মন খুশীতে ভরে যায়

P 27421

লক্ষ্মী ঘিয়ে তৈরী
খাবার খেলে
মন খুশীতে
ভরে যায়

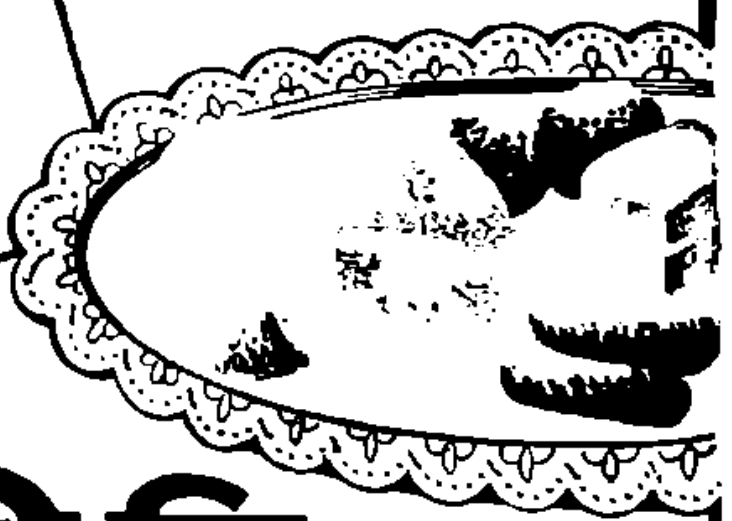

লক্ষ্মী ঘি

খাদ্যদ্রব্য
সুস্বাদু
ও
প্রীতিকর
করে

শুধু উৎকর্ষ নয় সুরুচির পরিচায়ক

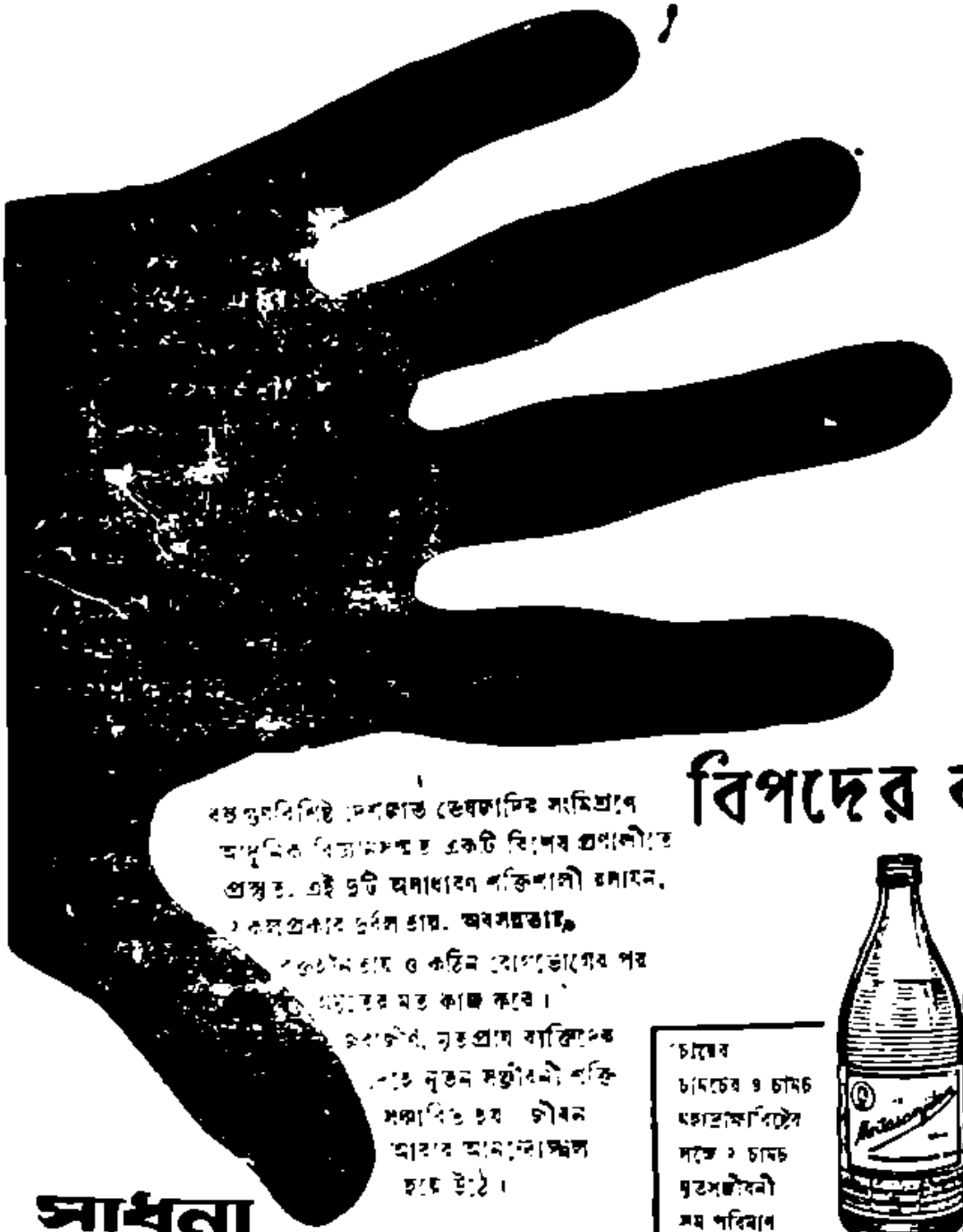

বিপদের বন্ধু

বহুগুণবিশিষ্ট ভেষজাদির সংমিশ্রণে
আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত একটি বিশেষ প্রণালীতে
প্রস্তুত. এই দুটি অসাধারণ শক্তিশালী রসায়ন,
কলপ্রকার দুর্বল রোগ, অবসন্নতায়,
কঠোর ও কঠিন রোগভোগের পর
যাদুর মত কাজ করে।
দুরারোগ্য, মৃতপ্রায় ব্যক্তিদেহে নূতন সঞ্জীবনী শক্তি
সঞ্চারিত হয় জীবন
আবার আনন্দোচ্ছল
হয়ে উঠে।

চায়ের
চামচের ৩ চামচ
ব্রেকফাস্টের
পরে ২ চামচ
মৃতসঞ্জীবনী
সম পরিমাণ
জলসহ প্রত্যহ
দুবার আহারের পর সেব্য।

সাধনা মৃতসঞ্জীবনী ও মহাদ্রাক্ষারিষ্ট

(৬ বছরের পুরাতন)

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা কলিকাতা-৪৮

কলিকাতা কেন্দ্র • ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি,এস, (কলি)
আয়ুর্বেদাচার্য

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম,এ,
আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন)
এম,সি,এস, (আমেরিকা) ভাগলপুর
কলেজের রসায়ণ শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

শারদীয়

গল্প-ভারতী

আশ্বিন—১৩৮০

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম"

সম্পাদক :
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মূল্য—ছয় টাকা

শ্রীগোপবিহারী দত্ত কর্তৃক ভারতী সাহিত্য ভবন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
১৭৯বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা-৭ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস-প্রাঃ লিঃ,
৯, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

স্বনিযুক্তি প্রকল্পের মাধ্যমে নিজের ব্যবসায় গড়ে তুলুন

॥ এই প্রকল্প ম্যাট্রিক বা সমতুল্য কোনো পরীক্ষায় পাস অথবা অধিকতর গুনসম্পন্ন বেকার যুবকদের জন্য ॥

ব্যবসায় করতে গেলে মূলধন লাগবেই। যতটা মূলধনের প্রয়োজন তার শতকরা নব্বুই ভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক সংস্থা থেকে সংগ্রহ করুন। বাকী দশভাগ পর্যন্ত টাকা সরকারই আপনাকে দেবেন ঋণ হিসাবে, দীর্ঘমেয়াদী ও কম সুদে।

বিশদ বিবরণের জন্য নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

জেলায় : ডিষ্ট্রিক্ট ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল অফিসার
কটেজ অ্যাণ্ড স্মলস্কেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ ডিরেক্টরেট

অথবা প্রজেক্ট অফিসার, রুরাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ প্রজেক্ট

কলিকাতায় : এমপ্লয়মেণ্ট সেল,
কটেজ অ্যাণ্ড স্মলস্কেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ ডিরেক্টরেট
নিউ সেক্রেটারিয়েট (একতলা)
১, কিরণশংকর রায় রোড, কলিকাতা-১

আপনি যদি উদ্বাস্তু হন তাহলে নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন :

জেলায় : ডিষ্ট্রিক্ট রিহ্যাবিলিটেশন অফিসার

কলিকাতায় : ডিরেক্টর অব ইম্প্লিমেণ্টেশন
রিফিউজি রিহ্যাবিলিটেশন ডিরেক্টরেট
১০, ক্যামাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত

এই সংখ্যায়

শ্রীশ্রীচণ্ডী —

কমলাকান্তের দুর্গাপূজা —শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

মহামায়ার আগমনী —রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়

জেলে জেলে দুর্গাপূজা —প্রশান্তকুমার রায়

—কাহিনী—

মধু বৃন্দাবনে

ভোজন থালি —শম্ভু মহারাজ

বিচিত্র অভিজ্ঞতা —গোপাল ভৌমিক

ঠাকুরদার ঝুলি —সুধাংশুমোহন বন্দোপাধ্যায়

একটি পুরুষ একটি নারী এবং নেভা নদী —কৃষ্ণ ধর

জীবন নাট্যের প্রথম তিন অঙ্ক —নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

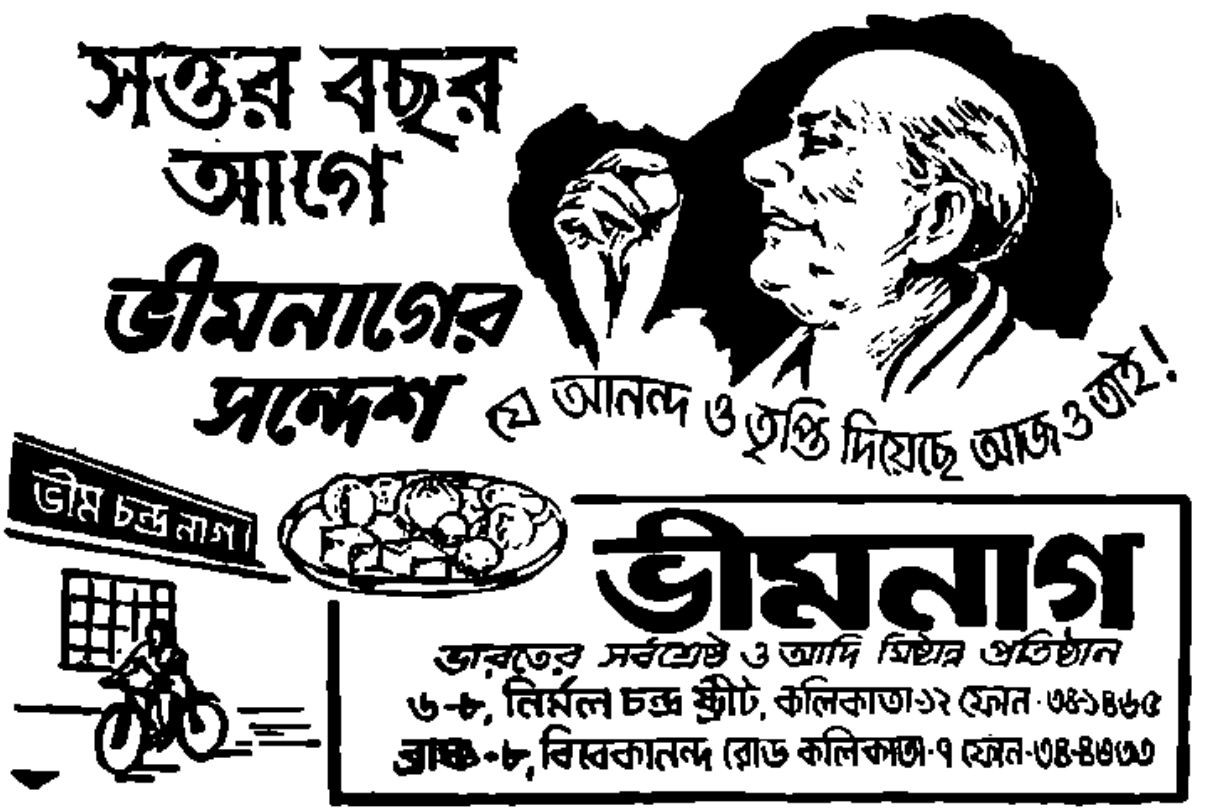

এই সংখ্যায়

সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলি অথবা প্রশ্নের আড়ালে	—দক্ষিণারঞ্জন বসু	২৫
দিন বদলায়	—সুতপা চক্রবর্তী	৩১
রিপোর্টারের জার্নাল	—সুদেব রায়চৌধুরী	৩৪
রামদাস	—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪১
জীবন কাহিনীর দু'একটি স্মৃতি	—সত্যেন বোস	৪৪
যোগক্ষেমং বহাম্যহম্	—চপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য	৪৫
বেঁটে সম্পাদকের আত্মকাহিনী	—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়	৪৭
'সরকার সেলাম'	—পুলকেশ দে সরকার	৫১
রহস্যময় কলোসিয়াম	—রবীন্দ্র নারায়ণ দে	৫৮
দক্ষিণে	—অন্নদাশঙ্কর রায়	৬৩
প্রবাসিনীর পুরাতনী	—জ্যোতির্ময়ী দেবী	৭১

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্পগুচ্ছ

রবীন্দ্রনাথ-রচিত সমুদয় গল্প গল্পগুচ্ছের চারটি খণ্ডে সংকলিত। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে ১২৯১ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৪০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত রচিত প্রায় সমস্ত গল্প সংগৃহীত। উক্ত সময়ের পূর্বে বা পরে রচিত গল্পগুলি চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত। মূল্য প্রথম খণ্ড ৫·৫০ দ্বিতীয় খণ্ড ৫·০০ তৃতীয় খণ্ড ৮·০০ ও চতুর্থ খণ্ড ৫·৫০ টাকা। চার খণ্ড একত্রে কাপড় বাঁধাই সংস্করণ যন্ত্রস্থ।

বিশ্বভারতী

১০, প্রিটোরিয়া ষ্ট্রীট। কলিকাতা-১৬

এই সংখ্যায়

—গল্প—

কেলেঙ্কারি	—বিমল মিত্র	১
দুর্যোধ	—প্রেমেন্দ্র মিত্র	৮
জীবন মরণ সীমানায়	—ভবানী মুখোপাধ্যায়	১৩
হিন্দু মুসলমান	—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়	১৭
বেওয়ারিশ মুর্দা (বড় গল্প)	—গজেন্দ্রকুমার মিত্র	২৩
তাসের ঘর	—শক্তিপদ রাজগুরু	৩৩
তুষার কমল	—চিত্তরঞ্জন মাইতি	৪১

সি, আই টি মানিকতলা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল এস্টেটে অ্যাকমোডেশন

ডাইরেক্টরেট অফ কটেজ অ্যাণ্ড স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ-এ রেজেষ্টারিভুক্ত ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহের জন্য মানিকতলায় ভি আই পি. রোডের উপর পশ্চিমবঙ্গ স্মল ইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশন লিঃ দুইটি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এষ্টেট নির্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। স্বয়ংসিদ্ধ শিক্ষিত স্থানীয় বেকার ব্যক্তিগণকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

যে সকল উদ্যোক্তা এই এষ্টেটে শেড লইতে ইচ্ছুক তাঁহারা নিম্নোক্ত তথ্যাদি উল্লেখ করিয়া ১০৯.৭.৩ তারিখের মধ্যে আবেদন করিবেন :—

শিল্প ইউনিটের নাম ও ঠিকানা। ২। এস, এস, আই-এর রেজিষ্ট্রেশন নম্বর।

বর্তমান ইউনিটের ক্ষেত্রে উৎপাদন আরম্ভ হওয়ার তারিখ।

মালিক/অংশীদার/ডিরেক্টরদের নাম ও ঠিকানা।

যে সকল দফা তৈয়ারী হইবে তাহার তালিকা। ৬। আবশ্যক কাঁচা মাল, (ক) আমদানি করা, (খ) দেশজ।

কোনো বিশেষ সরঞ্জাম এবং ফিকশ্চার যথা বয়লার ইত্যাদি প্রয়োজন হইলে তাহার নাম।

৮। কতখানি এরিয়া দরকার (ক) খোলা (খ) আচ্ছাদিত।

৯। বৈদ্যুতিক শক্তি (এইচ টি/এল টি)

১০। নিয়োগের পর্যায় বিভাগ-ম্যানেজেরিয়াল, সুপারভাইজারি, দক্ষ, আধাদক্ষ, অ-দক্ষ।

১১। উদ্যোক্তাদের পটভূমি।

১২। অপর কোন ব্যবসায়ে/শিল্পে,ডিরেক্টর/মালিক/অংশীদারের স্বার্থ আছে কিনা থাকলে এই প্রকার স্বার্থের সম্পূর্ণ বিবরণী নিম্ন ঠিকানায় জানাইতে হইবে :—

ম্যানেজিং ডিরেক্টর

পশ্চিমবঙ্গ স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ করপোরেশন লিমিটেড

৫৫, গনেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ কলিকাতা-৭০০ ০১৩

এই সংখ্যায়

কৃপাসিন্ধু মাসচটক	—অসিত গুপ্ত	৪৮
দারোগার মিছিল (বড় গল্প)	—দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	৫০
দ্বিতীয় স্তরের মানুষ (বড় গল্প)	—কবিতা সিংহ	৬৫
রজনীগন্ধার রং লাল	—গৌরীশংকর দে	৭৬
বিশুলাল	—মহাশ্বেতা দেবী	৮১
সম্রাট	—সুশীল রায়	৮৫
পৃথুলা	—বাণী রায়	৯১
এক অধ্যায়	—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়	৯৭
ঝংকার	—নিলীনা দাশগুপ্ত	১০৫
শঙ্কুকন-শিল্পী	—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	১১০
ভারতবর্ষ	—উৎপল চক্রবর্তী	১১৩
অভিজিতা	—সুবোধ বসু	১১৮
চাই—হুইস্কি···বিয়ার···রাম (বড় গল্প)	—সুলেখা দাশগুপ্ত	১২৩
প্রতিক্রিয়া	—সমর বসু	১৩৯

For trouble-free printing

Use more Blocks.

KING HALFTONE Co.

A PIONEER IN PROCESS ENGRAVING

Gram : Quickwork, Calcutta
Phone : 24-2075

22, Nirmal Chunder Street,
CALCUTTA-12

এই সংখ্যায়

★

রমণী	—মায়া বসু	
দক্ষিণ সমুদ্রের গান (বড় গল্প)	—নির্মলেন্দু মাল্লা	
অবলম্বন	—মানবেন্দ্র পাল	
মহামানব চলে গেলেন (বড় গল্প)	—বোধিসত্ত্ব মৈত্রেয়	
রজনীগন্ধা	—বিভূতিভূষণ গুপ্ত	
চাঁদ	—অনিলকুমার ভট্টাচার্য	
ক্ষুদিরাম কলোনীর সিতিকণ্ঠ	—আশাপূর্ণা দেবী	
এপার ওপার	—নরেন্দ্র নাথ মিত্র	
	—উপন্যাস—	
অনিবার্য	—পার্থ চট্টোপাধ্যায়	১—৩২
[illegible]	—নাটক—	
[illegible] যজ্ঞ	—নাট্যকার মন্মথ রায়	১—১৯

আরো দুটো দাও না...

বিনোদের

ক্ষীরের সিঙ্গাড়া

ভাল জানতাম-কিন্তু এতো ভাল তা আজ জানতাম না

বিনোদ বিহারী নাগ

গণেশ চন্দ্র দত্ত

৫৭, রাম দুলাল সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৫৫-১৪৫০

৫, ৬ হেয়ার ষ্ট্রীট,

ফোন : ২৩-১৯১৯

শাখা

১৮, যতীন্দ্রমোহন এভিনিউ,

এই সংখ্যায়

★

—উৎসব—

আমেরিকায় কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন দিবস উৎসব	—প্রভাত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
দুর্গোৎসব : আদিরূপ এবং বর্তমান ব্যাপ্তি	—লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য
মংগল দিনকর শ্যাম	—মনিপদ্ম
মাংগল্যময় সিংহল	—মীনা সেন
উৎসব মেলায় ব্রহ্ম	—পুতুল রায়
উৎসবে ধ্যানী জাপান	—হাসি ভট্টাচার্য
পশ্চিম বাংলার গ্রামীণ উৎসব	—অলকা ভট্টাচার্য
মহারাষ্ট্রের গণেশ চতুর্থী উৎসব	—শ্যামলেন্দু মাল্লা
কেরেলার ওনাম নৌকা প্রতিযোগিতা	—শুভেন্দু মাল্লা
দশেরা	—দীপঙ্কর
ঈদ উৎসব	—নবকুমার শীল

নিখুঁত ও নির্ভুল কাজ

ব্লক ম্যাট ষ্টিরিও

বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও সুদক্ষ কারিগরের তৎপরতার সমন্বয়ে আমাদের প্রতিটি কাজ সব সময়েই বাজারের সেরা

মডার্ণ হাফটোন কোং

৪৫, মলঙ্গা লেন কলিকাতা-১২

ফোন : ২৪-৩১০৫

অসংখ্য মতামতের মধ্যে মাত্র কয়েকটি

I have tried a sample of 'Lakhmi Ghee' and found it very good. Pure ghee is so scarce in these days that any one who offers pure ghee for sale renders distinct publicservice.

C. C. Biswas

Ex. Judge, Calcutta High Court.
Ex-Law Member, Govt. of India

আমি লক্ষ্মী-ঘিই ব্যবহার করি। অন্য ঘিয়ের তুলনায় এ ঘি অনেক ভাল ও বিশুদ্ধ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

—সত্যেন মজুমদার

সম্পাদক—আনন্দবাজার পত্রিকা

লক্ষ্মী ঘি ব্যবহার করে আমার বিশেষ ভাল লেগেছে। এটা সত্যিই ঘি।

—শিশির কুমার ভাদুড়ী

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি সত্যই ইহা বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ।

ডাঃ কালিদাস নাগ

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার ক'রে দেখেছি এটা ভাল জিনিষ।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

সম্পাদক—অমৃতবাজার পত্রিকা

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিবার সুযোগ হইয়াছিল। ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এই দেশালের বাজারে এরূপ খাঁটি ও সুস্বাদু ঘৃত পাওয়া সৌভাগ্যের ব্যাপার।

শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আমি 'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি। এই ঘি বাজার চলতি উৎকৃষ্ট ঘৃতের অন্যতম, জনসাধারণ স্বচ্ছন্দে ইহা ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

সম্পাদক—দৈনিক বসুমতী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া দেখিলাম। বাজারে প্রচলিত সাধারণ ঘৃতের তুলনায় ইহা অনেক গুণে ভাল, সে বিষয় নিঃসন্দেহ। ব্যবহার করিয়া দেখিলে প্রত্যেকেই আমার সঙ্গে একমত হইবেন আশা করা যায়।

শ্রীআশাপূর্ণা দেবী

'লক্ষ্মী ঘৃত' ব্যবহার করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহার স্বাদ ও গন্ধ ভাল।

সীতা দেবী

'লক্ষ্মী ঘি' ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছি, ইহাতে প্রস্তুত খাদ্যাদির স্বাদ ভাল ও মুখোরোচক হয়।

শ্রীশান্তা দেবী

আপনি কি বেতনভোগী ?

আপনি কি আপনার আয়কর-এর 'রিটার্ণ' দাখিল করেছেন ?

কেবল বেতনই যাঁদের মাসের আয় তাঁরা সমেত যাঁরাই মোট আয় গত বছরে পাঁচ হাজার টাকার উপর গেছে, তাঁকেই আয়কর এর বিবরণ দাখিল করতে হবে এবং তাতে ১৯৬১-র আয়কর বিধি অনুযায়ী, অনুমোদিত রেহাই-এর উল্লেখ করতে হবে।

আয়কর-এর সঠিক বিবরণ দাখিল করলে আপনার আয়কর আধিকারিক লক্ষ্য রাখবেন যে :—

(ক) আইনতঃ যে সব রেয়াত্ আপনার প্রাপ্য তা আপনি পেয়েছেন ; এবং

(খ) আপনি প্রদেয় করের চেয়ে বেশি কর জমা দিয়ে থাকলে তা অবিলম্বে আপনাকে ফেরত দেওয়া হয়েছে।

আয়কর-এর রিটার্ণ ফর্ম দরকার হলে কিংবা অন্যান্য কোনও জ্ঞাতব্য থাকলে আপনার আয়কর-নিরূপক-আধিকারিক (ITO) অথবা আয়কর বিভাগের জনসংযোগ আধিকারিকের (PRO) সঙ্গে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন।

আপনার 'রিটার্ণ'-এ আপনার পার্মানেন্ট অ্যাকাউন্ট নম্বর (PAN) উল্লেখ করতে ভুলবেন না। এযাবত আপনাকে কোনও পার্মানেন্ট বা স্থায়ী অ্যাকাউন্ট নম্বর দেওয়া হয়ে না থাকলে, একটা নম্বর দেওয়ার জন্য আপনার আয়কর আধিকারিক অথবা আয়কর কমিশনারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

দি ডিরেক্টোরেট অফ ইন্সপেকশান
(রিসার্চ, স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যাণ্ড পাবলিকেশান)
নতুন দিল্লী

D.A.V.P. 73/292
BENGALI

দেবি প্রপন্নার্ত্তিহরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জ্জগতোঽখিলস্য।

প্রসীদ বিশ্বেশ্বরি পাহি বিশ্বং,
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য॥

আধার ভূতা জগতস্ত্বমেকা,
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈতদাপ্যায্যতে
কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্য্যা,
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ,
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥

বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ,
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ,
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥

সর্ব্বভূতা যদা দেবী স্বর্গমুক্তি প্রদায়িনী।
ত্বং স্তুতা স্তুতয়ে কা বা ভবন্তু পরমোক্তয়ঃ॥

সর্ব্বস্য বুদ্ধিরূপেণ জনস্য হৃদি সংস্থিতে।
স্বর্গাপবর্গদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

কলাকাষ্ঠাদিরূপেণ পরিণামপ্রদায়িনি।
বিশ্বস্যোপরতৌ শক্তে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

সৃষ্টিস্থিতিবিনাশানাং শক্তিভূতে সনাতনি।
গুণাশ্রয়ে গুণময়ে নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

শ্রীশ্রীচণ্ডী। ১১ অ।

গল্প-ভারতী

শ্রীশ্রীচণ্ডী

কমলাকান্তের দুর্গাপূজা

অধ্যাপক—শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ

জয় জয় জয় জয় জয়দাত্রি
জয় জয় জয় বঙ্গ জগদ্ধাত্রি।
জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি।
যেষকদলনি সন্তান পালিনি।
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি॥

বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের মুখে এই দুর্গাস্তোত্র উচ্চারিত করিয়াছিলেন। এই স্তোত্র যে ভাবের সঙ্গে উদ্গীত হইয়াছিল—সে ভাবের উচ্ছ্বাস আজ আর বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্ফুরিত হয় না। প্রাণের সে সরসতা যেন শুকাইয়া গিয়াছে। কমলাকান্ত বলিলেন,—

"সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে আমার সর্বার্থসাধিকে! অসংখ্যসন্তানকুলপালিকে! ধর্ম-অর্থ-সুখদুঃখ-দায়িকে! আমার পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর।

এই ভক্তি প্রীতি বুদ্ধি শক্তি করে লইয়া তোমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছি, বিশ্ববিমোহিনী মূর্তি একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর। এসো মা গৃহে এসো। ছয়কোটি সন্তানে একত্রে একবারে বাদশকোটি কর যোড় করিয়া তোমার পাদপদ্ম পূজা করিব।"

অতঃপর আনন্দমঠে বঙ্কিমচন্দ্র—যে সন্তানের আদর্শ স্থাপন করিয়া দেশমাতৃকা-পূজার চিত্র দেখাইয়াছেন—সে আদর্শ আজ আমরা ভুলিয়াছি। স্বাধীনতালাভ হইয়াছে সত্য কিন্তু মাতৃচরণে নিবেদিত-প্রাণ সন্তান সম্প্রদায় আজ কল্পনার অতীত। স্বার্থ, লোভ ও মোহরূপী পিশাচ আজ ভারতের স্কন্ধে ভর করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'কে নিরানন্দে পর্যবসিত করিয়াছে। "উঠ মা এবার সুসন্তান

হইব, সৎপথে চলিব—তোমায় মুখ রাখিব। উঠ মা দেবি! দেবাসুরযুদ্ধে এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা।"

মাতৃপূজার এই পরম উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত বঙ্গবাসীকে—তথা ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। আজ সে আদর্শের কথা আলোচিত হয় না। যাঁর উদাত্তবাণীর ঝঙ্কারে সমগ্র ভারতবাসীর হৃদয়ে দেশপ্রেমের বন্যা বহিয়াছিল—আজ সে ঝঙ্কারের রেশ গগনে বিলীন!

যদিও স্বাধীনতালাভই ছিল আনন্দমঠের সন্তানগণের প্রধান উদ্দেশ্য, তথাপি বলিব—স্বাধীনতা লোকের আকাঙ্ক্ষিত হয় এইজন্যই যেহেতু মানুষ তাহার প্রাণধারণ নিরাপদ ও শান্তিময় হইবে মনে করে। নিরাপত্তা ও শান্তির উৎস কেবলমাত্র—অর্থ নহে। অর্থাগম ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত হইলে মানুষ শান্তির রসাস্বাদ করে। ন্যায়কে ভারতবাসী—ধর্মের মর্যাদায় উন্নীত করিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে,—মানুষ প্রয়োজনের দায় হইয়া ন্যায়কেও লঙ্ঘন করিতে সাহস করে, কিন্তু ধর্মকেও অতিক্রম করিতে সঙ্কোচ ও ভয় আসে। এজন্য বঙ্কিমচন্দ্র আনন্দমঠের আদর্শ অঙ্কিত করিতে ভগবৎপ্রাণ সন্তানের সৃষ্টি করিয়াছেন। সন্তানদিগের কণ্ঠে—'হরে মুরারে মধুকৈটভারে', 'জয় জগদীশ হরে' প্রভৃতি শ্রীভগবানের নামমাধুরী গাওয়াইয়াছেন। যখন সন্তানদের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন,—তখনও সন্তানদল-মুখে প্রকাশিত হইয়াছে—ভগবৎ সাক্ষাৎকার প্রতিজ্ঞা কর—আপনার জন্য বা স্বজনের জন্য অর্থোপার্জন করিবে না। যাহা উপার্জন করিবে, তাহা বৈষ্ণব ধনাগারে দিবে। সনাতন ধর্মের জন্য স্বয়ং অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিবে। রণে কখনও ভঙ্গ দিবে না।

সমস্ত ভাবের প্রবাহে ভারতের সংস্কৃতি যেন নবমূর্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যে জাতীয়তার বাঙ্গলার তথা সমগ্র ভারতের প্রাণে নবজাগরণের স্পন্দন আনিয়াছিল—তাহার মধ্যেও দেখা যায় যে—তিনি দেশ-মাতৃকা ও শ্রীদুর্গামূর্তিকে অভিন্নরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। নবভাবের সহিত প্রাচীন মানসপ্রবাহকে এক প্রণালীতে মিলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন।

এই মিলনের মূলে আছে—বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃপিতামহের সাধনার এক অপূর্ব প্রভাব। নবীন ভাবের ভাবুক বঙ্কিমচন্দ্র—চিরন্তন শ্রীদুর্গাপ্রতিমাপূজার ভাবধারাকে মিলিত করিয়াছেন এই দেশমাতৃকা আরাধনার ধারার সহিত। এখনও সেই পিতৃপিতামহের আরাধনার স্থান দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের বাসভবন সংলগ্ন প্রকাণ্ড পূজামণ্ডপ আজও দাঁড়াইয়া আছে। ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, ছোট ছোট বৃক্ষলতাগুল্মে মেঝে ও দেওয়াল আচ্ছন্ন হইয়াছে। কিন্তু সেই বহুছড়-শোভিত পাঁচটি সারি সারি স্তম্ভ সম্মুখের উচ্চ দেওয়াল মস্তকে ধারণ করিয়া আজও পূজা-ভবনের বিশালতার সাক্ষ্য দিতেছে। সম্মুখে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ও প্রাঙ্গণ হইতে মণ্ডপে উঠিবার জন্য প্রশস্ত সোপানশ্রেণী আজও পূজা-মণ্ডপের শোভাবর্ধন করিতেছে। দক্ষিণদ্বারী এই দালানের এই পূর্বোবর্তী প্রাঙ্গণ পার হইলেই আজও দেউড়ি ও মোটা মোটা পেরেকে কণ্টকিত কাষ্ঠনির্মিত উচ্চ দ্বারদেশ প্রাচীন আভিজাত্যের প্রমাণ প্রদান করিতেছে।

বহু বৎসর ধরিয়া এই মণ্ডপের মধ্যদেশে শ্রীদুর্গাপ্রতিমা পূজিতা হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের পিতামহ ও যাদবচন্দ্র উভয়ই পরম নিষ্ঠা ও ভক্তিসহকারে এই পূজা নির্বাহ করিতেন। গভীর রাত্রিতে সন্ধিপূজার সময়েও সমস্ত পরিবারবর্গের সহিত গৃহকর্তারা সশরীরে উপস্থিত থাকিতেন। পুরোহিত পূজা করিলেও গৃহকর্তারা জোড়হস্তে দণ্ডায়মান থাকিয়া 'মা' 'মা' বলিয়া অশ্রুপাত করিতেন।

ভট্টপল্লী সন্নিহিত গ্রাম, সেখান হইতে জ্ঞানসম্পন্ন পুরোহিত আনাইয়া পূজা করাইতেন, নিজেরা ঘট স্থাপন করিতেন। আত্মীয়কের সমস্ত দৃশ্যপূজার আয়োজনে আদেশ দিতেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণের মতই অনিমন্ত্রিত অব্রাহ্মণদিগকে সাদরে প্রসাদ পরিবেশন করাইতেন। এই পারিবারিক পরিবেশের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্র-জীবনে গভীরভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল। তাহার ফল বঙ্কিম-সাহিত্যে ও 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতে—দেশমাতৃকা শ্রীদুর্গার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। শ্রীদুর্গাপ্রতিমা মৃন্ময়ী, দেশমাতৃকাও মৃন্ময়ী, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবসাধনায় উভয়ই যেন চিন্ময়ী হইয়া উঠিয়াছেন।

আমরা চণ্ডীগ্রন্থে পাঠ করিয়াছিলাম বটে—

আধারভূতা জগতস্ত্বমেকা
মহীস্বরূপেণ যতঃ স্থিতাসি।
অপাং স্বরূপস্থিতয়া ত্বয়ৈত-
দাপ্যায়তে কৃৎস্নমলঙ্ঘ্যবীর্য্যে॥

যে মা দুর্গে! তুমি সমস্ত জগতের একমাত্র আধার, কেননা তুমিই পৃথিবীস্বরূপে অবস্থিতা, আর তুমি, যে অলঙ্ঘ্যবীর্য্যে! জলস্বরূপে বিরাজিতা হইয়া এই জগৎকে আপ্যায়িত—তৃপ্ত করিতেছ। অথর্ববেদেও পৃথিবীস্তুতি মন্ত্রগুলি অপূর্ব দেশভক্তিপরিচায়ক, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অথর্ববেদে—"মা নো ভূমির্বিস্তাং মাতা পুত্রায় মে পয়ঃ।"—সেই পৃথিবী মাতা পুত্র আমি—আমাকে পয়ঃ (জল ও দুগ্ধ) দান করুন। পৃথিবী যে মাতৃরূপিণী ইহা বৈদিক সিদ্ধান্ত হইলেও তাহা পরিস্ফুট হইবার মত ভাষায় তেমন আলোচনা হয় নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার অমর লেখনীযোগে সেই প্রাচীনভাবকে নবীন ভাষায় নবীন উদ্দীপনায় প্রকাশ করিয়া বিশ্বকে বিস্মিত করিয়াছেন।

"ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমলদলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী"।

মহামায়ার আগমনী

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সুমঙ্গল শঙ্খধ্বনি ও সুমধুর আগমনী গান, এক শারদ প্রাতের আকাশ বাতাস আনন্দমুখর করে তুলল। সে দিন আনন্দময়ীর আগমন। রূপ রস গন্ধে ভরা ধরণী। সোনার বরণ ধানের ক্ষেত—নদী, খাল, পুষ্করিণী জলে ভরা। জলে পদ্ম, স্থলে জবা। প্রকৃতি তার ডালি সাজিয়েছে মহামায়ার বরণকল্পে। বিগত বছরে মায়ের সন্তানগণ জলভরা চোখে বিজয়ার গান গেয়েছিল, কিন্তু সেই সঙ্গে আকুল হৃদয়ে প্রতীক্ষা করেছিল এই শুভ দিনটিকে। এই আনন্দ দিনে মানুষ ভুলে যায় পরস্পর দ্বন্দ্ব, দুঃখ দৈন্য। মানুষকে দীক্ষিত করে সাম্য, মৈত্রী, নিষ্ঠা, সাধনার মহামন্ত্রে। এই শারদীয়া পূজা এতদিন জনগণের মনে নূতন প্রাণ সঞ্চার করত। গ্রামে, সহরে, মানুষ উৎসবে মেতে উঠত। কালের কঠোর হস্ত এখন সে আনন্দকে হরণ করেছে। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের চিন্তাধারা পরিবর্তন হচ্ছে। সে প্রাকৃতিক পরিবেশ, সে আন্তরিকতা বা সামাজিক বন্ধন খুবই অল্পই দেখা যায়। বাঙ্গলার অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের ভক্ত কবিগণ মাতৃবন্দনা—আগমনী গান লিখে ধন্য হয়েছেন। আগমনী গান এখন মহাপূজায় শোনা যায় না। যান্ত্রিক যুগে যন্ত্র পরিচালিত তন্ত্রাবহ, কুৎসিত রুচিপূর্ণ গান মানুষকে বিব্রত ও রোগগ্রস্ত করে তোলে। কে জানে, সুদূর কোন এক শান্তিপূর্ণ গ্রামে, মায়ের বন্দনা যথারীতি সম্পন্ন হয় কিনা! বরেণ্য বাঙ্গলার কবি দাশরথি রায় রচিত আগমনী গান এক সময় বাঙ্গালীর অন্তরকে অভিভূত করেছিল। দাশরথি রায় রচিত একটি আগমনী গান :—

আগমনী

মিশ্র বিভাস—ঝাঁপতাল

কৈ হে গিরি! কৈ হে আমার
প্রাণের উমা নন্দিনী
সঙ্গে তব অগ্রনে, কে এল রণরঙ্গিনী
এযে সর্ব্বমঙ্গলা তিমির নাশিনী।
করি অরিতে করি ভর
করে করিছে রিপু সংহার
পদ ভরে কাঁপে মহী মহিষমর্দ্দিনী
ত্রিলোকধন্যা ত্রিলোকজননী।

দুর্গাপূজা
জেলে জেলে

স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মাতৃসাধনা

—প্রশান্ত রায়

আমরা সকলে জগন্মাতার সন্তান। আমরা মাকে ডাকি, মায়ের আরাধনা করি আমাদের অন্তরে সুখ-শান্তি লাভের জন্যে। আজ দেশের চতুর্দিকে বড় অন্ধকার, আমরা কোথাও পথ দেখতে পাই না, তাই মায়ের কাছে নত হয়ে প্রার্থনা করি শক্তি লাভের জন্যে, আমাদের ন্যায়-ধর্ম-নীতি ফিরে পাবার জন্যে।

বাঙালী চিরকাল মায়েরই পূজা করে এসেছে। আধুনিক কালে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চারণ করলেন মহামৃত্যুঞ্জয়ী শক্তিমন্ত্র—বন্দেমাতরম্। আমাদের হৃদয়ে তখন এক অপরূপ আলোক প্রবেশ করল, আমরা তখন শুধু যে মাকে আরাধনা করে হৃদয়ে শক্তি পেলাম তা নয়, আমরা দেশকেও মা বলে পূজা করতে, শ্রদ্ধা করতে, ভক্তি করতে শিখলাম।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙালী সমস্ত মন প্রাণ ঢেলে মাকে ডেকেছে, মায়ের আরাধনা করেছে। দেশে তখন পরাধীনতার অন্ধকার। সে ঘোর অন্ধকার দূর করার জন্যে বাঙালী তখন জীবনপণ করে লড়াই করেছে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে। তার ফলে, সইতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন, দুঃখ, কষ্ট, এমন কি মৃত্যু পর্যন্ত বরণ করতে হয়েছে।

কে তাঁদের হৃদয়ে এমন আশ্চর্য প্রেরণা সঞ্চার করলেন? কার আরাধনায় নিরত হয়ে তাঁরা এমন অলৌকিক শক্তি লাভ করলেন? অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সেই বিপ্লব আন্দোলনের যুগে বাঙালী বীরসন্তান কারাগারের মধ্যেও দেবী দুর্গার আরাধনা করেছে। শত বাধাবিপত্তি, অসুবিধার ভেতরেও সে-যুগের বিপ্লবীরা সোৎসাহে অন্তরালে মায়ের পূজায় মন প্রাণ সমর্পণ করেছে। বড় বিস্ময়কর সে ইতিহাস! আমরা অনেক পরিশ্রমে তিনটি জেলের দুর্গাপূজার বিবরণ সে-যুগের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধার করে পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করলাম। আশাকরি এই উদ্ধৃতি পাঠকদের হৃদয়ে নতুন করে শ্রদ্ধা, ভক্তি ও দেশপ্রেম জাগিয়ে তুলবে।

—সম্পাদক

আন্দামান জেলে দুর্গাপূজা :—

আন্দামান জেল থেকে ১১।৯।২৪ তারিখে মেজোবৌদিকে সুভাষচন্দ্রের লেখা চিঠি—

"এখানে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হচ্ছে। আশা করি এখানেই মায়ের পূজা করিতে পারব। তবে খরচ নিয়ে কর্তৃপক্ষের সহিত ঝগড়া চলছে, দেখা যাক কি হয়। পূজার কাপড় এখানে পাঠাতে যেন ভুল না হয়—বিজয়া দশমী যখন এখানেই কাটাবো।"

২৫।৯।২৪ তারিখে বাসন্তীদেবীকে লিখিত চিঠিতে জানালেন সুভাষচন্দ্র, সুদূর আন্দামান জেলে বসে,

"আজ মহাষ্টমী। আজ বাঙলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি এসে দেখা দিয়েছেন। আমরা এই বৎসর এই-খানেই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করিতেছি। মা যোড়হস্ত আমাদের কথা ভোলেন নাই তাই এখানে এসেও তাঁহার পূজা অর্চনা করা সম্ভবপর হয়েছে। পরশুদিন আবার

আমাদের কাঁদিয়ে মা চলে যাবেন। জেলখানার অন্ধকারের মধ্যে নির্জীবতার মধ্যে—পূজার আলো, পূজার আনন্দ বিলীন হয়ে যাবে এইরূপে কয় বৎসর কাটাবো জানিনা তবে মা যদি এসে বৎসরান্তে দেখা দিয়ে যান তবে—কারাবাস দুর্বিসহ হইবে না তাহা বলি।"

১২।১০।৩৩ আবার লিখলেন,

"সরস্বতী পূজা আমরা এখানে করেছিলাম। পূজার খরচ নিয়ে আমাদের সহিত কর্তৃপক্ষের গণ্ডগোল চলছে। দুর্গাপূজার টাকা ও সরস্বতী পূজার টাকা এখনও দরকার দেন নাই। আমি কয়েকটি কাগজ পাঠাচ্ছি—তা থেকে বুঝতে পারবেন যে আমাদের পূজা সংক্রান্ত খরচ বহন করবার ভার বাংলা সরকারের উপর—বাঙ্গা সরকারের উপর নয়।"

রংপুর জেলে দুর্গাপূজা :—

তদানীন্তন দৈনিক পত্রিকা 'Liberty' ১০ই অক্টোবর '৩০ সালে একটি ছোট্ট সংবাদ,

"The Durga Puzah in the local jail passed off smoothly. The Detenus performed the puzah with all solemnity and all the prisoners were sumptuously fed. The immersion ceremony took place in the tank inside the zail : the permission to hand over the Pratima to the Congress Volunters was refused."—Free Press.

হিজলী জেলে দুর্গাপূজা :—

পূজোর বন্ধ, বিজয়া দশমীতে গণ্ডগোল বাধলো হিজলী জেলে। Liberty পত্রিকায় ১২।১০০ প্রকাশিত—

"It is said, that on the last Bejoya day, the prisoners were ordered to be locked up at the usual time. They wanted a few minutes time to finish mutual greetings. This was refused by the zail authorities and it is stated, they were forcibly taken to their respective cells where the prisoners began shouting, 'Bande Mataram' Thereupon the Superintendent of the zail, it is stated, rang up alarm bail. Armed force arrived on the spot soon. The prisoners then began hunger-strikes when their complaint regarding diet and clothing were not attaned to."—Free press.

১৯৩৩ সালে ৪ঠা অক্টোবর Forward পত্রিকা আর একটি আকর্ষণীয় সংবাদ,

"Bengali Detenus on Hunger-Strike.
Precarious condition
Permission to perform Puza refused"
Mandalya Oct 2, 1933.

Nine Bengali detenus confined in the Local Central zail are reported to have gone on hunger strike from Sept. 20th last as a prorest against alleged refusal by the zail authorities to grant them facilities for performing Durga Puza."—Free Press.

কাহিনী

কাহিনী

ভূমিকা

প্রতি বছর গল্পভারতী নতুন নতুন বিষয় পরিবেশন করে, পাঠকদের সম্মুখে অজানা অচিনব জগতের দরজা খুলে দেবার জন্যে সে সব সময় চেষ্টা করে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনকে তার তত্ত্ব রূপ সন্ধানের পথে চলে গল্পভারতী।

এ বছর গল্পভারতী একটি অত্যন্ত অভিনব বিষয়ের আয়োজন করেছে—সেটি হোল কাহিনী। এই বিভাগে আপন আপন জীবনের স্মৃতিকথা লিখেছেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক বিখ্যাত লেখক এবং সাংবাদিক। এঁদের অনেকে বৃদ্ধ হয়েছেন, তাঁদের চিন্তাধারা, তাঁদের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত মূল্যবান। তাই স্মৃতিচারণের মাধ্যমে তাঁরা দেশকে যা উপহার দিলেন তা অমূল্য—তা চিরকাল আমাদের স্মৃতির মণিকোঠায় রক্ষা করার মতো। একদিন এঁদের অনেকে যখন থাকবেন না তখন এই কাহিনী তাঁর হয়ে পাঠকদের কাছে কথা বলবে।

বাংলার লেখক ও সাংবাদিকদের আমরা আহ্বান জানিয়ে বলেছি—এতকাল বাস্তব আর কল্পনার টানাপোড়েনে গল্পের বেনারসী বুনেছেন; রচনাকে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ করতে গিয়ে আত্ম-বিলুপ্তি ঘটিয়েছেন, সযত্নে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছেন। এবার আত্মপ্রকাশ করুন, কোনো কাল্পনিক চরিত্রের পোষাক পরে নয়, একেবারে অবেশে নিজের মুখটি দেখান। অপরের মধ্যে এতদিন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন, এবার সেই লুপ্ত 'আমি'কে উদ্ধার করুন, আমরা আপনার স্বরূপ দেখব।

দেশের বর্ষীয়ান লেখক লেখিকা থেকে সুরু করে আজকের নূতন লেখক লেখিকাদের উদ্দেশ্যে আমরা জানিয়েছি—আপনারা অন্তঃপুরের কথাও বলুন বাইরের কথাও বলুন। দেশ আজ দ্রুত পালটে যাচ্ছে, আপনারা এসব কথা না লিখলে চিরকালের মতো হারিয়ে যাবে। আপনাদের এই সব আত্মকাহিনীতো ভবিষ্যতে ইতিহাস সৃষ্টির অমূল্য সম্পদ হবে।

আমাদের এই অকুণ্ঠ আবেদনের ফল হয়েছে অত্যন্ত বিস্ময়কর। যাঁদের কাছেই আমরা গিয়েছি তাঁরা সকলেই সহযোগিতা করেছেন, যাঁদের দুয়ারে হাত পেতেছি একমুঠো ভিক্ষাদের জন্যে, তাঁরা সকলেই পরমান্ন পরিবেশন করেছেন। এতখানি প্রাপ্তি আমাদের আশাতীত। কাহিনীর মধ্যে মিথ্যের ভেজাল নেই, আছে জীবনের সত্যকার বিচিত্র রূপ। আর এইখানেই কাহিনীর গুরুত্বকার, কল্পনার চেয়ে সত্য সবসময়েই বিস্ময়কর চমকপ্রদ। "Truth is stranger than fiction"

এই কাহিনীর আসরে আমরা আপনাদের সাদর আহ্বান জানাই, আমরা আশা করি বহু বিচিত্র জীবনের এই সব স্মৃতিকথা আপনাদের অবসরকে আনন্দে ভরিয়ে দেবে, আপনাদের জীবনকে অতি মধুর ও রমণীয় করবে।

• কাহিনীকার •

বৈজ্ঞানিক	সত্যেন বোস
	চপলাকান্ত ভট্টাচার্য
	অন্নদাশঙ্কর রায়
	বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
	দক্ষিণারঞ্জন বসু
	নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
	জ্যোতির্ময়ী দেবী
	সুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়
	সুদেব রায়চৌধুরী
	গোপাল ভৌমিক
	পুলকেশ দে সরকার
	কৃষ্ণ ধর
	সুতপা চক্রবর্তী
	শম্ভু মহারাজ
	রবীন্দ্রনারায়ণ দে
	শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

মধু-বৃন্দাবনে

ভোজন-থালি

শম্ভু মহারাজ

বারোটি বন, বারোটি তীর্থ ও পাঁচটি হ্রদ নিয়ে গঠিত যে মধুদণ্ড মণ্ডল, ভক্ত-বৈষ্ণবরা তাকে বলেন ব্রজ-মণ্ডল আর আমি বলি মধু-বৃন্দাবন। চুরাশি ক্রোশ পদ-পরিক্রমা করে শ্রীকৃষ্ণের শৈশব ও কৈশোরের এই লীলাভূমি দর্শন করতে চল্ল।

পরধর্মদ্বেষী দস্যু ও আক্রমণকারীদের কবলে পড়ে এই ঐশ্বর্যশালী মণ্ডল সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আনুমানিক ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য নীলাচল থেকে বৃন্দাবনে আসেন। তিনি মনুষ্য বসতিহীন ও হিংস্র-শ্বাপদপূর্ণ বনাবৃত ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেন। তারপরে শ্রীরূপ-সনাতনকে লুপ্ত ব্রজ-মণ্ডল প্রকট করে তুলবার আদেশ দেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর আশীর্বাদে রূপ-সনাতন ও তাঁদের সতীর্থগণ লুপ্ত ব্রজ-মণ্ডলকে উদ্ধার করতে সমর্থ হলেন। আর তখন থেকেই এই চুরাশি ক্রোশ বন-পরিক্রমার প্রচলন হোল।

মূল-বনযাত্রা শুরু হয় নন্দোৎসবের পরদিন। ব্রজবাসীরা এই যাত্রা পরিচালনা করেন। তবে বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তগণ তাঁদের সুবিধামত সময়ে বনযাত্রা করে থাকেন। যেমন কলকাতার কোন এক আশ্রমের তরফ থেকে কার্তিক মাসে আমাদের এই যাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। শতাধিক সন্ন্যাসী ও শিক্ষ-শিক্ষার সঙ্গে আজ ন'দিন ধরে আমি মধু-বৃন্দাবনের পথ-পরিক্রমা করছি। ইতিপূর্বে দর্শন করেছি —বৃন্দাবন, মথুরা, মধুবন, তালবন, বহুলাবন, রাধাকুণ্ড, গোবর্ধন ও কামাবন। আজ চলেছি ভোজন-থালি— সখাদের সঙ্গে সখাসহায় শ্রীকৃষ্ণ যেখানে বন-ভোজনলীলা সম্পন্ন করেছিলেন।

মাঠের ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের সংকীর্তন শোভাযাত্রা। ব্রজমণ্ডলে মেঠোপথ মানেই কণ্টক-পথ। আমাদের সকলেরই খালি-পা। কিন্তু এখন কাঁটার ভয় কেটে গিয়েছে আমাদের। সুতরাং কীর্তন করতে করতে নির্ভয়ে এগিয়ে চলেছি।

কিছুদূর কেটে একটু উঁচুতে উঠে হনুমান মন্দির। রামভক্ত মহাবীরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের কি সম্পর্ক, জানা নেই আমার। কিন্তু কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন করতে এসে যাকে যাকেই শ্রীহনুমানকে দর্শন করছি। হয়, কৃষ্ণভক্তগণ ভক্ত-শিরোমণি মহাবীরকে ভুলতে পারেন নি বলেই তাঁর স্মৃতিরক্ষার আয়োজন করেছেন।

সুতরাং সশ্রদ্ধ চিত্তে মন্দিরে উঠে আসি। ছোট মন্দির, কোন মূর্তি নেই। ভেতরে একখানি সিঁদুরমাখানো শিলা —সম্ভবত শ্রীহনুমানের প্রতীক।

প্রণামী দিয়ে প্রণাম করি। তারপরে আবার নেমে আসি মাঠে—সংকীর্তন শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে।

মাঠে কাঁটা আছে কিন্তু রোদ নেই। এখানে প্রচুর গাছ-পালা। ছায়াশীতল পথ ধরে এগিয়ে চলেছি আমরা।

চমৎকার একটি শান্ত-সুন্দর স্থানে এসে শোভাযাত্রা থামল। জনৈক সহযাত্রী বললেন—শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীর ভজন কুটির।

সাধন-ভজন করার আদর্শ-স্থানই বটে। সমস্ত অঞ্চলটি গাছে-ছাওয়া—যেন ঘন বন। সামনে সুন্দর একটি সরোবর, তারই তীরে সেই রসিকানন্দ মহাপুরুষের পদরেণু রঞ্জিত মহাতীর্থ। আমরা দর্শন ও প্রণাম করি।

সরোবরটির নাম শ্রীকুণ্ড। বাঁধানো ঘাটের একপাশে গিরিধারীর মন্দির। মন্দিরের গায়ে ছোট একটি ঘরে একজন সাধু বাস করেন।

কেন? কেন এই সন্ন্যাসী, লোকালয় থেকে বহুদূরে, এই জনহীন বনে একাকী বাস করছেন? শুনেছি তিনি

নাকি বড় একটা এ বনের বাইরে যান না। কেউ এসে কিছু দিয়ে গেলে খাওয়া জোটে, নইলে উপবাসী থাকেন। কেন? কি করেন তিনি এখানে?

প্রবোধানন্দ যা করেছেন, সাধন-ভজন করেন।

আজকের যুগেও তার কোন প্রয়োজন আছে কি?

আছে, নিশ্চয়ই আছে। আর যতদিন মনুষ্য-সভ্যতা থাকবে, ততদিন এ প্রয়োজন ফুরোবে না—এমনকি মঙ্গল-গ্রহে মানুষের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হবার পরেও।

দূর গাঁয়ের মেয়েরা ঝুড়িতে করে আটা নিয়ে মন্দিরের সামনে বসে আছে। ছোট ছোট মাটির ভাঁড়ে করে আটা বিক্রি করছে। এক ভাঁড় আটার দাম দশ পয়সা। দর্শনার্থীরা ঐ আটা কিনে সাধুজীকে সিধা দিয়ে যান। আমরাও কিনলাম।

সাধুজীকে প্রণাম করে ঘাটে এসে বসি। কিছুক্ষণ কীর্তনের পরে সভা শান্ত হোল। পরিক্রমার অন্যতম পরিচালক প্রবীণ সন্ন্যাসী মথুরা মহারাজ বলতে শুরু করলেন—

"শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী হলেন মহাপ্রভুর পার্ষদ শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর পিতৃব্য। শ্রীচৈতন্যের কৃপায় তিনি রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-রসে আপ্লুত হয়েছিলেন। সাধন-ভজনের অবসরে তিনি নয়খানি অমূল্য ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে শ্রীবৃন্দাবন-মহিমামৃত, শ্রীরাধারসসুধানিধি, শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ও শ্রীগীতগোবিন্দ ব্যাখ্যান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কাজেই সেই মহাপুরুষের সাধনভূমিতে পদার্পণ করতে পেরে আজ আমরা ধন্য হলাম।"

থামলেন মথুরা মহারাজ। আমরা উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু বাধা দিলেন ভক্তি মহারাজ। মথুরা মহারাজের মতো তিনিও আমাদের গুরুমহারাজের গুরুভাই এবং সুপণ্ডিত। সুতরাং আবার বসে পড়ি।

বই হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ভক্তি মহারাজ। কোন রকম প্রস্তাবনা না করেই বলতে আরম্ভ করলেন—

"শ্রীপ্রবোধানন্দ হলেন রাধারস-দীপ-প্রণেতা, রাধাতত্ত্বের এমন সরস বর্ণনা আজ পর্যন্ত আর কেউ দিতে পারেন নি। আর এই বর্ণনায় তিনি তাঁর সাধনা ও পাণ্ডিত্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। তাঁর 'শ্রীনবদ্বীপ শতক'ও অপূর্ব। এই গ্রন্থে তিনি বলেছেন—

'বৃন্দাবন নবদ্বীপ অভেদ-স্বরূপ।
ভিন্ন শাস্ত্রেও তাহা দিখি একরূপ।'

এবার থামলেন ভক্তি মহারাজ। তারপরে শ্রীকুণ্ডের দিকে হাত বাড়িয়ে তিনি অনুদাত্ত স্বরে বলতে থাকলেন—

"এই শ্রীকুণ্ড হোল শ্রীরাধিকার রসকুণ্ড। প্রবোধানন্দ জগতের যাবতীয় রস এবং সকল সুধা রাধারানীর শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিয়েছেন এবং সেই রসরাশি দিয়েই পূর্ণ করেছেন এই কুণ্ড। আজ সেই কুণ্ডবারি স্পর্শ করে আমাদের ইহকাল ও পরকাল ধন্য হোল।"

শ্রীপ্রবোধানন্দের ভজনকুটি থেকে আমরা ভোজন-থালিতে এলাম। অনেকটা পথ—প্রায় দু'ঘণ্টা লেগেছে। যাত্রীদের অধিকাংশই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। তার ওপর কড়া রোদ। মাঠ ভেঙে পথ—কোথাও জলাশয় নেই। সুতরাং সকলেই শ্রান্ত এবং অনেকের অবস্থাই রীতিমত শোচনীয়।

কিন্তু কেউ সেকথা প্রকাশ করছেন না। পাছে গুরু মহারাজের কাছে 'রিপোর্ট' চলে যায়, এবং তিনি 'আন ফিট' করে দেন। তাহলে যে পরিক্রমা বন্ধ—পুণ্যার্জনের পালা শেষ।

অতএব তাঁরা মরীয়া হয়ে পথ চলেছেন। এমন কি কীর্তনও করেছেন। তবে শুধু মুখই নড়েছে, শব্দ বের হয় নি।

যাই হোক্ আমরা নির্বিঘ্নেই ভোজন-থালিতে পৌঁছে গিয়েছি। প্রথমে দর্শন করলাম ব্রহ্মকুণ্ড। চারিদিক বাঁধানো ছোট একটি জলাশয়। তীরে খানিকটা উঁচুতে ছোট মন্দির। মন্দির তোরণের চৌকাঠটি পাথরের। তারই ওপরে একটি গর্ত। এই গর্তটাই ভোজন-থালি বা খাবারের থালা। রাখাল-রাজা কানাই নাকি এই গর্তটির ভেতরেই খাবার রেখে রাখালদের সঙ্গে ভোজনলীলা করেছিলেন।

আমাদের সঙ্গেও দেখছি প্রচুর ফল ও মিষ্টি নিয়ে আসা হয়েছে। এবং পূজোর আয়োজন চলেছে। ভালোই হোল, প্রসাদ পাওয়া যাবে। আমরা কেবল শ্রান্ত নই, ক্ষুধার্তও বটে।

মথুরা মহারাজ বললেন, পূজো হতে সময় নেবে। চলুন আমরা ততক্ষণ গিয়ে বসি—ভগবানের সেই অপরূপ লীলার কথা আলোচনা করি।

নির্দিষ্ট স্থানে এসে বসে পড়লাম সবাই। মথুরা মহারাজ বলতে শুরু করলেন—

"আপনারা জানেন শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের বাইশ অধ্যায়ে কৃষ্ণের বনক্রীড়া ও অঘাসুরবধ লীলার কথা বলা হয়েছে।"

আমরা মাথা নাড়ি।

মথুরা মহারাজ বলতে থাকেন, "পরবর্তী দু'টি অধ্যায়ে অর্থাৎ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ অধ্যায়ে ভাগবতকার শ্রীকৃষ্ণের ভোজনলীলার কাহিনী বলেছেন।

"অঘাসুরকে বধ করে শ্রীকৃষ্ণ বৎস ও বয়স্যদের নিয়ে এখানে এলেন। তাঁরা এই ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করলেন। তারপরে কৃষ্ণ বললেন—এসো, গোবৎসদের জল খাইয়ে মাঠে ছেড়ে দিই। তারা ঘাস খেতে থাকুক আর আমরা সেই অবসরে এখানে বসে সবের খাবার খেয়ে নিই।

"সখারা সম্মত হলেন। সবাই যে তখন বড়ই ক্ষুধার্ত। তাঁরা বৃত্তাকারে কৃষ্ণের চারিপাশে পংক্তিতে পংক্তিতে আহারে বসে গেলেন।

"প্রত্যেকেই বাড়ি থেকে খাবার এনেছেন। কিন্তু কেউই থালা নিয়ে আসেন নি। তাই তাঁরা কেউ পাতা, কেউ গাছের ছাল, কেউ বা যে পাত্রে খাবার এনেছেন সেই পাত্রেই খেতে শুরু করলেন। কৃষ্ণ ঐ পাথরখানির ওপরে খাবার রেখে খেতে থাকলেন।

"সে এক চমৎকার দৃশ্য—শ্রীকৃষ্ণ বসেছেন মাঝখানে, হাঁটু জোড়া করে। তাঁর কোমরে বেণু, বগলে শিখা ও পাঁচনি আর হাতে দই-মাখা অন্নের গ্রাস।

"এমন সময় সহসা সখারা দেখতে পেলেন, বাছুরগুলো মাঠে নেই। তাঁরা কৃষ্ণকে খবরটা জানালেন। কৃষ্ণ তাঁদের অভয় দিয়ে বললেন—ভয় পেয়ো না, খাওয়া থামিও না। তোমরা খেতে থাকো, আমি বাছুরদের নিয়ে আসছি।

"দই-মাখা অন্ন হাতে নিয়েই কৃষ্ণ ছুটলেন বাছুরদের খোঁজে। কি করবেন। ভক্তদের দেওয়া প্রসাদ তো ভগবান ফেলে দিতে পারেন না!

"অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কৃষ্ণ বাছুরদের সন্ধান পেলেন না। তিনি ফিরে এলেন এখানে। দেখলেন সখারাও নেই। বহু ডাকাডাকি করেও কৃষ্ণ সখাদের সাড়া পেলেন না।

"ভক্তদের বিরহে ভক্তবৎসল ভগবান আকুল হলেন। তিনি তখন শুধু লক্ষ্মীহীন নন, তিনি ভক্তহারা।

"এদিকের মধু-বৃন্দাবনের পথে ও প্রান্তরে গোধূলি ঘনিয়ে এলো। গোষ্ঠবিহারীর গোষ্ঠ থেকে ঘরে ফেরার সময় হোল। কিন্তু তিনি একা কেমন করে ফিরে যাবেন? ব্রজবধূরা যে ব্রজবালকদের পথ চেয়ে বসে আছেন! গাভীরা গোবৎসদের জন্য দাঁড়িয়ে আছে! একা ফিরে গেলে যে আজ ব্রজপুরীর ঘরে ঘরে বাইরে কান্নার রোল উঠবে। কিন্তু সখারা কোথায় গেল?

"পরক্ষণেই বিশ্ববিধ জানতে পারলেন, এ সবই ব্রহ্মা ঠাকুরের কাণ্ড। বটে—ভগবান ভাবলেন—আমি আজ এমন লীলা করব যে ব্রহ্মজননীরাও আনন্দিতা হবেন, আবার ব্রহ্মারও উচিত শিক্ষা হবে।

"ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজেকে বৎস ও বৎসপালক এই বিবিধরূপে রচনা করলেন। বৎস ও বয়স্যদের যার যেমন রূপ, যার যেমন পাঁচনি শিঙা ও বেণু, যার যেমন চরিত্র গুণ আকার ও বয়স, সর্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ নিজেও তেমনি রূপ ধারণ করলেন।

"কৃষ্ণ একটি বাছুরের গলায় দড়ি বেঁধে একজন সখাকে বলছেন—"এই বাছুরটাকে ধরি ধরে টেনে নিয়ে চল্।"

"কি চমৎকার লীলা!" মথুরা মহারাজ মন্তব্য করেন, "বাছুরও কৃষ্ণ, দড়িও কৃষ্ণ আবার সখাও কৃষ্ণ। যিনি বলছেন তিনিও কৃষ্ণ, যাকে বলছেন তিনিও কৃষ্ণ আবার যাঁর সম্পর্কে বলছেন তিনিও কৃষ্ণ। কৃষ্ণ সেদিন নিজেই বৎস, নিজেই পালক, নিজেই কর্তা। আবার তিনি নিজেই ক্রীড়া—

আত্মক্রীড়। নিজের আত্মার সঙ্গে নিজেই ক্রীড়া করছেন—'বাসুদেবঃ সর্বম্।'

"ব্রজবধূরা বেণুগীতি শুনে ছুটে এলেন। তাঁরা আপন আপন পুত্রদের কোলে তুলে নিলেন। অর্থাৎ পূর্বশ্লোকে হৃদয়ের মাঝে গ্রহণ করলেন। কৃষ্ণকে কোলে নিয়ে শুদ্ধ স্নান করাবার সাধ সুপ্ত ছিল সকল ব্রজ-জননীর অন্তরে। তাঁদের সে সাধ পূর্ণ হোল। গাভীরাও বৎসরূপী কৃষ্ণকে কাছে পেয়ে পুলকিতা হয়ে উঠল।"

থামলেন মথুরা মহারাজ। আমরা শব্দহীন। শুধু তাঁর মুখের দিকে রয়েছি তাকিয়ে। মহারাজ একটু নড়ে-চড়ে ঠিক হয়ে বসে নিলেন। তারপরে আবার বলতে থাকলেন—

"একবছর ধরে কৃষ্ণ এই অপরূপ লীলা করলেন। এক-বছর বাদে ব্রহ্মা আবার এলেন মর্ত্যলোকে। তিনি সবিস্ময়ে দেখলেন—বৎস ও বয়স্যগণ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত। অথচ তিনি যাদের অপহরণ করেছিলেন, তারা তেমনই মায়া-শয়ানেই রয়েছেন। তিনি তখন বৎস ও বয়স্যদের দু'টি দল দেখতে পেলেন—একটি তিনি নিজে লুকিয়ে রেখে গিয়েছেন, আরেকটি কৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়ারত। দু'টি দলের কোনটি কৃত্রিম, আর কোনটি প্রকৃত, ব্রহ্মা তা বুঝতে পারলেন না। শ্রীকৃষ্ণকে মুগ্ধ করতে এসে ব্রহ্মা নিজেই মোহিত হয়ে গেলেন।..."

"বা! তাহী মজা তো।" মাঝখান থেকে জানকী বলে ওঠে। জানকী আমাদের দলের একমাত্র যুবতী সদস্যা। ব্যর্থ প্রেমের বেদনা ভুলতে মায়ের সঙ্গে বন-পরিক্রমায় এসেছে।

মথুরা মহারাজ জানকীর দিকে তাকিয়ে একটু মৃদু হাসেন। বলেন, "হ্যাঁ, মা! কৃষ্ণলীলা এমনি মজার।" একটু থেমে তিনি আবার বলতে থাকেন, "যাক্ সে, যে কথা বলছিলাম। মোহিত ব্রহ্মা দেখলেন—বৎস ও বয়স্যগণ প্রত্যেকেই এক-একজন নারায়ণ। অগণিত নারায়ণ দর্শন করে ব্রহ্মা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। এবং তারপরেই তিনি দেখতে পেলেন—বালকরূপী কৃষ্ণের কোমল অঙ্গে সমস্ত নারায়ণ বিলীন হয়ে গেল। আবার দেখলেন—কৃষ্ণের হাতে গোপবালকদের উচ্ছিষ্ট। তিনি বৎস ও বয়স্যদের খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

"পিতামহ ব্রহ্মার সহ্যশক্তি শেষ হয়ে গেল। আর সামলাতে পারলেন না তিনি। তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণের চরণে দণ্ডবৎ হয়ে তাঁর স্তব করতে লাগলেন,

"—হে স্তবনীয়, তোমাকে নমস্কার করি। তোমার এই মধুর মূর্তিটি আমার অন্তরের অন্তরলোকে চিরবিরাজ করুক।

"—আমার প্রতি অনুগ্রহ করেই তুমি এই অপরূপ লীলা করছ, তোমার বৎস ও বয়স্যদের রূপ ধারণ করেছো। কিন্তু তোমার অন্যান্য রূপের মতো এ-রূপও দুর্জ্ঞেয়। নিখিল বিশ্ব তোমার অধীন, অথচ তুমি ভক্তের অধীন। কারণ ভক্তি পরম কল্যাণের পথ। যে ভক্ত ভক্তিপূত অন্তরে তোমার ভজনা করে, একমাত্র তাঁর পক্ষেই তোমাকে জয় করা সম্ভব।

—আমি মূঢ়, আমি অজ্ঞ, আমি অভিমানী। তুমি প্রভু, আমি দাস। রজঃ ও তমো গুণের জন্য আমি দাস থেকে বিচ্যুত। কিন্তু তুমি তো সর্বদাই প্রভুস্বরূপে স্থিত। অপরাধ করাই আমার স্বভাব, আর ক্ষমা করাই তোমার প্রকৃতি। অতএব আমাকে তোমার ক্ষমা করতেই হবে। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

"—গর্ভস্থ সন্তান মাতৃ-উদরে পদাঘাত করে বলে কি জননী তাকে ক্ষমা করেন না? আমিও তো তোমারই সন্তান। প্রলয়-পয়োধি-জলে ত্রিভুবন যখন ডুবে গিয়েছিল, তখনই তো নারায়ণের নাভিকমলে আমার জন্ম হয়েছে। তুমি নন্দনন্দন হলেও নারায়ণ। কারণ 'নার' শব্দের অর্থ নরসমূহ, আর 'অয়ন' মানে আশ্রয়। আত্মারূপে তুমি প্রত্যেক প্রাণীর আশ্রয়, তুমিই তো নারায়ণ। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।"

"হয়ে গেল!" মথুরা মহারাজ থামতেই অসহিষ্ণু কণ্ঠে জানকী বলে ওঠে।

মথুরা মহারাজ মৃদু হাসেন। বলেন, "নারে না, আরও আছে।"

"ধন্যি তাহলে।" জানকী আবদার করে।

মথুরা মহারাজ আরম্ভ করেন, "এইভাবে ব্রহ্মা যখন

ধরে বহুকথা বলে শ্রীকৃষ্ণের স্তব করলেন। অবশেষে তিনি করজোড়ে কৃষ্ণকে বললেন—

'শ্রীকৃষ্ণ! বৃষ্কিকুল-পুষ্কর-জোষদায়িন্!
ক্ষমানির্জর বিজ্ঞপদ্মবিবৃদ্ধিকারিন্!
উদ্যদ্দার্ষ্টেয়! ক্ষিতিরাক্ষসপ্রপাতজন্মার্কমহিম্!
ভগবন্! নমস্তে।'

"হে কৃষ্ণ! তুমি সূর্যের মতো বৃষ্কিবংশরূপ পদ্মের সুখদাতা. তুমি চন্দ্রের মতো দেবতা, তুমি ব্রাহ্মণ পক্ষ ও পৃথিবীরূপ সমুদ্রের বৃদ্ধিকারক। তুমি পাপও-ধর্মরূপ অন্ধকারের বিনাশকারী, তুমি ক্ষিতি রাক্ষস ও কংস প্রভৃতির শাসক। বৈকুণ্ঠ থেকে সূর্য পর্যন্ত তুমি সকলেরই পূজনীয়। হে ভগবান! আমি তোমাকে নমস্কার করি।"

"তারপরে ব্রহ্মা তিনবার শ্রীকৃষ্ণকে প্রদক্ষিণ করলেন। এবং প্রণাম করে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন। কৃষ্ণ তখন অপহৃত বৎস ও বয়স্যদের নিয়ে ব্রজে ফিরে এলেন। 'মায়া-বদ্ধ ব্রজবালকগণ জানতেই পারলেন না যে ইতিমধ্যে একটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে।…"

খাচ্ছে হোল মথুরা মহারাজকে। কারণ ইতিমধ্যে পুজো শেষ হয়ে গেছে। কেউ-কেউ প্রসাদ নিয়ে এসেছেন—পানিফল, কলা, আপেল ও সন্দেশ।

মনে মনে কৃষ্ণকে ধন্যবাদ দিই। বলি—তুমি এখানে ভোজনলীলা করেছিলে বলেই তো এই ফিজের পেটে আমরা এমন সব উৎকৃষ্ট বস্তু ভোজন করতে পারছি। তুমি প্রকৃতই পূজনীয়। আমি তোমাকে নমস্কার করি।

প্রসাদ হাতে নিলাম। কিন্তু মুখে দিতে পারলাম না। তার আগেই ভক্তি মহারাজ বলতে আরম্ভ করলেন—

"এই ভোজন-খালিতে কৃষ্ণ ভোজন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সে ভোজন নিজের জন্য নয়। তিনি তো সর্বশক্তিমান ভগবান, তাঁর আবার ভোজনের প্রয়োজন কি?

একবার থামেন ভক্তি মহারাজ। না, কেউ কোন উত্তর দেন না। তিনি পণ্ডিত হলেও তেজী মানুষ, একটুতেই রেগে যান। সুতরাং নির্ভুল উত্তর না হলে চুপ করে থাকবেন না। তাই আমরা নিরুত্তর।

একটু বাদে ভক্তি মহারাজ নিজেই তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিলেন। বললেন, "ভক্তদের কৃপা করবার জন্যই কৃষ্ণ এখানে সেই ভোজনলীলা করেছিলেন।"

ঠিকই বলেছেন ভক্তি মহারাজ। আমি ভক্তিহীন অবৈষ্ণব হলেও ভক্ত-বৈষ্ণবদের সঙ্গে ব্রজ-পরিক্রমায় এসেছি। তাই তো ভক্তবৎসল কৃষ্ণ কৃপা আমাকেও করলেন। ফিজের সময় প্রসাদ পেয়েগেলাম। অতএব প্রসাদে মনঃসংযোগ করি।

ওই তুলি সমতুল শাদা কাশ ফুল
আলো ক'রে আছে ধূলি,
শারদ জোছনা অমল করিতে
ধরনী ধরেছে তুলি!
রাঙারাঙি সুধা-ধবলিত করি'
দিবে গো কাজল মেঘে,
তাই গোপনে স্বপনে তুলি লাখে লাখ
নহনা উঠেছে জেগে!

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

বিচিত্র অভিজ্ঞতা

গোপাল ভৌমিক

জীবনের নানা অবস্থায় আমরা বিভিন্ন বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই। আমরা যে ইচ্ছা করে এসব অভিজ্ঞতা অর্জন করি এমন নয়। অনেক ক্ষেত্রে আমরা ঘটনার দাস হই মাত্র। ঘটনা কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন আবর্তের মধ্যে টেনে নিয়ে যায় যেখান থেকে তিক্ত-মধুর কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করে বেরিয়ে আসার উপায় থাকে না। এসব অভিজ্ঞতা অনেক সময় গল্প উপন্যাসের রোমাঞ্চকর কাহিনীকেও ছাড়িয়ে যায়। আমরা তখন "Truth is stranger than fiction" এই ইংরেজি আপ্ত বাক্যটির প্রকৃত যথার্থ উপলব্ধি করতে পারি। জীবনের পথে চলতে চলতে এমনই বিচিত্র অভিজ্ঞতা প্রায় আমাদের সকলেরই হয়। এখানে এমনই গুটিকয়েক বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনীই তুলে ধরছি।

আমার নিজের জীবনের যে কয়টি বিচিত্র অভিজ্ঞতার কাহিনী এখানে বলতে চাইছি সেগুলি পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত নয়। অথচ আমার জীবনে এখন একটা পর্যায়ে এবং এমন একটা সময়ে এগুলি ঘটেছিল যে এ অভিজ্ঞতাগুলির মধ্যে একটির কথা মনে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে অন্যগুলির কথাও মনে পড়ে। সময়ের এই সাযুজ্যই ঘটনাগুলিকে আমার কাছে একসূত্রে চিহ্নিত করে রেখেছে। আর কি উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল ছিল কলকাতার সে সময়! সেটা ঘটনাবহুল ১৯৪৬ সাল। যুদ্ধ শেষে জাতীয় জীবনে তখন একদিকে যেমন নতুন আশার আলোক রেখা দিয়েছে, তেমনই অন্যদিকে মুসলিম লীগের বিভেদকামী রাজনীতির ফলে দেখা দিয়েছে সাম্প্রদায়িক হানাহানিমা। নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী, বোম্বাইয়ের নৌবিদ্রোহ ও কলকাতার রশিদ আলি দিবসে ছাত্রছাত্রীদের অভ্যুত্থান দেখে সুচতুর ইংরেজ বুঝেছিল যে তাদের ভারত ত্যাগের সময় সমাগত। এই পটভূমিকায় এসেছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ক্যাবিনেট মিশনের প্রস্তাব এবং লর্ড ওয়াভেলের অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রয়াস। কিন্তু কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের তীব্র মতানৈক্যের ফলে সে সব প্রস্তাব কার্যকর হয় নি। কংগ্রেসের দাবী অনুসারে ভারত অখণ্ড থাকবে, না মুসলীম লীগের দাবী অনুসারে ভারত দ্বিধাবিভক্ত হবে তাই ছিল সে সময় জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। ইংরেজের শেষ তরুপ ছিল সাম্প্রদায়িক হানাহানিমা বাধিয়ে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে বানচাল করে দেওয়া। একাজে বাংলা দেশে মুসলীম লীগ সরকার তার প্রধান সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল এবং এর প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় মুসলীম লীগের কুখ্যাত প্রত্যক্ষ সংগ্রাম বা "direct action" এর ফলে যে সাম্প্রদায়িক হানার সূত্রপাত হয়েছিল তা চলেছিল তিনদিন ধরে এবং এতে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। বস্তুত তিনদিন কলকাতার জীবন-যাত্রা অচল হয়ে পড়লেও কার্যত এর উত্তেজনা চলেছিল বেশ কিছুদিন ধরে এবং মাঝে মাঝেই চোরাগোপ্তা হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হত। এই হত্যাকাণ্ডের ফলে মহানগরীর মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলি ও হিন্দু অধ্যুষিত এলাকাগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়েপড়েছিল। কোন হিন্দু মুসলমানএলাকায় ঢোকার আগে যেমন ভাবার চিন্তা করত তেমনই মুসলমানও শঙ্কিত হত হিন্দু এলাকায় পা দিতে।

এই সময় আমি ছিলাম সংবাদপত্রসেবী। থাকতাম বৌবাজার ষ্ট্রীট ও ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের সংযোগ স্থলের বাজারের গায়ে একটা বড় ফাটবাড়ির একটি দোতলা ফ্লাটে। মনে আছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রথম তিন দিন প্রায় বাড়িতেই বন্দী হয়ে ছিলাম। যাইহোক, সংবাদপত্রসেবীর পক্ষে কোন ক্রমেই বাড়িতে বসে থাকা সম্ভব নয়। আমি তখন দিনের

বেলা ড্যালহৌসি স্কোয়ার এলাকায় ও হেমেন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'মাতৃভূমি' মাসিক পত্রিকার কাজ করি এবং সন্ধ্যায় ক্রীক রো স্থিত তাঁদেরই দৈনিক 'কৃষক' পত্রিকার সম্পাদকীয় লিখি। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তীব্রতা কিছুটা কমার পর একদিন 'মাতৃভূমি' অফিসে গেছি। তখন সম্পাদক মশাই আমাকে জানালেন যে সে মাসের 'মাতৃভূমি' ছাপার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়ে আছে, কাগজের অভাবে ছাপা হচ্ছে না। তিনি আমাকে কিছু টাকা দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে ব্রাবোর্ণ রোডের একটি কাগজের দোকান থেকে তিন রীম কাগজ কিনে আমাকে অবিলম্বে ছাপাখানায় পৌঁছিয়ে দিতে হবে। 'মাতৃভূমি' তখন ছাপা হত আমহার্স্ট স্ট্রীট (বর্তমান রাজা রাম মোহন সরণী) ও হ্যারিসন রোডের (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) সংযোগ স্থলের নিকটবর্তী একটি ছাপাখানায়। তখন প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তীব্রতা কেটে গেলেও সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার অবসান হয় নি। কোন কোন এলাকায় পথ চলা তখনও নিরাপদ ছিল না।

ড্যালহৌসি থেকে ব্রাবোর্ণ রোড ছিল খুবই নিকটে এবং এ সমস্ত এলাকাটা ছিল নিরাপদ। ব্রাবোর্ণ রোডে কাগজ কিনে আমি একটা রিক্সাওয়ালা ঠিক করেছিলাম। সে অবস্থায় সেখানে কোন মুসলমান রিক্সাওয়ালার উপস্থিতি সম্ভব না হলেও আমি একটি টিকিওয়ালা হিন্দু রিক্সাওয়ালাকে ঠিক করেছিলাম। সে হিন্দু বলে এবং কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার পরিস্থিতি তার জানা ছিল বলে আমি কোন পথে তার গন্তব্য স্থলে যেতে হবে তা বিশেষ করে বলে দেই নি। ভেবেছিলাম যে তার নিজেরও যখন প্রাণের ভয় আছে তখন সে নিরাপদ এলাকা দিয়েই আমাকে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবে। কিন্তু আমার প্রায় অজান্তেই সে রিক্সা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল বড়বাজারের মধ্য দিয়ে হ্যারিসন রোড ও চিৎপুরের সংযোগ স্থলে। তখন আর তার সরাসরি হ্যারিসন রোড ধরে আমহার্স্ট স্ট্রীটের দিকে এগুনো ছাড়া উপায় ছিল না। অথচ আমার তখন ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত। হ্যারিসন রোড চিৎপুর মোড় থেকে কলেজ স্ট্রীট পর্যন্ত তখন ছিল প্রায় পুরোপুরি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা এবং কুখ্যাত কলা বাগান বস্তিও এই এলাকায়। আমি রিক্সায় বসে সামনে তাকিয়ে দেখি ও এলাকার অধিকাংশ দোকান পাট সেই দুপুর বেলাতেও বন্ধ কিংবা কোন কোন দোকানের ঝাঁপ খোলা। সারা রাস্তা পথচারী বিহীন-খাঁ খাঁ করছে। তখন রিক্সাওয়ালার উপর যে কি রাগ হল তা বুঝিয়ে বলতে পারব না। অথচ ওদিকে সে তখন পরম নিশ্চিন্ত মনে আমাকে নিয়ে সেই জনশূন্য পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। রিক্সায় বসে তখন আমি কৃষ্ণনাম জপ করছি। নিজের মনে সাহস সঞ্চারের জন্য ওর সঙ্গে তখন বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হলাম। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম এই দাঙ্গা হাঙ্গামার দিনে ওইপথে ও আসার সাহস পেল কি করে। ও যা জবাব দিল তা শুনে আমার দ্বিতীয় দফা চক্ষু স্থির হল। নিশ্চিন্ত প্রত্যয়ের সুরে ও বলল: "বাবুজি আপনার কোন ভাবনা নেই। কোন দুষমণ আপনার বা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার হাতে এমন এক রক্ষা-কবচ করানো আছে যার প্রভাবে কোন দুষমণ আমার কাছে ঘেঁষতে পারবে না!" তার মুখের এই বেদবাক্যে আমি আশ্বস্ত হয়েছিলাম বলে মনে হয় না। তার বুদ্ধিবাদী মনে যে বিশ্বাস ছিল জলন্ত সত্য —আমার সংশয়-কণ্টকিত বুদ্ধিবাদী মনে তার কোন আবেদনই ছিল না। তবু এক সময় প্রেস সিনেমা পেরিয়ে কলেজ স্ট্রীটের কর্মচঞ্চল এলাকায় আমার রিক্সা এসে পড়ায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বেঁচেছিলাম।

দ্বিতীয় যে ঘটনাটি আমার স্মরণযোগ্য হয়ে আছে সেটিও ১৯৪৬ সালেরই ঘটনা। এ ঘটনাটি ঠিক কোন দিন ঘটেছিল তা আমি লিখে রাখি নি। তবে এটা ঘটেছিল এমন এক দিনে যেদিন কলকাতা শহরের জন-জীবন ছিল উত্তাল। সে সময় প্রায়ই ছাত্রবিক্ষোভ ও আজাদ হিন্দ ফৌজের কোন ঘটনা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে কলকাতার নাগরিক শান্তি বিঘ্নিত হত। কলেজ স্কোয়ারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থিতির দরুন কোন প্রকার বিক্ষোভ হলেই শ্যামবাজারগামী যান-বাহন তুলে নেওয়া হত। সেদিন এইরূপ কোন ঘটনার দরুন বৌবাজার থেকে ড্যালহৌসি ও এসপ্ল্যানেড। ড্যাল-হৌসি শ্যামবাজার রুটে সব যানবাহন চলাচল বন্ধ। এই রকম দিনে সন্ধ্যার পর থেকে আমার বাসার সংলগ্ন বৌবাজার ওয়েলিংটন মোড়টি হয়ে উঠত কর্মচঞ্চল। ছাত্র আন্দোলনের

সঙ্গে সঙ্গে সমাজবিরোধী শক্তিও এসে জড়িত হত এবং এই মোড়ে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত চলত হল্লা, ট্রামের তার ছেঁড়া, বহু উৎসব প্রভৃতির ঘটনা। তখন আকাশ বাতাসে বৃটিশ বিরোধী মনোভাব এতই প্রবল ছিল যে রাজশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলন প্রায়শই এ ধরনের বিক্ষোভ দেখা দিত। আমার পক্ষে অবশ্য অফিসে যাতায়াতে কোন অসুবিধা হত না। কেননা আমার পক্ষে হেঁটে 'ডালহৌসি' মাতৃভূমির অফিসে যাওয়া এবং সন্ধ্যার দিকে ক্রীক রোর 'কৃষক' অফিসে যাওয়া আদৌ কষ্ট সাধ্য ছিল না।

এমনই একদিন সন্ধ্যা ৯টার সময় অফিস থেকে বাসায় ফিরে দেখি হুলুস্থুল কাণ্ড। সেদিন বিকাল থেকেই ট্রাম বাস বন্ধ ছিল, বাসার সামনে মোড়ে দেখি বহু উৎসবও হল্লা চলেছে। বাসায় ঢুকতে গিয়েই দেখি আমার ঘরের সামনে প্যাসেজে ভাতের থালা প্রভৃতি কার পদস্খলিত হয়ে ছিটকে পড়েছে। শোবার ঘরে ঢুকে আমার চোখ প্রায় ছানাবড়া। দেখি আমার বিছানায় একজন টমি ও একজন ফিরিঙ্গি মেয়ে বসে ভয়ে রীতিমত ঠক ঠক করে কাঁপছে। বাসায় আমার ছোট ভাই-এর স্ত্রী ও দুটি বোন ছিল। ব্যাপার কি জানতে চাওয়ায় তারা বলল যে মোড়ে এই সাহেব মেম দুটি জনতার হাতে তাড়া খেয়ে প্রাণভয়ে আমাদের ফ্লাটে ঢুকে পড়ে এবং দোতলায় উঠে প্রথমেই ডান দিকে আমাদের ফ্লাট দেখে হুড়মুড় করে ভিতরে ঢোকে। আমার বোনেরা তখন খেতে বসেছিল—বুট ও হাইহিলের ঠোকা লেগে তাদের থালার ভাত ছড়িয়ে পড়ে। তাদের মুখে এও শুনলাম যে ওদের পশ্চাদ্ধাবনকারী জনতা ইতিমধ্যে একাধিকবার নীচে এসে এদের খোঁজ করে গিয়েছে। তবে এরা কোন ফ্লাটে আশ্রয় নিয়েছে তা তারা জানতে পারেনি কিংবা এজন্য কোন ফ্লাট চড়াও হয় নি। যাই হোক আমি দেখলাম যে টমিটি ও ফিরিঙ্গি যুবতীটির অবস্থা খুবই করুণ। আমি বোনদের চা করতে বলে ওদের সঙ্গে আলাপ সুরু করলাম। টমিটি জানালো সে কোর্ট উইলিয়ামের বাসিন্দা। ফিরিঙ্গি যুবতী শিয়ালদহের এক অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান রেলকর্মীর মেয়ে। টমিটি এই যুবতীকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যায় ফুর্তি করতে বেরিয়েছিল এবং সান্ধ্য অভিসার শেষে বৌবাজার দিয়ে দুজনে হাত ধরাধরি করে চলেছিল শিয়ালদহের দিকে—উদ্দেশ্য মেয়েটিকে বাসায় পৌঁছিয়ে টমিটি ফিরে যাবে কোর্ট উইলিয়ামে। এরই মধ্যে অজ্ঞাতসারে মোড়ে এসে ঘটেছে এই বিপত্তি। জনসাধারণের হাতে নিগৃহীত হয়ে, তারা প্রাণভয়ে আশ্রয় নিয়েছে আমার ফ্লাটে। টমিটি তখন বারবার আমাকে সনির্বন্ধ অনুরোধ করতে লাগল যাতে আমি তাকে এই বিপদ সীমার বাইরে অবিলম্বে পৌঁছিয়ে দেই। তার কারণ রাত দশটার মধ্যে কোর্টে হাজির হতে না পারলে তার শাস্তি হবে। যাই হোক ওদের বলে কয়ে দুকাপ চা খাওয়ানোর পর ওরা কিছুটা চাঙ্গা হয়ে উঠল। বাইরের মোড়ে তখনও সমানে হল্লা চলেছে। এ অবস্থায় ওদের বাইরে নিয়ে গেলে ওদের মৃত্যু যে অবধারিত তা ওরা জানত। তার সঙ্গিনীও শিয়ালদহে তার মা বাবার কাছে ফিরে যাবার জন্য অনুনয় বিনয় করতে লাগল।

এই অবস্থায় আমি কি করি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমার ছোট ভাই অখিলের সঙ্গে পরামর্শ করেও কোন সন্তোষজনক উপায় খুঁজে পেলাম না। রাস্তায় ট্যাক্সি সমেত প্রায় সব রকম যানবাহন চলাচল ছিল বন্ধ। একমাত্র ভিক্ষা চলছিল। উপায় না পেয়ে পরামর্শ করার জন্য নীচে 'বাতায়ন' অফিসে নেমে গেলাম। আমাদের নীচে একটা ঘরে ছিল 'বাতায়ন' পত্রিকার অফিস এবং পত্রিকা সম্পাদক শ্রী অবিনাশ চন্দ্র ঘোষাল সেখানে অনেক রাত্রি পর্যন্ত বসে প্রুফ দেখতেন ও সম্পাদকীয় কাজকর্ম করতেন। অবিনাশদার কাছেই গেলাম পরামর্শ চাইতে। অবিনাশদাও হৈচৈ দেখেছেন এবং ব্যাপারটা জানতেন। তিনি সব শুনে বললেন যে রাত্রে যখন ওদের থাকার উপায় নেই তখন ওদের শিয়ালদহ পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেবার একমাত্র উপায় হল ওদের দুজনকে বাঙ্গালী মেয়ের মত শাড়ি পরিয়ে ঘোমটা দিয়ে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাওয়া। কথাটা খুবই যুক্তিযুক্ত মনে হল। বাসায় ফিরে টমিটি এবং ফিরিঙ্গি যুবতীটির সঙ্গে পরামর্শ করলাম। প্রাণ ফিরে পাবার আশায় তখন তারা সব করতে প্রস্তুত। তখন আমার ভাই বৌ ও বোনেদের শাড়ি নিয়ে ওদের দুজনকেই বৌ সাজানো হল—মাথায় ঘোমটা দেওয়া হল। অতঃপর ওদের দুজনকে সহজেই

বাড়ি থেকে বের করা সম্ভব হল এবং একটা রিক্সার চাপিয়ে ওদের নিয়ে যাওয়া হল শিয়ালদহ মোড়ে। সুখের বিষয় শিয়ালদহে কোন গণ্ডগোল না থাকায় এদের পক্ষে ছদ্মবেশ পরিহার করে নিজের নিজের আস্তানায় ফিরে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল।

তৃতীয় যে ঘটনাটির কথা বলব সেটিও ঘটেছিল এই ১৯৪৬ সালে কিংবা তার অল্প কিছু পরে। সেই সময় আমার বৌবাজারের বাসায় পচা নামে একজন তরুণ পূর্ববঙ্গীয় ছিল। সে এসেছিল আমাদের দেশের বাড়ি থেকে। সে নীচ জাতীয় হলেও আমরা তাকে বাড়ির ছেলের মতই আদর যত্ন করতাম। ছেলেটি ছিল বেশ রোমান্টিক প্রকৃতির। সে সময় তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসটি চলচ্চিত্রে রূপায়িত হয়ে সাড়া জাগিয়েছিল। পচা আমাদের কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে 'কবি' চিত্রটি বোধ হয় বেশ কয়েকবার দেখেছিল। 'কবি'র রোমান্টিক বিষয়বস্তু তার মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিল তা বুঝতাম যখনই শুনতাম সে কাজ করতে করতে গুন-গুনিয়ে গান গাইছে: "কালো যদি মন্দ তবে কেন পাখিলে কান্দ কেনে।" 'কবি'র আরও অনেক গান তার কণ্ঠে শুনেছি। সেই বুঝতাম যে 'কবি'র নায়ক এবং তার জীবনের ট্র্যাজেডি তার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

যাই হোক এই পচাকে নিয়ে একদিন যে বিপদে পড়েছিলাম সেই কথাই বলি। সেদিন সকাল বেলা পচা আমাকে জানিয়েছিল যে তার গেঞ্জিটা ছিঁড়ে গেছে। আমি বৌবাজারে যেখানটায় থাকতাম সেখানে দোকান পসারের কোন অভাব ছিল না। সুতরাং আমি সেদিনই ওকে একটা গেঞ্জি কিনে দিয়ে বিকাল বেলা যথারীতি দৈনিক 'কৃষক' অফিসে চলে গিয়েছিলাম। সেদিন অফিস থেকে ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় দশটা হয়ে গেছিল। বাসায় ফিরেই তুমি পচাকে নিয়ে এক বিষম ফাঁপরে পড়েছ। আমি অফিস যাবার পর থেকেই সে নাকি ভীষণ কান্নাকাটি সুরু করেছে। তার কান্নার কারণ কি জানতে চেয়েও কেউ তার মর্মোদ্ধার করতে পারে নি। সে কেমন হাউমাউ করে কেঁদেই চলেছে। আমি নিজেও এসে দেখলাম যে সে কেঁদেই চলেছে। তাই বোনদের খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেও এর কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। তার কান্নার কারণ ঘটতে পারে এমন কোন ব্যবহারও কেউ তার সঙ্গে করেনি। জনে জনে তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করেও কিছু সদুত্তর তার মুখ থেকে পায় নি। ওই ভীড়ের মধ্যে দুচার বার আমিও ওকে কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। ও ক্রন্দনরত অবস্থাতেই শুধু জানাল যে সে কারণ বলতে পারবে না। সেই দুপুর থেকে পচা কিছু খায়ও নি। উপায়ান্তর না দেখে অত রাতে আমি ওকে ডেকে নিয়ে ছাদে চলে গেলাম। সেখানে নিয়ে গিয়ে ওকে অনেক করে বোঝালাম এবং কান্নার কারণ জানতে চাইলাম। অনেক সাধ্য সাধনার পর ও যা বলল তাতে আমার প্রায় মূর্চ্ছিত হবার উপক্রম। ও বলল যে সকাল বেলা আমার কিনে দেওয়া গেঞ্জিটাই নাকি ওকে সারাদিন ধরে কাঁদিয়েছে। ও যা বলেছিল তা অবশ্য এতদিন পরে আমার মনে নেই। তবে ভাবার্থটা মনে আছে ও আমাকে বলেছিল "আমি মুখের কথা খসাতে না খসাতেই আপনি যে ভাবে আমার জন্য গেঞ্জি কিনে দিয়েছিলেন তাতে আমার পরলোকগত বাবার কথা মনে পড়ে গেছিল। তিনিও কোন দিন এমন করে আমাকে ভালবাসেন নি। আপনার কাছ থেকে এই ভালবাসা পেয়ে আমি সারাদিন চোখের জল ধরে রাখতে পারি নি।" পাগল আর কাকে বলে! সবাইকে যখন পচার কান্নার কারণটা জানালাম বাড়ির সবাই তো হেসেই অস্থির। রোমান্টিক মনের অধিকারী পচার এই আনন্দ জনিত কান্নার ইতিহাস আমি কোনদিন ভুলতে পারি নি।

• • • •

মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে,
বরপুত্রসজ্জ বিরাজ হে।
শুভশঙ্খ বাজাই বাজ' হে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঠাকুরদার ঝুলি

—শ্রীসুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

আজ থেকে পঞ্চাশ বছরেরও আগের কথা। শারদ-প্রাতের বোধন দিন, বাঙালীর মন বাংলার জল, বাংলার মাটিতে ফিরতে চাইছে, সহর কলকাতায় নয়, পুজো এসে গেছে গৃহে গৃহে মঙ্গলদীপ হচ্ছে জ্বালা, বাজছে ঢাক ঢোল চলরে চল, বাংলার মেয়ে বাংলার ছেলে ঘরে ফিরে চল। চিদাকাশের বোধনী খঞ্জনী বাজছে বলছে—সখি জাগো। সখি জাগো, মেলি রাঙ্গা-অলস আঁখি সখি জাগো আমার মন-ভ্রমরা ছুটলো সেই দিনটির দিকে পল্লীমায়ের নিস্তরঙ্গ বুকে জেগে ওঠা একটি প্রবাল দ্বীপের ধরিত্রি আত্মার ঘোমটা পরা সন্ধ্যায়। বিশ্বমূলে মন্ত্রপাঠ হচ্ছে জলদ গম্ভীর স্বরে— যা দেবী সর্বভূতেষু। মেঘের সিংহবাহনে প্রমত্তা ভৈরবী সহ দেবী মাধবেন, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, তারই আভাস কি লাগলো দিকে দিগন্তরে, আকাশে কি তারই ঘোর। আষাঢ় এসেছে আশ্বিনে—পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভস্তল, কইলো কই মেঘ উদয় হও, সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি মন্দ্র-মন্থর বচন কও। চার যুগেরও বেশী আগের সেই হারানো সন্ধ্যার কথাটি শেষ বিদায়ের দিনে আবার কেন মনকে নাড়া দিলে স্মৃতির উদাসতায়—জানান্ দিলে আমি আছি, তুমি আছ—সত্য আছ প্রিয়! কিন্তু এই পঞ্চাশ-ষাট বছরের ইতিহাসে কত কী যে ঘটে গেছে, কত কী সে হারিয়ে গেছে, রাজ্য উল্টে গেছে, সাম্রাজ্য পালটে গেছে, রাজা নেই রানী নেই, বাঈশা বেগম শাহাজাদা-শাহাজাদীরা ইতিহাসের সরল পথ ছেড়ে নকল ঘোঁড়দৌড়ার হয়ে ছুকে পড়েছে উপন্যাসের ছায়াছবিতে। মানুষ হয়েছে নম্বর, উনবাটের ও। কোথায় গেলো আজ সেই কয়লা খনির নীচের ঘন অন্ধকারের হুড়কে কালো কামিন্, যে খুঁজবে তার মিজিনকে, মাঝিনকে, হারিয়ে গেছে নাকি ঘণোরের বনলতা সেন পদ্মানদীর মাঝি সব্যসাচীর দল, স্বাধের জঙ্গম। তবু নদী এগিয়ে হয়তো এসেছে, জানাচেনা হয়েছে ইয়াং কিয়াং সাইএর নোবেল সাভেজরা গড়াগড়ি দিচ্ছে পিকাসোর তুলিতে পলিনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে, বন্ধুরা সাধকরা কি বলছে

জোইনি তঁই বিহু ঘন হি ন জীবমি

যোগিনী তোমা বিনা ক্ষণমাত্রও বাঁচেবোনা

তো মুই চুমি কমলরস জীবমি

তোমার মুখ চুম্বন করে কমল রস পান করব?

আর বর্ষার দিনে গা শির শির করা শিস্ দিচ্ছে কারা, হাজুলি ধাঁকের কোণে কোণে নিধান-ছাকা জীবন মশাই, শিঞ্জনকেশিনী কৌষেয়কারিনী না নাগিনীকন্যার দল।

যাক্ এসব পুরোণোদিনের স্মৃতিভরা বিদায়ের গাথা—পিছন ফিরে তাকানোটাই তো যৌবনের অবসান—এগিয়ে চলো দৃষ্টি সম্মুখ প্রসারিত হোক—হোকনা তপ্তাশ্রু শরীরে পর্যবসিত—ও ক্রতো স্মর কৃতং স্মর—সেই অর্ধশতাব্দী আগের ষষ্ঠীর দিনটির কথা বলি স্মৃতি রোমন্থন করে। চলরে ফিরে বিড়ম্বিত আবার ফিরে চল, যেখরে খুঁজে মনের বিজন সভাতল, কই তো সেখানে খুঁজে পাচ্ছিনা, নেপথ্যনায়িকাদের কিন্নরিকংকৃত রাতে, পরজের বিহ্বল বাঁশ, মল্লারের তান বা বেহাগের সুরকে, মালকোশের ছন্দকে—মন্দির বাহির কঠিন কপাট চলইত পঙ্খিল পঙ্খিল বাট। মনে পড়ছে উৎসব মুখর একটি প্রাঙ্গণ, মনে আছেন একটি শুভ্রকেশ বর্ষীয়ান, গলায় তুলছে লাদা বগবগে পৈতে, গৌরকান্তি তনু, বয়স প্রায় আশী ছুঁইছুঁই তবু অবার প্রখরাত্মা নন গুনগুন করে গান করছেন —'মজলো আমার মন ভ্রমরা কালীপদ নীল কমলে'। প্রতিদিন বাজারে যান, দেখেশুনে দরদস্তুর করেন নিয়মিত

গঙ্গাস্নান আর দুভোধাবা চলছে চোখে কাপড় পড়তেন। একটা চোখে ছানি কিন্তু কাটানো চলেনি। তখনও চলছে কাশ—রামপ্রসাদী,কীর্তনাঙ্গ, টপ্পা, বাউল, মারফতী, হাফ আকড়াই, যাত্রা-অপেরার ছড়া ছুখে ছুখে। পুজোর দালানে উঠে আলো-ঝলমল দেবী প্রতিমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তাঁকেও প্রণাম করলাম, কোলে টেনে নিলেন আমায়, দরাজ বুকের খাঁজে খাঁজে, মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন 'বেঁচে থাক, মানুষ হ'। মানুষ হয়েছি কিনা জানিনা, কিন্তু এই আমার মেজঠাকুরদা মশাই পুজোর সময় আসর জাঁকিয়ে বসে থাকতেন—বাড়ীর জ্যেষ্ঠ তিনি—বলিদান করতেন নিজের হাতে অবশ্য রক্তরঞ্জিত খাঁড়াও নয়—বেরসিক কুমাণ্ডও ইক্ষুদণ্ডও এইসব।

আমায় দেখে বললেন এই যে বড়কর্তা, আসতে আজ্ঞা হোক। আমার পিতামহ ছিলেন সবচেয়ে ছোট, উনি মধ্যম ব্যায়োগের মধ্যমণি আর বড়ভাই ছিলেন ওঁদের চেয় বড়ো, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঘরে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন করিয়ে প্রি-মিউটিনী যুগে ইংরেজ এ্যাটর্নীর বাড়ী চাকরী করতেন এবং ওকালতীর ধাপাধাপি দেখে ছোট ভাইকে মানুষ করেছিলেন, লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন, উকীল করবার জন্য—তিনি দেখেছিলেন তখনকার দিনের সুপ্রীম কোর্টের উকিলরা পুজোর আগে বস্ত্রাবলী করে টাকা নিয়ে যেতেন। পরভৃতিক ব্যবসায় হলে কি হয়, বেশ পাসালো—মেজ ভাইকে চেয়েছিলেন ডাক্তার করতে—সবে মেডিকেল কলেজ খুলছে—সংস্কৃত কলেজের পড়ুয়াদের জন্য ভার্নাকুলারে মেডিক্স ডাক্তার তৈয়ারী হচ্ছে—বিদ্যাসাগরের আমল লর্ড ডালহৌসীর যুগ। তারপর এলো ১৮৫৭ - রাণীর ইস্তেজে আমেজে ইংরাজ-আমল কায়েম হলো—বিশ্ববিদ্যালয় হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হলো—মেজ ঠাকুর্দার কিন্তু ডাক্তার হওয়া হোল না, কারণ বিদ্যাসাগর মশায়ের বিধবা বিবাহ আন্দোলন।

কিন্তু আমার পিতামহ জ্যেষ্ঠভ্রাতা সহ পিতার আদেশ ও নির্দেশ অনুযায়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে 'ল' পড়ে হলেন উকীল, রাসবিহারী ঘোষের সমসাময়িক। ওঁদের বড়ভাই মারা যান আমার জন্মাবার আগে। তিনি নাকি মরে বলেছিলেন আমার বড় ঠাকুমাকে—'আমি আবার আসছি তোমাদের ঘরে'। তাই কিছু দিনের মধ্যে আমার জন্ম হয় —বাড়ীর বড়ছেলে, ঠাকুর্দার প্রথম নাতি—বাড়বাড়ন্ত সংসার, ঘড়িও ঘর আর ভরযান—আমার মাতা তখন আজকের হিসাবে কিশোরী বধূও চলে—(তিনি ছিলেন স্বনামধন্য মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্নের নাতনী)। বড়ঠাকুমা ও মেজঠাকুর্দা ফতোয়া জারী করলেন—আমিই তাদের ফিরে আসা বড়কর্তা, শুধু নতুন চং-এ নতুন রংএ, নতুন মেজাজ নিয়ে নবকলেবর প্রাপ্তি।

নাতি-ঠাকুর্দার মধ্যে ফিরে গিয়ে নিজের কথাই এক কাহন হলো। মেজঠাকুর্দা মজাদার রসিক লোক ছিলেন, ফিল-চরিত্র মেজাজ, বললেন—ওরে, ঘন্টা বাজাবার লোক এসে গেছে আমি তখন বি এ পড়ি তার আবার সবার সেরা প্রেসিডেন্সী কলেজে, নিজের আত্মমর্যাদা সম্বন্ধে সবিশেষ সচেতন, ঘন্টা বাজানোই কাজ নাকি আমার? বললেন—ওরে, তোদের ডাফ্ সাহেবের স্কুলটা কেমন চলছে, হেয়ার সাহেবের স্কুলের চেয়ে ভাল?

ওঁর কাছে স্কুল কলেজ সবই স্কুল—তার ভিতর দুটো নাম গজগজ করছে—ডেভিড হেয়ার আর ডেভারেণ্ড ডাফ্। কলকাতার এত কাছে থেকেও বিশ বছর কলকাতায় যাননি—শেষ যান মেডিকেল কলেজে রুগ্ন বড় ভাইকে দেখতে। অথচ তারই ছোটভাই আমার পিতামহ বাকী কলকাতা করতেন ঝুরোদা পেশার তাগিদে। আর মেজ-ঠাকুর্দা ছিলেন বৃহৎ যৌথ পরিবারের একছত্র সম্রাট, ম্যানেজার ইন-চিফ্। গ্রামের গণ্ডীর বাইরে তিনি পাদমেকং ন গচ্ছামি—কাশী নয়, গয়া নয়, তীর্থ নয়। বলতেন—সবই আছেন আমার মা গঙ্গায়, আর বেঁচে থাকুন কল্যাণেশ্বর আর সিদ্ধেশ্বরী।

আমি হেসে বলেছিলাম—বেঁচে থাকবেন কি ওরাই তো বাঁচিয়ে রাখেন। দেবতারাই তো মানুষ সৃষ্টি করেন।

হো-হো করে হেসে বলেছিলেন—মানুষই দেবতা গড়ে নয় নিয়েই নারায়ণ।

বুঝবি না, বড়ো হ—সবার উপরে মানুষই সত্য।

সেকালে সকলে বলতো—মেজদাদু প্রায় খ্রীষ্টান হয়ে গিয়েছিল। যৌবনে সংস্কৃত কলেজে পড়েছেন সেখান থেকে বিদ্যাসাগর মশাই ব্যবস্থা করেছিলেন কতকগুলি ছেলেকে ইংরাজী শিক্ষার পাঠ দেবার—নতুন সংসার ছেলেরা শিখুক পশ্চিমের শারীরতত্ত্ব, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যনীতি। তখন তিনি বিধবা বিবাহ নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছেন, শ্লোক উদ্ধার করেছেন।

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ

এতৎসু পঞ্চসু আপৎসু নারীনাং পতিরন্যো বিধীয়তে।

পরাশর সংহিতা তুলোয় থাক্, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা গালাগালি দিক, আচারভ্রষ্ট বলুক মেজ ঠাকুরদা তাঁর খুড়তাত প্রাণকৃষ্ণ সার্বভৌমকে না জানিয়ে বিদ্যাসাগরের বিধবতগারী করছেন, সভায় সমিতিতে যাচ্ছেন, তলাস্টিয়ারী করছেন। প্রথম বিধবা বিবাহের ব্রাহ্মণ ভোজনের নিমন্ত্রণে আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন এই কুলীন কুলতিলক নৈয়ায়িক-স্মার্ত বংশের এক যুবক প্রতিনিধি, লুচি, ছক্কা, মণ্ডার পরে ভোজন দক্ষিণা ছিল বেশ মোটা, যথাসম্ভব গোত্র নামে ব্রাহ্মণের চাক্ষুষ করে বরকন্যাকে আশীর্বাদ জানিয়ে তিনি রাতারাতি গঙ্গা পেরিয়ে পশ্চাদাপসরণ করেছিলেন। আজকের কৈলাস বসু স্ট্রীটে সেদিন বিবাহ বাসর বসেছিল, নগদ ষোলটি রজতখণ্ড বিনিময় হয়েছিল। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের কথা উঠলেই বলতেন—একটা জ্যান্তো মানুষ।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশ, চোরাগোপ্তা খবর দেবার লোকের অভাব ছিল না। বেশীদূরও নয়—এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা

ঝরায় বহিছে ভরি, ভিলেক না রয়
চিৎপুর শালিখা সে এড়াইয়া যায়

শালকের পাশেই খুসুড়ীর বাঁক, ভোটবাগানের মহাকাল যেখানে বসে শক্তি-আলঙ্গিত হৈ'বজ্র তারপরেই বেলুড়ের পার ঘাট। বলতেন মেজঠাকুরদা—কোথায় তখন তোদের মঠ, দেবী ভবতারিনীই অনাগতা, আকাশ আলো করে নাম্বেননি তিনি। কামারপুকুরের আধপাগলা পূজারী রামন গদাধর চাটুর্যে সবে মা. মা, করে ডাকতে সুরু করেছেন, তখন তিনি দক্ষিণেশ্বরে দক্ষিণপাণি প্রসারিত করে প্রসন্ন ওপথী ন্ন বীরশিষ্যেরা অনাগত। অবশ্য জানবাজারের রাণী জেলে যাদেরা তাঁকে সাক্ষাৎ ভগবতীর অংশ বলেই জানতো গঙ্গার তীরে দেবী মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য জায়গা খুঁজছেন।

জিজ্ঞাসা করি—আচ্ছা, মেজদা, মন্দির তৈরারী দেখেছো তোমরা।

—দেখিনি, কি বলিস, ইংরেজদের বারুদ খানার পাশেই —এ যুগের বারুদখানা—আমরা নৌকোয় করে যেতুম যে এপার থেকে ওপার।

'আমি মরমী তোমা হেন ধন চেনা বাগবাজারে রই'

ছেলে বয়সে টোলে পড়েছেন ব্যাকরণ ও কাব্য আজও কানে আসে সেই উদাত্ত সুরে কালিদাস আবৃত্তি—

অথ প্রজানামধিপঃ প্রভাতে জায়া প্রতিগ্রাহিত গন্ধ মাল্যা বনার পীতপ্রতিবদ্ধ বৎসায় যশোধনো ধেনু তবে মুমোচ

বিদ্যাসাগরীয় বিধবা বিবাহের ভোজ খেয়ে, আর মেডিকেল কলেজের মড়াঘরে মেজঠাকুরদার পবিত্র ব্রাহ্মণত্বের রক্ষাকল্পে, গোময় ভক্ষণে প্রায়শ্চিত্ত হলো বটে কিন্তু কর্তাদের রহস্যে পড়ায় হলো ইতি—চাকরী ছুটলো দাদার আপিসে। ছোটভাইটির মতিগতি দেখে তাঁর পড়া আর বন্ধ হয়নি।

সেদিন পুজোর দালানে ধরেছেন রামপ্রসাদী—

নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন,
চিনি খেতে ভালবাসি

আমি জিজ্ঞাসা করলুম—বাক্যালাপ, রসিকতা হতো সমানে সমানে, স্বতঃস্ফূর্ত সে অনুমতি তিনি দিয়েছিলেন—বাইরে থেকে দেখতে ব্রাহ্মভারী গম্ভীর মানুষ, বৈষয়িক হিসাবনিকাশ কড়ায়গণ্ডায় বোঝেন, লোকের আপদে বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়েন, অন্তরে রসের ফল্গুস্রোতে টইটম্বুর। একদিন ত বলেই ফেলেছিলাম—মেজঠাকুমাকে দেখিনি, তা নাহলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করতুম—অঞ্চলনিধির চঞ্চলতা কতদূর? তুমি কি বলতে?

চিনি গো, চিনি তোমায় ওগো বিদেশিনী?

ওরে ওরা শুধু আদর করে হৃদে রাম আদরিনী নন; পায়ের তলায় শিব হয়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না রে একেবারে নড়নচড়ন-রহিত।

মেজঠাকুরদা যাত্রায় শিব সাজতেন শুনেছি, তামাক টানতেন মুহুর্মুহু—ধূম উদ্গীরণ করে বললেন—

কহলো নিরুপমা, তাহার ঘোলে ঘাম
ইচ্ছিলা বুড়ো জটাধরে
হইয়া সুনারী তলব তিপারী
দরিদ্রবর দিগম্বরে ?
তুমি গো রূপবতী দেহের হেমজ্যোতি
মাণিক্য রুচির দর্পনা
ইচ্ছিলে এমন বরে তৈল নাচি পারে ঘরে
হইবে বিভূতিভূষণ।

জানলি, মহিলারে স্বরটি তারা থেকে উদারা মুদারায় উঠতো—আমি মরে গেলে আর একটা জোটাবে—বাংলা-দেশে পোড়াকপালীদের অভাব নেই, বাঁটা মারো। মেজ-ঠাকুরদা বললেন। ভয়ে ভয়ে বলতাম—বিদ্যাসাগর মশাই এখনও মরেন নি, আইনও চালু আছে, ইচ্ছে করলে উল্টোটাও ঘটতে পারে, ঐ কথা না শুনে যা সব সুধাবা রসবর্ষণ কর্ণপটাহ বিদ্ধ করতো, পালিয়ে বাঁচি—

সংস্কৃতে বেশ দখল ছিল তাঁর—ব্যাকরণ ছেড়ে কাব্যের ক্লাসে উঠেছিলেন তিনি সংস্কৃত কলেজে—তার পরে আর পড়াশোনা এগোয়নি। কলেজের পড়া ছেলেদের অত্যন্ত আদর করতেন তিনি। আমার পিতা পিতৃব্যদের সঙ্গে একটি দূরত্ব রাখতে হতো পারিবারিক মর্যাদার প্রশ্ন নিয়ে কিন্তু নাতিদের সঙ্গে ঠাকুর্দাদের রসিকতার সম্পর্ক বাংলার সামাজিক জীবনে চিরবিদিত—আর আমিই ছিলাম ছেলের দিকে প্রথম নাতি—আমার চেয়ে বড় এক পিশতুতো ভাই ছিলেন, তিনি থাকতেন মহেশতলায়, দূরে। ছেলে বয়স থেকেই মেজদাদুর 'নেওটা' ছিলাম আমি। তাছাড়া এই বয়সেই দুটো পাশ—সোজা কথা—আমিও যেমন তাঁর ভক্ত, তিনিও তেমনি আমার—আঠারো আর আশি মিলেছিল বেশ। তোমার মায়া, আমার মুগ্ধ।

আচ্ছা, মেজদাদু, তুমি কেন এযুগে জন্মালে না ?
নতুন নামে ডাকবে মোরে
বাঁধবে নতুন বাহুর ডোরে
আসব যাব চিরদিনের সেই আমি

বাহবা, বাহবা, সাবাস, ভাল লেখা ছড়াতে, তারী চমৎকার।

আমি বললাম—তোমাদের থাম্ থাম্ থাম্ পাত্তরা কবির অর্থাৎ রবি ঠাকুরের—

মেজঠাকুরদা বললেন—ও, দেবেন ঠাকুরের ছোট ছেলে ঠাকুরবাড়ীর কাঁচামিঠে আম—বেশ, বেশ, কী চমৎকার ছড়া বানায়—আমার শোনাস তো ওর কবিতাগুলো, ওর লেখা গানগুলো আমি জানি—

অয়ি ভুবন মন মোহিনী—নবক জননী জননী

তবে শুনেছি নাকি দুটো দল আছে—একদল ওকে দেখতে পারে না,বলে ন্যাকামীর চং—আবার ছড়া বানিয়েছে নাকি আনন্দবিদায়

আমি নিশ্চয় কোনরূপে স্বর্গ থেকে টলকে
জন্মেছি এ-বঙ্গদেশে বিধাতার হাত ফসকে

আমি যা লিখেছি এবং আজকাল যা সব লিখছি
সে সব থেকে মাঝে মাঝে আমিই অনেক শিখছি
আমি যোগ দিলাম
আমি লিখেছি যে সব কাব্য মানব জাতির জন্যে
নিজেই বুঝি না তার অর্থ, বুঝবে কি তা অন্যে

এবং বললাম—এতোও মনে থাকে তোমার—

বিদেশী প্রাইজ পেয়েছে বলেই ওকে তোরা মাথায় নিয়ে নাচছিস্—আমি তো সংস্কৃত সাহিত্য কিছুটা পড়েছি, ওর আছে দিব্যদৃষ্টি, তা নাহলে ওসব বোঝায়—কালিদাস গুলে খেয়েছে—নবরত্নের মাল্যখানে ঘনশ্যাম রত্নই বটে।

বলেই গুনগুন করে গান ধরলেন—

দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে

ঐ বিবেকানন্দ পরমহংসদেবকেও আমরা মানতুম না কি—এই তো এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা—এই তো সেদিনের কথা, বিবেকানন্দ আমেরিকা জয় করে এলো, রাজা প্যারী-মোহন তাকে শিরোপা দিলে, কত ধুমধাম—ঘুড়ি গাড়িতে বসিয়ে ছেলেরা টেনে নিয়ে এলো, মালা গেল ছোকরা অন্ন

বলেন, গিরীশ ঘোষ এলো তোর ঠাকুর্দার কাছে (মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান তখন), অনুমতি দিয়ে দেন, মঞ্চের ভেতরেই ওঁর থাকা ব্যবস্থা হবে। তোর ঠাকুর্দা ইতস্তত করছিল, তখনো ও এমন নামডাক হয় নি—একটা মঞ্চ স্থাপিত হয়েছে বটে—পরমহংসদেবের সময়েও লোকের ধরনটা পাল্টাচ্ছে, দেশে একটা নতুন হাওয়া বইছে, সবই ঠিক কিন্তু ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, থার্ড আই সি. এস., যদি চটে যান আমাদের হাঁটি হাঁটি পা পা খাসতলাসন দেখাচ্ছেন হাত ধরে, আমি গিয়ে বললুম—জগৎ, পারমিসন্ দিয়ে দাও। বড় ভাই বলছেন—আর কথা নেই। তখনকার দিনে সব বিষয়েই আমরা নিঃসঙ্কোচে মতামত দিতুম। মনে রাখিস্ বিদ্যেসাগর মশায়ের চেলা।

তার চেয়ে বেজদাদু কলকাতার গল্প বলো,

হেসে তিনি বললেন—

গিয়াছিনু কলিকাতা, যা দেখিনু গিয়া তথা
কি লিখিব তার কথা—

সেকালের সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়ে বেরিয়েছিল, এই ছড়া—হুতোমের নাম জানিস বিশ্চয়—তার নক্সাতেই আছে—আজব সহর কলকাতা। বৈঠকখানা বাজারে বটগাছের নীচে বসে গড়গড়া টানতে টানতে টার্ণর সাহেব যখন হুতোমওয়ালীর তেজীয়সী খেলা খেলতেন, তখন কী কেউ ভেবেছিল যে বাদশাহী নবাবী টুকরো টুকরো হয়ে গিয়ে কালাদের রাজত্ব নেবে বলায়। নহবতে তান মিলিয়ে যাবে, শীতমহলে রংমহলে বাদুড়রাই শীস্ দেবে—

মাসে মাসে আর নাহি খুশ রোজ
নওরোজ নেই নব বরষে

জমানা বদল গিয়া

যৈ দি খোলা তলোয়ার
ঘড়ি ভরমে জিত্ লিয়া কেল্লা কলকাতা বাজার

আমি ইতিহাসের ছাত্র, বললুম—বেজঠাকুরদা হিসেবে একটু ভুল হলো—ওটা তো প্রচলিত হয়েছিল সিরাজদ্দৌল্লার ব্ল্যাকহোলের সময়।

আরে ঐ—ঘড়িভরমে জিত্ লিয়াই কোম্পানী বাহাদুর রাইত আর ওয়ারেন হেস্টিংস। হুগলীর গঙ্গার তীরে (ঐ দেখ্ কালিদাস এসে গেলো—পথে একেবারে অসুর পান সভার সখীরা এসে গেছেন—চোখের পলক পড়ে না—চোখ দুটো যেন উপোস্ করে আছে—উপোবিভাত্যাং ইব লোচনাভ্যাম) যেতের জঙ্গলরা বাদাবনে দাঁড়িয়ে ভুলীন করেছিল আগন্তুকদের তারা—এই অধমদের পূর্বপুরুষেরা—ওরা তো হার্থাদের দল বললেই চলে—লুটপাট, খুনখারাপ, মেয়ে চালান দেওয়া—কত না কী করেছে।

আমি বলি—পর্টুগীজ বোম্বেটের দল তো তাই করতো ও সব সময় চৌরঙ্গীতে শুধু বিলেসের নয় (আজও বিল্-গেয়ের খেলা চলে সেখানে)—কলকাতা থেকে ভুলে নিয়ে গেছে না রাজধানীটা—বড়লাটের প্রাসাদ—ঐ যে তোর এক মামার পিসে কাজ করতো না সেখায়—কলকাতা সিভিলের বাবু—কি সেলাম, কি সমীহ—খাস মেমী সাহেবের খিদমৎগার—দূর-দূর—

থাকগে চৌরঙ্গীর গল্পই বলো—

জানিনা তো ঠিক, পড়াশোনাও করি না, শুনেছি বাবা দক্ষিণরায়ের একটা আস্তানা ছিল—তখন সবই তো জঙ্গল—পার্ক ষ্ট্রীটের নামই তো ঐ জন্যে—ডিয়ার পার্ক—হরিণ হরিণীদের আড্ডা—

আমি বললাম—আজকের মতার্ণ হরিণ হরিণীরাও সেখায় যাতায়াত করেন—মৃগনয়নারা।

তবে শোন্—এক যে ছিল রাজা, আর এক ছিল রাণী—রাজা ছিলেন বুড়ো, কিন্তু রাণী ছিলেন একটি তরুণী ভার্য্যা—রাজা গেছেন শিকারে—বাড়ীতে উপযুক্ত সোমত্ত ছেলে—সংসা-এর কানে ফুসমন্ত্র দিতে চেষ্টা করলে, হলো না সুফল—ফলে ভীষণ চটে গেলেন তিনি—ফলে রাজা ফিরতেই নানান্ ভাবে কানে লাগালেন তিনি—ফলে ছেলে হলো হাত পা কেটে জঙ্গলে ফেলে দিয়ে এলো—সেই অবস্থাতেই চতুরঙ্গী হয়ে তিনি নিজ গোবর্ধনাথের কৃপা পেলেন, সিদ্ধাই হলেন, নাম হলো চৌরঙ্গীনাথ, তারপর—তারপর তো ভোরের বেলার কথা, জবচার্ণকের বিবি, কেরী-সাহেবের মুন্সী—সেবেজদের থিয়েটার, কবর খানায় ভূতেদের জলসা, ভূলণ্ডীর মাঠ, হিকির ট্যাভার্ন, নর্তকী নেকি নাচে আর বোতল বোতল শ্যাম্পেট উড়ছে, বেলভিয়ার সিল্কী মলভিয়

ছবি আঁকছে—সেরাদা হবকরা, হকাবরদার, গঙ্গায় বান আসছে—কালো টাউনের ছবি—

কালো টাউন—সে আবার কি? জিজ্ঞাসা করি আমি।

তোরা আজকালকার ছেলে কিছু জানিস্ না, আর আমি ভিনকাল গাওয়া একবালে ঠেকা বুড়ো—১৭৮০ সালের মে-জুন মাসের কলকাতা গেজেট খুলে দেখিস—কি যেন সব লেখা আছে, মনে নেই তাই—

সত্যিই দেখেছিলাম পরে—একত্রিশ ভাগে ভাগ করা হয়েছিল কলকাতা সহর—তেতগুলো থানাদার—সাতটা থানা ইংলিশ টাউনে, বাকী চব্বিশটে ব্ল্যাক—ইংলিশ টাউনে চারটে, আর কালা টাউনে ছুটো করে মরলা ফেলার গাড়ী এর তদারক করতেন যোলেক্ সেরবোর্ন। বলা থানাগুলো ছিল—আর্মেনিয়ান চার্চ, ওল্ডকোর্ট হাউস, চাঁদপাল ঘাট, ধর্মতলা, সাউথ অব্ দি গ্রেট্ টাঙ্ক ইত্যাদি। কথা শেষ করে আমি হেসে বলি—চলি, মেজদাদু,

You grow old among dreams
A weather worn marble Triton
among streams

আমিও ইংরেজী শিখেছিলুম—রিচার্ডসনের বুলের ছাত্র,

The memory throws up high and dry
A crown of twisted things

স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার ভেঙে চুরে রেখে গেছে বুঝি—দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—স্মৃতির পিঞ্জরদ্বার—কার কথা যে?

আমি বললাম আবার কার—রবি ঠাকুরের—

ঁ্যা, ছোকরাটা আগুন জ্বালবে—

ছোকরা?—সে কী তোমার চেয়ে ছোট বটে, কিন্তু একেবারে বুড়ো না হোক—বুদ্ধদ্ বয়সী নিশ্চয়। তোদের চেয়েও ছোকরা জানলি? পড়িস, ওর লেখাই পড়িস, এবারে যখন সময় পাবি, আমায় শোনাস ও ওর কথা কাহিনী—

পদ্মনদীর তীরে বেণী পাকাইয়া শিরে

আমি শুনিয়ে এলাম—

উষরের পথে শুনি কার বাণী
ভয় নাই ওরে ভয় নাই
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।

আজ ধানের খেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরি খেলা,
নীল আকাশে কে ভাসালে সাদা মেঘের ভেলা।
আজ মধুর তোলে মধু খেতে,
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ বিদের ভরে নদীর চরে চখাচখীর মেলা॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একটি পুরুষ একটি নারী এবং নেভা নদী

—কৃষ্ণ ধর

ব্রুস্টনের ব্যারিমুরের সঙ্গে দেখা সেবার হেলসঙ্কে।

অরোরা দেখে ফিরছিলুম। একটি জাহাজের নাম। ছোট জাহাজ। তখনকার ক্রুজার চেস্টুয়ারের তুলনায় খেলনা। কিন্তু অরোরা অদ্বিতীয়। একটা দুনিয়া-কাঁপানো ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে সে লেনিনগ্রাদে নেভা নদীর বুকে এখনও জেগে আছে।

ছাপান্ন বছর আগে এই জাহাজ থেকে প্রথম কামানের গোলা গিয়ে পড়েছিল জারের মৃগয়া বিলাসনিকেতন উইণ্টার প্যালেসে।

সেই সতেরো লালের নভেম্বরের কথা। এই শহরের নাম ছিল তখন পেট্রোগ্রাড। তারও আগে এর পরিচিতি ছিল পিটার্সবার্গ নামে। পুশকিনের লেখায় সেই শহরের আশ্চর্য ছবি আমরা পেয়ে যাই। নভেম্বরের সেই আগুনে জারের শীতের প্রাসাদই শুধু প্রজ্বলিত হয়নি রুশভূমির চেহারাই গেল বদলে।

অরোরা নভেম্বর বিপ্লবের সংকেত দিয়েছিল তার অধিবর্তী কামান থেকে।

অরোরা এখন শান্ত। সে এখন ইতিহাস।

দেশ বিদেশের মানুষ আসে। অরোরাকে তারা স্পর্শ করে যায়। সে পুরানো কিন্তু জীর্ণ নয়। সে নিষ্ক্রিয় কিন্তু উপেক্ষিত নয়। নভেম্বর বিপ্লবের অগ্রদূত অরোরা লেনিনগ্রাদের অন্যতম দ্রষ্টব্য।

মার্কিন সাংবাদিক জন রীড এই যুগান্তকারী বিপ্লবের ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শী। তাঁর 'টেন ডেজ্ দ্যাট শুক্ দি ওয়ার্ল্ড' বইয়ে সেই অগ্নিঝরা দিনলিপি তিনি লিখে রেখে গেছেন। রাশিয়াতেই হয় তাঁর জীবনান্ত। মস্কোর ক্রেমলিনের আঙিনায় তিনিই একমাত্র বিদেশী যাঁর সমাধি আজও মনে করিয়ে দেয় রুশরা তাঁদের এই বন্ধুটিকে ভোলেনি।

নেভা এখন শান্ত। হেলসঙ্কের হোটে দাঁড়িয়ে ইতিহাসের সেই রোমাঞ্চ অনুভব করছিলুম মনে মনে। আমি ভারতবর্ষের মানুষ। অন্য ইতিহাস চেতনায় আমরা লালিত।

তবু মনে হল, এ ইতিহাসতো সব দুঃখী মানুষেরই। শরৎচন্দ্রের ভাষায়, সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই।

টলস্টয়ের সেই বুড়ো ইভানের মুখটা আমার মনে পড়ল। সেই ইভানের সঙ্গে হারাণের কোনো পার্থক্য নেই।

পৃথিবীর সব দুঃখী মানুষেরই এক চেহারা, একভাষা, একই চলার পথ। ওরা ইতিহাসের দিনবদল ঘটিয়েছে। তাই পর্যাবর্তের নতুন এক বেশ চোখে পড়ল। ব্যারিমুর আমার পাশে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছিল। বস্টনের ব্যারিমুর। পেশায় ইনজিনিয়ার। কাজ করে স্কেট্রয়টের এক নামী মোটর কারখানায়।

প্রশ্ন করলুম, কত ছবি তুললে?

ব্যারিমুর হাসল। লম্বা দর্শনীয় চেহারা। বললে, তোমায় দেখাব হোটেলে ফিরে।

ব্যারিমুর এবং তাঁর সাথী টুরিষ্ট মার্কিন বন্ধুরা উঠেছে আমাদেরই সঙ্গে হোটেল অ্যাস্টোরিয়ায়। তাই পরিচয় হয়ে গিয়েছিল।

ব্যারিমুর ছুটি পেলেই দুনিয়া ঘুরে বেড়ায়। রাশিয়ায় কোনোদিন আসেনি, এই প্রথম। ওর কৌতূহল আর শেষ হতে চায় না।

আমেরিকান টুরিষ্টদের কদর আছে রাশিয়াতেও। ওরা ডলার খরচ করে। ডলারের তখনও এমন দশা হয়নি। রাশিয়ার সঙ্গে আমেরিকার ভাব সুরু হয়েছে। মাত্র ক'দিন আগেই নিকসন সাহেব সস্ত্রীক এবং সদলে ঘুরে ঘুরে গেছেন।

আমারও কৌতূহল হল, আমেরিকানরা কী চোখে দেখছে রাশিয়াকে! ওরা এতদিন জেনে এসেছে রাশিয়া হল কম্যুনিষ্ট দেশ। লোহার বেড়া দিয়ে নাকি ওটা ঘেরা। এখানকার মানুষগুলো সব ধর্ম। ক্রেমলিনের কর্তারা যা বলে তাই করে, ওদের যা ভাবতে বলা হয় তাই ভাবে।

রুশরাও বোধ হয় ভাবত, আমেরিকান মানেই হল এক একটা স্থূল ক্যাপিটালিষ্ট।

ব্যারিমুর অনেক দেশ ঘুরেছে। ইয়োরোপে সে প্রায়ই আসে। রাশিয়াকে তো আগে ইয়োরোপ বলেই মনে করা হত না। জারের আমলে রাশিয়া ছিল রহস্যময়। এশিয়া ও ইয়োরোপ জুড়ে, বাল্টিক থেকে সুরু করে ভ্লাদিভস্টক পর্যন্ত তাঁর বিশাল দেহ নিয়ে পড়ে আছে।

জার পিটার দি গ্রেটই প্রথম বাল্টিক যুদ্ধে জয়ী হয়ে ইয়োরোপের দরজা খুলে দেন।

সে সপ্তদশ শতাব্দীর কথা। রুশদের তিনিই বাধ্যতামূলক ভাবে ইয়োরোপীয় পোশাক পরান।

নেভস্কি প্রসপেক্ট দিয়ে আমরা হাঁটতে হাঁটতে ফিরছিলুম।

প্রায় চার মাইল সোজা সরলরেখার মতো রাস্তা।

লেনিনগ্রাদের চৌরঙ্গী।

শীত ছিল। তবে তেমন অসহনীয় নয়। টুরিষ্ট বাস ছেড়ে দিয়ে হাঁটতেই আমাদের ভাল লাগছিল। আশ্চর্য সুন্দর জনপথ। রুশ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে দুপাশে উজ্জ্বল সব বাড়ি। পরিষ্কার ঝকঝকে। আমার তো আশ্চর্য লাগবেই। ব্যারিমুরও তারিফ করছিল।

এগারোটা বাজে এখন। উত্তরের এই শহরে এতো সবে সকাল। লেনিনগ্রাদ ঘুমোয় দেরিতে, ওঠেও দেরিতে। ওর রাত সাদা আলোয় স্বচ্ছ হয়ে থাকে অনেকক্ষণ অবধি উত্তর মেরুর কাছাকাছি বলেই তার এই জাগরণ।

মাটির তলায় রেলের দিয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারী যাচ্ছে আর আসছে কাজে। ওপরের রাস্তায় তাই ভীড় কম। রাশিয়ার সব বড় শহরেই এই দৃশ্য।

'চলো একটা রেস্তোরাঁয় বসি, একটু গল্প করা যাক।' ব্যারিমুরের কাছে প্রস্তাব দিই।

ব্যারিমুর রাজি হয়। কখন চা খেয়ে বেরিয়েছি। গলাটা একটু ভেজানো দরকার।

একটা মস্ত বাড়ীর বেসমেন্টে রেস্তোরাঁ। খুব ভীড় ছিল না। জায়গাটি এমন যে ভেতরে বসে রাস্তা পরিষ্কার দেখা যায় অথচ যেন একটু আলাদা।

রাশিয়ার রেস্তোরাঁয় ঢুকে গেলে সব সময়েই সেলফ-সার্ভিস। খাবার সব সাজানো। প্রত্যেক খাবারের দাম লেখা। বললেই মেয়েরা প্লেটে খাবার তুলে দেয়। রাশিয়ার সর্বত্র খাবারের এবং সব জিনিসের এক দাম। লেনিনগ্রাদেও যা তাশকেন্টেও তা।

নিস্তব্ধ রেস্তোরাঁ। কিউ দিয়ে দাঁড়িয়ে একের পর এক খাবার নিয়ে সবাই টেবিলে বসছে।

চা এবং কফি দুইই পাওয়া যায়। হাসিমুখে মেয়েরা খাবার সাজিয়ে দেয় প্লেটে। কোপেক গুণে দিয়ে খাবার নিয়ে আমরা টেবিলে এসে বসি। আমি পয়সা দিতে গেলে ব্যারিমুর বাধা দেয়। বলে, এর পর যখন ক্যালকাটা যাব তখন তুমি সব দিও। এবার আমাকে দিতে দাও।

ব্যারিমুরের কথাবার্তা, স্বভাব এত মার্জিত যে ওকে আমার মনে হয়েছিল কোনো কলেজের দর্শনের অধ্যাপক হবে বা। শান্ত, সুরুচিবান: সৌজন্যে বিনয়ে অতুলনীয়। বয়স আমার চেয়ে ঢের কম।

খেতে খেতে গল্প করছিলুম।

ব্যারিমুর তাঁর নিজের কথা বলে। ওর বাপ গত মহাযুদ্ধের সময় সৈনিক হয়ে এসেছিলেন ইয়োরোপে। ব্যারিমুরের বয়স তখন পাঁচ। যুদ্ধের কথা ওর মনে নেই বিশেষ। শুধু মনে আছে, মা ইয়োরোপের মেলের জন্য অধীর হয়ে থাকতেন।

চিঠি এলেই মা আর দিদিমার সে কি আনন্দ।

ব্যারিমুরের এ হল শৈশবস্মৃতি।

আমি বললুম, যুদ্ধের সময় আমিও ছাত্র ছিলুম। খুব ভাল করেই বুঝতে পারলুম যুদ্ধ এসে গেছে একেবারে দরজার গোড়ায়। জানো এই যুদ্ধের সময় আমার দেশের পঞ্চাশ লাখ লোক না খেয়ে মারা যায়।

ব্যারিমুর আশ্চর্য হয় শুনে। যুদ্ধ সেও দেখেনি।

আমেরিকার মাটিতে যুদ্ধ হয়নি। জাপানীরা অবশ্য পার্লহারবারে বোমা ফেলে তুলকালাম বাঁধিয়েছিল।

খুব আবছা সে সব কথা তার মনে পড়ে। কথা বলতে বলতে ব্যারিমুর কেমন যেন অন্যমনা হয়ে যায়।

স্মৃতির গলি বেয়ে সে চলে গেছে অনেক দূরে।

আমি চুপ করে থাকি। ওকে ভাবতে দিই।

'তুমি জানো, কেন আমি বার বার ইয়োরোপে আসি,' ব্যারিমুর তাঁর পুরু চশমার ভিতর দিয়ে গভীরভাবে আমার দিকে তাকায়।

কী বলব ভেবে পারছিলুম না। বুঝতে পারছিলুম ও একটা কিছু বলতে চায়। মনের ভেতরে ওর কোনো কথা খেলা করছে। সে বোধহয় ফিরে গেছে অতীতে। আমি ওর দিকে জিজ্ঞাসু চোখে তাকাই।

ব্যারিমুর বুক পকেট থেকে একটা নোটবই বের করল। একজন যুবকের ছবি। ইউনিফর্ম-পরা, উজ্জ্বল চোখ, প্রশস্ত কপাল।

'আমার বাবা' ব্যারিমুর গভীর গলায় বলে, তিনি আর ফিরে যেতে পারেন নি। নরম্যাণ্ডি অভিযানের কথা নিশ্চয়ই পড়েছো। ফোরাইট আইজেনহাওয়ারের বাহিনীর সঙ্গে তিনি ফ্রান্সের উপকূলে অবতরণ করেছিলেন। তারপর আর কোনো খবর তাঁর পাওয়া যায়নি লস্ট এ্যাণ্ড প্রিজিউমড্ ডেড।

খানিকক্ষণ আমরা কেউ কথা বলতে পারলুমনা। মনে পড়ল সেই দীর্ঘতম দিনের কথা – দি লংগেস্ট ডে।

অনেকদিন অপেক্ষার পর মিত্রবাহিনী দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলেছিল নরম্যাণ্ডিতে অবতরণ করে। হিটলারের বিরুদ্ধে সে ছিল তাদের তীব্রতম এবং দুঃসাহসিক আক্রমণ।

পূর্ব রণাঙ্গনে তখন মার্শাল জুকভের নেতৃত্বে সোভিয়েট বাহিনী নাৎসীদের তাড়িয়ে নিয়ে আসছিল রুশভূমি থেকে বার্লিনের দিকে চলছিল তাদের অভিযান।

ফ্রান্স তখন অধিকৃত। মার্শাল পেঁতাকে দিয়ে 'ভিসি সরকার' গঠন করেছিল নাৎসীরা। ডেঁতুর যুদ্ধ বিজয়ী বীর মার্শালের মতিভ্রম হয়েছিল। ফরাসীরা স্বীকার করেনি সেই বিশ্বাসঘাতক সরকারকে।

সারা দেশে গড়ে তুলেছিল তারা এক স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধ যুদ্ধ।

দি রেসিটান্স্।

সবাই যোগ দিয়েছিল সেই মহান সংগ্রামে।

কবি, দার্শনিক, গায়ক, চিত্রশিল্পী সবাই।

প্যারিসে তখন রয়েছেন শতাব্দীর মহান শিল্পী, একালের প্রোমিথিউস পাবলো পিকাসো।

প্রতিরোধ বাহিনীর নেতারা আসতেন তাঁর স্টুডিয়োতে।

লুই আরাগঁ, পল এলুয়ার, জাঁপল সার্ত্রর।

আলোচনা চলত কীভাবে ফ্রান্সকে রাহুমুক্ত করা যায়।

ইস প্যারিস বার্নিং?—বার্লিনের উইন্টার ভেন লিণ্ডেনের বাঙ্কার থেকে ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত হিটলার টেলিফোন করে জানতে চাইতেন তাঁর সেনাপতির কাছে।

পরিকল্পনা ছিল, পিছু হটে আসার আগে গোটা প্যারিস জ্বালিয়ে দিয়ে আসবে নাৎসীরা।

প্যারিস জ্বলেনি।

মিত্রবাহিনী তখন প্যারিসের উপকণ্ঠে। সঙ্গে সঙ্গে ভিতর থেকে জেগে উঠল প্রতিরোধ বাহিনী।

আমি বললুম, সে সব কথা আমি জানি ব্যারিমুর।

যুদ্ধের সে হল উজ্জ্বলতম দিন।

'সেই যুদ্ধে আমার বাবা প্রাণ দেন।' ব্যারিমুর বলে, ফ্রান্সের মাটিতে তাঁর শেষঅস্থি রেণু হয়ে মিশে আছে। আমি ফ্রান্সে না এসে পারি না। মা বুড়ো হয়ে গেছেন। তিনিও আগে এসেছেন কয়েকবার। এখন আর আসতে পারেন না। আমি আসি। নরম্যাণ্ডির উপকূলে দাঁড়িয়ে সেই সমুদ্রকে দেখি। সে হয়তো বলতে পারে কোথায় কোন তরঙ্গে আমার বাবাকে সে চিরশান্তি দিয়েছিল।

বলতে বলতে ব্যারিমুর চুপ করে গেল।

লেনিনগ্রাদ থেকে নরম্যাণ্ডি; নরম্যাণ্ডি থেকে বস্টন। মাঝখানে এক অশ্রুসজল সমুদ্র।

আমরা আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ি। একটা বাস ধরি এবার। লাঞ্চের সময় হয়ে এসেছে। বিকেলে আবার অন্য প্রোগ্রাম আছে।

হোটেলে ফিরতেই দোভাষিনী ইরিনা বললে, কোথায় ছিলে তোমরা। হার্মিটাজে গেলে না।

বললুম, কাল যাব।

ইরিনা পেশায় শিক্ষিকা। ইংরাজি জানে বলে মাঝে মাঝে দোভাষিনীর কাজ করে।

ব্যারিমুর বিদায় নিয়ে ওর ঘরে চলে গেল। ইরিনার সঙ্গে আমি খানিকক্ষণ গল্প করি।

বললুম, জানো এই আমেরিকান ট্যুরিস্টের কাছে আজ তার জীবনের গল্প শুনেছি। বড় করুণ সে গল্প। গত যুদ্ধে সে তার বাবাকে হারিয়েছে ইয়োরোপের মাটিতে।

শুনে ইরিনা দুঃখিত হল। তারপর হঠাৎ চুপ করে গেল। ভাবলুম ব্যারিমুরের কথা ভেবেই বা সে এমন আনমনা হয়ে গেছে।

ইরিনা বললে যুদ্ধ একটা অভিশাপ। সবারই জীবনে সে এক দুঃস্বপ্ন।

'সে জন্যই তো আমরা যুদ্ধের বিরুদ্ধে।' আমি বলি।

ইরিনা বলে, আমার তখন কতই বা বয়স। বাবা যুদ্ধে গেলেন। লেলিনগ্রাদকে ঘিরে ফেলল নাৎসীরা। চারশো দিন শহরটা ছিল অবরুদ্ধ। প্রতিদিন ঝাঁকে ঝাঁকে বিমান এসে বোমা ফেলে যেত।

আমি বললুম ওরা তবুও লেলিনগ্রাদ দখল করতে পারেনি।

'পারেনি কিন্তু তার জন্য লেলিনগ্রাদকে কত মূল্য দিতে হয়েছিল তা তো তুমি জানো, ডোবারিশ।' ইরিনা বলে, খাবার ছিল না, আলো ছিল না।

অতিকষ্টে শিশু আর মেয়েদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তাই বোধ হয় বেঁচে গিয়েছিলুম।'

'লেনিনগ্রাদ বীরের নগরী।' আমি বলি।

'কিন্তু আমার বাবা; তুন নদীর লড়াইয়ে তিনি মারা যান। বাবার ছবি ছাড়া আর কিছু মনে নেই ওঁর বিষয়ে।'

ইরিনা চুপ করল।

বস্টনের ব্যারিমুর তখন কী ভাবছে জানি না।

ইরিনার দিকে তাকিয়ে আমার তার কথাই মনে পড়ছিল।

একজন বস্টনের অপরজন লেলিনগ্রাদের।

আশ্চর্য মিল তাদের জীবনের ইতিহাসের।

আমি বললুম, চলো ইরিনা, ব্যারিমুরের সঙ্গে তোমার নতুন করে আলাপ করিয়ে দিই।

হোটেল অ্যাস্টোরিয়ার সামনের পার্কটায় হেমন্তেও তখন কয়েকটা শাদা ফুল ফুটেছিল।

আমার নয়ন-ভুলানো এলে,
আমি কি হেরিলাম হৃদয় মেলে।
শিউলিতলায় পাশে পাশে ঝরা ফুলের রাশে রাশে
শিশির-ভেজা ঘাসে ঘাসে অরুণরাঙা চরণ ফেলে
নয়ন-ভুলানো এলে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবন নাট্যের প্রথম তিন অঙ্ক

—মন্মথগোপাল সেনগুপ্ত

বাল্য কৈশোরের প্রথম দিকটা শহরে কাটিয়ে হঠাৎ যদি গ্রামে গিয়ে থাকতে হয়, তাহলে সেটা যে বেশ উপভোগ্য লাগে না এ আশা করি দুরুভোগীদের বোঝাতে হবে না। সত্যিই আমি মহা ফাঁপরে পড়লাম বার-তের বৎসর বয়সে কলকাতা থেকে মফঃস্বলে এসে। কোন ছেলের সঙ্গে বনে না। তাদের বেশভূষা ফিটফাট নয়, মুখের ভাষা অমার্জিত, রুচি ও ধরণ-ধারণ অসুন্দর।

কিন্তু কি আর উপায়? বাবা এলেন চাকরি নিয়ে, কাজেই আসতে হল আমাদের। শহরে চালিয়াতি নিয়ে ভালই ছিলাম। বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে বেশ একটু পসারই ছিল। গ্রামে তার কোন কদর হল না। ছেলেরা আমার ধোপ দুরস্ত ভাবটাকে বিদ্বেষের চোখে দেখতে লাগল। বিশুদ্ধ পশ্চিম বাংলার উচ্চারণকে ইয়ার্কির দ্বারা করতে লাগল সম্বর্ধিত। এর ওপর পড়াশুনায় ছিল তথাকথিত ভালে ছেলেমি। সেজন্যেও প্রায় সবাই বেঁকে দাঁড়াল আমার বিরুদ্ধে।

হঠাৎ একটি সহপাঠী, ধরুন তার নাম মানিক, গায়ে পড়ে আমার সঙ্গে ভাব জমাল। বলল, তারী ভাল লাগে তার আমাকে। আমি নাকি বেশ বাবুয়ানা দেখতে। আমি নাকি এক সময় খুব নাম জাদা হব।

ও বয়সে একথায় গরম হয় নয়। বিশেষ করে অন্তরটা যখন খাঁ খাঁ করছিল দরদী একটি সমবয়সী বন্ধুর জন্যে, তখন এই কথা। শুনব ভেজে গেল। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেলাম মানিকের মায়ায়।

মানিকের রং বেশ ফর্সা, গড়নটি হালকা ছিপছিপে। মাথার চুলগুলিও চমৎকার। মিহি সিল্কের মত নরম ঘন। কিন্তু চলন বলন কেমন যেন একটু মেয়েলি রকম। হাত দুলিয়ে, চোখ নাচিয়ে, ঠোঁট বেঁকিয়ে কথা কয়, হাঁটেও একটু নেচে নেচে। কেমন যেন লাগে এজন্য। কিন্তু একটি মাত্র বন্ধু, সবে ধন নীলমণি, কি করব? মেনেই নিতে হয় ওটুকু।

একদিন দুপুরে মানিক এসে বলল, চল আজ কেরেন্দার বাঁধে যাই। তুমি কবি মানুষ, খুব ভাল লাগবে দেখ। কত পানকৌটি, বালি হাঁস, শামুক ভাঙা আসে। কত শালুক ফোটে, পদ্ম ফোটে। আর জলও থাকা নীল, আকাশের মত। ছুটির দিন, চল না যাই!

মানিকের আমন্ত্রণটা লোভনীয়। ওদের বাড়ীতে অঙ্ক কষতে যাচ্ছি বলে মার কাছে ছুটি আদায় করে নিলাম।

মাইল তিনেক পথ। দুধারে ঘন শাল বন, ফাল্গুনের মধ্যাহ্নে জ্বল জ্বল করছে তাতে থোকা থোকা ফুল। তারি ফাঁকে ফাঁকে ফুটেছে বনবেলী, আকন্দ আর ওঁট ফুল। মাঝে মাঝে যাচ্ছে দু'একখানা গোরুর গাড়ী ক্যাঁচর কোঁচর শব্দ করে, লাল ধুলোর রাস্তা দিয়ে। মাঝে মাঝে যাচ্ছে কুর্মী মেয়েরা দল বেঁধে খোঁপায় বুনোফুল গুঁজে, অবোধ্য ভাষায় গান করতে করতে। কলকাতার চোখ জুড়িয়ে গেল আমার জংলা গ্রামের এই ছবির মত দৃশ্য দেখে।

বাঁধের ধারে পৌঁছে দেখলাম মানিকের বর্ণনা নির্ভুল। সত্যিই চমৎকার জায়গা। অগাধ অতল কাল জল টলমল করছে। তার অর্ধেকটার ওপর ছড়িয়ে রয়েছে সারি সারি পদ্ম পাতা। ফাঁকে ফাঁকে ফুটেছে লাল আর শাদা পদ্ম, তারি সঙ্গে শাপলাও। সব চেয়ে আশ্চর্য্য, চারদিকে তাকিয়ে রয়েছে অজস্র পানিফল। তা যে জলে হয়, এ কে জানত? কে জানত কলমির শাক এমন অনাদৃত যে কেউ তাতে হাত দেয় না? আর পাখী, এত পাখী···এই বা কোথায় কবে দেখেছি?

কিন্তু একমনে যে দেখব সে উপায় নেই। মানিকটা

খালি হাত ধরে টানতে লাগল খালি কাঁধে মাথা রেখে জড়িয়ে ধরতে লাগল। আর কেমন এক রকম বিষদৃষ্টে চোখ করে বার বার তাকাতে লাগল আমার দিকে।

ব্যাজার হয়ে বললাম, ও কি করছ? বল না স্থির হয়ে। নয়ত চল একটা বাঁশটাশ জোগাড় করে তাই দিয়ে পদ্ম আর পানিফল তুলি।

মানিক সেই রকম রহস্যময় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, ওসব করতে হলে অন্যদিন একলা এস। আমি ওজন্যে এখানে আসিনি। আমি সাপের নই তোমার মত।

মনে হল মানিক চটেছে। কিন্তু চটার মত খুব বেশী কড়া কথাত কিছু বলিনি তাকে। শুধু ওরকম করে গায়ে পড়তে আর আমার পাট ভেঙে দিতে বারণ করছি। এতেই রাগ হয়ে গেল তার? বললাম, তাহলে এসেছ কি জন্যে?

মানিক আবার তাকাল সেই রকম করে। তার পরেই টস টস করে চোখ দিয়ে তার গড়িয়ে পড়ল কয়েকটি ফোঁটা জল। হতভম্ব হয়ে গেলাম। এ কি? পাগল নাকি?

বললাম ও কি? কি হোল তোমার? শুধু শুধু কেঁদে ফেললে যে!

মানিক বলল, তোমাকে কোন ছেলে দেখতে পারে না। আমি বেচে ভাব করেছি কিনা, তোমাকে ভালবাসি কিনা, তাই আমাকে অপমান!

বলতে বলতে স্পষ্ট কান্না এবং তার সঙ্গে ফোঁপানি। ফোঁপাতে ফোঁপাতে মানিক বলল, তোমার চোখ দুটো খালা জল জলে। তুমি সুন্দর গান কর। তোমার হাতের লেখা পরিষ্কার ঝরঝরে। তাই তোমাকে আমার ভাল লাগে। কিন্তু আমাকে তুমি ভালবাস না। আজ থেকে আমিও অন্য ছেলেদের দলে।

মানিক উঠে হন হন করে চলতে সুরু করল লাল মাটির পথ ধরে। আমি উঠলাম না। কেমন যেন অবাক হয়ে গেলাম। ভাবতে লাগলাম ওর এই গায়ে পড়ে আলাপ করার এবং বিনা কারণে ঝগড়া করার মানেটা কি?

এই হল প্রথম শিক্ষা জীবনের। নিষ্ঠুর শিক্ষা এটা চোদ্দ বছর বয়সে।

তখন ম্যাট্রিকুলেশন দিয়েছি। বছর ষোল বয়স। একটু একটু কবিতা লিখি, ছবি আঁকি, গান গাই। শুভার্থীরা বলেন জিনীয়াস। তা শুনে বেমাকে অহঙ্কার দেখি।

তাকে দুটো কবিতা পাঠিয়েছিলাম কলকাতার এক নাম-করা মাসিক পত্রে। তা ছাপা হয়েছে এবং সম্পাদক এক খানা চিঠিতে খুব প্রশংসা করে অনেক কথা লিখেছেন, লিখেছেন আরো কবিতা পাঠাতে। বন্ধু মহলে তাই পসারের অন্ত নেই। সবাই বাড়ী নিয়ে যায়। কেউ চা খাওয়ায়, কেউ ঘটা করে দাদাদের বৌদিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় কেউ একসঙ্গে ছবি তোলায়। সে এক অদ্ভুত উদ্দীপনা!

এক ডেপুটি পুত্র সহপাঠী, ধরুন তার নাম সুশীল, একদিন বলল, আমার বড়দি কবিতা লেখে, তোকে শোনাতে চায়। যাবি একদিন? ভাল হলে তোর ঐ সম্পাদকের কাছে ছাপিয়ে দিবি? বড়দিও কিন্তু বেশ লেখে!

গেলাম। একে মফঃস্বলে ডেপুটির কন্যা, তাতে আই-এ পড়ে. তার ওপর সহপাঠীর দিদি। গিয়েছিলাম বেশ একটু সমীহের ভাব নিয়ে, এত বুঝতেই পারছেন।

দেখলাম বড়দির বয়স বছর উনিশ হবে। রংটি শ্যাম বর্ণ, মুখ চোখ বেশ কমনীয়, চল চলে, চলন বলনও বেশ সুঠাম। চোখে এক জোড়া সোনার চশমা লাগিয়ে চরকা ঘোরাচ্ছিলেন। আমরা যেতেই উঠে দাঁড়িয়ে হাসলেন। অপরূপ হাসি। এক ঝলক আলো ঠিকরে পড়ল যেন বারান্দায়।

প্রথম দৃষ্টিতেই বুকের ভেতরটা আনচান করে উঠল। এ আনচানি কেন, কিসের, তা জানতাম না। তবু ভাল লাগল।

বড়দির কবিতা কিছুই না। মিনি বেড়াল মাছ চুরি করে খেয়েছে, তারি ওপর অগোছাল গদ্যপদ্যের একটি আবোল তাবোল, নয়ত ছোট বোন কৃষ্ণার জন্মদিন নিয়ে ঘটিহীন মিলহীন পয়ারের একটি প্রলাপ। এমনি যারা ছাইভস্ম মুক্তোর মত সুন্দর অক্ষরে পরের পর তারিখ দিয়ে টুকে রেখেছেন তিনি চামড়ায় বাঁধানো মোটা একখানা খাতায়।

আমার কবিতা নামী মাসিকপত্রে ছাপা হয়েছে। তার

P29421

ওপর সম্পাদক সুখ্যাতি করে চিঠি দিয়েছেন। আমার কি আর এসব কবিতা বরদাস্ত হয়? তবু ভদ্রতা করে বললাম, বেশ হয়েছে। সন্দেশে পাঠালে হয়ত ছাপাবে।

কেন বঙ্গবাণীতে নয়ত মানসীতে?

ওসব বড়দের কাগজ। এ লেখাগুলো হয়েছে ছোটদের মত। এ ওরা নেবে না।

বড়দের কবিতা আবার কি রকম হয়।

এই স্বদেশী কবিতা, প্রেমের কবিতা, সুখ দুঃখের কবিতা যা বেরয় সব কাগজে।

এই হল প্রথম পরিচয়। ক্রমে আলাপ ঘনিষ্ঠ হল। শেষে প্রতিদিনই দুপুরে চলতে লাগল বড়দির সঙ্গে কাব্য চর্চা কাব্যের কিবা বুঝি তখন। তবু ওরি মধ্যে আউড়ে যাই শেলী কীটস রবীন্দ্রনাথ। কবিয়ানায় অকালপক্কতা কম ছিল না আমার। বড়দি থ হয়ে শোনে। এক একদিন বলে, সত্যিই তুমি একটা জিনীয়াস। দেখ তুমি বিখ্যাত লেখক হবে।

ঐ বয়সে মুগ্ধ ভক্তীর প্রশংসায় মাথা ঘুরে যায় না, এমন মাথা আর যারই থাক আমার ছিল না। সুশীলের বন্ধু হলেও ক্রমে আমি সুশীলের চেয়ে বড়দিরই বেশ অনুরাগী হয়ে পড়লাম। হরদম নূতন নূতন কবিতা লিখে শোনাতাম তাকে। রোজ লিখতাম, রোজ শোনাতাম।

বেশীর ভাগই প্রেমের কবিতা, কাঁচা বয়সের আকুলতায় উৎসারিত অবোধ উচ্ছ্বাসের অভিব্যক্তি। কি ছিল তাতে জানি না। কিন্তু বড়দি তার ফলেই নিজে লেখা ছেড়ে দিয়ে হল আমার কবিতার সমঝদার।

প্রত্যেক কবিতার পাণ্ডুলিপি সে নিজে নিত। তার বদলে আমাকে দিত তার সুক্ষাক্ষরে নকল করা এক একটি খসড়া। বড়দির সেই কবিতার নকল মহাকালের সম্মার্জনীর মুখে কোথায় উড়ে গেছে। আমার পাণ্ডুলিপির কি হয়েছে জানি না। কারণ বড়দি যে আজ কোথায়, এ জীবনে তা আর জানার সুযোগ হয় নি।

একদিন বড়দি আমাকে বলল, আচ্ছা সুশীল ও আমাকে তুমি বলে, তুমি আপনি বল কেন? আমার ভীষণ দুঃখ হয়। তখন থেকে বড়দি হল তুমি। তারপর আর একদিন অত্যন্ত আকস্মিক ভাবেই বড়দি বলল, জান আমার বিয়ের ঠিক হচ্ছে।

কেন জানি না শোনা মাত্র মুষড়ে গেল মনটা। একটিও কথা কইতে পারলাম না। বড়দি লক্ষ্য করল সেটা। ফিক করে হেসে বলল, দূর আমি বিয়ে করব না। আমি কখনো বিয়ে করতে পারি?

আহম্মকের মত মুখ করে বললাম, কেন সবাই ত করে মেয়েরা।

বড়দি চোরের মত এদিক ওদিক তাকিয়ে খপ করে আমার ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকিয়ে একটা চুমো খেয়ে বলল, আমি তোমাকে ভালবাসি। তুমি আমার লাভার, আমার কবি মিরিমণি!

সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। ঢিপ ঢিপ করতে লাগল বুকটা। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, না, না, এ ভাল নয়, এ ভারী বিশ্রী বড়দি। ছিঃ এ রকম করলে কেন তুমি?

সঙ্গে সঙ্গে রান্নাঘর থেকে বড়দি মার হাঁক এল, আন-না শুনে যা শীগ্রী।

এক দৌড়ে রান্তায় নেমে পড়লাম এবং সেখানেই হল ধ্বনিকা পতন। সতের বছরের গোড়ায় সেই উন্মাদকরা অনুভূতি মন্দ লেগেছিল কি? মিথ্যে কথা বলব কি জন্যে? ভুলতে পারি নি জিনিষটা অনেক দিন!

এই হল বাস্তব শিক্ষার সুনঘর।

* * *

কলেজে ঢুকেছি। ঘটনা চক্রেই এসে পড়লাম রাজনীতিক সন্ত্রাসবাদীদের দলে এবং নিজের প্রয়োজনেই কতকটা পর্যন্ত জড়িয়ে পড়লাম তার কার্যকলাপের সঙ্গে। ম্যাট্রিকের পর বাড়ী থেকে আর পড়াতে চাওয়া হল না আমাকে। বলা হল চাকরী বাকরি করে সংসারে সহায়তা করতে।

কিন্তু আমার মনে অন্তর্ভেদী উচ্চাশা। কাজেই কাউকে, কিছু না জানিয়ে ভোর রাত্রে হঠাৎ একদিন হাঁটা পথে আঠার মাইল পাড়ি দিয়ে জেলা শহরে পালিয়ে এলাম। এই সময় রিক্ত নিঃসম্বল বালক আমি সবচেয়ে বেশী সাহায্য ও সহযোগিতা পেলাম যাদের কাছে, তাঁরা সবাই বাইরে ব্যায়াম করতেন, গীতা পড়তেন, আর ভিতরে ভিতরে বন্দুক

পিস্তলে হাত মক্স করতেন, সরকারের প্রতিভূস্থানীয় সাহেবদের নিকেশ করার ফন্দী আঁটতেন।

তাদের চেষ্টায় লেখাপড়ার ব্যবস্থা হল, খাওয়া থাকার আস্তানা মিলল, কিন্তু নাম লেখাতে হল দলের খাতায়। রক্ত দিয়ে পড়তে হল তিনপ্রস্থ হলফ :—জীবনে বিয়ে করব না, কোন অবস্থায় কোন গোপন তথ্য প্রকাশ করব না, প্রয়োজনে প্রাণ দিতে এবং নিতে কুণ্ঠিত হব না। কিবা বুঝতাম তখন? দেশ কি, জাতি কি, স্বাধীনতার লক্ষ্য কি, সবই ছিল অস্বচ্ছ। শুধু এইটুকু জানতাম যে ইংরেজ মারতে হবে এবং শাসন ক্ষমতা দেশবাসীর হাতে আনতে হবে। আর তা করতে হলে চাই লোক বল, অর্থবল, বাহুবল, অতএব একদিকে করতে হবে শক্তি চর্চা, অন্যদিকে করতে হবে ধনীর ঘরে ডাকাতি। সেই সঙ্গেই করতে হবে জ্ঞানের সাধনা, চরিত্রের অনুশীলন।

দাদারা এই কথা শেখালেন, নাবালক চেলা আমরা শিখলাম তাই। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন, ধরুন তাঁর নাম মুরারিদা। তিনি বিবাহিত, যদিও গৃহ পালন বিদ্রোহী বন্দুকে ওস্তাদ ছিলেন, আর চমৎকার বোমা ও বুলেট বানাতে পারতেন। ত্রিশ একত্রিশের মৌকায় যে চারটি রাজনীতিক হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, তা হয়েছিল এঁরই সাগরেদদের মৌলতে।

হঠাৎ এঁর কঠিন অন্ত্রের পীড়া হল এবং দল থেকে বেরিয়ে শহরের উপকণ্ঠে কেওড়া পল্লীতে একখানা পরিত্যক্ত ঘরে আশ্রয় নিয়ে তিনি মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওঁর নেই, বন্ধু নেই, চিকিৎসা নেই, যেনেতনে তিল তিল করে সমাপ্তির প্রতীক্ষা...সে কি ভয়ানক!

মুরারীদা কিন্তু একটুও বিচলিত হতেন না। ঐ অবস্থাতেও তিনি দিতেন সলা পরামর্শ, বাৎলাতেন নানা প্ল্যান ও পরিকল্পনা। মাঝে মাঝে যেতে হত আমাকে এখানে দলের হুকুমে। খবরাখবর আনতে, নগদ টাকা পয়সা দিয়ে আসতে। যেতে কত যে কষ্ট হত তা বলে বোঝাতে পারি না।

এক দিন গিয়ে দেখলাম ঈষৎ কৃশা একটি মহিলা বসে আছেন ভাঙ্গর ঘরে, আর মুরারীদা হড় হড় করে রক্তবমি করছেন। একটু সুস্থ হয়ে বললেন, আর বেশী দিন তোদের ভোগাব না রে। হয়ে এসেছে। তারপর বললেন একে চিনিস? তোদের বৌদি।

তখন আর কুশল প্রশ্ন করার মত মনের অবস্থা নেই। কান্না পাচ্ছে। এরই মধ্যে দেখলাম বৌদি বেশ সুন্দরী। উজ্জ্বল বুদ্ধিদীপ্ত দুটি চোখ, মুখখানিও মিষ্টি। চেহারাটা একটু লম্বার দিকে।

ভারী কষ্ট হল তাঁর কথা ভেবে। বুঝলাম সেদ সময় বুকেই মুরারীদা তাঁকে আনিয়েছেন বাপের বাড়ী থেকে।

কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রি আন্দাজ নটায় বেরিয়ে আসছি পাঁচটা টাকা দিয়ে মুরারীদার বালা থেকে, দরজার পাশে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বৌদি ডাকলেন। ফিরে তাকাতে বললেন, একটু বিষ এনে দিতে পারেন আমাকে? খুব তেজী বিষ, দিন না দয়া করে।

মনে হল শোকে অধীরা হয়েছেন মহিলা। চাইছেন আত্মহত্যা করে জ্বালা জুড়াতে! বললাম, কাতর হবেন না বৌদি। কি করবেন বলুন।

বৌদি করুণ হাসি হেসে বললেন, ওঁকে শান্তি দিতে চাই যে কষ্ট পাচ্ছেন তা চোখে দেখা যায় না। বলতে বলতে হাত দুটো চেপে ধরলেন আমার। উত্তপ্ত দুটি হাত কাঁপছে তাঁর ঠক ঠক করে। চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। অন্ধকার রাত্রে নির্জন কেওড়া বস্তীর একটেরে বৌদির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল! তাড়াতাড়ি পথে নেমে পড়লাম।

দুদিন পরে সকালের দিকে মৃত্যু হল মুরারিদার। আমার ওপর হুকুম হল সে রাত্রে বৌদিকে পাহারা দিতে হবে। কেমন যেন বুক দুর দুর করতে লাগল। কি করব? কি বলব? কি বলে সান্ত্বনা দোব সেই সদ্য স্বামীহীনা হত ভাগিনীকে?

ভয়ে ভয়ে এলাম। কেওড়া পল্লীর একটি বৃদ্ধা বসেছিল। আমি আসতেই উঠে গেল সে। গলা খাঁকারি দিয়ে নিজের উপস্থিতিটা জানিয়ে দিলাম বৌদিকে, তারপর শূন্য রোয়াকে এসে বসলাম চুপ করে।

কোন কান্না কাটি নেই। লণ্ঠন জ্বালিয়ে বৌদি জিনিষ

পত্র বাবাছাদা করছেন। পরের দিন দুপুরে বাপের বাড়ী যাবেন, তারই আয়োজন করছেন আর কি। একটু অবাকই লাগল।

মিনিট কুড়ি পরে বৌদি এলেন এবং বসলেন আমার গায়ে প্রায় হেলান দিয়ে। বললেন, কাল আমি চলে যাচ্ছি আপনি যাবেন আমার সঙ্গে? চলুন না।

আমি বললাম, আমি কলেজে পড়ি। তাছাড়া পার্টির হুকুম না হলে ত যেতে পারব না।

বৌদি বললেন, আমি যদি হুকুম করি। বলেই ডান হাতটা চেপে ধরলেন আমার। বললেন, না, যেতেই হবে তোমাকে। এমন মিষ্টি চেহারা তোমার, ঐ খুনের ব্যবসায় নষ্ট করতে দেবো না আমি।

ভয়ে আঁৎকে উঠলাম আমি। শোকে দুঃখে মহিলা কি পাগল হয়ে গেলেন? চুপ না হলে কি বলছেন তিনি এসব?

হঠাৎ লিকলিকে ন্যাড়া দুখানি হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরলেন তিনি আমাকে এবং কাঁপা গলায় বললেন, বিমলী না কাঁচ বলা! ভীরু ভেড়া কোথাকার!

এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম এবং আর পিছনে না তাকিয়ে সোজা রওনা দিলাম আস্তানা মুখে।

এই হল তৃতীয় শিক্ষা এবং চরম শিক্ষা এটা।

"শিউলি ফুল, শিউলি ফুল, কেমন ভুল, এমন ভুল।
রাতের বায় কোন্ মায়ায় আনিল হায় বনছায়ায়,
ভোরবেলায় বারে বারেই কিরিবারে হলি ব্যাকুল।
কেনরে তুই উন্মনা, নয়নে তোর হিমকণা।
কোন ভাষায় চাস্ বিদায়, গন্ধ তোর কী জানায়—
সঙ্গে হায় পলে পলেই দলে দলে যায় বকুল।"

—রবীন্দ্রনাথ

'সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলি

অথবা

প্রশ্নের আড়ালে

—দক্ষিণা রঞ্জন বসু

সত্য প্রকাশই আমাদের কাজ। আমাদের অর্থাৎ সাংবাদিকদের। কিন্তু সে স্বাধীনতা যখন থাকে না তখন উপায় ?

উপায় কিছু না কিছু একটা বার করে নিতেই হয়। তা না হলে সাংবাদিকতা করা চলে না। সংবাদপত্র মিথ্যা হয়ে যায়।

তেমনি একটা সঙ্কটের মুখোমুখি আমাদের হতে হয়েছিল স্বাধীনতা লাভের আগের বছরে। অর্থাৎ তথাকথিত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর বছরে।

সহসা সাংবাদিকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলেন প্রাদেশিক লীগ সরকার। এক অভিন্যান্স জারী করে সত্য প্রকাশের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হলো। আমাদের ওপর এমনভাবে বাধানিষেধ আরোপিত হলো যাতে করে আমরা সত্য সংবাদ প্রকাশ করে মুস্লিমলীগ সরকারের মুখোস উন্মোচন করে না দিতে পারি এবং হাটে হাড়ি ভেঙে দিয়ে তাদের কুৎসিত কার্যকলাপের পরিকল্পনা বানচাল করে দেওয়া আমাদের পক্ষে যাতে সম্ভব না হয়।

কিন্তু এ অবস্থা কি আমরা মেনে নিতে পারি? পারি না। অথচ সরাসরি সরকারী নির্দেশ অমান্য করার ঝুঁকি নিতে যাওয়াও সে সময়ে খুব সহজ ছিল না। তখনো বিদেশী শাসনাধীনে ভারত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম বিজয়ী শাসক ইংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মুস্লিমলীগ তখন দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তিকে নষ্ট করার জন্যে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ। কংগ্রেসের ভুলে লীগ সরকার কায়েম হয়েছে বাঙলায়। জাঁদরেল শহীদ সোহরাবর্দী তখন বাঙালীর দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা—বাঙলার প্রধানমন্ত্রী (তখনো মুখ্যমন্ত্রী পদটি আবিষ্কৃতই হয়নি)! তার ওপরে বৃটিশ রাজ-প্রতিনিধি গভর্ণর স্যার ফ্রেডারিক বারোজ রয়েছেন মাথায়।

শুধু প্রধানমন্ত্রী নন, সোহরাবর্দী সাহেব মুস্লীমলীগ ঘোষিত তথাকথিত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর প্রধান সেনাপতিও।

যুদ্ধে সাফল্য অর্জনের জন্যে সবযুগে সর্বদেশেই নানা বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সতর্কতা ও কড়াকড়ি জনসাধারণকে বিব্রতবোধ করে তোলে।

পাকিস্তান পয়দার জন্যে আয়োজিত সেই কুখ্যাত 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর প্রাক্কালেও ঠিক তেমনি অবস্থা দেখা দিয়েছিল বাঙলায়। একটা ঘোরতর আতঙ্ক তখন অন্ধকারের ছায়া বিস্তার করছিল গোটা বাঙলা জুড়ে।

ঠিক সেই সময়েই নির্ধারিত পরিকল্পনা মতো সত্যের আলোক-বর্তিকাটি নিভিয়ে দেওয়া হলো যাতে গভীর অন্ধকারের আড়ালে মুস্লিমলীগ, লীগ সরকার এবং লীগ-পন্থীরা মানবতার ওপর যথেচ্ছ অপরাধ অনুষ্ঠান নির্বিবাদে করে যেতে পারে এবং তার কোনো খবরই যাতে প্রকাশ হয়ে পড়ার সুযোগ না পায়।

বাস্তবিকই নিখুঁত ব্যবস্থা। সংগ্রামের নামে জঘন্যতম অপরাধ অনুষ্ঠানের জন্য সুনিপুণ হাতে সেদিন যে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করা হয়েছিল এদেশের ইতিহাসে বোধহয় তার সমতুল দৃষ্টান্ত দ্বিতীয়টি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আর সেই ষড়যন্ত্রের কর্মসূচীর মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ওপর। সংবাদ প্রকাশের ক্ষেত্রে এবং সম্পাদকীয় মন্তব্য রচনার ওপর বাধানিষেধের এমন বেড়াজাল এরূপ নৈপুণ্যের সঙ্গে সৃষ্টি করা হয়েছিল যার ফলে সে সময়ে প্রকৃত সাংবাদিকতার কাজ করা সাংবাদিকদের পক্ষে এক দুরূহ সমস্যা হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু সেই চূড়ান্ত সংকটকালেও বাঙলার সাংবাদিকতার আদর্শ এবং গৌরবময় ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার যে চেষ্টা আমরা করেছিলাম গর্বের সঙ্গেই তা স্মরণ করা চলে।

তখন ছোটবড়ো প্রত্যেকটি সংবাদপত্রের অফিসেই মূল একমাত্র চিন্তা, কী করে লীগ সরকারের কঠোর নিষেধাজ্ঞার ব্যূহ ভেদ করে দেশবাসীর কাছে সত্য খবর পরিবেশন করা যাবে!

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কার বিধিনিষেধের মধ্যে কয়েক বছর ধরে কাজ করে নিয়মের বেড়াজাল ডিঙিয়ে যথাসম্ভব সত্য সংবাদ পরিবেষণের কৌশল আমরা আয়ত্ত করেছিলাম। বাঙলায় লীগ সরকার পরিচালিত ও মুস্লিমলীগ ঘোষিত প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনগুলিতে আমাদের সেই অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছিল।

সে প্রসঙ্গ বিশ্লেষণের আগে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর পটভূমিকাটা সংক্ষেপে তুলে ধরা দরকার।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে ধীরে ধীরে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে, এই নীতি ঘোষণার পর ক্রিপস মিশন যে ফর্মুলা নিয়ে আসে ভারতীয় নেতৃবর্গ তা প্রত্যাখ্যান করলে ভারত সচিব স্যার পেথিক লরেন্স-এর নেতৃত্বে ক্যাবিনেট মিশনকে ভারতে পাঠানো হয় ভারতের সঙ্গে একটা মীমাংসায় উপনীত হবার জন্যে। ক্যাবিনেট মিশনের পক্ষ থেকে যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেস তা গ্রহণ করে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে রাজী হলে কি হবে মুস্লিমলীগ হয়তো সেই কারণেই ঐ পরিকল্পনার বিরোধিতায় নেমে পড়লো।

বম্বে শহরে ১৯৪৬-এর ৩০ জুলাই থেকে তিনদিনব্যাপী সুদীর্ঘ আলোচনার পর ক্যাবিনেট মিশনের পরিকল্পনা মুস্লিমলীগ কাউন্সিল প্রত্যাখ্যান করে। আরেকটি প্রস্তাবে পাকিস্তান লাভের জন্যে সারাদেশে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খেতাবধারী মুসলমানদের খেতাব ত্যাগেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কাউন্সিল থেকে।

মুস্লিমলীগ কাউন্সিল এভাবে ক্যাবিনেট মিশনের দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করায় কংগ্রেস নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বিস্ময় ও দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এসবে টলবার পাত্র নন লীগ-নায়ক জিন্না। তিনি অনড়—পাকিস্তান তাঁর চাই-ই, সেই জন্যেই 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর দিনও স্থির হয়ে গেল ১৬ই আগষ্ট!

সেই থেকেই স্লোগান শোনা যেতে লাগল, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান! হাসকে তকদির! পাকিস্থান মেঙ্গে-ইজির রূপ বুঝা গেল।

কলকাতায় একটা বড়ো রকমের গোলমাল হতে চলেছে এ সন্দেহ তখন প্রায় সবারই মনে। ১৫ আগষ্ট তারিখে ষড়যন্ত্রের স্বরূপটা স্পষ্ট হয়ে গেল। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর দিনকে সরকারী ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করায় চারদিকে প্রশ্ন উঠলো, যাদের সঙ্গে এ সংগ্রামের কোনো সম্পর্ক নেই প্রদেশের সেই অমুসলমান অধিবাসীদের ওপর এ হরতাল কেন অযথা চাপিয়ে দেওয়া হলো? কেন ব্যাঙ্ক ও সওদাগরী অফিসগুলি অকারণে বন্ধ থাকবে?

এ নিয়ে ব্যবস্থাপক সভায় ১৫ আগষ্ট তারিখে এক মুলতবী প্রস্তাব তুললেন হিন্দু মহাসভা দলের সদস্য হরিদাস মজুমদার আর তার জোর সমর্থন এলো কংগ্রেস পক্ষ থেকে। সে অবস্থায় মুস্লিমলীগের হামিদুল হক চৌধুরী প্রথমে বললেন, মিঃ জিন্না প্রমুখ লীগ নায়কেরা জানিয়ে দিয়েছেন যে, হিন্দুদলকে যেন এ হরতাল পালনে বাধ্য করা না হয়। কংগ্রেসেরই এখন শান্তি-রক্ষায় উদ্যোগী হওয়া উচিত। একজন অতি সজ্জন ও শান্তিপ্রিয় লোকের ভঙ্গিমায় যে ভাবে ও যে ভাষায় প্রধানমন্ত্রী সোহরাবর্দী সেদিন সমালোচনার উত্তর দিয়েছিলেন ধূর্ততার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হিসাবে তা' স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তিনি বলেছিলেন, বিরোধের আশঙ্কা লাঘব করার উদ্দেশ্যে এবং শান্তি ও শৃঙ্খলার খাতিরেই ১৬ই আগষ্টকে গভর্ণমেণ্ট সরকারী ছুটির দিন হিসাবে ঘোষণা করেছেন।

সোহরাবর্দী সাহেবের কথা যে কতো ভুয়া পরদিন প্রভাতেই তা' প্রতীয়মান হলো। মানিকতলা অঞ্চলের এক মিঠাইওয়ালার দোকানের ওপর আক্রমণ ও লুণ্ঠন দিয়ে যে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরু হলো দিনের শেষে দেখা গেল গোটা মহানগরী রক্তস্নাত, মহানগরী জ্বলছে। রাত ৯টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত কার্ফুজারী করা হলো—এ সময়ের

মধ্যে বাইরে বেরোনো নিষেধ!' এমনকি দুর্বৃত্ত প্রতিরোধেও ঘরের বার হওয়া চলবে না। ঘরে থেকে বাইরের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা দেখা এবং কান্নাস্বরনি ও 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ও 'নারায়ে তকদির' প্রভৃতি ভীতিজনক শ্লোগান শোনাই ছিল নিরীহ নাগরিকদের ললাট লিপি!

'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শুরুর দিন থেকেই টেলিফোন বন্ধ, তার-তার বন্ধ, যানবাহন বন্ধ এবং বাইরের সঙ্গে কলকাতা একরকম বিচ্ছিন্ন। পরদিন অর্থাৎ সতেরো তারিখ থেকে শহরে সংবাদপত্র বিলি-বন্টনও দুরূহ হয়ে উঠলো।

এই পরিবেশের মধ্যেও ১৭ আগস্টের যুগান্তর পত্রিকায় 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' শীর্ষক একমাত্র সূত্রে সম্পাদকীয় নিবন্ধের উপসংহারে নির্ভীকভাবেই বলা হলো···'কলকাতায় গতকল্য যে অবাধ গুণ্ডা-রাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার পশ্চাতে অবশ্যই এমন কোনো প্রশ্রয়দাতা আছেন যাহার জন্য কলিকাতার ন্যায় মহানগরীতে এই নিষ্ঠুর নির্মম হত্যালীলা সম্ভব হইতে পারিয়াছে। আইন ও শৃঙ্খলামন্ত্রী সুরাবর্দী সাহেব যখন অসামরিক সরবরাহ বিভাগের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন তখন বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। আজ আবার তিনি যখন আইন ও শৃঙ্খলার ভার গ্রহণ করিয়াছেন তখন কলিকাতা শহরে বিশৃঙ্খলার তাণ্ডব শুরু হইয়াছে। আমরা জানিনা ইহার পরিণতি কোথায়?'

দ্বিতীয় দিন সকালবেলাতেও অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি, স্বয়ং গভর্ণর তার স্বাভাবিক বারোজ এক বিবৃতিতে একথা স্বীকার করেছেন। বরং অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাচ্ছিল বলেই ঐ দিন সকালেই ১৪৪ ধারা জারী করা হয়েছিল।

লীগপন্থীদের অতর্কিত আক্রমণে প্রথম দিন বিপর্যস্ত হয়ে নিরীহ নাগরিকগণ মহল্লায় মহল্লায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আক্রমণ প্রতিরোধে রুখে দাঁড়ালে উত্তর কলকাতায় সকালে সৈন্য নামিয়ে অবস্থা আয়ত্বে আনতে হয় এবং বিকেলে সারা শহরেই বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যরা টহল দিতে আরম্ভ করে। তা'হলেও যেহেতু ঐদিন লীগপন্থী ও লীগবিরোধী উভয় পক্ষই প্রস্তুত হয়ে ধ্বংসলীলায় মেতে উঠেছিল তাই হতাহতের সংখ্যাও যেমন সেদিন বেড়ে গিয়েছিল, গৃহদাহের ঘটনাও ঘটেছিল অনেক বেশি। প্রায় আড়াইশ' জায়গায় দমকলকে ছুটতে হয়েছিল আগুন নেভাতে।

এই নিদারুণ ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যেও বিভিন্ন সংবাদ পত্রের রিপোর্টাররা নিঃশঙ্কচিত্তে তাঁদের কর্তব্য পালন করে চলেছেন দিনের পর দিন। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নিষেধাজ্ঞা বাঁচিয়ে যতদূর সম্ভব সে সব নৃশংসতার খবর প্রকাশিতও হয়েছে। কিন্তু তার বাইরেও অনেক সংবাদ বিভিন্ন খবরের কাগজের অফিসে এসে পৌঁছেছে যেগুলি সেই অন্ধকার দিনগুলিতে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। অথচ যেসব সংবাদ সাধারণের কাছে পরিবেশন না করা পর্যন্ত আমরা স্বস্তি পাচ্ছিলাম না।

এমনি পরিবেশে আমার মনে হলো, সরাসরি যেসব খবর আমরা প্রকাশ করতে পারবো না সেগুলো অনায়াসেই আমার প্রশ্নের আড়ালে থেকে সকলকে জানিয়ে দিতে পারি।

চিন্তায় হাতড়াতে হাতড়াতে এই নিরাপদ উপায়ের কথা মাথায় আসতেই যুগান্তরে আমরা 'জবাব দিবেন কি?' এবং 'ইহা কি সত্য?' ইত্যাদি প্রশ্ন তুলে অনেক গুপ্ত তথ্যই ফাঁস করে দিতে লাগলাম। সরকারের পক্ষ থেকে এর কোনো প্রশ্নেরই জবাব দেওয়ার উপায় ছিল না এবং সত্যকে মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেওয়ার মতো সাহসও ছিল না।

সংগৃহীত নানা ঘারাত্মক তথ্যকে আমরা কীভাবে সেই অতিশপ্ত আগষ্ট মাসে প্রশ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করে দিয়েছিলাম এবার তারই কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে দেওয়া যেতে পারে।

'ইহা কি সত্য?' পর্যায়ে যে সমস্ত প্রশ্ন যুগান্তরে তোলা হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করছি:

১। 'এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, প্রধানমন্ত্রী মিঃ সুরাবর্দী (তখন এ বানানই লেখা হতো) বর্তমান পরিস্থিতিতে শিখদের হাতে কৃপাণ থাকা বিপজ্জনক বিবেচনায় শিখদের নিকট হইতে ঐসব কৃপাণ সরাইয়া লইবার জন্য পুলিশ কমিশনারকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু এরূপ করা হইলে পরিস্থিতি আরও খারাপ হইবে

বলিয়া পুলিশ কমিশনার নাকি প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশে সায় দিতে পারেন নাই। ইহা কি সত্য ?"

২। 'এইরূপ প্রকাশ, গত ৬ই আগষ্ট হইতে ১০ই আগষ্টের মধ্যে লীগপন্থী মুসলমান পরিচালিত কলিকাতার অনেকগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান স্থানীয় একটি লীগপন্থী ইন্সিওরেন্স কোম্পানীতে 'অগ্নিবীমা' ও 'মালা-বীমা' করে এবং পরে ঐ সমস্ত পলিসি অল্প কয়েকটি বীমা কোম্পানীতে 'রি-ইন্সিওরেন্স' করা হয়। ইহা কি সত্য ?'

৩। 'তিলজলার সরকারী রেশন চাউলের মস্ত এক গুদাম রহিয়াছে। বিশেষ এক সূত্রে খবর পাওয়া গিয়াছে যে লীগের 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবসের দুই-এক দিন পূর্বে বিশেষ সম্মানজনক আসনের অধিকারী জনৈক লীগ পাণ্ডা নিজের লোকজন দিয়া বলপূর্বক উক্ত গুদাম খুলিয়া অনেক চাউল বাহির করিয়া নিয়াছেন এবং বহির্গত গুণ্ডাদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। ইহা কি সত্য ?

৪। 'এইরূপ জানা গিয়াছে যে, বাঙলার মুস্লিম লীগের দুইজন মোড়ল স্থানীয় ব্যক্তি ইতিমধ্যে একদিন আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট থানায় যাইয়া মৌলভী নৌশের আলীকে এই বলিয়া শাসাইয়া দিয়াছেন যে, মৌলভী ফজলুল হক অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করিবেন না বলিয়া তাহাদের কথা দিয়াছেন। সুতরাং তিনিও যেন অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানে অনিচ্ছুক হইলে তাহা প্রত্যাখান করেন। এতদপ্রসঙ্গে লীগ মোড়লদ্বয় নাকি নৌশের আলি সাহেবকে বর্তমানে তাঁহার বৈঠকখানার বাড়ীতে যাইতেও নিষেধ করিয়া দিয়াছেন। ইহা কি সত্য ?

এসব প্রশ্নের কোনো উত্তরই দেননি লীগ সরকার বা প্রাদেশিক মুস্লিমলীগ প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা কাজেই ধরেই নেওয়া যায় 'ইহা কি সত্য ?' পর্যায়ে প্রকাশিত প্রত্যেকটি প্রশ্নমূলক সংবাদই ছিল সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত খবর।

ঠিক একই ভাবে এও প্রমাণিত হয়েছে যে, 'জবাব দিবেন কি ?' পর্যায়ের খবরগুলিরও প্রত্যেকটিই ছিল সত্য-ভিত্তিক কোনো রকমেই যা অস্বীকার করার উপায় ছিল না। তাই কারো কাছ থেকেই সে প্রশ্নের কোনো জবাব পাওয়া যায় নি।

তেমনি 'জবাব দিবেন কি ?' পর্যায়ের দুটি নমুনা নীচে উদ্ধৃত করা গেল :

মিঃ কবীর চৌধুরী জবাব দিবেন কি ?

মানিকতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী মিঃ কবীর চৌধুরী জবাব দিবেন কি ?

(১) ১৬ই, ১৭ই ও ১৮ই আগষ্ট তারিখে তিনি ও তাঁহার পুলিশ দল চক্ষের সম্মুখে মুসলমানের গুণ্ডামী করিতে দেখিয়াও নিষ্ক্রিয় ছিলেন কিনা এবং থাকিলে তাঁহার এরূপ আচরণের কারণ কি ?

(২) মানিকতলার হিন্দুগণ তাঁহাদের ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলে তিনি তাঁহাদিগকে সরাসরি প্রত্যাখান করিয়াছিলেন কিনা, করিয়া থাকিলে তাহার কারণ কি ?

(৩) হিন্দুর ধনসম্পত্তি লুঠতরাজ সম্পর্কে থানায় ডায়েরী করিতে গেলে তিনি তাহাতে আপত্তি করিয়াছিলেন কিনা—করিয়া থাকিলে, কেন ?

(৪) লুঠের মাল কোথায় আছে খোঁজখবর দিলেও তিনি সেগুলি উদ্ধারের কোন চেষ্টা করেন নাই, ইহা কি সত্য ? সত্য হইয়া থাকিলে তাঁহার এইরূপ মনোভাবের কারণ কি ?

(৫) মানিকতলার অধিবাসী জনৈক বিশিষ্ট সাংবাদিক তাঁহাকে রাস্তায় সশস্ত্র জনতা দেখাইয়া তাহাদিগকে গ্রেপ্তার বা নিরস্ত্র করিতে বলিলেও তিনি তাহা উপেক্ষা করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন কিনা, করিয়া থাকিলে তাহার কারণ কি ?

এ ছাড়া 'জবাব দিবেন কি ?' পর্যায়ে আরো যেসব চক্রান্তকারীদের মুখোশ উন্মোচন করে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে বটতলা থানার অফিসার-ইন-চার্জ মিঃ খন্দকার ছিলেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ পাওয়া গিয়েছিল তার প্রত্যেকটিই অত্যন্ত গুরুতর। সে

কারণে তার প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর জিজ্ঞাসা কয়টিও এখানে উল্লেখ করছি :

খন্দকার জবাব দিবেন কি ?

(১) ১৬ই ও ১৭ই আগষ্ট পুলিশ কর্তৃক গুলি চালনার সময় কেবলমাত্র মুসলমান পুলিশের হাতে বন্দুক দেওয়া হয়েছিল কিনা। হইয়া থাকিলে, কেন ?

(২) রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে বারবার পুলিশের গাড়ী চলার সময় রাস্তার উপর লাঠি হাতে জমায়েত মুসলমান জনতার উপর গুলী না চালাইয়া, কেবলমাত্র হিন্দু পল্লীর দিকে গুলী চালান হইয়াছিল কিনা, হইয়া থাকিলে কেন ?

(৩) 'অতবার মিঃ খন্দকার রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে গাড়ী চালাইয়া যাইতেছিলেন, ততবার তাঁহার গাড়ীর পিছনে শত শত মুসলমান পাকিস্তানী ধ্বনি সহকারে ছুটিতে থাকিলেও তাহাদের দিকে গুলী না চালাইয়া দূরের হিন্দু জনতার দিকে গুলী চালান হইয়াছিল কিনা, হইয়া থাকিলে কেন ?'

(৪) 'বটতলা থানায় মুসলমান আশ্রয়প্রার্থী ছাড়া হিন্দু আশ্রয়প্রার্থী ছিল কিনা ? হিন্দু আহতদের লরীতে না লইয়া কেবলমাত্র মুসলমান আহতদেরই লরীতে লওয়া হইয়াছিল কিনা, হইয়া থাকিলে কেন ?'

(৫) 'বটতলা থানায় যে সব হিন্দুকে গ্রেপ্তার করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাদের আহার্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল কিনা ? হিন্দু ও মুসলমান পুলিশদের খানার ভিতর সংঘর্ষের কারণ কি উহাই ?'

(৬) 'বটতলা থানায় সামনে রামকৃষ্ণ মিশনে মুসলমানদের আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় মিশনের কর্তৃপক্ষকে হুমকী দেখানো হইয়াছিল কিনা ? হইয়া থাকিলে, কেন ?'

(৭) 'মিঃ খন্দকার যে পুলিশ ভ্যানে করিয়া ঘোরা-ফেরা করিতেছিলেন, তাহার দুই পাশে লীগের পতাকা উড়িতেছিল কি ?'

এমনিভাবেই প্রশ্নের আড়ালে সত্যের বাণে বিদ্ধ করে চলেছিলাম আমরা মুসলিমলীগ ও তার গুণ্ডাবাহীকে। প্রশ্নের পর প্রশ্নেই তারা ঘায়েল হয়েছিল এবং সমস্ত সংবাদ-পত্রই এ পথা গ্রহণ করেছিল।

সে সময়ের কলকাতাবাসীরাই জানেন 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' -এর নামে এই মহানগরীকে তখন কী এক নরকক্ষুণ্ডে পরিণত করা হয়েছিল। সে উপলক্ষে রক্তস্নাত কলকাতার প্রথম চারদিনের হানাহানিতেই পনেরো হাজার নরনারীকে খুন জখম হতে হয়েছিল এবং সম্পত্তি নষ্ট হয়েছিল কোটি কোটি টাকার।

বাঙালী জীবনের চরম দুর্দিনের সূচনা করেছিল ঐ 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' এবং বেদনাদায়ক ঘটনাবলী সম্পর্কে লন্ডনস্থিত কেন্দ্রীয় সরকারের অন্তর্বর্তী সরকারের বাঙালী প্রতিনিধি শ্রীশরৎচন্দ্র বসু যে মর্মস্পর্শী বিবৃতি দিয়েছিলেন তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

বাঙলার তখন কি পরিবেশ ! গোটা প্রদেশে লীগ সরকারের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষমূলক শাসনে ক্লিষ্ট। কংগ্রেসের ভুল নীতি ও ক্লীব নেতৃত্বে নিরাশ প্রগতিশীল বাঙালী সমাজ। মহানগরী কলকাতার পৌরপতিও তখন এক লীগ পাণ্ডা। সেই মেয়র এস. এম. ওসমানের কথা যত কম বলা যায় ততই ভাল। ভ্রাতৃহনন এবং ভ্রাতৃবিরোধে যে ভাবে তিনি 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর সেই অন্ধকার দিনগুলিতে প্রকাশ্যে ইন্ধন যুগিয়েছিলেন তাতে মেয়রের পবিত্র আসনটি চিরকালের জন্যে কলঙ্কচিহ্নিত হয়ে আছে।

'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'কে সফল করার জন্যে বিভিন্ন জেলা থেকে এবং বাঙলার বাইরে থেকেও বহু লোককে আমদানী করা হয়েছিল কলকাতায়। তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছিল আক্রমণে সামিল হওয়ার জন্যে এবং তাদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল মসজিদে মসজিদে এবং লীগ নেতাদের বাড়িতে বাড়িতে। স্বভাবতই মহানগরীর সেইসব হাজার হাজার অতিথিকে আপ্যায়নের ও দেখাশুনার মূল ভার পড়েছিল নগরপাল মেয়র মহোদয়ের ওপর এবং সে কাজ তিনি যে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গেই করেছিলেন সে সময়ের খবরের কাগজগুলিতে তার অনেক প্রমাণই লিপি-বদ্ধ হয়ে আছে।

মিঃ নর্টন জোন্স ছিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার।

কিন্তু তা'হলে কি হবে মুস্লিমলীগের মানস সন্তান জি সি ডি জি মিঃ সোহরাবর্দীর হাতেই প্রকৃত পক্ষে দেওয়া হয়েছিল পুলিশের সর্বময় কর্তৃত্ব।

এ অবস্থায় যা হবার তাই হয়েছে। সারা ভারতেই লীগের আহ্বানে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম' দিবস পালিত হয়েছে। একমাত্র পাটনার সামান্য হাঙ্গামা ছাড়া আর কোথাও থেকে তেমন কোনো হাঙ্গামার খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু সে উপলক্ষে কলকাতায় রক্তগঙ্গা বয়ে গেল। একতরফা মারের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত আর এক তরফা থাকেনি। আমি নিজে দেখেছি যাদের মারবার জন্যে আনা হয়েছিল তাদের হাতেই বাগবাজারের নিকাশীপাড়ার মসজিদে আশ্রিত সশস্ত্র গুণ্ডারা কী নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে। এসব দৃশ্য এবং এসব খবরে সোহরাবর্দীর মত শক্ত মানুষও যে বিচলিত হবেন আশ্চর্যের কিছু নেই। পাহাড় প্রমাণ অভিযোগ জমে উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে। বিলেতের কাগজগুলিতে পর্যন্ত লীগ শাসনের কঠোর সমালোচনা প্রকাশিত হচ্ছিল।

চারদিন ধরে রক্তস্নানের পর কলকাতা একটু শান্ত হলে হিসেহারা প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাবর্দী এক বিবৃতিতে বললেন, 'শান্তি স্থাপিত হলে আমি সমস্ত অভিযোগের জবাব দেবো।' কিন্তু তা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি, বরং পরবর্তী দিনগুলিতে যে গান্ধী শিখ হয়েই তাঁকে আত্ম-রক্ষা করতে হয়েছিল সেকথা সবারই জানা। পরবর্তী কালে মুস্লিমলীগের বিরুদ্ধেই যে তাঁকে সংগ্রামে নামতে হয়েছিল সেও আর অজানা নয়। 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর সেই ভয়ংকর দিনগুলিতে বাঙলার সংগ্রামী ও নিঃস্ব সাংবাদিকরা কীভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তা নিয়ে আলোচনাই এ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

দিনের পর দিন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার রিপোর্টাররা বাধাবিঘ্ন ও ভয়কে উপেক্ষা করে এবং অন্যান্য সাংবাদিক ও অসাংবাদিক কর্মীরা যেভাবে তখন আক্রমণের আতংককে তুচ্ছ জ্ঞান করে সংবাদ সংগ্রহ, সম্পাদনা ও সংবাদপত্র প্রকাশ করে তাঁদের কর্তব্যজ্ঞানের পরিচয় দিয়েছিলেন তা' নিশ্চয়ই দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বাধানিষেধকে অতিক্রম করে সংবাদ প্রকাশের নতুন উপায় উদ্ভাবনও ভবিষ্যৎ সাংবাদিকদের পক্ষে শিক্ষণীয় বিষয়।

নির্ভীক সাংবাদিক শ্রীযুক্ত বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ৩১শে আগস্টের যুগান্তরের মূল সম্পাদকীয় স্তম্ভ থেকে কিছিৎ উদ্ধৃতি দিয়ে এ আলোচনা শেষ করছি।

সেই সম্পাদকীয় নিবন্ধের শুরুতেই বিবেকানন্দবাবু লিখলেন—'মিঃ সুরাবর্দী এখনও প্রধানমন্ত্রী আছেন, তাঁহার পক্ষে ইহা ভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। যেখানে গণতন্ত্র গুণ্ডাতন্ত্রে পরিণত হয়, যেখানে আইন ও শৃঙ্খলা ছোরা ও ভাণ্ডাবাজীর রূপ ধারণ করে, যেখানে নির্দোষ নরনারী গরু-ছাগলের মত কাটা পড়ে এবং একজন বৃটিশ লাট সকলের উপর নিরপেক্ষ দৃষ্টিক্ষি সাজিয়া বসিয়া থাকেন, একমাত্র সেই গবুচন্দ্রের দেশেই এখন হবুচন্দ্র মন্ত্রী সম্ভব।'

এই নিবন্ধের উপসংহারে বলা হয়েছে—'গুণ্ডারাজের জন্য যাহারা দায়ী, নরঘাতনের বীভৎসতায় যাহারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী তাহাদের সহিত সম্পর্কিত কোনো ব্যক্তিকেই বাঙলা-দেশ আর চাহে না। যদি ইহার প্রতিকার না হয় তবে আরো দুর্দিন দেখা দিতে পারে।'

সে দুর্দিন সত্যি সত্যি দেখা দিয়েছিল। এবং সেই আশঙ্কায় আতঙ্কিত হয়েই সেদিনের মেয়র ওসমান সাহেব মহাত্মা গান্ধীর পদপ্রান্তে উপস্থিত হয়ে লীগপন্থীদের প্রাণ ভিক্ষা চেয়েছিলেন এবং এই প্রার্থনা জানিয়েছিলেন দেশ ভাগ হলেও যাতে তারা ভারতে বাস করতে পারে।

দেশ ভাগ হলো, পাকিস্তান পয়দা হলো কিন্তু অদৃষ্টের এমনি পরিহাস, যে বাঙালী মুসলমানরা মুস্লিমলীগের হয়ে হাজার হাজার প্রাণ বলি দিয়ে, লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু হয়ে পূর্ব-বঙ্গে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করলো সেই বাঙালীরাই ত্রিশলক্ষ প্রাণের বিনিময়ে পাকিস্তানকে কবর দিল বাঙলার মাটিতে।

জয় বাঙলা।

দিন বদলায়

—সুতপা চক্রবর্তী

দিন চলেছে—মিছিলের মত দিন একে একে পার হয়ে। ছবি চলেছে, ছ'বির পরে ছবি। কিন্তু দিনগুলির মত ছবির চেহারাও বুঝি এক নয়। একই জীবনে আমরা ফেলে আসা দিনগুলির তাই নতুন নতুন রূপ দেখি। যে দিন ছিল আমাদের শৈশবে, যৌবনের প্রান্তে যেথি কত না বদল তার চেহারায়। যে শৈশবে বড় হবার অদম্য ইচ্ছে পেয়ে বসেছে—বড় হ'তে না পারার দুঃখে কেঁদে নিজের বুক নিজে ভাসিয়েছি কতদিন—রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা-পূরণের সুশীলের মত ইচ্ছাঠাকুরুণকে ডেকেছি প্রাণপণ, সেদিন মনে হ'য়েছে বড় হবার কত না সুখ। স্বাধীনতার স্বর্গ পাব একেবারে হাতের মুঠোয়! কিন্তু হা ঈশ্বর! বড় হবার মাশুলের খবর তখন যদি জানতেন। শৈশব অতিক্রমণের পর থেকে বুঝতে পারছি বয়স বাড়ার দুঃখকে। কেননা, যতই বয়স বেড়েছে, দায়িত্ব, সেই সঙ্গে দুঃখের বোঝাও বেড়েছে তত। আজ প্রায় মধ্যগগনের নীচে দাঁড়িয়ে মিনতি জানাতে ইচ্ছে হয়—এ বোঝা আমার নামও বন্ধু।

কিন্তু অন্য আর একটি দিকও আছে। অতীতে যা ছিল তিক্ত—এখন তার স্বাদ ভিন্ন। দিনগুলি যত দূরের তত সে মধুর, অধরা। তাই ঐ শৈশব এমন কি লম্ব ছেড়ে আসা বহু বিধি নিষেধের গণ্ডীতে ঘেরা তারুণ্যের দিনগুলিও মনে হয় কত উষ্ণ রোমাঞ্চে ভরা! প্রতিটি দিনের বৈশিষ্ট্য স্বতন্ত্র। যেন এ দিনগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন সে এক অন্য রঙা দিনের ছবি—প্রেক্ষাগৃহে দামী সীটে বসে আমরা তার রসাস্বাদন করছি।

এই ভাবেই অবিরাম দিনের আসা যাওয়া চলছে, চলতে থাকবে, কিন্তু দিনকাল দ্রুত বদলে চলেছে এ কথা আদৌ সত্য কি? দিনকাল বদলাবে এতো অতি স্বাভাবিক —যেমন বয়সের চোখের দেখার, দৃষ্টিভঙ্গীর, এবং আসল বদল হয়ত দেখানেই, তবু, দিনকালের বিরুদ্ধেই ওঠে অবিরত অভিযোগ।

মনে পড়ে আজ থেকে বছর কুড়ি আগের দিনগুলিকে। নিজের জীবনের কথাই যদি ধরি। কুড়ি বছর আগে যে মনটিকে লালন করছিলাম সযত্নে—সে ছিল রঙে রসে ভরপুর। পৃথিবী তখন কবিতাময়। সেই কচি চলচলে মন নিয়ে যা কিছু দেখেছি তা-ই অপূর্ব বলে মনে হয়েছে। তারুণ্যে যেহেতু এমনই রসসিক্ত যে, নেহাৎ অপ্রীতিভাজন কারো কারো আচরণ দেখেও তেমন বিরক্তিবোধ দূরে থাক —সব অসঙ্গতিকে সেদিন ক্ষমার চোখে দেখেছি।

তবে যে বয়সের কথা বলছি সে তখন দারুণ যন্ত্রণা-বিদ্ধও। কোন বিষয়ে ইচ্ছানুযায়ী চলার উপায় নেই। তাইনে চলতে চাই অথচ বড়োরা বেই বলেন, 'বাঁয়ে ফেরো' অমনি সে হুকুম মাথায় পেতে বাঁয়েই ফিরে গেছি। মাঝে মাঝে একটু যে অসুবিধা হ'ত না তা নয়—বিশেষ ক'রে নিষিদ্ধ উপন্যাস পড়বার বেলা। বড়োরা হয়ত বলেন—'এ বই তোমাদের নয়—অতএব ধরবেনা,' অমনি অবাধ্য ইচ্ছেটা যেন আরশোলার মত সুড়সুড় ক'রে উঠত মনে—'ধরবেনা, তারমানে ওর ভেতর এমন কিছু আছে যা আমাদের জন্য নয়—অতএব ওটা ধরতেই হবে দেখতেই হবে, জানতে হবে নিষিদ্ধ বস্তুটা কী। এখন যেমন 'প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য' সিনেমার এই লেবেল তরুণতর বয়সীদের মধ্যে সব চেয়ে বেশি সাড়া জাগায় তেমনি নিষিদ্ধ বই দেখলেই আমরা পাগল হয়ে উঠতুম। সবটুকু না হোক যতটুকু পারি তাই বা দেখতে ছাড়ব কেন।

এমনি এক সময়ের কথা। পাড়ার লাইব্রেরি থেকে শরৎ বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস প্রায় শেষ ক'রে

সবে হাত বাড়িয়েছি বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমারের দিকে। বাড়ীতে এদের ভক্ত পাঠক ছিলেন অনেকেই। কিন্তু জানিনা কেন, আমার হাত ওদিকে এগোলেই সঙ্গে সঙ্গে বড়োরা তা টেনে নিতেন। 'এখনই এত?' বুঝতাম না এতে ক্ষতি কী। আমি যদি বঙ্কিম শরৎ রবীন্দ্রনাথের রস আস্বাদন করে থাকি তবে সমসাময়িক লেখকদের লেখা পড়লে তাতে দোষ হবে কেন? বরং সমসাময়িক কালই তো সবচেয়ে বেশি রসসিক্ত করে মনকে। তা বড়োরা যদি ঐ বয়সটাকেই মূল্যবান বলে মনে করেন তবে অবশ্য বলবার কিছু নেই।

বাবা পড়াশুনার বিষয়ে তেমন কড়াকড়ি পছন্দ করতেন না—তবে তিনি সর্বদাই বলতেন—রবিবাবু পড়ো। অর্থাৎ যাই পড়োনা কেন রবিবাবুকে ছেড়োনা। একজন মানুষ সারা জীবন ধরে এত লিখে গেলেন যে একজন মানুষের পক্ষে সারা জীবনেও তার সম্পূর্ণটা পড়ে ওঠা সম্ভব কিনা সন্দেহ—একথা তিনি প্রায়ই বলতেন। আমরা তাঁর কথাকে কোনদিন অমান্য করিনি। রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে আমাদের ছেলেবেলার কথা আমরা ভাবতেও পারি না। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাজে অকাজে তাঁর মানসিক উপস্থিতি অনুভব করেননি এমন মানুষই তখন কম ছিলেন। তবু আমরা যারা রবীন্দ্রযুগের পরবর্তী বলে অভিহিত হব আমাদের হাত সর্বদা নিসপিস্ করত কল্লোল কিংবা পরবর্তী লেখকদের রচনার দিকে। আমরা যা পাই লুকিয়ে পড়ি। এমনি লুকিয়ে পড়ার নেশায় যখন বেশ মেতে উঠেছি—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের বইএর নীচেই সংগোপনে কল্লোল অথবা পরবর্তী কালের কোন লেখকের বই রেখে মাঝে মাঝে সেই দিকে নিবিষ্ট হচ্ছি মা হঠাৎ সে দৃশ্য একদিন ধরে ফেলেন হাতে হাতে। 'দেখি কী বই পড়ছিস'—আমি যখন ভয়ে দ্বিধায় রীতিমতো সংকুচিত তখন, যেন কিছুই হয়নি এমন একটি ভাব দেখিয়ে মা বইটি টেনে নিয়ে একবার বইটির নামের ওপর চোখ বোলালেন তারপর আমাকে চমকে দিয়ে বলে উঠলেন—'তা এমন অন্ধকারে না বসে ওদিকে আলোর দিকে সরে বসলেই পারিস। আর একটা কথা। আমার কি মনে হয় জানিস, এ বইগুলো মনকে বড় বেশি অস্থির করে—চিন্তাকে এলোমেলো ক'রে দেয়—একটু বড় না হলে এসব পড়ে কি হজম করতে পারবি?'

হ্যাঁ, এখন সেদিন বদলেছে। লুকিয়ে এখন প্রেম করতে হয় না, এমন কি পরীক্ষার নকলেও আর লুকোচুরি নেই। সুতরাং বই পড়া? তাতে আর লুকোবার কি থাকতে পারে? নিষিদ্ধ ছবি দেখা, নিষিদ্ধ বই অভিভাবকদের সামনে ব'সে পড়া এ সব কিছুরই সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠেছে এ যুগের ছেলেমেয়ে তেমনি অভিভাবকরাও দেখে শুনে নীরব থাকাই বুঝি শ্রেয় মনে করছেন। সে যাই হোক, আমার কিন্তু এখনও দুঃখ হয় সেই দিনগুলির জন্যে—যে দিনগুলিতে বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের নববধূ দিনের শেষে রাত্রির কয়েকটি প্রহরের জন্য ক্ষণ গুণতেন, চিক অথবা কোন খেয়ার আড়াল থেকে দিনের বেলায় পলকের জন্য স্বামীর সঙ্গে চোখাচোখি হলে আনন্দে আশংকায় রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতেন, ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে বিছানায় উপুড় হয়ে কোন স্ত্রী তাঁর প্রবাসী স্বামীর চিঠি পড়তে পড়তে আনন্দ বেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠতেন। একই সঙ্গে কিশোর বয়সে লুকিয়ে নিষিদ্ধ বই গোগ্রাসে গেলা তারও একটা রোমাঞ্চকর অনুভূতি আছে বৈ কি! নিষিদ্ধ কোন কিছুর সম্ভোগ যে মাত্রাহীন সুখের স্বাদ নিয়ে আসে এ অনুভূতি বুঝি কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার হয় না। অথচ এখন নিষেধ শাসনের বাইরে সত্যিই কি সীমাহীন কোন সুখের সন্ধান পেয়েছে এ যুগের ছেলেমেয়েরা?

একটি ঘটনা মনে পড়ে। সবে তখন স্কুল ছেড়েছি—তাও সম্পূর্ণ অনিচ্ছায়। না ছেড়ে উপায় ছিলনা। উঠতি বয়সের সব লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠতেই বয়জ্যেষ্ঠরা ফতোয়া দিলেন শাড়ি না পরলে বাইরে বেরোনো বন্ধ। অগত্যা শাড়িতে রপ্ত হবার চেষ্টা করছি। আয়নার সামনে দাঁড়িয়েছি দিনের মধ্যে কতবার। নিজের চেহারা দেখে নিজেই চিনতে পারিনি। কোথায় হারিয়ে গেল সেই ছিপছিপে মেয়েটি? তার বদলে এই ভরা যৌবন দেহ নিয়ে এ কোন নারীর আবির্ভাব হল আয়নায়?

লজ্জা করত প্রথম প্রথম বাইরে যেতে। শাড়ি পরাতেই যেন বেশি লজ্জা। এ যেন সবাইকে জানানো আমি আর কিশোরী নই, যুবতী হতে চলেছি। প্রথম যেদিন শাড়ি পরে বন্ধুদের সঙ্গে বিকেলে রাস্তায় নেমেছি দেখি জোড়া জোড়া চোখ যেন আমার সম্পূর্ণ দেহকেই বারবার ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। আমি শাড়ির প্রান্ত টেনেনিই বুকের ওপরে। ভাল করে ঢাকা দিই। পা দিয়ে চেপে চেপে শাড়ির প্লীল ঠিক রাখার চেষ্টা ক'রি। তবু যেন লজ্জা ঢাকে না। পরের দিনও ঐ পথে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে দেখে বাড়ীর দিকে দ্রুত পা বাড়িয়ে দেখি গলির কাছে বেশ কয়েকটি ছেলে। ওরা যেন ঠিক আমারই অপেক্ষায় ওখানে দাঁড়িয়ে জটলা করছে। আমি চোখ দুটো মাটিতে নামিয়ে দাঁত দিয়ে ঠোঁটটা চেপে ধরে ওদের পেই ক্রস করেছি হঠাৎ কে যেন আমার শাড়ির আঁচলটা একটু টেনেই ছেড়ে দিল। কে একজন বল্ল শুনতে পেলাম—'কীরে হলো তো' আমি ভয় পেয়ে তাকাতেই ওরা এতটুকু লজ্জা না পেয়ে হো হো করে হেসে উঠল। ওদের মধ্যে অনেকেই আমার চেনা —কেন না পাড়ারই তো ছেলে ওরা। আমাকে নিয়ে ওদের রসিকতায় ভয় পাবার কিছু ছিল না তা ঠিক— কিন্তু এখন মনে হয়, ভয় আমি ঠিক পাইনি —আমার যেন কেমন লজ্জা করছিল, আর লজ্জার সঙ্গে একটা নতুন কিছু উপলব্ধির আনন্দও বুঝি মেশানো ছিল। বুকটা তাই যেমন কেঁপে কেঁপে উঠছিল তেমনি শিহরণ ছিল এক অজানা পুলকের।

অথচ সেদিন। বাড়ী ফিরছি সন্ধ্যেবেলা। এবং আজকাল যেমনটি হয়, লোডশেডিং এর ফলে ব্ল্যাক আউট। অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই পথ চলেছি—দু'পাশের বাড়ী থেকে আসছিল ছিটে ফোঁটা আলোর আভাস। দেখলাম কয়েক হাত দূরে একটি মেয়ে চলেছে তাকে ঘিরে ধরেছে একদল ছেলে। 'তোর কদিন দেখা নেই যে বড়, কোথাও জমিয়েছিল বুঝি।'

'যা যা, জমাবো আমি, তা হলে তো স্টীম্ হ'য়ে যাব! তবে হ্যাঁ রোজই তোদের সঙ্গে আড্ডা দেব তারও কোন মানে নেই—তোদের মত কত জন হা ক'রে আছে।'

অন্ধকারে ঐ কথাকয়টিতেই যেন শিউরে উঠলাম। ছিঃ, কী নির্লজ্জ হ'য়েছে আজকের উঠতি ছেলেমেয়েগুলো। রাস্তাঘাটে প্রকাশ্যে এমন কথাবার্তা! কিন্তু তারপরেই মনে হল—তা হোক ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ তো আজও আছে। হয়ত প্রকাশের ধরণ পাল্টেছে, তা ছাড়া পরিবর্তন যা কিছু ঘটছে তা আমাদের বয়সের, দৃষ্টিভঙ্গীর। তাই একদিন আমাদের চোখে যা ছিল উপভোগ্য আজ তা নির্লজ্জতার নামান্তর বলে মনে হচ্ছে।

দিন বদলে যাচ্ছে—ছবিটাও যাচ্ছে বদলে। কিন্তু থেকে যাচ্ছে যেটুকু? তা বুঝি কোনদিন বদলাবার নয়!

"ওগো শেফালীবনের মনের কামনা,
কেন সুদূর গগনে গগনে
আছ মিলায়ে পবনে পবনে।
কেন কিরণে কিরণে গলিয়া
যাও শিশিরে শিশিরে গলিয়া।
কেন চপল আলোতে ছায়াতে
আছ লুকায়ে আপন মায়াতে।
তুমি মূরতি ধরিয়া চকিতে নামো না,
ওগো শেফালিবনের মনের কামনা"॥

— রবীন্দ্রনাথ

রিপোরটারের জারনাল

—সুদেব রায়চৌধুরী

বছর তিনেক আগেকার একটি ঘটনা। সম্ভবত জুন-জুলাই মাস। রাত তখন দশটা। আমার সেদিন নাইট-ডিউটি। কলকাতার খবরের কাগজের রিপোরটারদের নাইট-ডিউটি একটা পর্যন্ত। প্রৌঢ় এক ভদ্রলোক অফিসে এসে হাজির। পরনে ধুতি, গায়ে ছাইরংয়ের ফুলহাতা সার্ট্। টেবিলের সামনে ঝুঁকে ভদ্রলোক বললেন : আনন্দবাজারের এই নামের রিপোরটারের সঙ্গে কোথায়, কখন, কিভাবে দেখা করতে পারি, বলতে পারেন ?

ভদ্রলোকের চোখেমুখে উত্তেজনার ছাপ সুস্পষ্ট। স্টোরিটা আমারই লেখা। তাই খুবই অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। কি জানি, হয়ত লেখার কোন কনট্রাডিকশান দিতে এত রাতে ছুটে এসেছেন ? ভাগ্যিস ঠীক রিপোরটার নেই। তাকিয়ে দেখলাম আশেপাশের চেয়ারগুলিও খালি। সহকর্মীরা সবাই কপি দিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছেন। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, কি দরকার বলুন তো ?

চেয়ার টেনে কাছে বসলেন ভদ্রলোক।—দেখুন সোনালক্ষী মানে আমার বিবাহিত স্ত্রীকে কেন্দ্র করেই আপনাদের কাগজে ওই স্পেশাল স্টোরি। তাই আমি জানতে এসেছি রিপোরটার ভদ্রলোক কিভাবে পনের-কুড়ি বছর আগেকার এসব খবর পেলেন ?

—কেন ? স্টোরির ভিতরে কোথাও কি আপনার স্ত্রী সম্পর্কে খারাপ কিছু লেখা হয়েছে ? আর লেখা হয়ে থাকলে কি সে সম্পর্কে কোন কনট্রাডিকশান ছাপাতে চান ?

ভদ্রলোক বললেন : আরে না—না, সে সব কিছুই না। আমার স্ত্রী সোনালক্ষীর দেহ থেকে সোনার গওনা ডাকাতি হওয়ার ব্যাপারেই ওই স্টোরি। আমার তখন সবে বিয়ে হয়েছে। থাকি আমহার্স্ট ষ্ট্রীটে। একদিন রেখেলা আঁধারে নীল শাড়ী পড়ে সুন্দরী একটি মহিলা আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। বাড়িতে তখন সোনালক্ষী একা। আমি অফিসে। নীল শাড়ী পরিহিতা আমার স্ত্রীর বুকের সামনে ছোরা উঁচিয়ে ধরে সব নিয়ে যায়। সোনালক্ষী বাহাতে বিয়ের রাতে আমার দেওয়া আংটিটি কিছুতেই দিতে চায়নি। কিন্তু মহিলার পোষাকের আড়ালে ওই দুর্বৃত্ত সোনালক্ষীকে মাটিতে ফেলে শেষ পর্যন্ত সেটিও নিয়ে রাজপথে মিলিয়ে যায়। কাকপক্ষীও কিছু জানতে পারল না এতবড় একটা দুঃসাহসিক ডাকাতির কথা।

দেখুন, আপনার স্ত্রীর গায়ের গয়না চুরির কাহিনী শোনবার মত আমার এখন তেমন সময় নেই। টেবিলের উপরে রাখা টেলিফোন বেজে ওঠে। হ্যা-লো—লালবাজার। একটু কনট্রোলরুম দেবেন তো ? ও প্রান্ত থেকে 'কিছু নেই' কথা দুটি কানে ভেসে আসে। রিসিভারটা নামিয়ে রাখতেই পাশেরটা বেজে উঠল। হ্যা-লো, শিলিগুড়ি। অ্যাকসিডেন্ট ! কি বললেন মাইনর। কেউ মরেনি তো ? বাঁচালেন।

ভদ্রলোক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আমার দিকে মুখ উঁচু করে বললেন : দেখুন, আমি এ কাহিনী শোনাতে এত রাতে ছুটে আসিনি। ছুটে এসেছি কেন, জানেন ? স্টোরিতে রিপোরটার ভদ্রলোক লিখেছেন, লালবাজারের গোয়েন্দা পুলিশ সোনালক্ষীর গায়ের গয়না চুরির ওই ঘটনাটি নিয়ে এখনও অস্বস্তি করছে। কুড়ি বছর আগেকার একটি বিষন্ন দুপুরের ঘটনা খবরের কাগজে লেখে আমার স্ত্রীর বুকেও যেন কিছুটা আশার সঞ্চার হয়েছে। আমাকে ডেকে বারবার বলছেন ওগো, তাহলে কি এবার বিয়ের গয়নাগুলি ফিরে পাব ? স্ত্রীর পীড়াপীড়িতেই এতরাতে আপনাদের অফিসে ছুটে এলাম। সেই রিপোরটারের কাছ থেকে জানতে ইচ্ছে করে লালবাজারের গোয়েন্দা পুলিশ কি সত্যি সত্যিই বিষটির অন্ত করছেন ?

স্টোরিতে তো সব কিছুই লিখে দিয়েছি। অসতর্ক মুহূর্তে নিজের নামটা পরোক্ষে প্রকাশ করে ফেললাম ভদ্রলোকের কাছে।

—তাহলে, এটা আপনারই লেখা? এতক্ষণ বলেননি কেন? সত্যিই আপনার স্টোরিটা ভালো লেগেছে। সোনার গয়না না পেলেও এই কথা বলব।

ভদ্রলোককে বললাম, এতরাতে স্টোরির তারিফ করতে কেউ আসবে জানলে আগে থেকেই আপনার কাছে আমার পরিচয় দিতাম। বুঝলেন মশাই, রিপোরটাররা পৃথিবীতে একটা জিনিষ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করে না। এবং সেটা হল 'কনট্রাডিকশান।

• • •

আগস্ট মাস। সেদিন ছিল বুধবার। বিকেল চারটে-পাঁচটা হবে। রাইটার্সবিলডিংস-এর মেন গেটে জিপ থেকে নামতেই রাস্তার ওপারের ফুটপাতে পরিচিত এক ভদ্রলোকের দিকে হঠাৎ চোখ পড়ে গেল। কাছে যেতেই জিজ্ঞাসা করলাম, মনাদা আপনি এখন এখানে দাঁড়িয়ে? সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট আমার হাতে দিয়ে নিজেও একটা ধরালেন। মনাদা হলেন লালবাজারে গোয়েন্দা পুলিশের একজন দক্ষ অফিসার। পোষাকী নাম মনোরঞ্জন ব্যানার্জি। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন: একটু অপেক্ষা করুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কেন দাঁড়িয়ে আছি।

—তাহলেও একটা কারণ আছে? আমি নাছোড়বান্দা। লালবাজারের গোয়েন্দা অফিসার মনোরঞ্জন ব্যানার্জি যে অ্যামব্যাসাডার গাড়িতে হেলান দিয়ে সিগারেট খাবার আনন্দ উপভোগ করতে এখানে আসেননি সেটা বুঝতে আমার একমিনিটও লাগেনি।

—ফিরে আসছি। হঠাৎ দেখি মনাদা আমার কানের কাছে এসে বলছেন: শুনুন, এখুনি আমরা খাদ্যমন্ত্রী কাশীকান্তবাবুর পি-একে গ্রেফতার করব। খবরদার, গ্রেফতার করার আগে একথা যেন আপনার কাছ থেকে কেউ জানতে না পারে। তখানে আর এক মিনিটও দেরি না করে রাইটার্সবিলডিংস-এর দোতলায় রিপোর্টারদের আস্তানা এয়ারকন্ডিশানড্ প্রেসরুমটায় গেলাম। দেখি সব রিপোর্টাররাই কি একটা আলোচনা নিয়ে ব্যস্ত। এরই মধ্যে একফাঁকে আমাদের চীফরিপোর্টার শিবদাস ভট্টাচার্যকে ইসারা করে ডাকলাম। সবকিছু শুনে বললেন তুমি এখনই কোন জায়গা থেকে অফিসে টেলিফোন করে ফটোগ্রাফার পাঠাতে বল। প্রথমে টেলিফোন করতে মুখ্যমন্ত্রীর প্রাইভেট সেক্রেটারি বারীন বসুর ঘরে ঢুকলাম। টেলিফোন করার অনুমতি চাইতে না চাইতে বারীনবাবু টেলিফোনটা টেবিলের উপর এগিয়ে দিলেন। ডায়াল করেও রিসিভারটা রেখে দিলাম। বারীনবাবুর ঘরে লোকসভতি। তাই টেলিফোন পেয়েও ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম। বারীনবাবুকে বললাম: লাইনটা এনগেজড্। পরে করব।

এর পরে ঢুকলাম ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খানের ঘরে। গুরুপদবাবুর ঘরে মাত্র একজন লোক বসে কথাবার্তা বলছেন। টেলিফোন করেই আমাদের অনেক কালের বিশ্বস্ত অপারেটার রবিবাবুকে বললাম লাইনটা ফটোগ্রাফারদের ঘরে দিন। খুবই জরুরী। ফটোগ্রাফার হীরেনদা (হীরেন সিংহ) বিচক্ষণ লোক। ফোন ধরেই বললেন: কি ব্যাপার বলতো? —আমি বললাম, ব্যাপার ফোনে বলা যাবেনা। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে একজন ফটোগ্রাফার রাইটার্স বিলডিংসের মেন গেটের কাছে পাঠান। আমি মেন গেটের সামনেই দাঁড়িয়ে আছি। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখি অফিসের জিপ এসে হাজির। অলোক মিত্র এবং শুরু—এই দুজন ফটোগ্রাফার জিপ থেকে নামলেন। ওঁদের দুজনকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সব কিছু খুলে বললাম। ক্যামেরা যেন আগে থেকে কেউ দেখে না ফেলে! এই বলে আমি আবার রাইটার্সবিলডিংস-এ দোতলায় উঠলাম। উঠবার সময় দেখলাম পুলিশ অফিসার দেবী রায় একজন অফিসারের সঙ্গে লিফটের কাছে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। পাছে দেবীবাবু আমাকে চলে যেতে বলেন সেই কারণে তখন দেবীবাবুর সঙ্গে দেখাই করলাম না। অরুণবাবুর সাদাসাটা গ্রেফতারের খবর হয়ত সকলেই পাবেন। কিন্তু কিভাবে তাঁকে গ্রেফতার করা হল সে রিপোর্ট আমাকে জানতেই হবে।

রাইটার্সবিল্ডিংস-এর দোতালায় উঠে দেখি প্রেস কনফারেন্সে রিপোর্টারদের সঙ্গে নিয়ে আমাদের চিফ্ রিপোর্টার বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছেন।তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থবাবু এরই মধ্যে দেবীবাবুর সঙ্গে একবার কথা বলে নিয়েছেন। রিপোর্টাররা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন দেবীবাবুর সঙ্গে তাঁর কোন জরুরী ব্যাপার আলোচনা হয়েছে কি না ? মুখ্যমন্ত্রী হেসে জবাব দিয়েছিলেন : না, তেমন কিছু নয় ? দেবীবাবুর উপর তুমি কেলেঙ্কারী অন্বেষণের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে তাই এই কৌতূহল। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের সামনের করিডর ধরে পূর্বদিক বরাবর এগিয়ে গেলাম। কাশীবাবুর ঘরের কাছাকাছি হতেই দেখি লালবাজারের দুইটি তরুণ গোয়েন্দা সাব ইনস্পেক্টর বারান্দার বেঞ্চে বসে উইথসর সিগারেট টেনে চলেছেন। ওদিক ভ্রুক্ষেপ না করে এগিয়ে গেলাম। কাশীবাবুর ঘরে ঢুকতে গেলে আগেই তাঁর সি-এ অরুণবাবুর ঘরে যেতে হয়। দেখি অরুণবাবু কাজ করছেন। অন্য এক ভদ্রলোক বললেন : এখন ঘরে যাবেন কি ? কাশীবাবুর সঙ্গে আপনাদের অফিসের অরুণবাবু (অরুণ সেনগুপ্ত) কথা বলছেন। বেরিয়ে এলাম আবার বারান্দায়। সিড়ি বেয়ে নীচে এলাম। এসেই দেখি দেবীবাবু একখানি গাড়িতে উঠে পড়লেন। মনোরঞ্জন ব্যানার্জিও নেই। অলোক মিত্র ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ফটোগ্রাফি করতে ব্যস্ত। একজন পুলিশ সারজেন্ট বললেন : "না, যেন গেট থেকে কাশীবাবু অথবা তাঁর সি-এ কেউই বেরোননি।

পিছনের দিকের গেটে, দীর্ঘার কাছে এসে শুনি পাখী উড়ে গিয়েছে। অর্থাৎ মনোরঞ্জন ব্যানার্জি আমাদের সকলের চোখে ধুলো দিয়ে অরুণ সেনগুপ্তকে চারদের দিকটার গেটেই গ্রেফতার করে নীরবে গোপন কোন জায়গায় চলে গিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে জিপ নিয়ে লালবাজারে ছুটলাম। লালবাজারে গোয়েন্দা দপ্তরের দু'নম্বর ডেপুটি কমিশনার শ্রীঅমিয় গুপ্ত জানালেন : অরুণবাবুকে গ্রেফতার করা হয়ে থাকলে তাঁকে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ অ্যানডারসান হাউসে নিয়ে যাবে। সেখানে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। অ্যানডারসান হাউসে টেলিফোন করলাম। সেখান থেকে দেবী রায় জানালেন, অরুণবাবুকে আমরা এখন লোয়ার সার্কুলার রোডের একটি ন'তলা বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি। লা'মারটিনেয়ার স্কুলের সামনে ওই বাড়িতে যেতেই বৃদ্ধ লিফ্‌টম্যান জানালেন, একটু সবুর করুন। সাহেবরা এখুনি আসবেন। টেলিফোন এসেছিল। লিফ্‌টম্যানের কথা শেষ না হতেই দেখি একখানি কালো রংয়ের ইন্ডিকেবার এসে থামল। প্রথমেই বেরিয়ে এলেন অরুণবাবু। সবশেষে দেবীবাবু। লিফটে যেতে যেতেই অলোকের ক্যামেরার ফ্লাসবাল্বের আলো চমকে উঠল। অরুণবাবুর চোখেমুখে যুগপৎ 'বিস্ময় ও আতঙ্কের ছাপ সুস্পষ্ট। আমাকে দেখে কি ভাবলেন জানিনা। মুখ গম্ভীর করে বললেন : আপনারা এখানে !

—সেই গোপন বাড়ির আটতলার রাস্তার দিকের ঘর থেকে বেরিয়ে সোজা চলে এলাম আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসে। জেনারেল রিপোর্টিং-রের ঘরে অনেক রিপোর্টার। তাই ডেপুটি নিউজ এডিটার শান্তিদার (শান্তি মিত্র) অনুমতি নিয়ে সিনেমার ঘরে গিয়ে লিখতে বসলাম। মিনিট পনের পরে আনন্দবাজার পত্রিকার ম্যানেজিং এডিটার অতীনবাবু (অতীন কুমার সরকার) নিজেই সিনেমার ঘরে এসে আমাকে বললেন : আপনি একবার কাশীকান্তবাবুর রিঅ্যাকশান নেবার চেষ্টা করবেন। ফোনে না পেলে বাড়িতে যদি একবার ঘুরে আসতে পারেন ভাল হয়। কাশীবাবুর প্রতিক্রিয়া না দিতে পারলে মেটারিং কমপ্লিট হবে না। কাশীবাবুকে ফোনেই পেয়ে গেলাম। কাশীবাবুর রিঅ্যাকশানও পেলাম। রিপোর্ট লিখে শান্তিদার হাতে দিয়ে বেলগাছিয়ার তিনতলায় আমার দু'কামরার ছোট্ট ফ্লাটের বাইরের দরজায় এসে যখন কড়া নাড়লাম তখন রাত একটা।

শুধু রাইটার্স বিলডিংস, বিধানসভা, কর্পোরেশন, বিশ্ববিদ্যালয়, বা পার্টি অফিসে গিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের বিবৃতি, পালটা বিবৃতি সংগ্রহ করাই আমাদের কাজ নয়। রিপোর্টার হিসাবে কাজের তাগিদে সর্বত্র যেতে হয় আমাদের। এইভাবে দায়িত্বসহকারে খবর গোপন রেখে লক্ষ লক্ষ পাঠকের কাছে আমাদের বড় রকমের ঘটনার বিস্তারিত রিপোর্ট পৌঁছে দিতে হয়। খবর সংগ্রহের ব্যাপারে

'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—এই তিন থাকতে নয়' কথাটি বর্ণে বর্ণে সত্যি।

• • •

বেশ কিছুদিন আগেকার খবর এটি। সন্ধে হয়ে গিয়েছে। রাইটার্স বিলডিংস-য়ে লোকজন নেই বললেই চলে। প্রেসকরনারেও কেউ নেই। ডান পকেট থেকে চিরুনি বের করে অমৃতবাজার পত্রিকার স্বনামধন্য রাইটার্স বিলডিংস্ রিপোরটার অনিলদা চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বললেন: চল! আর কত ঘুরবে। তুমি তো চীফ সেকরেটারির বেয়ারা, সি-এ থেকে শুরু করে কাউকেই বাদ দেও না সবার সঙ্গেই একবার করে আলাপ না করে ছাড় না।

অনিলদা (অনিল সেন) আমাকে এভাবে মাঝেমধ্যে ঠাট্টা করে থাকেন। আর এদবের জন্য ভালও বাসেন। তবে হ্যাঁ এই সব বেয়ারার কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। অনিলদাকে বললাম: আপনি যান। আমি লালবাজার ঘুরে একটু বাড়ি যাচ্ছি। অনিলদা চলে গেলেন। চীফ সেকরেটারি তখন সুকুমার মল্লিক, আই-সি-এস। সুকুমারবাবুর ঘরে ঢুকতে যাব এমনি সময় দেখি তাঁর বেয়ারা (নামটা এক্ষুনি মনে পড়ছেনা) বেতের ঝুড়ির মধ্যে একগাদা কাগজপত্র নিয়ে বেরিয়ে আসছে। প্রশ্ন করার আগেই বলল সাহেব চলে গিয়েছেন।

কথাটা শুনে একটু অবাকই হয়ে গেলাম। আমাকে সাড়েছটার সময় আসতে বললেন। অথচ তিনি এরই মধ্যে চলে গেলেন!—সাহেব দিল্লী যাবেন তাই আজ সকাল বাড়ি চলে গিয়েছেন।

দিল্লী যাবেন? আজ!

নিশ্চয়ই দিল্লী থেকে কোন খবর এসেছে। তার কারণ, সুকুমারবাবুকে কেন্দ্র করে তখন পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে প্রবল ঝড়। বেয়ারের কাছ থেকেই জেনে নিলাম রাত্রের ফ্লাইটে যাবেন। দেরি না করে সঙ্গে সঙ্গেই চীফ সেকেরেটারির সি-এ গণেশবাবুর (গণেশ বসু) ঘরে ঢুকে পড়লাম। গণেশবাবু আমাদের পুরানো বন্ধু। খবর দেন না ঠিকই। কিন্তু ঘরে গেলে কখনও অন্যান্য সরকারী আমলার মত মুখ গুমরে বসেও থাকেন না। ঢুকতেই গণেশবাবু বললেন: কি বুঝছেন বলুন তো? দেশের হালচাল কি?

—যার হাত দিয়ে রাজ্যের সবকিছু গোপন ও জরুরী বিষয় একের পর এক প্রতিদিন টাইপ হচ্ছে, সিল করার হয়ে দিল্লী যাচ্ছে, তিনিই আবার আমার কাছে জানতে চাইছেন দেশের খবরাখবর। অর্থাৎ গণেশবাবু আমাদের অন্যদিকে মনআকৃষ্ট করার জন্য এসব কথার অবতারণা করেন। খুব মারাত্মক একটা বিষয় হয়ত টাইপ করছেন। এর ভিতর যদি কোন রিপোরটার ঢুকে পড়েন তখনও গণেশবাবুর হাবভাবে কিছু বোঝার উপায় নেই। টাইপ থামিয়ে চা খাবার জন্য অনুরোধ করবেন। খুব বেশি চৌখস রিপোরটার হলে হঠাৎ তাঁর সামনে ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকের একটা রেকর্ড খুব আস্তে শুনিয়ে দিলেন। জানেন কালরাতে মহাজাতি সদনে ওস্তাদ যা জমিয়েছিলেন। গানের প্রতি শুধু আসক্তি নয়, গণেশবাবুও নিজেও একজন গায়ক। কিন্তু আমি যে এসবে ভোলার পাত্র নয় তা তিনি ভালভাবেই জানেন। বললাম আচ্ছা গণেশবাবু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আপনাদের সাহেবকে টেলিফোনে হঠাৎ দিল্লী ডেকে পাঠালেন কেন? গণেশবাবু হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গেলেন। সামনের চেয়ারে অজিতবাবুর (অজিত মুখার্জি) দিকে তাকিয়ে বললেন: অজিত, কি ব্যাপার তুমি কি এসব কিছু জান?

অজিতবাবু বললেন: টেলিফোন এসেছিল কিনা, আর আসলেও প্রধান মন্ত্রীর কাছ থেকেই তা এসেছিল কিনা আমি কিছুই জানি না। তবে আমাদের সাহেব আজ দিল্লী যাচ্ছেন।

অজিতবাবুর কাছ থেকে এই কথা শোনবার পর অফিসের পথে পা বাড়ালাম। রাইটার্সবিলডিংস-য়ের সিঁড়িদিয়ে নামতে নামতে ভাবলাম চীফ সেকরেটারি সুকুমার মল্লিকের সঙ্গে রাজ্যপাল ধাওয়ান সাহেবের অহি-নকুল সম্পর্ক। এ নিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম থেকে শুরু করে স্বরাষ্ট্র দফতরের ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পর্যন্ত জল গড়িয়েছে। কোন চীফ

সেক্রেটারির সঙ্গে রাজাপালের বাদানুবাদের ঘটনা সম্ভবত এর আগে প্রকাশ্যে ঘটেনি। এই পটভূমিকায় চীফ সেক্রেটারির হঠাৎ দিল্লী যাবার তাৎপর্য আছে বৈকি? সুতরাং এ খবর আমাকে যে করেই হোক বের করতে হবে।

অফিসে এসেই সুকুমারবাবুর বাড়িতে টেলিফোন করলাম। টেলিফোনে পরিচয় দিতেই বললেন এ খবর আপনি পেলেন কোথায়?

—কেন? আপনি তো আজ সন্ধ্যে সাড়েছটায় রাইটার্স বিল্ডিংএ দেখা করতে বলেছিলেন। কিন্তু গিয়ে শুনলাম আপনি আজ দিল্লী যাচ্ছেন। তাই সকাল সকাল বেরিয়ে এসেছেন।

সুকুমারবাবু হেসে বললেন, ধরা যখন পড়ে গিয়েছি তখন আর লুকিয়ে লাভ নেই। বললেন: হ্যাঁ আজই দিল্লী যাচ্ছি। ক্যাবিনেট সেক্রেটারি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। জানিনা, সেখানে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আমাকে নিয়ে যাওয়া হবে কিনা? তবে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি কেন আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন তা আমি নিজেও জানিনা। এই কথা বলেই রিসিভারটা ছেড়ে দিলেন। আমার স্টোরি পরদিন প্রথম পাতায় তিন কলম শিরোনামায় খবর হয়েছিল। এবং সেটা ছিল 'এক্সক্লুসিভ'।

চীফ সেক্রেটারির বেরোয়া যদি সেদিন না বলত যে সাহেব আজ দিল্লী যাচ্ছেন তাহলে হাজার চেষ্টা করেও আমি এই স্টোরি দিতে পারতাম না। তাই বলছিলাম, রিপোরটারের সোর্স কে নয়? অনেক সময় দেখবেন, বাসে যেতে যেতে নানারকমের কথা কানে ভেসে আসে। তার-মধ্যেও খবর লুকিয়ে থাকতে পারে। আমাদের, একজন অভিজ্ঞ রিপোরটার প্রায়ই বলে থাকেন, জেলা রিভিউ করতে যখন বেরুবে তখন শুধু ডি-এম, এস পি বা কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে কথাবার্তা বলে চলে এস না। রিপোরটকে যদি জীবন্ত করে তুলতে চাও তাহলে যেখানে যাবে সেখানকার ছোটখাটো চায়ের দোকানে গিয়ে পর পর তিন চার কাপ চা খাবে। চায়ের দোকানের আলোচনার মধ্যে সেই জায়গার সামাজিক, অর্থনৈতিক চিত্র ফুটে ওঠে। তাছাড়া সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে হবে। মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতি, সাক্ষাৎকার জেলার ট্যুরিস্ট লজে বসে নিয়ে তা বড় বড় করে প্রকাশ করলে তাতে আর যাইহোক না কেন, পর্যালোচনার রিপোরট হয়না।

এটিও হালফিলের ঘটনা করপোরেশনের কাজকর্ম পর্যালোচনা করে ইনভেস্টিগেটিং রিপোরট তৈরীর দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত হল। করপোরেশনের কালেকশান, অ্যাসেস-মেন্ট, মোটর ভেহিকিলস্ কনজারভেন্সি, জলসরবরাহ সব দপ্তর ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করলাম। এখন যার উপর এসবের দায়িত্ব ন্যস্ত সেই পৌরমন্ত্রীর সঙ্গে একবার দেখা করা দরকার। বর্তমান খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লকান্তি ঘোষ তখন পৌরমন্ত্রী শতবাবু বলেই তিনি সমধিক পরিচিত। অনেক চেষ্টা করে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ শতবাবুর সঙ্গে দেখা হল। ঘরে ঢুকতেই বললেন: সংক্ষেপে সারবে ভাই। পা খোড়া মানুষ, এক্ষুনি আবার এই পা নিয়েই ছুটতে হ'বে।

শতবাবুকে বললাম: আপনি তো পৌরমন্ত্রী। কিন্তু আপনি কি জানেন, করপোরেশনের ব্যর্থতার নগ্ন মূর্তিটা ক্রমশই নাগরিক সাধারণের কাছে প্রকট হয়ে পড়ছে। এই বলে, বিভিন্ন দপ্তরের ব্যর্থতা সম্পর্কে একের পর এক তথ্য তাঁর সামনে তুলে ধরলাম। শতবাবু জবাব দিতে যাবেন এর মধ্যে একটা টেলিফোন ঝনঝনিয়ে উঠল।

সামনের টেবিলে বসে শুনতে পেলাম, শতবাবু বলছেন: মেয়র জেনারেল চৌধুরী, আমাদের করপোরেশনে আপাতত তিনজন হিলিটারি অফিসার হলেই চলবে। বিশেষকরে কনজারভেন্সি, মোটর ভেহিকিলস আর ইঞ্জিনিয়ারিং— এই তিনটি বিভাগের দায়িত্ব আমি আপনাদের এই তিনজন অফিসারের উপর ন্যস্ত করতে চাই। করপোরেশনে কাল থেকে এই তিনজন অফিসারের ইন্টারভিউ শুরু হ'বে। এই বলেই টেলিফোনের রিসিভারটা রেখে দিলেন শতবাবু।

এর পরেই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন: বল ভাই, কি বলছিলে? শতবাবু মোটামুটিভাবে আত্মপক্ষ সমর্থন করেও অকপটে নিজের ব্যর্থতার কথা স্বীকার করলেন। খুব

এইটুকু বললেন : প্রিয়-সুব্রতর সম্পূর্ণ সহযোগিতা পেলে আমি আরও অনেক কিছু করতে পারতাম।

আমার অনেক প্রশ্ন ছিল। কিন্তু টেলিফোনের কথাবার্তা শুনে সে সব কোথায় যেন হঠাৎ হারিয়ে গেল। চা খেতে খেতে বললাম : শুভদা আর একদিন বসা যাবে।

বেরিয়ে আসছি, এর মধ্যে দেখি পি-টি-আই-য়ের লব্ধপ্রতিষ্ঠ রিপোর্টার শ্রীমৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় ঢুকলেন। মৃত্যুঞ্জয়দাকে দেখে ভাবলাম তাহলে কি টেলিফোনের কথা দরজার বাইরে থেকে শুনেছেন ? তা হলে তো আর আমার এক্সক্লুসিভ স্টোরি হবেনা। না, মৃত্যুঞ্জয়দার প্রশ্ন শুনে আমার সে ভয় কেটে গেল। মৃত্যুঞ্জয়দা বললেন : মিঃ ঘোষ আপনার সঙ্গে সেন্ট্রাল মিনস্টার মিঃ মিরধার আজ কি আলোচনা হল।

শুভদাবাবু বললেন : মিঃ মিরধা আমাদের পুরানো বন্ধু। ওঁকে পশ্চিম[illegible]জেলায় জেলায় খেলাধুলা সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে টাকা দেবার অনুরোধ জানালাম।

মৃত্যুঞ্জয়দার সঙ্গে আমিও বেরিয়ে এলাম।

শুভদাবাবুকে টেলিফোনের কথা নিয়ে কোন প্রশ্ন করিনি। পাছে যদি বলে বসেন, খবরটি ছাপিও না। তাহলে তো আমার কাজ শেষ। সেই কারণে তাঁকে এ ব্যাপারে না ঘাঁটানোই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করলাম। অফিসে এসে ফোর্ট উইলিয়ামে মেজর জেনারেল প্রেমাংশু চৌধুরীকে টেলিফোন করলাম। না পেয়ে অন্য আর একজন পদস্থ মিলিটারি অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতেই তিনি বললেন : আমাদের কাছে কনফার্মেশন তিনজন অফিসার চেয়েছেন। এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারব না। পরের দিন এই খবরই প্রথম পৃষ্ঠায় লিড স্টোরি হয়ে প্রকাশিত হল। এবং সেটা আর কোন কাগজে প্রকাশিত হয়নি। এভাবেও খবর পাওয়া যায়। কানটাকে, চোখটাকে সজাগ রাখা খুবই দরকার। পরের দিন স্টেটসম্যান থেকে শুরু করে বহুমতী সকলেই খবরটির ফলোআপ করতে বাধ্য হলেন।

• • •

তখন বাংলাদেশ স্বাধীন। রাইটার্স বিলডিংস-এ ডাক বিভাগের কমিশনার শ্রীবি. কে. ভট্টাচার্যের ঘর থেকে সবে বেরিয়েছি। সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন একজন অফিসার। ভদ্রলোক আমার খুবই পরিচিত। আমাকে দেখেই বললেন : শিলাইদহে রবীন্দ্রজন্মশতবার্ষিকীর রিপোর্টটা বেশ লাগল। তাহলে শিলাইদহ অক্ষতই আছে। গায়ে আঁচড়টি পর্যন্ত লাগেনি। আপনিই তো বাংলাদেশের যুদ্ধচলাকালে আপনাদের কাগজে খবর দিয়েছিলেন শিলাইদহ কুঠিবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছে পাক সেনাদের বোমায়। আবার সেই আপনিই লিখছেন শিলাইদহের কুঠিবাড়ি অক্ষত অবস্থায়ই আছে !

আপনিই তো লিখেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা নীলিমা ইব্রাহিম নিহত হয়েছেন। আবার আপনিই ঢাকা থেকে বেশ পত্রিকায় ঢাকার চিঠিতে নীলিমা ইব্রাহিমের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎকার ছাপালেন। বলতে পারেন আমাদের মত সাধারণ পাঠক আপনার কোন লেখাটি বিশ্বাস করবেন।

ভদ্রলোক যেন একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

তাঁর উত্তেজনার কারণও যে নেই তা নয়। অফিসার ভদ্রলোকের নাম এস. এন. রায়।

মিঃ রায়কে বললাম : দেখুন যুদ্ধের সময় এ ভুল ভ্রান্তি হয়েই থাকে। নীলিমা ইব্রাহিম মারা যাননি ঠিকই। কিন্তু আমার সেই স্টোরির ভিতর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও তিনচারজন অধ্যাপকের নিহত হবার সংবাদ ছিল। কই সেগুলির কথাতো আপনি উল্লেখ করলেন না ? তার কারণ, সেগুলি ঠিক ছিল। তবে হ্যাঁ, একটি নিহত হবার সংবাদই বা ভুল হবে কেন ? ওটি ভুল না হলে রিপোর্টার হিসাবে আমি একশর ভিতর একশই পেতাম।

শিলাইদহের কুঠিবাড়ি সম্পর্কেও কুষ্টিয়ার ডেপুটি কমিশনার একজন এস. এল. এ-র কাছ থেকে খবরটা পেয়েছিলাম। ডেপুটি কমিশনার থেকে শিলাইদহ কুঠিবাড়ি খুবই কাছে। তাই ওই এস. এল. এর কথায় বিশ্বাস করেই খবরটি দিয়েছিলাম। তখন আমি ডেপুটি কমিশনার বসেই এই খবরটি পাঠাই। কুঠিবাড়ি যাবার মত তখন অবস্থা ছিল না। এ কথা ঠিক কুঠিবাড়ির আশেপাশে পাক সেনারা বোমা

যেরেছিল। সেই কারণে ওই গ্রামের লোকেরা অন্যত্র পালিয়ে যায়।

একথা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই যে, কোন কোন সময় এ ধরণের খবর পেলে তা চেপে রাখা খুবই কঠিন। সব সময় এই চিন্তাই মাথায় ঢোকে যদি অন্য কোন কাগজ সংবাদটি আগে থেকে বের করে ফেলে। রিপোর্টারের জীবনে কখনও কখনও এটুকু রিস্ক নিতেই হয়। তবে সব সময়ই লক্ষ লক্ষ পাঠক-পাঠিকার কথা মনে রেখেই খবর পাঠানো উচিৎ। আবার অনেক সময় আমরা অপর পক্ষের বক্তব্য না শুনে খবর লিখে থাকি। সেটাও ঠিক নয়। কারও সম্পর্কে কেউ বা কোন সংস্থা কোন অভিযোগ করে থাকলে সে ব্যাপারে অভিযুক্ত ব্যক্তিরও বক্তব্য ছাপানো উচিৎ। উভয় পক্ষের বক্তব্য দেখে পাঠক স্বাধীনভাবে তাঁর মতামত গড়ে তুলতে পারেন।

শরতে আজ কোন্ অতিথি এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গা রে হৃদয়, আনন্দগান গা রে॥
নীল আকাশের নীরব কথা শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা।
বেজে উঠুক আজি তোমার বীণার তারে তারে।
শস্য-ক্ষেতের সোনার গানে যোগ দেরে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে যে সুর ভরা নদীর অমল জলধারে॥
যে এসেছে তাহার মুখে দেখ্ রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে বাহির হয়ে যা রে।

— রবীন্দ্রনাথ

রামদাস

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

আজ আমি এমন একটি মানুষের কথা বলবো যিনি নিজেকে 'আমি' বলা পরিত্যাগ করেছেন। সকলকেই তিনি বলছেন 'রাম'। সবাই রাম আর তিনি সকলের দাস। তাই 'রাম-দাস'। 'আমি' নেই। সব 'তুমি'—সব রাম। রাময় এই জগৎ।

নারী মাত্রেই মা।

চোখে এই দৃষ্টি, আর মনে রামকে জানবার দুর্দমনীয় আগ্রহ। সেই রামকেই রামদাস খুঁজে বেড়িয়েছেন সর্বত্র অন্তরে এবং বাহিরে। সারা ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থস্থান পরিক্রমা করেছেন দু'বার। কেমন এক অদৃশ্য শক্তি তাঁর সারা অন্তঃকরণকে অধিকার করে বসলো, কেমন করে ধীরে ধীরে তাঁর সব কিছু বদলে গেল, তারই এক বিচিত্র সুন্দর মনোরম কাহিনী তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

একটিবার এই সত্যদ্রষ্টা মহাপুরুষের শ্রীচরণ দর্শন করবার জন্য আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো!

কিন্তু কোথায় কোলকাতা আর কোথায় মাঙ্গালোর।

তাছাড়া আমার মনের গঠন একটুখানি বিচিত্র ধরনের! কোন কিছুকেই বেশীদিন ধরে রাখতে পারি না।

ম্যাঙ্গালোরে যাওয়ার কথা ভুলে গেলাম, কিন্তু স্বামী রামদাসের কথা ভুললাম না মনের মধ্যে চেপে বসে রইলো তাঁর সেই আনন্দোজ্জ্বল হাসি হাসি মুখখানি।

তারপর পুরো একটি বৎসর কেটে গেছে।

তখন আমি সিনেমা-ছবির ডিরেক্টার। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাজের অন্ত নেই।

এমনি দিনে হঠাৎ আমি আমার এক অত্যন্ত পরিচিত ভদ্রলোকের দ্বারা প্রতারিত হলাম। সে এক বিশ্রী ধরনের প্রতারণা। যিনি প্রতারণা করলেন তাঁর আমি অনেক উপকার করেছি। তাই তাঁকে বিশ্বাস করেছিলাম দারুণ বিশ্বাসঘাতকতা করে তিনি কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করলেন। প্রায় সাতখানেক টাকার ব্যাপার। এতদিন ধরে যা কিছু উপার্জন করেছিলাম সব গেল। একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে পথে বসে পড়লাম। নালিশ করবার পথ ছিল, কিন্তু আমি তা করব না তিনি জানতেন। জানতেন 'এটর্নি' আর হাইকোর্টের নাম শুনলে আমার গায়ে জ্বর আসে।

কিছুদিন আগে এমনি করে আরও দুজন আমাকে ঠকিয়েছে। সিনেমা-ছবির রাজত্বটাই এমনি চোর-জোচ্চোরে ভরা।

এবার যিনি আমাকে ঠকালেন তিনি রীতিমত শিক্ষিত। এম-এ বি-এল। অথচ আশ্চর্য, এতবড় একটা অপকর্ম করতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হলেন না।

এই মানুষটিকে কিছুতেই আমি ক্ষমা করতে পারছিলাম না ক্রমাগত তাঁকে আমি মনে মনে গালাগালি দিচ্ছিলাম।

মনে হচ্ছে আমি যেন অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছি, আমারও যেন মনুষ্যত্ব নেই মহত্ব নেই, ঔদার্য নেই, ক্ষমা করতে পারি না, ত্যাগ করতে পারি না, নিতান্ত একজন সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমার যেন কোথাও কোনও প্রভেদ-পার্থক্য নেই।

আবার মনে হচ্ছে—কেন ক্ষমা করবো? ক্ষমাই তো এখানে দুর্বলতা, ক্ষমা এখানে অপরাধ।

কখনও বা মনে হচ্ছে—আমি একটা অপদার্থ নির্বীর্য অপদার্থ মানুষ, তাই বোধহয় ক্ষমার আড়ালে আত্মগোপন করতে চাই।

স্বামী রামদাসের কথা মনে পড়লো। এসময় একমাত্র তিনিই পারেন আমার মনের জ্বালা দূর করে দিতে।

ক্রমাগত তাঁর কাছে আমার প্রার্থনা জানাতে লাগলাম। মুখে যতই কেন-না বড়াই করি, যথাসর্বস্ব ত্যাগ করে

নিরাসক্ত হবার মত মনের জোর আমার নেই। আমার জন্য যে সাধনার প্রয়োজন সে সাধনা করবার মত সামর্থ্যও আমার নেই।

কি আমি করতে পারি কিছুই বুঝতে পারছি না।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত চোখে আমার ঘুম এলো না। স্বামী রামদাসের কাছে প্রার্থনা করতে লাগলাম।—এর প্রতিকারের পথ আমার জানা নেই প্রভু, তুমি এর প্রতিকার কর, আর নয়তো আমার মনের এই দুর্বিষহ জ্বালা থেকে আমাকে মুক্তি দাও।

কতক্ষণ প্রার্থনা করেছিলাম মনে নেই, সকালে যখন ঘুম ভাঙলো সমস্ত শরীরে তখন অসহ্য যন্ত্রণা, মনে হলো যেন জ্বর হয়েছে।

কালীপুজোর পর। সবে তখন শীত পড়তে শুরু করেছে। হাত মুখ ধুয়ে টেম্পারেচার দেখলাম—সামান্য জ্বর। গায়ে একটা গরম কাপড় জড়িয়ে বসে বসে চা খাচ্ছি, হঠাৎ দেখি একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত যুবক আমার বাগবাজারের বাড়ির তেতালায় সোজা উঠে এসেছে। ছবির কাজের জন্য আগে অনেকেই। কিন্তু এমন করে কাউকে কোন খবর না দিয়ে সোজা তেতালার ঘরে উঠে আসতে কেউ ভরসা পায় না। আমার মনের অবস্থা তখন ভাল ছিল না। অভদ্রভাবে চেঁচিয়ে উঠলাম, কে তুমি? কাউকে কিছু না বলে এখানে উঠে এসেছ কেন? এটা কি মেস-বাড়ি, না হোটেল?

যুবকটি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে বললে, দয়া করে আসুন আমার সঙ্গে।

অনুরোধ নয়, সে যেন আদেশ।

নিজে অপরাধ করে আমাকে হুকুম করছে। তার কথা শুনে আমার আপাদমস্তক জ্বলে গেল। বললাম, কেন যাব কেন?

লোকটি বললে, আপনাকে ডাকছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম কে ডাকছে?

সে বললে, স্বামী রামদাস।

চোখের সামনে মনে হলো যেন বজ্রপাত হলো। কথাটা শুনে আমি তখন স্তম্ভিত হয়ে গেছি।

—স্বামী রামদাস? কোথায় তিনি?

—আসুন আমার সঙ্গে।

যেমন ছিলাম ঠিক তেমনি অবস্থায় উঠে দাঁড়ালাম। —চলুন।

আমার বাড়ির সামনে কালী বোসের প্রকাণ্ড বাড়ি। (তখন তিনি সেই বাড়িতেই ছিলেন। পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বাড়িটা বিক্রি করে দিয়ে অন্যত্র চলে গেছেন।) সেই বাড়ির দোতলায় গিয়ে দেখি, সামনের বারান্দার গালিচার ওপর বসে আছেন স্বামী রামদাস। ছবিতে যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক তেমনি। আমারই দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে হাসছেন তিনি।

ছুটে যাচ্ছিলাম সেই দিকে। কালীবাবু আমার হাতে সুন্দর একটি গোলাপ ফুলের মালা ধরিয়ে দিয়ে বললেন, আপনিই পরিয়ে দিন।

স্বামীজি তখন উঠে দাঁড়িয়েছেন।

মালাটি তাঁর গলায় পরিয়ে দিতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। আমার সর্বশরীর জুড়িয়ে গেল।

কালীবাবু তখনও বলে চলেছেন, আপনিই উপযুক্ত ব্যক্তি। তাই আপনাকেই ডেকে পাঠালাম। উনি যে শুনেছেন তো? যে ছেলেটি আপনাকে ডাকতে গিয়েছিল তাকে বলে দিয়েছিলাম—বলবি, স্বামী রামদাস ডাকছেন। লাটঘ ইণ্ডিয়ার একজন মস্তবড়—

জানি। কে আমাকে ডেকেছে জানি। কেন ডেকেছে তাও জানি।

কালীবাবু উপলক্ষ মাত্র। তিনিই বরং কিছু জানেন না।

আমার দু'চোখ তখন জলে ভরে এসেছে।

কালীবাবু তখনও থামেননি।—উনি এসেছিলেন ফুলঝি সিকার বাড়ীতে। আমি ধরে নিয়ে এলাম।

কালীবাবুর দিকে তাকাবার অবসর তখন আমার নেই। অথচ না তাকালেও অভদ্রতা হয়।

যেই তাকিয়েছি, দেখি, কালী (শুধু) বসে আছে। কালী আমার বহুদিনের পরিচিত অন্তরঙ্গ বন্ধু। এত সকালে সে এলোই বা কোত্থেকে, আর খবরই-বা পেলে কেমন করে?

কালী আমাকে দেখেই বললে, স্বামী রা তুমিই আমাকে প্রথম বলেছিলে।

—বলেছিলাম।

—তোমারই জন্যে স্বামীজিকে আজ চোখে দেখলাম

—না, আমার জন্যে নয়। চোখের ইশারায় কালী বোসকে দেখিয়ে দিলাম। কালী (গুরু) বললে, উনি উপলক্ষ্য।

এই বলে সে গম্ভীর মুখে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো স্বামী রামদাসের দিকে।

কালী এমনিই। এমনিই সে চিরকাল।

সে কালী আর ইহজগতে নেই। শুনেছি কিছুদিন আগে কাশীতে সে দেহরক্ষা করেছে। কাশীতে সবাই নাকি তাকে যোগীরাজ বলতো।

যে-কথা বলছিলাম সেই কথা বলি।

স্বামী রামদাস তখন বসেছেন, আর আমি তাঁর পায়ের কাছে মাথাটা পেতে দিয়েছি। তিনি কিছুক্ষণ আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, Don't worry Ram।

তাঁর কাছে সবাই রাম।

আমার মাথাটা হাত দিয়ে তুলে নিলেন তিনি দেখলাম দু'চোখ বন্ধ করেই আপন মনেই কি যেন বলছেন।

আমার দুচোখ তখন জলে ভরে এসেছে।

স্বামীজি উঠে দাঁড়ালেন। আমাকেও উঠতে বললো।

আবার তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন।

এমন সময় কালী বোস অদ্ভুত এক কাণ্ড করে বসলেন। হঠাৎ ছুটে এসে যেন ছোঁ মেরে দু'হাত দিয়ে স্বামীজিকে আড়কোলা করে তুলে ধরলেন, তারপর ছোট ছেলেকে যেমন করে কোলে তুলে নেয় তেমনি করে তাঁকে নিয়ে তিনি বাড়ির ভেতর চলে গেলেন।

আমি নীচে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কালী গুহ আমার সঙ্গেই নেমে এসেছিল। আমার হাতে হাত রেখে বললে, চলি।

মুন্সি সিঙ্গার প্রকাণ্ড গাড়ীখানা দাঁড়িয়েছিল। স্বামিজী তাঁর দুজন মাদ্রাজী ভক্তকে নিয়ে গাড়ীতে উঠতেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

"নদীর ঘাটের কাছে
নৌকো বাঁধা আছে,
যাইতে যখন যাই দেখি সে
জলের চেউয়ে নাচে।
আজ গিয়ে সেইখানে
দেখি দূরের পানে
যাক নদীতে নৌকো কোথায়
চলে তাহার টানে।"

—রবীন্দ্রনাথ

জীবন কাহিনীর দু'একটি স্মৃতি

—সত্যেন বোস

(১)

১৯২৪ সালের অক্টোবর। ইউরোপ যাবার প্রথম সুযোগ এসেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২ বছর বিজ্ঞান চর্চার ছুটি দিয়েছে। পারী উপস্থিত হয়েছি। এখানে আগে থেকেই আমার বন্ধু, ডাঃ মুখার্জি, ডাঃ বাগচি আছেন—তাঁরা ধরে বসেছেন, ওইখানে তাঁদের সঙ্গেই থেকে যাই। আরো কিছুদিন আগে ফটোনের সংখ্যায়ন সংক্রান্ত প্রবন্ধ জার্মান ভাষায় বের হয়েছে। বিজ্ঞানীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে, কারণ আইনষ্টাইন স্বয়ং গুরুত্বসহকারে প্রশংসার সঙ্গে ছাপিয়েছেন। আমি তখনও ভারতে। ইউরোপে এসেই দেখি সর্বত্র দুয়ার সহজেই খোলে। পারীতে প্রথম পৌঁছলাম। মনে আশা, নতুন কিছু শিখে যাব, যাতে ফিরে ছাত্রদের কাজে লাগতে পারি।

সহরের দর্শনীয় সবকিছু দেখবার বাসনা। বন্ধুরা পথ দেখাচ্ছেন।

যে মিউনিসিপাল স্কুলে রেডিয়ামের আবিষ্কার হয়েছিল সেখানে পিয়ের কুরীর শিষ্য লাঁজভ্যাঁ অধ্যক্ষতা করছেন। আমার প্রবন্ধ দেখেছেন—সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—কি শিখতে চাই—কতদিন থাকব ইত্যাদি। এঁরই পরিচয়পত্র নিয়ে গেলাম মাদাম কুরীর কাছে। ইচ্ছা তাঁর ইনষ্টিট্যুটে কিছুদিন থেকে তেজস্ক্রিয়তা সম্পর্কিত কাজ নিজের হাতে করতে শিখি। ছোট ধাস-কামরায় প্রবেশ করবার অনুমতি পেলাম—বয়স্কা মহিলা কালো পোষাক পরে রয়েছেন। ছবি দেখেছি আগে—চিনলাম ইনি সেই। তাঁর হাতে পরিচয়পত্র দিলাম। সস্নেহে আপ্যায়ন করলেন—বললেন, যাঁর কাছ থেকে সুপারিশ এনেছ—তাঁর কথা তো ঠেলতে পারি না! তুমি নিশ্চয়ই আমার কাছে কাজ করবার সুযোগ পাবে—অবশ্য এখনই নয়—৩।৪ মাস বাদে। তুমি ফরাসী ভাষাটা একটু দুরস্ত কর। তা না হলে লেবরেটরীতে কাজ করবার বড় অসুবিধা হবে। আর তোমার তো বিশেষ তাড়া নেই।

মাদাম বলেছিলেন বিশুদ্ধ ইংরাজিতে অবশ্যলাক্ষমে প্রায় মিনিট দশেক হবে। কোন সুযোগ জুটলো না তখন জানাতে যে, চলনসই ফরাসী তখনই আমি জানি। এই নিয়ে দেশেই ১০ বছর চেষ্টা করেছি। মাদামের নির্দেশ শিরোধার্য করে ফিরলাম। তারপর যথারীতি কিছুদিন রেডিয়াম ইনষ্টিট্যুটে কাজ করবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

(২)

১৯৩৭ সালের কথা। সবাই যেমন যায়, আমিও শান্তিনিকেতনে বেড়াতে গেছি একবার। তখন সেখানে আমার ছাত্র প্রমথনাথ সেনগুপ্ত বিজ্ঞানের অধ্যাপক। আমি যখন রবীন্দ্রনাথের কাছে যাই, তখন প্রমথ সঙ্গে ছিলেন। প্রমথকে বিজ্ঞানের একখানা বই লেখার ভার দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। লেটি রবীন্দ্রনাথ দেখেন এবং শেষপর্যন্ত নিজেই লেখা সম্পূর্ণ করেন। তিনি এই বইটির নাম দেন 'বিশ্বপরিচয়'। আমাকে বইটি দেখে দিতে বলেছিলেন। আমি রাজী হইনি। তিনি লিখেছেন, তা-ই আমাদের ভাগ্য। তাঁর লেখা আমি কি দেখব! পরে দেখলাম, 'প্রীতিভাজনেষু' সম্বোধন করে 'বিশ্বপরিচয়' তিনি আমার নামের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।

যোগক্ষেমং বহাম্যহম্

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য্য

পার্লামেন্টের কমিটীর সদস্যরূপে পশ্চিমে ভ্রমণ করিতেছি—বোম্বাই, গুজরাট, রাজস্থান হইয়া দিল্লীতে ফিরিব। সঙ্গে অন্যান্য সদস্য বন্ধু আছেন—নানা প্রদেশের—দক্ষিণ সীমান্ত হইতে পূর্ব সীমান্ত পর্য্যন্ত। ভ্রমণের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে করণীয় কার্য্যের একটা তালিকা পূর্ব হইতেই নির্দ্ধারিত ছিল। তদনুযায়ী প্রত্যেক স্থানে পৌঁছিবার ও তথা হইতে ছাড়িয়া যাইবার সময়সূচি নির্দ্দিষ্ট করিয়া পূর্ব হইতেই বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। অর্থাৎ সময় সূচীর কোথাও কোনো পরিবর্ত্তনের উপায় ছিল না; একস্থানের ইহার ব্যতিক্রম ঘটিলে পরবর্ত্তী সমস্তটাকেই চালিয়া সাজিবার দরকার হইবে।

গুজরাট অঞ্চলে যাইতেছি বলিয়া সঙ্গী সদস্যদের মধ্যে একজন প্রথম হইতেই দ্বারকার মন্দির দর্শনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছিলেন। কিন্তু দ্বারকায় যাওয়া আমাদের কার্য্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল না; যাতায়াতের সময়সূচী যেভাবে নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল তাহার মধ্য হইতে দ্বারকা যাতায়াতের সময় বাহির করা সহজ ছিল না। দ্বারকা যাতায়াতের কোনো বন্দোবস্ত করা ছিল না তো বটেই; সহসা তাহার সঙ্গতি করাও সম্ভব ছিল না।

ঘুরিতে ঘুরিতে এমন জায়গায় আসিয়া পৌঁছিলাম যেখান হইতে দ্বারকা ভ্রমণপথের সর্বাপেক্ষা সন্নিকট। কিন্তু সন্নিকট হইলেও প্রায় ৯০ মাইল দূর। দ্বারকা দর্শন সম্ভব হইলে এখান হইতেই হইবে। পরে আমরা আরও দূরে সরিয়া যাইব। সন্ধ্যায় এখানে পৌঁছিয়াছি, পরদিন সন্ধ্যায় ছাড়িয়া যাইব। মাত্র এক রাত্রির অবস্থিতি।

এখানে আসিয়া বন্ধুটী বেশ বিচলিত হইয়া উঠিলেন, দূর দক্ষিণ প্রান্ত হইতে আসিয়াছেন; পুনরায় আসা হইবে কিনা ঠিক নাই। দ্বারকার এত কাছে আসিয়াও শ্রীমন্দির দর্শন না করিয়া ফিরিয়া যাইতে হইবে বলিয়া তাঁহার মনে একটা গভীর অভাববোধ দেখা দিল এবং আলাপ প্রসঙ্গে দুঃখের সহিত বারবার তিনি তাহা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনদর্শন সম্বন্ধে যে মতবাদ বন্ধুটী পোষণ করেন তাহাতে ভগবৎসত্তার কোনো স্থান নাই, তাহা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে না। তথাপি তাঁহার মনের এই আকুলতা দেখিয়া আমার একান্ত আগ্রহ হইল যে, দ্বারকায় যাওয়া যেন সম্ভব হয় এবং শ্রীমন্দির দর্শনের জন্য বন্ধুটির যে আকাঙ্খা হইয়াছে তাহা যেন পরিপূর্ণ হয়।

যে কমিটীর সদস্য হইয়া আমরা যাইতেছিলাম তাহার মধ্যে আমিই প্রধান। সেইজন্য কোনো কিছুর ব্যবস্থা করার দায়িত্ব আমার উপরেই আসিয়া পড়ে। দ্বারকা দর্শনের সৌভাগ্য আমার ইতিপূর্বেই ঘটিয়াছিল; তথাপি পুনরায় দর্শনের আগ্রহ আমারও কম ছিল না। কিন্তু তৎকালীন অবস্থায় প্রায় অসম্ভব বিবেচনায়, নির্দ্দিষ্ট করিয়া কিছু বলিতে পারিতেছিলাম না। বন্ধুটী পথে কথাটা যতবার তুলিতেছিলেন ততবারই বলিতেছিলাম "মনে মনে ইচ্ছা করিয়া রাখো দেখো কি হয়।"

রাত্রিতে আহারে বসিয়া কথাটা আবার উঠিল। তখন পর্য্যন্ত চেষ্টা করিয়াও দ্বারকায় যাওয়ার কোনো বন্দোবস্ত করা যায় নাই। এখান হইতে যাইবার ট্রেন যে সময়ে আমাদের ধরিবার কথা তাহার মধ্যে ৩ মাইল গিয়া ফিরিয়া আসা মোটর ছাড়া সম্ভব ছিল না। একটা জীপের জন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়াছিলাম তাঁহারা ভরসাও দিয়াছিলেন কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জানাইয়াছেন উহা পাওয়া যাইবে না। এই অবস্থায় বন্ধুটীর মনে একটা গভীর আশাভঙ্গের বেদনা দেখা দিয়াছে এবং সে বেদনা আমিও অনুভব করিতেছি।

কথা প্রসঙ্গে তাঁহাকে বলিলাম—"তোমার একটা শেষ উপায় আছে। সে উপায় গীতার একটী শ্লোকে মেলে। কথাটী ভগবানের উক্তি।

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।"

"অনন্যচিত্ত হইয়া যাহারা আমাকে ভজনা করে তাহাদের সমস্ত ভার আমিই বহন করিয়া থাকি।" ইহা ভগবানের নিজের উক্তি বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি। যখন শয়ন করিতে যাইবে তখন এই কথাটা মনে মনে স্মরণ করিও। তুমি যদি অনন্যচিত্ত হইয়া ভগবানে সমস্ত সমর্পণ করিতে পারো তাহা হইলে দ্বারকা দর্শন সম্ভব হইতে পারে। বন্ধুটী বলিলেন—"ভগবান কি পরীক্ষা করিয়া লন?" বলিলাম, —"না, তিনি নিজে পরীক্ষা করেন না কিন্তু যাহারা অনন্যচিত্ত হইয়া তাঁহাকে সমস্ত সমর্পণ করে তাহাদের আচরণেই তাহা প্রকাশ পায়।" তাঁহাকে বুঝাইবার জন্য মহাভারত হইতে দৃষ্টান্ত দিলাম। কৌরব রাজসভায় দ্রৌপদী; দুঃশাসন সভামধ্যে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিতে সচেষ্ট; কোনো দিকে কোনো সহায় নাই; স্ত্রীলোককে কেহ যদি বিবস্ত্রা করিবার চেষ্টা করে তাহার প্রথম প্রয়াস হইবে পরিধেয় বস্ত্র আঁকড়াইয়া ধরা; এ চেষ্টা স্বভাবতঃ এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত ভাবেই ঘটিয়া থাকে। কিন্তু দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের যে বর্ণনা মহাভারতে পাওয়া যায় তাহাতে দেখা যায় দ্রৌপদীর সে চেষ্টাই নাই। মুক্ত দুই করে মুখাচ্ছাদন করিয়া তিনি তখন একান্তচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিতেছেন। পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরতায় তিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। ইহার ফল যাহা ঘটিয়াছিল তাহা দৈব ঘটনা; কিন্তু আমাদের বিশ্বাসে তাহা প্রত্যক্ষ বাস্তব সত্য। সেবাহীন বস্ত্রসম্ভার আবির্ভূত হইয়া দ্রৌপদীর লজ্জা নিবারণ করিয়াছিল।

এই আলাপের পর বিদায় লইয়া যে যাহার শয়নকক্ষে চলিয়া গেলাম। প্রাতঃকালে পুনরায় একসঙ্গে ভোজন কক্ষে সমবেত হইয়াছি। তখনও পর্যন্ত দ্বারকায় যাইবার কোনো বন্দোবস্ত নাই, সম্ভাবনা নাই। আমরা প্রাতরাশে নিযুক্ত, হোটেলের সংবাদবাহী আসিয়া আমাকে বলিল—"এক ভদ্রলোক আপনার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন"। উঠিয়া বাহিরের ঘরে আসিলাম। ভদ্রলোকটী বলিলেন—"আপনারা কি দ্বারকা যাইতে চাহেন?" বলিলাম—"একান্ত ভাবেই চাহি কিন্তু চেষ্টা করিয়াও কোনো উপায় করিতে পারি নাই।" ভদ্রলোকটী বলিলেন—"ভাবিবেন না, আমি গাড়ী দিতেছি আপনাদিগকে দ্বারকা দর্শন করাইয়া সন্ধ্যার মধ্যে ফিরাইয়া আনিবে।" পরিচয়ে জানিলাম তিনি দেবস্থানের একজন বিশিষ্ট অধিবাসী। কয়েকখানি গাড়ীর মালিক। গাড়ী পাঠাইবার সময় ঠিক করিয়া ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলেন।

ভোজন কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সংবাদটী যখন শুনাইলাম বন্ধুটীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না, বলিলাম "ভগবান তোমার মনের কথা শুনিয়াছেন এইবার প্রস্তুত হও।"

প্রাতরাশ সারিয়া রওনা হইলাম। ২০ মাইল পথ বড় কম নহে। পৌঁছিতে পৌঁছিতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল। মন্দির তখন বন্ধ। অপরাহ্ণের পর মূল মন্দিরের দ্বার খুলিলে শ্রীমূর্তির দর্শন হইল। শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী চতুর্ভুজ মূর্তি। শ্রীমূর্তির দর্শনের পর মন্দিরের সংলগ্ন অন্যান্য কক্ষে স্থাপিত মূর্তি ও চিত্র দেখিয়া দ্বারকা মঠাধীশ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। তিনি সাদরে সকলকে আশীর্বাদ করিলেন এবং শ্রীমন্দির সংস্কার ও রক্ষার প্রতি অবহিত হইতে অনুরোধ জানাইলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যের নিকট হইতে প্রসাদ ও আশীর্বাদ পাইবার পর আমরা ফিরিবার উদ্যোগ করিলাম।

ফিরিবার পথে যাহা ঘটিল তাহা খানিকটা "এণ্ড্‌ভেঞ্চারের" পর্য্যায়ে পড়ে। কিন্তু তাহা এখনকার আলোচ্য নহে। এখানে শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে সমস্ত বাধাবিপত্তি অতিক্রম করিয়া আমাদের কর্মসূচী যথারীতি রক্ষিত হইয়াছিল।

ফিরিবার সময় বন্ধুটীকে আর একবার স্মরণ করাইয়া দিলাম।—

"যোগক্ষেমং বহাম্যহম্"

বেঁটে সম্পাদকের আত্মকাহিনী

—বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

আমার খর্বাকৃতি চেহারার একটা সর্বজন পরিচিতি আছে। বিশেষতঃ দীর্ঘাকৃতি লোকদের তুলনায় আমার মত বেঁটে চেহারার লোক স্বভাবতঃই কৌতুকের বিষয় হতে পারে। সম্ভবতঃ এ জন্যই আমার সাহিত্যিক ও সাংবাদিক বন্ধু শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রায় বছর খানেক আগে (১৩. ১১. ৭২. তারিখের 'যুগান্তর' পত্রিকা) "হ্রস্ব-দীর্ঘ সমাচার" শীর্ষক সরস আলোচনার উপসংহারে মন্তব্য করেছিলেন—

"লম্বা এবং বেঁটে দুই হওয়ারই অবশ্য সুবিধা অসুবিধা আছে। আমার আপনার যেখানে নাগাল পৌঁছায় না, লম্বা মানুষ সেখানে হাত পাগার অনায়াসে। আবার যে খাটে আমি আপনি শুতে পারি, যে পাঞ্জাবী গায়ে গলাতে পারি, তিনি তা' পারেন না। বেঁটেদেরও প্রধান সুবিধা তাঁরা বাৎস্যায়ন মতে স্থির যৌবন বা যৌবনা হন। আর অসুবিধার দিকটা বিদ্যাসুন্দরের পতিনিন্দা অংশে দেখে নেবেন। কিন্তু ও কথা থাক। মনে রাখবেন তঃ প্রফুল্ল ঘোষ, বিবেকানন্দ মুখুজ্যে ও প্রেমেন্দ্র মিত্রকে, যাঁরা পশ্চিম বঙ্গের তিন বিখ্যাত বেঁটে মানুষ।"

নন্দবাবুর এই সরস মন্তব্য পড়ে যথেষ্ট কৌতুক বোধ করেছিলাম বৈ কি? সেই সঙ্গে একথাও সত্য যে, বেঁটেদের অসুবিধাও অনেক। এমন কি কোন কোন সময় বিড়ম্বনাও ভোগ করতে হয়। কিম্বা খর্বাকৃতি লোকদের দেখে সহসা কারুর সম্ভ্রম উদ্রেক করে না—যদিও লেনিন, নেপোলিয়ন, জুলিয়স সীজর প্রভৃতি যাঁরা পৃথিবীর ইতিহাসে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন তাঁরাও প্রকৃত পক্ষে খর্বাকৃতিই ছিলেন। আর নারীদের সঙ্গে সম্পর্কের বিষয়ে শেষের দু'জনের খ্যাতিও কম ছিল না।—বিদ্যাসুন্দরের পতিনিন্দায় যে ইঙ্গিতই থাকুক না কেন!

ব্যক্তিগত ভাবে আমার নিজের সান্ত্বনাও ওই ইতিহাস-খ্যাত ব্যক্তিদের রয়েছে! তবু বেঁটে মানুষ হওয়ার জন্য অভিজ্ঞতা প্রাপ্তির দিকটাও উপেক্ষনীয় নয়। সেই সম্পর্কে আমার দু'একটি অভিজ্ঞতার কথা এখানে উল্লেখ না করে পারছিনা।

১৯৪০ সালের ১৪ই বৈশাখ। তখন রবীন্দ্র জয়ন্তীর আধুনিক দেশব্যাপী এত প্রচার ছিল না এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তখনও সশরীরে বর্তমান। তথাপি সে সময় রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে যে সমস্ত সভাসমিতির অনুষ্ঠান হতো সে গুলির পিছনে যথেষ্ট গাম্ভীর্য ও গুরুত্ব ছিল। সেবার ফরিদপুর শহরে খুব ঘটা করে রবীন্দ্র উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। আমি তখন 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদক। কিন্তু তখন সুভাষচন্দ্রকে নিয়ে অখণ্ড বাংলার রাজনৈতিক মহলে তথা সারা ভারতে প্রচণ্ড বিতণ্ডা। একদিকে গান্ধী জওহরলাল নেহরু, তাঁরাই মেজরিটি এবং অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র মাইনোরিটি —কিন্তু জনপ্রিয়তায় বাংলার যুবকদের কাছে সুভাষচন্দ্র প্রায় যুবরাজ! 'যুগান্তর' পত্রিকা তখন সুভাষ বিরোধী—বিধান রায়, কিরণশঙ্কর প্রভৃতি গ্রুপের সমর্থক। আর আনন্দ-বাজার পত্রিকা স্বয়ং বসু-সুভাষ বসুর সমর্থক। কিন্তু ফরিদ-পুর শহরে যাঁরা রবীন্দ্র জয়ন্তীর আয়োজন করেছিলেন, তাঁরা এই দলাদলির ঊর্দ্ধে উঠতে চাইলেন। অর্থাৎ গান্ধী-নেহরুর পক্ষপাতী, আর সুভাষচন্দ্রের পক্ষপাতী এই দুই গ্রুপ মিলেই রবীন্দ্র বন্দনায় অগ্রসর হলেন। তাঁরা কলিকাতা থেকে যুগান্তর সম্পাদক হিসাবে আমাকে, আর আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে প্রফুল্ল কুমার সরকারকে এই সভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথির আসন গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক প্রফুল্ল কুমার সরকার শেষ মুহূর্তে আর

গেলেন না। একার উপরেই দায়িত্ব পড়লো।

হুমায়ুন কবির এবং তাঁদের পরিবার ফরিদপুর শহরের তখন সম্ভ্রান্ত বাসিন্দা। তাঁরা ছিলেন গান্ধী-নেহেরুর সমর্থক। আর অপর দিকে তখন ফরিদপুর বারের প্রসিদ্ধ লীডার এবং সুভাষচন্দ্রের সমর্থক ছিলেন দীনেশচন্দ্র সেন—বর্তমানে চলচ্চিত্র জগতের খ্যাতিমান পরিচালক শ্রীসুশীল সেনের পরলোকগত পিতা।

আমি হুমায়ুন কবিরের বাড়ীতে আতিথ্যগ্রহণ করেছিলাম। তখন তাঁর পিতা জীবিত। কলিকাতা থেকে আমি যেদিন ফরিদপুরে পৌঁছলাম সেদিন রাতে হুমায়ুন কবিরদের বাড়ীর একতলায় আমি বসে অন্য দু'একজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম, এমন সময় দীর্ঘাকৃতি মাঝারি চেহারার এক ভদ্রলোক প্রবেশ করলেন। ইনিই প্রসিদ্ধ আইনজীবী দীনেশ সেন। কিন্তু আমার পরিচয় পেয়ে এবং আমার নাম শুনে ভদ্রলোক খুব অবাক হয়ে গেলেন এবং কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন—

"আপনারই নাম বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়? কী সর্বনাশ! আমি ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই একজন লম্বা চওড়া লোক হবেন আপনি। কিন্তু আপনি তো নেহাৎ ছেলেমানুষ। আর আপনিই কিনা সুভাষের এত বিরোধিতা করছেন?"

ভদ্রলোকের চোখে মুখে অপরিসীম বিস্ময় দেখে আমি কিছুটা কৌতুক এবং কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করলুম। কিন্তু পিছু হঠলুম না, কেন নিখিল ভারতীয় কংগ্রেসের পক্ষে থেকে সুভাষচন্দ্রের বিরোধীতা করছি, তা বুঝাতে চেষ্টা করলুম। বলা বাহুল্য যে, সঙ্গে হিংসা ও অহিংসার দার্শনিক তত্ত্বের তুলিমালও সে রাতের ছোট কক্ষটিকে আঞ্জয় করলো।

বলা বাহুল্য যে, দীনেশবাবু খুব ভদ্রলোক ছিলেন। পরদিন সভার পর তাঁর গৃহে নৈশ ভোজের জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন।

কিন্তু পরদিন অপরাহ্ণে সভাক্ষেত্রে গিয়ে দেখি লোকে লোকারণ্য। ফরিদপুরের বিখ্যাত টাউন হল বা 'অম্বিকা হল'—জীবনে সেই প্রথম জনসভায় ভাষণ। বহু স্কুল কলেজের যুবক ও শহরের বিশিষ্ট লোকজন উপস্থিত। স্বভাবতঃই আমার বুক দুরদুর করছিল।

আমার বাড়ী ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমায়। জীবনে প্রথম জনসভায় ভাষণদানও ফরিদপুর শহরে এবং তা'ও রবীন্দ্র-জন্মতিথি উপলক্ষে এবং সেই সঙ্গে আবার দুই বিরোধী রাজনৈতিক গ্রুপের সম্মেলন! যোগাযোগটা আমার ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে একেবারে ঐতিহাসিক। এমনকি আমার জীবনের সুবর্ণক্ষণ বললেও অত্যুক্তি হবেনা। কিন্তু এমন সুবর্ণক্ষণেও আমার বেঁটে চেহারার জন্য একটু বাধা খেতে হলো।

সভায় আমার গাইড্ ছিলেন হুমায়ুন কবিরের পিতৃদেব স্বয়ং। সভা আরম্ভের আগের মুহূর্তে অনেক বয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে আমিও চেয়ারে বসেছিলুম। এমন সময় জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক হুমায়ুন কবিরের পিতাকে জিগ্যেস করলেন—"আজকের সভায় যিনি প্রধান বক্তা সেই বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় কোথায়?"

কবির সাহেবের পিতা আঙুল দিয়ে আমাকে দেখিয়ে বললেন, "ইনিই সেই ব্যক্তি।"

এই কথার পর সেই ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে কেবল অবাক বোধ করলেন না, আমার নিতান্ত বালকোচিত চেহারা (বেঁটেদের যতই বয়স হোক, দেখতে ছেলেমানুষ মনে হয়- যদিও আমার তখন বয়স ৩৬ বছর) দেখে এমনভাবে নাসা কুঞ্চিত করলেন যে, তাঁর সমস্ত মুখে যেন একটা তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠলো এবং তারপর তিনি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে একেবারে চুপচাপ বসে রইলেন, আর একটি বাক্যালাপও করলেন না।

এই ঘটনায় আমি কিছুটা আহত বোধ করলুম বৈকি! সৌভাগ্যক্রমে আমার সেদিনের বক্তৃতা (লিখিত ভাষণ) সমগ্র সভার উপর যেন বিদ্যুৎসঞ্চার করলো এবং যুবকেরা একেবারে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। জীবনে সেই আমার প্রথম বক্তৃতা এবং প্রথম সাফল্যের গৌরব।

ফরিদপুরের অম্বিকা হলের ১৯৪০ সালের রবীন্দ্রজয়ন্তী

আমার জীবনে এক ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রথম সেদিন থেকেই বক্তা হিসাবে আমার নাম ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। সাহিত্যিক শ্রীরণজিৎকুমার সেন সেই সভাতে উপস্থিত ছিলেন। পরবর্তীকালে বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত তাঁর একটি পুস্তকে তিনি আমার ফরিদপুর টাউন হলের সেই বক্তৃতার অত্যন্ত সপ্রশংস উল্লেখ ও আলোচনা করেছেন, যার জন্য তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

কিন্তু বক্তা হিসাবে জীবনে এই প্রথম সাফল্যের উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও আজও আমার স্মৃতিতে কাঁটার মত বিদ্ধ হয়ে আছে আমার বেঁটে চেহারার জন্য সেই ভদ্রলোকের তাচ্ছিল্য আর দীনেশবাবুর বিস্ময়বোধ।

• • •

এই প্রসঙ্গে আর একটা মজার ঘটনাও বলতে পারি। তখন ১৯৪৩ সাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের তামাডোলে সারা পৃথিবী কম্পমান। 'যুগান্তরে' মহাযুদ্ধ সংক্রান্ত আমার সম্পাদকীয় ও বিশেষ রচনাগুলির জন্য চারদিকে আমার প্রচুর নামডাক। এমন সময় উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে যুদ্ধ সংক্রান্ত একটি প্রকাণ্ড জনসভায় ভাষণ দেওয়ার জন্য আমার কাছে অনুরোধ এল। আমিও সোৎসাহে জলপাইগুড়ি রওনা হয়ে গেলুম। ষ্টেশনে যখন ট্রেন এসে থামলো তখন দেখা গেল অনেক ছাত্র ও যুবকের ভীড়। কয়েকজন ছাত্র ট্রেনের নানা কামরায় উঁকি মেরে কাকে যেন খুঁজছে—আমি ব্যাপারটা আন্দাজ করলুম। তাদের মধ্যে দু'তিনজন খুব ব্যস্তভাবে আমার কাছে এসে সহসা জিগ্যেস করলো—"আচ্ছা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের এই গাড়ীতে কোলকাতা থেকে আসবার কথা ছিল, তিনি কি এসেছেন, বলতে পারেন?"

আমি তৎক্ষণাৎ অম্লান বদনে জবাব দিলুম, "না, তা তো বলতে পারি না। তাকে আমি চিনি না?"

ছেলেরা মুখ বেজার করে চলে গেল।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা জলপাইগুড়ি শহরের একটি হলের মধ্যে জনসভা—প্রচুর নরনারীর ভীড়। আমি অনেকক্ষণ ধরে আবেগপূর্ণ বক্তৃতা দিলুম।

জলপাইগুড়িতে আমার বোনের বাড়ী। বক্তৃতা শেষে আমি সেখানে ফিরে এলে আমার বোন বললো—

"জানো দাদা তুমি যখন বক্তৃতা করতে উঠলে, তখন মেয়েরা কি বলাবলি করছিল?"

"কি বলছিল?"

আমার বোন জবাব দিল—"মেয়েরা বলছিল, এ যে দেখছি এসেবারে 'পোলাপান' (অর্থাৎ ছেলে মানুষ) এ আবার কি বক্তৃতা দেবে? কিন্তু বক্তৃতার শেষে তারাই খুব উত্তেজিত ভাবে বলতে লাগলো—

"নাঃ ছেলেমানুষ হলে কী হবে, গলায় খুব জোর আছে! আর মুখে যেন খই ফোটে!"

কিন্তু আমার খর্বাকৃতি নিয়ে ঘোর শান্তিনিকেতনে কবিগুরুর আশ্রমে যা ঘটেছিল তা আমার জীবনে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে।

সে অনেককাল আগেকার কথা। ১৯৩৬ সাল আমি তখন আনন্দবাজার পত্রিকার (বর্মন ষ্ট্রীটের অফিস) সহকারী সম্পাদক, স্বনামপ্রসিদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের প্রায় দক্ষিণ হস্তের মত। আনন্দবাজারের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব সুধা কান্ত রায়চৌধুরীর মারফৎ এই সাক্ষাতের ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু লেখক হিসাবে তখন আমার এমন কোন প্রতিষ্ঠা ছিল না যে আমি সেই জোরেই শান্তিনিকেতনে যেতে পারি। বিশেষতঃ তখন পর্যন্ত এখানে যাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। কিন্তু 'দেশ' সাপ্তাহিকের সহকারী সম্পাদক কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের যাতায়াত ছিল। অতএব তাঁর সঙ্গে সহযাত্রী হয়ে আমি শান্তিনিকেতনে গিয়ে হাজির হলাম। নবাগত হিসাবে আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শান্তিনিকেতনের এদিক ওদিক দেখানো হচ্ছিল—সকালের দিকে। এমন সময় ঘুরতে ঘুরতে যখন একটা গাছের তলায় গিয়ে পৌঁছেছি, তখন সেখানে সুপণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেনকে দণ্ডায়মান দেখা গেল। বলা বাহুল্য যে, আমার সঙ্গে তখন তাঁর কোনও পরিচয়ই ছিল না। কিন্তু বিজয়লালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। ক্ষিতিমোহন সেন আমাকে লক্ষ্য করে কবি বিজয়লালের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

বিজয়লাল পরিচয় দিয়ে বললেন—"কবি বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, আনন্দবাজারের সহকারী সম্পাদক।"

ক্ষিতিমোহন সেন আমার মুখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টি রেখে বলে উঠলেন—

"এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়,
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিস্ময়।"

ক্ষিতিমোহন সেনের মত একজন বিখ্যাত মনীষীর মুখ থেকে হঠাৎ এই বিদ্রূপাত্মক রসবাক্য শুনে আমি প্রায় হতভম্ব! কবিগুরুর 'হিং টিং ছট্'-এর ওই বিখ্যাত লাইন দু'টি যে আমার মত বর্ষীয়সী লোকের উদ্দেশ্যে এভাবে প্রযুক্ত হতে পারে তা কোনদিন কল্পনা করিনি। পাণ্ডিত্যের সঙ্গে অপূর্ব রসবোধের জন্য ক্ষিতিমোহন সেন সাহিত্যিক মহলে বিশেষ প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় ছিলেন। তারপর থেকে তাঁর এই 'হিউমার' বা রসিকতার মত পরিচয় পেয়েছি ততই মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু শান্তিনিকেতনে আমার প্রথম পরিদর্শন এবং তারপর থেকে কবিগুরুর সঙ্গে আমার পর পর দু'দিন ৩ ঘণ্টা সাক্ষাৎকার আমার কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সেই সঙ্গে কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়ের সহৃদয়তাও ভুলবার নয়।

অবশ্য আমার বেঁটে চেহারার জন্য একটা সুবিধাও ছিল। দেশে বিদেশে বহু লোকই আমার বয়স সম্পর্কে ঠাওর করতে পারতো না। এমন কি আমার যখন ৬০ বছর বয়স ছিল, তখনও অনেকে আমাকে ৪৫ বছরের 'যুবক' বলে মনে করতো।

কিন্তু আজ আর সেই আত্মগোপনের দিন বয়স গোপনের সুযোগ নেই। কারণ, আজ '৭০'-এ পা দিয়েছি এবং এই বয়সে বেঁটেরাও আর 'স্থির যৌবন' (বন্ধুবর নন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক বাৎস্যায়নের উদ্ধৃতি অনুসারে) দাবী করতে পারেন না। এমন কি সেদিনের 'যুবক' প্রেমেন্দ্র মিত্রও না।

"শিউলির ডালে কুঁড়ি ভরে এল,
টগর ফুটিল বেলা।
মালতী-লতায় খোঁজ নিয়ে যায়
মৌমাছি দুইবেলা।

গগনে গগনে বরষন-শেষে
মেঘেরা পেয়েছে ছাড়া।
বাতাসে বাতাসে ফেরে ভেসে ভেসে,
নাই কোনো কাজে তাড়া।"

—রবীন্দ্রনাথ।

'সরকার—সেলাম' !

—পুলকেশ দে সরকার

মুক্ত 'ধরো ধরো'র পকেট প্রবেশদ্বারটাও আমার পেছনে ঘুর্ করে বন্ধ হয়ে গেল। বাইরের জগত থেকে আমি এখন বিচ্ছিন্ন; ভিন্ন এক রাজ্যে; আমার চারদিকে নিষেধের প্রাচীর তোলা। আমি বন্দী।

এইমাত্র ওঁরা আমায় পৌঁছে দিয়ে গেল। ওঁরা মানে এক মস্ত মিছিলের লোকেরা, ছেলেরা মেয়েরা, বুড়োরা, তরুণেরা। মালাও দিয়েছিলেন ওঁরা আমার গলায়; সারা পথটায় দিয়েছেন ধ্বনি দেশমাতৃকার বন্দনায়।

আমার শরীর তখনও থর্থর করে কাঁপছে। স্বচ্ছন্দে বসা যদিবা যায়, দাঁড়াতে গেলেই দুর্বল স্নায়ুগুলো অস্থির হয়ে পড়ে। শুয়ে থাকতে পারলে ভালো।

প্রতিপক্ষ জানত, আমার এ শরীর নিয়ে পালানো কঠিন; ধরতে হয় তো এই সময়। তাই ওঁরা এসেছিলেন কাগজ-পত্রে প্রস্তুত হয়েই, পরোয়ানা ছিল গ্রেপ্তারের।

শহর জুড়ে হরতাল। ঠিক হরতালও নয়, পুলিশ বয়কট। বাজারে তাদের জিনিস বন্ধ, গাড়ী ঘোড়া নারাজ; সহযোগিতার হাত বাড়ানো নেই একটিও। এই সেদিন দৌরীপুর ময়দানে লাঠি চালিয়াছে ওরা—নির্মম, নির্বিচার—। বুড়ো শহরের লোকে দাঁড়িয়ে দেখেছে। মিলিটারী হুকুম তামিলের জন্য প্রস্তুত, আসাম রাইফেলসের সঙ্গীন উদ্যত, লাঠিয়াল পুলিশ উদ্যত। মুষ্টিমেয় নিরস্ত্র অসহযোগকারী সত্যাগ্রহীকে যদি লাঠিয়াল সামলাতে না পারে, সঙ্গীন খেঁচে-খুঁচে মেরে বিদ্রোহী পরিবেশকে, শেষ অস্ত্র মিলিটারী 'গোলি'।

এমন কি শহরবাসীদের সহানুভূতি তোলবার চেষ্টা তোলেন নি। তাই কাঁদ ফেলে দিয়েছেন লাল-পাগড়ী খাকি পোষাকের মুখের ওপর। তোমরা মানুষ নও, তোমরা মানুষ মারতে পার, খুন করতে পার।

মেরেছে। নিরস্ত্র আইন না-মানাদের ওপর সঙ্গীন চালাতে হয়নি, মিলিটারীর 'গোলি'ও খরচ হয়নি, লাঠিয়া' লেরাই কুকুর-পেটা করে মাঠ খালি করে দিয়েছে। ওরা বীরদর্পে চলে যাবার পর মাঠে পড়ে-থাকা অচেতন আহতদের কুড়োবার পালা। সে কাজ পুলিশের নয়। অশ্রুময়ী মেয়েদের নয়তো ক্রন্দনরোলে উন্মত্ত ছেলেদের, বুড়োরাও নির্বীর্য কুকুরের মত কথা তুলতে চাইছেন। চোখে দেখেছেন তাঁরা।

●

কার্শিয়াং-এ চড়াই-উতরাই দিন কাটছে; খাদ্যের পরিবর্তন ঘটাবো এই ছিল বাসনা। স্টেশন থেকে আস্তানায় আসতে চোখ পড়ল চাটগাঁর ওপর; খবরের কাগজে যে চাটগাঁর ছবি ফুটে উঠেছিল। অস্ত্রাগার লুট হয়েছে। বাংলার জাগ্রত যৌবন আইন আমান্যের এক নতুন মহড়া দিয়েছে। আরব সাগরতীরে চলেছে লবণ অভিযান, অহিংস সত্যাগ্রহ। ভিন্নতর বিপ্লব ঘটেছে বঙ্গোপসাগরতীরে—চাটগাঁয়।

হাতের কাগজটা খোলাই ছিল। পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন সাহেব-মেম, সম্ভবতঃ দম্পতি। সংবাদটায় চোখ বুলিয়ে বললেন, কি কাণ্ড চলেছে বাঙলায়।

ভাঙচুরটা বিশেষ কিছুই ছিল না; তড়িঘড়ি নেমে এলাম শিলিগুড়ি তারপর শর্শিল পথাভিক্রম করে দুবড়ী।

এসে শুনি চাটগাঁর পলাতক বিপ্লবীর খোঁজে দুবড়ী শহর তোলপাড়; রায়বাহাদুর সরকারী অফিসারদের বাড়ীও রেহাই পায়নি। ক্রন্দনরোলে উন্মত্ত সবাই। একাকার। যেমনি একাকার ময়দানের প্রতিবাদ সভা। কলকত্তার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ড নয়, তখনকার অকটরলোনি মনুমেন্টের পাদদেশেও নয়, ছোট্ট শহরের ছোট্ট মাঠ; কিন্তু কানায় কানায় পূর্ণ; উপচে পড়েছে চারদিকের রাস্তায়।

মানুষ আর মানুষ। একটা লাগসই প্রত্যুত্তরের জন্য উদ্‌গ্রীব। কে এই অভিমানাহতদের ভাষা দেবে?

না, না, এ অপমান অসহ্য। কিন্তু তা কি নিরুপায় আস্ফালনেই শেষ হবে? অন্ততঃ একটা প্রতিবাদ—সহস্রকণ্ঠে উচ্চারিত প্রতিবাদ।

রায়বাহাদুরই চেয়ার পেলেন। বর্ষীয়ান, প্রভাপান্বিত, সমাজের নেতা। রাজনীতি স্পষ্টতঃই বিপরীত; স্বদেশী, বিদ্রোহ, বিপ্লব, সত্যাগ্রহ, অগ্নিগর্ভ আস্ফালনের সভা কিছুতে নেই। সেই ঠাণ্ডা রক্তেও দোলা লেগেছে, রাজাদ্রোহেরও এই একই পুরস্কার!

আমার বয়স তখন কুড়ি। স্বদেশীতে হাতে-খড়ি হয়েছে বেশ কয়েক বছর আগেই। দেশীয় রাজ্য কোচবিহার জন্ম। চেউ এসেছিল ১৯১৪-১৮ ইংরাজ-জার্মান যুদ্ধাবসানের। হাতে কমলা ও বুকে ছুলিয়েছিলাম রোজ মেডেল। আবার লাগল আর এক জোয়ারের ধাক্কা। ১৯২১ অসহযোগ আন্দোলনের আচ্ছন্ন আকাশের তলায় মাথায় তুলেছিলাম গান্ধী টুপি—ক্লাশেই। বিপ্লবীদলের আড্ডাটিদের হাতে হাতে এসেছিল লিবিলান কামটির রিপোর্ট, সাহিত্য সভার নির্বাসিতদের আত্মকথা, কারাকাহিনী, কারাজীবনী, বন্দীজীবন, বিপ্লবপ্রচেষ্টা—গোগ্রাসে গিলেছি। সংসার অরণ্য বুঝেছি, নিজের চারদিকে তুলে চলেছি তপশ্চর্যার কাঠিন্য; তারপর কলেজ ছেড়ে একদিন নিরুদ্দেশ যাত্রা। এখানে ওখানে নানাভীড়ে সত্যিকার অরণ্যে নির্জনতায়, নিয়তির চক্র ঘুরছে অবিশ্রান্ত। কলমে আগুন ধরেছে। লিখেছি "বিপ্লব পথে ভারত"। রাজরোষে পুড়ে ছাই। বাজেয়াপ্ত। আবার "ফাঁসীর আশীর্বাদ" "রক্তে লেগেছে সর্বনাশের নেশা"। বাজেয়াপ্ত। প্রকাশক ব্রজবিহারী বর্মণ গ্রেপ্তার, লেখক পলাতক। আমি।

চোরাপথে ধুবড়ীতে। আত্মপ্রকাশ নিষেধ। কিন্তু সারা দেশ, হ্যাঁ, ধুবড়ীও যখন আত্মপ্রকাশে উন্মুখ, অন্ধকার গুপ্ত কক্ষ থেকে বেরোবার সাগ্রহ অনুরোধ এল। বেরোলাম।···

সেই উত্তপ্ত তারুণ্য।

ধুবড়ীর গৌরীপুর মাঠে বিরাট প্রতিবাদ সভার এক বক্তা আমি, তরুণের বিদ্রোহ। কি বলেছিলাম মনে নেই; অতি ধীর শান্ত আবেষ্টনের নিস্তব্ধতা ভার দিতে পারিনি। বলেছিলাম, যারা ইচ্ছে করে সজ্ঞানে করেছে অবিচার তাদের কাছেই সকাতর প্রতিকার প্রার্থনা? প্রতিপক্ষ অপমান করছে, সইতে রাজি নই, কিন্তু আত্ম-অবমাননা আরও দুঃসহ। একবার কি এই পর নির্ভরতা ছেড়ে সোজা শিরদাঁড়ায় দাঁড়াতে পারিনে আমরা? এমনি সব কথা।

তরুণ কণ্ঠোচ্চারিত অভিযান হয়তো উপেক্ষা করা যেত কিন্তু তার প্রতিধ্বনি ঘটল এক অপ্রত্যাশিত মহলে। এক বৃদ্ধা—বেলাবাবুর মা—বললেন, অপমানবোধ? অপমানবোধটা তোমার কোথায়? হৃদয়ে না শরীরে। জমিদারের কাছে এক কর্মচারীর নালিশের গল্প তিনি বললেন। প্রজারা তাকে লাঞ্ছনা দিয়েছে, 'অধিকন্তু' নাকে অপমান করতে চাইছে। জমিদার জানতে চেয়ে ছিলেন, অপমানবোধটা তোমার কত পর্দা চামড়ার নীচে?

সভা ধিক্কার দিয়ে প্রতিকার প্রার্থনার প্রস্তাব পাল্টে দিল।

এই প্রকাশ্য বৈধ নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনে সামিল হতে আসান আমি ধুবড়ীতে। গুপ্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূত্রকে হাত রেখে চলেছি বরাবর। প্রকাশ্য আন্দোলনের প্রবল ঢেউ আমাকে গোপন কোনে টেনে তোলেনি; জনতা বুঝে জিজ্ঞাসায় জানতে চায়, পীড়ন দমনের মোকাবিলা করতে আমি প্রস্তুত কিনা, নইলে প্রত্যয় হয় না; হয়তো দূরত্বে পালানোও অভ্যেস প্রতিপন্ন হয়। আসতেই হ'ল দিবালোকে বহু মানুষের দৃষ্টিগোচরে এবং আমারও নজর সমবয়সী বা আরও ছোটদের ওপর। প্রকাশ্য আন্দোলনকে পুরোপুরি কাজে লাগাব, কিন্তু আত্মোৎসর্গে আমিও যে প্রস্তুত এ প্রমাণের ঝুঁকিও নিতে হবে প্রকাশ্যেই। বলিদানের চত্বরে আনতে হবে যে ওদেরও।

এই প্রতিবাদ সভার পরদিন থেকে উত্তাপ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য প্রত্যহ ফেরী, সান্ধ্য মিছিল আর কোন-না-কোন উপলক্ষ্য অজুহাতে জনসভার শৃঙ্খল-শৃঙ্খলা রচনা করতে লাগলাম। রোজ। রোজ।

এরই মাঝে, সত্যিই এক শীতল্লী পলাতক এলেন। পুলিশ খবর পেয়েছিল ঠিকই ; কিন্তু সময় নির্ঘণ্টটা পিছলে গেছে। পলাতক এলেন শহর ছয় তল্লাসীর পর, হয়তো তিনদিন পর। ঠিক মনে নেই। মনে আছে মেসের সেই অন্ধকার রাতটা। এই বিপুল বিশাল ব্রহ্মপুত্র পার করে দিতে হবে পলাতক বিপ্লবীকে, প্রস্তুতি চলছে, হ'ল পাড়ি দেবার আয়োজন, গৈরিক বসনাবৃত মানুষটার দুহাত জড়িয়ে ধরে ছিলাম। বিদায় বেলায় আর কিছু বলিনি।

পুলিশ চেঁড়া পিটিয়ে ঘোষণা করল একশ চুয়াল্লিশ ধারা—সভা মিছিল কিছুই না—নিষিদ্ধ এলাকায়। বুদ্ধিমানেরা পরামর্শ দিলেন, ভাবনা কি, মিউনিসিপাল এলাকার বাইরে চরে হবে সভা।

পলায়ন ? কাকি ? জানতাম, মুখোমুখি মোকাবিলা একদিন হবেই, নয়তো তলিয়ে যেতে হয়, দর্শার অন্তরালে, তারপর অকস্মাৎ বিস্ফোরন। কিন্তু জড়িয়ে গেছি প্রকাশ্য আন্দোলনে, প্রকাশ্যেই ফয়সালা করতে হবে, দাম দিতে হবে। পিছিয়েছি এ ধারণা যেন পুলিশ না করে, জনসাধারণ না করে। পুলিশের কাছে হার মানা নয়, জনসাধারণের বিশ্বাস ভেঙে দেওয়া নয়। অসম্ভব।

বাজেয়াপ্ত বইয়ের জন্য পুলিশ যখন আমায় খুঁজছিল কলকাতায়, বিপ্লবী রবি সেন বলেছিলেন, পচা শামুকে পা কাটবে ? আমি নির্বোধের মত তাঁর দিকে তাকিয়েছিলাম। তিনি বললেন, পালাও।

সেই পালিয়ে এসেছিলাম ধুবড়ীতে। কিন্তু আজ আর পালাবার পথ নেই। ধুবড়ীর তারুণ্য আমার মুখাপেক্ষী, সামান্য অনলে সব ধসে পড়বে। সুতরাং যে পা বাড়ানো ছিল তাকে আরও এক কদম এগিয়ে দিলাম।

ক্যানেস্তারা বাজিয়ে পাল্টা ঘোষণা করা গেল, সভা হবে, মিছিলও হবে। হবেই। সকালবেলা ছিল আমাদের ঘোষণা, একটু পরে পুলিশের ঘোষণা তারপর আবার পাল্টা ঘোষণা। সংগ্রাম—সংগ্রাম ; সমানে সমানে নয়, অস্ত্রে অস্ত্রে নয়, অস্ত্রবল আর চিত্তবলের। ফল—ভবিষ্যৎ, আপাততঃ সীতার অগ্নিপরীক্ষা।

আশ্চর্য, বহু ছেলে এল, কিছু আধাবয়সীও। হ'ল মিছিল। পথের ধুলো উড়িয়ে আকাশে ছুঁড়ে দেওয়া গেল স্বদেশী সঙ্গীত ; ধুলো তখন আবিরের রঙ পায়নি, কিন্তু রাঙিয়ে দিয়েছে তরুণ তরুণীর মনগুলোকে। চলছে শহর পরিক্রমা। বাড়ীর সামনে এসে বন্ধ দরজা পেছনে রেখে সেরস্ত মেয়েরা সস্নেহে সভয়ে দেখছেন দুর্দান্ত দুর্দমনীয় ছেলেদের ; নিশ্চিত মরণের সুমুখে যাচ্ছে এরা যাবেই। ঘরে ঘরে চাঞ্চল্য। আঁচলে বেঁধে রাখা গেল না কাউকেই। যেন পাইড পাইপার জাদু দিলেন, বাড়ীর দরজাগুলো খুলছে, মিছিলের আয়তন বাড়ছে ; এদের পায়ে উৎকীর্ণ ধূলিকণায় চমকে উঠছে গাছে পাখীগুলো, উৎকর্ণ হয়ে শুনছে এদের সমস্বর গান ; মায়েদের বুকে ধুকধুকানি শব্দ—মাগো !

শহর পরিক্রমায় কিছু বলল না, মিছিল নিবিঘ্নে এল মাঠের কাছে। একবার সেই সমাগত জনতাকে উদ্দেশ বললাম, মা'র হবেই, ওরা প্রস্তুত, সুতরাং বিদায়ার্থীরা সাবধান। একেবারে স্বেচ্ছায় না-ধেরে মার খাওয়ার জন্য প্রস্তুত যাঁরা আসুন তাঁরাই।

মিছিলের আয়তন কিছু খসকে দাঁড়াল। বাকীটা নিয়ে নামলাম মাঠে আমরা। একেবারে সামান্য নয়। পুনরাবৃত্তি করলাম সাবধান বাণীর। অদূরে লাঠিয়াল, কিছু দূরে রাইফেলস্, কিছু আড়ালে···

আরও কিছু কমল। খুশী হ'লাম। কারণ, কাউকে জীবন দেওয়ার সামর্থ্য নেই আমার, জীবন দানে ডাকব কোন্ অধিকারে ? তবু স্বেচ্ছায় অবস্থানকারীর সংখ্যা নগণ্য নয়, অন্তত সেদিন আমার চোখে বেশ বড়ই ঠেকেছিল।

সভানুষ্ঠানের উদ্যোগে সভাপতির একটা লোহার চেয়ারও আনা গেছল, সে চেয়ারে বসলেন প্রেমাংশু দাশগুপ্ত, শ্রোতারা বসে পড়লেন সবুজ ঘাসের ওপর। বলব আমি।

'পুলিশ সমভিব্যাহারে' এগিয়ে এলেন ডি-সি। হাতের কাগজখানা আমাদের উদ্দেশ্যেই পড়লেন, আমরা কর্ণপাত করিনি। পর মুহূর্তেই—

একটা পতাকা ছিল, কংগ্রেসেরই এবং আমার হাতে ; পুলিশ কেড়ে নেবে, আমি দেব না। লাঠিয়াল পুলিশেরা পাগল হয়ে গেছে, কুকুর তাড়া করছে, লাঠি সোজা

আকাশে তুলে ফেলছে মানুষের গায়ে ; তখনও দেখছি, এ ও গড়িয়ে পড়ছে, হেলাই নেই, পড়া মানুষের ওপর চলছে বেধড়ক মার, ওরা মাঠ খালি ক'রে ছেড়েই, আর দেখতে পাই নি, আমার গায়ে কত ঘা পড়ছে কি হয়েছে তাও খেয়াল করিনি ; সে এক অস্বাভাবিক অবাক উত্তেজনায় আমি বেহুঁস, বেদনাবোধ নেই, দাঁড়িয়ে, বসে, না শুয়ে তাও মনে নেই, একবার মনে হ'ল কে ঝুঁকে পড়ে কি বলছেন, মা কি ?…

কিন্তু না, বেঁচে গেছি মেসে এনে ওরা শুধু আমায় ঘুম পাড়িয়ে রাখছেন, কোথায় যে যন্ত্রণা ধরতে পারছিনে। দুটি শিশু এসে বসে কাছাকাছি, অন্তরাল থেকে মায়ের আশীর্বাদের স্পর্শ লাগে মাথায়। আমি অজানিতে আলগোছে মাথা নেড়াই। এ ও আসে, স্বপ্নের মত লাগে ; ঘোর কিছুতেই কাটে না।

একদিন তাও কাটল। এবং সেই দিনই। কোনরকমে শৌচাগারে গেছি ; সব শরীর কাঁপছে, পড়ে যাব না তো ? না, পড়িনি, আবার তেমনি হাতড়াতে হাতড়াতে কি রকম একটা অশক্ত দেহ টেনে টেনে এসে বসেছি শুরুপোষে—এমন সময় সমন হাজির।

প্রস্তুতই ছিল ; রুদ্ধশ্বাস ওরা আশেপাশেই ; খবর পেতেই ছুটে এসেছে। মেস—আর প্রকাণ্ড আন্দোলনের অপরাধী আমি, খুঁজতে হয় না, হাত বাড়ালেই হয়। অপরাধ ? অপরাধ, সেইদিনের মাঠের বক্তৃতা, রাজদ্রোহ, রাষ্ট্রদ্রোহ, তাঃ দঃ বিধির ১২৪ক ধারা।

আশ্চর্য দক্ষতায় এক ঠেলাগাড়ী নিয়ে এসেছে পুলিশ আমাকে নেবে ব'লে। শুরুপেরা গেল ক্ষেপে, রুখে দাঁড়ালো এমন অনাচারের বিরুদ্ধে। পুলিশ বলল, উপায় কি ? আপনারাই তো হরতালের ডাক দিয়ে বসে আছেন, একটাও গাড়ী পাওয়া যাচ্ছে না, কেউ আসবে না আমরা ডাকলে। আপনারা আসুন।

কিন্তু যে-নিয়ম সর্বসাধারণের জন্য তা তবে আমার জন্য ; তবে হেঁটে ? আবার শুরুপেরা গর্জে উঠল, এই রুগ্ন অশক্ত লোকটা হাঁটবে ? পুলিশ বলল, উপায় কি বলুন ? আমাকে ওরা একটা চেয়ারে বসালো। তারপর চলল। কিছু বয়স্ক একজন ঐদিকে বললেন, একটু ব্যতিক্রম না করলেই নয়, —র নিজের গাড়ী আছে, তিনি নিজে চালিয়ে নেবেন, আদালতে, আদালত থেকে জেলে।

একটিই গাড়ী বেরুলো রাস্তায়, মেস থেকে আদালতে সঙ্গে চলমান জনতা আদালত থেকে জেল গেট অবধি ; বিচ্ছিন্ন আর এক জগতে ঢোকবার আগে ওঁদের উদ্দেশে রাখলাম এক বিনম্র নমস্কার।

দুই

আমার ষোলমাস সশ্রম কারাদণ্ড হয়ে গেল।

ডেপুটি কমিশনার রায় দিলেন : সত্য অসন্তোষের সৃষ্টি করে ; অতএব তা রাষ্ট্রদ্রোহ।

কি বক্তৃতা দিয়েছিলাম, তার অবশ্যই একটা রিপোর্ট তাঁরা পেয়েছিলেন, কোন পুলিশ দিয়ে থাকবে। কোথাও স্থির হয়ে বসে লেখেনি। ছেলেদের জন্য সে উপায় ছিল না। শর্টহ্যাণ্ডেরও প্রচলন ছিল না। কেউ স্মৃতি শক্তির ওপর নির্ভর করে কিছু একটা রিপোর্ট ক'রে থাকবে। আসাম সরকারের আদালতী ফাইল দস্তাবেজে হয়তো সে সাক্ষ্য খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমি এখনও যেমন নির্বিকার তখনও এমনি নির্বিকার ছিলাম।

আইন অমান্যের সঙ্গে একটা উদ্ভট রেওয়াজও চালু হয়েছিল। আইন অমান্য ক'রে ধরা পড়ো, কিন্তু এর পর আর কোন আইন অমান্য কোরো না, বিচারেও আত্মপক্ষ সমর্থন কোরোনা। সেকালে স্রোতে ভেসেছি, যুক্তি খুঁজিনি, আজ স্রোতে ভাসছি নে, যুক্তিও খুঁজে পাইনে। সেদিন যেটা করেছি সেটাও চরম। আদালতের সঙ্গে কোন সহযোগিতা করিনি। একটা একটা করে সাক্ষীর সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে আর আমাকে ডেপুটি কমিশনার জিগগেস করছেন, জেরা করবেন ? আমি বলেছি না। বারবার জিগগেস করাতে কেননা, সেটাই বিধি, একবার আমি উদ্ধতকণ্ঠে বলেছিলাম য়্যাম আই টু রিপিট মাই ইনটেনশান ?

ঐটুকু ঔদ্ধত্য না দেখালেও চলত। আমি জানতাম, আমি ধরা পড়ব, পালাইনি। ধরতে এসেছে, শারীরিক অপারগের জন্যই হোক, অনিচ্ছায়ই হোক পালাইনি।

বিচারেও নীরব থাকতে পারতুম। আত্মপক্ষ সমর্থন করিনি লজ্জায় এবং সেকালের ঐ এক নির্বোধ স্রোতে গা ভাসিয়ে দেওয়ায়।

আমার সঙ্গে আরও একজন ছিলেন, আমার চাইতে বয়সে বড়, ধীর স্থির, তাঁরও বিরুদ্ধে ঐ একই অভিযোগ। তিনি নিয়ম মেনেছেন। একই সঙ্গে আমাদের দণ্ড হয়েছে তাঁর একবছর বিনাশ্রম আমার ষোলো মাস (অর্থাৎ চার মাস বেশি) সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

কারাদণ্ডের পর যখন কয়েদী হ'লাম, আর ছাত্রতী নই ; তখন একদিন ডেপুটি কমিশনার এসেছিলেন, কোন অসৌজন্য দেখাই নি ;

বুবড়ী (সাব জেলের ডাক্তার-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন অতি ভদ্র মানুষ ; লোকে বলত, স্বদেশীদের প্রতি সহানুভূতি সম্পন্ন। কখ্খনো সুমুখে আসতেন না ; কিন্তু আদর-যত্ন বুঝতে পারতাম। যদ্দিন বিচারাধীন ছিলাম, বাইরে থেকে খাবার আনতে দিতেন। টিফিন কেরিয়ারে মা পাঠাতেন দু'জনের মত। হঠাৎ একদিন তা বন্ধ হয়ে যায়। হয়তো গোয়েন্দা বিভাগের নির্দেশে। জানিনে কোন চিঠিপত্তর পাওয়া গেছল কিনা। ঠিক মনে নেই। কিন্তু এজন্য স্পষ্টতঃই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ দাস দায়ী ছিলেন না।

কয়েদী হলে, বিশেষ সশ্রম কারাদণ্ড হলে আর ভদ্র পোষাক পরা চলে না ; ঐ দাগ টানা হাত-কাটা কামিজ আর দাগ টানা হাফ প্যাণ্ট। কদর্য। জেদ বশে তাও পরেছি। দাস সাহেব আমাকে মেটদের কোট পরতে দিয়েছিলেন। ছেলেমানুষ, ঠাণ্ডা লাগবে। কয়েদীদের মধ্যে যাদের মেয়াদ বেশি, এককালে তারা কয়েদীদের পাহারাদার হয় ; তারাই মেট ; তাদের পোষাক কিছু স্বতন্ত্র. কোট, লম্বা প্যাণ্ট। তারই একটা কোট দিয়েছিলেন মিঃ দাস আমাকে পরতে।

আদালতে খুব বেশিদিন যাতায়াত করতে হয়নি। দুতিনদিন হ'তে পারে। যেতে আসতে পথের পাশে লোক দাঁড়াত। পুলিশ কিছু বলত না। ছেলেরা ঘনিষ্ঠ হ'ত। পুলিশ জানত, পালাবার কোন মতলবই আমাদের নেই। তখন বুবড়ী জেলের প্রাচীর ছিল বাঁশের। ফাঁক দিয়ে বাইরেটা বেশ দেখা যেত। পালাবার মতলব থাকলে কিছু কঠিন হ'ত না। সুতরাং, সে পরীক্ষায় পুলিশ নিশ্চিন্ত হয়েছে।

নওগাঁ জেলে চালান যাবার সময় কিছু গোলমাল হ'ল। কারাবিধি অনুসারে সশ্রম কারাদণ্ডীর পায়ে লোহার মল পরাতে হয়, হাতে হাতকড়া কোমরে দড়ি স্নেহপ্রবণ এক ভদ্রলোক সর্বক্ষণই প্রায় ঘুর ঘুর করতেন। সেদিন ছিলেন। বললেন, আপত্তি করুন। করলাম। কর্মচারীরা ছুটলেন দাস সাহেবের কাছে। দাস সাহেব আমার আপত্তি মেনে নিলেন। বেড়িকড়া দড়িদড়া থেকে অব্যাহতি পাওয়া গেল।

জুতোটাও পায়ে দিতে দিলেন।

স্টেশনে কিছু ভীড় জমেছিল। তাও কেটে গেল গাড়ী ছাড়লে। কোন্ ফাঁকে মার টাকা পৌঁছেছিল পুলিশদের হাতে (পরে শুনেছি) ওরা সদ্ব্যবহার করল পথে।

নওগাঁ জেলে এসে কিছু নিয়মের মধ্যে পড়া গেল। আমিও ঠিক করেছিলাম, ওসব নিয়ম মানব না। ওরা পায়ে লোহার মল পরাতে চায়। আপত্তি করলাম। তক্ষুণি কিছু-হৈ-চৈ হ'ল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খাপিয়া, ইংরাজীভাষী খৃষ্টান, লোক ভাল, বললেন থাক। কিন্তু পরদিন প্যারেডে বুকে কাঠের নম্বরী মেডেল লাগিয়ে আর কেদ হিল্লির খাতা কাঁধ বরাবর রেখে যখন দাঁড়ালাম, তখন অকস্মাৎ বজ্রপাত হ'ল।

সদলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বারন্দায় পা দিতে না দিতেই জমাদার হাঁক দিল : সরকার—সেলাম ! আমার সমগ্র সত্তা বিদ্রোহ ক'রে উঠল। আমি কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কাছে আসতে স্পষ্ট করেই বললাম, না, এতো রীতি নয় আমি ডিক্লিনাল টু সেলুট, সরকার সেলাম নয়, অফিসার স্যালিউট। তাই-বা কেন ? হুকুমে তোমায় অভিবাদন জানাব কেন ? স্বেচ্ছায় সৌজন্য জানাব, বলব, প্রাতঃ প্রণাম।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দাঁতে দাঁত চেপে রইলেন। তিনিও কয়েদীকে শাসন করতে জানেন।

দুপুর বেলাই ডাক পড়ল। টেলিগ্রাফিক অর্ডারে আমি

তেজপুর যাচ্ছি। সুন্দর দার্জিলিং জেল আমার ভালোই লেগেছে।

মস্ত জেল, যখন পৌঁছোলাম তখন অনেক রাত; জেলে নেবার কেউ নেই গেটের বাইরেই রাত কাটাতে হ'ল ওদের প্রহরায়। কি খেয়েছি বা খাইনি মনেও নেই। আমিও আমার ঠোঁট কামড়াচ্ছি।

সকালবেলা, একটু বেলাতেই, বাবুর্চী যথারীতি আড় মোড়া ভেঙে অবসর সময়ে জেলে এসে আমাকে ভর্তি ক'রে নিয়ে সোজা এক সেলে ঠেলল। গরম ও মশা দুইই আছে। যা পাশে ডানপাশে দুইসেলে দুই মার্ডারার। দু'জনই অসমীয়া। ছিলেন একজন বাঙালী, কিছুদূরে, এ ডিভিসান বিনাশ্রম কয়েদী জমিদার ব্রজেন চৌধুরী, বয়েষ্ট বয়স। আর কেউ কোথাও নেই, দাগী দাগী আর দাগী। ফাঁসীর দড়ি যারা গলায় পরিয়ে দেয় সেই হরিণ শিকারীরাও এখানে, ছোকরা নিয়ে হাঙ্গামা করে তারাও এখানে।

ব্রজেন চৌধুরী আমাদের মতই বাংলা বলতে পারেন; কিন্তু লুকিয়ে চুরি ক'রে কাঁহাতক কতক্ষণ কথা বলা যায়। কথা বলা নিষেধ।

জেলাররা সব সিলেটি, অত্যন্ত সরকারানুগত. স্বদেশী কয়েদীকে জব্দ করতে পারলে আর কিছু চায় না।

আমাকে প্রথম বলে, ধুবড়ী জেলের সবকিছু ছেড়ে যাও। বললাম, দোব, করব কি? বলল, সি ডিভিসানের পোষাক যদ্দিন না ডিভিসান টুর ধুতি জামা তৈরী হয়ে আসে। আমি বললাম, তদ্দিন ধুবড়ীর জামা কাপড়ই আমার গায়ে থাকবে। পার, কেড়ে নাও। আর, জুতো কিনে আনো, এজোড়া ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু এসকোর্ট যে চলে যাচ্ছে? ওদের সঙ্গে ও জেলের জিম্মিস দিতে হবে।

শেষটায় আপোষ হ'ল। দু'একদিনের মধ্যে আমরা সব কিছু জমা দেব কিছুকাল, পরদিন বাকীটা। রাজি হয়ে গেলাম।

চারদিকে সব বন্ধু। ডাক্তারটি অসমীয়া, অত্যন্ত ও নিষ্ঠুরতাই ও মনে করত সরকার সেবা। মুসলমান ব'লে ভাবত দাত খুন মাপ। হাজির করেছিল আমাকে একদিন কেস টেবিলে, সিলেটি জেলারদের কি উল্লাস, বাগে পাওয়া গেছে ছোকরাকে কিন্তু সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ সি এইচ পি এলেন ওদের সব খুশী ধূলিসাৎ ক'রে দিলেন।

ডাক্তার নালিশ ঠুকেছিলেন, ঐ কয়েদী আমাকে ভয় দেখিয়েছে।

উৎসুক জেলাররা আশে পাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। সুপারিন্টেন্ডেন্ট আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, কি ভয় দেখিয়েছিলে?

আমি বললাম, আমি ক'দিনই পাহারা নিয়ে আসছি ডাক্তারের কাছে, ডাক্তারকে পাইনি। কম্পাউণ্ডারকে বলেছি, এরকম হলে তো আমার জানাতেই হবে ওপরে। ডাক্তারের সঙ্গে আমার দেখাই হয়নি।

ডাক্তার হৈ-হৈ ক'রে উঠল, না স্যার, মিথ্যে মিথ্যে ভয় দেখিয়েছে।

সুপারিন্টেন্ডেন্ট হাসলেন। আমাকে বললেন, না, না, এসব কোরোনা তুমি, ভাল হ'য়ে থাক। কিছু লিখলেন না কেস রিপোর্ট-এ, খাতাটা ফিরিয়ে দিলেন; জেলার সাব জেলার ডাক্তার সবার মুখ শুকিয়ে আমসি।

কারণ ছিল। এলেন কোন ভদ্রবংশজাত। প্রথম থেকেই আমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেছেন। বাইরে থেকে বই এনে পড়তে দিয়েছেন, পড়ার সঙ্গে নোট করার জন্য খাতা পেন্সিল দিয়েছেন। দিয়ে হেসে বলেছেন, এই খাতার পাতা নম্বর দেওয়া, পাতার কোরোনা যেন। আমি হেসে, বলেছি, নিশ্চিন্ত থাক।

এলেই বলতাম, গুড মর্নিং। সাড়া দিতেন। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কথা বলতেন; এই সেলে আমি ছাড়া কেউ পলিটিকাল ছিল না; আমার সঙ্গেই আলাপ করতেন। একদিন স্ত্রীকে এনে পরিচয় করিয়েও দিলেন। সম্ভবত সেদিনই জিজ্ঞেস করেছিলেন, ধরো, তোমাকে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, আবার একাজ করবে? আমি বলেছিলাম। অবস্থার পরিবর্তন না হলে আমাকে বারেবারেই এ করতে হবে। খুশি হয়েছিলেন কি রাগ করেছিলেন বুঝতে পারিনি, ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটেনি। বলেছিলাম, চোখটা একটু দেখাতে হবে। বলেছিলেন, বেশ তো এসো না, একদিন আমিই দেখে দেব। দেখে দিয়েছিলেন। একটা

শর্ত ছিল। চশমার দাম দৈনে আমি গেটে জমা রাখি। বড়দার কাছ থেকে দশটা টাকা আনিয়ে ছিলাম। তাই থেকে সস্তায় নিজে বস্তু ক'রে ফ্রেম বেছে চশমা দিয়েছিলেন।

এসব কিছুই ভাল লাগছিল না, অসহ্য। ভাক্তার সিলেটি জেলার, হিন্দুস্থানী জমাদারদের। ওরা অভ্যস্ত কয়েদীদের শাস্তি দিতে। এক অদ্ভুত মনোবিকার। আমি সিলেটি নই আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলত না। পরে ঐ জেলে কিছু সিলেটি বন্দী এসেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে কথা কইত, আমার সঙ্গে নয়। সেই যে একবার খটে গেছে, মুক্তির দিন পর্যন্ত এক মেজাজ।

কিন্তু খুশি হয়েছিল যখন এলেন আমাকে দণ্ড দিতে বাধ্য হলেন। এজন্য আমার আপোষহীন মনোভাবই বেশি দায়ী। আমার স্নেহ।

সিলং থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশ এল সি ডিভিসানের কয়াও হ'ল—'সরকার সেলাম',বি ডিভিসানের 'অফিসার অ্যাটিউট', এ ডিভিসনের 'এটেনসান'। যখন সেলে ছিলাম। তখন আমার চারপাশে ছিল সি ডিভিসান কয়েদী। হাঁকত 'সরকার সেলাম'। আপত্তি করেছিলাম। মনে হচ্ছে, জেলারের প্ররোচনায় জমাদার একাজ করেছিল। আমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। বললাম, তোমার যেমন আমি সৌজন্য দেখছিলাম, দেখাব, কিন্তু-এ হুকুম কেন?

একদিন বোধ হয় জেলাররা খুব খু চিয়ে ছিলেন; আর ইতিমধ্যে কিছু হ'য়েও থাকবে। সেটাও প্রকাশ পেল।

জমাদার যথারীতি 'সরকার সেলাম' ক'রে আসতে আমাকে উনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কয়াওে সাড়া দিয়েছ? আমি বললাম, না, এই তো তোমায় অভিবাদন করলাম। আর তা ছাড়া—

মি: এলেন, পরিষ্কার দৃঢ় কণ্ঠে আমায় বললেন, Before you finish, I should like to tell you, I have heard everything about you from Bengal as well as elsewhere. If you go on defying jail rules I shall have to punish you.

সেই থেকে সাজা সুরু হ'ল। ভাল মানুষ তাই লাগাম দিয়ে সুরু করলেন। প্রথম দিন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কয়াও মেনেছ? আমি বলেছি,না। জেলারকে বললেন, ওর বইগুলো ফেরৎ নিয়ে নাও। পরে একদিন, চিঠিবন্ধ ক'রে দেবার হুকুম। জেলাররা হাসি আর চাপতে পারেন না। মারাত্মক একটা দণ্ডের জন্য ওরা দু'হাতে দিন কাটাতে লাগলেন। কিন্তু আবারও ওদের স্বপ্ন সাধ ধূলিসাৎ করে মি: এলেন এখানে মোটে আসা ছেড়েই দিলেন—পাছে আমাকে সাজা দিতে হয়।

ইতিমধ্যে, সিলেট থেকে আরও কিছু বন্দী এসেছেন। ফলে আমাদের সবাইকে একটা বড় চালি-তে আনা হয়েছে। সিলেট বন্দীরা নিয়ম কানুন মেনে নিয়েছিলেন, জেলাররাও স্বভাবী, তাঁদের সঙ্গে সদালাপী।

দেখলাম মি: এলেনের আমার প্রতি স্নেহ ফুরোয়নি। তিনি সিলেটি দুই একটি ভদ্রলোককে বললেন আমাকে বোঝাবার জন্য যেন আমি রাজী হই। এখন তো 'অফিসার অ্যাটিউট' চালু হয়েছে···। শেষ পর্যন্ত এলেন বললেন, দেখ আইজি আসছেন অন্তত: সেদিনটা রাজি করাও। সিলেটি ভদ্রলোকেরা আমায় বোঝালেন। ওদের পক্ষে যুক্তি ছিল, আমার পক্ষে ছিল স্নেহ। কিন্তু পাছে এলেনের কোন ক্ষতি হয়, আই জি এসে দেখেন, নিয়ম শৃঙ্খলা মানে না এমন কয়েদীও বেঁচে আছে এই তেজপুরের মত জেলে, তবে তিনি লজ্জা রাখবার জায়গা পাবেন না। আমি বললাম, ঠিক আছে, এলেনের জন্য। আই জি এসেছিলেন।

অফিসার অ্যাটিচট কয়াও দিলে কপালে হাত ছুঁয়ে ছিলাম। এলেনকে এখনও মনে পড়ে।

রহস্যময় কলোসিয়াম

—রবীন্দ্র নারায়ণ রে

সার্কাস্ ম্যাক্সিমাস্‌কে পেছনে রেখে ভি, এস্, গ্রেগরীও রাস্তা ধরে রোম্ মহানগরীর উত্তর দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলাম। বাঁ দিকে প্যালেটাইন্ হিল্, সুপ্রাচীন রোমান্ ফোরাম। বহু দূর থেকেই পথের শেষে কলোসিয়ামের বিশাল অট্টালিকা চোখে পড়ে।

সব বিশাল স্থাপত্যশিল্প পাথর ভিন্ন অন্য উপাদান দিয়ে তৈরী সে সব পৃথিবীর বুক থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

কলোসিয়ামের বাইরের বৃত্তাকার পরিবেষ্টনীর পূর্বাদিক এখন ভেঙ্গে পড়েছে। কিন্তু ভিতরের পরিবেষ্টনী এবং বাকি অংশ প্রায় তেমনিই আছে নিঃসন্দেহে অনুমান করা যেতে

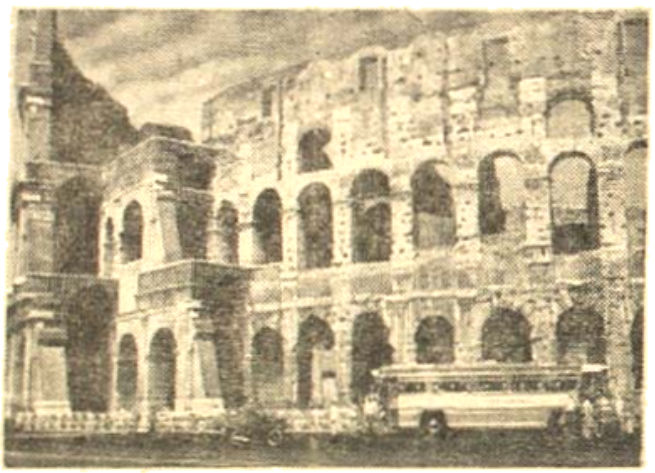

এই কলোসিয়ামকে বিশাল ঘরে নবাগত অচেনা পর্যটক দিক নির্নয় করতে পারে। শেওলা পড়া পরিত্যক্ত ভূতুড়ে বাড়ীর মত রহস্যময় বিশাল বৃত্তাকার এই অট্টালিকা সর্বকালের সমগ্র মানব জাতির কাছে একটা বিস্ময় হয়ে—দাঁড়িয়ে আছে। বিশ্ববিখ্যাত এই কলোসিয়ামের আর এক প্রাচীন নাম—এ্যাম্‌ফিথিয়েট্রাম্ ফ্লাভিয়ানাম্। দু হাজার বছরেরও আগে সম্রাট ভেস্‌পাসিয়ান্-এর সময় এটি আরম্ভ হয়। অবশ্য খৃষ্টের জন্মের ৮০ বছরের পরে সম্রাট টিটাসের সময় এটি সমাপ্ত হয়।

রোম্ ছাড়াও এথেন্স, স্পেন, যুগোস্লাভিয়া এবং পশ্চিমের আরো বহু দেশে এই জাতীয় এ্যাম্‌ফিথিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া যায়। কিন্তু এ্যাম্‌ফিথিয়েটার বলতে প্রথমেই রোমের কলোসিয়ামের কথাই সবার মনে পড়ে। এর সমকালীন যে

পারে—যদি বিরাট কোন প্রাকৃতিক বা রাজনৈতিক বিপর্যয় না ঘটে তবে আগামী বহু সহস্র বছর ধরে কলোসিয়াম ঠিক এইভাবেই পর্যটকদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকবে।

কিন্তু রহস্যময় এই কলোসিয়ামের বিস্ময় তার বাইরের দৃশ্যে নয়। ভেতরে ঢুকে ভাঙ্গা সিঁড়ি বেয়ে দোতালায় কিম্বা তিনতালার ওপরে উঠে যেতে হয়।

ভেতরে বিস্তৃত ক্রীড়াভূমি, যার নাম এ্যারেনা। তা অন্য কোন এ্যাম্‌ফিথিয়েটার বা সার্কাস ম্যাক্সিমাসের মত সমতলভূমি নয়। সেখানে সারি সারি সমান্তরাল প্রাচীর। প্রাচীরের অন্তরালে ছোট ছোট ঘর। ওপর থেকে অন্ধকার গভীর পরিখার মত মনে হয়। সারা ক্রীড়াভূমি জুড়ে ভেঙ্গে পড়া, ধসে পড়া এই সব সারি সারি প্রাচীরের দিকে দৃষ্টি

পদ্ধতি কেমন যেন খাপছাড়া, সামঞ্জস্যহীন বলে মনে হয়। পৃথিবীর অন্য কোন এ্যামফিথিয়েটারে এ জাতীয় জিনিস তো চোখে পড়ে না!

মনে আছে গাইডের মুখে এর ব্যাখ্যা শুনে শিউরে উঠেছিলাম।

পৃথিবীর বুকে নিরন্তর কত পরিবর্তন না ঘটছে। এক যুগের যা বিস্ময় আর এক যুগের তা উল্লাস, উন্মাদনা। আজকের দিনে সে সব কথা কাল্পনিক রূপকথার কাহিনীর মত মনে হয়।

নির্মল ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং নিছক আনন্দদান করার রঙ্গমঞ্চ এই কলোসিয়াম নয়। মানুষের শরীরের উষ্ণ রক্তের বিনিময়ে মানুষের শরীরের শিরায় উপশিরায় আলোড়ন সৃষ্টি করার উত্তেজনাকে সেখানে ক্রয় করা হত।

মানব সভ্যতার কি বীভৎস, নির্মম পরিহাস!

বহু বহু দিন আগে আমাদের দেশেও নাকি পশুপক্ষী বলির সঙ্গে নরবলির প্রথা ছিল। ধর্মীয় সংস্কার ছাড়া সেই প্রথার সঙ্গে প্রচ্ছন্ন ভাবে আর একটা জিনিসের যোগসূত্র ছিল।

সম্ভবত সে যুগে মনের সূক্ষ্মতম অনুভূতিকে উগ্রপথে নিয়ন্ত্রিত করার জন্যেই, মানুষের স্তিমিত জীবনসত্তাকে সজীব করার জন্যেই এই নির্মম প্রয়াস। হাজার দু' হাজার বছর আগে ফিরে গেলে দেখা যেত তখন মানুষের অনাড়ম্বর জীবন যেমন জটিলতা বর্জিত তেমনি যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল জীবন যাত্রার একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আধুনিক যুগের ঠাণ্ডা লড়াই তখন আবিষ্কৃত হয় নি। পারস্পরিক মতাবিরোধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ছিল সম্মুখ সমর। অবশ্য তখন মানুষের আনন্দ পাবার রীতি ছিল ভিন্ন।

বুল্-ফাইট্ ছিল তখনকার এ্যামফিথিয়েটারগুলির প্রধান আকর্ষণ। স্পেন, মেক্সিকো এবং পশ্চিমের কয়েকটি দেশে ষাঁড়ের লড়াই চলে।

রক্তের মত লাল একটি কাপড়ের নিশান সবল করে ঐ দুর্ধর্ষ বন্য জন্তুটিকে বার বার বিভ্রান্ত, উত্যক্ত করে তোলাতেই সমবেত দর্শকের উল্লাস। কিন্তু একটি বারের জন্যেও যদি মাত্র একটি পদক্ষেপের ত্রুটি হয়?

একটি নির্ভুল পদক্ষেপের বাতিক্রম—অবধারিত একটি ম্যাটাডরের মৃত্যু। জীবন এবং মৃত্যুর সন্ধিক্ষণ নিয়ে এই খেলা তাই এত আকর্ষণ।

কিন্তু মৃত্যু একজনকে বরণ করতেই হবে। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে সেই অর্বাচীন পশুটিকে নির্মম মৃত্যু বরণ করতে হবে ম্যাটাডরের হাতের শাণিত অস্ত্রের আঘাতে।

হাজার হাজার বছর আগে থেকে আজ পর্যন্ত ঐ একই রীতি চলে আসছে।

কিন্তু কলোসিয়ামে যা হত তা এ থেকেও অনেক বেশী। শুধু বন্য জন্তুর রক্ত ঝরণে কলোসিয়ামের দর্শকরা সন্তুষ্ট হত না। সেখানে হত দুজন কিম্বা ততোধিক গ্ল্যাডিয়েটারের মধ্যে সামনা সামনি যুদ্ধ। ক্রীড়াপিপাসুদের পরিতৃপ্তির জন্যে সকলের সামনে একজনকে পৈশাচিক, বীভৎস মৃত্যু বরণ করতে হত।

কলোসিয়ামের ইতিহাস এইখানেই শেষ নয়। দীর্ঘদিনের উপবাসী, ক্ষুধার্ত সিংহের সামনে প্রাচীর পরিবেষ্টিত সীমানার মধ্যে অপরাধী কিম্বা জীবন-পণ করা দুঃসাহসী গ্ল্যাডিয়েটারকে এসে দাঁড়াতে হত।

অবশ্য আত্মরক্ষার জন্যে অপরাধীর হাতে একটি সামান্য অস্ত্রও দেওয়া হত। দৈবক্রমে অপরাধী যদি ঐ হিংস্র পশুটির কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হত তবে তার সব অপরাধ ক্ষমা করে তাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হত।

এই সমগ্র রোমহর্ষক অনুষ্ঠানটি একটু বিলম্বিত লয়ে উপভোগ করার জন্যে এবং ক্ষতবিক্ষত দুপক্ষকে একটু আত্ম-গোপন করার সুযোগ দেওয়ার জন্যই এই সব সারি সারি প্রাচীরের সৃষ্টি হয়েছিল।

দর্শকের আসনে বসে নীচের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে মুহূর্তকালের জন্যে দু'হাজার বছর আগের ভয়াবহ দৃশ্যগুলি আমার চোখের সামনে যেন ভেসে উঠল।

ওই তো বক্সে বসে আছেন সম্রাট, চারদিকে সেনেটরদের ভিড়, ওপরে হাজার হাজার দর্শকের চিৎকার। শিরস্ত্রে রক্তিম চন্দ্রাতপ ভা ভেদ করে দুপুরের খর রোদ রঙীন মায়াবী হয়ে এ্যারেনায় লুটিয়ে পড়েছে। রৌদ্রেরেখার কোঠায়ার পাশে হাসি, শিঙা আর ট্রাম্পেট গভীর গর্জনে বেজে চলেছে।

বহুদেশ থেকে জোর করে মানুষকে ধরে আনা হয়েছে, ব্রিটেন থেকে এসেছে বন্দীরদল এসেছে রাইনের তীরে থেকে ক্রীতদাস, আফ্রিকা থেকে এসেছে অসহায় মূঢ়। তারা লড়াই করে মরবে।

ওই তো একদল যোদ্ধা নগ্নদেহ শাণিত তরবারি নিয়ে, তীক্ষ্ণ আঘাতে পরস্পরকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলল। আহত মানুষ মৃত্যুযন্ত্রণায় চীৎকার করছে কিন্তু তাদের আর্তনাদ ডুবে যাচ্ছে হাজার হাজার মানুষের কাণফাটা উল্লাসে আর ট্রাম্পেটের নির্ঘোষে। মাটিতে রক্তের দাগ।

এবার পশুতে পশুতে লড়াই—গণ্ডারের সঙ্গে বুনো ষাঁড়ের, হাতির সঙ্গে সিংহের, বাঘের সঙ্গে জলহস্তীর। বন্য ভূমি আবার রক্তে আর মৃত পশুর শবে ভরে গেল।

ওই তো এবার মানুষে পশুতে লড়াই, সিংহের সঙ্গে লড়াই করে মরে গেল যোদ্ধা। রথের পেছনে দড়ি দিয়ে বাঁধা হোল একজন মানুষকে, খাঁচার দরজা খুলে দিতেই বাঘ ছুটে এল অসহায় মানুষটার দিকে, আর তখনি রথ জোরে ছুটতে সুরু করল, জীবন্ত মানুষের চোপ গেলবার জন্যে বাঘও ছুটল, দর্শক আনন্দে ফেটে পড়ল।

এবার নকল নদী পাহাড় অরণ্য দিয়ে এ্যারেনা সাজানো হোল, নিরস্ত্র মানুষ আর হিংস্র সিংহ হায়েনা নেকড়ের দল ছেড়ে দেয়া হোল, চলল তাদের লুকোচুরি খেলা, তারপর পশুরা টুকরো টুকরো করে ফেলল মানুষের দেহগুলো। দর্শকের মনে এতটুকু বেদনাবোধ নেই, তারা তখন বাজি লড়ছে, কোন্ মানুষ কতক্ষণ যুঝবে পশুর সঙ্গে।

ওই তো এবার চূড়ান্ত খেলা—সারা এ্যারেনা জলে ভরে গেল, সুরু হোল নকল কিন্তু প্রাণঘাতী নৌযুদ্ধ, নৌসেনার পোষাকে সজ্জিত গ্ল্যাডিয়েটারগণ ধরধার বর্শা আর তরবারী নিয়ে একে অন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, জল রক্তে লাল হয়ে উঠল, মৃতদেহ ভাসতে লাগল।

নাঃ আর চিন্তা করতে পারা যায় না—মানুষ তখন এত নিষ্ঠুর নির্বিবেক ছিল! মানুষের প্রাণ তখন এত সস্তা ছিল! মানুষ আর জীবজন্তুকে নিয়ম করে হত্যা করা হবে বলে এত উৎসব, এত আয়োজন, এই কলোসিয়ামে!

শোনা যায় এই সব দৃশ্য দেখে বহু মহিলা সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়তেন।

কিন্তু নারী চরিত্র চিরকালের রহস্যে আবৃত। মহিলাদের মধ্যেই এই সব রোমহর্ষক অনুষ্ঠানের আকর্ষণ ছিল বেশী।

এ সব কাহিনীর অনেক কিছুই আজ কিংবদন্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে।

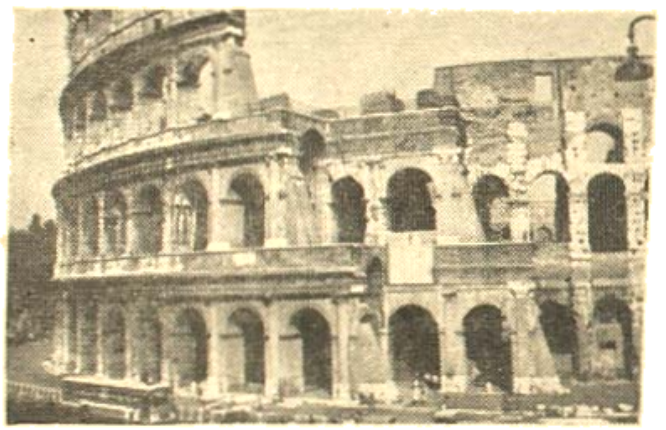

উন্মত্ত সিংহ বা বাঘ আক্রান্ত কিম্বা গ্ল্যাডিয়েটারের তরবারির আঘাতে রক্তপ্লুত মানুষের জীবনের শেষ আর্তনাদ হৃদয় বিদারক না উল্লাস ব্যঞ্জক, দু'হাজার বছর আগে এই কলোসিয়ামের পঞ্চাশ হাজার দর্শক তার সঠিক উত্তর দিতে পারতেন। কল্পনাবিলসী মন থেকে এর কোন সদুত্তর আজ পাওয়া সম্ভব নয়।

সৈশাচিক আদিম বর্বরতার সুপ্ত ইচ্ছে থেকে বোধ হয় মানুষের মন কোন দিনও মুক্ত নয় নয়। দেশাচার ও সমাজ ব্যবস্থার আবরণে নিজেদের ঢেকে রাখলেও বর্বরতার সেই সুপ্ত বাসনা মনের কোনে পুঞ্জীভূত থেকেই যায়। বিভিন্ন কালে, বিভিন্ন কারণকে উপলক্ষ্য করে তারই অকস্মাৎ আত্ম-

প্রকাশ ঘটে। যুগ থেকে যুগান্তরের ব্যবধানের সঙ্গে আদিম প্রবৃত্তির রূপান্তর ঘটেছে মাত্র।

আধুনিক স্টেডিয়ামের বিরাটত্ব এবং অতি আধুনিক অপেরা হাউসের স্বাচ্ছন্দ্য ; এই দুই এর সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছিল এই সুবিখ্যাত কলোসিয়াম।

একান্ত নিভৃতে পাশাপাশি বসে মঞ্চের ওপর দৃশ্য উপভোগ করার মধ্যে যে রোমাঞ্চ আছে রোমের কলোসিয়ামেই বোধ হয় তার সূচনা।

অভিজ্ঞ স্থপতির সূক্ষ্ম দৃষ্টিতেই কেবল কলোসিয়ামের গঠন বৈচিত্র্যের প্রকৃত মান নিরূপিত হওয়া সম্ভব।

প্রায় বৃত্তাকার—দৈর্ঘ্যে ৬২০ ফুট, প্রস্থে ৫০০ ফুট এবং চারতলা উঁচু এই বিরাট অট্টালিকায় সারা বিশ্বের বিভিন্ন স্তরের থেকে দর্শকের সমাবেশ হত।

৫০,০০০ দর্শকের স্থান ছিল এই কলোসিয়ামে। ২৯০ ফুট দীর্ঘ এবং ১৮০ ফুট চওড়া ডিম্বাকৃতি এ্যারেনার পূর্ণ দৃশ্য চতুর্দিকের দর্শকের দৃষ্টিকোন থেকে কোথাও বাধা পড়ত না।

এই বিশাল কলোসিয়ামের ওপরে একদিন চাঁদোয়া আচ্ছাদনের ব্যবস্থা ছিল। দর্শকদের ছোট ছোট ঘরের চালু ছাদ এখন ভেঙ্গে পড়েছে। বসার আসনে ফাটল ধরেছে। এখন এঃ সর্বত্র অবাধ বিচরণ নিরাপদ নয়।

কয়েক হাজার অর্দ্ধবৃত্তাকার খিলানের সমন্বয়ে তৈরী এই কলোসিয়াম। দেওয়াল সংলগ্ন দুই তৃতীয়াংশ পরিস্ফুট স্তম্ভগুলি খিলানের ভার বহন করছে।

একতলার স্তম্ভগুলি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত. সূক্ষ্ম কাজ এবং বাহুল্য বর্জিত। প্রাচীন ডোরিক্ প্রথায় নির্মিত।

দোতলার আয়নিক্ প্রথায় নির্মিত স্তম্ভের ওপরের অংশ (ক্যাপিটাল) দুভাগে বিভক্ত এবং তিনতলায় হালকা ধরণের স্তম্ভের ওপরের অংশ (ক্যাপিটাল) ঘন্টার আকৃতি, সূক্ষ্ম এক পাতার কারুকার্যে ঢাকা। এটি করিন্থীয়ান্ প্রথার পরিচায়ক।

আপাত দৃষ্টিতে স্তম্ভের শ্রেণী বিন্যাসের এই তাৎপর্য সবার কাছে সুস্পষ্ট নয়। দীর্ঘ দু'হাজার বছর আগে পঞ্চাশ হাজার উন্মত্ত দর্শকের ভাবলাস্যের কথা চিন্তা করে রোমান স্থপতিরা যে সুষ্ঠু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছিলেন আজকে তা ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়।

অবশ্য খিলান সংলগ্ন এই স্তম্ভগুলির মধ্যে প্রাচীন গ্রীক্ স্থাপত্যকলার প্রভাব সুস্পষ্ট।

চারতলার ওপরে খিলানের মধ্যে দিয়ে বাইরের দিকে শেষপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালাম। চারিপাশে বিস্তৃত রোম্ মহানগরীর দৃশ্য।

অদূরে দক্ষিণ পশ্চিম দিকে ঐতিহাসিক রোমান্ ফোরামের ধ্বংসপ্রায় সারি সারি স্তম্ভ। দূরে সেপ্‌টিমিয়াসের বিজয়-তোরণ। আরো দূরে ক্যাপিটলিন্ হিল্। দক্ষিণে প্যালেটাইন্ হিল্ তার পেছনে সার্কাস্ ম্যাক্সিমাস্ যেখানে একদিন ঐতিহাসিক রথের দৌড় (বেনহুর) অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

চতুর্দিকে প্রসারিত কালো মসৃণ রাস্তার ওপর দিয়ে উল্কা বেগে নতুন মডেলের গাড়ীর সারি ছুটে চলেছে। একদিন ঐ সব পথ দিয়েই ধুলো উড়িয়ে দ্রুতগামী অশ্বারোহী ছুটে চলতো।

অনন্তকালের ইতিহাসে স্থাপত্যকলার একটা বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত এই কলোসিয়াম। ঠিক যেমন বিস্ময়কর নিদর্শন হল রোমের প্যান্‌থিয়ন্, পিসার হেলানো টাওয়ার, এথেন্স-এর এ্যাক্রোপোলো, সুপ্রাচীন মিশরের পিরামিড।

কেবলমাত্র প্রাচীনত্বই কলোসিয়ামের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। দু'হাজার বছর আগে যখন উনবিংশ শতাব্দীর সিমেন্ট আবিষ্কৃত হয়নি, সেই সুদূর অতীত খিলানের ওপর খিলান দিয়ে তৈরী চারতলা উঁচু এই বিশাল অট্টালিকা। প্রাচীন গ্রীক স্থাপত্য শিল্পের সঙ্গে মূলতঃ এই খানেই রোমান স্থাপত্য শিল্পের পার্থক্য। বিভিন্ন আকৃতির আর্চ বা খিলান এবং ভোম্-এর উদ্ভাবক হল রোমান স্থপতিরা।

প্রাচীন রোমান্ স্থাপত্যকলার সাফল্যের মূলে ছিল দীর্ঘ দিনের গবেষণা—রোমের উত্তর-পূর্ব অংশে চকোলেট রং এর এক বিশেষ ধরনের মাটির সন্ধান পাওয়া যায়, নাম "পোজোলোনা"। কোন এক বিস্মৃত অতীতে দীর্ঘদিন ধরে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূগর্ভ থেকে লাভা নিক্ষিপ্ত হয়েছিল কালক্রমে তাই একদিন ধূলিকনায় রূপান্তরিত হয়।

রোমান বৈজ্ঞানিকরা গবেষণা করে এই বিশেষ ধরনের মাটির সঙ্গে লাইম্ স্টোন্ ($CaCO_3$) মিশিয়ে পরে তা কুইক্ লাইম্ (CaO) এ পরিণত করেন। আধুনিক সিমেন্ট আবিষ্কারের বহু যুগ আগে এই বিশেষ রাসায়নিক সংমিশ্রন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গৃহনির্মানের মশলা হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল।

এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঘটনাকাল রোমান সাম্রাজ্যের প্রথম সম্রাট আগাষ্টাস্ অর্থাৎ খৃঃ পূঃ ৬৩ সালেরও আগে। ওই প্রসিদ্ধ "পোজোলোনা" নাম অনুকরণ করে ভারতবর্ষে একটি সিমেন্ট-এর নামকরণ হয়।

কংক্রিটের আকারে এই উপাদানের নির্মিত বিশাল কলোসিয়াম এখন পাথরের তৈরী বলে ভ্রম হয়। অবশ্য এর বহু অংশ পাথরের তৈরী।

বহু কষ্টে এ্যারেনায় নেমে এলাম। ভেঙ্গে পড়া, ধ্বসে পড়া সারি সারি প্রাচীরের ধারে অপরিচ্ছন্ন ধূলো বালির ওপর বিশেষ কোন পর্যটক আজ এসে দাঁড়ায় না।

পৃথিবীর প্রায় সব এ্যাম্ফিথিয়েটারের এ্যারেনাই শুকনো বালিতে ঢাকা থাকতো এর একটা কারণ ছিল। উষ্ণ তাজা রক্ত শোষণ করার ক্ষমতা অন্য কোন উপাদানের তুলনায় শুকনো বালিতে বেশি।

যাঁরা পরলোকতত্ত্ব মানেন না, অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁরাও যদি গভীর রাতে এই কলোসিয়ামের মাঝখানে এসে দাঁড়ান তবে তাদেরও গা ছম ছম করে উঠবে।

হোক না হাজার দু'হাজার বছর আগের ঘটনা। তবুও মনে হবে সেই সব অসংখ্য অতৃপ্ত, প্রবঞ্চিত, বিক্ষুব্ধ আত্মা ভীড় করে দাঁড়িয়েছে আপনার চারি পাশে।

হাজার হাজার প্রশ্ন, হাজার অভিযোগে গুমরে গুমরে উঠছে সেখানকার বদ্ধ পরিবেশ।।

এ্যারেনার ভেতর থেকে উঠে ধীরে ধীরে কলোসিয়ামের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। একটা কথা বার বার মনে পড়ছিল —অনড়, অটল, বিশাল এই অট্টালিকা মহাকালের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ এই কলোসিয়ামকে ঘিরে কত রহস্য জড়িয়ে আছে। তাই ইতিহাস সম্রাট ভেস্পাসিয়ানের নাম মনে রেখেছে, মনে রেখেছে সম্রাট টিটাসের নাম।

কিন্তু এই বিরাট কীর্তির অন্তরালে যে সব স্থপতির দীর্ঘ দিনের গবেষণা, তাদের বিনিদ্র রজনীর অক্লান্ত পরিশ্রম সমন্বিত আছে, নিষ্করুণ ইতিহাসের ছিন্নপত্র খুঁজে আজ তাঁদের নাম উদ্ধার করা সম্ভব নয়।

"দিঘি-ভরা জল করে চল-চল,
নানা ফুল ধারে ধারে।
কচি ধান গাছে ক্ষেত ভরে আছে,
হাওয়া দোলা দেয় তারে।

যেদিকে তাকাই সোনার আলোয়
দেখি যে ছুটির ছবি।
পূজার ফুলের বনে ওঠে ওই
পূজার দিনের রবি।"

—রবীন্দ্রনাথ।

প্রথমে আমার কল্পনা ছিল চট্টগ্রাম থেকে জলপথে যাত্রা করে ভারতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল পরিক্রমা করব। তারপর রেলপথে ফিরে আসব। কিন্তু আমি তো একা নই, সঙ্গে স্ত্রী ও তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। এবং দু'জন বেয়ারা। বয়সও আমার পঁয়ত্রিশ। আরো দশ বছর কম হলে চোখ বুজে ঝুঁকি নেওয়া যেত। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো কথা উপকূল দিয়ে যেসব জাহাজ যাতায়াত করে সেগুলি মালবাহী জাহাজ। যাত্রীর জন্যে স্থান যদি বা মেলে আহারাদির অব্যবস্থায় ভ্রমণের আনন্দ মাটি হবে।

শেষপর্যন্ত স্থির হলো আমরা জলপথে শুরু না করে রেলপথে যাব বম্বে। সেখান থেকে শুরু করব জলপথে। যদি যাত্রীবাহী ভালো জাহাজ পাই। কত দেশের যাত্রীবাহী জাহাজ তো বম্বের বন্দর ছুঁয়ে যায়। সেখানে থেকে কলম্বো ও কলম্বো থেকে পণ্ডিচেরী ও মাদ্রাজ হয়ে কলকাতা ফেরা কি সম্ভব হবে না! কিন্তু বম্বেতে গিয়ে খোঁজ করে জানতে পারি যে সঙ্গে দুটি চাকর নিয়ে সিংহলে ঢুকতে হলে বিশেষ অনুমতিপত্র লাগবে ও সে অনুমতি মাদ্রাজ থেকে নিতে হবে। তখনকার দিনে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের শেষভাগে পাসপোর্ট বা ভিসার বালাই ছিল না। আমরা অক্লেশে যেতে পারতুম। শুধু স্বাস্থ্যঘটিত কয়েকটা বিধিনিষেধ ছিল। কিন্তু চাকর দুটিকে বাদ দিলে শিশুদের দেখবে শুনবে কে? আমরাই যদি দেখি শুনি তো ঘোরাফেরা করব কখন? মেলামেশা করব কখন?

রেলপথে মাদ্রাজ যাওয়াই শ্রেয়। সেখান থেকে জলপথে কলম্বো। তার আগে আমরা একবার পুণা বেড়িয়ে আসি। তার বৃত্তান্ত 'চেনাশোনা'য় বর্ণনা করেছি। এখন যেটা লিখছি সেটা 'চেনাশোনা'র জের। মাঝখানে কেটে গেছে ত্রিশটি বছর। তার আগেও প্রায় আরো পাঁচটি বছর। পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের সেই আমি এখন পা দিয়েছি সত্তর বছরে। তখন যা স্পষ্ট ছিল এখন তা অস্পষ্ট। কাগজে যা টোকা ছিল তা গেছে হারিয়ে। নির্ভর করতে হচ্ছে স্মৃতির উপরে। কিন্তু স্মৃতিও কি নির্ভরযোগ্য?

পুণা থেকে ফিরে আসার পর বিচারপতি কিতীশচন্দ্র সেনের অতিথি হই। বন্ধুরা বলেন মারাঠাদের স্থান যেমন দেখেছি তেমন গুজরাটিদের নিজ বাসভূমিও দেখা উচিত। বম্বে সেদিক থেকে যথেষ্ট নয়। কারণ বম্বে শহরটা হচ্ছে কসমোপলিটান। মারাঠারা যাই বলুক না কেন বম্বের ঐতিহ্য মহারাষ্ট্রের ঐতিহ্য নয়। বম্বের চরিত্র মহারাষ্ট্রের চরিত্র নয়। তখন আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে ভাষা অনুসারে প্রদেশ ভাগ করতে গেলে বম্বেকে নিয়ে অনর্থ বাধবে। মাদ্রাজে গিয়ে দেখি একই মনোভাব। কিন্তু সেকথা পরে।

পুণা যখন দেখেছি তখন আহমদাবাদও দেখতে হবে। কিন্তু বন্ধুরা বলেন, আহমদাবাদ নয়, বরোদা। সেখানে তখন গাইকোবাড় সরকারের সব সুদ্ধ ছিলেন রাজারত্ন মহাত্মা মুখোপাধ্যায়। বিচারপতি কিতীশচন্দ্র সেনের সুহৃদ্, রবীন্দ্রনাথের 'রাজা' নাটকের ইংরেজী অনুবাদক। তাঁর সাদর আহ্বান পাই। কিন্তু বরোদা যাত্রার পূর্বে আমরা যাই অজন্তা এলোরা দেখতে। ওটা আমাদের বহুদিনের সাধ। বম্বে থেকে রেলপথে ঔরঙ্গাবাদ। তখন সেটা নিজাম রাজ্যে। নিজাম সরকারের নির্মিত হোটেলে আমাদের অভ্যর্থনা করেন ইউরোপীয় ম্যানেজার। তাঁরই ব্যবস্থাপনায় আমাদের এলোরা অজন্তা দর্শন। আর একদিন দৌলতাবাদ।

দেশভ্রমণ আমার কাছে নিছক স্থানদর্শন নয়। স্থানের সঙ্গে যোগ দেয় কাল। ঔরঙ্গাবাদ থেকে দৌলতাবাদের ব্যবধান কয়েক শতাব্দীর। কারণ ওর আদি নাম ছিল দেওগিরি। যেমন ঔরঙ্গাবাদের আদি নাম ছিল কর্দে-নগর। কর্দেনগর থেকে দেওগিরি গেলে বেশ কয়েক শতাব্দী পেছিয়ে যেতে হয়। তার চেয়ে আরো বেশী পেছিয়ে যেতে হয় এলোরার বেলা। ব্যবধান আরো অনেক শতাব্দীর। আর অজন্তার যেটা আদিপর্ব সেটা তো খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। পেছিয়ে যেতে হয় আরো অনেকদূর। চার দিনে আমরা পেছিয়ে যাই বিংশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীতে, সেখান থেকে দ্বাদশ শতাব্দীতে, সেখান থেকে

চতুর্থ শতাব্দীতে, সেখান থেকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে। এ এক বিস্ময়কর কালপরিক্রমা। দু'হাজার বছর পেছিয়ে গিয়ে দু'হাজার বছর আগেকার অতীতকে ছুঁয়ে আসা। যে অতীত যুগে যুগে বিভিন্ন।

পথের মাঝখানে বুলন্দাবাদে দেখি ভারতসম্রাট ঔরঙ্গজেবের কবর। কবরের উপর সৌধ নেই। একপ্রস্থ চাদর। সেটা সরাতেই একখানি মাটি। তার উপর জল সেচন করা হয়েছে। মনে হয় যেন নবে ঘোর দেওয়া হয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এত বিশাল সাম্রাজ্য অশোকের পর আর কারো ছিল না। সেই সাম্রাজ্যের অধীশ্বর যখন দক্ষিণের সুবাদার তখন পত্নীর জন্যে নির্মাণ করেছিলেন দাক্ষিণাত্যে একটি তাজমহল। ঔরঙ্গাবাদে সেটিও আমরা দেখি। তাহলে নিজের জন্যও তো সেইখানেই একটু জায়গা বরাদ্দ করে রাখতে পারতেন। শাহজাহান যেমন করেছিলেন। কিন্তু উত্তর বয়সে তাঁর জীবন সর্বপ্রকার ঐশ্বর্যবর্জিত হয়েছিল। মৃত্যুর পরে ঐশ্বর্য তাঁর কাম্য হবে কী করে? জীবনে তিনি যতই অন্যায় করে থাকুন মরণে তিনি মহান। দেশ বিদেশের সম্রাটদের মধ্যে আমি তো তাঁর মতো বিষণ্ণ বৈরাগ্য দেখতে পাইনে। আহা, তিনি যদি অন্তর্দর্শী না হতেন! মরুপথার রাস্তায় পড়ে আমাদের যুদ্ধক্ষেত্র। ইংরেজ সেনাপতি আর্থার ওয়েলস্লী যেখানে মারাঠাদের পরাস্ত করেন ঔরঙ্গজেবের পর একশো বছর যেতে না যেতেই তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী মারাঠাদেরও পতন ঘটে।

এইরূপ আর একজন অন্তর্দর্শী অধিপতি ছিলেন মুহম্মদ বিন তুঘলক। সেকালের জগতে তিনি ছিলেন অতুলনীয় বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী সুলতান। চরিত্রেও তিনি ঔরঙ্গজেবের মতো সংযত। কিন্তু ক্ষমতার নেশায় এমন এক একটি কাণ্ড করতেন যা কেউ সুরার নেশায় বা নারীর নেশায় করে না। এমনি এক কাণ্ড হলো দৌলতাবাদে রাজধানী অপসরণ। দিল্লীর নাগরিকদের উপর ফরমান জারী হলো তাঁরাও দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে অপসরণ করবেন, দেবানন্দার নাগরিক হবেন। তাও তিনদিনের মধ্যে। ফলে দিল্লী হলো মরুভূমি। অথচ দৌলতাবাদ যে জনাকীর্ণ হলো তাও নয়। শেষে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীদের হুকুম দেওয়া হলো 'দিল্লী চলো'। বেচারিরা নিজেদের ঘরবাড়ী জায়গা জমি ছাড়তে বাধ্য হলো, কিন্তু দিল্লীর শূন্যতা পূরণ করতে পারবে কেন?

দৌলতাবাদে তাঁর আমলের দুর্গটি ছাড়া কিছুই নেই দেখবার। সেটাই অত্যাশ্চর্যতাগ যাদব রাজাদের আমলের। অত্যন্ত দুর্গম গিরিবর্ত্ম দিয়ে শীর্ষে উঠতে হয়। সেকালের পক্ষে ওর সামরিক গুরুত্ব অশেষ। ওই দুর্গ থেকে সারা দক্ষিণাপথ আয়ত্তে রাখা যায়। তাছাড়া ওটাই তাঁর মতে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের পক্ষে স্বাভাবিক সদর। দিল্লী তো কেন্দ্রস্থল নয়। কথাটা এক হিসাবে ঠিক। তাই যদি না হতো তবে ঔরঙ্গজেবকেই বা কেন জীবনের শেষ আটাশ বছর দিল্লী ছেড়ে আহমদনগর শোলাপুর প্রভৃতি স্থানে শিবিরবাস করতে হতো। রাজধানীর মায়া কাটানো কি এতই সহজ? সাম্রাজ্যের প্রয়োজন ছিল তার চেয়ে বড়ো। দক্ষিণ বার বার স্বাধীন বা স্বশাসিত হয়েছে। ঔরঙ্গজেবের পরে দক্ষিণের সুবাদার নিজাম রাজ্য স্থাপন করেন। ঔরঙ্গাবাদ হয় তাঁর রাজধানী। পরবর্তীকালে রাজধানী হায়দরাবাদে স্থানান্তরিত হয়। তখন ঔরঙ্গাবাদ তার গুরুত্ব হারায়। আমি যখন যাই তখন ওটি একটি জেলা সদর। জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নাম বরকত রায়। উত্তর ভারতের কায়স্থদের নাম ও রকম হয়।

দৌলতাবাদের ওই ঐতিহাসিক দুর্গের এক প্রান্তে দেখি হিন্দুদের দেবস্থান। যতদূর মনে পড়ে শিবলিঙ্গ। হিন্দু পুণ্যার্থীরা অবাধে যাচ্ছে। বোধহয় তাদের সে অধিকার চিরকাল অব্যাহত রয়েছে। জানিনে এই গিরিদুর্গের নাম দেওগিরি হলো কেন। এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতার জন্যেই কি! তাই যদি হয়ে থাকে তবে ইনিই কালজয়ী। দুর্গাধীশরা নন।

এলোরার শৈলখাত কৈলাসও শিবমন্দির। তার সৌন্দর্যের তুলনা ভূ-ভারতে নেই। এর নির্মাণকাল অষ্টম শতাব্দী। তখন গুপ্তযুগ শেষ হয়ে এসেছে। গুপ্ত যুগের স্বর্ণাভা তার অঙ্গে। যুগটা গুপ্তদের হলেও এলাকাটা রাষ্ট্রকূট রাজাদের তাদের আগে চালুক্য রাজবংশের।

পাহাড়ের ধার কেটে গুহা খনন শুরু হয় যষ্ঠ শতাব্দীতে। দক্ষিণপ্রান্ত থেকে আরম্ভ করলে দর্শনযোগ্য চৌত্রিশটির মধ্যে ১২টি বৌদ্ধ, ১৭টি ব্রাহ্মণ্য ও ৫টি জৈন।

পাশাপাশি এই যে তিন পর্যায় গুহা এ যেন তিনটি সতন্ত্র ধর্মমতের বিচিত্র শিল্পপ্রদর্শনী। কিন্তু কাদের জন্যে? নিকটবর্তী গ্রামিকদের জন্যেই কি? তারা এর কতটুকু বোঝে? তিনটি সম্প্রদায়ই যে একই গ্রামাঞ্চলে পাশাপাশি বাস করত এটাই বা ধরে নেব কী দেখে? যখন বৌদ্ধ বা জৈন বলতে ধারে কাছে কেউ নেই। আছে কয়েক ঘর গরীব ব্রাহ্মণ। যতদূর মনে পড়ে আর কয়েক ঘর অস্পৃশ্য। তবে কি এখানে বিভিন্ন মতের সন্ন্যাসীরা নির্জন-বাস করতেন? তাই যদি হয় তবে দুই শতাব্দী ধরে গুহা খনন, মন্দির নির্মাণ, মূর্তি খোদাই, চিত্রাঙ্কন ও কারুকার্য কেন? ধর্মসাধনার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কী? তা হলে কি লক্ষ্য ছিল বহুদূর থেকে জনগণকে আকর্ষণ করা? আসত ওরা দর্শন করতে, শিক্ষালাভ করতে, আনন্দ পেতে? প্রধামী দিতে? যাতে ওই সন্ন্যাসীদের আহার্য ও পরিধেয় জুটত।

আর এক কারণ এই হতে পারে যে পর্বতের মতো চিরন্তন বস্তু কিছু নয়। অশোকও তো বেছে বেছে পাহাড়ে পর্বতে উৎকীর্ণ করেছিলেন তাঁর শিলালিপি। কেই বা যেত সেখানে সে সব পাঠ করতে? পাঠ করার মতো অক্ষরজ্ঞান ছিল ক'জনের? তাঁর নীতি ও নির্দেশ অক্ষয় হবে এই বোধহয় ছিল তাঁর ধারণা ও প্রেরণা। লোকে হয়তো পড়েনি হয়তো দেখেও নি। তবু মহাকাল সযত্নে সংরক্ষণ করেছে। এই হলো শিলার গুণ। অশোকের যুগে মন্দির নির্মাণের রীতি ছিল না। না জৈনদের মধ্যে, না বৌদ্ধদের মধ্যে, না ব্রাহ্মণ্য হিন্দুদের মধ্যে। শিবলিঙ্গ অবশ্য অতি প্রাচীনকাল থেকেই ছিল। সেটা হলো প্রতীক। শিবের সঙ্গে তার কোন সাদৃশ্য নেই। বুদ্ধের সঙ্গে সাদৃশ্য বৌদ্ধধর্মের আদি পর্বে নিষিদ্ধ ছিল। বুদ্ধের স্থানে বোধিবৃক্ষকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করা হতো। স্তূপও একপ্রকার প্রতীক। জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রাও সম্ভবত বৌদ্ধদের প্রতীকরূপে কল্পিত। বিষ্ণু বা কৃষ্ণের সঙ্গে জগন্নাথের কোনো সাদৃশ্য নাই। নামটাও জৈনদের মতো। ইতিহাসে এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়ের কীর্তিকে নামান্বিত ও রূপান্তরিত করেছে এর নিদর্শন খ্রীষ্টানদের রোমে ও মুসলমানদের কনস্টান্টিনোপলে আছে। ভারতেও কী হিন্দু কী মুসলমান কেউ এর থেকে মুক্ত নয়। এমনি করেই বুদ্ধ পরিণত হন বিষ্ণুর অবতারে। যেমন অষ্টারলোনি পরিণত হয়েছেন শহীদে। আর মনুমেন্ট পরিণত হয়েছে মিনারে। বৌদ্ধরা যদি জিতে যেত তারাও হয়তো দাবী করত যে কৃষ্ণ একজন বোধিসত্ত্ব ও রাধা তাঁর পারমিতা। তবে এই বৌদ্ধ গুহাগুলি যে বৈষ্ণব বা শৈব গুহায় পরিণত হয়নি এর কারণ বোধহয় এগুলি বহুশতাব্দী-কাল লোকচক্ষুর অন্তরালে অবহেলিত অবস্থায় পড়েছিল। তেমনি ব্রাহ্মণ্য গুহাগুলি যে কালাপাহাড়দের দ্বারা ধ্বংস হয়নি তারও বোধহয় সেই একই কারণ। যাই হোক এই, যে দূর-অবস্থান এটা অন্যত্র বিরল বলেই এত মূল্যবান।

অন্য এক পাহাড়ের এক পাশ কেটে অজন্তা দর্শনযোগ্য ত্রিশটি গুহাও খনন করা হয় খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টোত্তর সপ্তম শতাব্দী অবধি। এই নয় শতাব্দীকাল জুড়ে একমাত্র বৌদ্ধরাই তাদের শিল্পমেলা বসায়। জৈন ও ব্রাহ্মণ্য সহ অবস্থানের নিদর্শন মেলে না। অজন্তা কেবল ভারতে অদ্বিতীয় নয়, বৌদ্ধ জগতেও অদ্বিতীয়। এর আদল মেলে জাপানের হোরয়ুজীতে। প্রায় বিশ বছর বাদে জাপানে গিয়ে অভিভূত হই। এদেশের শিল্পীরা যে ওদেশের শিল্পকেও প্রেরণা দিয়েছিলেন এটা হাতে কলমে প্রমাণিত হয়। এঁরা কি কেবল অজন্তাতেই আক্ষর রেখে যান। আর কোথাও নয়? নিশ্চয়ই ভারতের অন্যান্য স্থানেও অজন্তার অনুরূপ ছিল। ভাগ্যক্রমে অজন্তাই রক্ষা পেয়েছে। সেটা তার দুর্গম অবস্থানের কল্যাণে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে ঘটনাচক্রে আবিষ্কৃত না হলে আমরা কেউ জানতেও পেতুম না তার অস্তিত্বের কথা। অথচ ঐতিহাসিক উত্তর দক্ষিণ বাণিজ্যপথের অদূরবর্তী নয় অজন্তা নামক গ্রাম। না, গ্রামবাসীরাও গভীর অরণ্যের ভিতরে যেত না। মৌমাছিতে তাড়া না করলে একজন ইউরোপীয় সৈনিকও যেতেন না। আলো বাতাসের ঢোকবার পথেনি বলে গুহাচিত্রগুলি সযত্নে সুরক্ষিত ছিল। এখন তো

দিন দিন নিষ্প্রভ হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে বা ক্ষয়ে পড়ছে। তাদের সংরক্ষণ করাই এখন সমস্যা।

শীতের দুপুর। তবু গুহার ভিতরে ঘোর অন্ধকার। কিছু খরচ করলে ইলেকট্রিক ল্যাম্প ভাড়ায় পাওয়া যায়। সেটা হাতে করে নিয়ে যায় একটি শিয়ন। তারই আলোয় দেয়ালে ও সীলিংএ ফলসে ওঠে নানা রঙের ছবি। একবার চোখ বুলিয়ে নেওয়াই সার। নয়তো খরচ বাড়ে। একজন মার্কিন সহযাত্রী আমাদের সহভাগী না হলে খরচও পড়ে যেত অনেক। এখন কী ব্যবস্থা হয়েছে জানিনে। তখন তো এই ছিল ব্যবস্থা। এইসব অসূর্যম্পশ্যা গুহার অভ্যন্তরে ঘুরাল চিত্র অতন সহজ ছিল না নিশ্চয়। কিসের আলোয় আঁকিয়েরা আঁকতেন? দেখিয়েরা দেখতেন? দর্শক না থাকলে অঙ্কনের সার্থকতা কী? কার জন্যে এত কিছু আঁকা? গুহাবাসী সন্ন্যাসীদের আত্মতৃপ্তির জন্যে। নয় শতক ধরে রামায়ণ মহাভারতের মত বৌদ্ধ জাতকের কাহিনীগুলিও ছিল সেকালের জন সাধারণের আনন্দের তথা শিক্ষার আধার। লোকশিক্ষা তথা লোকরঞ্জনের জন্যেই সেগুলির সৃষ্টি। সুতরাং যেখানেই বৌদ্ধ শিল্প সেখানেই জাতকের গল্প।

দেয়াল জুড়ে গল্পের পর গল্প বলা হয়েছে। সীলিং জুড়েও তাই। এসব কাহিনীর অল্পই আমাদের ছিল। গাইডবুক দেখে যতটা পারি বুঝি। পরবর্তীকালে আমি জাতক পড়েছি ও তার অনুরক্ত হয়েছি। কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও দ্বিতীয়বার অজন্তা যাত্রা হয়ে ওঠেনি। একটি অতি মনোহর যুগকে সচিত্র করা হয়েছে, ধরে রাখা হয়েছে এখানে। নরনারী পশুপাখী তরুলতা ফুলফল বসনভূষণ সকলই সুন্দর, সমস্তই জীবন্ত। এ ছাড়া দেবদেবী যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব কিন্নর ভূতপ্রেত পিশাচ। সমসাময়িক জনমানসের কল্পলোক। হিন্দু কোথায় শেষ হয়েছে, বৌদ্ধ কোথায় শুরু হয়েছে বলা কঠিন। তবে ছিল একটা ভেদরেখা। বৌদ্ধরা দেবতার চেয়ে মানুষকেই বড়ো করে দেখত। অথচ একজন মানুষকে বড়ো করে দেখত। তিনি বুদ্ধ। কোন দেবতার অবতার নন তিনি। নিজেও দেবতা নন। "বুদ্ধদেব" এ কথাটি বৌদ্ধদের মুখে শোনা যায় না। এতে বুদ্ধের গৌরব হানি হয়, দেবত্বের গৌরব বৃদ্ধি হয়। বুদ্ধ হয়েছেন যে মানব তিনি সব দেবতার উর্ধ্বে। মানুষ একদিন দেবতা হবে একথা যারা বলে তারা বৌদ্ধ নয়, তারা হিন্দু। মানুষ একদিন দেবতাকে ছাড়িয়ে গিয়ে বুদ্ধ হবে একথা যারা বলে তারাই বৌদ্ধ। অমরত্বকে বৌদ্ধরা মহামূল্য মনে করে না। তার চেয়ে মূল্যবান নির্বাণ। দেবতাদের মাহাত্ম্য তো এইখানে যে তাঁরা অমর।

হিন্দুরা যখন গুণমুগ্ধ হয় তখন বলে, "মানুষ তো নন, দেবতা।" বৌদ্ধরা যখন গুণমুগ্ধ হয় তখন বলে, "মানুষ তো নন, বোধিসত্ত্ব।" অর্থাৎ বুদ্ধ হতে চলেছেন, বুদ্ধ হবেন বলাবাহুল্য হিন্দু বলতে আমি প্রচলিত অর্থে বুঝেছি। আগেকার দিনে দেশশুদ্ধ লোক ছিল দেশদুষমনে হিন্দু। তার মানে ভারতীয়। মুসলমান আগমনের পর ধর্মগত বিভেদের উপর জোর দেওয়া হয়। তার আগে থেকেই বৌদ্ধরা মহাপ্রস্থানের পথে। রাজাহারা সঙ্ঘহারা বিহারহারা হয়ে তারা দেশান্তরী হন। তাদের মধ্যে গৃহী যাঁরা তাঁরা কোনোকালেই জাত ছাড়েনি, শুধু ধর্মই ছেড়ে ছিলেন। যে যার জাতব্যবসা করতেন। জাত ছেড়েছিলেন শুধু সন্ন্যাসীরাই। সন্ন্যাসীদের বিদায়ের পর গৃহীরা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের যজমান ও বৈষ্ণব গুরুর বা শৈব গুরুর শিষ্য হয়। ইতিমধ্যে আরো একদল সন্ন্যাসী সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছিলেন এঁরা শঙ্করাচার্যের অনুগামী। বৌদ্ধদের এঁরা তর্কযুদ্ধে হারিয়ে দেন। রাজশক্তি এঁদের সহায় হয়। নিজেদের মধ্যে অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হয়ে বৌদ্ধরা তাদের সংহতি হারিয়েছিল। সংহতিই তাদের শক্তির উৎস। সংহতির অভাব না হলে তারাও জৈনদের মতো থেকে যেত। জৈনরা কেউ হিন্দু হোলো না, অথচ বৌদ্ধরা সবাই হিন্দু হয়ে গেল, নয়তো পালিয়ে গেল, এর একাধিক কারণ! কিন্তু এটা কখনো একটা কারণ হতে পারে না যে বৌদ্ধ ধর্মটাই হিন্দুধর্মের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। জাপানে বা সিংহলে গেলে বুঝতে পারা যায় ভেদ অতি স্পষ্ট। আড়াই হাজার বছরেও ভেদরেখার বিলোপ হয়নি। ইহুদীধর্ম ও খ্রীষ্টধর্মের মতো।

অজন্তার শ্রেষ্ঠ চিত্র বোধ হয় অবলোকিতেশ্বর পদ্মপাণির।

করুণার প্রতিমূর্তি। জাপানীরা বলে করুণার দেবী। সে ছেলে ইনি পুরুষ নন, নারী। আসলে বোধিসত্ত্বরা ছিলেন এক্ষেত্রেও মতো দেবদেবী সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না বলে পুরুষ কিংবা নারীরূপে কল্পনা করে। বুদ্ধ আর অবলোকিতেশ্বর মহাযান শাখার চিত্রকলায় ও ভাস্কর্যে আর সকলের উপরে। তার পরেই বোধ হয় প্রজ্ঞাপারমিতা। বোধি, করুণা ও প্রজ্ঞা শিল্পীরা চেয়েছে মানুষের মুখে চোখে হাতে ও ভঙ্গীতে ফোটাতে। অজন্তায় অবশ্য আমি প্রজ্ঞাপারমিতার সাক্ষাৎ পাইনি। দেখেছি ইল্যোরার একটি গুহাঘরে। জাভায় নিমিত মূর্তি বৌদ্ধ শিল্প ভারতে নিবদ্ধ ছিল না। হিন্দু শিল্পও ভারতের সীমানা ছাড়িয়েছিল। হিন্দু ঘরে ফের এল। বৌদ্ধ ফিরল না। ভারতে তার স্থান নিল মুসলিম।

অজন্তার চেয়ে প্রাচীন, অজন্তার চেয়ে সুন্দর, অজন্তার চেয়ে মানবিক আর কিছু আমি পরে দেখতে পাব বলে আশা করিনি। দক্ষিণে বা সিংহলে অজন্তাই আমার এবারকার ভ্রমণের শীর্ষবিন্দু। শাস্ত্রে বলে ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। আমি বলব শিল্পস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং। শিল্পী বলে আমরা যারা পরিচয় দিই তাদের উচিত অজন্তায় গিয়ে কয়েক মাস থাকা ও দিনের পর দিন গুহায় গিয়ে দেখা। ভাগ্যবান তাঁরাই যাঁদের জীবনে সেটা সম্ভব হয়েছে। ধর্মের প্রেরণা পেয়েছে অথচ সেকুলার, লোকের জন্যে অভিপ্রেত অথচ ক্লাসিকাল, অভিপ্রাকৃতকে বর্জন করেনি অথচ মানবিক, নীতিবোধ প্রখর অথচ রসবোধ অতি সূক্ষ্ম, প্রত্যেকটি চিত্র মৌন অথচ প্রত্যেকটি চরিত্র মুখর—অজন্তার শিল্পীদের কাছে কত কী শেখবার আছে। কিন্তু সময় যে নেই। সময় যে নেই। আমি সরকারী কর্মচারী। আমার ছুটি ফুরিয়ে যাবে। তার উপর আমি সপরিবারে ভ্রমণে বেরিয়েছি। হোটেলে বাচ্চারা কী করছে কে জানে! সন্ধ্যার আগেই ফেরা চাই। পথ বড়ো কম নয়। উপরন্তু নির্জন।

আশ্চর্যের কথা, ফিরতি ট্রেনে আলাপ হয়ে গেল আমাদের সহযাত্রিণী কুমারী রাইহানা ভৈরবজীর সঙ্গে। দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্বই হয় আলাপের সূত্র। বরোদায় তাঁর বাড়ী। আমাদেরও বরোদা যাওয়া স্থির। বললেন তাঁর ওখানে একদিন যেতে। যেতে পৃথ্বীশ দাশগুপ্তের ওখানে বিশ্রাম করে আবার আমরা ট্রেনে উঠি। বরোদার সব সুবা মহাশয়ের সৌজন্যে আমাদের জন্যে স্টেট গেস্ট হাউসের একটি অংশ ছেড়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, আমাদের করা হয় স্টেট গেস্ট। বরোদার দেখবার মতো যা ছিল তা একদিনেই কাবার। তা হলে থাকি কেন? থাকি গুজরাটীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে গুজরাটকে ওইখান থেকে চেনবার জন্যে। বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক রমণলাল দেশাইয়ের সঙ্গে কথা বার্তার বিষয় গুজরাটি সাহিত্য। কুমারী রাইহানা ভৈরবজী ইংরাজীতে একখানি বই লিখেছিলেন 'একটি গোপীর হৃদয়।' বাইরে মুসলমান, অন্তরে বৈষ্ণবী। বিখ্যাত ভৈরবজী পরিবারের কন্যা বরোদার সম্ভ্রান্ত নাগরিক। কিন্তু সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার, নিষ্কাম ও নিষ্কিঞ্চন।

আমার এইবারকার ভ্রমণের উদ্দেশ্য কেবল দেশ দেখা নয়, মানুষ চেনা। একজন সমজদার মানুষ ছিলেন সত্যব্রত মুখোপাধ্যায়। অক্সফোর্ড না কেম্ব্রিজের কৃতী ছাত্র ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস প্রতিযোগিতায় অকৃতকার্য হয়ে বরোদার হাতকার্য যোগ দেন। ছেলেবেলায় 'মডার্ন রিভিউ'তে তাঁর অনুবাদকর্ম দেখেছি। স্বভাবটা সাহিত্যরসিকের, সেটা তাঁর লাইব্রেরী থেকেও বোঝা যায়। বরোদা রাজ্যের সেনসাস রিপোর্ট তাঁরই রচনা সৌষ্ঠবের নিদর্শন। সাহিত্যের লোক পথ ভুলে প্রশাসনে জড়িয়ে পড়েছেন, কিন্তু পড়াশুনা করেন। তাঁর স্ত্রী অরুণা দেবী আমাদের সাহিত্যরথী লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়ার কন্যা। তাঁর শাশুড়ী স্বনামধন্যা সুলেখিকা প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী। ঠাকুরবাড়ীর মেয়ে। মহর্ষির নাতনি। তাঁর আমিষ ও নিরামিষ ও মিষ্টান্ন রান্নার বই ছিল বিদেশের ছিসেস বীটনের মতো এদেশের প্রামাণিক রন্ধনগ্রন্থ। এঁদের সঙ্গেও আলাপ হয়। আমরাও বার বার আমিষ ও নিরামিষ ও মিষ্টান্ন ভোজনের পরিচয় হই। তবে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর সঙ্গে নয়। তিনি তখন সম্ভবিদবা।

বরোদার চিত্রকলার অধ্যক্ষ ছিলেন একজন বিদেশজ ইউরোপীয়। তাঁর নাম ভুলে গেছি। তেমনি ভুলে গেছি বরোদার সংস্কৃত গ্রন্থমালার সম্পাদক এক বিদেশজ বাঙালীর নাম। কৃষ্ণাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য কি?

এঁদের কর্মস্থলে গিয়ে এঁদের সঙ্গে আলাপ করি। সংগ্রহ

দেখি। মনে পড়ে রাসমণির ছবি। মহারাজা নবাবী রাও গায়কোয়াড় তখনো জীবিত, কিন্তু প্রায়ই বিদেশে বাস করতেন। সেটা বোধ হয় ইংরেজ রেসিডেন্টের কাছ থেকে শতহস্ত দূরে থাকতে। দেওয়ান ছিলেন কৃষ্ণমাচারী রাজস্বর্ম-প্রবীণ। স্বাধীনতার পরে যাঁকে দিল্লীর প্ল্যানিং কমিশনে নেওয়া হয়। তাঁদের বাড়িতে তাঁর সঙ্গেও একবার সাক্ষাৎ করে আসি। কিন্তু রেসিডেন্সীর ছায়া মাড়াইনে। দেশীয় রাজ্যে রেসিডেন্টই প্যারামাউন্ট পাওয়ারের প্রতিভূ। সুতরাং এপক্ষের লোককে ওপক্ষের শিবিরে যাতায়াত করতে দেখলে বন্ধুরা বিব্রত হতেন। দেশীয় রাজ্যে চক্রের ভিতর চক্র। মিত্রার মুখার্জির মত না নিয়ে আমি একটি পদক্ষেপও নিইনে।

মুখার্জিরা একদিন আমাদের বড়োদা ক্লাবে নিয়ে যান। যতদূর মনে পড়ে সেটা ছিল ইংরেজ বর্ষশেষের রাত্রি। দারুণ শীত। অপেক্ষা করতে হলো যতক্ষণ না রাত বারোটা বাজে। বর্ষারম্ভ আমরা প্রথাসিদ্ধ স্ফূর্তির সঙ্গে করি। তখন কি জানতুম যে সেটা আনহ্যাপি নিউ ইয়ার? নিয়ে আসবেনোক?

আবার বঙ্গে। বঙ্গে যেন আমাদের ছাড়তে চায় না। আমরা কিন্তু সত্যি সত্যি তাকে ছাড়ি। বাঙ্গালোর অভিমুখে যাত্রা করি। পথে পড়ে ধারওয়ার। সেখানে ট্রেন বদলের ফাঁকে এক বাঙালী ভদ্রলোকের পরিবারে দিনযাপন করি। নাম ভুলে গেছি অতিথির সজ্জন। রেল কর্মচারী। ধারওয়ার যাত্রা মাটির লেপ। এইটুকু তার সম্বন্ধে আমার মনে আছে। সন্ধ্যাবেলা ট্রেনে উঠে বসি। ভোরবেলা বাঙ্গালোর।

সেখানে যাঁর অতিথি হই তিনি আমেরিকা ব্যাটারিন অরবিন্দ বসু। তাঁর স্ত্রী জার্মান রমণী। কিন্তু তাঁদের চাল-চলন শুদ্ধ ভারতীয়। বছরের শীতকালটা ছিল দিব্যি গরম। আর বছরোদারটা তেমন ঠাণ্ডা। বাঙ্গালোর নাতিশীতোষ্ণ। বারো মাসই নাকি না ঠাণ্ডা না গরম। সেইজন্যে দেশের ও বিদেশের বিস্তর ভদ্রলোক যেখি অবসর নিয়ে এখানে সপরিবারে বসবাস করছেন। জায়গাটা কেবল স্বাস্থ্যকর নয়, সস্তা। মহারাজা তো রাজর্ষি। আর তাঁর দেওয়ান সার মির্জা ইসমাইল তাঁরই মতো উদারমনা। দেশীয় রাজ্য হলেও মৈসুর ব্রিটিশ ভারতের কোনো কোনো প্রদেশের চেয়েও সুশাসিত। তখন থেকেই মৈসুর রাজসরকারের পলিসি শিক্ষা-বিস্তার। সেইজন্যেই নানা দেশের নানা প্রদেশ থেকে উৎসাহ পেয়ে ছাত্ররা হয়েছেন শিল্পপতি ও প্রযুক্তি বিশারদ গোষ্ঠী। ব্রিটিশ ভারতেও এতখানি উৎসাহ কেউ তাঁদের দেয়নি। স্থানীয় লোকও বন্ধুভাবাপন্ন। তারাও তো সমৃদ্ধির ভাগপাচ্ছে। মৈসুর দিন দিন এগিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু যে জিনিসটি আমি চেয়েছিলুম সেটি পেলুম না। সাহিত্যিক সঙ্গ। কন্নাড় সাহিত্যের খবর। কন্নাড়ভাষীরা সে সময় চতুর্ধা বিভক্ত। কতক বম্বেতে, কতক হায়দরাবাদে, কতক মৈসুরে। সেই যে বাংওয়ার সেটা ছিল প্রেসিডেন্সীর অঙ্গ বাঙ্গালোর। তেমনি হায়দরাবাদের অন্তর্গত গুলবর্গা। কন্নাড় সাহিত্যকে তাই ধরতে ছুঁতে পারিনে। দেশীয় রাজারা সদয় হলে কী হবে, তাঁদের প্রজারা স্বাধীন ভাবে লিখতে সাহস পায় না। সাহস যাদের আছে তারা ব্রিটিশ প্রজা। তখনকার দিনে এই ছিল বাস্তব চিত্র। স্বাধীনভাবে সৃষ্টি করতে না পারলে সাহিত্যের বিকাশ হয় না। এই সেদিন এক কন্নাড় লেখক এসেছিলেন দেখা করতে। বললেন কন্নাড় সাহিত্যের রেনেসাঁস হয় বিশে শতাব্দীতেই। বাঙালীদের পক্ষে অভাবনীয় ব্যাপার। ব্রিটিশ শাসনাধীন অবিভক্ত বঙ্গ না থাকলে বাংলা সাহিত্যের হয়তো অনুরূপ দশাই হতো। তবে সম্প্রতি কন্নাড় সাহিত্য অনুকূল পরিবেশ পেয়ে দ্রুত উন্নতি করছে।

অরবিন্দ বসুও একজন বিপ্লবী ছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়ায় গিয়ে তাঁর মোহ ভঙ্গ হয়।

তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ভারতকে থাকতে হবে তার আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠাভূমিতে অটল। তা বটে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির চোরাবালিতে নয়। তিনি রমণ মহর্ষির শিষ্য। রাইহানাবেন আমাদের পরামর্শ দিয়াছিলেন রমণ মহর্ষিকে দেখতে যেতে। অরবিন্দ বসুরও সেই অভিমত। তিনি মহর্ষির সম্বন্ধে অনেক চমৎকার কথা বলেন। মহর্ষি স্বয়ং ব্রাহ্মণ হয়েও অব্রাহ্মণদের পঙ্‌ক্তিতে বসে ভোজন করতেন। আর তাঁর ব্রাহ্মণ শিষ্যরা করতেন অপর পঙ্‌ক্তিতে বসে। মহর্ষির ওটা এক প্রতিবাদ। স্বভাবত তিনি বাক্‌সংযমী বা মৌন। কথা বলতে বলতে অন্তরে ডুব দিতেন। তখন তিনি কোন্ অতলে! তাঁর সেই অনির্বচনীয় অনুভূতি কি উক্তি দিয়ে প্রকাশ করা

যায়। মন্ত্রীদের অন্তরে সঞ্চারিত হয়। অরবিন্দ বসুর মুখ দেখে বোঝা যেত তিনি লড়ি কিন্তু পেয়েছেন গভীর শান্তি

বাঙ্গালোর থেকে মোটরে করে একদিন মৈসুর শহরে ঘুরে আসি। উচ্চভূমির উপর অবস্থিত সুদৃশ্য নগর অধিষ্ঠাত্রী দেবী চামুণ্ডী। মহিষাসুরমর্দিনী। মহিষাসুর থেকেই নাকি মহিসুর বা মৈসুর। মহিষাসুরও তাহলে তার নাম রেখে গেছে। কারো সঙ্গে আলাপের সুযোগ বা সময় হলো না। কারণ সেইদিনই বাঙ্গালোরে ফিরতে হলে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিতে হয়। পথে পড়ে বৃন্দাবন উপবন। তৎকালীন মহারাজার রমণীয় কীর্তি। উপবনটি আলোকমালায় সজ্জিত হলে নন্দনবনের মতো দেখায়। দূর থেকেই চোখ বুলিয়ে নিই।

মৈসুরের পথে পড়ে হায়দর আলী ও টিপু সুলতানের রাজধানী। সেরিঙ্গাপটম বা শ্রীরঙ্গপত্তনম্। দেবতার নামেই নামকরণ। নদীবেষ্টিত একটি দুর্গের ভিতরেই রঙ্গিরনগর। দুর্গের ও নগরের এখন ভগ্নদশা। দুই সুলতানের কবর আর মসজিদ ইত্যাদিও সাক্ষ্য দেয় মুসলিম অধিকারের। হায়দর আলীর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন পূর্ণায়া নামক বিচক্ষণ ব্রাহ্মণ। যেমন রনজিৎ সিংহের প্রধানমন্ত্রী আজীজউদ্দিন নামক বিচক্ষণ মুসলমান। দেশীয় রাজ্যের ঐতিহ্যই ছিল অসাম্প্রদায়িক। রাজা বা নবাবরা যে যার ধর্মে পরমবিশ্বাসী হলেও প্রজাদের ধর্মে আঘাত করতে চাইতেন না। করলে মিত্র হারাতেন, শত্রু বাড়াতেন। ওটা রাজনীতি নয়। হিন্দুরাজবংশের উপাধির তালিকায় মুসলিম উপাধিও থাকত। মিরাসুদের মহারাজা কোনোকালেই বাদশার অধীন ছিলেন না, অথচ তাঁর উপাধির মধ্যে ছিল সুলতান ও শমসেরজঙ্গ। শমসের জং বাহাদুর তো নেপালের রাণাদেরও পূর্ববী। কোনোকালেই তাঁরা বাদশাহী আনুগত্য স্বীকার করেননি। তেমনি কোনো কোনো হিন্দু রাজবংশে শাহাজাদা উপাধিও লক্ষ্য করেছি। তেমনি মুসলমান অভিজাতদের মধ্যে রাজা, রাণা ও রাও উপাধি। ঠাকুর তো উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই লক্ষণীয়। খান্‌ও তাই। ঠাকুরটা যতদূর জানি তুর্কী, খান্‌টা মঙ্গোলীয় আর শাহটা পারসিক। শাহ্ ও খান ইসলামপূর্ব পারসিক ও মঙ্গোলীয় ইতিহাসে মেলে। হিন্দু মুসলমান অভিজাত শ্রেণী দেশের পৃথক হলেও স্বার্থে এক ছিল রাজা বা নবাব স্বনিষ্ট হোন, তাঁর পেছনে হিন্দু মুসলিম সামন্ত শ্রেণী। তবে রাজার বা নবাবের ধর্মই ছিল পরলা নম্বর ধর্ম। সেক্ষেত্রে মেজরিটি মাইনরিটি অবান্তর জার্মান ইতিহাসে যেমন রাজার ধর্মই প্রজার ধর্ম ভারতের ইতিহাসে তেমন নয়।

বৈদিক আর্যদের অসহিষ্ণুতাকে বহুপরিমাণে সংযত করেছিল বৌদ্ধ ও জৈন মানবিকতা। তেমনি তুর্কী ও মোগলদের অসহিষ্ণুতাকে বৈষ্ণব ও শৈব মানবিকতা। দক্ষিণ ভারত এই চারটি সাম্প্রদায়িক মানবিকতার ঐতিহ্যে অতিরিক্ত। তাই ধর্ম নিয়ে রাজা দক্ষিণের মাটিতে বাধে না। দক্ষিণের সমস্যা ধর্মগত নয়, বর্ণগত ও জাতিগত। জাতি। বলতে বুঝতে হবে রেস। এটি আর একটি দক্ষিণ আফ্রিকা। উত্তরভারতের মানুষ অত বেশী বর্ণসচেতন ও রেসসচেতন নয়। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ গোড়ায় ছিল আর্য দ্রাবিড় ও গোড়া কালা। এই তিন হাজার বছরে মেলামেশা হয়েছে, কিন্তু মিশে যাওয়া হয়নি। হাজা এরা করবে না, কিন্তু অশান্তিকে অন্য আকার দেবে।

মৈসুর রাজ্য জৈন ভাস্কর্যের জন্যে বিখ্যাত। কিন্তু সময় যে নেই, সময় যে নেই। দিন কয়েক পরে আমরা রাত্তের ট্রেনে মাদ্রাজ রওনা হই। সকালে উঠে দেখি মাদ্রাজ। এটা ইংরেজদের হাতে গড়া। এমন বিজাতীয় নাম আর কোনো শহরের নয়। একটা স্থানীয় নাম ছিল এর। কোথাও শোনা যায় না। মাদ্রাজ শহর থেকে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী। তার থেকে মাদ্রাজী বা মাদ্রাজী। বাইরের লোক যাদের মাদ্রাজী বলে তাদের কেউ বা তামিল, কেউ বা তেলুগু, কেউ বা কন্নাড়, কেউ বা মলয়ালী। যখনকার কথা লিখছি তখন এটা তেমন স্পষ্ট ছিল না। এখন তো ভাষা অনুসারে রাজ্য হয়েছে। কিন্তু তখনো লক্ষ্য করেছি যে ভাষা অনুসারে প্রেসিডেন্সী ভাগ হলে মাদ্রাজ শহরটা কাদের ভাগে পড়া উচিত এই নিয়ে তীব্র মতভেদ। তামিল ও তেলুগু ভাষীদের সংখ্যা প্রায় সমান সমান। মধ্যিখানে একটা ছোট্ট নদী। এপারটা তামিলপ্রধান, ওপারটা তেলুগুপ্রধান। তাহলে কি শহর ভাগাভাগি হবে। কিন্তু

তামিলদের তাতে আপত্তি যে কারণে বম্বের বেশ মারাঠাদের আপত্তি পরে এই সমাধান হলো মাদ্রাজটা তামিলদের রাজ্যের ও হায়দরাবাদটা তেলুগুদের রাজ্যের রাজধানী করে। কিন্তু হায়দরাবাদ নিয়ে এখনো মধ্যে বিবাদ বেধে গেছে হায়দরাবাদ মুলুকের তেলুগুতে ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তেলুগুতে। ধর্ম, একই ভাষা, কিন্তু দুই অঞ্চল। যখনকার কথা বলছি তখন কেউ হায়দরাবাদ পাবার স্বপ্নও দেখত না। দেশীয় রাজ্যের বিলোপ ছিল অকল্পনীয়। প্রজারা শুধু চেয়েছিল রাজারা গণতান্ত্রিক সংবিধান মেনে নিন। বাঁচুন আর বাঁচতে দিন। তাঁরা যদি ফেয়ারের লিখন পড়তে জানতেন।

মাদ্রাজে আমরা অমূল্য গুপ্তর অতিথি হই। রেলওয়ে অফিসার। কর্মিকর্মা ব্যক্তি। আমাদের ঘুরিয়ে দেখান। সমুদ্রের কূলে হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রভৃতি সুদৃশ্য ও সুবৃহৎ সৌধ। পাশ্চাত্য রীতির। অবশ্য দ্রষ্টব্য একটি আকোয়ারিয়াম। সেই জলাধারে কত রকম মাছ যে আছে? আর কী সুন্দর! বেশীর ভাগই সমুদ্রের।

থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির বিশ্বকেন্দ্র আড্যার মাদ্রাজের একপ্রান্তে। সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। অ্যানী বেসান্টের দেহান্তরের পরে তাঁর অনুগামীদের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে মতভেদ বেধা দেয় একদল আলাদা হয়ে যান ও তাঁদের ইউনাইটেড লজের সদর হয় বম্বে। মিসেস বেসান্টের সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় অন্তরীণ করা হয়েছিল যে দু'জনকে তাঁদের একজন ছিলেন ওয়াডিয়া ও অপরজন এরাণ্ডেল। বম্বের ভার নেন ওয়াডিয়া। তিনিও তাঁর বন্ধুজন মিলে যে "আর্যসঙ্ঘ" স্থাপন করেন আমরা থাকি তারই গেস্ট হাউসে। আর এরাণ্ডেল ও তাঁর পত্নী তথা অন্যান্য অনেকের কর্মপরিচালিত হয় আড্যার থেকে। আমরা আগে থেকে চিঠি লিখে বা খবর দিয়ে যাইনি, তাই কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় না। শুধু স্থান পরিক্রমা করি। আশ্রমের উপযুক্ত পরিবেশ। এইখানেই জনাকয়েক ইউরোপীয় ও ভারতীয় মিলে কংগ্রেসের কল্পনা করেন। ধর্ম আর সমাজ আর শিক্ষা আর রাজনীতি আর সাংবাদিকতা সমস্তই ছিল এর কর্মসূচির অঙ্গ। পরে রুক্মিণী দেবী এরাণ্ডেলের উদ্যোগে কলাকেন্দ্র সংযুক্ত হয়। কিন্তু রাজনীতি হয় পরিত্যক্ত। দলাদলির ফলে ধর্মেরও আর সে প্রভাব থাকে না। ওঁদের ধর্ম অবশ্য সর্বধর্ম সমন্বয়। কার্যত হিন্দু বৌদ্ধের অংশটাই বেশী! থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি মাদ্রাজকে যে আন্তর্জাতিকগুরুত্ব দেয় তা অভূতপূর্ব। তেমনি আনী বেসান্ট যেন নিখিল ভারতীয় গুরুত্ব।

একদিন আমরা তেরো শতাব্দী পেছিয়ে গিয়ে মামল্লপুরম্ দেখে আসি। মাদ্রাজ হবার চারশ বছর আগে মামল্লপুরম্ বা মহাবলী পুরম্ ছিল সমুদ্রপথে যাতায়াতের বন্দর। বাণিজ্য চলত একদিকে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে ওদিকে ইউরোপের সঙ্গে। ওইরকম আরো কয়েকটি বন্দর ছিল পূর্ব পশ্চিম উত্তর উপকূলে। আরব শক্তি ভারত মহাসাগরে প্রবেশ হবার আগে ভারতীয় শক্তিই ভারত মহাসাগরে প্রবল ছিল। ইতিহাস বলতে বোরাত কাবুল থেকে বালী দ্বীপ অবধি ভূখণ্ড। সেই সুপ্রশস্ত যুগ পরে অপ্রশস্ত হয়। সংকীর্ণ হিন্দু দৃষ্টিতেই সব কিছু দেখার অভ্যাস জন্মায়। শৈলখাত প্যাগোডার নাম পাণ্ডব রথ কেন হবে তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা নেই। পাথরে তৈরী দাতটি পোর টেম্পলের দু'টিকে সমুদ্রে গ্রাস করেছে। বাকী একটিতে বিগ্রহ নেই। পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা গঙ্গাবতরণ, অর্জুনের তপস্যা প্রভৃতি দৃশ্য কালজয়ী হয়েছে। অপূর্ব কারুকার্য। হাতী, সাপ প্রভৃতি প্রাণীর ছড়াছড়ি। অদ্ভুত প্রাণবন্ত। পল্লব রাজবংশ অক্ষয় কীর্তি রেখে গেছেন।

দক্ষিণ ভ্রমণ অসমাপ্ত রেখে আমরা ফরাসী জাহাজ ধরে মাদ্রাজ থেকে কলম্বো যাই। কলম্বো থেকে রেলপথে ফিরব ও দেখতে দেখতে আসব এই ছিল সংকল্প। সঙ্গীত নাচ ইত্যাদি হাতে রেখে দিই। চেনাশোনাও ধীরে সুস্থে হবে। এসব অপেক্ষা করতে পারে, জাহাজ তো সবুর করবে না। সমুদ্রযাত্রার এই দ্বিতীয় সুযোগ আমার জীবনে।

প্রবাসিনীর পুরাতনী

জ্যোতির্ময়ী দেবী

১৮৮৯/'৯০/'৯১-ও হতে পারে কোন সাল ঠিক আমার জানা নেই। দেশটা জয়পুর রাজস্থান।

সন্ধ্যাবেলা। আমার এক পিসিমা বাড়ীর বাইরের প্রাঙ্গণের দো করছিলেন। ৯৭ বছর বয়স, নাম উষাময়ী।

সহসা একজন সন্ন্যাসী এসে দাঁড়ালেন। বললেন, খুকি তোমার মাকে গিয়ে বল একজন অতিথি এসেছেন।

অতিথি সমাগম সেকালের প্রবাসের বা স্বদেশের বাড়ীতে খুবই সাধারণ ঘটনা। মানুষ অনায়াসে অতিথি হতেন, এবং আতিথ্য পেতেন।

পিসিমার জননী আমার পিতামহী শুনলেন এবং আতিথ্যের ব্যবস্থা হ'ল নিশ্চয়ই। কেউ করলেন বোধ হয় পুরুষরা অথবা চাকররা। কারণ সেকালে তো মেয়েরা পর্দানশীন অন্তঃপুরিকা।

তখনকার বাড়ীখানার ডানদিকে একটা বড় পোক্তো জায়গার উপর একটা আটচালা মত ছিল খড়ের, সেইটা অতিথি সজ্জন বন্ধুগন এবং বাড়ীর পুরুষদের বৈঠকখানাও ছিল।

অতিথি সেখানে কয়েকদিন বোধ হয় ছিলেন।

মা ও পিসিমার মুখে শুনেছি, রাত্রে সুন্দর অপূর্ব কণ্ঠে তাঁরা তাঁর গান শুনতে পেতেন।

"নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপ রাশি"

"এলো কৃষ্ণ এলো ঐ, বাজলো বাঁশরী"

(গিরিজা ঘোষ)

"মন চল নিজ নিকেতনে" আরও গান।

মজলিসে অথবা একা তা তাঁরা কিছু জানতেন না। বলেন নি।

তারপর সেই অতিথি সহরের কোন্ পণ্ডিতের কাছে পাতঞ্জল দর্শন পড়তে সহরের মধ্যে রইলেন কিছুদিন। আমাদের বাড়ীটা সহরের বাইরে। সহরের যাওয়ার গেট রাত্রি ৯টার পর বন্ধ হয়ে যেত বাইরে ভিতরে যেতে আসতে 'পাশ' লাগত লোকেদের।

পরে সেই অতিথি সন্ন্যাসী আবু পাহাড়ে গেলেন খেতড়ী (ক্ষেত্রী) রাজার দেওয়ান জগমোহন লালজীর সঙ্গে আলাপ পরিচয় সূত্রে রাজার সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল।

অতঃপর ১৮৯৩ সালে সেপ্টেম্বর মাসে অকস্মাৎ আমেরিকার শিকাগো মহাধর্ম সম্মিলনে জগদ্বিখ্যাত বিবেকানন্দ রূপে বিস্মিত বিশ্বের সামনে আবির্ভূত হলেন। এবং জয়পুরবাসীও বিস্মিত হয়ে গেলেন।

পাশের সেই আটচালাখানির জায়গায় তখন ১৮৯৩।৯৪ সালে আমার পিতামহ দেওয়ান চন্দ্রসেনের নতুন একটি বাড়ী হয়েছে।

সেই তখন অখ্যাত জগদ্বিখ্যাত সন্ন্যাসীর পদরজ পবিত্র সদ্যতে অতিরিক্ত পূত মাটিতে ঋ: ১৮৯৪ সালে (১৩০০ সাল মাঘ ১০।১১ই) জানুয়ারী ২৩শে সেই বাড়ীর প্রথম একখানি আঁতুড়ঘরে আমি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম।

প্রবাসীর বাঙালীর জীবনধারার তিনরূপ বা চার রকমে বিশিষ্ট ও বিচিত্র বলা যায়।

(১) অন্য প্রবাসী বাঙালীদের সঙ্গ সাহচর্য।

(২) অতিথি সজ্জন পথিক ভ্রমণকারী তীর্থযাত্রীদের আতিথ্য দান। মেলামেশা—সজ্জন সঙ্গ।

(৩) দেশীয় ধরনে কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠার চেষ্টা অথবা দুর্গোৎসব কালী পূজার আয়োজন তখনও ছিল কম হলেও। এই কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠার প্রবর্তক ছিলেন একজন কৃষ্ণানন্দ স্বামী, (পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী নন, গুপ্তিপাড়ার) ইনি ১৮৫৪ সাল থেকে পাঞ্জাবে দিল্লীতে লাহোরে আম্বালায়

রাজস্থানে (?) অনেক জায়গায় প্রায় ৪৫টি কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠা করেন।

দুর্গোৎসবও সেকালেও করেছেন বাঙালীরা। জয়পুরে করেছেন কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ৮।৯ বছর করেন। আমার প্রথম দুর্গোৎসব দেখা জয়পুরে ৪।৫ বছর বয়সে অস্পষ্ট মনে আছে। সে কি বিশাল প্রতিমা ও সেকি বিরাট বিরাট দেখা শিশু চোখে।

(৪) প্রবাসের বাঙালীর বিশেষত্ব হ'ল বাংলা সাহিত্য তখনকার দিনেও। যত কমই হোক সাময়িক পত্র প্রবাসীর সংবাদ কৌমুদী। হিতবাদী বঙ্গবাসী সবই সাপ্তাহিক পরে সন্ধ্যা দৈনিক তাঁদের বাড়ীতে নিতেন। আর মাসিক পত্র তত্ত্ববোধিনী বর্ষতত্ত্ব নব্যভারত হিন্দু পত্রিকা উদ্বোধন বঙ্গীয় বঙ্গদর্শন অনুসন্ধান জন্মভূমি প্রদীপ ভারতী প্রচার আর্যদর্শন সঙ্গে প্রবাসী প্রায় প্রথম থেকেই বাঙালীরা নিতেন। এমন কি হয়ত অনেকের জানা নেই কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত এবং রাজস্থান (টড্) মাসিক বাংলা পত্রিকা হিসাবে আমরা দেখেছিলাম। জীবনযাত্রা তাঁদের কিন্তু যতই সম্পন্ন হোক খুব সাধারণ ও সাদাসিদে ছিল। এ ছাড়াও বিদ্যাসাগর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র রমেশ দত্ত তখনকার রবীন্দ্রনাথাদির বই সবই ছিল।

একেবারে উপকরণহীন বিলাসবাসনহীন, খাওয়াদাওয়া অতি সাধারণ ডাল, ভাত, রুটী, মাংস, দুধ তরকারী। সেই "রাবণ" রাজ্যে দুধ ১৬।১৮ সের, মাংস দু'আনা সের চালই তখন একটু দাম বেশী ১ টাকায় ৪ সের। গমের আটা ১৬।২০। সের যাক এই "রাম" রাজ্যে তা আরও উপস্থান মনে হয়।

লোকজন দাসদাসী ভৃত্য কিন্তু অনেক আর গাড়ী ঘোড়াও ছিল।

প্রবাসী বাঙালীরা প্রায়ই ইংরেজী শিক্ষিত সম্প্রদায়। তখন ওদেশের অধিবাসীরা বিদেশী শিক্ষা গ্রহণ করেন নি। কাজেই উত্তর পশ্চিম ভারতে তখন সর্বত্রই ইংরাজী জানা প্রবাসী বাঙালী ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, উকিল ও শিক্ষকদের খুব প্রতিষ্ঠা আর সম্মান।

জয়পুরে ঐ ইংরেজী জানা বা শিক্ষিত বাঙালী অনেক ছিলেন। তার মধ্যে সঞ্জীবন গাঙ্গুলী মহারাজা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন। মেঘনাথ ভট্টাচার্য (হরপ্রসাদশাস্ত্রীর ভাই) ও শিক্ষক ছিলেন।

আমার পিতামহ এবং কান্তিবাবু ও শিক্ষক ছিলেই প্রথম আসেন ক্রমে রাজার সেক্রেটারী হ'ন পরে মন্ত্রিত্বে উন্নীত হ'ন।

কিন্তু এদের আগেও প্রবাসী বাঙালী দুধারা ছিলেন। প্রথম ধারা হলেন সম্রাট আকবর ও মহারাজা মানসিংহের আমলের প্রবাসী। যাঁদের রাজা মানসিংহ বারো ভূঁইএর কেদার রায়ের কালীমাতা দেবীকে অম্বরে এনে অম্বরেশ্বরী নামে প্রতিষ্ঠা করেন। তাদের পুরোহিত সম্প্রদায়। এর নাম ছিল শঙ্কর ভট্টাচার্য। জয়পুর নগরী নির্মাতা স্থাপত্য বিদ্যা বিশারদ রাজমন্ত্রী বিদ্যাধর ভট্টাচার্যএঁর প্রপৌত্র।

এঁরা আচারে ব্যবহারে একেবারে বাংলা ভুলে গেছেন এই প্রায় ৪।৫০০ বছরে।

দ্বিতীয় ধারায় বাঙালী (প্রবাসী) ছিলেন ঔরঙ্গজেবের বৃন্দাবন মথুরার মন্দির ধ্বংস অপবিত্র করার অভিযানে দেবতা ও বিগ্রহ নিয়ে পলায়ন বাঙালী-গোস্বামী সম্প্রদায়। শ্রী শ্রীগোবিন্দজী গোপীনাথজী মদনমোহনজীকে জয়পুর রাজার জয়সিংহ রাজার শরণাগত হয়ে আশ্রয়ে আনেন। এবং সেই থেকে রাজা হন "গওয়াই" (সেবাইত) রাজা জয়সিংহ। এবং প্রচুর দেবত্র সম্পত্তি বিগ্রহ সেবার জন্য দেওয়া হয়। প্রথম দলের মত এঁরা বাংলা একেবারে ভুলে যান নি কিন্তু।

একটু একটু মনে আছে কিন্তু হিন্দী বা ওদেশী রাজস্থানী মিলিয়ে তাঁদের মাতৃভাষার মত। কুটুম্বিতার জন্য বাংলাদেশে আসা যাওয়া আছে মেয়ে বৌয়ের আদান প্রদান হয়। তবু কালক্রমে ভুলে যান তাঁরা।

তৃতীয় ধারায় প্রবাসী বাঙালী ব্রিটিশ আমলের এঁরা ভাষা সাহিত্য বন্ধু অভিধের সঙ্গে আলাপআলোচনায় এখনো বাংলা ভোলেন নি।

আমাদের এই সব দলেই বন্ধু খেলার সঙ্গী ছিলেন গোঁসাই বাড়ীর, অধ্যাপক বাঙালী বাড়ী এবং অভিধি সব আমাদের বাংলাভাষাও বাঙালীকে ভুলতে দেয় নি। কত রকমের অভিধি যে এসেছেন।

জবলপুরে মানুষ কেউ স্থায়ী হয়ে বসে গেছেন কেহ—সতোন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। বিলাতফেরৎ সাধু—এই পরিবারের সঙ্গে ১৯০১ এ আসেন।

এঁরই প্রেরণায় ঠাকুমা আমাদের শিবপূজা করতে শেখান বলেছিলেন 'মা বাড়ীতে এতগুলি মেয়ে কুমারী বাগানে এত ফুল বেলপাতা এঁদের শিব পূজা শেখান না। ঠাকুমা অন্তরীক্ষ (পর্দাথেকে) থেকে প্রেরণাটা নেন।

এখন অতিথি এসেছে। কতদিন ঘুম থেকে উঠে দেখেছি পিতামহের পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন জলের ঘটী গামছা হাতে বৃন্দাবন ফেরৎ তীর্থ যাত্রী বৈষ্ণবী নারী। স্নান পূজা করা হলে দেব দর্শনে বেরুতেন। আমরাও 'গাইড' হতাম কখনো কখনো। এসে রান্না খাওয়া। অনেকে বাড়ীর আতিথ্য নিতেন। কেউ কেউ প্রতিগ্রহ করতেন না। নিজেদের পোটলা পুটলী থেকে চিড়ে চাল ইত্যাদি বার করে রাঁধতেন। বাড়ীর লোকরা উনুন হাঁড়ী জলের ব্যবস্থা করতেন।

একবার একটি কৌতুকাবহ ঘটনা হয়। অতিথি রাঁধতে বসে দেখেন নুন নেই।

মহা সমস্যা। বাজার দূরে সহরে আর টেশনে। চাকররা খেতে বাড়ী গেছে বা যাবে।

বিপন্ন মহিলাটি দুটী পয়সা হাতে নিয়ে গৃহিনীদের কাছে দাঁড়ালেন। দু'পয়সার নুন যেন যদি।

তাঁরা চমৎকৃত। নুন বিক্রী করবেন অতিথিকে? এমনি নিন না!

প্রতিগ্রহ' করব কি করে মা?' অতিথিকে!

এঁদের ও সমস্যা নুন বিক্রী করবেন কি করে? সকলে কৌতুকে উচ্ছল। তর্ক মেটে না।

অবশেষে এক তৃতীয় তার ঘর থেকে দু পয়সার নুন এনে দিলে সমস্যা মেটে।

চারদিকে অনেক বন্ধু অতিথি মানুষের সম্পর্ক প্রবাসী মানবমনের আনন্দ এবং লোকজন গরু ঘোড়া মহিষ কুকুর পোষা পাখিরা মধুর নানাজাতীয় দাসদাসীর সন্তান আমাদের খেলার ও আনন্দের উপকরণ।

আজ অনেক দূর থেকে মনে হয়। এই মানব সম্পর্ক আমাদের একালের জীবন থেকে হারিয়ে গেছে।

তীর্থযাত্রী অতিথি ছাড়াও কিছু অন্য অতিথির দুর্লভ সঙ্গ ও বাড়ীর প্রবাসীরা পেয়েছেন

যেমন পুণ্য শ্লোক ভারত বিখ্যাত পণ্ডিত মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ কিছুদিন জবলপুরে আমাদের বাড়ীতে থেকে পড়াশোনা করেন মহারাজা কলেজে। সেখান থেকে সর্বোচ্চ সম্মানে বি এ, পাশ করে কাশীতে কুইনস কলেজে কাজ নিয়ে চলেআসেন এবং সেখানে পড়াশোনা করেন।

আমাদের, এঁর ঘরের আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথের তখনকার।

১২ খণ্ড কাব্য গ্রন্থাবলী। ক্ষীণ দেহ রোগা মুখ চোরা মানুষটি যখন সসম্মানে পাশ করলেন রাঁচির জন্য বাঙালীদের কি গর্ব ও আনন্দ।

সার যদুনাথ গেছেন শুনেছি পিতার কাছে।

রবীন্দ্রনাথ গেছেন কয়েক দিনের জন্য। তখন আমি শ্বশুর বাড়ীতে।

শেষে দেখি ১৩০৬।৩৭ সালে 'গল্পালিকা'র বিখ্যাত রম সাহিত্যিক পরশুরাম রাজশেখর বসু মহাশয় যেন। প্রবাসী বাঙালীরা আনন্দিত। আমার ভাইয়েরাও পরিচিত হতে গেলেন তাঁদের হোটেলে। তাঁরা ফিরে যাবার দিন এঁদের বাড়ীতে কিছুক্ষণের জন্য বসলেন এবং খাওয়ানো হল।

পরশুরামের স্ত্রী ও তাঁর দিদিকে আমরা অল্প দূরে দেখলাম সেকালে বাইরের পুরুষদের সঙ্গে আলাপের প্রথা ছিল না ও বাড়ীতে। তাঁদের ঐ মধুমাখা দেশের পাহাড় হরিণ মযূর দেখে মুগ্ধ।

আর বালিকাকালে একটি বন্ধু সংগ্রহ হয়। তার নাম প্রতিভা দেবী এলাহাবাদের এডভোকেট দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে চিঠিপত্রের মাধ্যমে বন্ধুত্ব আছে।

এই হল প্রবাসী বাঙালীর সেকালে বিচিত্র জীবন চিত্র মাত্র ঘর জীবনের সঙ্গও আনন্দে উজ্জ্বল।

একজন আসতেন ব্রজেন্দ্রনাথ উপাধি মনে নেই অতি সুগায়ক। বুঁদীর মেওয়ান ছিলেন তিনি এলে বাড়ীতে এবং সহরে তোলপাড় পড়ে যেত গানের শ্রোতা ও শ্রোত্রীদের মধ্যে।

সকলের রান্নাঘরে সকাল সকাল চাবি। আর এবাড়ীতে চিকের আড়ালে নারী সমাবেশ। রাত এগারোটা শেষ গান আর গানের ফরমাস আর থামে না। আজ এই পর্যন্ত।

সাধনা বিউটি ক্রীম

তাঁর মনোহারিণী সৌন্দর্য!

প্রতিদিনের রূপচর্চায়
সাধনা বিউটি ক্রীম তাঁকে
এনে দিয়েছে
যৌবনসুলভ কমনীয়তা
আর অপরূপ লাবণ্য

একটি অতি আধুনিক
অনন্য অঙ্গরাগ
প্রতিদিনের রূপ-সাধনায়
অপরিহার্য

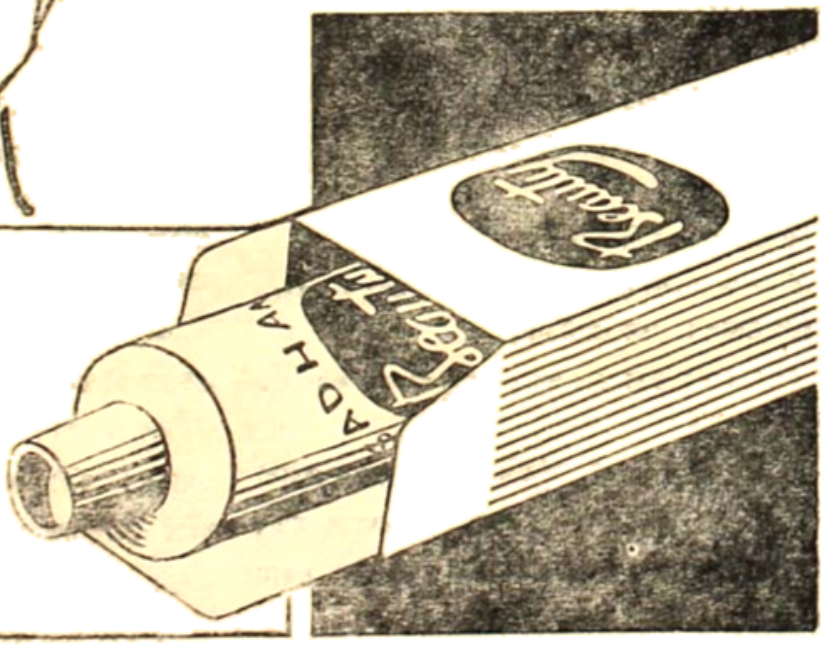

সাধনা
ঔষধালয়
ঢাকা
কলিকাতা-৬৮

শাখা ভারতের সর্বত্র

কাহিনী

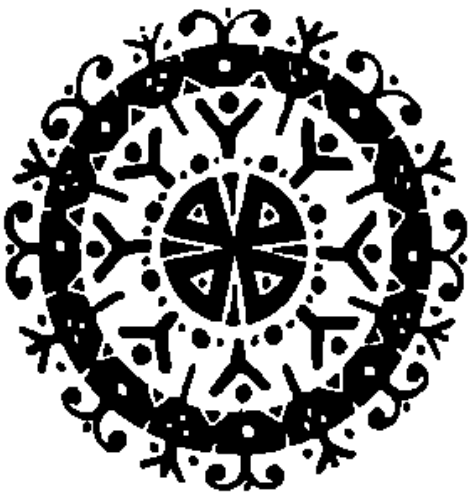

২৭৯এ,চিত্তরঞ্জন এভিনিউ,
কলিকাতা-৬ ফোন-৫৫-৩২৯৪

শাড়ী নয় সুতার কবিতা
শাড়ী শিল্পের চরম উৎকর্ষ অতি সুস্পষ্ট প্রতিটি শাড়ীতে
অতি আধুনিক * অভিনব * অভিজাত

কেলেঙ্কারী

বিমল মিত্র

আমার বন্ধু বিলাস বিহারী নামেও যা কাজেও তাই। অর্থাৎ নামেও বিলাস বিহারী আবার কাজেও বিলাস বিহারী সারা জীবন বিলাসিতা করে করেই কাটিয়ে দিয়েছে সে। এমন কিছু বিলাস নেই যা সে ভোগ করে-নি জীবনে।

এক একবার তাকে সাবধান করে দিতাম। বলতাম—আর কেন, এবার তো বয়েস হলো, এখন ও-সব ছেড়ে দাও না।

বিলাস বিহারীও বলতো:—আরে ভাই, আমি তো ছাড়তেই চাই, কিন্তু কম্‌লি যে ছাড়ে না।

সত্যি, আমিও দেখেছি বিলাস বিহারী নামটার মধ্যেই যেন কী একটা বিলাসিতা ছিল। সেই বিলাসিতার জন্যে যার সঙ্গেই সে মিশতো সে-ই তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তো। ঈশ্বর তাকে চেহারাটাও দিয়েছিল অপূর্ব। যেন তার স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে একেবারে খাপ খাইয়ে। তার নামের সঙ্গেও মিলিয়ে

বিলাসের পেশা ছিল ঠিকেদারি। বাড়ি তৈরির ঠিকে নিত সে। মানে ইংরিজি ভাষায় যাকে বলা যায় বিল্‌ডিং-কন্‌ট্রাক্টার।

মোটামুটি নিজের পেশায় এক রকম করে চালিয়ে নিত সে। টাকা হাতে আসতোও তার যেমন তেমনি আবার বেরিয়ে যেতেও ঠিক তাই। বেরিয়ে যেত ওই সব বদ্-খেয়ালে। আজকালকার সহরের মানুষের যত রকমের বদ্ খেয়াল থাকে সে সমস্তই বিলাসের ছিল। বদ্ খেয়ালের মধ্যে ছিল রেস খেলা। ওই এক রেস খেলার নেশাতেই কত লোকের ভিটে মাটি উচ্ছন্নে যায়। তার ওপর্ আবার ছিল তার মেয়েমানুষের নেশা। মেয়েমানুষের নেশাটাই ছিল বিলাস বিহারীর সব চেয়ে প্রবল। অনেক মেয়ে বিলাস বিহারীকে বেশ করে দুয়ে নিয়েছিল। তারপর যখন সে ছিবড়ে হয়ে গিয়েছিল তখন আর পাত্তা দেয় নি তাকে। আর বিলাস বিহারীও ছিল নিত্য নতুনের ভক্ত। দু'দিনের মধ্যেই তার কাছে সবাই পুরোন হয়ে যেত। তখন আবার নতুন করে নতুনের পেছনে ছুটতো বিলাস।

এ সব ছাড়াও তার আরো অনেক রকমের নেশা ছিল। সেগুলো তেমন মারাত্মক নয়। যেমন মদ, চা, সিগারেট প্রভৃতি।

আসলে বিলাস ছিল একজন যাকে বলে বিলাসী পুরুষ।

এ যেন মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা আমার মত লোকের পক্ষে একটু অস্বাভাবিক বৈকি। তবু যখনই বিলাস আসতো তার সঙ্গে গল্প করতে করতে আমার কখন যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কেটে যেত তার আর হিসেব থাকতো না কারো।

সেদিন হঠাৎ আবার ধূমকেতুর মত বিলাস এসে হাজির হতেই আমি তার চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেলাম।

বললাম—কী হয়েছে হে তোমার?

বিলাস একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে—আমি ভাই এবার রিটায়ার করেছি—

—রিটায়ার করছো মানে? কীসের থেকে রিটায়ার করলে?

বিলাস বললে—সব কিছু থেকেই রিটায়ার করলুম ভাই।

বললাম—কেন? কোন্ দুঃখে?

বিলাস বললে—দুঃখে নয় ঘেন্নায়।

জিজ্ঞেস করলাম—কার ওপরে ঘেন্না? রেস খেলার ওপর, না মদের ওপর, না মেয়েমানুষের ওপর?

বিলাস বললে—তাই সব কিছুরই ওপর। নেহাৎ নিজের ব্যবসাটা চালাতে হয় তাই কোনও রকমে চালাচ্ছি,

নইলে খাবো কী! ওটা ছাড়া আর সব কিছু ছেড়ে দিয়েছি—

বললাম—কিন্তু হঠাৎ বেরা হলো কেন? তোমার তো অমৃতে অরুচি হবার কথা নয়!

বিলাস বললে—হ্যাঁ ভাই, সেই অমৃতেই এবার আমার অরুচি হলো।

—কী রকম?

বিলাস বললে—তাহলে ভাই তোমার লোককে আগে এক কাপ চা করতে বলো!

চায়ের অর্ডার দিলাম। চা-ও এলো। চা খেতে খেতে বিলাস আবার একটা সিগারেট ধরালে নতুন করে।

বললাম—এবার বলো কী হয়েছে তোমার—

বিলাস বলতে লাগলো—উল্টোডিঙিতে একটা বাড়ি তৈরির কন্ট্রাক্ট পেয়েছিলুম তা তো তুমি জানো। তেমন বড় বাড়ি নয়। মোটামুটি একটা দোতলা বাড়ি। আমার এক বন্ধু চাকরি থেকে রিটায়ার করে একটা বাড়ি করবে, তাই আমাকে এসে ধরলো। তা সেই বাড়ি তৈরির ব্যাপারেই আমাকে সেখানে রোজ যেতে হতো। কাণ্ডটা সেখানেই ঘটলো—

বলে বিলাস একটু থামলো।

জিজ্ঞেস করলাম—কী কাণ্ড হলো?

—বলছি। আজ তোমার কাছে আমার আসাটাও সেই জন্যে। জীবনে ভাই নিজের দিকটাই বরাবর ভেবে এসেছি। বেশের কথা ভাবা দূরে থাক, নিজের ছেলে মেয়ে বউ মা বাবা কারোর কথাই কোনওদিন কখনও ভাবিনি। তুমি তো জানো আমি বরাবর একটু স্বার্থপর ধরণের মানুষ। আমার কাছে আমার ব্যক্তিগত সুখ-সুবিধেটাই বড় জিনিস! এসব তো তোমরা সবই জানো। কিন্তু এখন হঠাৎ নিজের কথা ছেড়ে একটু একটু অন্য লোকের কথাও ভাবতে আরম্ভ করেছি—

বললাম—কেন?

বিলাস বললে—এর জন্যে দায়ী একটা সেলস্‌ম্যানের

—সেলস্‌ম্যান! মানে ফেরিওয়ালা?

—হ্যাঁ। সাবানের সেলস্‌ম্যান। লোকটার নামও আমি জানতে পেরেছি। তার নাম নিবারণ। নিবারণ সরকার। লোকটা চাকরি-বাকরি কিছু করে না। সকাল বেলা উঠে চা খেয়ে একটা ছোট সুটকেস নিয়ে বেরোয়। তার ভেতরে থাকে নানা রকম সাবানের স্যাম্পেল। সস্তা দামী নানারকম সাবান। সুটকেসটাও ভাঙা, লোকটার শরীরটার মতই ত্যাড়াব্যাঁকা।

সকাল থেকে ওই সাবানের অর্ডার জোগাড় করতে করতেই তার দুপুর একটা গড়িয়ে যেত। কোনওদিন অর্ডার জুটতো আবার কোনওদিন বা অর্ডার জুটতো না। যত টাকার অর্ডার জুটতো, মাল সাপ্লাই হলে যখন পেমেন্ট হতো তখন নিবারণ সরকার পেত টাকায় দু'আনা কমিশন। এই-ই ছিল লোকটার পেশা!

কিন্তু কলকাতা সহরে সাবানের সেলস্‌ম্যান কি একটি? ও রকম কত নিবারণ সরকার যে কলকাতায় আছে তার কি গোণাগুন্তি আছে? যারা সেলস্‌ম্যান হয় তাদের চেহারাটাও একটু ভালো হওয়া দরকার। কিম্বা একটু ভালো দামী পোষাক-পরিচ্ছদ। কিন্তু নিবারণ সরকারের সে সব কিছুই নেই।

প্রতিদিন আমি উল্টোডিঙির নতুন বাড়িটা তদারক করতে যেতুম। বাড়িটা তখন দোতলা পর্যন্ত ইঁট গাঁথা হয়ে গেছে। কিন্তু বালির কাজ হয়নি, মেঝেও হয়নি। ছাদটা আগেই হয়ে গিয়েছিল। রাজমিস্ত্রীর কাজ তখন কিছুদিন বন্ধ আছে। সিমেন্ট পাওয়া যায় না। অনেক ঝামেলা চলছে তখন—

শেষকালে ছুতোরমিস্ত্রী নিয়ে পড়লাম ভাই। সারাদিন ছুতোরমিস্ত্রীরা জানলা দরজা তৈরি করে আর আমি সকাল থেকে গিয়ে সেখানে বসে বসে সুপারভাইজ করি।

ছুতোর মিস্ত্রীর কাজ দেখা তেমন কিছু জরুরী ব্যাপার ছিল না আমার। কারণ ওরা যেমে কাজ করবে আর যেমে পয়সা নেবে। কিন্তু জরুরী ব্যাপারটা ছিল অন্য!

সেই জরুরী ব্যাপারটাই তোমাকে এবার বলি।

যেখানে বাড়িটা তৈরি করছিলুম সেটা একটা বস্তি। আশে পাশে সবগুলো বাড়িই ছোট ছোট। কোনওটা

মাটির বাড়ি, টিনের চাল, কোনও বাড়িটার আবার ইটের দেওয়াল, টালির ছাদ। এই রকম।

ঠিক এই রকম একটা বাড়ি ছিল আমার নতুন বাড়ির উল্টোদিকে। আমার তৈরি করা বাড়িটার দোতলা থেকে ওই বাড়িটার উঠোন ঘর-দোর, এমন কি শোবার একখানা ঘর পর্যন্ত সব কিছু দেখা যেত!

ওইটেই ছিল সাবানের সেলস্‌ম্যান নিবারণ সরকারের বাড়ি।

নিবারণ সরকার তো সকালবেলাই সুটকেসের ভেতরে সাবানের স্যাম্পেল নিয়ে বাইরে চলে যেত! কিন্তু নিবারণ সরকারের বউ বাড়িতে একলা থাকতো।

আমি সেই বউটাকে দেখতুম! একলাস বসে বসে বউটার কাজ-কর্ম লক্ষ্য করতুম।

তুমি তো ভাই আমাকে চেনো। আমার স্বভাব-চরিত্রও তো মোটামুটি জানো। আমি মদ পান করি, আমি রেস খেলি। আমি কী-ই না করি! সমাজে যে কাজগুলোকে খারাপ বলে সবাই জানে সেগুলো সবই আমার নিত্য কর্ম। তাই আমি সেইখানে নিরিবিলিতে বসে বসে বউটিকে দেখতুম। তার রোজকার ঘরকন্নার কাজগুলো ছিল আমার লক্ষ্যবস্তু।

তা সেই দেখাই যে শেষকালে এমন কেলেঙ্কারিতে পরিণত হবে তা আমি ভাই তখন কল্পনাও করতে পারিনি।

আমি জিজ্ঞেস করলাম—কেলেঙ্কারী মানে?

বিলাস বললে—সেই কথা বলতেই তো এসেছি। জীবনে অনেক কিছু দেখেছি, অনেক কিছু শিখেওছি আমি, কিন্তু এমন ঘটনা আগে কখনও আমার জীবনে দেখিনি ভাই। আমি দোতলায় বসে বসে দেখতুম বউটার দিকে। আর লক্ষ্য করতুম বউটা সংসারে খেটে-খেটে একেবারে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পর্যন্ত পেত না। ঘর-দোর পরিষ্কার করা থেকে সুরু করে ভাত রাঁধা পর্যন্ত অনেক কাজ তার। অথচ ঘর বলতে ছিল মাত্র ওই একখানা। আর মানুষ বলতে তো মাত্র ওই দু'জন, স্বামী আর স্ত্রী!

ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে উনুনে আগুন দিয়েই বউটা কলে গিয়ে চান করে নিত। তখনও ঘুম থেকে উঠতো না নিবারণ সরকার! চা করে নিবারণের মুখের কাছে গিয়ে ডেকে আসতো বউটা, তখন উঠতো নিবারণ।

উঠেই বাজার করতে যেত সে। কাছেই বাজার। বাজার করে ফিরে এসেই নিবারণ আবার সুটকেসটা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরোত। আর সেই যে বেরোত ফিরতো একেবারে দুপুর করে। কখনও দুপুর একটা, আবার কখনও বা দু'টো।

যখন নিবারণ ফিরতো তখন একেবারে গরমে ঘেমে নেয়ে উঠেছে সে। হাতের সুটকেসটা নামিয়ে রেখে নিবারণ পকেট থেকে এক গাদা খুচরো পয়সা বার করে বউ-এর হাতে দিত। সে অনেক খুচরো। বোধহয় আট-দশ টাকার খুচরো হবে। সব সাবান বেচার পয়সা। দু'তিনবার মুঠো মুঠো খুচরো পয়সা বার করে বউ-এর হাতে দিয়ে নিবারণ তখন গায়ের জামাটা খুলে ফেলতো। বউটা তখন কাছে এসে একটা হাত পাখা নিয়ে স্বামীকে বাতাস করতে আরম্ভ করতো।

আমি অবাক হয়ে বউটার সেই স্বামীসেবা দেখতুম।

অমন স্বামীসেবা ভাই আমি আর কখনও কোনও বউ-এর দেখিনি। এক একদিন দেখতুম নিবারণ খাটের ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে আছে আর বউটা তার পায়ের কাছে বসে বসে পা টিপে দিচ্ছে। সত্যি ভাই, আমিও তো বিয়ে করেছি, কিন্তু মনে হতো নিবারণ সরকার সত্যিই ভাগ্যবান। নিবারণ সরকারের স্ত্রী-ভাগ্য দেখে আমি অবাক হয়ে যেতুম। মনে মনে হিংসেও হতো নিবারণ সরকারকে!

আর দেখতুম বউটার খাটুনি। জামা-কাপড় কখনও ধোপার বাড়ি দেওয়া হতো না। সে সংস্থানও ছিল না নিবারণ সরকারের। তাই এক একদিন সেই জামা কাপড়ের স্তাঁই নিয়ে কাচতে বসতো বউটা। আর কাপড়ও কি একটা? সেই জামা কাপড় সোডা সাবান দিয়ে কেচে তাতে নীল দিয়ে ঘাড় দিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া। তার ওপর সংসারের নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ তো

আছেই। ভাত রাঁধা, ঘর ঝাঁট দেওয়া মোছা. আর নিবারণ সরকার বাড়ি এলে তাকে আধ ঘণ্টা ধরে পাখার বাতাস করা। কাজ কি তার কম!

আর নিবারণ যখন খেতে বসতো তখন সামনে বসে খাওয়ানো! সে কী যত্ন, কী আগ্রহ, তোমাকে কী বলবো ভাই।

খেয়ে উঠে নিবারণ সরকার বিছানায় চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়তো, আর বউটা তখন স্বামীর সেই এ টো থালায় নিজের ভাত তরকারি নিয়ে খেতে বসতো।

আর খেয়ে নিলেই তো আর সংসারের কাজ ফুরিয়ে যায় না। তখন আছে রান্নাঘর পরিষ্কার করা, বাসন মাজা। সেই টা-টা রোদে পিঠ দিয়ে বাসন মাজতে মাজতে ঘাম পুড়ে যেত বউটার। মুখ লাল হয়ে যেত রোদ্দুরে।

দিনের পর দিন এই রকম। প্রতিদিন নিবারণ সরকারের সংসারের চাকা এই রকম করে ঘুরে চলতো আর আমি সামনের নতুন বাড়ির দোতলায় বসে বসে আড়াল থেকে সব লক্ষ্য করতুম।

তারপর যখন রোদ একটু কমে আসতো তখন নিবারণ সরকার ঘুম থেকে উঠতো। উঠলেই চা নিয়ে আসতো বউটা। শুধু চা নয়, সাবান-কাচা গেঞ্জিটাও এগিয়ে দিত, জামাটাও এগিয়ে দিত স্বামীর হাতের কাছে। নিবারণ সেগুলো পরতো আর তারপর আবার সেই সাবানের সুটকেসটা নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়তো।

তখন বউটা আবার সংসারের ঝাঁতাকলে জড়িয়ে পিষে মরতো অনেক রাত পর্যন্ত। সন্ধ্যে হবার পর আমি আর থাকতুম না। কারণ বাড়িতে তখনও ইলেকট্রিকের লাইন লাগানো হয়নি। ছুতোর মিস্ত্রীদের কাজও তখন সেদিনকার মত শেষ হয়ে যেত। তারা তাদের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়ে তখন বাড়ি চলে যেত। আমি তখন দরোয়ানকে তার রোজকার ঘোরাকির পয়সা বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি চলে আসতুম।

এই রকমই রোজ চলছিল।

রোজই আমি ওখানে রোজকার কাজ তদারক করতে যেতুম আর তদারকের নাম করে সাবানওয়ালার সংসারের দৈনন্দিন চিত্রটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতুম। সত্যি কথা বলতে গেলে সেই দেখার মধ্যে আমার কোনও বদ মতলবও ছিল না।

কিন্তু সেদিন হঠাৎ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো।

দুপুর বেলা ঘুম থেকে উঠে নিবারণ যেমন চা খায় রোজ তেমনি চাও খেলে। বউ যেমন সাবান কাচা গেঞ্জি আর জামা এগিয়ে দেয় তেমনি এগিয়ে দিলে। নিবারণ সরকারও রোজকার মত সেগুলো পরে সাবানের সুটকেস হাতে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বউটা অন্যদিন তখন উনুনে আগুন দিতে যায়। ঘর দোর পরিষ্কার নিয়ে ব্যস্ত থাকে।

কিন্তু সেদিন আর তা করলে না সে! তাড়াতাড়ি চলে গেল গা ধুতে। ভিজে কাপড়ে গা মুছে কলঘর থেকে বেরোল। একটা ভালো রঙিন শাড়ি বার করলে বাক্স থেকে। সেখানা পরলে। তারপর একটা ব্লাউজও গায়ে দিয়ে নিলে। নিয়ে ছোট একটা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখখানা দেখতে দেখতে চুল বাঁধতে লাগলো। চুল বেঁধে কপালে একটা সিঁদুরের টিপও লাগালে মোটা করে।

আমি অবাক হয়ে গেলাম। কোথাও যাবে নাকি? সিনেমা দেখতে যাবে? নিবারণ হয়ত সিনেমার টিকিট কিনে আনতে গেছে! কিম্বা হয়ত কোনও আত্মীয়ের বাড়িতে বিয়ের নেমন্তন্ন। সেখানে যাবে বলে আগে থেকে সাজছে গুজছে।

ছুতোর-মিস্ত্রীরা তখন তাদের পাওনা মিটিয়ে নিয়ে চলে গেছে। দারোয়ানটাও পেছনের দিকে কোথায় তার চাপাটি বানাচ্ছে। আমি চলে গেলেই সে সদরে খিল লাগিয়ে দেবে ভেতর থেকে!

কিন্তু আমি সেখানেই আটকে গেলুম। দোতলার ঘরটাতে। এরকম তো কখনও হয় না! হঠাৎ এরকম ব্যতিক্রম কেন হলো দেখতে হবে।

দেখলাম বউটা তখন মুখে পাউডার-স্নো-ক্রীম যা কিছু

বাড়িতে আছে মুখে দেখে নিয়েছে। ভাবলুম এইবার বোধহয় নিবারণ সরকার সিনেমার টিকিট কিনে নিয়ে এসে হাজির হবে। এসে তার বউকে নিয়ে বেরিয়ে যাবে।

কিন্তু না, বউটা তখন সাজ শেষ করে নিজের ঘরটার শেকল বন্ধ করে উঠোনে এসে দাঁড়ালো। তারপর সদর দরজার খিল খুলে বাইরে এসে দরজায় তালা লাগিয়ে দিলে। দিয়ে রাস্তায় বেরোল। বেরিয়ে রাস্তা পেরিয়ে একেবারে আমাদের বাড়িটার দিকে আসতে লাগলো। অবাক কাণ্ড! এমন তো কখনো হয় না। জীবনে কখনও তো রাস্তায় বেরোতে দেখিনি বউটাকে

আমি ভয়ে শিউরে উঠলুম। বউটা আমার কাছে আসছে নাকি?

বলতে বলতে দেখি সত্যি নিচেকার সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে একেবারে আমার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে!

আমি তার দিকে চাইলুম। সেও আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগলো। যেন আমার কাছে আসতে পেরে সে খুশী হয়েছে খুব!

শেষকালে কিছু কথা না বললে খারাপ দেখায় বলে জিজ্ঞেস করলুম—তুমি? এখানে?

বউটি হাঁফাতে হাঁফাতে বললে—হ্যাঁ, আমি এসেছি—তোমার কাছে এসেছি—

বললাম—কেন?

বউটা বললে—আমি তোমার সঙ্গে চলে যাবো—

আমার মাথায় তখন যেন বজ্রাঘাত হয়েছে।

বললাম—কোথায় যাবে আমার সঙ্গে?

বউটা বললে—যেখানে তুমি নিয়ে যাবে—

বললাম—কিন্তু তোমার বাড়ি? বাড়ি কে দেখবে? তোমার সংসার?

বউটা বললে—ও চুলোয় যাক গে, আমি আর ও নিয়ে ভাবতে পারি নে।

আমি তখন সত্যিই ভয়ে কাঁপছি। বললাম—কিন্তু তোমার স্বামী? তোমার স্বামী কিছু বলবে না?

বউটা বললে—তার আসতে দেরী আছে। সে সন্ধ্যেবেলা তাস খেলতে যায়, সেখান থেকে ফিরতে তার রাত দশটা বেজে যাবে, ততক্ষণে আমরা অনেকদূরে চলে যাবো, টেরও পাবে না—

আমি কী বলবো কী করবো কিছুই ঠিক করতে পারছিলাম না। আমি বউটার মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। এ যেন একেবারে অন্য মানুষ। যে-মানুষটাকে রোজ মাসের পর মাস বছরের পর বছর পরম আগ্রহে স্বামী সেবা করতে দেখেছি এ যেন সে নয়। রাতারাতি যেন সেই মানুষটাই একেবারে বদলে অন্য রকম হয়ে গেছে।

আমি আরো ভয় পেয়ে গেলুম। ভাবলুম এ এখন মরীয়া হয়ে উঠেছে।

বললাম—কিন্তু আমার কাছে তো টাকা নেই। তোমাকে নিয়ে বাইরে গেলে তো অনেক টাকার দরকার। ঘর ভাড়ার টাকা লাগবে, চাল-ডাল কেনার টাকা লাগবে। জামা-কাপড় কেনার টাকা লাগবে—আমার সঙ্গে তো এখন টাকা নেই—

বউটা হঠাৎ বলে উঠলো—আমার কাছে টাকা আছে, আমি সঙ্গে টাকা নিয়ে এসেছি—

জিজ্ঞেস করলাম—কত টাকা?

বউটা বললে—অনেক টাকা, এই দেখ—

বলে আঁচলের আড়াল থেকে একটা ছোট কাপড়ের পুঁটলি, বার করলে—একটা পেট-মোটা পুঁটলি—

পুঁটলিটার মুখের গেরো খুলতেই নজরে পড়লো এক গাদা খুচরো পয়সা। আধুলি, সিকি, নয়া পয়সার ভর্তি। দেখতে দেখতে মনে পড়ে গেলো এই খুচরো পয়সাগুলোই তার স্বামী নিবারণ সরকার প্রতিদিন সাবান বিক্রি করে বাড়ীতে এসে বৌটার হাতে দিত। স্ত্রীকে বিশ্বাস করে পয়সাগুলো দিয়ে সে পরম নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোত। আর সেদিন সেই পয়সাগুলো নিয়েই সে চলে এসেছে আমার সঙ্গে পালিয়ে যাবে বলে।

আমার মনে হলো আমি যেন খুচরো পয়সার পাহাড় দেখছি না, বছরের পর বছর জমাট বাঁধা সহনশীলতার স্তূপ যেন আমার সামনে ভেঙে গুঁড়িয়ে টুকরো টুকরো হওয়ার

ঘটনা দেখছি। দেখছি দরিদ্র স্বামীর ঘর আর সেবার বিশ্বাসঘাতক পরিণতি। আরো দেখছি ঐকান্তিক নিষ্ঠার অসহায় অবচেতন ভগ্নাংশ। আমি বউটার মুখের দিকে আবার চেয়ে দেখলাম। সে-মুখে কোনও অনুশোচনা, কোনও অনুতাপ, কোনও নিষ্ঠুরতা, কোনও প্রতিশোধ-স্পৃহার সামান্য চিহ্নটুকুও নেই! কিন্তু তার বদলে আছে শুধু বাঁচবার আকুল তৃষ্ণা, সংসার করবার অদম্য লোভ, আর অতীতকে অস্বীকার করবার তীব্র সাহস!

আমি তখন প্রাণপণে আত্মরক্ষা করবার উপায় খুঁজছি। উদ্যত-থাবা বাঘের সামনে মানুষ যেমন করে আত্মরক্ষা করবার অসহায় চেষ্টা করে আমারও তখন সেই অবস্থা। কিন্তু পালিয়ে যাবার রাস্তা তখন আমার সামনে বন্ধ। বউটা তখন দরজা আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বললাম—কত টাকা আছে এই সব খুচরো মিলিয়ে?

বউটা বললে—তিনশো সতেরো টাকা ছেষট্টি নয়া পয়সা—বাড়িতে যা ছিল সব নিয়ে চলে এসেছি—

আবার হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু নিজেকে আমি অতি কষ্টে সামলে নিলাম।

বললাম—কিন্তু এখন তো আমার যাওয়া হবে না—আমার যে একটু অসুবিধে আছে—

—কেন?

বললাম—আমার যে জামা-কাপড় সব বাড়িতে রয়েছে, সেগুলো তো সঙ্গে নিতে হবে—

বউটা বললে—সে সব তো আমিও সঙ্গে নিইনি, সঙ্গে এই তিনশো সতেরো টাকা ছেষট্টি নয়া পয়সা রয়েছে, এই টাকা দিয়েই সে সব কিনে নিলে হবে—

বললাম—না, এ-টাকাতে হবে না, আরো টাকা চাই। আমি কাল বাড়ি থেকে আসবার সময় দু'হাজার টাকা সঙ্গে নিয়ে আসবো, তাহলে আর কিছু ভাবনা থাকবে না আমাদের, তুমি বরং কাল এই সময়ে তৈরী হয়ে এসো, কাল ঠিক আমি যাবো—

আমার কথা শুনে বউটার মুখটা কেমন শুকিয়ে গেল। আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞেস করলে—ঠিক তো?

বললাম—হ্যাঁ ঠিক—

তারপর আর দাঁড়াল না সেখানে। যেমনভাবে যে-রাস্তা দিয়ে এসেছিল আবার সেই রাস্তা দিয়েই হন্ হন্ করে নিচে চলে গেল। আমি দোতলা থেকে চেয়ে দেখলাম বউটা আবার ঘোমটা টেনে দিয়ে রাস্তার পার হয়ে আবার নিজের বাড়িতে গিয়ে ঢুকলো। তারপর নিজের ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ করে দিলে। আমি আর কিছুই দেখতে পেলাম না—

জিজ্ঞেস করলাম—তারপর?

বিলাস বিহারী বললে—তার পর থেকে তাই আমি আর ওবাড়িতে যাইনি। কাজকর্ম দেখবার জন্যে আমার অফিসের এক ওভারসিয়ার আছে। তাকেই রোজ পাঠিয়ে দিই সেখানে। সে-ই এখন আমার সব কাজকর্ম দেখছে।

—আর সেই বউটা? তার খবর কিছু জানো না?

বিলাস বললে—কী করে খবর জানবো বলো? কিন্তু সেই সাবানের ক্যানভাসার নিবারণ সরকারকে মাঝে মাঝে সুটকেস হাতে রাস্তায় দেখি। বেশ পান চিবতে চিবতে রাস্তায় যায়। মনে হয় বেশ আরামেই আছে। সেই সকালবেলা বোধহয় সুটকেস নিয়ে বেরোয়, তারপর বেলা দেড়টা দুটোর সময় নিশ্চয় বাড়ি ফেরে। বউটাও নিশ্চয়ই সেই আগেকার মত পাখার বাতাস করে, তারপর ঠিক আগেকার মতই সামনে বসে যত্ন করে খাওয়ায়। আবার বিকেল বেলা যখন স্বামী বেরিয়ে যায় তখন বউটা নিশ্চয়ই সেই আগেকার মতই উনুনে আগুন দিয়ে সংসারের কাজে ডুবে যায়। তারপর প্রতিদিনের মত গা ধুয়ে কাপড় কেচে স্বামীর জন্যে হাঁ করে একলা বসে থাকে। আর তারপর যখন রাত দশটার সময় স্বামী ভাল সেজে বাড়ি ফেরে তখন আবার যত্ন করে সামনে বসে তাকে খাওয়ায়। আর স্বামীর খাওয়া শেষ হলে সেই এঁটো থালাতেই সে তেমনি করে নিজের ভাত নিয়ে খেতে বসে নিশ্চয়ই।

পৃথিবীর কাক-পক্ষীতে কখনও সন্দেহ করে না যে এই

মানুষটাই একদিন এই ঘর সংসার ছেড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল।

সমাজেরও কেউই জানতে পারে না যে এই স্বামী-সেবা, এই সংসার যাত্রা সবকটাই তার অসহায় পরাধীনতার বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু না জানলেও তাতে কারো কিছু আসে যায় না। কারণ কারো সুখ-দুঃখ নিয়ে তো পৃথিবীর যাত্রা থামাবার দায় নেই। নিবারণ সরকারের বউ সুখে আছে কি কষ্টে আছে তা না জানলেও পৃথিবীর চলবে। পৃথিবীর যেমন এগিয়ে যাবার কথা তেমনি সামনের দিকেই এগিয়ে যাবে। একদিন যে কেলেঙ্কারি হতে হতে সে বেঁচে গিয়েছিল, সেই কেলেঙ্কারির ঘটনাটা মনে পড়লেও তখন হয়ত সে লজ্জায় আধমরা হয়ে যাবে। হয়ত এই-রকমই হয়। এই রকম হওয়াই হয়ত স্বাভাবিক। হয়ত এইটেই নিয়ম।

কিন্তু আমি তাই ও-পাড়াতে আর কখনও সরকারের যেতে পারবো না। গেলে আমাকে যদি কোনওদিন বউটা দেখতে পায় তাহলে আমি ভালো করেই জানি, আমি যতটা না লজ্জায় পড়বো তার চেয়ে বেশি লজ্জায় পড়বে সেই বউটাই। কারণ তার এক মুহূর্তের দুর্বলতার সাক্ষী যেমন একমাত্র আমিই তেমনি তার কেলেঙ্কারির একমাত্র উপলক্ষ্যও যে সেই আমিই।

অথচ নিবারণ সরকার তো জানে তার স্ত্রী সতী-স্বাধ্বী প্রতিপ্রাণা স্বামী-পরায়ণা সংসারে এই রকম কত নিবারণ সরকার সংসার ধর্ম করছে কে তার খবর পাচ্ছে!

CALCUTTA UNIVERSITY PUBLICATIONS.

1.	Acharya P. C. Roy Centenary Volume	15.00
2.	বাঙ্গালীর পূজা পার্বণ—শ্রীঅরেন্দ্রনাথ রায়	4.00
3.	বাঙ্গলা আখ্যায়িকা কাব্য—ডঃ প্রভাবতী দেবী	6 50
4.	Basis of World understanding By Prof. W. Stuart Nelson	3.00
5.	Bengali Folk Ballads from Mymensingh by Dr. Dusanzbavital	12.00
6.	ছান্দসিকি—শ্রীদিলীপকুমার রায়	7.50
7.	Chief of Currents of the contemporary Philosophy by Dr. D. M. Dutta	15.00
8.	Daniel-De-Foe by Dr. Srichandra Sen	5.00
9.	Dictionary of Foreign Words in Bengali By Sree Gobindlal Banerjee	8.00
10.	Political History of Ancient India : By Dr. Hem chandra Roy Choudhuri	50.00
	Poisons & Poisoning (Kshentamony Nagendralal Memorial Lecture) By Dr. K. N. Bagchi	7.50
12	Nirakta Pt IV. By Dr. Amareswar Thakur	20.00
13.	ভারতীয় বনৌষধি—প্রথম খণ্ড (সচিত্র) বয় সংস্করণ— ডঃ কালীপদ বিশ্বাস ও শ্রীএককড়ি ঘোষ, মুখ্য সম্পাদিকা ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়	30.00

For further details
Please enquire
Calcutta University Publication Department :
48, Hazra Road, Calcutta-19

দুর্বোধ

প্রেমেন্দ্র মিত্র

কলেজের ছুটিতে বিনোদের সঙ্গে তাদের বাড়িতে গিয়েছিলাম বেড়াতে। উত্তর বিহারের ছোট একটা শহর। বিনোদের বাবা সেখানকার রেলের ছোট খাট একজন অফিসার।

সেইখানে বিনোদের বেল কোয়ার্টারেই করবীকে প্রথম দেখি।

করবীরা বিনোদেরই প্রতিবেশী। তার বাবাও চাকরির সূত্রেই ওখানে আছেন। করেন ওই রেলেরই কাজ। তবে তার জন্যে তাঁকে হামেশাই 'টুরে'-এ থাকতে হয়। তিনি তাই সপরিবারে ওখানে থাকেন না। করবী তার মায়ের সঙ্গে তাদের কানপুরের বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করে। আমাদের মতই কলেজের ছুটিতে ক'দিনের জন্যে বাবার কাছে এসেছে।

সত্যি কথাটা বলতে হলে স্বীকার করতেই হয় যে করবী প্রথম পরিচয়েই মাথাটা প্রায় ঘুরিয়েই দিয়েছিল। সুদূর মফস্বলের একটা আধা শহরে গিয়ে এ রকম উজ্জ্বল, সব দিক দিয়ে অসামান্য মেয়ের দেখা পাব ভাবতেই পারি নি।

প্রথম পরিচয়ের দিনই একটা ব্যাপার লক্ষ্য করে বেশ অবাক হয়েছিলাম। আমি করবীকে দেখে যতটা মুগ্ধ, বিনোদ তার সম্বন্ধে ঠিক ততটাই যেন উদাসীন। উদাসীন কেন, বেশ একটু বিরূপই তাকে মনে হয়েছিল।

প্রথমে এ বিরূপতার মূলে একটু ঈর্ষা আছে বলে সন্দেহ হয়েছিল।

করবী প্রায় আমাদেরই বয়সী। তখন ইণ্টারমিডিয়েট লেকেও ইয়ারে পড়ে।

বিনোদ বা আমি কেউ একেবারে গোলা ছেলেদের দলে পড়ি না। কিন্তু করবীর কৃতিত্বের কথা যা শুনলাম তা একেবারে পয়লা নম্বরের: শুধু তাদের কলেজেরই নয় কানপুরের ইউনিভার্সিটির অসামান্য ছাত্রী হিসেবে করবীর নাম ওখানকার সবার মুখে মুখে।

এই কৃতিত্বের সঙ্গে বিনয়ের অভাবটাই হয়ত বিনোদের বিরূপতার একটা কারণ বলে মনে হয়েছিল।

মেয়েদের পক্ষে যা শোভন বলে চিরকাল ধরে নেওয়া হয় করবীর মধ্যে সেই বিনয় বা নম্রতার যে বেশ একটু অভাব তা আমিও লক্ষ্য করি নি এমন নয়. কিন্তু সাধারণ ছকের বাইরে তার এই বিশেষত্বটুকু সত্যি কথা বলতে গেলে খুব অপ্রীতিকর কোনো চমক দেয় নি।

করবীর নিজের গুণের কথা নিজের মুখেই জাহির করতে বাধত না। আর আমাদের সে সব শোনাত, বিনোদকেই যেন বিশেষ করে খোঁচা দেবার ভঙ্গিতে।

করবী প্রায় দুবেলাই বিনোদের বাড়ি আসত। বহুদিন প্রতিবেশী হওয়ার দরুন দুবাড়ির সম্বন্ধটা এমন ঘনিষ্ঠ যে আসা যাওয়ার ব্যাপারে কোন সঙ্কোচ আড়ষ্টতা তার থাকবার কথা নয়। ছেলেবেলা থেকেই সে এ বাড়িতে আসছে।

সেদিন করবী চলে যাওয়ার পর যে ব্যাপারটা ঘটেছিল তাতে সত্যিই তাই বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলাম। ব্যাপারটার শুধু ঈর্ষা দিয়ে যেন ব্যাখ্যা হয় না।

রাত্রে সেদিন বাড়িতে চিঠি লেখার জন্যে বিনোদের কলমটা চেয়েছিলাম।

কেন, তোরটা কি হ'ল? —কলমটা দিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল বিনোদ।

কি জানি!—একটু ভ্রূকুটি করে বলেছিলাম—কোথায় রেখেছি খুঁজে পাচ্ছি না এখন।

আমার জবাবটা শুনে বিনোদ অতটা উত্তেজিত হয়ে উঠবে ভাবতে পারি নি।

রীতিমত ব্যস্ত হয়ে বলেছিল,—খুঁজে পাচ্ছিস না

মানে? এই টেবিলেই ত রেখেছিলি। করবী সেখানে বলেছিল।

বিনোদের উত্তেজনাটা নিতান্ত অহেতুক মনে হয়েছিল। হেসে বলেছিলাম, করবী বলেছিল তো হয়েছে কি! সে তো আর কলম দিয়ে কিছু লেখেনি যে ভুলে নিয়ে যাবে!

ভুলে নিয়ে যাবার মেয়ে সে নয়। —দাঁত চাপা কঠিন স্বরে বলেছিল বিনোদ!

তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে আমার হাতে টান দিয়ে বলেছিল,—আয়।

আয় মানে?—রীতিমত অবাক হয়ে বলেছিলাম,—এই রাত্রে করবীদের বাড়ি যাবো কলমের খোঁজ করতে?

খোঁজ করতে নয়, কলমটা চাইতে। —বিনোদ সত্যি সত্যিই আমার শোয়েটারটা তখন আমার দিকে ছুড়ে দিয়ে নিজেরটা মাথায় গলাচ্ছে।

না।—এবার শক্ত হয়ে আমায় বলতে হয়েছিল,—তোমার এ পাগলামিতে সায় দিতে পারব না। করবী যদি সত্যিই কলমটা নিয়ে থাকে ত নিক। ওটা আর চাইতে যেতে পারব না।

যেন যেও না তাহলে।—অত্যন্ত ক্ষুব্ধ স্বরে কথাটা বলে বিনোদ যে রকম গোমড়া মুখে আবার বিছানায় শুয়ে পড়েছিল তাতে মনে হয়েছিল মস্ত বড় একটা শুভ কাজে আমি অন্যায়ভাবে বাধা দিয়েছি।

মুখে আর কিছু না বললেও বিনোদের এ অবুঝ মেজাজে মনে মনে একটু হেসেছিলাম।

করবী সম্বন্ধে এ রকম মনোভাবের মূলে ঈর্ষা ছাড়া আর কিছু আছে কিনা তাও একবার সন্দেহ হয়েছিল।

কিন্তু থাকলেও কি থাকা সম্ভব?

ভালোবাসার প্রত্যাখ্যানের জ্বালা?

কিন্তু ব্যাপারটা ত ঠিক বিপরীত। করবী ত বিনোদ সম্বন্ধে ব্যবহারে অত্যন্ত সহজ ও স্বাভাবিক।

সব হাসি-ঠাট্টার মধ্যে বিনোদের প্রতি তার একটা আকর্ষণই বরং আমার কাছে অস্পষ্ট থাকে নি। বিনোদের মনোভাবটা কোনো আঘাতের প্রতিক্রিয়া বলে ত তাই ভাবা যায় না।

আর তাও যদি হয় ত করবীর মত একটি মেয়েকে একেবারে চোর বলে অভিযুক্ত করা!

আমার কলমটা তারপর অবশ্য তন্নতন্ন ক'রে খুঁজেও বাড়িতে পাওয়া যায় নি।

তার সন্ধান আর পাওয়াও যেত না, যদি না—

যদি না, দিন দুয়েক বাদে করবী আবার নিজে থেকেই দেখা করতে আসত।

আগের দিন করবী তার মায়ের সঙ্গে এসেছিল। এদিন এসেছিল একেবারে একলা।

বিনোদের মা বাবা সেদিন শহরে কোন পেটের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রাখতে গিয়েছিলেন বাড়িতে শুধু আমরা দুই বন্ধুই ছিলাম বলেই একটু অস্বস্তি বোধ করলেও সেটা খানিক বাদেই অমূলক বলে বুঝেছিলাম। করবী বা বিনোদ কারুর কাছেই এ রকম আসা যাওয়াটা নতুন কিছু নয়।

অস্বস্তিটা কাটলেও এ বাড়িতে আসার পর থেকেই করবীর মুখের মিটিমিটি হাসিটা তখন বেশ অদ্ভুত লাগছে।

হাসির রহস্যটা সে অবশ্য বেশীক্ষণ গোপন রাখল না। দু চারটে কথার পরই বিনোদের দিকে কৌতুকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল,—তোমরা কত বড় লোক এবার বুঝতে পেরেছি।

কোনো উত্তর না দিয়ে বিনোদ যে ভাবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে করবীর দিকে তাকাল তাতে তার আহত বোধ করবারই কথা। করবী কিন্তু সে ভ্রূকুটি যেন লক্ষ্যই না করে হঠাৎ আবার বললে,—একটা পেন দাও ত দেখি। একটা লেখা টুকে নিয়ে যেতে হবে।

তার মানে, তুমি কলমটা সেদিন নিয়ে গিয়েছিলে! —বিনোদের গলা যেমন তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি তেমনি ক্রুদ্ধ।

করবীর তাতে একটু অন্তত বিচলিত হবার কথা। কিন্তু সে তা হল না। হাসির অস্বীকারের দোলাতে দুলিয়েও রাখলে না কথাটা। সরাসরি জোর গলায় বললে,—হ্যাঁ নিয়েছিলাম। কত তোমাদের খেয়াল দেখবার জন্যে নিয়েছি।

করবীর কৈফিয়তটার কোনো দামই যেন না দিয়ে বিনোদ কঠিন স্বরে বললে,—কলমটা দাও।

কলমটা দেব ? হেসে উঠল করবী—ও কলম বাজেয়াপ্ত অসাবধানতার শাস্তি দিলেবে।

কলমটা দাও।—করবীর সঙ্গে কথা কাটাকাটির বিন্দু-মাত্র চেষ্টা না করে বিনোদ আবার আরো কড়া গলায় বললে,—কলমটা দাও।

না, দেব না !—করবী যেন ছেলেমানুষী ঝগড়ার ভঙ্গিতে বললে,—কলমটা নেওয়ার কথা যে জানিয়েছি তাই তোমাদের ভাগ্যি মনে করো।

কলমটা দাও—তৃতীয়বার বললে বিনোদ।—ও কলম আমার নয়।

তা জানি।—হেসে উঠল করবী।—তোমার সব কলম আমি চিনি। ও কলম তোমার বন্ধুর। তবু দেব না। বন্ধুর কলমের খেসারত তুমি দেবে।

না। কলমটা বার করে দাও।

বিনোদের গলার স্বরে আর মুখের চেহারায় এবার আমার অস্বস্তি লাগল। তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলবার জন্যে বললাম—কি মিছিমিছি গোলমাল করছ—বিনোদ ! অত জুলুম জবরদস্তির দরকার কি আছে ? কলম যদি উনি নিয়েই থাকেন নিজেই দিয়ে দেবেন।

হুঁ, দিয়ে দেবেন।—আমার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপটা ছুঁড়ে দিয়ে করবী আবার বিনোদের দিকে ফিরে বললে —তোমার বন্ধু আমায় চিনেছে বটে !

বিনোদের তখনও সেই এক যান্ত্রিক কণ্ঠস্বরের দাবী—কলমটা দাও।

যদি না দিই, করবে কি ? কেড়ে নেবে ?—করবীর মুখে কৌতুকের সঙ্গে যে দৃপ্ত ভাঙ্গিমা ফুটে উঠল তা ভালো করে দেখবার সময় পেলাম না।

হ্যাঁ—বলে বিনোদ তখন আচমকা করবীর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারপর জোর করে তার কাছ থেকে মুঠোটাই কলমটা বার করে নিলে।

জেদা-জেদীর রক্তা-রক্তিতে দুজনের মুখই রাঙা হয়ে উঠেছে তখন।

করবী স্তিমিত হয়ে উঠল কি ? কথা ও গলার স্বরে সেই তীব্রতাই প্রকাশ পেল। নিজের বাহুটা পরীক্ষা করতে করতে বললে,—জানোয়ার কোথাকার ! খিমচে রক্ত বার করে দিয়েছে।

করবীর মুখে তখনও কিন্তু একটু হাসির আভাস।

বেশীক্ষণ তারপর কিন্তু করবী সেখানে থাকেনি। হঠাৎ কাউকে কিছু না বলেই এক সময়ে চলে গিয়েছিল।

বিনোদের ওপর একটু রাগই হয়েছিল। করবী চলে যাওয়ার পর বলেছিলাম,—তোমার কি বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে ? একটা ফাউন্টেন পেনের জন্যে কি করলে বলো ত ! মেয়ে বলেও একটা সম্মান নেই ?

থাকবে না কেন, ঠিকই আছে।—বিনোদ নির্বিকার ভাবে বলেছিল,—একটা মিথ্যুক চোর মেয়ের যা সম্মান তাই আছে।

বিনোদের বলার ভঙ্গিটা এত খারাপ লেগেছিল যে করবী কিসে মিথ্যুক, কেন চোর, তা জিজ্ঞাসা করবার আর প্রবৃত্তি হয় নি।

কানপুরে ফিরে যাবার আগে করবী আর বিনোদদের বাড়িতে আসে নি। তা না এলেও করবীর সঙ্গে একবার আমার দেখা কিন্তু হয়েছিল।

নেহাৎ অপ্রত্যাশিত দেখা। শুধু আমার নয় করবীর পক্ষেও নিশ্চয়।

স্টেশন থেকে রেলওয়ে কোয়ার্টার মহলে আসবার যাবার জন্যে রেলের লাইনের তলা দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ গোছের রাস্তা আছে।

সেদিন স্টেশনের বইয়ের ষ্টলটা একবার ঘুরে আসবার জন্যে সেই আণ্ডার ব্রীজ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠতে গিয়ে চমকে উঠলাম। প্ল্যাটফর্মের ওপর নিচের সিঁড়ির ঠিক মাথাতেই করবী দাঁড়িয়ে।

সিঁড়িটা মাঝখানে রেলিং দিয়ে দুভাগ করা। একটা দিক নামবার ও অন্যটা ওঠবার।

আমি যেটা দিয়ে উঠছিলাম তার পাশেরটা দিয়ে আমায় না দেখবার ভান করে করবী অনায়াসে নেমে যেতে পারত। আশাও করেছিলাম তাই।

কিন্তু করবী সিঁড়ির মাথায় আমার দিকে চেয়েই তখন দাঁড়িয়ে। শুধু দাঁড়িয়েই নেই, মুখে তার পরম স্বাভাবিক হাসি।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আমাকেও তাই দাঁড়াতে হল।

স্টলে যাচ্ছেন বুঝি?—করবী-ই প্রথম বাক্যালাপ,—আপনার বন্ধু ত দেখলাম বই কাগজ দেখতে তন্ময়।

হ্যাঁ, মানে—দ্বীতিমত অপ্রস্তুত বোধ করে বললাম, কলকাতা থেকে আজ ক'টা পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা আসবার কথা তাই দেখছে বোধহয়।

মনের ভেতর অনেকগুলো প্রশ্ন তখন জেগে উঠেছে। বিনোদের সঙ্গে করবীর কি দেখা হয়েছে? তার সঙ্গেও এমনি সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার কি করেছে করবী? তাই যদি করে থাকে ত বিনোদের বাড়িতে আর আসে না কেন? সেদিনের ঘটনাটা সম্বন্ধে আমার ভর্ৎসনা চাওয়ার কোনরকম দাবির কি আছে? ব্যাপারটা এড়িয়েই যাব একেবারে?

শেষ ক'টা প্রশ্নের মীমাংসা করবী-ই করে দিলে।

জিজ্ঞাসা করলে—আর কতদিন আছেন?

উত্তর দিলাম দুচারটে এমনি সাধারণ আলাপের বেশী আর কিছু কথা সেদিন হয়নি।

স্টেশনের বুকষ্টলে গিয়ে বিনোদকেও করবীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা কিছু বলিনি।

বিনোদকে কিছু জিজ্ঞাসা না করলেও তার ও করবীর সম্পর্কটা আমার মনে একটা বেয়াড়া প্রশ্নের কাঁটা হয়েই জেগে ছিল।

সে প্রশ্নের খানিকটা জবাব পরে কমলেশের কাছে পেয়েছিলাম। কমলেশ আমাদের দুজনেরই বন্ধু। বিনোদের ত একেবারে ছেলেবেলার। শুধু বন্ধু নয়, কমলেশ আবার মনোবিজ্ঞানী। মানুষের মনের রহস্য নিয়েই নাড়াচাড়া করে।

কমলেশ আমায় যা বুঝিয়েছিল তা অনেকটা এই যে, শরীরে ছোটবেলায় কাটার দাগের মত মনের ভেতরও এই রকম কয়েকটা স্থায়ী দাগ অনেকের থেকে যায়। করবী সম্বন্ধে বিনোদের ব্যবহারটা ছেলে বেলায় ওই রকম একটা তীব্র বিরাগের বিস্ফোরণ।

ছেলেবেলার রাগের মধ্যে যা প্রকাশ পেয়েছে আজও অনুরূপ কোনো কারণ ঘটলে স্থান কাল ও বয়সের কথা তা ভুলিয়ে দেয়। বিনোদের মনে থাকে না যে ওরা শৈশবের গণ্ডি পার হয়ে এসেছে।

ও ব্যাখ্যা শুনে একটু ভুরু কোঁচকাতে হয়েছিল।

বলেছিলাম,—তোমার কথাই না হয় মানলাম, যে একটা অদম্য অযৌক্তিক আক্রোশ এ ব্যবহারের মূলে আছে, কিন্তু যার জন্যে এখনকার এই সব বিস্ফোরণ সে অদম্য আক্রোশটা কি থেকে? করবী কিসে বিনোদের কাছে এত অসহ্য?

কিসে?—কমলেশ একটু থেমে আমার মুখের দিকে চেয়ে যেন অবাক হয়ে বলছিল,—কিসে তা তুমি জানো না যে করবী ছেলেবেলা থেকে যেমন মিথ্যেবাদী তেমনি চোর!

মিথ্যেবাদী! চোর!—স্তম্ভিত হয়ে বলেছিলাম—তুমিও তাই বলছ? কিন্তু পড়াশুনায় অমন অসাধারণ একটা মেয়ে মিথ্যুক আর চোর হতে পারে?

পড়াশোনায় ওর বাহাদুরীর গল্প গুলোই মিথ্যে!—কমলেশ একটু বিষণ্ণ স্বরে বলেছিল,—করবী কানপুরের ওর কলেজে অতি সাধারণ ছাত্রী। এবার পরীক্ষায় পাস করতেও পারে নি।

বিনোদ এসব তাহলে জানত?—সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করেছি।

হ্যাঁ,—বলেছিল কমলেশ।—কানপুরের এক বন্ধুর কাছে চিঠি লিখে জেনেছিল।

এ তো বড় জ্বালা নয়!—হেসে বলেছিলাম এবার,—দুচক্ষের যে বিষ, মিথ্যে বাহাদুরী করতে তারও খবর না রেখে উপায় নেই!

একটু থেমে আবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম—আচ্ছা মিথ্যে বাহাদুরী ও বুঝলাম কিন্তু চোর অপবাদ কেন? আমার কলম নেবার কথা করবী ত নিজে থেকেই জানিয়ে ছিল, ওটা ত আর সত্যি চুরি নয়।

ওটা না হতে পারে?—বলেছিল কমলেশ—কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই চুরি করা ওর স্বভাব, বিনোদ সেই ওর ছোটবেলা থেকে ওর ওপর খাপ্পা। পড়শী হওয়ার সুবিধে নিয়ে ছেলেবেলা থেকে বিনোদকে একেবারে জালিয়ে পুড়িয়ে মেরেছে।

• •

কলেজ জীবন শেষ হয়েছে। তারপর ক্রমশ জীবনের ধারায় সবাই পরস্পরের কাছ থেকে দূরে দূরে সরে গিয়েছি। বিনোদের সঙ্গে বহু কাল আর যোগাযোগ নেই। করবীর কথা তো কিছুই জানি না।

একমাত্র কমলেশই মাঝে মাঝে চিঠিপত্র লিখে অতীত স্মৃতিটা একটু আধটু উসকে দেয়। সম্প্রতি তার একটা চিঠি পেয়েছি।

এবার কমলেশের চিঠিটা উসকে দেওয়ার চেয়ে বেশী কিছু করেছে। একটা দুরন্ত প্রশ্ন তুলে ধরেছে আমার সামনে।

কমলেশ যা লিখেছে তার সার কথাটা হ'ল এই—তোমার কাছে খবরটা বোধহয় পৌঁছোয় নি যে, চিরকুমার সভার একমাত্র অবৈতনিক সভ্য যাকে ভাবভাম সেই বিনোদ বিহারী এতদিন বাদে বিয়ে করেছে। আর বিয়ে করেছে কাকে জানো? সেই করবীকে!

এ ব্যাপারটার সত্যিই কোন মানে খুঁজে পাচ্ছি না। যেখানে ঘৃণা বিরাগ সেখানে তপ্ত অনুরাগ এই সূত্র দিয়ে এ ব্যাপারটা ব্যাখ্যা হয় কি? করবী যে চোর আর মিথ্যুক আর সেই জন্যেই যে বিনোদের ছেলেবেলা থেকে তার ওপর তীব্র ঘৃণা আর বিদ্বেষ, এই সত্যটা এ বিয়ের সঙ্গে কেমন করে মেলাই?···

চিঠিটা পড়বার পর থেকে ভাবছি!

সত্যিই কি ঘটে না?

কেবলই মনে হচ্ছে যে কমলেশের পুঁথিগত বিদ্যার চেয়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় বিনোদ মনোবিজ্ঞানের আরও গভীর কোনো সত্যে যেন শেষ পর্যন্ত পৌঁচেছে।

সে সত্য কি এই যে, ছেলেবেলা থেকে করবীর মিথ্যে আস্ফালন আর চুরি নিয়ে সব কিছু স্বভাব-উদাসীন বিনোদের মনোযোগ আকর্ষণ করবার একটা করুণ কৌশল মাত্র?

For Quality and Distinction

KALI PROCESS

DESIGNERS BLOCK MAKERS
AND COLOUR PRINTERS

2, NETAI BABU LANE, CALCUTTA-12

Phone :

জীবন মরণের সীমানায়

—ভবানী মুখোপাধ্যায়

। এক ।

আমি যে কথা বলতে চাই সে কথা আপনারা হয়ত বিশ্বাস করবেন না, আমি বিশ্বাস করতে বলিনা কাউকে, কারণ আপনারা যে বিশ্বাস করবেন সে ভরসা আমার নেই। কেউ আমাকে বিশ্বাস করে না। অবশ্য মুখের ওপর কেউ আমাকে মিথ্যাবাদী বলেনি—সব শুনে টুনে কেমন একটা করুণ দৃষ্টিতে তারা আমার মুখের পানে তাকিয়ে থাকে কিংবা কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন আমার কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

অবশ্য কাহিনীতে যখন প্রধান ভূমিকা আমার তখন যা আসল কথা তা শুধু আমারই জানার কথা। প্রকৃত তথ্য আমার করায়ত্ত। তাই ভাবছি সবটুকুই আপনাদের কাছে বলে দেওয়াই ভালো—বিশ্বাস যদি নাহয় আমাকে অপরাধী করবেন না, আমি আগে আসেই আপনাদের হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি।

গোড়া থেকেই সব কথা শুনুন। আমার বয়স এখন ছাব্বিশ। চেহারায় নিখুঁত বা এ্যাকটর না হলেও মোটামুটি সুশ্রী। নবীন যৌবনের পরিপূর্ণ আবেগে প্রাণ টাকুলো-তরপুর। ইনজিনিয়ারিং পাশ করে এ্যালায়েড মেটালসে একটা এক্সিকিউটিভ্ পোস্ট পেয়ে গেছি। সুট বুট ইত্যা-দিতে শোভিত হয়ে রাস্তায় একজন কেউকেটা। আমার চুলপি এবং চুল অনেকের ঈর্ষার বস্তু।

ঘটনার দিনটি ছিল দুর্যোগ ভরা আবহাওয়ার পূর্ণ। কোথায় নাকি বাতাসের নিম্ন চাপের ফলে মাঝে মাঝে ঝড়ো হাওয়া বইছিল। বৃষ্টি পড়ছে সারা দিন। নিজেই ড্রাইভ করে যাচ্ছিলাম সেকসরীয়ার সরণি। আমাদের সিনিয়র পার্টনার মিঃ মনসুখলাল জাভেরী বোম্বাই থেকে এসেছেন, তাঁর সম্মানে একটা পার্টির ব্যবস্থা ছিল। বৃষ্টির জন্যই হয়ত পীচ ঢালা-পথ অতি মসৃণ, এবং জনবিরল পথ। ডায়মণ্ড-হারবার রোড এমন নিরালা থাকেনা।

সেদিনকার সেই রাতটা আজো আমার স্মরণে স্পষ্ট হয়ে আছে। প্রায় তিন সপ্তাহ কেটে গেল তবু রাতের স্মৃতি আমাকে পীড়া দেয়।

তখন ক্লান্ত আকাশে মেঘ সরে যাচ্ছিল। আকাশে একাদশীর চাঁদ মাঝে মাঝে প্রকাশিত হচ্ছে—আমার কার-টির উইন্ড স্ক্রীনের ভিতর দিয়ে মেঠো হাওয়া গায়ে এসে লাগছে। মাঝে মাঝে ঘমঘা হাওয়া কানে এসে লাগছে। গাড়ীর চালার নিম্নেশে রাজপথ যেন চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।

বিষ্ণুপুর থানা পার হওয়ার পর মনে হল একটি নারীমূর্তি-সেই আলো-অন্ধকারে কি যেন ইঙ্গিত করছে। এই নির্জন পথ। এই দুর্যোগভরা রাত। এই সময় ঠিক এই ধরণের একটি রমণীর হাতছানির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। গাড়ীটা থামতেই মেয়েটি আমার কাছে ছোটে এল।

প্রায় হাঁপাতে হাঁপাতে সে বলল—দেখুন, আমি বড় বিপদে পড়েছি। যদি একটু লিফ্‌ট দেনত বড় উপকার হয়। মোমিনপুরের মোড়ে নেমে যাবো। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, একটাও বাস আসছেনা—অথচ আমার ভাই টির একটা এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে গোপালনগরের মোড়ে এই খবর পেয়েই এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছি—

মেয়েটি বেশ নার্ভাস হয়ে গেছে। বোধ হয় ভাইটির জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। পল্লীগ্রামের এই নির্জন প্রান্তর নিশ্চয়ই এই মেয়েটির পক্ষে উপযুক্ত নয়। বিশেষতঃ মেয়েটির বয়স কম এবং রূপও আছে। সুতরাং আমি মানবিক সহানুভূতি বশত তাকে গাড়ীর দরজাটা খুলে দিলাম গাড়ী আমার ছুটল।

মেয়েটি যখন কথা বলছিল তখন ক্ষণিকের জন্য তার মুখটা আমার নজরে পড়েছিল। কেমন যেন চেনা চেনা মুখ। কোথায় যেন দেখেছি। মাথায় সামান্য ঘোমটা ছিল। বৃষ্টির জন্যও হতে পারে—সিঁদুর-টিদুর আছে কিনা দেখতে পেলাম না, তা ছাড়া একটু ভালো করে দেখতে লজ্জা হল।

ষ্টিয়ারিং হুইল ধরে আছি বটে কিন্তু মন পড়ে আছে মেয়েটির দিকে। কান পেতে আছি তার কথায়। চেষ্টা করছি মনের গহনে তাকে সন্ধান করে স্মরণ করতে। বহু বিষয়ে অনেক রকম কথাই হল। মেয়েটির নাম মায়া সরকার। সবে পাট টু পাশ করেছে। বিয়ে হয়নি তবে সামনের অঘ্রাণে হতে হবে, সব ঠিক ঠাক।

কথা বলার সময় মেয়েটি কিন্তু বার বার পিছে তাকাচ্ছিল—যেন কেউ পিছন থেকে তাড়া করে আসছে—কেমন একটা ভয় ভয় ভাব, অন্তত আমার ত তাই মনে হয়েছিল। একটু কেমন কেমন মনে যে হয়নি তা নয়, তবে ওসব নিয়ে বেশী মাথা ঘামাইনি।

একেই আমার দেরী হয়ে গিছল—তার ওপর মেয়েটির জন্য অনেকটা সময় নষ্ট হয়েছে তাই গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দিলাম। ঠাকুর পুকুরের কাছাকাছি আসতেই যে বাঁক পড়ে সেই জায়গাটায় স্পীড কমল, ব্রেকটা চেপে ষ্টিয়ারিং ঘোরালেম কিন্তু সামান্য একটু গিয়েই মারল ল্যাম্প পোষ্টে ধাক্কা, গাড়িটা উলটে একেবারে পাশের খানায় গিয়ে পড়ল।

কি যে হল, কি হয়েছে তা বোঝবার মত অবস্থা রইল না। আমরা দুজনেই বোধহয় চেতনা হারিয়েছিলুম।

এই অবস্থাতেই সেই অদ্ভুত স্বপ্নটা দেখেছিলাম। যেন একটা অচেনা নতুন শহরে এসেছি—পথ হারিয়ে গেছে। ঠিক-ঠিকানা খুঁজে পাই না। এদিকে বেয়াল আছে যে কোনও একটা বাড়িতে তাড়াতাড়ি ঢুকতেই হবে নইলে ভীষণ বিপদ। দৌড়াচ্ছি, প্রাণপণে দৌড়াচ্ছি। একটা নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য-আমাকে সে কি প্রচণ্ড চেষ্টা। কিন্তু আশ্রয়ের আশা নেই। এমন সময় আমার সামনে সেই কালো ছায়া। বিশ্রী কালো ছায়া পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে। জিনিসটা যে কি কে জানে। আমি আতংকে বিহ্বল হয়ে তাড়াতাড়ি বাড়িটায় ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম।

। দুই ।

এতক্ষণে আমার চৈতন্য হল।

জ্ঞান হওয়ার পর দেখি পথের ধারে খড় বোঝাই একটা গরুর গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লেগে আমার গাড়ীটা উলটে পড়ে আছে—খড়ের গাড়িটাও টাল সামলাতে পারেনি—সেও কাৎ হয়ে পড়েছে আর তারই পাশে মায়া সরকারের অচৈতন্য-দেহটা পড়ে আছে—কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যতদূর মনে আছে মেয়েটির পরণে ছিল একটা রঙকী শাড়ি, বয়েতী পাড়। পায়ে একটা মাঝারি চপ্পল। এই দেহটার পরণে কিন্তু ট্রাউজার—পায়ে একটা ডিপ্লোম্যাট বুট। হয়ত গাড়িটা ওলটাবার সময় অন্য কেউ চাপা পড়েছে—কিন্তু মায়া সরকার? কোথায় তিনি? এই ভদ্র লোকটি বা কোথা থেকে এলেন।

তাঁধাচাকা খেয়ে গেলাম। চারদিকে তাকাই—। এমন সময় সেই ভয়ঙ্কর ব্যাপারটি আবিষ্কার করে চমকে উঠলাম। মায়া সরকারের সেই শাড়িটা আমার অতি নিকটেই আছে, আমারই সঙ্গে জড়ানো—আমি কি তাহলে এখনও স্বপ্ন দেখছি—এখনও আমার জ্ঞান হয়নি। কি বিশ্রী কাণ্ড, আমি আবার স্যুট ছেড়ে শাড়ি পরলাম কখন। ভালো পাগলামি কাণ্ড!!

কিন্তু কি নিদারুণ পরিহাস! শুধু শাড়ি নয়—আমার সমস্ত দেহটাই মায়া সরকারে পরিণত। সব অঙ্গ মায়া সরকার। তার মানে!

আমি ভীষণ চিন্তায় পড়ি। সমস্ত কিছু ভাববার চেষ্টা করি। আমি যদি মায়া সরকারে রূপান্তরিত হয়ে থাকি, তার অর্থ আমি তার খালি শরীরটা আবিষ্কার করেছি।

অর্থাৎ যে খালি বাড়িতে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছি সেটা মায়া সরকারের দেহ।

তাহলে আমি অমলেন্দু দত্তরায় যদি মায়া সরকারের খালি দেহটা আবিষ্কার করে থাকি তাহলে অমলেন্দু দত্ত রায়ের তাঁকা দেহটায় কি মায়া সরকার প্রবেশ করেছে নাকি! একটু অগ্রসর হয়ে গাড়িটা দরাবার চেষ্টা করি—গাড়ি পরে কি কাজ করা যায়, তারী অসুবিধা বিশেষতঃ যদি অভ্যাস না থাকে। অতি কষ্টে গাড়ির তলা থেকে দেহটা টেনে বার করি।

যে কোন সময় মুণ্ডহীন দেহ কিংবা ছিন্ন ভিন্ন দেহ, বা রক্ত মাখা হাত-পা দেখলে কি বিশ্রী আতংক মনে জাগে। কিন্তু নিজের বিকৃত দেহ সেদিন দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখে আমার মনে যে কি প্রতিক্রিয়া জেগেছিল তা অনির্বচনীয়। নীরবে কিছুক্ষণ সেই দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর মনকে শক্ত করলাম। মায়া সরকারকে বাঁচাতে হবে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। অমলেন্দু দত্ত রায়ের দেহে প্রবেশ করে সে ইতিমধ্যেই মারা গেছে।

একটি স্যুটকেসের ওপর বসে পড়ে সমগ্র ব্যাপারটি চিন্তা করার চেষ্টা করি। অচেতন অবস্থায় দেখা সেই বিশ্রী স্বপ্নটার কথা ভাবি। তাহলে কি যে বাড়িটায় ঢুকতে চাইছিলাম সেটা কি আমারই দেহ। আর সেইকালো-ছায়া? যা পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। সেই বোধ হয় মৃত্যু। তার ভয়েই আমি তাড়াতাড়ি মায়া সরকারের খালি দেহে ঢুকে পড়েছি—দরজা খুলে ছিল। অর্থাৎ মায়া সরকারের আত্মপাখী অনেক আগেই দেহ পিঞ্জর ছেড়ে উড়ে গিয়েছিল।

কাণ্ডটা তাহলে এই। কিন্তু ব্যাপারটি সহজ নয়। পড়েছি বটে আত্মহারা সব সময় চেষ্টা করে একটা খালি দেহকে আশ্রয় করতে। আমিওকাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছি, সেই সঙ্গে আমার আত্মাটাও অত শত না বুঝেই প্রবেশ করেছে মায়া সরকারের মৃত দেহে।

মানিক গ্রন্থাবলী

দশম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম থেকে দশ খণ্ড-গুলি পাওয়া যাচ্ছে। প্রতিখণ্ড ১৫টাকা করে। গ্রাহকরা তাদের খণ্ডটি সংগ্রহ করবেন।

বনফুল রচনাবলী

তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে দ্বিতীয় খণ্ডও পাওয়া যাচ্ছে। প্রতি খণ্ড গ্রাহকরা তাদের খণ্ডটি সংগ্রহ করবেন

বিঃ দ্রঃ—কাগজ ও ছাপার মূল্য বৃদ্ধির জন্য গ্রন্থাবলীর পরবর্তী সংস্করণের মূল্যবৃদ্ধি করা হয়তো রোধ করা যাবেনা। এখনও যারা গ্রাহক হতে ইচ্ছুক তারা প্রত্যেকটির জন্য ১০ টাকা জমা দিয়ে আগামী ১লা অগ্রহায়ণের মধ্যে গ্রাহক তালিকাভুক্ত হলে বর্তমান ও ভবিষ্যত খণ্ডগুলি এখনকার মূল্যেই পাবেন। বাইরের ক্রেতারা মনি অর্ডার করে টাকা পাঠাবেন এবং কি ভাবে বই সংগ্রহ করবেন জানাবেন।

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

জনপদ বন্ধু

একটি কালজয়ী উপন্যাস। ৪·০০।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের

পদ সঞ্চার

ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস ৪৮·০০।

গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড

১১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট কলিকাতা—১২

এখন প্রশ্ন এই, কিভাবে কি করা যায়! কিন্তু বুঝতে পারছি আর পালাবার পথ নেই। রূপান্তরের কোনো আর উপায় নেই। আমার পাশের দেহটা মৃত, আত্মাটা অবিবেকের মত মায়া সরকারের দেহে প্রবেশ করেছে। এখন আর কোন কিছুই করার নেই। নতুন খাঁচায়, পুরাতন আত্মা এখন বন্দী।

। ছয় ।

আকাশ পাতাল ভাবি। কত অদ্ভুত, অবান্তর চেষ্টা। এখন থেকে আমার চলা-ফেরা করতে হবে, নকুল করে সব শিখতে হবে। এখন আমি নারী। শাড়ি, ব্লাউজ পরতে হবে। মেয়েলি লক্ষ রাখতে হবে। কোথায় এই মায়া সরকারের বাড়ি কে জানে—মিস সরকারের সুটকেসটা দেখতে হবে। ভ্যানিটী ব্যাগটা দেখলেও কিছু ক্লিনিস মিলতে পারে।

সুটকেসে মাত্র তিনখানি শাড়ি, কয়েকটি ব্লাউজ ছাড়া আর কিছু নেই, হ্যাণ্ড ব্যাগে কিন্তু আশীটাকা আর কিছু খুচরা পয়সা—ব্যস ঐ পর্যন্ত।

কিন্তু এই-ই সব নয়, ভিতরকার পকেটব্যাগে সংবাদ-পত্রের কিছু কাটা অংশ সযত্নে রক্ষিত। চটটা হাতের কাছে ছিল, জেলে দেখি এক রোমাঞ্চকর হত্যাকাণ্ডের রিপোর্ট। মাত্র পঞ্চাশী টাকার লোভে মাত্র বয়সী পিসিকে এক ভাইঝি খুন করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তাকে ধরা যাচ্ছে না।

মায়া সরকার এই সব কাটিং এত যত্ন করে রেখেছিল কেন? এতক্ষণে মনে পড়ল কোথায় তাকে দেখেছি—এই কাটিং গুলির সঙ্গে পুলিশের নোটিশটাও ভাঁজ করা আছে, তার সঙ্গে একটি ফটো মুদ্রিত। মায়া সরকারের আসল নাম—মালতী সরকার, সে পিসি পদ্মাসনাকে হত্যার ব্যাপারে জড়িত।

হঠাৎ পিছনে কার পায়ের আওয়াজ সেই সঙ্গে প্রশ্ন—এই যে, কেমন আছেন এখন মিস সরকার'

—তার মানে, একটু পরেই সব জানবেন। ফাঁসীর লোভ সামলাতে পারলে না—না অন্য কিছু—

—দেখুন আমি এসব কিছুই বুঝছি না, কে আপনি? কি চাই আপনার? অনেকক্ষণ ধরে 'ধলো' করছি, আমার নাম বনমালী চক্রবর্তী, চোরে ধরা আমার পেশা। যাক, বেশী কথায় কাজ নেই। চুপটি করে লক্ষী মেয়ের মত ভ্যান-এ এসে উঠুন। আপনার বন্ধুটিকেও দেখেছি শেষ করেছেন। আহা বেচারী—

বুঝলাম পুলিশের লোক। হয়ত এ্যাকসিডেন্টের সংবাদ পেয়ে ছুটে এসেছে। কিন্তু এসব কি বলছে—কে কাকে খুন করেছে প্রশ্ন করি—খুন এ্যাকসিডেন্ট, কিসের তদন্ত করছেন? নাকের বদলে নরুণ নয়, আগে খুন পরে এ্যাকসিডেন্ট। এখন দয়া করে উঠে আসুন। বেশী কামেলা করবেন না। বুকলাম আমার বর্তমান আকৃতিটাই ওঁকে বিভ্রান্ত করেছে। আমাকে উনি খুনী আসামী মালতী সরকার মনে করেছেন। আমার গাড়িতে যে উঠেছিল সেই মেয়েটিই মালতী সরকার অর্থাৎ বর্তমানে যার দেহে আমি আশ্রয় নিয়েছি।

ভীষণ মুস্কীল ব্যাপার। কি করে বোঝাই ওঁদের। কিন্তু আমি মালতী নই—

ভাবলাম থানায় গিয়ে সব বুঝিয়ে বলব।

আমার অদৃষ্ট কিন্তু সত্যই মন্দ।

থানায় ওরা সবাই আমার কথায় হাসছে। অবিশ্বাসের হাসি। তাচ্ছিল্যের হাসি।

আদালতে কেউই আমার কথায় কান দেয়নি। জেল-খানায় ওয়ার্ডার জমাদারারাও হেসে চলে যায়।

হয়ত কাল সকালে যে ফাঁসির দড়িটা আমার গলায় পরিয়ে দেবে সেও বিশ্বাস করবেনা—

আমি কিন্তু মিথ্যা বলিনি। জীবন মরণের সীমানায় পৌঁছে অকারণে মিথ্যা বলব কেন? পাঠক, আপনি নিরপেক্ষ। আপনি আমার কথা বিশ্বাস করবেন কি—কি করে বোঝাব আমি স্ত্রীলোক নই, এক নিদারুণ সংকটে পথ ভুল করে অন্য দেহে আমার আত্মা প্রবেশ করেছে—

বিনা বিচারেই আমার ফাঁসী হয়ে যাবে!

হিন্দু মুসলমান

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাড়ীর পাশে মুসলমান পাড়া। দোষের মোড়ায় মুরগী চরে। এক একদিন দেখা যায়—সদর দরজা খোলা পেয়ে মুরগীগুলো ঘরে এসে ঢুকেছে।

বৌ বলে, ছি ছি ছি মা গো মা! জাত জন্ম আর রইলো না দেখছি।

এই বলে রাগের মাথায় খাংরা ছুঁড়ে মুরগীগুলোকে সে মারতে যায় কিন্তু শাশুড়ী নিষেধ করেন, শ্বশুর হেসে বলেন, তুমি তো জানো না বৌমা, শোনো কাছে এসো!

বৌ কাছে এসে দাঁড়ালে শ্বশুর হেসে হেসে তাকে বুঝিয়ে বলেন, 'তোমার বাবা খুব গোঁড়া বামুন তা আমি জানি। আমরাও কম গোঁড়া নই! কিন্তু মুসলমানদের মুরগী বাড়ীতে এলে জাত জন্ম সবই যায় এ-কথা তোমায় কে শেখালে!'

মাথা হেঁট করে বৌ দাঁড়িয়ে রইলো।

কে শিখিয়েছে তা সে জানে না। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছে এই কথা। এ তার আজন্মের সংস্কার।

শ্বশুর বলতে লাগলেন, 'ওরাও ভদ্রলোক মা, ওরাও ঠিক আমাদেরই মত মানুষ। একসঙ্গে পাশাপাশি কোনদিন বাস ত' করনি মা, করলে বুঝতে। আমরা আজ চার-পাঁচ পুরুষ ধরে পাশাপাশি বাস করছি।'

সে কথা সত্য। নূর মহম্মদ ও অবিনাশ গাঙ্গুলীর বাড়ী দু'খানি একেবারে গায়ে গায়ে লাগানো, এর ঘরের খড়ের চাল ওর ঘরে গিয়ে ঠেকে।

অবিনাশ বললেন, 'নূরুকে যদি দেখতে মা, তাহলে বুঝতে মানুষ কত সুন্দর হ'তে পারে। নূরু আমাকে দাদা ব'লে ডাকতো, আর তোমার শাশুড়িকে বলতো বৌ-ঠাকরুণ। আবার ওর ছেলে—গফুরটাও হয়েছে ঠিক তেমনি। আমাকে বলে জ্যেঠামশাই, ঠিক ওর বাপের মতই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে। না মা সত্যি বলছি, ওদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ কোনদিন যেন না হয় মা, গফুর আমার ছেলের চেয়েও বেশী।'

বৌ কি বুঝলে জানি না। 'বেশ' ব'লে ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

কিন্তু উপদেশ দিয়ে মানুষকে আর কতদিন বুঝিয়ে রাখা যায়?

দিনকতক বৌ চুপ করে থাকে, মুরগী যদি রান্নাঘরের ওপরে গিয়ে ওঠে ত' বৌ কথা ব'লে না, রাত্রে স্বামীর সঙ্গে দেখা হলে সে এই বলে অভিযোগ আনায়—পৈতাগুলো তোমাদের ছিঁড়ে ফেলাই উচিৎ।

স্বামীর বয়স কম। কাজকর্ম কিছুই নাই, অনেক রাত্রি পর্যন্ত গ্রামের যাত্রার দলের আখড়ায় গান-বাজনা ক'রে বাড়ী ফিরে দেখে, স্ত্রী তখনও নিজে না খেয়ে তার অপেক্ষায় চুপ করে বসে আছে।

রাজেন সেদিন রাত্রে বাড়ী ফিরে শোনে, স্ত্রী বলছে, 'খেয়ে নাও, তারপর বলব, একটি কাজ তোমাকে করতে হবে।'

'কি কাজ?'

'খেয়ে নাও আগে, তারপর বলব চুপি-চুপি।'

খাওয়া-দাওয়ার পরে মায়া বলে, 'শোনো, কিন্তু রাগ করো না বাপু, তাহলে ভাল কাজ হবে না ব'লে দিচ্ছি।'

এই ব'লে ভনিতা ক'রে যা সে বললে তার সারমর্ম এই যে, সন্ধ্যাবেলায় রান্নাঘরটা খুলে রেখে সে পুকুরের ঘাটে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে দরজা খোলা পেয়ে তিন চারটা মুরগী একেবারে তাদের রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকেছে। তাদের তাড়াতে গিয়ে হাতের কাছে কিছু না পেয়ে শেষে শিলের নোড়াটা তাদের দিকে ছুঁড়ে মারে। কিন্তু অত ভারী শিলের নোড়াটা একটা মুরগীর গায়ে

লাগবামাত্র সেটা ম'রে যায়, আর বাকিগুলো উড়ে পালায়। কাউকে কিছু না বলে সেই মরা মুরগীটাকে একটা চুপড়ি চাকা দিয়ে সে লুকিয়ে রেখেছে। সেইটাকেই চুপি চুপি ঘুরে কোথাও ফেলে দিয়ে আসতে হবে। এই কাজ।

ব্যাপারটা এমন গুরুতর কিছু নয়। তবু 'রাগ করো না' বলা সত্ত্বেও রাজেন রাগ করলে। বললে, 'ছি ছি, তারী অন্যায় করেছ তুমি। গফুরদের মুরগী নিশ্চয়ই। বুঝতে পারলে কি ভাববে বলতো?'

মায়া বললে, 'বেশ করেছি। কেন, আসে কেন? তাই ব'লে মোছলমানদের মুরগী আমাদের হেঁসেলে ঢুকবে নাকি?'

'অমন কত ঢোকে! ধীরে ধীরে তাড়িয়ে দিলেই হ'তো।'

মায়া বললে, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তাড়িয়ে-দিতেই গিয়ে-ছিলাম, দৈবাৎ গায়ে লেগে গেল তা আমি কি করব? বাবারে বাবা! তোমরাও আর-জন্মে মোসলমান ছিলে, আর এ জন্মেই বা কি! গরু খাও না, এই যা তফাৎ! এক-এক সময় এখান থেকে আমার পালাতে ইচ্ছে করে।'

রাজেন বললে, 'তাই পালাও। আমাদের হাড়টা তাহলে জুড়োয়। ছিঃ! সব কাজেই একটুখানি জ্ঞান গোচর করতে হয়। ও-সব তোমার ভাল লাগেনা বলেই কি একেবারে মেরে ফেলতে হবে? ছি!'

এমনি ক'রে দু'কথা চার কথা হ'তে হ'তে একেবারে তুমুল ঝগড়া। মুরগীটা রাজেন ফেলে দিয়ে এল কিন্তু ঝগড়া চললো অনেকক্ষণ ধরে। শেষে তার ফল হ'লো এই যে, আলো নিবিয়ে রাগ ক'রে দু'জনেই দু'জনের দিকে পেছন ফিরে শুয়ে রইলো। কেউ কারও সাথে আর কথা বললো না।

গফুরের বোন ফতেমা আজ কদিন হ'ল শ্বশুরবাড়ী হ'তে এখানে এসেছে। মেয়েটা অসাধারণ সুন্দরী এবং সুন্দরী বলেই কিনা জানি না, গ্রামের মধ্যে তার একটি ভারী বদনাম আছে। এমন কি, শ্বশুরবাড়ী হ'তে যতোবার সে এ গ্রামে এসেছে ততবারই দুটু লোকে একটা না একটা গুজব রটিয়েছে। মেয়েটা আসতে না আসতে এবার গুজব রটিয়েছে যে, স্বামী তাকে বেদম প্রহার করে বাড়ী হতে তাড়িয়ে দিয়েছে, এবার বোধহয় সে ফতেমাকে তালাক দিয়ে আবার আর একটা বিয়ে করবে।

সে যাই হোক, সে সব কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই।

পরদিন সকালে একগাদা বাসি এঁটো বাসন নিয়ে পুকুরের ঘাটে মায়া সেগুলো মাজতে বসেছে, এমন সময় খান-দুই বাসন হাতে নিয়ে ফতেমাও তাদের খিড়কির দরজা খুলে ঘাটে এসে দাঁড়াল।

কাল রাত্রে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে অবধি মায়ার মনের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না, তার উপর একই ঘাটে এঁটো বাসন নিয়ে ফতেমাকে আসতে দেখে সর্বাঙ্গ তার জ্বলে উঠল; নাক সিঁটকে 'ছাক থু' ব'লে খানিকটা থুতু ফেলে সে বললে, 'ওলো খাম্, তুই ওইখানে দাঁড়া, আমি উঠে যাই তারপর তুই যা খুসি তাই করিস্।'

'থামবার অবসর নেই বৌ আমার অনেক কাজ।' বলে ফতেমা ঘাট হ'তে একটু খানি ঘুরে জলে গিয়ে নামল।

বাসন ফেলে মায়া তাড়াতাড়ি জল থেকে উঠে বললে, 'বারণ করলাম্, তবু নাম্লি ফতেমা?'

ফতেমা তার মুখের পানে তাকিয়ে বললো, 'আমি ত' ঘাটে নামিনি বৌ, বে-ঘাটায় নেমেছি।'

মায়া বললে, 'জলে ত' নাম্লি? আমাকে চান তো করতে হবে। বল্লে কথা শুনিস্ না' আস্কারা পেয়ে পেয়ে তোদের ত' ভারী বাড় হয়েছে দেখ্ছি।'

হেসে ফতেমা তাকে রহস্য করে কি যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মায়ার মুখের ভঙ্গী এবং শেষের কথাটা শুনে ফতেমার মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল। বলল, ভাখো বৌ, 'মুখ সামলে কথা বলো। আমরা নেহাৎ বাউরী-বাগ্দী নই।'

মায়া রুখে দাঁড়াল। বললে, 'কি বল্লি? মুখ

সামলে কথা বলবি ? তোরা বাঙ্গীর মত নোস্ ?—বাউরী-বাঙ্গী-ভ।' পথে আছে না তোরা যে মোছলমান, তোরা যে মেলেচ্ছ তোরা গরু খাস্, তোরা ছোটলোক, তোদের ছায়া মাড়ালে চান করতে হয়।'

ফতেমা বললে বেশ করব, বাসন মাজব, জলে নামব, আমাদের যা খুশি তাই করবো, পুকুরে আমাদেরও অংশ আছে। এতদিন নিজের মান নিজে রেখেছিলে, তাই আমরাও তোমাদের মান রেখেছিলাম, এবার থেকে—'

এই ব'লে বাসন দুইটি হাতে নিয়ে ফতেমা আ-ঘাটা থেকে উঠে এ-ঘাটে এসে নামল। বললে, 'ততক্ষণ আমি কাজ সেরে নি, তুমি বরং দাড়িয়া থাকো।'

এতবড় অপমান মায়াকে আজ পর্য্যন্ত কেউ করতে পারেনি। রাগে অধীর হয়ে মায়াও আর কোন কথা না ব'লে তক্ষুণি জল থেকে নিজের বাসনগুলো তু'লে নিতে গিয়ে দেখলে—ফতেমা একটুখানি না সরলে বাসন তুলবার উপায় নাই। স্নান তাকে আজ করতেই হবে ভেবে মায়া তাকে সজোরে এক ধাক্কা দিয়ে বললে, 'সর্‌লো সর্! তোর সঙ্গে কথা বলতে ঘেন্না করে।'

অতর্কিতে ঠেলা খেয়ে ফতেমা নিজেকে সামলাতে পারলে না, জলে পড়ে গিয়ে কাপড়চোপড় সবই ভিজে গেল।

তখন ফতেমাও তার কাপড় ধরে এমন এক টান মারলে যে মায়ারও কাপড় জামা সবই ভিজে গেল।

তারপরই দু'জনের হাতাহাতি। মারামারি গালাগালি কিছু আর বাকী রইল না এবং শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হল মায়া। ফতেমা দেখতেই স্বাস্থ্যবতী সুন্দরী; কিন্তু গায়ে জোর বেশী নাই।

শুধু মুখের জোরে মায়ার চেয়ে কোনও অংশে কম নয়।

রাজেন বাড়ীতেই ছিল, শুনলে, ফতেমা তার স্ত্রীকে অপমানের বাকি কিছু রাখেনি।' রাগে আগুন হয়ে তক্ষুণি সে গফুরের বাড়ীর দিকে ছুটল। দেখলে গফুর বাড়ী নাই, দরজা থেকে ফতেমার গলার আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল, সে তখন একা মায়াকে নয়, তাদের ঘর ওষ্টী সকলকেই এমন কি হিন্দু-জাতিটাকে যা মুখে আসছে তাই ব'লে গালাগালি দিচ্ছে।

রাজেন সেখান থেকে চীৎকার করে ফতেমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলে গেল—'খবরদার বলছি ফতেমা, চুপ কর, নইলে আমি কিছু বাকি রাখব না ব'লে দিচ্ছি!'

ফতেমা বললে, 'তোর বৌকে চুপ করাগে যা!'

ফতেমা তাকে এমন কথা জীবনে কোনদিন বলে নি। ভাব্‌লে, মায়া হয়ত এমন কিছু করে বসেছে যার জন্য ফতেমা আজ তার মুখের ওপর জবাব দিতে কসুর করলে না।

এ ক্ষেত্রে চুপ করে থাকা ছাড়া আর কোন উপায় নাই।

রাজেন বাড়ী ফিরে এসে তার বৌকে যা খুশী তাই ব'লে গালাগালি করতে লাগল।

শ্বশুর বললেন, 'জানি একদিন অমনি একটা কিছু হবেই।'

রাজেন ভাবলে, আসুক্ গফুর, সে যাতে কিছু মনে না করে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার। দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর তাদের এই নিয়ে আলোচনা চলছিল, এমন সময় গ্রামের চৌকীদার এসে রাজেনকে বলে, 'ছোট দারোগাবাবু আপনাকে ডাকছেন, থানায় চলুন।'

'একেবারে থানা!' কেন, থানা কেন?'

—রাজেন জিজ্ঞেস করলে।

—'আপনার নামে নালিশ আছে।'

—'কে নালিশ করলে?'

—'গিয়েই দেখবেন চলুন।'

রাজেনকে দেখিবামাত্র ছোট দারোগাবাবু ব'লে উঠলেন, 'এই যে! আসুন, রাজেন বাবু আসুন।'

'আপনি' সম্বোধনটি যে নিছক বিদ্রূপের তা আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হলো না; কারণ এই রাজকর্ম-চারীটি গ্রামে এসে অবধি 'আপনি' সম্বোধন বোধহয় কাউকেও করেন নি।

বললেন, 'কি রে, নিজে যা করেছ করেছ, এইবার বৌ-টাকেও আসামী করে আদালতে দাঁড় করাতে চাও নাকি, ব্যাপার কি বল দেখি ?'

রাজেন একবার এদিক্-ওদিক্ তাকিয়ে দেখল। দেখ্‌লে, একটুখানি তফাতে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে গফুর বসে আছে, গফুরের পাশে আর একজন মুসলমান ছোকরা, সম্ভবতঃ ভিন্ন গ্রামের। এবং তার পাশে ফতেমা মাথায় কাপড় দিয়ে ঘোমটা দেঁবে চুপ করে বসে আছে।

রাজেন ডাকলে, 'গফুর !'

ছোট দারোগা বললেন, 'গফুরকে ডেকে কি হবে ? ও হারামজাদা আসতে চায় নি, আমিই ওকে ডেকে এনেছি।'

গফুর মুখ ফিরিয়েও দেখলে না।

রাজেন বললে, 'মেয়েতে মেয়েতে ঝগড়া হয়েছে পুকুরের ঘাটে, এর জন্য এত কেন ?'

ছোটদারোগা বললেন, 'ঝগড়া বোলো না রাজেন, ঝগড়া নয়, মারামারি। রীতিমত মারামারি। তার ওপর তুমি ওদের বাড়ীতে গিয়ে ফতেমাকে অপমান করে এসেছ—'

রাজেন বললে, 'অপমান করেছি আমি ?'

ফতেমা তার মুখের পানে তাকিয়ে বললে, 'তুমি।'

অপরিচিত সেই মুসলমান—ছোকরাটি বলে উঠল, 'হাঁ হাঁ—আলবৎ ! আমি নিজে তখন ওখানে বসে ছিলাম।'

রাজেন অবাক্ হয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে বললে, 'তারপর ?'

ছোটদারোগা বললেন, 'তারপর আর কি ! যাচ্ছিল আদালতে, আমিই ফিরিয়ে আনলাম, দাও কিছু জরিমানা, আর নইলে যাও আদালতে ! তোমার বৌকে আর তোমাকে দু'জনকে আসামী করবে বলছে।'

'হুঁ' বলে নতমুখে কি যেন ভেবে রাজেন জিজ্ঞেস্ করলে, 'কে বল্‌ছে ? গফুর ?'

ছোটদারোগা বললেন ; 'গফুর কেন বল্‌বে, বল্‌ছে ফতেমা আর ওর ওই দেওর।'

এই বলে তিনি সেই অপরিচিত ছোকরাটিকে আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন।

ছোকরাটি বললে, 'গফুরই বা কেন বল্‌বে না ? গফুরই বলেছে, ধরুন। তার বোনের অপমান হ'লে তার অপমান হয় না ? আমরা মুসলমান। মেয়েদের ইজ্জত আমাদের আগে দেখতে হয়।'

রাজেন বললে, বেশ, গফুর যদি বলে ত' আমি জরিমানা দিয়ে যাচ্ছি।'

কত জরিমানা ?

ছোট দারোগা বললেন, 'পঁচিশ টাকা।'

রাজেন বললে—এত পারবো না না দারোগাবাবু, এই নিন্ দশ টাকা।

এই হ'ল ঝগড়ার সূত্রপাত।

রাজেনের বাবা অবিনাশ গাঙ্গুলী বললেন, 'হতভাগা আমার কাছে এবার মুখ দেখাবে কেমন করে, কে জানে।'

কিন্তু মুখ সত্যই গফুর আর তাদের কারও কাছেই দেখায় না। কোন্‌দিক দিয়ে যে কেমন করে কোন্ সময়ে ঘর হ'তে বের হয় আবার কখনই বা ঘরে ঢোকে, কেউ তা দেখতে পায় না।

যে মুরগী মারার জন্য রাজেন তার স্ত্রীকে অপমানের কিছু বাকী রাখে নাই, সেই মুরগীর দুটি বাচ্চা সেদিন রাজেন তার নিজের হাতেই মেরে ফেলে দিল।

গফুর তার প্রতিশোধ নিতে কসুর করলে না। গফুর তার খামারের ভাঙ্গা প্রাচীরের ধারে-ধারে ঝাঁকাঝির বেড়া দিয়ে কয়েকটী পেঁপের গাছ লাগিয়ে ছিল ; রাজেনদের দুটো গাই সেদিন সেই পেঁপে গাছে মুখ দিয়েছে ব'লে সেই গাই দুটোকে মারতে মারতে খোঁয়াড়ে দিয়ে এল।

এমনি করে বিদ্বেষের বহ্নি ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে শেষে একদিন দপ্ করে জ্বলে উঠ্‌ল।

গ্রামের উত্তর প্রান্তে রাজেনদের ধানের জমির নীচেই গফুরের জমি। রাজেন একদিন মাঠে গিয়ে দেখলে, তার ক্ষেতের সমস্ত জলটুকু আলের নীচে ফুটো করে গফুর তার নিজের ক্ষেতে নিয়ে গিয়েছে। রাজেন কাউকে কোন

কথা না বলে এর প্রতিশোধের সুযোগ খুঁজে বেড়াতে লাগল।

অবশেষে সুযোগ একদিন মিলে গেল।

সেদিন সন্ধ্যা থেকে ঝিম্‌ঝিম্ করে বৃষ্টি পড়ছে। রাজেন ভাবলে, আজও সে মাঠের জল কেটে নিশ্চয়ই নিজের মাঠে নিয়ে যাবে; সুতরাং এই উপযুক্ত সময়। গ্রামের একজন চৌকীদার ও তার একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢেকে রাজেন মাঠে গিয়ে দেখে গফুর তার হাতে একটা কোদাল নিয়ে নিতান্ত সন্তর্পণে জল কাটতে আরম্ভ করেছে।

রাজেন তক্ষুণি তার কাছে গিয়ে হাতের ছোট লাঠি দিয়ে গফুরের পিঠের ওপর মারল এক বাড়ি। গফুর রুখে ফিরে দাঁড়াতেই রাজেন চৌকিদারকে বলল 'ধরো।'

তারপর গফুর গেল থানায় চালান্ এবং দিনকতক পরে শোনা গেল তার সাতদিন জেল হয়েছে।

সাতটি মাত্র দিন ফতেমা ও গফুরের স্ত্রীর গালাগালি শুনতে শুনতেই কেটে গেল।

জেল হ'তে গফুর ফিরে এল একেবারে মরীয়া হ'য়ে। তার মুখ দেখে সকলেই সন্দেহ করলে—গফুর মুসলমানের বাচ্চা এবার বোধহয় রাজেনকে সে আড়ালে পেলে খুন করে ফেলবে।

কিন্তু খুন সে করল না।

হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হ'য়ে প্রতিহিংসা নেবার দুর্বার আগ্রহে যা সে করে বসল তা নিতান্ত অমানুষিক।

গত বৎসর রাজেনের ক্ষেতে ফসল খুব ভালই হয়েছিল, কারণ বছরের এ সময়টায় ঝড় বড় একটা কারও খামারেই থাকে না, অথচ রাজেনের খামারে ঝড়ের তিন-চারটা

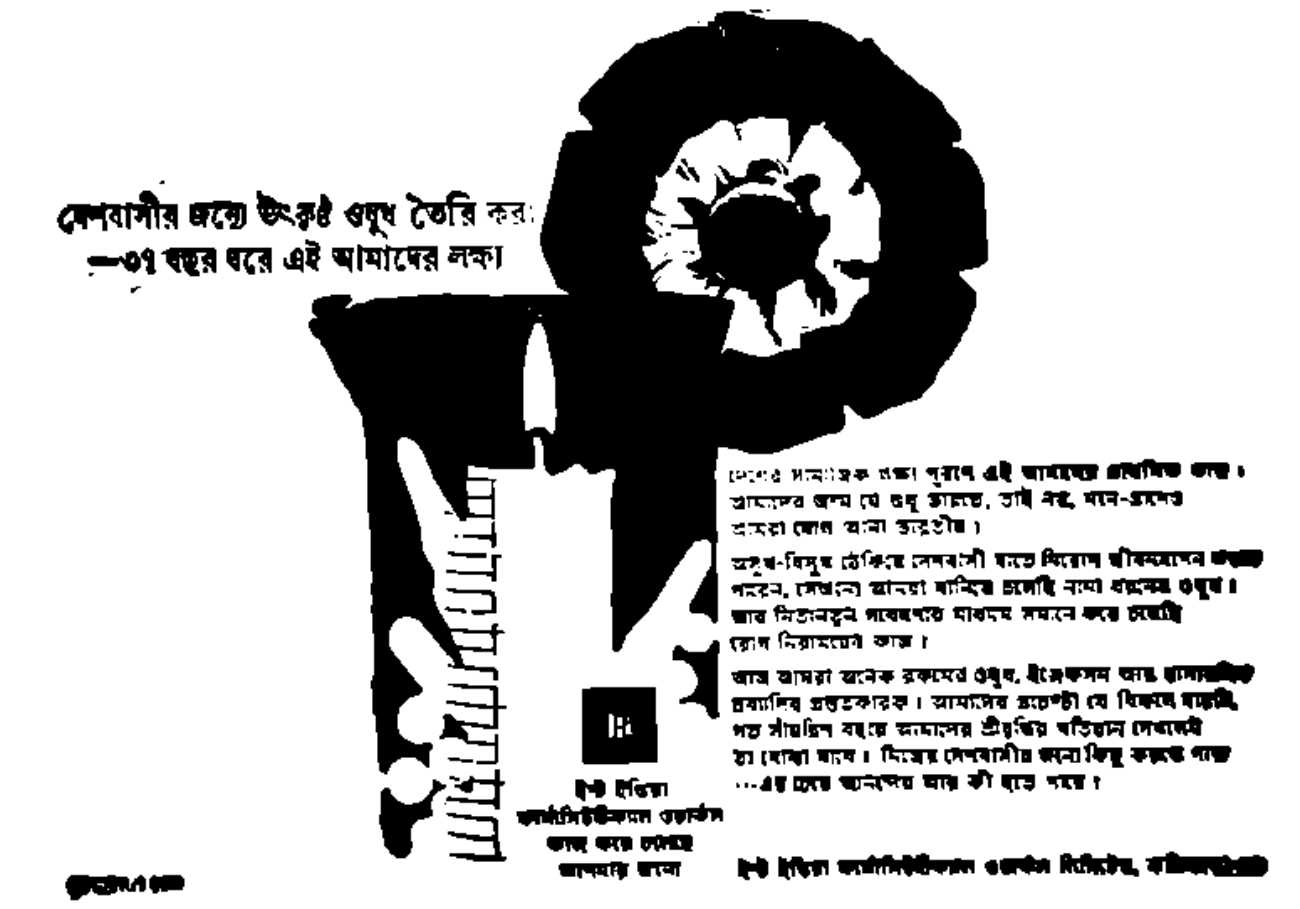

বড় পালুই ত' আছেই, তাহার উপর প্রকাণ্ড একটা গোলা ভর্ত্তি ধান।

গফুরের তা সহ্য হ'ল না।

খামারের পাশে ইট দিয়ে বাঁধানো একটি চত্বরের চারিধারে পথ করে রাজেন কয়েকটি ফুলের গাছ লাগিয়েছিল। মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে সে চুপ করে বসে থাকত।

সেদিনও সে অমনি বসে আছে, সন্ধ্যা হতেই চারিদিকে ঘোর অন্ধকার হয়ে এল। ঘোরকরি অমাবস্যার রাত্রি।

হঠাৎ এক সময়ে খড়ের পালুই-এর আড়ালে কেমন যেন খুস্ খুস্ শব্দ হ'ল। রাজেন ভাবলে, খামারে হয়ত শেয়াল কিংবা কুকুর ঢুকে থাকবে। যাই হোক্, রাজেন ভাবছিল—গফুরকে এরকম ভাবে জেল খাটানো তার উচিৎ হয়েছে কিনা! ভাবছিল,—এবার একদিন সে গফুরের দেখা পেলে তার হাতে ধরে ক্ষমা প্রার্থনা করবে।

কিন্তু ঠিক সেই সময়েই রাজেন দেখলে, তার চোখের সুমুখে খড়ের একটা গাদার পিছনে দপ্ করে আগুনের মত কি যেন জ্বলে উঠল। এবং সেই অগ্নিশিখার আলোকে সে স্পষ্ট দেখলে, গফুর যেন সেখান থেকে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে।

রাজেনের মাথার ভিতরেও তখন আগুন জ্বলে উঠেছে। সে আর একটি মুহূর্ত্তও চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারলে না। গফুরকে ধরবার জন্য তক্ষুনি সে সেখান থেকে উঠে তার পিছু পিছু ছুটল।

গফুর একেবারে হাতে হাতে ধরা পড়ে গেছে।

গফুরও যত ছুটে, রাজেনও তত।

গ্রাম পার হয়ে মাঠের উপর দিয়ে গফুর প্রাণপণে ছুটতে লাগল।

চীৎকার করে রাজেন বললে, 'চল্ তুই যেখানে যাবি, তোকে আজ খুন ক'রে ফেলব।'

এই ব'লে ছুটতে ছুটতে ফাঁকা মাঠের উপর দিয়ে তারা অনেকখানি পথ চলে এসেছে। কিন্তু এমনি ক'রে অন্ধকারে কতক্ষণই বা ছুটবে। গফুর হঠাৎ হোঁচট খেয়ে যেমন তার পতিরোধ একটুখানি থামিয়ে ফেলেছে, রাজেন তক্ষুনি তার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল। তারপর কিল, চড়, ঘুষি তারপর দু'জনেই মাঠের মাটিতে গড়াগড়ি।

রাজেন বলে, 'শালা ছোটলোক, মোছলমান কোথাকার।'

গফুর বলে, 'তুই শালা ছোটলোক—হিন্দু কোথা-

গফুর একবার রাজেনের ওপর ওঠে, রাজেন একবার গফুরের ওপর! পিছনে যে একটা ভয়ানক গোলমাল উঠেছে সেদিকে কারও লক্ষ্য নেই।

মারামারি করতে করতে হঠাৎ একসময় কোলাহল শুনে দু'জনেই পিছন ফিরে তাকাল। দেখল, সর্ব্বনাশ! রক্তবর্ণ অগ্নির লেলিহান শিখা তখন ধূ ধূ করে বড় ভয়ঙ্কর ভাবেই জ্বলে উঠেছে। সমস্ত গ্রামের সমস্ত নরনারীর গগনভেদী আর্ত্ত চীৎকারে কর্ণ যেন বধির হয়ে আসে।

মারামারির কথা অকস্মাৎ তারা যেন ভুলে গেল। রাজেন ছুটল গ্রামের দিকে গফুরও ছুটল।

ছুটতে ছুটতে সেখানে গিয়ে তারা দেখলে, সর্ব্বভুক অগ্নিদেবতার কুটিল জিহ্বা হিন্দু-মুসলমানের প্রভেদ পার্থক্য মানে নাই। রাজেন ও গফুরের পাশাপাশি দু'খানি বাড়ীই গ্রাস করে সর্ব্বনাশা আগুন তখন ধূ ধূ করে জ্বলতে আরম্ভ করেছে। কতক জিনিষ টেনে বের করা হয়েছে, কতক বা হয় নাই। গ্রামের অনেক লোক আগুন নিভাবার জন্য সেখানে জড়ো হয়েছে। রাজেনের বৃদ্ধ পিতা নিতান্ত অসহায়ের মত কেঁদে কেঁদে ছুটে বেড়াচ্ছেন। গফুরের স্ত্রী 'হায় হায়' করছে, আর সব চেয়ে অবাক কাণ্ড—আজ এই দুঃখের দিনে ফতেমা ও মায়ার ভাব হয়ে গেছে। আগুনের ভিতর হ'তে কি একটা জিনিষ টেনে বার করতে গিয়ে ফতেমার একখানা হাত আগুনের আঁচে ঝলসে গিয়েছে; আর সেই পোড়া হাতের শুশ্রূষা করবার জন্য মায়া তখন তাকে সঙ্গে নিয়ে ইতস্ততঃ ছড়ানো জিনিষপত্রের মাঝখানে একটুখানি নারকেলের তেলের সন্ধান করছে।

বেওয়ারিশ মুর্দা

গজেন মিত্র

এই কিছুদিন আগেই খবরের কাগজে চিঠিটা বেরিয়েছিল। একটি মহিলা লিখছেন, বেলেঘাটার নতুন রাস্তাটার ওপর তিনি যে ফ্ল্যাট-বাড়িতে থাকেন—তার সামনেই কদিন আগে একটা লোককে কে খুন করে ফেলে রেখে গেছে। দেখলে মনে হয় তরুণবয়সী কেউ। আজ তিন দিন হয়ে গেল পুলিশ আসেনি কেউ সে লাশ সরায়ও নি। ফলে এখন আর লাশ সনাক্ত করারও কোন উপায় নেই। শিয়াল কুকুরে তার অনেকখানিই খেয়ে ফেলেছে। দুর্গন্ধে তাঁর এই দোতলার ফ্ল্যাটেও টেঁকা যাচ্ছে না। তিনি বারবার থানায় ফোন করেছেন, লালবাজারে ফোন করেছেন, কোন ব্যবস্থাই হয়নি। লোকাল থানার ও. সি. বলেছিলেন, 'এখনই লোক পাঠাচ্ছি,' কিছুই হয়নি। তারপর ফোন করেছেন, এখনও করছেন, কেউ ভাল করে উত্তর দেয় না। কেউ বা দেখছি বলে ফোন নামিয়ে রেখে সরে পড়ে।....বড় চওড়া সদর রাস্তা—যা ডি. আই. পি. রোডেরই অংশ, সেখানেও মড়া পড়ে থাকলে পুলিশ তার খোঁজ করবে না—আশ্চর্য!....ইত্যাদি, ইত্যাদি।

স্থানীয় থানার ও. সি.কে তাঁর এক সহকারী দারোগাই দেখিয়েছিলেন চিঠিটা। ওপর থেকেও ফোন ও চিঠি এসেছে—তারপরে। ও. সি. মুখটা বিকৃত করে বলেছেন, 'আলিয়ে খেলে মেয়েটা! বোধহয় বাইশ তেইশবার ফোন করেছে পরশু থেকে। আরে, আমাদের কত রকম ঝ্যাচাং—ওকে কি বোঝাব। ফোটোগ্রাফারের পাত্তা নেই দুদিন, তার ক্যামেরা কোথাও কেউ জানে না। বিনয় হচ্ছে ফটো তুলে তবে লাশ তোলা। ব্যাগুলেন্স সব কটা বিগড়ে পড়ে আছে, তার কি?—খবরের কাগজে চিঠি দিয়েছেন—তবে আর কি, তবে ইঁদুরের গর্ত খুঁজি এখন! আমার কাঁচা মাথাটা কচ্ করে কেটে নেবে আর কি! গন্ধ তো নীচের ফ্ল্যাটে বেশী যাবে মশাই, তারা তো কিছু বলছে না।—এ যেন ক্ষেপে গেছে একেবারে!'

একজন বন্ধু বলেছিলেন ও. সি-র, তিনি মুচকি হেসে মন্তব্য করলেন, 'আসল কথাটা বলো না ভাই, দলে ঝগড়া, নিজের দলের লোকই মেরেছে—এতো পরিষ্কার। সেই জন্যেই তোমরা গড়িমসি করছ, যাতে সনাক্ত করা না যায়। সনাক্ত করলেই আনরেজাল্টনেস, ওর জান কে নিয়েছে খুঁজে বার করলে নিজের জান নিয়ে টানাটানি হবে। ওই তো?'

ও. সি. মুচকি হাসলেন, মুখে কিছু বললেন না।

সত্যিই অমিয়া হাজরা যেন পাগল হয়ে উঠেছিল।

এমন অবস্থা যে হবে তা ভাবে নি। আগে শুধু কাজটার কথাই ভেবেছে—তার সমস্ত অন্ধিসন্ধি আঁটঘাট বাঁধার কথা। অনেক নায়কের বিলিতী গোয়েন্দা কাহিনী পড়েছে সে। কোন্ কোন্ দুর্বলতায় কোন্ নির্বুদ্ধিতায় বা অসাবধানে অপরাধীরা ধরা পড়ে, সেইগুলো লক্ষ্য করেছে। মনে মনে শুধু প্ল্যানিংটাই ঠিক করেছে, যাকে বলে 'ফুল প্রুফ' করা তাই করেছে। তারপরের ফলাফল নিয়ে আলৌ মাথা ঘামায় নি। এমন কি ওর নিজের ওপর কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে সে কথাটাও চিন্তা করেনি একবার।

অবশ্য চিন্তা করলেও এমনটা সে কখনও কল্পনা করতে পারত না, এটাও ঠিক। এ অবস্থা ওর সুদূর কল্পনারও বাইরে। আগাথা ক্রিস্টী বা এডগার ওয়ালেসের গল্পে এরকম কোন পরিস্থিতিই নেই।

তবু ভাবা উচিত ছিল। অন্তত নলু পিসীকে এক দিনের জন্যে ছাড়া উচিত হয়নি। তিনি দেওয়ঝিকে দেখতে যেতে চাইছেন অনেকদিন ধরেই—সে দেওয়ঝি ওর দুঃসময়ে কোথায় ছিল, সে বিষয়ে অধিক ইতিহাস

নীরব—কিন্তু সে যদি বলে দিত, 'আমি বেশী দিন একা থাকতে পারব না পিসীমা, তুমিও কিন্তু দু একদিনের বেশী থেকো না'—তাহলে তিনি নিশ্চয়ই চলে আসতেন। কিন্তু অমিয়াই অতিরিক্ত উদারতায় বলেছে, 'না না, আমার জন্যে ভেবো না, এইটুকু ফ্ল্যাট, আশেপাশে এত লোক, মেঝেতে একটা পেরেক ফেললে তিনদিকের ফ্ল্যাট থেকে শোনা যায়। আমি বেশ থাকব।'

আসলে সে দুটো বাড়তি দিন হাতে রাখতেই চেয়েছিল। যদি প্রথম চোটে না হয়, অন্যভাবে অন্য উপায় চিন্তা করতে হবে। সেইটেই ছিল আসল দুশ্চিন্তা। সেই সময়টা হাতে রেখেছিল। এমন যে হবে তা কে জানত। মানুষ যে এই রকম ভয় পায়, অজানা অবর্ণনীয় একটা ভয়—আর ভয়ে যে এই রকম দৈহিক কষ্ট হয়—তাতো কোন পুঁথি কেতাবে পায়নি সে।—

অমিয়ার জীবনে ভগবান দুঃখ, মানসিক যন্ত্রণা ও নিঃসঙ্গতা ছাড়া কিছু লেখেন নি যে। তা নইলে কার এমন বাবা আর মা একসঙ্গে মারা যায়। মামারা নিয়ে গিয়েছিল, যত্ন ক'রেই রেখেছিল—সেই মামাই বা এমন বিপাকে জড়িয়ে পড়বেন কেন? কেন এই দূর সম্পর্কের পিসী নলিনীকে এনে সংসার পাততে হবে ওদের। এমন কেউ কোথাও নেই—কে কবে শুনেছে? কোন আত্মীয় স্বজন! অথচ কাকা আছেন, আপন কাকা—তিনি কাশীতায় সেটল্‌ড্‌, মাঝে মাঝে বছরে দুখানা হিসেবে চিঠি লেখা ছাড়া কিছু করে উঠতে পারেন না। বাবা মরবার পর উত্তেজিত হয়ে ইণ্ডিয়া গবর্ণমেণ্টকে একটা কড়া চিঠি লিখে ওর কাছে তার কপি পাঠিয়ে কর্তব্য শেষ করেছিলেন। না, কিছু টাকাও পাঠিয়েছিলেন।

টাকার খুব অভাব ওদের ছিল না। ওর বাবা একেবারে নিঃস্ব রেখে যান নি। বাবা দেবচরিত্র লোক ছিলেন। সরকারী কলেজের প্রোফেসর, মাইনে মন্দ পেতেন না একেবারে। টিউশনী অবশ্য করতেন না—কিন্তু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা দেখা, পেপার সেট করা প্রভৃতিতে বাড়তি রোজগার করতেন কিছু। তা ছাড়া মাও গানের ইস্কুলে চাকরি করতেন, শ দুই টাকা তিনিও আনতেন। বাবা দিলদরিয়া মেজাজের লোক ছিলেন—নইলে আরো অনেক টাকা রাখতে পারতেন। আত্মীয় অনাত্মীয় নির্বিশেষে—পরিচিত কেউ দুঃখে পড়েছে শুনলেই যথাসাধ্য সাহায্য করতেন—উপযাচক হয়ে, তার প্রার্থনার অপেক্ষা করতেন না। তাঁর ভাবটা ছিল যেন দুনিয়ার সব লোকের দুঃখ মোচনের দায়-দায়িত্ব তাঁরই।

বাবা মারা গেলেন সেরিব্র্যাল থ্রম্বসিসে, তখনও ওর দাদা ক্লাস ইলেভেনে পড়ছে, অমিয়া ক্লাস টেন-এ। তাতেও আটকাত না, ছোট্ট হলেও নিজেদের বাড়ি,—কাকার ভাগ অবশ্য আছে কিন্তু তিনি বা তাঁর কিরিঙ্গী ছেলেরা কেউ সে বাড়ি দখল করতে আসবে না—এক-রকম করে চলেই যেত, যদি মা থাকতেন। মা কোনমতে একটা মাস বৈধব্য সহ্য করেছিলেন, তারপর আর থাকতে পারলেন না। নিতান্ত গ্রাম্য মেয়ের মত গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

ওঃ, সে কী দিনই গেছে! আজও মনে হলে মাথা খুঁড়ে মরতে ইচ্ছে করে। লোকে লোকারণ্য, নানারকম বিদ্রূপ ও বক্রোক্তি, কৃত্রিম সমবেদনা—আসলে ও ছিল না যে তা বলতে চায় না অমিয়া—পুলিশ, পোষ্টমর্টেম পরীক্ষা, তারপর দুর্গন্ধ গলিত শব নিয়ে শ্মশানে যাওয়া। সে দুর্দিন যেন জীবনে না আসে। তার জের একবছর পরেও চলেছে, আত্মহত্যার মৃত্যু—একবছর পার না হলে বুঝি শ্রাদ্ধ হয় না।....

এরপর আর ওবাড়িতে থাকা যায়নি। বাড়ি ভাড়া দিয়ে জিনিষপত্র কতক বেচে মামার বাড়ি যেতে হয়েছিল। শ দুই টাকা বাড়িভাড়া, তা থেকে ট্যাক্স মেরামতিতে কিছু গেলেও, শ দেড়েক টাকা থাকে। বাবার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও ইন্‌সিওরেন্স মিলিয়ে হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা ছিল ব্যাঙ্কে, তারও সুদ নিতান্ত অল্প নয়। সুতরাং মামার গলগ্রহ হতে হয়নি। আর হয়ত সেই জন্যেই—মামীও অনাদর করে নি। কিন্তু সেটুকু আশ্রয়ও সইল না।

মামা ব্যবসা করতেন, সামান্য ব্যবসা—তবে আগে তাতেই সচ্ছলে চলত কিন্তু ইদানীং নাকি ধার দেনা ক'রে

চালাতে হচ্ছিল. সংসারেও টানাটানির অন্ত ছিল না। কেন যে ব্যবসা চলছে না তা ওরা বুঝত না। এ বাজারে সব ব্যবসারই উন্নতি হচ্ছে, ফুলে ফেঁপে উঠছে বলতে গেলে—ওঁর চলে না কেন? অথচ ভদ্রলোক গভীর রাত অবধি খাটেন, এক একদিন সারা রাতই দোকানে থাকেন।

ওর দাদা অমলই আবিষ্কার করল একদিন যে মামা খাটেন হয়ত—তবে সে অন্যত্র! দুদিন পরপর গিয়ে দেখল সন্ধ্যার সময়ই মামা নেই। কর্মচারী মুখ টিপে হেসে বললে, আজ আর আসবেন না। উনি তো ছুটা বাজলেই বা বিক্রীবাটা হয় নিয়ে মাল কিনতে যাবার নাম করে চলে যান। মাল তো আসে না—কী করেন কে জানে!'

মামীমাই পাঠিয়েছিলেন অমলকে, সেটা পরে শুনেছিল অমিয়া। অমল এসে খবর দিতে কপালে করাঘাত করে নীরবে চোখের জল ফেলতে লাগলেন মামীমা। তখনও অমিয়া কিছু বোঝেনি। বুঝল এর দিন কয়েক পরেই—যখন কোন সন্দেহজনক চরিত্রের মেয়েছেলেকে খুন করার অপরাধে পুলিশ একদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করল। অকারণে নয়—অকাট্য প্রমাণ পেয়েছেন তাঁরা। মামা নাকি এই মেয়েটির পিছনে যথাসর্বস্ব ঢালছিলেন, সে অপরকে অনুগ্রহ করছিল। মামা সেটা চোখে দেখেছেন। তারপর বিবাদ এবং খুন—এতো স্বাভাবিক পরিণতি।

দোকান দেনার দায়ে বিক্রী হয়ে গেল। মামীমা গয়না বিক্রী করে মামলার খরচ দিলেন। অমলদের টাকাও হয়ত যেত, অমিয়া তখনও নাবালক বলে টাকা ওঠানো গেল না। বাড়িওলা বাকী ভাড়ার নালিশ করলেন। মামীমা বাপের বাড়ী চলে গেলেন ছেলেমেয়ে নিয়ে।

এবার অমল আর কোন আত্মীয়ের বাড়ি যেতে রাজী হল না। কসবা অঞ্চলে একটা ছোট ফ্ল্যাট ভাড়া করল এবং খোঁজখবর করে এই নলু পিসীকে এনে সংসারভুক্ত করল। নলু পিসীও সে সময় একেবারে সহায় সম্বলহীন হয়ে পড়েছিলেন। লোকের বাড়ী ঝাঁধুনীগিরিই করছিলেন—এই আশ্রয় পেয়ে বেঁচে গেলেন। উনিই রান্না করতে লাগলেন, টিকা ঝি বাসন মেজে দিয়ে যেত। ধোয়া মোছা অমিয়া নিজেই করত। ওদের দা মোট আয় তাতে এর বেশী লোক রাখা সম্ভব নয়।

এরপর অমল বি. কম. পাশ ক'রে একটা চাকরিতে ঢুকল। তার আগে থেকেই টিউশনী করত, এখন সেটা বাদ দিয়ে সন্ধ্যায় এম. কম-এ ভর্তি হল। অমিয়াও বি. এস-সি পাস করে চাকরির চেষ্টা করবে এই ঠিক করে রেখেছিল। এ নিয়ে অমলের সঙ্গে নিত্যই তর্ক হত—অমল বলত, 'তোকে চাকরি করতে দোব না আরও কিছু। পাসটা করলেই একটা পাত্র দেখে চালান ক'রে দেব তার হাতে।'

বেশ ছিল ওরা। হঠাৎ এই সময় উগ্র রাজনীতির ঘূর্ণিঝড় উঠল। প্রথম প্রথম অমল ওদের বিদ্রূপ করত বিস্তর দিত কিন্তু তারপর কী যে হ'ল কার চক্রান্তে পড়ে ওদের ফাঁদে পা দিল তা অমিয়া জানে না, দেখতে দেখতে মেতে উঠল অমল।

শুরু হয়ে গেল চুপি চুপি মন্ত্রণা, চোখে চোখে ইসারা, দেওয়ালে দেওয়ালে লেখা, গুপ্ত সভা, গভীর রাত্রে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়া। অমিয়া হয়তো পারল বাধা দেবার চেষ্টা করল কিন্তু যাকে মরণ-নেশায় ধরেছে সে বোনের কথা শুনে ফিরবে তা সম্ভব নয়।

নেশা যাদেরই বুঝি এই রকম—হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দেয়। যারা রেস খেলে, যারা মদ খেয়ে জুয়া খেলে যথাসর্বস্ব ওড়ায়—অপরের সর্বনাশের চেহারা দেখেও তো তাদের চৈতন্য হয় না। তারা তো এমন কি স্ত্রীপুত্র-কন্যার কথাও ভাবে না। রাজনীতির নেশায় যে মেতেছে সে কার কথা শুনবে, এ নেশা অনেক বেশী উগ্র। তার কারণ—অমিয়া কাছে থেকে অথচ নির্লিপ্তভাবে লক্ষ্য করেছে বলেই দেখেছে—এই ছেলেমেয়েগুলো বিভাস্ত অল্প বয়সে এর মধ্যে ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছে। এ সুরার চেয়েও সাংঘাতিক, প্রচণ্ড উন্মত্ততা এতে। যা খুশি তাই করে পার পাওয়া যায়, বয়স্ক সম্ভ্রান্ত লোকদের আবার ইচ্ছার কাছে নত করা যায়—এর নেশা কম হবেই বা কেন?

কিন্তু অমল অনেকদূর এগোলেও বেশী দূর এগোতে পারল না। তার অধ্যাপক পিতার রক্ত তার ধমনীতে, ষোল বছর বয়স পর্যন্ত দেখেছে সে লোকটাকে, তাঁর উপদেশ পেয়েছে, তাঁর স্বভাবের স্নিগ্ধ জ্যোতিতে বিকশিত হয়েছে ওর মন, তার আদর্শ এখনও ভুলতে পারেনি—সেই শিক্ষা, সেই আদর্শ, সেই বিচারবুদ্ধি ও যেন বাধা দিল এই হিংসায় ডুব দিতে। যথেচ্ছ খুন, অনেক সময়েই তুচ্ছ কারণে বা অকারণে—এতটা বরদাস্ত করতে পারল না অমল। সে সরে দাঁড়াল। শুধু নিজে সরে দাঁড়ালেও হয়ত এত তাড়াতাড়ি এ পরিণাম হ'ত না—সে ওদের নিরস্ত করার চেষ্টা করতে লাগল, যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাতে চাইল কখনও কখনও সে তর্ক সোচ্চার ও উগ্র হয়ে উঠবে—এও স্বাভাবিক।

এতটা সহ্য করা সম্ভব হ'ল না ওর দলের। করা উচিতও নয়। মৃত্যু নিয়ে যারা খেলা করে তাদের সদা সতর্ক থাকতে হয়। ফলে একদিন প্রায় প্রকাশ্য দিবালোকে রেল লাইনের ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে অমলকে কুপিয়ে মারল ওরা। বড় ছোরা, রাম দা—যে যা পেয়েছে নিয়ে গেছে। পোস্টমর্টেমে ধরা পড়েছে—বাইশ জায়গায় চোট ছিল অমলের দেহে।

অল্প বয়স থেকেই আঘাত পাচ্ছে অমিয়া—একটির পর একটি। অথচ এত অল্প বয়স নয় যে কিছু বুঝতে পারবে না। কিন্তু পাঁচ ছ বছরের মধ্যে এতগুলো মৃত্যু দেখতে হয়েছে বলেই বোধ হয় ভেঙ্গে পড়ে নি। মা, বাবা, মামা। মামা নিজে যা-ই হোন ওদের ভালবাসতেন, ঐ একটি চরিত্র দোষ ছাড়া অন্য কোন বদ্ অভ্যাসও ছিল না, শান্ত বিবেচক ভদ্র ছিলেন। সেই মামার ফাঁসি হ'ল—এও খুব কম আঘাত নয়।

কিন্তু ভাগ্যের এই আঘাত যত আহত করেছে ততই এ সংসারে তার একমাত্র জীবিত আপনজনকে মনে প্রাণে আঁকড়ে ধরেছে। এই কঠিন দুঃসহ আঘাতগুলো ওদের ঘনিষ্ঠতর, অন্তরঙ্গতর করেছে; আপনাকে আপনতর করেছে। এই শেষ কবছর দাদাই ছিল অমিয়ার কাছে জগৎসংসার সব। মাত্র সেড় বছরের ছোট বড় ওরা—সে জন্যে বন্ধুর মতোও ছিল দুজনে, সাধারণ বন্ধু বলতে যা বোঝায় তার চেয়ে বেশী।

সেই দাদা চলে গেল এমন অকস্মাৎ, এমন নিষ্করুণ, মর্মান্তিক, শোচনীয় ভাবে। বিনা দোষে অকারণে। মহৎ উদার বন্ধুবৎসল স্নেহ পরায়ণ দাদা তার—শুধাকথিত কতকগুলো বন্ধুর হাতেই নিষ্ঠুর ভাবে নিহত হ'ল। আর কেউ রইল না, কোথাও কেউ নেই। তবু কিন্তু অমিয়া ভেঙ্গে পড়ল না। পাথর হয়ে গেল? কে জানে, সে অত বোঝে না। যতদূর সম্ভব স্বাভাবিক থাকারই চেষ্টা করেছে সে।

অনেকেই ভেবেছিল অদৃষ্টের এই চরম মার খাওয়ার পর—হয় পাগল হয়ে যাবে অমিয়া, নয় তো মায়ের মতো আত্মহত্যা করবে। কিন্তু কিছুই করল না সে। প্রতিদিনের মতোই খেয়ে বেরোতে লাগল। ইউনিভার্সিটিতেও যেত, চাকরির চেষ্টাও করত। সময় বেশী থাকলে ন্যাশানাল লাইব্রেরীতে গিয়ে পড়াশুনো করত। একটা কাজ পেয়েও গেল। দাদা যে আপিসে কাজ করত—একটা ব্যাঙ্কে—সেখানের কর্তৃপক্ষ এবং ইউনিয়ন, এই শোচনীয় ইতিহাস বিবেচনা করেই—আপিসের নিয়ম লঙ্ঘন ক'রে ওকে সেই কাজ দিলেন। ভাল মাইনে, শ চারেক টাকা পেতে লাগল প্রথম থেকেই।

শুধু একটি মাত্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পেল তার। এই চাকরি পাবার পর চেষ্টা ক'রে ভি আই পি রোডের ধারে এই সরকারী দু কামরার একটা ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে চলে এল—ঐ দুঃস্মৃতি জড়িত পাড়া ছেড়ে। তাতে ওরাও বাচল স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে—ওর দাদার যে সহকর্মীরা এই কাজ করেছিল তারা। মুখে যতই বেপরোয়া ভাব দেখাক—মনে মনে একটু অস্বস্তি ছিলই।

কারা এ কাজ করেছিল তা অনেকেই দেখেছে—কিন্তু স্বভাবতই কেউ বলে নি পুলিশকে। নিজেদের মধ্যেও আলোচনা করতে সাহস করে নি।

অমিয়া অনেক ধৈর্য ধরে একটু একটু ক'রে সেই নামের তালিকাটি সংগ্রহ করেছে। করেছে যে, করছে যে—সে

কথা কাউকে বুঝতে দেয় নি। মোটামুটি জানত সে—অনুমান করতে পেরে ছিল। এখন নিশ্চিত হ'ল শুধু। অনুমানের সঙ্গে পুরোটাই মিলে গেল। নেতা কে, কে অগ্রণী বা উদ্যোগী, সেটাই জানা দরকার ছিল, সেটাও জেনে নিল। দুতিন জায়গা থেকে কথাটা মিলিয়ে নিল। প্রদীপ বলে ছেলেটি। হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে বসে ছিল—টুকে পাশ বলেই চাকরির কোন সুবিধে করতে পারে নি—এই হুজুগে সর্দারী করায়: ব্যস্ত থাকার সুযোগ পেয়ে বেঁচে গেল। ওর বাবা পেনসন পান সামান্য, বড় সংসার, খাওয়া পরার মান ভাল নয়—সে এটাকে সমাজব্যবস্থার অবিচার ও তাবত বোধ হয় সত্যি সত্যিই। সে জন্যে সাধারণ ভাবে সকলের সম্বন্ধেই একটা আক্রোশ পোষণ করত, সেই আক্রোশটাই ঐ হুজুগ রাজনৈতিক আন্দোলনে তৃপ্ত হবার একটা পথ দেখতে পেল।

লোকটা কে জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে অমিয়া প্ল্যান করতে বসল।

তিন বছর অনেক সময়। এর মধ্যে মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়। বিশেষ আজ অপরাধের কথা তো ভুলতেই চায় সে। নানা ঘটনা ও কারণের মধ্যে সাফাই খোঁজে।

প্রদীপও অনেকটা ভুলবে সে স্বাভাবিক। তাছাড়া এতদিনেও কখনো অমিয়ার কাছ থেকে কোন অনুযোগ কি তিরস্কার না শুনে সে কতকটা নিশ্চিন্তও হয়েছে, ভেবেছে যে অমিয়া তার দাদার হত্যাকারীদের সন্ধান পায়নি, কেউ বলে নি। বলবেই বা কে, কার এত সাহস? তাছাড়া সে এখন—যাকে সলারসল্ট খাওয়া বলে—তাই খেয়েছে। সম্পূর্ণ অহিংসা বলে পরিচিত এক রাজনীতিক দলে যোগ দিয়ে 'লীডার' হয়েছে. পাড়ার মাতব্বর ছেলেদের ওপর মাতব্বরী করছে, নিজের পূর্ব দলের যে দু একজন কর্মী এখনও বক্তৃতা স্বীকার করে নি—তাদের বিষদাঁত ভাঙবার চেষ্টা করছে। সে দিক দিয়েও খরগোসের মুখ লুকানোর মতো—ভাবছে আগের চেহারাটা কারও মনে নেই।

সেই জন্যেই সেদিন অমিয়ার সঙ্গে এসপ্ল্যানেডে দেখা হয়ে যাওয়াটা সম্পূর্ণ দৈব ঘটনা বলেই ভেবেছে। এক শহরে থাকলে এমন তো দেখা হয়েই যায়। তাও প্রদীপ চিনতে পারে নি। অমিয়াও, যেতে যেতে ঘুরে ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করেছে, 'প্রদীপদা না?' তখন চিনেছে। অমিয়াকে আগেও দেখেছে—কিন্তু এমন চোখ ঝলসানো চেহারা যে ওর, তা কল্পনা করে নি—ওদের রক্তবাজী অভিধানে যাকে 'লম্পট' বলে। নিজেকে মনে মনে ধিক্কার দিয়েছে এই চিনতে-না-পারার জন্যে, তারপর যথাসাধ্য—ওর যতটা সাধ্য ততটা—মিষ্টি হেসে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এর পর আলাপ ক্রমে জমে উঠেছে। কে কী করছে খোঁজ নিতে ও দিতে প্রদীপ কি করছে তাও জেনেছে। না, এখনও কোন চাকরি বাকরি পায় নি—প্রবলদা বলেছে তার চাকরিটা পাকা হয়ে গেলেই সব কটাকে ঢুকিয়ে নেবে—তবে সে এখন কবে হয়। এরমধ্যে একটা ইন-সিওরেন্সের এজেন্সী নিয়েছে—তাতে কতই বা আসে। সেকথা শুনে অমিয়া যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ করেছে। এবং যেচে না চাইতেই জল, স্বর্গ আপনিই এসে ধরা দিয়েছে—অমিয়া নিজে থেকেই আপিসের ঠিকানা দিয়ে বলেছে, এদিকে যদি আসেন টাসেন কোনদিন—একটু খোঁজ করবেন? সেভিংস ব্যাঙ্ক কাউণ্টারে থাকি, না হলেও যাকে জিজ্ঞাসা করবেন অমিয়া হাজরা, সেই বলে দেবে।'

সঙ্গ ছাড়তে ইচ্ছা করেনা, তবু ছাড়তে হয়। এখন থেকেই অমন লেপ্‌টে থাকতে চাইলে ওর মনটা ছোট হয়ে যাবে।

অমিয়া তার বাস-এ উঠে গেলে একটা পানের দোকানের আয়নায় নিজের চেহারাটা দেখার চেষ্টা করে। নিশ্চয়ই কিছু আকর্ষণ আছে তারও—নইলে ভুলে গেছে. অমিয়া মনে ক'রে রেখেছে কেন?···

অতঃপর কোন মতে একটা দিন ধৈর্য ধরে থেকে দ্বিতীয় দিনেই সে যে অমিয়ার আপিসে আসবে—অমিয়া তা জানত।

অন্তরঙ্গতা চুমুতেই শেষ হয়ে ওঠে। একটু বেশি দ্রুত। যতটা সময় লাগবে ভেবেছিল অমিয়া তার অনেক আগেই।

এদিকের লালসা কোনদিনই মেটেনি, আটকাবার চেষ্টা যত্নেও। সুযোগ পায়নি, সুবিধা হয়নি। তাই কোন মেয়ে আমল দেয় নি। যে দুচার জন আমল দিয়েছে তাতে কোন তরুণ ছেলের মন ভরে না। এ রকম লোক সামান্য প্রশ্রয়েই অধীর হয়ে উঠবে এতো জানা কথা।

সিনেমায় নিয়ে যায় অমিয়াই। অন্ধকারে হাত ধরতে চাইলে বাধা দেয় না। তবে আর এগোতে দেয় না। সেটাও দেয় না হিসেব করেই, সস্তা হ'তে দিলে চলবে না।

মাস দুই এমনি খেলাবার পর অমিয়া একদিন কথাচ্ছলে হঠাৎ বলে ফেলে সুযোগের কথাটা। ইঙ্গিত দিচ্ছে না চার ফেলছে সেটা জানতে দেয় না। এর মধ্যে বার দেনা করেই হোক আর যেভাবেই হোক—প্রদীপও ওকে একদিন থিয়েটার একদিন সিনেমা দেখিয়েছে। এবার অমিয়াই আবদার ধরে 'মাসের শেষে আপনি আমাকে গ্রোবের ছবিটা দেখান প্রদীপ দা।'

'শোয়োর লি!' বাক্য উচ্চারণে নিজের পাণ্ডিত্য প্রমাণ করার চেষ্টা করে প্রদীপ, 'অফ্ কোর্স'। কবে যাবে বলো? কাল? পরশু?'

'অমিয়ার মুখ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ম্লান হয়ে ওঠে-' ও, না না। কী বলছি! এ সপ্তাহে তো হবেই না। পিসীমা যাচ্ছে কাল, কোন চুলোয় কে এক ওর দেওরঝি আছে, তার কাছে—'

'তাতে তোমার অসুবিধাটা কি?'

'অসুবিধা নেই? আজকালকার দিন, বাড়ি বেশী রাত পর্যন্ত চাবি দিয়ে রাখা ঠিক নয়। তাছাড়া গিয়ে নিজেকে রাঁধতে হবে তো?'

'ও' তুমি রাঁধতেও জান নাকি? বারে তাহলে তো এক দিন গিয়ে পড়তে হয়। তুমি তো বেয়ারা করবে না—

'এমনিই গিয়ে পড়ে খেয়ে আসব!'

'যাঃ, বেয়ারা করবো না কে বলেছে! বেশ তো, আসুন না রোববার দুপুরবেলা। ওখানেই খাবেন—!'

'না। রবিবার হবে না। জরুরী কাজ আছে একটা। মীটিং আছে ময়দানে। এমনিই একদিন গিয়ে পড়ব'খন।'

সে 'এমনি' টাতে যে দেরী ঘটবে না বিশেষ, তা অমিয়া জানত। দেরি হয়ও নি।

পিসী যেদিন গেছে তার পরের দিনই এসেছে, কোন এক বিলিতি ক্যাফানের হোটেল থেকে একরাশ খাবার নিয়ে। কিছু ফলও এনেছে। বলেছে, 'আজ আর তোমার রেঁধে কাজ নেই, অনেক খাবার আছে, বসে গল্প করো ততক্ষণ।'

তারপর চোঁক গিলে জিজ্ঞেস করেছে, এক 'ইয়ে' অর্থাৎ ড্রিঙ্ক করার অভ্যেস হয়েছে কিনা। তাও ঠিক আছে প্রদীপের সঙ্গেই। প্রমাণ স্বরূপ পকেট থেকে একটা চ্যাপটা বোতলও বার করেছে।

এ সবই জানে অমিয়া, তবু কৃত্রিম ধমক দিয়েছে, বোতল পকেটে পুরতে বাধ্য করেছে। তারপর চা করে এনে সত্যিই গল্প করতে বসেছে।

একথা সেকথার পর প্রদীপ চেয়ারটা টেনে কাছে করে বসেছে। একটা হাতের ওপর হাত রেখেছে ক্রমশঃ একটু চাপও দিয়েছে সে হাতে। তারপর—কোন কথা খুঁজে না পেয়ে বলেছে—'চলো সামনের হপ্তায় দুটো দিন ডায়মণ্ডহারবার ঘুরে আসি।'

চোখটা কি আশাতীত সাফল্য, অভাবিত সুযোগ পাওয়ার আনন্দে জ্বলে উঠেছে অমিয়ার? উঠলেও পাশে বসে থাকার জন্যে প্রদীপ অত লক্ষ্য করে নি। কিন্তু অমিয়া পরক্ষণেই মুখে হতাশার হাসি ফুটিয়ে বলেছে, 'সামনের সপ্তাহে আমাকে একবার গয়া যেতে হবে—আর কোন ছুটি নিতে পারব না এখন।'

'গয়া? সে কি? সেখানে কেন? সেখানে তো বুড়িরা যায়?'

'গয়ায় যাবো—' মুখ নামিয়ে গাঢ় কণ্ঠে অমিয়া

বলেছে, 'দাদা তো—মানে জানেন তো দাদা অপঘাতে মরেছে,—গয়ায় একটা পিণ্ডি দেওয়া দরকার।'

'তুমি এসব বিশ্বাস করো নাকি?' খুব একটা তাচ্ছিল্যের সঙ্গেই বলার চেষ্টা করেছে প্রদীপ, 'ছো:। তুমি না আধুনিক, লেখাপড়া জানা মেয়ে।'

বিশ্বাস তো করতুম না। আরও গলা নামিয়ে প্রায় চুপি চুপি বলেছে অমিয়া, 'আমি কাউকেই কিছু বলিনি এখনও, পিসীমাকে বললে তো জাঁতকে হার্ট ফেল ক'রে মরে যাবে—দাদা যে রোজ দেখা দিচ্ছে।'

সহজ হবার, উড়িয়ে দেবার সহস্র চেষ্টা সত্ত্বেও প্রদীপের গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। বলে, 'দাঃ! কী যা তা বলছ!···ও তোমার একটা বাজে ধারণা, কী দেখতে কী দেখেছো!···এখনকার দিনে ওসব—তুমি হাসালে এবার!'

'যদি আপনাকে দেখাতে পারি? এখন কটা? দশটা তো? আপনি আর আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করুন —সাড়ে দশটা নাগাদ আসবে।'

'আসবে মানে? এই ঘরে? ফ্লাটের মধ্যে?'

প্রদীপ প্রায় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, গলা কেঁপে যায়।

'না না। আমাদের এই ব্লকটার ওদিকে আরও আটটা ফ্ল্যাট তৈরী হচ্ছে না? নিচের তলা গুলো বালির কাজ হয়ে গেছে, ওপরেরও সব গাঁথুনি শেষ, সিঁড়িও হয়ে গেছে—শুধু বালির কাজ বাকি আছে। এখনও তারা বাঁধা। ওরই পিছনের একটা ফ্লাটের বারান্দায় রোজ আসে। এখনও প্যারাপেট গাঁথা হয়নি —ঐখানটায় এসে দাঁড়ায়।'

'তা তুমি ওখানে গেছলে কেন?' সন্দিগ্ধ কণ্ঠে বলে প্রদীপ।

'আমি কেন যাবো! গত সোমবার মনে নেই, সেই আপনার সঙ্গে সিনেমায় গেছলুম?—আপনি তো কেটে পড়লেন, আমি বাড়া একঘণ্টা বাসের জন্যে দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ট্যাক্সী করে বাড়ী ফিরলুম রাত সাড়ে দশটায়। অতরাত অবধি কেউ এখানে জেগে থাকে না, কোর্ট ইয়ার্ড একেবারে খালি—ঐ নতুন কনষ্ট্রাকশনটার ওখানে একটা দারোয়ান থাকার কথা—সে কোন দিনই থাকেন না, সেটার চাবি দিয়ে বাড়ি চলে যায়। হঠাৎ দেখি সেদিন ঐ সিঁড়ির মুখটায় সাদামতো কি! আর একটু এগোতেই দেখলুম মানুষ, মানুষ শুধু নয়—মনে হ'ল ঠিক দাদা।'

'তারপর?' রুদ্ধ শ্বাসে প্রশ্ন করে প্রদীপ।

'প্রথমটা ভয়ে পাথর হয়ে গিয়েছিলুম। গলা শুকিয়ে কাঠ, কাউকে ডাকব কি চেঁচাব সে শক্তি নেই। কিন্তু সেই সময়ই মেঘটা সরে গেল, সোজা চাঁদের আলোটা গিয়ে পড়ল—দেখলুম সত্যি সত্যিই দাদা, কোন ভুল নেই—হাতছানি দিয়ে আমাকে ডাকছে।···কী একটা হ'ল প্রদীপদা, আপনি বিশ্বাস করুন, মনে হল দাদা মরে নি—অনেকদিন পরে দেখা হবে তেবেই যেন সোজা এগিয়ে গেলুম। সিঁড়ির মুখে উঠে যেতে দেখি আগে আগে ওপরে উঠে যাচ্ছে, এবার অসুস্থ ভয় হবার কথা তো হ'ল না, যেন একটা ট্রান্সের মধ্যে দিয়ে উঠে গেলুম ওপরে। ঐখানে—পিছন দিকের ভারাটার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, 'বড় ভেষ্টা রে।'—পরিষ্কার সেই গলা। বললুম 'চলো না ওখানে জল খাবে।' ঘাড় নাড়ল, বলল, 'ও জল নয়।' তারপর বলল, 'এখানেই আসি রোজ, আসিস, দেখা হবে' বলে—যেন মনে হ'ল ও ধারের ভারা বেয়ে নেমে গেল।'

এবার অনেক সময় লাগল প্রদীপের। তবু তো মনে হ'ল কিছুটা নিশ্চিন্ত হয়েছে। আর কিছু ভাগ্যে বলেনি অমিয়াটা কিন্তু এতক্ষণ যে একটা শ্বাস রোধ করা আশঙ্কাবোধ করেছে—প্রতি মুহূর্তে—আগেকার ভূত দেখার আতঙ্কের চেয়েও এটা বেশী—তাতেই গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে কথা কইতে দেরি হচ্ছে।

অনেকক্ষণ পরে কোনমতে আবার ও প্রশ্ন করল 'তারপর?'

'তারপর আর কি।' আর আমার ভয় করে না। দুঃখই হয় বেচারীর জন্যে! রোজই যাই। ঐ এক কথা বড় ভেষ্টা। তাই ভাবছি, এ জল তো খেতে পারবে না

—ওখানেই জল দিয়ে আসি। জিজ্ঞেসও করেছি, পরার যাবো? ঘাড় নেড়েছে।'

একটু উশখুশ ক'রে প্রদীপ উঠে দাঁড়ায়, 'আমি আজ যাই তাহলে কী বলো?' যে স্বপ্নটা দেখেছিল, কল্পনায় যে আশা স্বর্গে যাওয়ার ছবি দেখেছিল সেটা কোন এক অপরীক্ষিকর প্রসঙ্গের ধাক্কায় নষ্ট হয়ে গেল।

'ও কি! এখনই যাবেন কি? না না, প্রদীপদা, প্লীজ!' অমিয়া এসে ওর একটা হাত চেপে ধরে। নিজেই আজ বড় কাছে এসে দাঁড়ায়। বুকটা প্রদীপের বাহুতে ঠেকতে কোন বাধা নেই—এত কাছে। ওর গরম নিঃশ্বাস এসে লাগে প্রদীপের গলায়। চোখ দুটোতেও যেন স্পষ্ট আমন্ত্রণ।

অমিয়া বলে, 'আজ পিসীমা নেই বলেই বোধ হয় একটু ভয় ভয় করছে। আর একটু থেকে যান।—চলুন ওখানটা সেরে আসি বরং? তারপর আর একটু বসে যাবে না পারারও তো খেলেন না—'

আবারও একটা কটুভিক্ত স্বাদ অমৃতের সঙ্গেই।

'তা ওখানে না-ই গেলে আজ।' কেমন অসহায় দুর্বল কণ্ঠে বলে প্রদীপ, 'রোজ যেতেই হবে তার মানে কী?'

'না না, আমাকে একসপেক্ট করবে বেচারী। ওর আর কি আছে বলো, এই যা একটু এক মিনিটের দেখা।

কেন, তোমার কি ভয় করছে নাকি? তুমি তো এসব বিশ্বাস করো না, আজকালকার ছেলে!—তা আমরা তো দুজনে যাচ্ছি। দুজন থাকলে কারুরই ভয় করবে না। চলো, লক্ষ্মীটি।'

এই প্রথম তুমি বলল অমিয়া।

শুধু তাই নয়, এবার স্পষ্টই ওর হাত জড়িয়ে হাতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়েছে, যাতে বুকের চাপ অনুভব করতে পারে প্রদীপ।

স্বপ্ন আর স্বর্গ এমন ভাবে সামনে এসে ধরা দিলে কোন অল্প বয়সী ছেলে প্রত্যাখ্যান করতে পারে?

মাত্র পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়স প্রদীপের।

'চলো' বলা ছাড়া উপায় থাকে না। শুধু এবার সেও একটা হাত বেড় জড়িয়ে ধরে অমিয়াকে, বুক দিয়ে বুকের স্পর্শ অনুভব করে।

ফ্ল্যাটে চাবি দেওয়া গেল না। চাবি দেওয়ার উপায় নেই। দুজনেই আস্তে আস্তে নেমে এল।

অন্য ফ্ল্যাটের দরজা অনেকক্ষণ বন্ধ হয়ে গেছে। সিঁড়িতে কেউ নেই। আলোও নেই। প্রদীপের পায়ে হাওয়াই চপ্পল অমিয়ার বাড়িতে পরার বাথ স্লিপার। দরজার কাছে এসে প্রদীপ অমিয়াকে একটা চুমু খেতে গেল, সেই সময়ই অমিয়ার মাথা হেলিয়ে কী একটা দেখার প্রয়োজন হ'তে ঠোঁটে বা গালে লাগল না—চুমুটা এসে পড়ল দাড়ে, তা হোক—অমিয়ার যে কোন আপত্তি নেই জানা গেল—সেইটেই লাভ।

নিঃশব্দে কোট ইয়ার্ড পেরিয়ে এসে নতুন বাড়ির সিঁড়ি ধরল। ওপরেও উঠল একসময়।

'কে?' চুপি চুপি প্রশ্ন করল প্রদীপ।

তর্জনী সঙ্কেতে শব্দ না করার ইঙ্গিত জানিয়ে—নিজের দেবভোগ্য দুল'ভ ঠোঁট দুটি ওর কানে লাগিয়ে অমিয়া বলল, এখনও তো সাড়ে দশটা বাজে নি। ঠিক সাড়ে দশটায় আসবে। এইখানটায় দাঁড়ায় এসে—'

এই বলে ওর হাত ধরে মৃদু আকর্ষণ ক'রে ভাঙাটার দিকে নিয়ে যায়। ওভাবে নরকে নিয়ে গেলেও যেতে পারে প্রদীপ। এই দুর্লভ সৌভাগ্য অনুভব করতে করতে সত্যিই স্বপ্নাবিষ্টের মতো এগিয়ে যায় সে। একেবারে কাছে গিয়ে বলে, 'এই ভাঙা বেয়েই যেন নেমে যায় রোজ। কেন বলো দিকি? ওদের তো সিঁড়ি লাগবার কথা নয়। এই যে ভাখো, এই যে ভাঙাটা—'

স্বপ্নাবিষ্টের মতোই হেঁট হয় প্রদীপ।

সামান্য মৃদু একটা ঠেলা—বুঝতেও পারে না সে, কেমন ক'রে নিচের জড়ো করা আধ ভাঙা ইটগুলোর ওপর এসে পড়ে—

তরতর ক'রে ভাঙা বেয়ে নেমে আসে অমিয়া।

জড়ো করা ইটের ওপর পড়লে খুব একটা আওয়াজ হবে না-সে জানত। হলেও—দুটো ব্লক পেরিয়ে গিয়ে

ও দিকের ফ্ল্যাটে পৌঁছাবে না। কিছু শব্দ কানে গেলেও দূরাগত শব্দ শুনে কেউ উঠে হাঁক ডাক বোঝ খবর শুরু করবে না। এ পাড়ার দুর্নাম সর্বজন বিদিত, দুটো টাকার জন্যেও অনেক সময়—খবরের কাগজের ভাষায় একদল "নামহীন এক দল লোকের" সামনে পড়তে হয়।

তখনও প্রাণ আছে দেখা গেল, গোঙাচ্ছে।

কোমর থেকে ছোট্ট পেন্সিল কাটা ছুরিটা বার করে অদিয়া, তারপর অব্যর্থ লক্ষ্যে ঘাড়ের কাছে বিঁধিয়ে দেয়, ডাক্তারী বই ঘাঁটতে আর গোয়েন্দা কাহিনীর কল্যাণে এটা শিখেছে সে। এইখানে একটা নরুণ বিঁধিয়ে দিলেও তৎক্ষণাৎ মরে মানুষ, আর্তনাদেরও ক্ষমতা থাকে না লোকটার।

তার আগে শুধু কানে কানে বলে মৃত্যুর প্রতিশোধ, তেনতেটা।' যদিও জানে জ্ঞান থাকলেও এ কথার অর্থ বুঝত না।

ছুরিটা বাঁটসুদ্ধ নরম মাটিতে পুঁতে রক্তের দাগ মুছে করে, তার পর আবার কোমরে গুঁজে প্রদীপের মৃতদেহটা সরাবার চেষ্টা করে

এখানে রাখলে চলবে না। যেমন করেই হোক বড় রাস্তায় নিয়ে যেতে হবে সনাক্ত করার উপায় বোধহয় থাকবে না, এ পাড়ায় প্রহরে প্রহরে এখনও শিয়াল ডাকে, খুব কাছে থেকেই ডাকে। চোখ মুখ আগেই খুবলে যাবে। কিন্তু এখানে থাকলেই এই রক্তগুলোর ওপর সন্দেহ হবে।....

কাজটা খুব কঠিন হবে ভাবেনি অদিয়া

ঐ তো রোগারোগা চেহারা, টেনে নিয়ে যেতে পারবে না—খুব পারবে। কিন্তু টানতে গিয়ে দেখল বিষম ভারী। হাড় চওড়া বলেই বোধ হয় এত ভারী ইটের স্তূপ থেকে নামাতেই ও ঘেমে নেয়ে উঠল। বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটতে লাগল কে তারপর আর একপাও নড়াতে পারল না

অথচ, না পারলেও চলবে না। জীবন মরণের প্রশ্ন।

একটা খুনীকে খুন করে ফাঁসী যেতে পারবে না সে। তাহ'লে আর প্রতিশোধ হ'ল কি ?

প্রাণপণেই টানে। এ কী হ'ল। এ কি দুজন না তিন জন ওজন ওর। আমার ইট বেধে যায় নি তো ওর ? তবে সে বাধলেই বা কথানা ?

আরও, আরও—

ওর মধ্যেই মনে পড়ে—কখনও কিছু বওয়া, ভারী কোন কাজ জীবনেই করে নি। সব হিসেব নিকেশ করেছে—এই হিসেবটা ধরে নি।

আশ্চর্য। এক সময় যেন হঠাৎই সহজ হয়ে গেল কাজটা। ইটই আটকে ছিল বোধ হয় এতক্ষণ। সে বোকা। সেইটেই দেখা উচিত ছিল আগে। এত সহজ হয়ে গেল কাজটা, মনে হল যেন আর কেউ ধরেছে। কোমরের দিকটা ওর কোন ভারই লাগছে না। যেন তুলে নিয়ে যাচ্ছে লাশটা আর কারও দয়ে—

কেমন একটা খটকা লাগল। ভয়ও হল একটু। পুলিশ টুলিশ কি অন্য কেউ নয়ত ? কিন্তু তখন আর অত ভাববার সময় নেই। কোন মতে বড় রাস্তায় নিয়ে যেতে হবে সেই চিন্তা।

দুহাতে প্রদীপের দুটো বাহুমূল ধরা, তার মধ্যে ঘাড় ঘুরিয়ে রাস্তা দেখতে দেখতে পিছু হেঁটে যাওয়া—অন্যদিকে তাকানোও সম্ভব নয়।

বড় রাস্তায় পড়ে মড়াটা ফেলে প্রথম এদিকে ফিরল। এবং—

সত্যিই মেঘ সরে গিয়ে সে সময় খানিকটা চাঁদের আলো এসে পড়েছে, সেই আলোতে স্পষ্ট দেখল, ওর সঙ্গে সঙ্গেই যে লাশটা বয়ে এনেছে, এখনও সত্যিসত্যিই কোমরের কাছে হাতটা লাগানো—সে ওর দাদা অমল !

ভয়ে পাথর হয়ে যাওয়া কি একেই বলে ?

ভয়ই বা কেন ! ওতো দাদা।

আপন দাদা, অমল।

সম্ভাষণ জানানোই তো উচিত বরং। স্বাগত জানানো !

কিন্তু কৈ, সে তো আর নেই তো।...একি, এই তো ছিল।

শুধু ভয়ে, দুর্বলতায়—বুকের অতিরিক্ত দ্রুত স্পন্দনে একবার চোখ বুজেছিল। এক সেকেণ্ড।

একবার সেই নবনির্মিত সুপ্রশস্ত রাজপথের দুদিকে চাইল। সম্পূর্ণ জনহীন। একটা কুকুরও নেই কোথাও।

না কোথাও কেউ নেই। যে গলি জায়গাটা থেকে লাশটা নিয়ে এল—সেখানেও না।

আর দাঁড়াতে পারল না। পা চলছে না, হয়ত সারা দেহটা পাথর হয়ে গেছে, বুকের শব্দে মনে হচ্ছে এখনই হার্টফেল করবে—শুধু ছুটল সে, যেন নিজেকেই নিজে চাবুক মেরে।...

দোতলায় উঠে—ফ্ল্যাটের দরজাটা খোলা—শুধু আলো জ্বলছে দেখে একটু যেন প্রকৃতিস্থ হয়েছে।

তারপর ভেতরে ঢুকে সব কটা আলো জ্বেলে দিয়েছে, আর একটু সামলে নিতে পেরেছে তাতে।

একটুখানি দাঁড়িয়ে দম নিয়ে বাথরুমে ঢুকেছে। দাড়ি জামা ছুরি সব বার করে বড় বালতির জলে ডুবিয়ে তাতে ব্যাসিড ঢেলেছে. স্নান পরিষ্কার করা ব্যাসিড। সব কাজই করে গেছে সে, যেমন ভেবে রেখেছিল—যেমন হিসেব করা ছিল। কোথাও কিছু ভুল হয় নি।

নিজে স্নান করার সময়ও—জলের না বেশী শব্দ হয়, দৈবাৎ পাশের ফ্ল্যাটের কেউ বাথরুমে এলে না শুনতে পায়—সে কথাও মনে রেখেছে, আস্তে জল ঢেলেছে।

খাবারগুলো জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছে একটা একটা করে। অনেক বেড়াল শেয়াল আছে—তারা খাবে। তারপর চা তৈরী করে খেয়ে তিনটে ঘুমের ওষুধের বড়ি খেয়ে শুয়ে পড়া—কোন কাজেই কোন দুর্বলতা কি অস্থিরতা প্রকাশ পায়নি। সব ঠিক ঠিক করে গেছে।

কিন্তু তারপর থেকে একি হ'ল ? এই একটা অকারণ ভয়, একটা আতঙ্ক—নামহীন আকারহীন—এইটে কিছুতে দমন করতে পারছে না যে।

কোথাও যদি কেউ থাকত, দুটো দিন গিয়ে থেকে আসবার মতো ! কিম্বা পিসীই যদি হঠাৎ এসে পড়ত।

অন্তত ঐ শেয়ালে খাওয়া বেওয়ারিশ লাশটা সরিয়ে নিয়ে যেত ওরা।

তাসের ঘর

—শক্তিপদ রাজগুরু

বিজয়বাবু কথাটা শুনে স্তব্ধ চাহনি মেলে চেয়ে থাকে। ওর মুখচোখে বয়সের ছাপটা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। চোখের চাহনিতে এসেছে ঘোলাটে অন্যমনস্ক আভাস।

বিজয়বাবুর জীবনে প্রায় সত্তরটা বছর কোনদিকে কখন পার হয়ে গেছে তার হিসাবও করতে পারেন না। এতদিন শুধু একটা স্বপ্নের মধ্যে বেঁচেছিলেন, বিগত বেশ কয়েকটা বছর যেন আর কাটতে চায় না। তার সব চিন্তা ভাবনা মানসের উপর জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছে। সেই গুরুভার আর অসংলগ্ন ভাবনাগুলো হয়তো অর্থহীন। কাউকে বলতেও পারেন না। ওরা শুনে হাসবে।

মন্থ শুনলে বলবে—দাদুর ভীমরতি ধরেছে।

একমাত্র তার ভরসা ওই দিনেশের উপরই। দিনেশ যেন তারই যৌবনের প্রতিমূর্তি, সেই ছাপ—সেই কাঠিন্য আর হারানো বন্ধুটাকে যেন খুঁজে পেয়েছেন বিজয় বাবু দীর্ঘ এতগুলো বছর পর ওই বলিষ্ঠ তরুণের মাঝে।

সারা শহরটা জ্বর জ্বর করছে কি নীরব উত্তেজনায়। গোলমাল মাঝে মাঝে বাধে, কোথায় রাতের অন্ধকারে কলরব শোনা যায়। বাজারের মানুষ হঠাৎ যেন জেগে উঠেছে।

বিজয়বাবু বড় একটা বেরোন না।

এককালে পথেই ছিল তার ঘর। দুরন্ত যৌবন তাকে ঘরছাড়া করেছিল। কলকাতা চন্দননগর-মেদিনীপুরের অন্ধ প্রতান্তে ঘুরতেন। রাতের অন্ধকারে সজাগ প্রহরীর মত। কাঁসাই নদীর ধারে ঘন শাল বনের মাঝে রাতের অন্ধকার নামতো। চারিদিকে ঘুম ঢাকা জগৎ। দূর গ্রামের মানুষ নিদ্রামগ্ন, ওদের চোখে ঘুম নেই।

মেদিনীপুরের মাটি থেকে বিদেশীদের লোভী থাবালো থাবাটাকে তারা উৎখাত করবে। জন্মিরামের মাটিতে তাদের ঠাঁই হবে না।

তাই একটার পর একটা আঘাত হেনে চলেছে তারা।

বিজয় বাবুর চোখের সামনে সেই দিনের ছবিগুলো যেমন উজ্জ্বল হয়ে ভেসে ওঠে। আজ দীর্ঘ বছরগুলোর পরেও সেই অতীতের নীরব সাক্ষী হয়ে আছেন তিনি।

কার পায়ের শব্দ ওঠে। সাবধানী কান, এটা আরও সতেজ ছিল সেই অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কাছে। আজও তার কিছুটা রয়ে গেছে।

নীচে গাড়ির ইঞ্জিনের শব্দ উঠে। ড্রাইভার গাড়িটা গ্যারেজ করছে।

—দীপেন ফিরেছো নাকি ?

বাবার ডাকে দীপেন বাবু জানায়—হ্যাঁ। কি সব গোলমাল হয়েছে নোতুন পাড়ার দিকে। ওদিকে মিলের লোকজন তাই চলে যেতে চাইল।

এ ভাবে চললে কাজ-কারবার বন্ধ করে দিতে হবে।

দীপেন বাবু এখন শহরের অন্যতম বড় কারবারী। বিজয়বাবু বাড়ি ছেড়ে গেছলেন ওই রাজদ্রোহীর ভূমিকা নিয়ে। সংসার তাকে বাঁধতে পারে নি।

তবু বাঁধা ছিলেন ছোট খাটো খেলো জমিদার। আয়ার, উত্তল কিছু হতো।

নিজের ক্ষেত জমি ছিল।

পলাতক ওই ছেলেকে ঘরবাসী করাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিজয় সেদিনও ধরা দেয় নি।

সেবার রংপুরে ধরা পড়ে বেশ কয়েক বছর জেল খেটে বাড়িতে অন্তরীণ হয়ে এলেন। থানা থেকে কড়া নজর রাখা হোতো। নির্দিষ্ট এলাকার বাইরে যাওয়া নিষেধ। ছেলেপুলেদের সঙ্গে মেলামেশা করাও বারণ।

সেদিন ওই আধাবন্দী জীবনে মুক্তির স্বাদ এনেছিল ওদিকের মিত্তিরবাড়ির প্রতিমা। তখন মেয়েদের স্কুল কলেজে

যাবার এত রেওয়াজ ছিল না। কিন্তু প্রতিমা ছিল তার ব্যতিক্রম। ওর বাবা মাও ছিলেন উদার-পন্থী। বাবা ডাক্তার। প্রতিমা তাই কলেজে যাবার সুযোগ পেয়েছিল।

এ বাড়িতে ও আসতো। ডাক্তার কালো চোখ মেলে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখতো তরুণ বিজয়কে। বিজয়ের অবশ্য অবসর। মনে হয় তাকে এমনি খাঁচায় পুরে আটকে রেখে ওরা তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেবে।

প্রতিমা বলে, তোমাকে ওরা ভয় করে।

বিজয় হাসে—ওরা কেন? অনেকেই ভয় করে। ধরো তুমিও—

—ধ্যাৎ! আমার ভয় করবে কেন?

বিজয়ের কাছে ওই হাসিটা কি যেন সাড়া আনে। চমকে ওঠে সে। তাদের জীবনে ওই সুরের কোন স্পর্শ থাকতে নেই। বিপ্লবী বিজয় বোস মরে যায় নি। তাই প্রতিমাকেও এড়িয়ে থাকতে চায় সে। বলে—

—এখানে যাতায়াত করো, আমার সঙ্গে কথা বলো জানতে পারলে পুলিশও নাজেহাল করবে তোমায়।

—ইস্! প্রতিমা মুখর হয়ে ওঠে বাঁধভাঙা কর্ণার জলস্রোতের মত।

বিজয় ওকে বোঝাতে পারে না যে তার জীবনে প্রতিমার কোন ঠাঁই নেই।

…সেদিন আকাশ ছেয়ে বৃষ্টি নেমেছে। বিজয় দেখছে খবরের কাগজে কি চাঞ্চল্যকর সংবাদ। মেদিনীপুরের সেই প্রাণশক্তিকে নিষ্ঠুর শাসন দিয়েও ইংরেজ সরকার শেষ করতে পারে নি।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পেডি বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত। তার ঢেউ এসে লেগেছে এই শহরেও। দু'এক জায়গায় থানা তল্লাসীও হয়ে গেছে। বিপদে পড়েছে বিজয়। এর মধ্যে গোপন যোগাযোগও সুরু হয়ে গেছে। তার কাছে কিছু কাগজপত্র-বইও এসেছে। দু'খানা চিঠিও রয়েছে। সেগুলো যদি কোনরকমে পুলিশের হাতে পড়ে বিজয়ের বিপদ তো হবেই, দলেরও সমূহ বিপদ।

…বৃষ্টি-ঝরা রাতে কাকে ওই বৃষ্টির মধ্যে ভিজে আসতে দেখে চমকে ওঠে বিজয় বাবু—তুমি!

প্রতিমার সারা মুখে চোখে কি উত্তেজনার ছাপ। প্রতিমা বলে—

—এখানেও পুলিশ আসবে খবর পেলাম, আজ রাতেই।

চমকে ওঠে বিজয়। ঠিক বিশ্বাস তবু করতে পারে না প্রতিমাকে। বিপ্লবীদের এই মন্ত্রগুপ্তি সংজ্ঞাত। প্রতিমা বলে ওঠে—

—কাগজপত্র অন্য কিছু থাকে তো দিয়ে দাও, বের করে নিয়ে যাচ্ছি। জানলা দিয়ে দেখা যায় পুলিশের গাড়ি যেন এই দিকেই আসছে। বিজয় ঠিক তবু ভরসা করতে পারে না।

—প্রতিমা!

প্রতিমাও বুঝেছে ব্যাপারটা। তাই বলে—

—এখনও আমাকে বিশ্বাস করতে পারো নি তুমি? এত বড় বিপদে কোনও—

বিজয় ওকে দেখছে। প্রতিমার দু'চোখে জল ছেয়ে আসে।

হয়তো অনেক স্বপ্নই দেখেছিল সে।

বিজয় বলে, তোমাকে যদি ধরে ফেলে?

ধরবে না। আর যদি ধরে সব দায়িত্ব আমার। প্রতিমা স্পষ্ট সতেজ কণ্ঠে জানায়।

বিজয়বাবুর চোখের সামনে সেদিনের প্রতিমার দৃপ্ত ছবিটা জেগে ওঠে। একটি মানুষকেই ও সেদিন ভালোবেসে এই আত্মত্যাগ করতে আসেনি। তার পিছনে আর মহৎ আদর্শের প্রতি ছিল সেদিনের ছেলেমেয়েদের নিবিড় শ্রদ্ধা। তাই সব বিপদ বরণ করে তারা এগিয়ে এসেছিল সেদিন বিজয়কে বাঁচিয়েছিল এই মেয়েটিই।

তাই প্রতিমা তার জীবনে আসেনি। দুজনে কোন এক উদার স্রোতে হারিয়ে গেছল। বিজয়বাবুও সেই অন্তরীণ অবস্থা থেকেই একদিন উধাও হয়ে গেছলেন।

তারপর কয়েকবছর কেটে যায় বন্ধা বন্দী নিবাসে। ধরা পড়ার পর বৃটিশ সরকার তাকে ছাড়তে আর চায় নি। অনেক মামলার আসামী করে শুধু জেলখানের মেয়াদই বাড়িয়ে চলেছিল।

...বাবা...

দীপেনের ডাকে বিজয় বাবু চাইলেন, দীপেন আজ শুছিয়ে নিয়েছে। বিজয়বাবু নিজে কিছুই চাননি কোনদিন। স্বাধীনতা আসার পর ওঁর বন্ধুরা বলেছেন দেশের কাছে নামো। কিন্তু বিজয়বাবু এড়িয়ে যান। তিনি বলেন—

—যেদিন দরকার ছিল করেছি। আজ জনসাধারণের কাছে কাঙ্গালীর মত ভোট দাও ভোট দাও বলে ঘুরতে পারবো না। আমাদের কাজ ফুরিয়েছে, এবার নোতুনদের আসতে দাও।

বিজয়বাবু নিজেই সরে এসেছিলেন। কোনকিছু পাবার আশা নিয়ে সেদিন ওই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নেননি, সর্বস্বত্যাগ করে এগিয়ে আসেন নি, এসেছিল নিঃস্বার্থভাবে দেশের মঙ্গলের জন্য—স্বাধীনতার জন্য।

দীপেন তখন কলেজে পড়ছে, দীর্ঘদিন জেলে থাকার পর ফিরে এসে সেই ছেলেটাকে দেখে চেয়ে থাকেন বিজয়বাবু—ছোট ছেলেটা এখন অনেক বড় হয়ে উঠেছে, চেনা যায় না।

বাবা মার ছেলের মধ্যে গড়ে উঠেছে অচেনা একটা ব্যবধান আর একজন তার আগেই চলে গেছে। বিজয়বাবু জেলে বসেই স্ত্রীর মৃত্যু-সংবাদ শুনেছিলেন।

দীপেনের বাবাকে মনে পড়ে না। মায়ের ছবিটাও অবচ্ছা হয়ে এসেছে দিন মাস বৎসরগুলো পার হয়ে গেছে, একটি কিশোরের সামনে সেই জগৎটা অনেক বিকৃত বেদনায় কালো হয়ে গেছে, কোনো আশা নেই আশ্বাস নেই।

মা হারা বাবার পর কাকার আশ্রয়ে পড়ে আছে দীপেন। পদে পদে সেখানে অবহেলা আর অপমান সয়েছে, তবু চেষ্টা করেছে তাকে পাশ করতে হবে। এতবড় পৃথিবীতে সে একা।

তাই মনের অতলে একটা রাগই জমে উঠেছে বাবার উপর। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি অনেককিছু করেছেন, কিন্তু দীপেনের জন্য কিছুই কর্তব্য করেননি।

তাই দীপেনের মনে জমেছে অনেক কিছু পাবার লোভ আর লালসা। তার বঞ্চিত অপমানিত মন যতই অবহেলা আর অনাদর পেয়েছে ততই সে স্বার্থপর আর আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে।

তাই বাবাকে ফিরে আসতে দেখে মনে হয় দীপেনও যেন তার থেকে আরও দূরে সরে গেছে।

বিজয়বাবু সেই দূরত্ব আর পরিবর্তনটা যে কতো গভীর তা অনুমান করতে পারেন না।

ফিরে এসে ছত্রভঙ্গ সংসারের অবস্থাটা তিনি কিছু ফেরাবার চেষ্টা করেন মাত্র। বাকীটা গুছিয়ে নেবার কাজে এগিয়ে আসে দীপেন।

সেইই কোন এক অবাঙ্গালী বন্ধুর সঙ্গে ওই ধানকলের পত্তন করে। অবশ্য বিজয়বাবু ক্রমশঃ ওদের উদ্দেশ্যটা বুঝে চমকে ওঠেন। দীপেন বলে—

—মতিরামই বেশী টাকা দিচ্ছে। তুমি শুধু তোমার চেনা জানা মন্ত্রীকে একটু বলে দাও, লাইসেন্সটা আমার নামে করে দিক্।

সেই মন্ত্রী বিজয় বাবুর বন্ধু লোক। এক সঙ্গে বিপ্লবীদলে ছিলেন। জেলবাসও করেছেন। তবুও এনিয়ে কিছু বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন বিজয়বাবু। উনি জানান—

—কিন্তু কি ভাববেন তিনি?

দীপেন অবাক হয়ে বলে, আমার জন্য এটুকুও করতে পারো না? এই আশা নিয়েই মতিরামজীকে এই পথে আনলাম।

দীপেন অনুযোগ করে—কোনদিন আমার কথা ভেবেছো তুমি? কেউ তোমার আপন নয়। ঠিক আছে।

বিজয়বাবুর জীবনে এই অভিযোগ বারবার এসেছে নানা দিক থেকে। তবু তিনি অবাক হয়েছিলেন মাননীয় মন্ত্রী তাঁর ছেলের জন্য এটুকু করে দিয়েছিলেন। হয়তো বন্ধুকৃত্যই করেছিলেন তিনি।

...দীপেনের ভাগ্যের চাকাটা ক্রমশঃ ঘুরে গেছে। ধাপে ধাপে উপরে উঠেছে সে। আজ শহরে ধানকল, অয়েল মিল-এর মালিক। নোতুন একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কার্মও করবে।

তার ছেলে দিনেশকে তাই ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করিয়েছে। বিজয়বাবু নিজেই লজ্জা পান। লোকেও বলে—

বিজয়বাবুর উপর মহলে খুব জানাশোনা আছে, তাই ভাগিয়ে দীপেনবাবু এখন এসব করে নিয়েছেন।

বৃদ্ধ তাই ছেলের ব্যাপার থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে এনেছে। এত পাওয়ার স্বপ্ন তিনি দেখেন নি।

বরং এই নিয়ে ছেলের সঙ্গেও বাধে। মনের অমিলটা তাতে বেড়ে ওঠে।

বিরাট বাড়িটা করেছে দীপেনবাবু। সাবেকী আমলের পৈত্রিক বাড়ির লাগোয়া বেশ খানিকটা বাগানসহ ছিল। সেটাকে নির্মূল করে সেখানে তিন-মহলা বাড়ি তুলেছেন। নীচের বিরাট ঘরগুলো বোধহয় এমনিই পড়ে আছে। ওদিকে দরী গাড়িগুলো থাকে।

বিজয়বাবু তখন মাঝে মাঝে সহরের এই নদীর ধারের পথ দিয়ে বেড়াতে বের হতেন। আর পরিবর্তনটা চোখে পড়ে তখনই। আগে তিনি ছিলেন তাঁদেরই একজন। সহরের মানুষ তাঁর দিকে শ্রদ্ধাবনত ভাবে চেয়ে থাকতো। কেউ নমস্কার করতো। তিনিও হেসে কথা বলতেন। সুখদুঃখ সংবাদ নিতেন। একটা আন্তরিক যোগাযোগ ছিল।

হঠাৎ সেই সহজ মধুর সম্পর্কটা কোথায় যেন ছিন্ন হয়ে গেছে।

বিজয়বাবুও দেখেছেন হঠাৎ কোথায় একটা অন্ধকার মেঘ ঘনিয়ে আসছে। তাদের জেলায় পর পর দুবছর ধরে চলেছে অজন্মা। মাটি এখানে এমনিতেই বন্ধ্যা। লাল কপিশ প্রান্তরে তপ্ত রোদের শিখা যেন সব কিছু সবুজকে পুড়িয়ে চলেছে। তামাটে শুষ্ক দিগন্ত বেয়ে বুভুক্ষু মানুষের দল কাতারে কাতারে গ্রাম ছেড়ে সহরের দিকে ভিড় করেছে।

ওই নদীর ধারের ছায়াঘন নির্জন রাস্তাটার দু'দিকেও তাদেরই ভিড় জমেছে। ওরা অনাহারে নিশ্চিত মৃত্যুর দিন গুণছে। ছোট ছোট বাচ্চাগুলো সহরের পথে ঘাটে আর্তনাদ করে ফেরে একটু ফ্যান-এর আশায়।

চমকে ওঠেন বিজয়বাবু। এই দৃশ্যের কল্পনাও তিনি করেন নি। তাই সেদিনের সেই বিপ্লবীমন হঠাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল।

স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা বের হয়েছে রিলিফ-এর কাজে। ওরা সাহায্য চাইছে পথে। সকলের কাছে। বৃদ্ধা বিজয়বাবু দেখেছেন তার নাতি ওই দীপেনের ছেলে দিনেশকেও ওদের দলে। মেয়েরাও আজ এগিয়ে এসেছে এই কাজে।

বিজয়বাবু বলেন—এভাবে বাঁচার কথা আমাদের নয় দিনেশ, ওই মানুষগুলোরও ভালো ভাবে বাঁচার দাবী আছে আজ স্বাধীন দেশের মাটিতে।

ছেলেরা চমকে ওঠে, তা তো আছে দাদু। কিন্তু কাকে সে কথা বলবো?

বিজয়বাবু জানান—দেশের মানুষকে। আজকের সরকারকে সেই কথাটা জানাতে হবে। তাই বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বের হয়েছিলেন। তাঁর প্রদীপ্ত তেজের শেষটুকু দিয়েও তিনি আবার এই কাজে এই তরুণদের সাহায্য করেছেন।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেটেরও একটু টনক নড়ে। বিজয় বাবুকে তিনিও সমীহ করেন। তাই রিলিফের কাজ সুরু হয়ে যায়।

দীপেন বাবার এই কাজে বিরক্ত হয়। তাঁর তখন চাদু কারবার। দিনরাতও সময় নেই। ওরই মাঝে একদিন রাতে বাড়ি ফিরে দীপেনবাবু বাবাকে বলে—

—এসব কি করছেন বাবা? আর আপনার উসকানিতে দিনেশও পড়াশোনা ছেড়ে এই হৈ-চৈ-এর ব্যাপারে মেতেছে। আজে বাজে ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মিশে কোথায় থাকে—কি করে জানি না। এসব নাই বা করলেন।

বৃদ্ধ বিজয়বাবু ছেলের দিকে চাইলেন। আজীবন এই অকাজই করেছেন। আজ ওই দীপেনের স্বার্থপর মনটাকে তাই তিনি ঘৃণা করেন। বলেন—

—এ বিষয়ে পরামর্শ দিও না দীপু। আর দিনেশের কথা বলছো? ওর বয়স হয়েছে। লেখাপড়া শিখেছে। ওকে ওর ভালোমন্দ বুঝতে দাও।

দীপেন বাবার কথায় খুশী হয় নি।

হঠাৎ বিজয়বাবু সেদিন চমকে ওঠেন। এসব

বলা ভাবতেও পারেন নি তিনি। দীপেন যে এমনি একটা অঘন্য কাজ করতে পারে তা কল্পনাও করেন নি। আর সেইটা তাঁর চোখের সামনে ধরা পড়ে যেতে তিনি প্রতিবাদ করেন।

নোতুন বড় বাড়ির একতলায় বিরাট গুদামে রাতের অন্ধকারে গাড়ি ট্রাক আসে। আর কি মালপত্র তারা নিয়ে যাতায়াত করে সেইটা ধরে ফেলেছেন তিনি। বড় বড় গুদামে চালবন্দী চালের বস্তা সাজানো। হাজার হাজার মন চাল আটকে রেখেছে দীপেন। আর মানুষের মুখের অন্ন কেড়ে নিয়ে এমনি ভাবে অন্ধকার পথে টাকার পাহাড় বানাবার স্বপ্ন দেখে দীপেন। সহরের সে মান্যগণ্য ব্যক্তি।

অনেক প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার।

বিজয়বাবু এই নীচতা আর স্বার্থান্ধ তপ্তামি দেখে মুখের উপর দীপেনকে জানান, এ তোমার অন্যায়। ঘোরতর অন্যায়।

দীপেন বিরক্ত বোধ করে। বাবার সেকালের দর্শন—সেই দেশ সেবার ধারণাটা কবে বদলে গেছে ওই বাড়িল বৃদ্ধ আজ তা জানে না। দীপেন একটু কঠিন স্বরে জানায়,

—তুমি ওখানে কেন গিয়েছিলে?

—তার জন্য আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে তোমার কাছে? বিজয়বাবু জানাবার চেষ্টা করেন। দীপেন বাবু ওই বৃদ্ধের দিকে চেয়ে থাকে। অবাক হয়েছে সে। বিজয়বাবু বলেন—

—ওই চাল তোমায় সরকারের হাতে তুলে দিতে হবে ন্যায্য দামে। আটকে রাখতে পারবে না।

বৃদ্ধ জানাচ্ছেন কঠিন স্বরে।

দীপেন আজ দেখেছে ওর চোখে ঘৃণার জ্বালা। ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে তারই সন্তান দিনেশ। দিনেশও দেখেছে তার বাবার এই মনোবৃত্তিটা। আজকের বলিষ্ঠ তরুণ মন যারা নোতুন করে দেশকে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখে ও তাদেরই দলে। তাই বাবার এই স্বার্থপর নীচতাকে ঘৃণা করে সে।

দীপেনবাবু আজ টাকার জোরে অনেক মানুষকে মতো পরিণত করতে পারেন। তিনি দেখেছেন আজকের সমাজের এই ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা। তাই বাবার কথায় বলে সে, কি করবো না করবো সেটার ভার আমার উপরই থাক। আপনি এ বিষয়ে কথা বলবেন না?

বিজয়বাবু ওর ধৃষ্টতায় চটে উঠেছেন। এক দিন লোভী ইংরেজের মদমত্ততাকে তাঁরা চূর্ণ করে দিতে চেয়েছিলেন। আজ তাদের লোভ আর লালসাটা যেন তাঁর ছেলের মুখেই ফুটে উঠেছে। বিজয়বাবু বলেন কঠিন স্বরে,

তাহলে ব্যবস্থা আমাকেই নিতে হবে। যত কঠিনই হোক তাই আমি নেব দীপেন।—আজীবন সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে এসেছি। আজও করবো।

বৃদ্ধের স্তিমিতপ্রায় শিরায় কি চকল রক্তস্রোত বয়ে যায়। দীপেনবাবু স্থির কণ্ঠে জানান।

—তার ব্যবস্থাও করবো বাবা। আপনাকে অ-প্রকৃতিস্থ বানিয়ে পাগলা গারদেই বাস করতে হবে হয়তো।

বারুদের স্তূপে যেন আগুনের ফুলকি পড়েছে। তেমনি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়েন বিজয়বাবু। তাঁর জীর্ণ শরীরটা কেঁপে উঠে—দীপেন!

সব বিশ্বাস সব ভালোবাসা কোন অতলান্ত অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। কাঁপছেন তিনি—এক প্রচণ্ড আঘাতে যেন লুটিয়ে পড়বেন এইবার। চোখের সামনে জমাট অন্ধকার নেমে আসে, বৃদ্ধের জীর্ণ ক্লান্ত দেহটা কেমন স্থির নিস্পন্দ হয়ে আসে।

দিনেশ এগিয়ে এসে দাদুর জ্ঞানহীন দেহটাকে ধরে ফেলেছে।

কি বিজাতীয় ঘৃণাভরে সে চেয়ে দেখছে তার বাবা ওই বিজনেস ম্যাগনেট দীপেনবাবুকে। ওর নীচতা লোভ আর ওই জঘন্য মনোবৃত্তিটা আগামী-কালের তরুণের সামনে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে।

দিনেশ বলে—তুমি খুশী হয়েছো বাবা? দাদুর মুখ তুমি বন্ধ করতে চাও, কিন্তু বাকী মানুষগুলোর কাছে একদিন জবাব তোমাকে দিতেই হবে। দীপেনবাবু ছেলের

কথায় আমল দিলেন না। দেবার প্রয়োজনও নেই তার। শুধু বলে—ডাক্তারবাবুকে খবর দাও।

দিনেশ বলে পুণাস্তরে—দাদু এভাবে বাঁচতে চান না বাবা। তবু হয়তো তাকে বাঁচতে হবে।

কথাটা যেন দিনেশ তার নিজের সম্বন্ধেও বলেছে—দীপেনবাবু একটু অবাক হন ছেলের ওই কথা শুনে।

বেশ বুঝেছে দীপেনবাবু একটা প্রতিপক্ষ তাঁর আছে ঘরে বাইরে। তবু এইভাবেই তাকে প্রতিষ্ঠার পাহাড়ে উঠতে হবে। আজকের সমাজে ন্যায় নীতি বিবেকের কোন দাম নেই, এটা দীপেনবাবু জেনেছে, আরও জানে সে দিনেশও একদিন বুঝবে এই কঠিন সত্যটা। তবে ওই বৃদ্ধ বিজয়বাবু কোনদিনই তা বুঝবেন না। তাতে ক্ষতি নেই, আজ বাতিলের দলে গিয়ে পড়েছে বিজয়বাবু।

দিনগুলো কেমন আবছা আলো আঁধারির মধ্য দিয়ে কেটে চলেছে। ...দুঃসহ বেদনাত দিন। বিজয়বাবু বেশ কিছু দিন অসুস্থ হয়ে রয়েছেন। দীপেনের দেখা মেলে না। ক্বচিৎ কদাচিৎ এসে দাঁড়িয়ে খবর নিয়ে চলে যায়। বৌমাও আজকাল বিখ্যাত লোকের ঘরণী। সংসারের কাজ দায় দায়িত্ব সব চাকর বাকরের হাতে দিয়ে সে সহরের নারী কল্যাণ সমিতি, শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান কোন পানের স্কুলের কর্তৃত্ব এই সব নিয়ে থাকে। দুটো গাড়ীতে ওরা স্বামী স্ত্রী দুজনে ঘোরে। তনব নাকি ব্যবসায়ই অঙ্গ। বৃদ্ধ বিজয়বাবু জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আজ জমাট অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছেন।

এই অন্ধকারেও কোথায় একটু আলোর ক্ষীণ রেখা যেন দেখেছেন তিনি। দিনেশও চিনেছে দাদুকে। আজকের নোতুন মন নিয়ে দিনেশ দেখেছে এই সমাজের ওই ভণ্ড অভদ্রলোকদের। বাবা মাকে দেখেছে। বাইরে ওরা অন্যমানুষ।

আর তাদের মনের সব ক্লেদ আর লোভটাকে ঘৃণা করে দিনেশ।

বৃদ্ধ ওদের পায়ের শব্দ চাইলেন। দিনেশ আর মনু এসেছে। একসঙ্গে কলেজে পড়ে ওরা। মনুর বাবা সামান্য কাজ করে আদালতে। কিন্তু মেয়েটা ভারি মিষ্টি। আজ সেইই তবু দেখা শোনা করে বিজয়বাবুকে।

বিজয়বাবু জানে এবাড়িতে মনুর আসা—দিনেশের সঙ্গে মেলামেশাটা বৌমা দীপেন কেউই পছন্দ করে না। বৌমা সেদিন মনুকে এখানে দেখে বিজয়বাবুকেই জানিয়েছিল—

—ওরা কেন আসে? এবাড়িতে যে সে আসবে—আর দিনেশও হয়েছে তেমনি;...এই বাজে মেয়েটাকে আসতে নিষেধ করে দেবেন।

বিজয়বাবু বৌমার দিকে চেয়ে থাকেন।

এবাড়ীতে তার কোনো অধিকার নেই—এই কথাটা বৌমাও জানাতে চায়। সেই রাতের প্রতিবাদের পর থেকে দীপেনও বাবাকে এড়িয়ে চলে। আর বৌমাও এমনি হয়ে উঠেছে।

তাই বিজয়বাবু মনুকে কথাটা বলেন।

—কেন আসিস দিদি এই বুড়োটার কাছে?

মনু ওর দিকে চাইল। বৃদ্ধের দুচোখে অসহায় বেদনা ঘনিয়ে ওঠে। উনি বলেন।—বুঝলি দিদি, কারোও কাছে কিছু নেবার অধিকার আমার নেই।--

দিনেশ বলে—ও আসবে। জানি বাবা মা হয়তো পছন্দ করে না তবু তাদের মতটাই এবাড়িতে বড় নয়।

দিনেশ ক্রমশঃ দেখেছে ওদের নীচতাকে, দেখেছে মানুষের সঙ্গ থেকে ওরা অনেক দূরে সরে গেছে। তাই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে সে। শুধু তার কথাই নয়। আরও বৃহত্তর জগৎকে দেখেছে তারা মুক্ত মন নিয়ে। যত দেখেছে ততই শিউরে উঠেছে।

তাই দিনেশ বলে—

—ওরা সব কিছু নিজেদের মতেই চালাতে চায় দাদু!

বিজয়বাবু দিনেশের দিকে চেয়ে থাকেন। বিজয়বাবু বলেন—হতাশা, ভয় ঘরে!

—ওদেরই এখন দিন পড়েছে দিনেশ। ওরাই সমাজের কর্তা, সব কিছু এসে গেছে ওদের হাতে। কিন্তু স্বাধীনতার পর এমনি একটি দিন আসবে তা ভাবিনি দিনেশ।

ইংরেজের লোভ, তার মহমন্তভার ছাপ ফুটে উঠবে একটা বিশেষ শ্রেণীর মুখে, এটা কল্পনা করিনি।

দিনেশও সেটা দেখেছে।

তাই বলে সে—এটাও ঘুচে যাবে দাদু ভাই। অন্ধকার চিরকাল থাকে না—ওরা যদি এখনও সাবধান না হয়, স্বাধীনতার এমনি কদর্থ করে নিজেরাই বেঁচে থাকতে চায় সব নিয়ে, ওদেরও মরে যেতে হবে।

বৃদ্ধ বিজয়বাবুর জীর্ণ চোখে মুখে কি আশার আলো জাগে।

মনে হয় তাঁদের আত্মত্যাগ বৃথা হয় নি, আগামীকালের মানুষ অনেক আঁধার পার হয়ে নোতুন আলোর সন্ধান পাবে।

…মনু বলে সেদিন আপনিও দেখে যাবেন।

হঠাৎ দরজায় কার পায়ের শব্দ শুনে চাইল দিনেশ। বিজয়বাবুও অবাক হন।

—বৌমা!… …

দিনেশও অবাক হয়, মায়ের মুখে ফুটে উঠেছে কাঠিন্য। কোথায় সমাজের কল্যাণ চিন্তার লেকচার দিয়ে এসে নিজের বাড়িতে এই দৃশ্য দেখবে ভাবেনি।

তাই দেখে শুনে রেগে উঠেছে দিনেশের মা।

মনুও ঘরোয়াভি আসছে, আর তারা এখানেই এইসব সমালোচনা করে না।

বাইরেও শোভাযাত্রায় দেখা যায় দিনেশকে, পার্কে সেদিন লেকচার দিয়েছে। জেলার অন্য জায়গাতেও ঘুরে দল পাকিয়ে মজুতদারী কালোবাজারী বিতাড়নের নামে গরম গরম কথা বলে।

এসবের মূলে যে এই বৃদ্ধ মানুষটিরই উস্কানি আছে সেটা আজ ভালো ভাবেই জেনেছে দীপেনের স্ত্রী। আজ ওই দিনেশ, বৃদ্ধ এই মানুষটা, সকলেই তাদের শত্রু। রক্তের সম্পর্কের চেয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্কটা—মতামতের প্রশ্নটাই আজ বড় হয়ে ওঠে দীপেন আর তারই আধুনিকা সমাজসেবী স্ত্রীর কাছে।

তাই ওর মুখেও কোন কথাই আটকায় না। দিনেশের মা বলে ওঠে—বাড়িতে যে এই সব কাণ্ড কারখানা চলে তা জানি দিনেশ। তোমার সম্বন্ধে অনেক কথাই কানে আসে। এমনি ঘরাটে হয়ে উঠবে তা ভাবিনি।

দিনেশ মায়ের কথায় চমকে ওঠে।

—কি বলছো তুমি!

—হ্যাঁ ঠিকই বলছি। আর আপনাকেও বলি বাবা—

—বৌমা! বিজয়বাবুর জীর্ণ কণ্ঠস্বরে যেন আর্তনাদ ফুটে ওঠে। তিনি কি করেছেন জানেন না। তবে মনে হয় অন্ধকারের পর আলো আসে, এই অন্ধকারের পর দিনেশের মত তরুণেরাই সেই আলোক সন্ধান করে, এটা প্রকৃতির নিয়ম। তিনি এখানে অসহায় দর্শক মাত্র। কিন্তু বৌমা বেশ কড়া স্বরেই বলে—

বাড়িতে বসে বসে এতবড় শত্রুতা করবেন এই বয়সে তাও ভাবিনি। শেষ কথা বলে যাচ্ছি—আপনি এভাবে সর্বনাশ করবেন না।

—সর্বনাশ আমি করছি না মা। তোমরাই ডেকে আনছো নিজের সর্বনাশ।

বিজয়বাবুর কণ্ঠস্বর ক্লান্তিতে ভরে ওঠে। আজ জীর্ণ মানুষটির মনে হয় কোথাও তার ঠাঁই নেই। এভাবে জীবনের বোঝা টেনে টেনে চলার ক্লান্তি আজ বেদনাময় হয়ে উঠেছে।

দিনেশের মা মনুকেও বলে—

—আর তোমাকে যেন এবাড়ীতে না দেখি।

মনু অপমানে মুখ নীচু করেনা। ও কোন অপরাধ করেনি—কোন লোভও ওর নেই। দিনেশই বলে ওঠে—

—কেন? কি করেছে ও এবাড়ির?……মানসম্মান-এর কথা ভুলবে? এই ভুয়ো মানসম্মানের খোলসটাকে আমি মানিনা মা। যদি আমারও এ বাড়ীতে আসার অধিকার থাকে, ওরও থাকবে।

ওর কথাটা জানিয়ে দিয়ে মায়ের মুখের উপর বের হয়ে গেল। শিবানী স্তব্ধ হয়ে ছেলের দিকে চেয়ে থাকে। বিজয়বাবু আজকের ওই ঘটনাকে অন্য চোখে দেখেন। তাই বলেন—

—ওদের মতামতের মূল্য দিতে হবে মা—

শিবানী কথার জবাব দিল না। রাগে গর গর করে বের হয়ে গেল।

বৃদ্ধ বিজয়বাবু ওদের ডাকবার চেষ্টা করেন—শোন। দিনেশ!

দিনেশ বলে—পরে আসছি দাদু। এখন তোমাকেও নিয়ে যাবো। এখানে এভাবে ওদের দয়ায় পড়ে থাকলে।

দিনেশ চলে গেল।

স্থবির বৃদ্ধ ওদের গতিপথের দিকে চেয়ে থাকেন। মনে হয় অতীতে তার যৌবনের দিনগুলো।

প্রতিমাও এসেছিল তার জীবনে, কিন্তু সেই ভালবাসার কোন সার্থকতা নেই। কোন অতীতের অন্ধকারে তা হারিয়ে গেছে। আজ সেই স্মৃতির ম্লান সুরভি কি নীরব বেদনার রং-এ সারা মন ভরিয়ে তুলেছে!

আজ ওরা পাশাপাশি এগিয়ে এসেছে দৃপ্ত প্রতিবাদের কাঠিন্য নিয়ে, দিনেশ মহুয়া আজ একই পথের পুরোধা।

কদিন আজ ওদের দেখা নেই। দিনেশও বাড়ী ফেরেনি।

দীপেনবাবুও খুব ব্যস্ত, মাঝে মাঝে গাড়ী নিয়ে আসে—কিছুক্ষণ থেকে চলে যায় আবার। শিবানীও গম্ভীর হয়ে গেছে।

দীপেনের মুখে ভাবনার কালো ছায়া নামে।

বৃদ্ধ শুধু কিছু কিছু খবর পায়। সারা জেলার শহরে যেন একটা কালো মেঘ নামছে। কি একটা বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত কালোমেঘের রূপ নিয়ে সারা আকাশটাকে ছেয়ে ফেলেছে এ কোন ঝড়ের পূর্ব লক্ষণ। আগামী কোন সর্বনাশের অশনি সংকেত।

সারা শহরে নেমেছে রাতের অন্ধকার। আলোগুলো জ্বলেনি। কোথায় দূরে গাড়ী যাবার শব্দ কানে আসে। কাঁপছে চারিদিক। অন্ধকারে, ভীত ত্রস্ত পায়ের শব্দ শোনা যায়। কারা জয়ধ্বনি দিচ্ছে। মাটির অতল থেকে কারা এক রুদ্ধ শক্তি নিয়ে জেগে উঠছে।

শহরের পথে পথে হাজারো মানুষ আজ জমায়েত হয়েছে। ওরা দাবী জানাতে এসেছে, বাঁচার দাবী। অন্যায়-এর অন্ধকার থেকে ওরা আলোয় ফিরতে চায়।

—বাবা!

বৃদ্ধ বিজয়বাবু কি ভাবছিলেন। এই দুর্বার প্রতিরোধের সামনে ওই লোভী স্বার্থপর মানুষগুলো আজ শিউরে উঠেছে। দীপেনবাবু বাড়ী ফিরেছে। বিবর্ণ ত্রস্ত একটি মানুষ। দিনেশ আর ফেরেনি। এবাড়ির ওই নীতিকে—সেই স্বার্থপরতাকে সে ঘৃণা করে। তাই সে চলে গেছে।

দীপেন বলে—পুলিশ মিল সিজ করেছে, এবাড়ির গুদামও সার্চ করে সব কিছু বের করেছে।

বিজয়বাবু ছেলের ভীত মুখের দিকে চেয়ে থাকেন। আজ দয়াও হয় না ওর। খুশী হয়েছেন তিনি। ওদের সেই লোভের জগৎটা বিলুপ্ত হোক। এই তিনি চান। দীপেনবাবু বলে, কে এসব খবর দিয়েছে জানো? বৃদ্ধ ওর দিকে চাইলেন। শিবানীও এসেছে এ ঘরে। উৎকর্ণ হয়ে শুনছিল স্বামীর কথাগুলো। এবার শিবানীই জানায়।

—ওই তোমার বাবাকেই জিজ্ঞেস করো। তিনিই এসবের মূল।

দীপেন বলে ওঠে—উপলক্ষ্য হ'ল আমারই সন্তান, ওই দিনেশ। ওদেরই দলবল সারা শহরের গুদাম—সবকিছুরই খবর দিয়েছে পুলিশকে। ওরাই এই সর্বনাশ করেছে।

বৃদ্ধের জীর্ণ কুঞ্চিত মুখে কি তৃপ্তির আভাষ জাগে। হারানো বিশ্বাসটাকে ফিরে পেয়েছেন তিনি। তাঁর আশা ব্যর্থ হয়নি, প্রকৃতির নিয়মেই এগুলো ঘটবে, আগামী দিনের যৌবন অন্ধকারকে ছিঁড়ে ফেড়ে নোতুন আলোর আভাস আসছে।

দীপেনবাবু গ্লানিভরা স্বরে বলে,

—ওরা নিজের কথাও ভাবল না? আজ আমার সব চলে গেল। ওর এই কথাটাও মনে এল না?

বিজয়বাবু বলে ওঠেন—এ পাপের আঁধারে ওদের নামিয়ো না দীপেন। ওদের নিজের পায় বাঁচতে দাও।

বৃদ্ধের মনে হয় অনেকগুলো বছর আগে রাতের অন্ধকারে তিনিও ঘর ছেড়েছিলেন সব পিছনে ফেলে।

সেদিন তিনিও নিজের কথা ভাবেননি।

দিনেশরাও আজ ভাবেনা। ওরা এই ছোট্ট ভাবনাটাকে জয় করে মানুষের অধিকার ফিরে পেয়েছে।

তুষার কমল

—চিত্তরঞ্জন মাইতি

পিণ্ডারী হিমবাহের পথে সেবার একা যাত্রী। তুষার মৌলী নন্দাদেবী নন্দাকোট নীল আকাশের বুকে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে। তার থেকে লক্ষ লক্ষ হুড়বারার মত ঝরে ঝরে গলে পড়ছে তুষার। সেই গলিত তুষার সৃষ্টি করেছে প্রায় দু'মাইল দীর্ঘ হিমবাহ। এই হিমবাহের পাশে গিয়ে দাঁড়াব এই ছিল আমার অনেকদিনের ইচ্ছা।

চলার পথে চাকুরী হয়ে খাতিতে এসে পৌঁছলাম। পিণ্ডার নদীর কাকচক্ষু ধারা বয়ে চলেছে। নদীর বাঁ দিকে ডাকবাংলো। ক্লান্ত পা দুটো টানতে টানতে যখন ডাক-বাংলোর সামনে এসে দাঁড়ালাম তখন সন্ধ্যার ঘন ছায়া নেমে এসেছে।

চৌকিদারকে ডাক হাঁক করলাম, কিন্তু কোন সাড়া মিলল না। পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়ে ডাক বাংলোর বারান্দায় উঠে দাঁড়ালাম। ঘরের দরজা বাইরে থেকে তালা বন্ধ। আমি অসহায়ের মত চারদিকে তাকাতে লাগলাম। সারারাত প্রচণ্ড শীতের ভেতর বাইরে পড়ে থাকার একটি মাত্র অর্থ হয়, মৃত্যু। দোহারকেত থেকে দেখছি, রাত গভীর হবার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হ'য় ঝড়। শেষ রাতের আগে সে ঝড় আর থামে না। ভোর বেলা সারা পথ প্রান্তর জুড়ে ঝড়ের দুঃশাসনের চিহ্ন থাকে ছড়ানো। পাইনের ডাল পাতাপত্তর ভূলুণ্ঠিত।

এ রাতেও ঝড়ের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তাই তালাবন্ধ ডাকবাংলোর দিকে তাকিয়ে প্রমাদ গণলাম।

এত ক্লান্ত ছিলাম যে খুব বেশী সময় কিছু ভাবতে পারলাম না। বেডিংখানার ওপরেই বসে পড়লাম।

অল্পক্ষণের ভেতরেই দৃশ্যমান জগতের অস্পষ্ট ছবিগুলোও মুছে গেল। শুধু পিণ্ডার নদীর বহমান জলস্রোত কানে এসে বাজতে লাগল।

কেমন করে ঘোর গিয়ে পড়েছিল জানিনা, বারান্দার একটু দূরে যে ওকগাছের জটলা আবছা আলো থাকতে থাকতে দেখেছিলাম, তার ভেতর থেকে হঠাৎ দিক্ দিক্ করে একটা আলো জ্বলে উঠল। আগুনটা জ্বলছে আবার স্তিমিত হয়ে পড়ছে। কি ব্যাপার। বাংলোর বাইরে একটিও লোকের থাকার কথা নয়। তবে আগুন জ্বালালো কে। এত কথা বিচার করার মত মনের অবস্থা ছিল না আমার। বেডিংটা পিঠের ওপর তুলে নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম আগুন লক্ষ্য করে। হাতের টর্চটার আলো অন্ধকারের বুক চিরে তীব্র ধারা ফোয়ারার মত ছড়িয়ে পড়ছিল। কিছুটা পথ আসার পর আগুনের উৎস সন্ধান করা গেল। ওক গাছের জটলার ভেতর একটা অতি ছোট কাঠ আর ডালপালা দিয়ে তৈরী ঝুপড়ির মত। তার সামনে পাতাপত্তর জ্বালিয়ে আগুনে হাত সেঁকছে একটি পাহাড়ী মেয়ে। টর্চের আলো সামনে পড়তেই মেয়েটি চমকে উঠে দাঁড়াল।

হয়তো ভয় পেয়েছে, তাই চেঁচিয়ে বললাম, ডাক-বাংলোতে গিয়ে দেখলাম তালাবন্ধ, এখন আলো দেখে এখানে এসেছি।

মেয়েটি আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। ও আড়চোখে আমাকে দেখছিল।

আমি বললাম, কোন পুরুষ মানুষ এখানে নেই?

মেয়েটি মাথা নেড়ে জানাল যে কোন পুরুষ সেখানে নেই।

আমি অবাক হলাম। কিন্তু তখন এত ক্লান্ত আর

ঐতে কাতর যে বিশেষ কোন কিছু ভাবতে পারলাম না। আগুনের ধারে এগিয়ে গিয়ে বেঞ্চিটা ফেলে তার উপর বসলাম। হাত বাড়িয়ে দিলাম একটুকরো আগুনের শিখার ওপর।

মেয়েটি এই ফাঁকে গিয়ে ঢুকল তার কোপ্‌ড়ির ভেতর।

বেশ কিছুক্ষণ পরে সে বেরিয়ে এল বাইরে। হাতে একটা ছোট আকারের ঝুড়ুল। আমার দিকে একবার তাকাল, তারপর পাশে পড়ে থাকা লম্বা লম্বা গাছের ডালগুলো ঝুড়ুলের ঘায়ে কেটে ছোট করতে লেগে গেল। ঐ কাঠের টুকরো পাতাপত্রের সঙ্গে মিশিয়ে মাঝে মাঝে ফেলতে লাগল আগুনে।

চিড়্‌ চিড়্‌ একটা শব্দ উঠছিল আগুন থেকে। আমার হিমশীতল শরীরটা একটু একটু করে গুপ্ত হয়ে উঠছিল।

মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলাম, বাংলোর চৌকিদার কোথায় বলতে পার?

মেয়েটি ফ্যাল ফ্যাল করে আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, মারা গেছে।

আমি বিস্মিত হয়ে বললাম, মারা গেছে! তাহলে ডাকবাংলোর দেখাশোনা করছে কে?

মেয়েটি বলল, এই ক'দিন হল আমার বাবা মারা গেছে। আমি সরকারের কাছে গিয়েছিলাম আর্জি নিয়ে। তা সরকার জেনানা বলে বাংলোর ভারটা আমাকে দিলে না। আমার কাছে চাবিটাও নেই যে আপনাকে তালা খুলে দেব। সব সরকারে জমা করে এসেছি।

উদ্বেগের একটা সুর বেজে উঠল আমার গলায়, তাহলে বহিন্‌ রাতে আমার থাকার কি ব্যবস্থা হবে?

বহিন্‌ তাকটা শুনে ও আমার দিকে তাকাল। আমার চোখে মুখে কোন অসুখ ছায়া আছে কিনা বোধকরি তাই দেখে নিয়ে বলল, আপনি কি এ কোপ্‌ড়িতে রাত কাটাতে পারবেন বাবুজী?

বললাম, একটু মাথা গুঁজতে না পারলে যে রাতে মারা পড়তে হবে বহিন্‌।

মেয়েটি বলল, ঠিক আছে, একটা খাটিয়ায় বিস্তারা বিছিয়ে কোন রকমে রাতটা কাটাতে যদি পারেন তাহলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

হাতে যেন স্বর্গ পেলাম। বললাম, এর চেয়ে বেশী আমার কিছু চাইনা। সারারাত বাইরে পড়ে থাকলে ম্যালিয়ার দেখতে যাওয়া আমার ভাগ্যে আর হয়ে উঠবেনা।

মেয়েটি কোন কথা না বলে কোপ্‌ড়ির ভেতরে চলে গেল।

আমি আগুনে গা হাত পা সেঁকতে সেঁকতে ভাবতে লাগলাম, মেয়েটির বয়েস পঁচিশ ছাব্বিশের ভেতরেই হবে। কালো একটা ঘাগরা আর ওড়নায় সর্বাঙ্গ ঢাকা থাকলেও মেয়েটির মুখশ্রী চোখে পড়ার মত। শোকের একটা বিষণ্ণ ছায়া পড়েছিল ওর চোখে। তবে মুখ দেখে একেবারে ভেঙে পড়েছে বলে মনে হল না। সাধারণ পাহাড়ী মেয়েদের মত দারিদ্র্য আর খাটুনির বড় একটা চিহ্ন পড়েনি ওর কোথাও। বরং মার্জিত বুদ্ধির একটা ছাপ দেখলাম ওর চোখেমুখে আর আচরণে।

কতক্ষণ এমনি আগুনের পাশে বসেছিলাম খেয়াল নেই, হঠাৎ আমার সামনে দিয়ে কতকগুলো শুকনো পাতা ডিগবাজি খেতে খেতে বেরিয়ে গেল। ঠাণ্ডা একটা হাওয়া চাবুকের মত আমার মুখে এসে আঘাত করল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সামনে এসে দাঁড়াল সেই মেয়েটি। বলল, ঝড় উঠেছে বাবুজী, কোপ্‌ড়ির ভেতর চলে আসুন।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বেঞ্চিটা তুলতে যাচ্ছিলাম, মেয়েটি এগিয়ে এসে হাত লাগাল। ধরাধরি করে কোপ্‌ড়ির ভেতর বেঞ্চিটা নিয়ে গিয়ে ফেলতে না ফেলতেই দারুণ গর্জন করে পাহাড়ী ঝড় এগিয়ে এল। কাঠের দরজাটা অনেক ঠেলাঠেলির পর বন্ধ করে দিল মেয়েটি। ঘরে একমাত্র টেমির আলোটা মৃত্যুপথযাত্রীর মত দু'একবার দপ্‌ দপ্‌ করে হাওয়া টানতে টানতে নিভে গেল। নিরন্ধ্র অন্ধকারে ডুবে গেল ঘরটা।

তৎক্ষণে আমি খাটিয়ার ওপর বসে পড়েছি। মেয়েটি কোথায় তা বুঝতে পারছি না।

একটা প্রবল দোঁ দোঁ আওয়াজ উঠছে। দমকা হাওয়ার ঝাপটে ঝড়্ ঝড়্ করে কেঁপে কেঁপে উঠছে কোপ্‌ড়িটা। মনে হচ্ছে অন্ধকার ঝড়ের সমুদ্রে ঘন আছি একটা ছোট্ট নৌকার খোলের ভেতর। যে কোন মুহূর্তে ঝড় ওকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে অন্ধকারের অগাধ অতলে ফেলে দেবে।

টর্চটা জ্বাললাম। সোবার ঘরের ওপারে ছোট্ট একটা রান্নাঘর জাতীয় কিছু চোখে পড়ল। সেখানে টর্চের তীব্র আলোয় দেখলাম, কালো আবরণের আড়ালে মেয়েটির দুটো চোখ জ্বলে উঠল। সে গুটিসুটি মেরে বসেছিল ঐ এক চিলতে ঘরের কোণায়। হাতে দেখলাম, সেই কাঠ কাটা ছোট্ট কুড়ুলটা শক্ত করে ধরা আছে।

লজ্জা পেলাম মনে মনে। আমাকে ও ভরসা করতে পারেনি। আর না পারাই তো স্বাভাবিক।

আলোটা জেলে রেখেই বললাম, বহিন্‌জী যদি কোন দরকারে লাগে তাহলে আমার এই টর্চটা নিতে পার।

স্পষ্ট দেখলাম, ওর জলে ওঠা চোখ দুটো স্তিমিত হয়ে এল। হাতে ধরে থাকা কুড়ুলটাকে ঘরের একপাশে সরিয়ে রাখলে।

আমার কথার উত্তরে বলল, খানা তৈরী বাবুজী, আলোটা ধরে থাক এমনি করে, আমি তোমাকে রোটী তরকারী দিয়ে দিই।

এরই ভেতর ও খাবার বানিয়ে ফেলেছে, অথবা বেলা থাকতে থাকতে নিজের জন্যে তৈরী করেছে। এখন আমাকে ওর ভাগের খাবারটাই হয়ত দিতে চাইছে।

বললাম, তোমার কম পড়বে না বহিন্‌জী ?

ও বলল, আপনারই হয়ত কিছু কম পড়তে পারে। খাবার আমি বেশী করেই বানাই, পরের দিন ওতেই জলখাবারের কাজ সারি।

বললাম, আমার কাছে অনেক শুকনো খাবার আছে। ভোরবেলার জলযোগের জন্য ভাবতে হবেনা।

ও কোন কথা না বলে আমার টর্চের আলোতে কয়েকখানা রুটি আর খানিকটা শুকনো তরকারী থালাতে সাজিয়ে আমাকে ধরিয়ে দিল।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাবার কাজটা শেষ করে ফেললাম। কারণ অনেকগুলি এক্সট্রা ব্যাটারী আমার কাছে থাকলেও আমি আগামী দিনগুলোর প্রয়োজনের কথা ভেবে খরচ করতে চাইলাম না।

আমার খাওয়া হয়ে গেলে বললাম, আমি টর্চ জ্বালিয়ে রাখছি, তুমি এবার খেয়ে নাও।

ও বলল, অন্ধকারের ভেতর কাজ করার অভ্যেস আমার আছে। আলোর একটুও দরকার নেই। আমি দিব্যি খেয়ে নিতে পারব। ততক্ষণ আপনি বরং আপনার বেডিং খুলে চারপায়ার ওপর বিছানাটা পেতে নিন।

টর্চটা জেলে রেখে কোনরকমে বিছানাটা পেতে নিলাম। তারপর ওর অনুরোধে টর্চ নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

বাইরে তখনও ঝড়ের তাণ্ডব চলেছে। কাঠের দেয়ালের ফাঁক দিয়ে কনকনে হাওয়া ঢুকে পড়ে আমার সারা শরীরটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

কোনরকমে কম্বলের ভেতর মুখখানা ঢুকিয়ে শুয়ে পড়ে আছি। ভাগ্যের কথা মনে হচ্ছে। আজ রাতে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কে আমাকে রক্ষা করল। এই মেয়েটির সঙ্গে কি আশ্চর্যভাবেই না দেখা হয়ে গেল। মেয়েটি সম্বন্ধে মনে মনে প্রশ্ন জাগল। বিয়ে করেনি বোধকরি, তাহলে স্বামী থাকত সঙ্গে। বাবার কাছে থাকার অর্থই হচ্ছে মেয়েটি এখনও অবিবাহিতা। অবশ্য অন্য কারণও থাকতে পারে।

এইসব নানা কথা ভাবতে ভাবতে কখন ক্লান্ত চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এল। আমি ঝড় আর শীতের কথা ভুলে ঘুমিয়ে পড়লাম।

শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। গায়ে হাতে ব্যথা। ঝড়ের তাণ্ডব থেমে গেছে। আমি হাতড়ে টর্চ জেলে একটা ট্যাবলেট বের করলাম। কিন্তু জল চাই। ভাবলাম, মেয়েটির শেষ রাতের ঘুম ভাঙিয়ে কাজ নেই। কিন্তু কিছুক্ষণ বসে থাকার পর অসহ্য হয়ে উঠল যখন মাথার যন্ত্রণা তখন মেয়েটিকে না ডেকে পারলাম না। ও সাড়া দিল। বিছানা থেকে ওঠার শব্দ পেলাম।

আমি বললাম, তোমাকে খুব বিরক্ত করছি, কিন্তু শরীরটা বিগড়েছে বহিনজী। একটু জল দাও।

কথাটা বলেই আমি চোখ বন্ধ করলাম। ও তৎক্ষণে মাথে জল ভরেছে। এক নজরে চোখে পড়ল ওর বিছানার একদিকে সেই ছোট কুড়ুল আর একদিকে একখানা খোলা তোজালী।

আমি ওষুধ খেলাম। তারপর সেই যে চোখ বন্ধ করলাম, বিকেলের আগে আর খুলিনি! প্রবল জ্বরের ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। অপরাহ্নের দিকে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়তেই আমি চোখ মেলে তাকালাম।

তাকিয়ে দেখি মেয়েটি আমার পায়ের কাছে বসে কি যেন করছে।

আমাকে তাকাতে দেখেই ও উঠে এল।

বলল, বাবুজী, একটু আরাম বোধ করছেন কি?

দুর্বল হয়ে পড়লেও মাথা নেড়ে বললাম, এখন সুস্থ বোধ করছি।

ও বলল, কিছু ভাবনা নেই, ওটা খুব বেশী পরিশ্রমের জন্য হয়েছিল। আমি একটু খাবার আনছি, আপনি খান, খুব তাড়াতাড়ি সুস্থ হয়ে যাবেন।

প্রতিবাদ করলাম না। মেয়েটি তার এক চিলতে ঘরে ঢুকে গেল। আমি এরই ভেতর পাশ ফিরলাম, আর সঙ্গে সঙ্গে একটি জিনিস আমার চোখে পড়ল। পায়ের কাছে খাটিয়ার ধারে একটা উনুনে কাঠের আগুন জ্বলছে। ঘরটা তাই বেশ আরামদায়ক মনে হচ্ছে। আমি অসুস্থ আর আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিলাম যে সময় মেয়েটি নীরবে এসে আগুন জ্বালিয়ে আমাকে শীতের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে।

পরদিন অনেক সুস্থ বোধ করছিলাম। বাইরের আলোয় একটু ঘুরে এসে বললাম, এবার বহিনজী আমাকে তো এগোতে হবে। এখনও দুটো তাকবাংলো পেরিয়ে তবে ম্যানিয়ারে পৌঁছতে পারব।

ও আমার দিকে অদ্ভুত চোখ তুলে তাকাল। বলল, কি বলছ বাবুজী, একেবারে সুস্থ না হলে তোমাকে ছেড়ে দিই কি করে। সঙ্গে যদি আর কেউ থাকত তাহলে আলাদা কথা। এখন আমার কোপ্‌ড়ীতে যখন এসে পড়েছ তখন এ অবস্থায় তোমাকে একা ছেড়ে দিতে পারব না।

ও একদিনের ভেতরেই দেখলাম, আপনি থেকে তুমিতে নেমে এসেছে। কিন্তু এত আন্তরিক আর স্বাভাবিক ওর আচরণ যে আমার মনে কোনরকম বিরূপ ভাবনা এলো না।

শুধু বললাম, একাই বেরিয়েছি, একাই যাব ওখানে। মাঝখান থেকে তোমাকেই কষ্ট পেতে হল।

ও বলল, কষ্ট কেন বলছ বাবুজী। দুদণ্ড মানুষের সেবা করতে পারার মত ভাগ্য কি আছে বল। আবার যেখানকার মানুষ, সেখানেই তো তুমি চলে যাবে।

ওর কথার কোন উত্তর দিতে পারলাম না।

সুস্থ হবার পরেও তাই দিন চারেক থেকে যেতে হল আমাকে। এই চারদিনে সম্পূর্ণ অপরিচিত মেয়েটি আশ্চর্যভাবে আমার অন্তরঙ্গ হয়ে গেল। বোধকরি প্রকৃতির সম্পূর্ণ নির্জন পরিবেশে মানুষ অনেক সহজে পরস্পরের কাছাকাছি আসতে পারে।

যেদিন খাতি ছেড়ে চুলি হয়ে কুরখিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেব তার ঠিক আগের বিকেলে বসেছিলাম ওক গাছের তলায় আমি আর সোনিয়া। এ কদিনে মেয়েটির নাম আর তার জীবনের ছোটখাট অনেক কিছু ঘটনা জানা হয়ে গেছে। কিন্তু সেই বিকেলে যখন মরা রোদের অনুজ্জ্বল সোনাটুকু খেলা করছিল ওক গাছের ডালে পাতায় তখন সোনিয়া আমাকে শোনাল তার জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাহিনী।

ও বলল, ভাইসাহেব, তুমি আমার কাছে জানতে চেয়েছ কেন আমি বাবা মারা যাবার পরেও লোকালয় থেকে বহুদূরে এই নির্জন পরিবেশে পড়ে থাকতে চাইছি।

বললাম, এই কদিনে তোমার ভাইসাহেব ডাকে আমি কি পরিমাণ খুশী হয়েছি তা বলে বোঝাতে পারব না।

আমার বোন নেই, তাই প্রথম দিনেই আমি তোমাকে বহিনজী বলে ডেকেছি। তুমি তাতে সহজেই সাড়া দিয়েছ, তাই এখান থেকে তোমাকে লোকালয়ে নিয়ে যেতে চাইছিলাম।

সোনিয়া বলল, মেয়েদের স্বাভাবিক আত্মরক্ষার ধর্ম থেকেই আমি প্রথমে তোমাকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলাম, কিন্তু পরে তোমার ব্যবহার থেকে জানতে পারলাম, মেয়েপুরুষের একটামাত্র সম্পর্কই নয়, তাদের ভেতর ভাইবোনের একটা মধুর সম্পর্কও গড়ে উঠতে পারে।

হেসে বললাম, পারে নয়, একেবারে গড়ে উঠেছে সোনিয়া।

ও বলল, তাইতো ভাইসাহেব তোমাকে কোনরকম সংকোচ না করে আমার জীবনের দু চারটি কথা শোনাতে চাই।

আমি ওর দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। সোনিয়া দূর ভুবার পাহাড়ের দিকে একবার তাকাল, তারপর শুরু করল তার জীবনের কথা।

খুব ছোটবেলায় মা মারা যায়, তাই মায়ের স্মৃতি আমার কাছে অস্পষ্ট। বাবা আমাকে সারাক্ষণ আগলে রাখত। আমি বাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতাম বিভিন্ন ডাক বাংলোতে। বাবা করত চৌকিদারের কাজ। লোকজন এলে রান্নার কাজ করতে হত। আমি প্রায়ই নির্জনে প্রকৃতির মাঝখানে শুধু বাবার সঙ্গেই কাটাতাম। যখন কোন লোক এ পথে আসত তখন আমি তার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। মানুষজন দেখতে পাওয়া আমার কাছে ছিল একটা বিশেষ আনন্দের ব্যাপার।

একদিন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক এলেন এই ডাকবাংলোয়। আমি বাবার সঙ্গে সঙ্গে থেকে তাঁর নানা কাজ করে দিলাম। তাঁকে দেখে আমার খুব ভাল লেগেছিল। তিনি শিওরীর দিকেই চলেছিলেন। সব সময় একটা আনন্দের ভাব যেন তাঁকে ঘিরে থাকত। তিনি দুটি দিনমাত্র এই বাংলোতে ছিলেন, আর আমি প্রায় সারাক্ষণ তাঁর কাছে কাছে থাকতাম। আমি বেশ বুঝতাম, আমাকে তিনি খুব স্নেহের চোখে দেখছেন। কত সুন্দর সুন্দর কথা, কত দেশের কত গল্প যে তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন তা আজও স্পষ্ট মনে আছে। আমি সন্ধ্যে হলেই বাবার সঙ্গে বসে ওঁর কাছে কত কথাই না শুনতাম। কথায় কথায় উনি বললেন, রাঁচীক্ষেতের একটি স্কুলে ওঁর স্ত্রী কাজ করেন, আর আমার বয়সী একটি মেয়ে ঐ স্কুলে পড়ে। ওঁর মেয়ের ওপরে আর একটি ছেলে রয়েছে। ছেলেটি নৈনীতালে থেকে পড়াশোনা করছে।

এক সময় কি মনে করে বললেন, তুমি পড়বে আমার মেয়ের সঙ্গে?

বাবার মুখের দিকে তাকালাম। বাবা কি ভেবে বলল, গরীব মানুষ, আমার কি মেয়েকে লেখাপড়া শেখাবার সামর্থ আছে বাবুজী।

উনি বললেন, দেখলাম, মেয়েটি তোমার বেশ বুদ্ধিমতী। তোমার অসুবিধে না হলে ওকে রাঁচীক্ষেতে আমার স্ত্রীর কাছে রেখে আসতে পারি। সেখানে আমার মেয়ের সঙ্গে থেকে ও স্কুলে পড়বে।

বাবা তাকাল আমার দিকে। আমি মাথা নাড়লাম। বাবা কি ভেবে রাজী হয়ে গেল।

সেই ভদ্রলোক ফেরার পথে আমাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন রাঁচীক্ষেত। আমি ওঁর বাড়ীতে থেকে স্কুলে যেতে লাগলাম। ওঁর মেয়ে হল আমার বন্ধু।

বছরে বাবা একবার মাত্র ছুটি পেত। ছুটি পেয়েই ছুটে আসত আমার কাছে। ক'দিন থেকেই আবার চলে যেতে হত কাজে। আমি এখানে বন্ধু পেয়েছিলাম অনেক, কিন্তু আমাকে ছেড়ে বাবা যে কতখানি অসহায় বোধ করত তা বাবার চলে যাবার সময় চোখের দৃষ্টি থেকে বুঝতাম।

কয়েক বছর আমার কাটল রাঁচীক্ষেতে। আমি স্কুল থেকে পাশ করে বেরোলাম।

ইতিমধ্যে একটি ঘটনা ঘটে গেছে আমার জীবনে। আমার বান্ধবীর যে দাদা সৈনীতালে পড়াশোনা করতে সে গ্রাজুয়েট হয়েছে। ছুটিতে মাঝে মাঝে বাড়ী এলে আমার সঙ্গে দেখা হত। সেই দেখা সাক্ষাৎই ধীরে ধীরে আমাদের ভেতর ভালবাসার জন্ম দেয়। আমরা পরস্পর ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখতাম। কিন্তু সাহস করে আমাদের এই গভীর ভালবাসার কথা কাউকে জানাতে পারিনি।

ইতিমধ্যে পাশ করে গেছি, আর স্কুলে যাচ্ছি না। বাবা ছুটিতে এল আমাকে দেখতে। দেখলাম, বাবার শরীরটা একেবারে ভেঙে গেছে। আমাকে নিভৃতে কাছে পেয়ে বলল, মা, আমি বুড়ো হয়েছি, এখন আমাকে কাজে কর্মে একটু সাহায্য না করলে আর যে পারছি না একা একা। সরকারী কাজে ইস্তফা দিলে শেষ জীবনটা চলবে কি করে মা।

বাবার চোখে জল দেখে আমার মন টলল। কিন্তু আর একটা মন হাহাকার করতে লাগল। এখান থেকে চলে গেলে আমি শিউশরণকে যে আর দেখতে পাব না। আমার বান্ধবী মুন্নির দাদার নাম শিউশরণ। আমি ভুলি কি করে তার সঙ্গে আমার ভালবাসার কথা।

চলে গেলাম বাবার সঙ্গে, কিন্তু চিঠিতে রইল যোগাযোগ। বহুদিন পর পর একখানা করে চিঠি পেতাম শিউশরণের। ভালবাসায় ভরা চিঠি। ভালবাসার রঙ যে এমন উজ্জ্বল, এমন করে সমস্ত মন যে তার রঙে রঙীন হয়ে ওঠে তা এই নির্জন বাংলোয় বসে বুঝতে পারতাম।

ও মাউণ্টেনিয়ারিং শিখে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াত। শিউশরণের বাবা চিরদিন খুবই উৎসাহ দিতেন ছেলেকে এইসব কাজে।

আমি চিঠি পেতাম শিউশরণের কাছ থেকে। নানা রকম স্বপ্নে ভরা সে সব চিঠি। আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্নের কথা যত না থাকত তার চেয়ে বেশী থাকত তুষার পাহাড় বিজয়ের স্বপ্নসাধের কথা।

কত বর্ণনা, কত রোমাঞ্চ ছড়ানো থাকত সে সব চিঠিতে।

আমি ভাবতাম কবে এই পাহাড়-পাগল মানুষটাকে বাঁধতে পারব ঘরের বাঁধনে।

কিন্তু ভাইসাহেব মানুষ ভাবে এক আর ভাগ্যের দেবতা করেন ভিন্ন।

একদিন দেখলাম শিউশরণ এল এই খাতির বাংলোতে। আগে ভাগে কোন চিঠিপত্র নেই। কৌশানী থেকে বাইসাইকেল হয়ে নেমে এসেছে। আমাকে অবাক করে দেবে এই নাকি ছিল তার ইচ্ছে।

অবাক আমি হয়েছিলাম ঠিক, কিন্তু কেঁদেছিলাম তার চেয়ে অনেক বেশী। সাতদিন স্বপ্নের ভেতর কেটেছিল আমাদের। বাবাকে বলেছিলাম আমাদের সব কথা। বাবা সব শুনে বলেছিল, আগে শিউশরণের বাবা মায়ের মত হোক, তাঁদের আশীর্বাদ নিয়ে তোমরা সুখী হও, এই আমার ইচ্ছে।

সাতদিন পরে ও চলে গেল, আর আমার চোখের স্রোত মিশল পিণ্ডার নদীর জলে।

কিছুদিন পরে চিঠি পেলাম। ও লিখেছে, বাবা মায়ের মত পেলাম না আমাদের মিলনে। অনেক বুঝিয়েও সফল হতে পারিনি। তুমি দুঃখ করনা, যেখানেই যাইনা কেন আমি তোমার।

কেঁদে কেঁদে আমার চোখের জল শুকিয়ে গেল। বাবা আমার মাথায় হাত রেখে বলত, মা, তোকে ওখানে লেখাপড়া শিখতে পাঠিয়ে আমি ভুল করেছিলাম। তুই ভুলে যা ওদের কথা। আমরা যে চৌকিদার যা। ওরা করুণা করতে পারে কিন্তু তার বেশী আর কিছু নয়।

শেষ চিঠি এল মুন্নির কাছ থেকে। চিঠি পড়ে আমি একখণ্ড পাথর হয়ে গেলাম। মুন্নি লিখেছে, দাদা হিমশৃঙ্গ অভিযানে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। আমাকে যে লিখেছিল শেষ ক্যাম্প থেকে তাতে তোমার কথা ছিল। লিখেছিল, তোমাকে সে কোনদিন ভুলতে পারবে না।

এরপর ভাইসাহেব কটি মাসও পেরোয়নি, আমার বাবা

আমাকে ছেড়ে চলে গেল। এখন তুমি বল আমি কেমন করে এই শান্তির রাজ্যটুকু ছেড়ে চলে যাই।

আমি হিমশৃঙ্গের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি আর আমার মনে হয় আমার শিউশরণ প্রধান থেকে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ভোরের হাওয়া যখন তুষার পাহাড়ের ওপর দিয়ে বয়ে আসে তখন কান পাতলেই আমি শুনতে পাই আমার শিউশরণের কথা, সোনিয়া তোমাকে আমি কোনদিনও ভুলব না।

তবে বল ভাইসাহেব, আমি ওকে তুলি কি করে। এই ওক গাছ, ঐ দূরের তুষার পাহাড় আর ঐ পিণ্ডার নদী, আমার বাবা, শিউশরণ, আমার শৈশব যৌবনের আশা আকাঙ্ক্ষায় ভরা এই ছোট্ট পাহাড়ী অঞ্চলটুকু ছেড়ে আমি কি করে চলে যাই বল?

এর পরে আমি পিণ্ডারী গ্ল্যাসিয়ার গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল সোনিয়া। সে তখনও আমাকে অসুস্থ ভেবে নিয়ে একা ছাড়তে সাহস করেনি। সারাপথ আমার বারণ না শুনে সে আমার বেডিং বয়ে এনেছিল। বলেছিল, পাহাড়ী মেয়ে সে, এসব বোঝা অবলীলায় বয়ে নেওয়াতে পারে।

ফিরে এসে খাতিতে তিনদিন ছিলাম।

বিস্কুটটা ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলেছিলাম, না বলো না, ভাই সাহেব বলেই যখন ডেকেছ। আর আমি এখান থেকে তোমাকে গোরালদের ভেতর ডাক দেব না। তবে যে কোন রকম অসুবিধে পড়লে যদি ভাই সাহেবকে লেখো, তখনি বুঝব তুমি আমার সত্যিকারের বহিন।

কৃপাসিন্ধু মাসচটক

—অসিত গুপ্ত

নীলাদ্রি বর্মণ গাড়ি চালাচ্ছিল। সামনের সীট-এ তার পাশে তাদের আড়াই বছরের মেয়ে ফুলটু। পেছনে আভা; তার কোলে কাঁথা-তোয়ালের জড়ানো দশ মাসের নতুন বাচ্চা। বাচ্চাটা ঘুমোচ্ছিল। নীলাদ্রি বলেছিল সঙ্গে আয়াকে আনতে। আভা আনে নি। বলেছিল, 'না, এতক্ষণ পাশে পাশে কান খাড়া করে থাকবে। সে বড় অস্বস্তি'। যেন আয়া না থাকলে আভা সারাক্ষণ নীলাদ্রির কানে মধু বর্ষণ করত!

ফুলটু সীট-এর ওপর নীলাদ্রির গা-ঘেঁষে দাঁড়িয়ে মা'র সঙ্গে 'হাসি-খুশি'র ছড়া বলছিল।

'গোরু-বাছুর—?'

'দাঁড়িয়ে আছে।' ফুলটু চটপট বলল।

'ঘুঘু পাখি—?'

'ডাকছে গাছে।'

'আচ্ছা এবার বল তো! উট চলেছে—?'

'মুখটি তুলে।'

'উঁচি—?'

'আছে ঝুলে।'

'বাঃ, সব ঠিক হয়েছে। আভা শ্রান্ত হয়ে ছড়ার ছেদ টানতে চাইল। কিন্তু মেয়ে অত সহজে ছাড়ল না। যতক্ষণ জেগে থাকবে মেয়ে, ততক্ষণ শুধু নিজে বকবে আর সকলকে বকাবে।

'সেই পান-সুপুরিটা বল।'

'কাল সকালে বলব। ওই, রাস্তায় কত কি যাচ্ছে দেখ না! কত আলো!' বলে আভা ফুলটুর রাস্তায় চোখ পাতল। গাছ পালা, আলো-অন্ধকার, বাড়ি-ঘর, আবর্জনা সব বিপুল বেগে ছুটে চলেছে। আভার মন আরো জোরে ছুটছিল। সে চোখ বুজল।

'বল না, পান-সুপারিটা বল না।' মেয়ে সমানে জেদ ধরে রইল।'

'তুমি বড় বিরক্ত কর, ফুলটু। তুমি নিজে বল না!

আচ্ছা, আমি বলছি। নীলাদ্রি কোনরকম দোঁড়া দেখলেই তাড়াতাড়ি আগুন নেভায়। অশান্তি মোটে পছন্দ করে না। বাঁ হাতে মেয়েকে কাছে টেনে নিয়ে সে সুর করে বলতে লাগল:

'চুল টানা বিবিয়ানা
বাবু-বিবির বৈঠকখানা
কাল বলেছে যেতে
পান-সুপুরি খেতে—

হল তো?'

'না।' মেয়ে আধো-আধো গলায় বলল। 'বাবু-বিবি নয়। সাহেব-বিবি। বাবা জানে না।'

তুমি তো জান। তবে তুমি বললে না কেন?' আভা পেছন থেকে বলল। মেয়ে সেকথা যেন শুনতেই পেল না। নীলাদ্রির কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল। 'আমরা কখন বাড়ি যাব বাবা?'

'এই যে মা, এখুনি পৌঁছে যাব।' নীলাদ্রি মেয়েকে বাঁ-হাত দিয়ে ভালো করে শুইয়ে দিল। 'তোমার ঘুম পাচ্ছে?'

মেয়ে কোন জবাব দিল না। একটু পরে ঘুমিয়ে পড়ল। আভা কোলের বাচ্চাকে পাশে শুইয়ে একটু হাল্কা হল তার পর মা থেকে স্ত্রীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে সামনের সীট

-এর পেছন দিকে তার চিবুক ঠেকিয়ে নীলাদ্রির ঘাড়ের কাছে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল।

'ওদের কেমন লাগল, তুমি তো বললে না?' আভা জিগ্যেস করল।

'ভালো-ই তো।' নীলাদ্রি ভদ্র গোছের জবাব দিল।

আভার মাসতুতো বোনের কন্ট্রাক্টর স্বামী চন্দননগরে নতুন বাড়ি করেছে। স্ট্র্যাণ্ড-এর কাছেই পেল্লায় বাড়ি। কলকাতার চাটা-লেটার-এর মতো আগাগোড়া বাড়িটা টীল ফ্রেমের। ভেতরে দু'খানা ঘর এয়ার-কণ্ডিশনড।

আজ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন সেই বাড়ির গৃহপ্রবেশ ছিল। অন্তত একশ জন লোককে সকাল থেকে গিয়ে খাবার-থাকার সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছিল মমতা আর গবেশ। মমতা নিজে এসে আভা আর নীলাদ্রিকে অনেক করে বলে গিয়েছিল। নীলাদ্রির তত খাবার ইচ্ছে ছিল না। 'বাচ্চা আছে, মুশকিল' বলে কাটাতে চেয়েছিল।

কিন্তু গবেশ তার অফিসে বারংবার ফোন করেছে। 'কোন ওজর শুনব না। আসতেই হবে তিন্ন। কুড়ি কিলো স্পেশাল ইলিশের বন্দোবস্ত করেছি। বাংলাদেশের। না এলে সব আনন্দই মাটি।'

নীলাদ্রি ফোনেই গবেশের চকচকে হাসি দেখতে পাচ্ছিল। ইলিশের মতো চকচকে আর পিচ্ছিল। কিন্তু আজ সকালে গবেশের মুখে হাসি ছিল না। বাংলাদেশের স্পেশাল ইলিশ পাওয়া যায় নি। নীলাদ্রি ঠাট্টা করে বলেছিল, 'কি হল? যে-মাছের জন্যে এই স্টুপিড ওয়ার, যার জন্যে এই ইনক্রেসন—সেই মাছই শেষ পর্যন্ত তোমাদের হাত থেকে পিছলে যাচ্ছে, গবেশ?'

গবেশ শুকনো হাসি হেসে বলেছিল, 'মাছও যে পাওয়ার-ব্লক করে তা তো জানতাম না, দাদা। আমার চেয়েও এক রহিম মাল আমার মাছটি হাতিয়ে নিয়েছে।'

রাত বেশি হয়নি। সবে সাড়ে আটটা। তবু এরই মধ্যে এসব জায়গায় বুক-চাপা অন্ধকার। রাস্তায় লোকজন তেমন নেই। দু'চারটে দোকানের আলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে। কখনো-কখনো ট্রানজিসটার থেকে এক-আধটা গানের সুর লাফিয়ে এসে গাড়ির সামনে পড়ছে। এসব জায়গাকে বিশ্বাস নেই। বিশেষ করে রাতে। নীলাদ্রি সেইজন্যে শ্যামবাজার, এস্‌প্ল্যানেড আর বালিগঞ্জ ছাড়া ভরসা পায় না।

'ওই লোকটা কে?' নীলাদ্রি গাড়িতে স্পীড তুলল।

'কোন্ লোকটা?'

'ওই যে 'আমাকে দেখ, আমাকে দেখ' মার্কা কাতর চোখ?

'ও। তুমিও নজর করেছ?' বাদামের খোলা ভাঙার মতো ভেঙে ভেঙে হাসল আভা। 'ও তো মন্টু। গবেশের খুড়তোতো বোনের স্বামী। ছেলে থাকতে খুব ছেলে বেলায় আমার খেলার সাথী ছিল।' আভা সীট-এর পেছন থেকে চিবুক তুলল। নীলাদ্রির কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে হাওয়ার মতো ফিসফিস করে বলল, 'আমার সঙ্গে একবার বিয়ের কথাও হয়েছিল।'

নীলাদ্রি স্টীয়ারিং হুইল আদ্‌সা করে ধরে রেখেছিল। গাড়ির স্পীড বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা ঝনঝন করে কাঁপছিল। নীলাদ্রি স্টীয়ারিং ছেড়ে ঘরে 'হুই' করে একটা শিস্ দিল।

'তাই বল! সেই থেকে বুঝি তোমাদের মন্টুর কাতর-কাতর চোখ?' আভা নীলাদ্রির পিঠে আলতো এক চৌকা দিল। 'যাঃ! ছোটবেলায় অতশত বুঝতাম না তো। পরে বুঝেছি ওর চোখটাই ওইরকম ভাল্'।

'আচ্ছা ওই মেয়েটিকে তো চিনতে পারলাম না!' লাইটারে সিগারেট ধরাতে ধরাতে জিগ্যেস করল নীলাদ্রি।

'কোন মেয়েটা?'

'ওই যে বাদুড়ের মতো কানে গুচ্ছের কি-সব ঝুলিয়ে এসেছিল। মেয়েটা এমনিতে দেখতে বেশ কিন্তু অমন ভয়ংকর সাজ-পোশাক করেছিল কেন?'

এই খেলা আজ বহুদিন ধরে চলেছে ওদের মধ্যে। এই 'কোন লোকটা?' আর 'কোন মেয়েটা?'-র খেলা। কিছু কিছু বাধ্যতামূলক সময় এক সঙ্গে কাটাতে হয়। ওরা সেইজন্যে এই সব কৌশল বার করেছে। খেলাটা অবশ্য খুবই করুণ।

'ও। তুমি জয়ন্তীর কথা বলছ? জয়ন্তী হচ্ছে আমার

বড় শিশেমশাইয়ের ছোট ভাইয়ের মেয়ে।' খুব সহজভাবেই বলল আভা। 'জঘন্য!' নীলাদ্রি সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে কথাটাকে বার করে দিল। 'না, না, জঘন্য হতে যাবে কেন? জয়ন্তী খুব ভালো মেয়ে।' ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি বলল আভা।

'আমি তোমার জয়ন্তীকে জঘন্য বলছি না। তোমাদের এই লতাপাতায় আত্মীয়-স্বজনের ব্যাপারটাই জঘন্য। ভীষণ ক্ল্যানিশ তোমরা, যাই বল। কেমন যেন নিজেদের নিয়েই মত্ত। আজকের দিনে আমি তো এসব ভাবতেই পারি না। খুব আগ্‌লি।'

আভা নিজেকে পেছনের সীট-এ ছেড়ে দিল। মাথাটা একবার এ-পাশ ও-পাশ গড়াল। তারপর খুব চাপা অথচ ধারাল গলায় বলল, 'কি করব বল। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী। নিজেদের নিয়েই মত্ত থাকি। তোমার মত বাইরের জিনিস নিয়ে তো মেতে থাকতে পারি না।'

আভার এ-কথায় স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল। 'বাইরের জিনিস' কথাটা ও এমন ভাবে বলল, যে নীলাদ্রির পিঠে সেটা ছুরির ফলার মতো আমূল বিঁধে গেল। নীলাদ্রি জানে এই ইঙ্গিতের পেছনে কি আছে! নীলাদ্রির পাপ। একটিমাত্র পাপ। তার জীবন-মরণের সমস্ত সীমানা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই শুভ্র পাপ। আভা সুযোগ পেলেই সেই কথাটা নীলাদ্রিকে একবার করে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এতক্ষণে যথার্থ কলকাতার হাওয়ার মধ্যে ঢুকল নীলাদ্রি। চারদিকে আলো, লোকজন, ব্যস্ততা। ট্রাফিকে ঘন-ঘন বাধা। ট্রাফিকে ঘন-ঘন আলোর রঙ বদলাচ্ছে। কোথায় একটা দমকলের গাড়ি ভীষণ শব্দে পাগলা ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চলে গেল। একটা লরির ব্যাক ফায়ারের শব্দ। কি প্রচণ্ড মাল চাপিয়েছে লরিটা। ওজনের ভারে নড়তে পারছে না।

এতক্ষণে নীলাদ্রির বেশ হাল্‌কা লাগছিল। শহরকে যারা জঙ্গল বলে, তারা সহজে হাততালি পায় বটে, কিন্তু নির্জনতা কি তারা জানেনা! নির্জনতার চেয়ে বড় শত্রু মানুষের আর কিছু নেই।

গাড়ীর এঞ্জিন থেকে বোলতা ওড়ার মতো আলাদা একটা শব্দ বেরিয়ে আসছে। শব্দটা আগে থেকেই হচ্ছিল। নীলাদ্রি কান পাতল। না, এঞ্জিনেরই শব্দ। কিন্তু একটা গোলমাল হয়েছে। গাড়িটা এবার গ্যারেজে পাঠাতেই হবে। আভাকে সে কথাটা বলতে যাচ্ছিল। কি ভেবে ফের ঘাড় ঘুরিয়ে নিল। আভা এখন এসব ঘরকন্নার কথা শুনতেই পাবে না।

হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে যাওয়ায় আভা হেসে উঠল। নীলাদ্রি সংকিত হয়েছিল। তার ঘাড়ের কাছটা শক্ত হয়ে উঠল।

'আচ্ছা, দেরাদুনের সেই লোকটার নাম কি বল তো? যে আধবুড়ো একটা বাঙালী। নস্যি দিয়ে খুব পান খেত! যখন-তখন চলে আসত আমাদের বাড়ি। সহজে উঠতে চাইত না। কি যেন নাম তার?'

নীলাদ্রিও হাসল। খানিক স্বস্তিতে, খানিক কৌতুকে। বিয়ের পর প্রথম পাঁচ মাস ওরা দেরাদুনে ছিল। কোম্পানী নীলাদ্রিকে বদলি করেছিল সেখানে। হাতে কাজ নেই বলে আভা সেখানে এক মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেছিল।

'কৃপাসিন্ধু'—মনে আছে এই ভরসায় নীলাদ্রি সবেগে আরম্ভ করেছিল। কিন্তু স্মৃতি তার তলা ফাঁসিয়ে রেখেছে। সময় মতো মনে করতে পারল না। 'কি যেন 'ম' দিয়ে পদবীটা। একটু অদ্ভুত ধরণের। লোকটার সিন্ধ্‌স নেই। হুট হুট করে চলে আসত। এলে উঠতে চাইত না। তোমাকে তো রান্নাঘর অবধি ধাওয়া করত। তোমার ওপর বিলক্ষণ টাঁক ছিল।'

লোকটাকে এখানো নীলাদ্রি চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পায়। গায়ে এক ঝলমলে পাঞ্জাবী; বুক সব সময় খোলা। মুখে সব সময় পান। এবং কালো কালো দাঁতে নির্বিরোধ কিন্তু নিরর্থক এক হাসি। এই গোলার্ধের মতো পেট। অত্যন্ত ভোজন-প্রিয় বাঙালী-প্রাণ বাঙালী।

'আচ্ছা মিসেস ভড়ভড়ের কথা তোমার মনে আছে? তার পুরো নামটা কি বল তো?'

'ও, সেই গুরুজীকি কিরপা!' নীলাদ্রি ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল। মহিলা কথায় কথায় 'গুরুজীকি কিরপা' বলতেন। একবার সকলে মিলে মুসৌরি যাওয়া হয়েছিল। মহিলা সমিতি ছিল, সঙ্গে মহিলা সমিতির স্বামীরাও ছিল। মিসেস ভড়ভড়ে পাহাড়ে উঠতে গিয়ে পা-হড়কে পড়ে যান। পড়তে-পড়তেও তিনি 'গুরুজীকি কিরপা' বলে চেঁচিয়ে উঠেছিলেন। গুরুজী অবশ্য কৃপা করেন নি। মহিলার পা ভেঙে গিয়েছিল। ছ'মাস বিছানায় শুয়েছিলেন। কি যেন নামটা ওঁর?

'মনে পড়ছে না তো?' আভা বলল। সামনের উইণ্ডশীল্ড-এ চোখ রেখেও নীলাদ্রি পেছনের সীট-এ আভার ছোট একটুকরো বাঁকা হাসি দেখতে পেল।

'মালিনী। মালিনী ভড়ভড়ে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, এবার বল তো!' আভাকে এখন জোর খেলা-তে পেয়েছে। সে আবার সামনের দিকে ঝুঁকে এল।

'গিরিধারী মিঠোলিয়ার সঙ্গে কি হয়েছিল?'

"ও, সেই সি-সি-গিরধারী মিঠোলিয়া? তোতলা কিন্তু বটানিস্ট ছোকরা?' নীলাদ্রি একটু সতর্ক হল। রেড রোড দিয়ে গাড়ি চলেছে তার। একটু পরেই টার্ন রোড। তারপর বাড়ি। কিন্তু আভা তাকে বোধহয় পরীক্ষা করতে চাইছে। তার স্মৃতিকে বাজিয়ে দেখছে। এই কলাফলেই নীলাদ্রির আন্তরিকতা, আন্তরিকতা সব প্রমাণ হয়ে যাবে।

নীলাদ্রি কথা ঘোরাল। 'জান আভা, গাড়িটা এবার গ্যারেজে দিতে হবে।' মুখে সময়োচিত গাম্ভীর্য আনল। 'তার মানে একগাদা খরচের ধাক্কা।'

কিন্তু আভা যেন গাড়িতে নেই। সে শুনতেই পেল না। স্মৃতিতে আবদ্ধ হয়ে রইল। তারপর যথা-সময়ে আবির্ভূত হয়ে বলল, 'সেবার যে-খুন মানে দেরাদুনে কি গরম। আমরা সহস্রধারায় নাইতে গিয়েছিলাম। তুমি যাও নি। অফিসে কাজ না কি বলে যেন গেলে না। তারপর কি হয়েছিল বল তো?' এক মুহূর্তের মধ্যে নীলাদ্রির চোখের সামনে প্রশস্ত রেড রোড গুটিয়ে ছোট্ট হয়ে গেল। মাথা ঠুকে গেল অন্ধকারে। তারপর হঠাৎ—'মনে পড়েছে। সন্ধ্যে হয়ে গেল। তোমরা ফিরছ না। আটটা বাজল। আমি ঘর-বার করছি। শেষে যখন পুলিশে খবর দেব কি না ভাবছি, তখন তোমরা এসে উপস্থিত। আমি রেগে তোতলা মিঠোলিয়াকে যাচ্ছেতাই বললুম। কেমন, ঠিক না?' 'হুঁ।' আভা গম্ভীর হয়ে গেল। 'কিন্তু সেটা যে মাসের কত তারিখ ছিল বল তো?'

'তা কি করে মনে থাকবে? তারিখ-টারিখ কি সব মনে থাকে!' নীলাদ্রি যেন আভার এই দিনানুগত অবিবেচনায় মনে-মনে কষ্ট পেল। 'জানি, তোমার মনে থাকবে না।' আভা জানত এ-খেলায় সে-ই জিতবে। প্রায়ই সে জেতে। জিতে তার আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে এবং হয়তো নীলাদ্রির সম্বন্ধে তার ধারণা আরো খারাপ হয়েছে। 'মনে থাকবার একটা বিশেষ কারণ ছিল। ২রা মে ছিল আমার জন্মদিন। অবশ্য এটা তোমার কাছে কোন কারণ-ই নয়। আর ঘটনাটা ঘটে ৪টা মে।'

বাড়ি পৌঁছে নীলাদ্রি আগে পোর্টিকোতে গাড়ি দাঁড় করাল। অত সময় সোমা গ্যারেজে ঢুকে যায়। ঘুমন্ত মেয়েকে তুলে তার আলাদা খাটে শুইয়ে এলো। আয়া এসে বাচ্চাটাকে কোলে নিল। তারপর নীলাদ্রি গাড়ি গ্যারেজে তুলে জামাকাপড় ছাড়ল। চোখে মুখে জল দিয়ে এসে বেড়িও খুলে বসল।

আভা ততক্ষণে কিচেনে গেছে। ছেলে-মেয়ের দুধ গরম করবে। ফ্রাস্ক-এ ভরবে। নীলাদ্রি রাগে রেডিও বন্ধ করে দিল। একটা লোক কাঁপা-কাঁপা, নাটুকে গলায় 'পাকিস্তান, যুদ্ধবন্দী' এইসব বলে চেঁচাচ্ছে। পঁচিশ বছর ধরে ভারত কিছুতে পাকিস্তান-মোহের ঊর্ধ্বে উঠতে পারছে না। ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি মানে পাকিস্তান।

আভা ঘরে এলো। দুধের ফ্রাস্ক ঠিক জায়গায় রাখল। ঘরের বড় আলো নিভিয়ে দিয়ে সবুজ আলো জ্বালল। বাইরের জামাকাপড় ছেড়ে নাইটি পরে নিল।

পা মুছে বিছানায় শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, হঠাৎ কি যেন মনে পড়ে গেল।

'জেলুসিল আছে? একটা দাও তো! গলার কাছটা জ্বালা করছে।'

নীলাদ্রি ড্রয়ার হাতড়ে একটা জেলুসিল বার করে দিল।

আভা সেটা লজেন্সের মতো মুখে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'এরা খাওয়ার জন্যে বড় জোরাজোরি করে। পারলে যেন গিলিয়ে দেয়। এতরকম কখনো খাওয়া যায়?'

সারাদিন ধরে কম ধকল যায় নি। একশ লোকের সঙ্গে হেসে-হেসে, ঘুরে-ঘুরে কথা বলা-ও কি কম পরিশ্রম! হাঁটু, চোয়াল ব্যথা হয়ে যায়। আভা শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

নীলাদ্রি সবুজ আলোয় বসে বসে সিগারেট খেতে লাগল। বুকের ভেতর চাপা অস্বস্তি। কি যেন আঁচড়ে বেড়াচ্ছে। আভার সঙ্গে সে পাল্লা দিয়ে পারছে না। দেরাদুনের সেই তিনটে মাস ওর কাছে এত মূল্যবান। সব স্মৃতি কি মনে সাজিয়ে রেখেছে! মন না করলে তো কোন জিনিস থাকে না?

দেরাদুনের আভাকে আস্তে-আস্তে মনে পড়তে লাগল নীলাদ্রির। তখন কত ছিপছিপে ছিল আভা; পীচ-ফলের মতো গায়ের রঙ ছিল। নীলাদ্রি বলত, চোখে হিজলের ছায়া আছে তোমার, আভা। আভা হাসত আর পা দুলিয়ে দুলিয়ে বলত, সব মিথ্যে কথা। প্রথম ওরা ক'দিন মুসৌরিতে ছিল। দেবদারু আর পাইনের বন থেকে কি ভিজে-ভিজে গন্ধ ভেসে আসত। সন্ধ্যেবেলা মল্-এ দাঁড়িয়ে গলায় মালা পরা দেরাদুন শহর দেখত। ক্লেটিং রিংক-এ গিয়ে আভা কিছুতে স্কেটিং করবে না। আর নীলাদ্রি তাকে ছাড়বে না। রাতে কারার প্রেসের সামনে একটা শাল দু'জনে জড়িয়ে বসে থাকা—

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ নীলাদ্রি পেয়ে গেল। হ্যাঁ, মনে পড়েছে। নীলাদ্রি চেয়ার ছেড়ে উঠে খুব নরম গলায় ডাকল 'আভা'। ডাকল বটে কিন্তু ঘুম থেকে আভাকে সে তুলবে না। তা-ও সে জানতো—আভা ঘুমোক। 'কিন্তু আভা, দেরাদুনের সেই আধ-বুড়ো, নস্যি দিয়ে পান-খাওয়া কৃপাসিন্ধুর পুরো নামটা মনে পড়েছে?' কৃপাসিন্ধু মাসচটক।'

• • • •

"বলো কি তুমি। সংস্কৃতি ছাড়া কোনো জাত বাঁচতে পারে? পারলেই বা সে বাঁচার মূল্য কি? আমি দেশ বিদেশের নানা দুনিয়ার খবর জানি। চীন, জাপান, রুশিয়া, জার্মানী, ইতালী সব দেশে আমি গিয়েছি। যে কোনো জাত, তারা যত বড় বিপদেই পড়ুক না কেন, তখনও তারা সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিকের চর্চা অব্যাহত রেখেছে। তুমি দেশের স্বাধীনতা আনতে চাও? কিন্তু দেশের লোকের মন যদি না জাগে, তবে কাকে দিয়ে তুমি কি করবে? কেউ তোমার ডাকে সাড়া দেবে না। তোমার সমস্ত প্রয়ত্ন পণ্ড হবে। দেশের মনটাকে আগে উদ্বুদ্ধ করে তোলা চাই। তা করতে হ'লে চাই যথোচিত সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টা। তা না হলে তুমি কেমন করে কি করবে? সব সংস্কৃতির মূল কথা হচ্ছে লোকের মনটাকে জাগানো এবং নব নব প্রচেষ্টার প্রেরণা জোগানো। জাতির পক্ষে এর প্রয়োজন সর্বত্র ও সর্বদা, এর মধ্যে কোনো সময় অসময়ের কথা নেই। এর প্রয়োজন সকল প্রয়োজনের উপরে। যে জাতের সংস্কৃতির প্রতি দরদ নেই —সে সম্বন্ধে আন্তরিক প্রচেষ্টা নেই, সে জাত মরতে বসেছে—তার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।"

—রবীন্দ্রনাথ

দারোগার মিছিল

বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়

বৃটিশের আমলে 'স্বদেশী' করার অপরাধে (?) হাজার হাজার কিশোর ও যুবককে বছরের পর বছর রাজবন্দী জীবন যাপন করতে হয়েছিল। আমিও তাদের মধ্যে একজন। প্রথম যেবার রাজবন্দী ছিলাম তার বয়সের কিছু বেশী, দ্বিতীয় বেলা প্রায় আড়াই বছর। একুশ বছর বয়সে বন্দী হয়ে যখন মুক্তিলাভ করলাম, তখন দাড়ায় পেরিয়ে গেছি। দ্বিতীয় বার যখন গ্রেপ্তার হই, তখন চৌত্রিশ পেছনে ফেলে এসেছি।

রাজবন্দীদের নানা জায়গায় রাখা হত। কখনো বাংলার জেলে, কখনো বাংলার বাইরে অন্য প্রদেশের জেলে, আবার কাউকে কাউকে পাঠানো হয়েছিল ভারতেরও বাইরে সুদূর বর্মার জেলে। বাংলায় ছিল তিনটি রাজবন্দী শিবির, হিজলিতে, বহরমপুরে আর জলপাইগুড়ী জেলার বক্সা-দুর্গে। তারপর আর একটি বন্দী শিবির তৈরী করা হয়েছিল সুদূর রাজস্থানের দেওলিতে। এগুলো ঠিক ঠিক জেল নয়, এখানে গার্ড যারা ছিল, তারা জেল ওয়ার্ডার নয়। আমরা হিংসার পথে বোমা রিভলবার দিয়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টকে খতম করতে চেয়েছিলাম, তাই আমাদের মনে করা হত 'ওয়ার প্রিজনার'—যুদ্ধবন্দী, তাই আমাদের পাহারা দিতেন রেগুলার কোনো রেজিমেণ্ট, কোন সৈন্য বাহিনীর সৈন্যেরা, আমাদের শিবিরের অধিকর্তাকে সুপারিনটেনডেণ্ট বলা হত না, বলা হত কমাণ্ডাণ্ট। এবং তিনি অবশ্যই হতেন সৈন্যবাহিনীর কোন ক্যাপটেন অথবা লেফটেন্যাণ্ট, মেজর অথবা কোন কর্ণেল।

অনেকেরই বন্দীজীবনে শাস্তি বলে কিছু ছিল না। যেখানেই গেছে সেখানেই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ঠোকাঠুকি সুরু হয়ে গেছে। ফলে বারবার গভর্ণমেণ্ট তাদের, বিড়াল যেমন ছানা মুখে করে এখানে ওখানে রাখে, কোথাও রেখে স্বস্তি পায় না, তেমনি করে জেল থেকে বন্দী-শিবিরে, শিবির থেকে নানা গ্রামে অন্তরীণে বদলী করত। রাজবন্দীকে শাস্তি দিতে নয়, নিজেরা শান্তি পেতে।

আমার বন্দী জীবনও এমনি অশান্তিময় ছিল। ফলে অনেকবার স্থানান্তরিত হয়েছি।

প্রত্যেকেরই বন্দী জীবনে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের যে প্রত্যক্ষ প্রতিনিধিটির সঙ্গে একাধিকবার মোলাকাৎ হয়েছে, তার নাম দারোগা। দারোগা আসিতে, দারোগা অস্তে। গ্রেপ্তার করে দারোগা, আবার মুক্তি দেবার সময়ও সরকারী তকমাআঁটা হাতে তুলে দেয় দারোগা। মধ্যেও অনেকেরই ভাগ্যে দারোগা আঠার মতো সেঁটে ছিল। গ্রামে যারা অন্তরীণ ছিল, তারা তো থানার দারোগার সঙ্গেই অথবা বলা যেতে পারে, তারই অভিভাবকত্বে (?) বাস করত। স্বগৃহে অন্তরীনদের গৃহেও যখন তখন ধূমকেতুর মতো এসে হাজির হতেন যিনি, তিনি দারোগা!

আমার হাজারো বাহু বন্দিত্ব বন্দী জীবনে হাজারো দারোগার সঙ্গে ভেট হয়েছে বলা যেতে পারে। স্মৃতি-চারণ করতে গিয়ে মনে হচ্ছে, সেই দারোগাদের এক জায়গায় জমায়েৎ করতে পারলে একটা মিছিলই বার করে ফেলা যায়। দারোগার মিছিল!

আমাদের শত্রু ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের গন্ধ গায়ে লেগে আছে বলে সে যুগে রাজবন্দীরা দারোগামাত্রকেই শত্রু বলে মনে করত। আমিও করতাম। আজ এতকাল পরে তাদের স্মৃতি উদ্ধার করতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি, না না, তাদের মধ্যেও প্রহ্লাদ যে একেবারে ছিল না, তা নয়!

কয়েকজন দারোগার কাহিনী বলছি—

আদিতে যিনি অর্থাৎ ১৯০১ সালে ডিসেম্বর মাসে

১৯৩০ সালে বিধিবদ্ধ বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে যিনি ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত আমাদের কেয়টখালী গ্রামের বাড়ী থেকে আমায় গ্রেপ্তার করেছিলেন, তাঁর নাম রাজেন্দ্রনাথ দাস। আমাদের শ্রীনগর থানার দ্বিতীয় অফিসার।

কলকাতায় ছিলাম। ছিলাম একটু গা ঢাকা দিয়েই। আমাদের ভবানন্দ রোডের বাড়ীতে থাকতাম পণ্ডিতিয়া হোস্টে। পণ্ডিতিয়া তখন শহরতলী, আম, কাঁঠাল, নারকেল, পেয়ারা, ঝোপঝাপ, জঙ্গল, মাঠ, পুকুর, খানা-ডোবা—পণ্ডিতিয়া তখন গ্রামাঞ্চল। গোয়ালন্দে ষ্টীমার কোম্পানীর চাকুরে এক বন্ধুর বাড়ী আমাদেরই পাড়ায়। অসুস্থ হয়ে সে বাড়ীতে পৌঁছে দিতে লিখেছিল, তাকে নিয়েই কেয়টখালী এসেছিলাম। এসেই এই বিভ্রাট!

রাজেনবাবুর সঙ্গে অপেক্ষমান নৌকোয় উঠলাম। নৌকো চলল শ্রীনগর অভিমুখে। মাইল চারেক দূরে। রাজেনবাবু সিগারেট ধরিয়ে বলতে লাগলেন, কি আমরেকেন্ট কাণ্ড! আমরা মশাই, চোর বদমাস নিয়েই ব্যস্ত, এরই মধ্যে আবার আই-বি-দের ফরমাস খাট। কেন বাপু, তোমারও তো পুলিশ, ভদ্রলোকের ছেলেদের নিয়ে টানাটানি তোমরাই কর না কেন। সাক্ষী-টাক্ষী আদালতে হাজির করবার হাঙ্গামা নেই, ব্যস, ধরে ডেটিনিউ করে রাখলেই হল যত দিন খুশী।

আমি নীরব শ্রোতা, কারণ আই-বি হোক আর থানাই হোক, পুলিশকে আমরা আদৌ বিশ্বাস করতাম না। সুবিধে ও সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে

রাত প্রায় এগারোটায় থানার ঘাটে নৌকো ভিড়ল। রাজেনবাবু প্রহরারত সিপাই-এর কাছে শুনতে পেলেন বড় ও ছোট দারোগা কোয়ার্টার্সে চলে গেছেন। এক মুহূর্ত কি ভাবলেন রাজেনবাবু, তারপর বলে উঠলেন, চলুন আমার বাসায়, খাবেন চলুন।

বলেন কি! বাধা দিয়ে বললাম, ডেটিনিউকে বাসায় নিয়ে খাওয়ালে চাকরিটি খোয়াবেন।

শুনলেন না। নিয়ে গেলেন। ওঁর স্ত্রী নানারকম উপাদেয় খাদ্য বাটিতে বাটিতে সাজিয়ে দিলেন, দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ালেন, আহারের শেষে পান নিয়ে এলেন। পান খাইনা শুনে ভাজা মশলা নিয়ে এলেন।

গ্রাম্য থানার লক-আপ অর্থাৎ গারদকে নোংরা গুদাম বলা যায়। কত কালের ময়লা ধুলা খাতা ও ফাইল এখানে ওখানে স্তূপীকৃত, একটা ভাঙা চেয়ার, দুটো জলহীন কুঁজো, ছেঁড়া সিপাইদের বুট কয়েকটা আর হাঁটু সমান ধুলো।

মেহাৎ আমি রাজবন্দী, ওঁর বাড়ীতে শুতে দেয়া বিপজ্জনক, বার বার সে কথা বলে দুঃখ প্রকাশ করে রাজেনবাবু বাড়ী থেকে ভাল বিছানা, লেপ ও মশারী নিয়ে এসে সেই ধূলিধূসরিত গারদের মধ্যেই নিজের হাতে পরিপাটি করে বিছানা করে মশারী টাঙ্গিয়ে দিয়ে বিদায় নিলেন।

পরদিন, আই বি যা নির্দেশ পাঠিয়েছে, আমায় নিয়ে যাওয়া হবে ঢাকা আই বি অফিসে। শ্রীনগর থেকে নৌকোতে নৌহজং, সেখান থেকে ষ্টীমারে নারায়ণগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ থেকে ট্রেনে ঢাকা।

নৌকো এল, ছজন সশস্ত্র সিপাই নৌকোয় উঠলাম। সঙ্গে চললেন দারোগা সীতানাথ সেনগুপ্ত। শ্রীনগর থানার ওসি অফিসার।

নৌকো থানার গণ্ডী ছাড়িয়ে মাঠে পড়তেই অকস্মাৎ দারোগার অদ্ভুত প্রশ্ন, আপনার নাম?

গা জ্বলে গেল! যেন আমার নাম ধাম না জেনেই উনি আমাকে এসকোর্ট করছেন। আর যদি না জেনেই এসে থাক, তাহলে আর জেনে কাজ নেই। আমার ভাবলাম, থাকগে। মাত্র কয়েক ঘণ্টার পথের সঙ্গী, পরে হয়তো জীবনেও আর দেখা হবে না, কি হবে ঝগড়া করে? বললাম, বিজেন গাঙ্গুলী।

শুনেই সীতানাথ পকেট থেকে একটা ছ' ভাঁজ করা বড় মনিব্যাগ বার করলেন এবং তার একটি ক্ষুদ্র খোপ থেকে ছোট এক টুকরো কাগজ বার করে আমার চোখের সামনে মেলে ধরলেন, দেখলাম, তাতে স্পষ্টভাবে পেনসিল দিয়ে লেখা, বিজেন গাঙ্গুলী!

ব্যাপার কি? দারোগাটিকে তো কোনদিন কোথাও

দেখেছি বলে মনে পড়ছে না, অথচ ওর মনি ব্যাগে কাগজের টুকরোয় আমার নাম। কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

সীতানাথ কাগজখানা ব্যাগে রেখে ব্যাগটা পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, বলব সব পরে। থানা থেকে আরও খানিকটে ঘুরে নিয়ে নিই। মৃদু হেসে বললেন, দেখুন, কি অদ্ভুত ব্যাপার। আপনার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ নেই, পরিচয় নেই, অথচ আমার ব্যাগে আপনার নাম। কারণ কি?

মনে মনে বললাম, আমারও তো সেই প্রশ্ন, কারণ কি?

প্রায় আধ ঘণ্টা চলবার পর দারোগার আবার প্রশ্ন, গণেশ বোসকে চেনেন জিতেনবাবু? গণেশ বোস? আপনাদের গ্রামের কালাচাঁদ দাসের বোনের জামাই? ডেকেছিলেন নাকি তাকে সিরাজ হীরা পোষ্টাল ব্যাগ ডাকাতির জন্য? রাজদিয়া গ্রামে আপনার কে বন্ধু আছেন? মধুসূদন ভট্টাচার্য্য তাঁর নাম? তস্কর গ্রামের সুবোধ চক্রবর্তী আপনাদের দলের ছেলে?

সেই মুহূর্তে যদি নৌকোর ওপর বজ্রপাত হত, তাহলেও এতটা বিস্মিত হতাম না!

সীতানাথ বলতে লাগলেন, মাস দুয়েক আগে আপনার বাড়ী নিয়ে বিভিন্ন গ্রামের সুবোধ গুহ ও পূর্ণিশবালা বাড়ীতে তল্লাসী করা হয়। আপনি বাড়িতে ছিলেন না। শেখরনগর গ্রামের সুবোধ গুহ ও গণেশ বোসের বাড়ীও তল্লাসী হয়। গণেশের বাড়ীতে পাওয়া আপনার সুবোধ গুহকে লেখা একখানি দু লাইনের চিঠি। আপনার বা সুবোধবাবুর কারুর নাম নেই তাতে। কিন্তু অর্থবোধক চিঠি!

ঝক্ করে মনে পড়ে গেল সেই ঘটনাটা। সেরাজ-হীরা পোষ্ট অফিসের জানায় পোষ্টাল ব্যাগগুলো নিয়ে যখন পাটক্ষেতের আইল বয়ে ইছাপুরার দিকে যাবে, তখন মাঠের মাঝখানে প্রয়োজন হলে তাকে হত্যা করে ব্যাগ-গুলো ছিনিয়ে আনতে হবে, এমনি প্ল্যান করে সুবোধ গুহের কাছে একটি 'বেষ্ট বয়' চেয়ে পাঠিয়েছিলাম, সুবোধ পাঠিয়েছিল গণেশ বোসকে। হঠাৎ খবর পেলাম, কদিন বৃষ্টি হবার ফলে যাবার যাবার রাস্তা জলে ডুবে গেছে সুতরাং গণেশকে বললাম ফিরে যেতে। সে বার বার পীড়াপীড়ি করতে লাগল সুবোধের নামে একখানা চিঠি লিখে ওর হাতে দিতে, নইলে সুবোধ নাকি বিশ্বাসই করবে না যে, গণেশ এসেছিল। খুব অনিচ্ছার সঙ্গে আমি একখানা চিরকুটে লিখে দিয়েছিলাম, সে কাজ হল না। জল এসে পড়েছে। হলে আবার জানাব। পরশু আপনার বাড়ীতে যাব দুপুরে। না খেয়ে কিন্তু ফিরব না। খাবার ঠিক রাখবেন।'

পুলিশ জানত যে 'খাবার' মানে রিভলভারের বুলেট। ওদের ধারণা, আমার হেফাজতে রিভলভার আছে। কিন্তু গণেশ সেই 'বেষ্ট বয়'!' উঃ, কানের পাশ দিয়ে বুলেট চলে গেছে! যদি ব্যাগ ডাকাতি কাজে গণেশকে পাঠাতাম?

সীতানাথ বলতে লাগলেন, জিতেনবাবু, গণেশ আই বি পুলিশের ইনফরমার। আপনাদের দলে নাম লিখিয়ে আপনাদের খবরগুলি আর চাকাতে নিয়ে যায় না, আমাদের থানার বড় বাবুর কাছে নিয়মিত জানিয়ে যায়, বড় বাবু টাকা দেয়। বড়বাবু ঘরে খিলখিল করে বললেও আমাদের ঘর থেকে আপনার নামটা প্রায়ই গণেশের মুখে শুনতাম। তাই একটা কাগজে লিখে ব্যাগের মধ্যে রেখে দিয়েছিলাম, ইচ্ছে ছিল আপনাদের ওদিকে গেলে আপনাকে জানিয়ে আসব।

বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়! সীতানাথ দারোগা কি ইংরেজ সরকারের বেতনভুক্ত কর্মচারী, না বিপ্লবী দলের শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু? আমার শত্রুপক্ষের লোক, না আমার পরম সুহৃদ? আই বি টের পেলে ওর সন্ধান যাবে, তা কি আর ও জানে না? তবে এই মারাত্মক ঝুঁকি কেন নিচ্ছে? কেন নিচ্ছে?

এ প্রশ্নের জবাব নেই।

১৯৩০ সালের এপ্রিলে বহরমপুর বন্দী শিবির থেকে কেরটখালীতে এনে আমার স্বগৃহে অন্তরীণ করা হয়েছে। সে বছর শীতকালে গভর্ণমেণ্ট একটা নতুন ব্যবস্থা প্রয়োগ

করেছিল। বিক্রমপুরের প্রায় সব কটি থানাতেই এক সেকশন করে গোরা সৈন্য পোষ্ট করা হয়েছিল। খাঁটি বিলিতি লাল মুখ সাহেব, যারা মুখ ছাড়া কিছু জানে না, বোঝে না, যাদের মুখে চুরোঘা ইংরেজী ভাষা। বিক্রমপুরের যত্রতত্র অন্তরীণ সমস্ত টেরোরিষ্টকে (?) এবং সন্দেহভাজনকে টেরোরাইজ করবার উদ্দেশ্যে থানার দারোগা যখন-তখন বাড়ী তল্লাসী করতে গেলে লাল পাগড়ীর সঙ্গে এই গোরা সৈন্য সঙ্গে যেত। বাড়ীর মধ্যে ঢুকত না ওরা, বাড়ী ঘিরে রাখত, তবে সঙ্গে মিলিটারী রাইফেল, রেমিংটন রিভলভার সবই থাকত।

হঠাৎ একদিন ভোর হতে না হতেই গোরা সৈন্যদলের একটি সেকশন এসে আমাদের বাড়ী ঘিরে ফেলল। সঙ্গে দেখলাম, লাল পাগড়ী সিপাইও আছে। আর আছেন একজন ভুঁড়িওয়ালা দারোগা। বড় দারোগা কলিমদ্দীন সরকারকে চিনতাম, ভুঁড়িয়ালকে দেখিনি। মেজো বা সেজোও হতে পারেন। সীতানাথ রায়ের দুই দারোগাই বদলি হয়ে গেছে।

জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি শ্রীনগর থানা থেকে আসছেন?

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন, তা দিয়ে আপনার দরকার কি? এখন যা বলি, তাই করুন!

হ্যাঁ, একেই বলে দারোগার মেজাজ! মনে মনে বললাম, হুকুম করুন শাহাজাদা!

কিন্তু শাহাজাদা কিছুই হুকুম করলেন না। শুধু বললেন, সার্চ হবে। পুলিশ দলকে বললেন, সার্চ সুরু কর। তারপর এদিক ওদিকে তাকিয়ে ইশারায় আমায় একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, আছে নাকি কিছু? যদি থাকে তো বলুন, আমি পুলিশদের নিয়ে ওদিকটাতে যাচ্ছি, আপনি সরিয়ে ফেলুন। নইলে পোটলা করে পুকুরে ফেলে দিন, আমরা চলে গেলে তুলে নেবেন। আছে?

বললাম, কিছু নেই। কোনওকালে ছিল না।

কুমড়োবিনিন্দিত গাল দুটো যেন শক্ত হয়ে উঠল, জানাবিনিন্দিত ভুঁড়িটাও বুঝি!

গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন।

ওদিকে চলছে তন্ন তন্ন করে তল্লাসী। আমাদের বাড়ীটা যে বিরাট, তা নয়। কিন্তু আমার বাবা ছিলেন উচ্চপদস্থ রেলওয়ে অফিসার। ত্রিশ বছর চাকরি করবার পর রিটায়ার করে দেশের বাড়িতে এসেছেন ১৯২৯ সালে। আমার বয়স তখন চোদ্দ, জীবনে প্রথম দেশের বাড়ীতে এলাম। চাকরি জীবনে যা হয়, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র শুধু বেড়েই চলে। ত্রিশ বছর ধরে বেড়ে যাওয়া সেইসব এসেছে বাড়ীতে, সিন্দুক তো আগেই ছিল, তার ওপর এসেছে নানা আকারের বাক্স, ট্রাঙ্ক, সুটকেস ও গোটা তিনেক আলমারী, তারপর সাবেকী বাসনকোসন রাখার বিরাট বাক্স, যাকে বলা হয় আঠের সিন্দুক, খাটের নীচেই বা কত বাসন, হাড়ী, পাতলা, ডেকচি, কড়াই, তারপর গোটা চারেক বেতের বাক্সিল কড়ির সঙ্গে টাঙানো—ঘণ্টা চারেক তল্লাসীর পর গলদঘর্ম হয়ে সিপাইরা এসে সেলাম ঠুকল, হুজোর, কুছ মিলা নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে দারোগাবাবু সার্চ লিষ্টে যখন ক্রস চিহ্ন দিচ্ছিলেন, আমি বলে উঠলাম, ইস, তাহলে কষ্ট হল সিপাইদের আর আপনার—এক কাপ চা খাবেন?

Shut up, গর্জন করে উঠল দারোগা, চালাকির আর জায়গা পাও না? বলেই সে বাইরে বেরিয়ে আসতেই আমিও বেরিয়ে এলাম। ও যেমন 'আপনি' থেকে 'তুমি'-তে নেমেছে, আমিও তেমনি একেবারে 'তুই' সম্বোধন করলাম, কি বলছিস তুই?

দারোগা বলল, গোরা সৈন্যদের বসবার জন্য যাও, কয়েকটা চেয়ার এনে দাও—

Shut up! আবার দারোগার চীৎকার।

তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম, সে জন্য তো গভর্ণমেণ্ট তোকেই চাকর রেখেছে।

আমিও বসিয়ে দিলাম কষে এক লাথি ওর থলথলে পেটে।

কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। গোরা সৈন্যগুলি ক্ষেপে ওঠা দূরের কথা, ওরা যেন বেশ এনজয় করল। ওদের দলপতি এগিয়ে এসে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে ওদের অযোধ্য ইংরেজী ভাষায় কি বলে উঠল আর সবাই হাসতে লাগল।

১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে স্বগৃহে অন্তরীণ অবস্থা থেকে স্থানান্তরিত হলাম গ্রামে। গ্রামে, মানে ঢাকা জেলা থেকে একেবারে মেদিনীপুর জেলায় কাঁথি মহকুমার অন্তর্গত কেশিয়াড়ী গ্রামে। কেশিয়াড়ী থানা ক্যাম্পাসের মধ্যেই আমার জন্য তৈরী কোয়ার্টারে বাস।

ছোট থানা কেশিয়াড়ী। একজন দারোগা, একজন সহকারী দারোগা আর যত দূর মনে পড়ে, আট জন সিপাই, তার মধ্যে একজন এল সি অর্থাৎ লিটারেট কনেষ্টবল।

এসেই লক্ষ্য করলাম, দারোগা আর সহকারী দারোগার মধ্যে সদ্ভাব নেই। দারোগা ক্ষীরোদ হস্ত সুযোগ পেলেই আমার কাছে সহকারী দারোগা অবিনাশ ঘোষের, বিশেষ করে তাঁর তৃতীয় পক্ষের সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রীর নিন্দা করেন, আবার অবিনাশও সুযোগ পেলেই আমার কাছে দারোগার শ্রাদ্ধ করেন। জানেন বিজেনবাবু, এই ক্ষীরোদ ব্যাটা ছিল এ এস আই, বিয়ে ম্যাট্রিক, নবগ সত্যাগ্রহীদের এক মিছিলের ওপর গুলী চালিয়ে তুজনকে মার্ডার করেছিল—ব্যস, অমনি প্রমোশন অফিসিয়েটিং এস আই এবং তারপরই থানার ইনচার্জ। নইলে আমি ঐ ব্যাটার চাইতে অন্ততঃ দশ বছরের সিনিয়র, আমি কেন অফিসিয়েটিং পাব না? যেন এই নালিশের জবাবটা আমিই দোব, এমনি ভাবে আমার চোখের দিকে চেয়ে রইলেন, তারপরই গলাটা অকস্মাৎ খাটো করে বললেন, কি বলব মশাই, কেসের ব্যাপারে ব্যাটা মফঃস্বলে গেলেই রাত কাটিয়ে আসে আর চৌকিদারকে পাঠিয়ে গাঁয়ের সাঁওতাল মেয়ে একটাকে আনিয়ে রাত্রে ওর গরুর গাড়ীতে রাখে। কারুর বাড়ীতে থাকলে সেখানেই আনায়। সারাটি রাত মদ আর মেয়েমানুষ। ছিঃ ছিঃ ছিঃ শুনে আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যায়। তারপর গলাটা আরো খাটো করে বললেন, কি বলব মশাই, আমার স্ত্রীকে ডাকে বৌদি বলে—বৌদি, মানে বড় ভাইয়ের বৌকে আমরা তো মশাই, মাতৃস্থানীয়া বলেই জানি—সেই মাতৃসমা বৌদিকে আড়ালে পেলেই বলে কিনা, বৌদি, তোমার যা সুন্দর ফিগার না, আরও তিন বার বিয়ে দেয়া যায়—শুনেছেন, শুনেছেন বিজেনবাবু, এমনি লম্পট কেসের কথা? শালার চৌদ্দ পুরুষের গালি যে, আমি সেদিন মফঃস্বলে ছিলাম—

আমার দারোগা যা বলেন, তার মর্মার্থ হল, বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে যে, অবিনাশবাবু যাকে তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী বলে পরিচয় দিচ্ছেন, আসলে ও মেদিনীপুর সহরের একটি বারবণিতা, সহরে পোস্টিং থাকার সময় ওর বাড়ীতে অবিনাশের যাতায়াত ছিল, তার ফলে ওর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী আত্মহত্যা করে, কেশিয়াড়িতে আসবার সময়, বুঝলেন বিজেনবাবু, সেই মেয়েমানুষটাকেই বৌ সাজিয়ে এনে বলছে, তৃতীয় পক্ষ, তা নইলে—গলাটা খাটো করলেন ক্ষীরোদবাবু, আমি ওকে বৌদি বলে ডাকি, শুনেছেন কোনো বৌদি ঠাকুরপোকে হেসে হেসে জিজ্ঞেস করে, ঠাকুরপো, ছাখ তো ভাই, আমার ফিগারটা কেমন? তোমার পছন্দ হয়?

ওদের মনোমালিন্যের ফলে আমার বেশ সুবিধা ছিল। দারোগা মফঃস্বলে গেলেই আমার স্বাধীনতা। জমাদারের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা, ওঁর বাড়ীর লুচি তরকারীতেই ফার্স্ট ক্লাস ব্রেকফাষ্ট, সাইকেলে যত্রতত্র ভ্রমণ, দ্রষ্টব্য চিকিৎসালয়ের কম্পাউণ্ডার বিনোদবাবুর বাড়ীতে খবর দিয়ে আনা গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে 'স্বদেশী' আলোচনা—সবই চলে।

তবে সবার কাছেই শুনতে পাই ক্ষীরোদ দারোগা দুশ্চরিত্র ও মদখোর এবং আমার রাধুনী ও ঝি হরিমতীর কাছে শুনতে পাই, অপকার্যে প্রবল আপত্তি ও কান্নাকাটি করেন বলে দারোগা তার স্ত্রীকে মাঝে মাঝেই প্রহার করে। এতে আমার কিছু যায় আসে না বটে, তবু মহিলাটির দুঃখময় জীবনের কথা মনে হলে কেমন যেন লাগে।

ভেবেছিলাম এই কেমন লাগাটা সময়ের ব্যবধানে কমে যাবে এবং একদিন হয় ওরা, না হয় আমি এখান থেকে বদলি হয়ে গেলেই এখানকার কথা একেবারেই ভুলে যাব। কিন্তু কে জানত যে, কেশিয়াড়ী থানায় রাজবন্দী আমাকে অকস্মাৎ একটি ঘনায়মান উপন্যাসের উত্তপ্ত আখ্যায়িকার সম্মুখীন হতে হবে।

একদিন আমার রাত্রির আহারের পরে কাজকর্ম শেষ

করে আমার কথাইও হ্যাও হরিমতী যখন রান্নাঘরে ভালো এঁটে চলে গেল, তখন প্রায় এগারটা। বাহিরে জোৎস্না, ঝিরঝিরে হাওয়া, পাশেই আমার নিজের হাতে তৈরী ফুলের বাগান থেকে ভুরভুরে গন্ধ আসছে। বারান্দায় চেয়ারখানা বার করে বসলাম।

বসতেই দেখি, হরিমতী আসছে। জিজ্ঞেস করলাম, কি হরিমতী ফিরলে যে? দারোগাবাবু ফিরে এসেছেন? তোমায় আর থাকতে হবে না ও বাড়ীতে?

না বাবু, দারোগাবাবু আজ আসবেন না, হরিমতী জবাব দিল, আমায় এখানে থাকতে হবে। আবার এলাম বাবু—হরিমতী ইতস্তত: করে থেমে গেল।

কি? কেন এলে?

বাবু, মা ঠাকুরুণ আপনাকে একবার যেতে বলেছেন এখনই—

চমকে উঠলাম, এ্যাঁ, বল কি? মা ঠাকুরুণ মানে দারোগাবাবুর স্ত্রী? আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ নেই, পরিচয় নেই, তারপর দারোগাবাবু নেই বাড়ীতে, এখন রাত এগারোটা—কি যে বলছ হরিমতী, যাও এখন—

উনি বললেন, বিশেষ দরকার—

কি দরকার তা বলেননি, হরিমতী বলল, শুধু বলে দিয়েছেন, বিশেষ জরুরী—

জরুরী!

আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। চলুন না একবার।

মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল। রাত দুপুরে আমার সঙ্গে মহিলাটির কিসের দরকার? দারোগাবাবুর অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়ীতে যাওয়া, এ যে সাংঘাতিক অপরাধ! উৎসুক্য অনুভব করছি বটে, শ্রীমতী দারোগা হয়তো শ্রীমতী সহকারী দারোগার সেবা শোনবার জন্যই ডাকছেন, তবুও—

পায়ে পায়ে হরিমতীকে অনুসরণ করতে লাগলাম।

বাড়ীর দরজায় পৌঁছলাম। হরিমতী ডাকল, আসুন বাবু!

ঢুকলাম। প্রাঙ্গনের পর বারান্দা। বারান্দার পর শয়ন কক্ষ। দরজা পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতেই আমারই সমবয়সী একটি মহিলা মাথার কাপড়টা টেনে দিয়ে মাথা ছুইয়ে হাতে ঘোড় করে নমস্কার জানিয়ে বললেন, আসুন দাদা, বসুন।

দাদা!

আমার বিস্ময়ের আর অবধি রইল না।

না, অন্য কোনো কথা নয়। আমার স্বামী চরিত্রহীন, মদ্যপায়ী, দুনিয়ার কাউকে ভয় করে না, শুধু আপনাদের —'স্বদেশীদের।' আপনি আমার দাদার মতন, বোনটির মুখের দিকে চেয়ে—

হয়েছে। এ যে অদ্ভুত পরিস্থিতি! জবরদস্ত দারোগা কোথায় রাজবন্দীর ওপর চোখ রাঙাবে, তা নয় আমিই দারোগাকে ধমকাব, তাকে ভাল করে তুলব!!

১৯৩৬ সাল। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আছি, সরকারী বদলির হুকুম এল, যেতে হবে দিনাজপুর জেলার খানসামা নামক গ্রামে আর সেখানে যাবার জন্য ট্রেনে চেপে নামতে হবে গিয়ে পারোয়ানী নামক ষ্টেশনে। সেখান থেকে গরুর গাড়ী।

পারোয়ানী! খানসামা!

দেখলাম, আছে এবং সত্যেরোই ফুলাই সেই খানসামা থানার রাজবন্দী কোয়ার্টার্সে গিয়ে হাজির হলাম। সেখানে আর একজন রাজবন্দী ছিলেন। একই ঘরের পার্টিশনের ওপারে, নাম বিশ্বেশ্বর চৌধুরী।

কেশিয়াড়ীর মতোই থানা, দারোগার নাম পরিতোষ দে।

দারোগার চেহারা এক কথায় ফড়িং-এর মতো। যেমন উঁচু দুটি হনু, তেমনি তোবড়ানো দুটি গাল, থুতনির নীচে আর পুঁতনিতে দাড়ির দাগ, অন্যত্র দাড়ি গজায় না। যেন একটি কঙ্কাল চামড়া দিয়ে ঢাকা।

কিন্তু নিজের 'পজিশন' সম্বন্ধে ইনি তীব্রভাবে সচেতন। ইনি মনে করেন, রাজবন্দী হলেও আমরা চোর, ডাকাত, বদমায়েসের মতোই সমাজবিরোধী অপরাধী, শুধু ওরা আটক আছে জেলে আর আমরা বাইরে থাকলেও আছি

থানা কম্পাউণ্ডের মধ্যে, এইটুকুই তফাৎ। আমাদের ওপর গাজিয়েনি করবার, ঘরজামাই করবার, আইন-কানুনের লম্বড় ঝোলাবার, রাজনীতি অর্থনীতি থেকে সুরু করে একেবারে সাহিত্য, সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান দান করবার একচ্ছত্র অধিকার ইংরেজ গভর্নমেণ্ট ওঁকেই দিয়েছে। থানার অফিসার-ইন-চার্জ যেন বাংলার ছোট লাট আর রাজবন্দীরা যেন তুচ্ছ জনতার একাংশ! আমাদের সঙ্গে কথা বলা তো দূরের কথা, আমাদের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করবার অবসর নেই তাঁর।

বিশ্বেশ্বরবাবুর কাছে খবর পেলাম, আমার আগের রাজবন্দী বাদারীপুরের তেজেশ বহু পরিতোষের চ্যাটাং চ্যাটাং বক্তৃতা সইতে না পেরে একদিন একাণ্ড দিবালোকে থানার বারান্দায় পা থেকে স্যাণ্ডেল খুলে ওর তোবড়ানো গালে বেশ কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যাটা গর্দভ তাই নিয়ে আবার মামলা করেছিল।

ঠাকুরদা মহকুমা হাকিমের এজলাসে সেই কৌতুককর দৃশ্যটির কথা শুনলাম।

ছেঁড়া স্যাণ্ডেলটি এক্সিবিট করা হয়েছে, কারণ ওটাই সেই মারাত্মক অস্ত্র যা নিয়ে আসামী কর্তব্যরত থাকাকালে দারোগাকে আক্রমণ করেছিল। তেজেশবাবু কোন উকিল দেননি, নিজেই বাদীকে জেরা করতে লাগলেন।

আচ্ছা পরিতোষবাবু, ঐ স্যাণ্ডেল দিয়ে আপনার কোন্ অঙ্গে প্রহার করেছিলাম?

গালে।

কোন্ গালে?

বাঁ গালে।

ঠিক ক ঘা মেরেছিলাম বলতে পারেন?

তিন ঘা।

তেজেশবাবু বললেন, ঘাঃ ঘাঃ, কি প্রখর আপনার বুদ্ধি! স্যাণ্ডেলের পেটাইকে প্রতিরোধ না করে আপনি মারগুলো গুনে নেবেছেন, যাতে মেরাতে না ঠকে যান।—আচ্ছা পরিতোষবাবু, ঐ পুরোনো ছেঁড়া স্যাণ্ডেলের কাঁটা লেগে আপনার গাল কেটে যায়নি?

পরিতোষ মাথা নীচু করে জবাব দিল, না।

কি করে হবে রক্তপাত? তেজেশবাবু বললেন, আপনার গালে তো আর মাংস নেই, কাঁটাগুলো বিঁধবে কিসে? চোয়ালের হাড়ে ঠক করে লেগে ফিরে এসেছে।

আদালতের সবাই হেসে উঠলেন। এমন কি, মহকুমা হাকিমও।

স্বাভাবিক ভাবেই এই পরিতোষ দারোগার সঙ্গে আমাদেরও লেগে গেল।

দিনের বেলায় আমরা পুরো বনেদাগা গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে পারি। তাই করতে লাগলাম। যখন তখন বেরিয়ে পড়ি, যেখানে সেখানে যাই, হয়তো কোন পুরোনো ভাঙা বাড়ীর সিঁড়িতে বসে অনেকের সঙ্গে গল্প করি, হয়তো গ্রামের পাশেই আত্রাই নদীর চরে কাশ বনের মধ্যে ঘুরে বেড়াই, বিলস্থ ছোঁয়া মাঠের ধারে গাছের ছায়ায় বসে থাকি, এবাড়ি যাই, ওবাড়ী যাই, হয়তো দুপুর পেরিয়ে যায়, আমরা আহার বিশ্রামের কথা ভুলে যাই, ফিরে যখন আসি, দাদাদের ভৃত্য তখন আমাদের বাড়ীর বাইরে ব্যাডমিণ্টনের নেট টাঙ্গাচ্ছে, আমরা চা খেয়েই খেলতে নামব।

আমাদের গতিবিধি খুব সন্দেহজনক মনে হল দারোগার কাছে। থানার পুলিশ লাগিয়ে যখন হদিস পেল না, রিপোর্ট করল দিনাজপুরে আই বি অফিসে। এসে গেল গুরুন ওয়াচার। আমরা কোথাও গেলেই ওরা প্রকাশ্য-ভাবে ফেউ-এর মতো আমাদের পেছনে লেগে থাকত।

ওরা সিপাইদের চৌকায় রান্না করে খেত। রাত্রে যখন রান্না চাপাত, আমরা তখন পালা করে রান্না ঘরের পেছনে কোপবাগের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আড়ি পেতে ওদের কথা শুনতাম। এমনই বোকা ওরা যে, সারা দিনে আমাদের কোথায় কোথায় যেতে দেখেছে, সে সব নিয়ে আলোচনা করত।

একদিন বিশ্বেশ্বরবাবু বিরক্তি প্রকাশ করলেন, নাঃ দ্বিজেনবাবু, আর ভাল লাগছে না এখানে। আসুন, ট্রান্সফারের জন্য দরখাস্ত করি। করবেন?

এতে আর আপত্তি হবে কেন? যেখানেই ট্রান্সফার

হুকুম না কেন, সরকারী পয়সায় আর একটা নতুন জায়গা দেখা যাবে। মন্দ কি।

তৎক্ষণাৎ রাজী হলাম এবং একই সঙ্গে দুজনে দরখাস্ত করলাম।

কোন জবাব এল না।

আবার লিখলাম।

জবাব নেই।

এবার পাঠালাম চরম পত্র, অমুক তারিখের মধ্যে কোন জবাব না পাইলে আমরা নিখোঁজ ভঙ্গ করিব।

তারিখ পার হয়ে গেল, জবাব এল না।

একদিন বিকেল পাঁচটায় আমরা আর থানায় হাজিরা দিতে গেলাম না। বাড়ীতেই বসে রইলাম।

সন্ধ্যার পর অকস্মাৎ একেবারে সরকারী পোষাক পরে পরিতোষের আবির্ভাব!

নিখোঁজ ভঙ্গের অভিযোগে আমি আপনাদের গ্রেপ্তার করতে এসেছি—

গ্রেপ্তার! বিস্ময়ে হেসে ফেললেন বিশেশ্বরবাবু, গ্রেপ্তার তো আমরা হয়েই আছি। আবার কিসের জন্য গ্রেপ্তার?

আপনারা আজ থানায় হাজিরা দিতে।

আমি বললাম, তা বটে। আমরা ইচ্ছে করেই যাইনি। আইন-টাইন আছে কিনা জানি না, তবে রীতি এটাই দেখেছি যে, আমাদের মতো কোন রাজবন্দীকে গ্রেপ্তার করবার পূর্বে পুলিশ সুপার ও ডিসট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের পারমিশন নিতে হয়—

তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠল আইন বিশারদ অফিসিয়েটিং দারোগার মুখে, আইনের ব্যাখ্যা আপনাদের কাছে না শুনলেও চলবে। আমি আপনাদের গ্রেপ্তার করলাম।

পরদিন সকালে রওনা হল আমাদের গরুর গাড়ীর কনভয় চল্লিশ মাইল দূরে ঠাকুরগাঁ-এর উদ্দেশে। প্রথম দুটো গাড়ীতে আমাদের মালপত্র, তৃতীয়টায় আমরা দুজন, চতুর্থটায় জমাদার কামাখ্যা মুখার্জী ও একজন সিপাই আর পাঁচ নম্বর গাড়ীতে আরও তিনজন সিপাই।

সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরগাঁ-এর কোতোয়ালীতে আমাদের শোভাযাত্রা গিয়ে উঠতেই কামাখ্যাবাবুর কাগজপত্র দেখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন বড় দারোগা, কই, ডি এম এবং এস পি-র অর্ডার কোথায়? ওঁদের এ্যাপ্রুভেল না নিয়েই ডেটিনিউদের এ্যারেষ্ট করে বসল পরিতোষ! না, না, আমি এঁদের থানায় রাখতে পারব না। ওঁরা জোমার চার্জে যাচ্ছেন, সেখানেই থাকুন, কাল যা হয় হবে।

তাই থাকলাম।

পরদিন কোর্ট ইনসপেক্টার এসে কাগজপত্র দেখে কামাখ্যাকে ধমক, মামলা করব কি আমি পরিতোষের হুকুমে? আইন কোনদিন পড়েছে ও? ডেটিনিউ আইন-ভঙ্গ করলেই এ্যারেষ্ট ও চালান? ডি এম অথবা এস পি-র অর্ডারের দরকার নেই? যত সব—

এস ডি-ও-র এজলাসে যেতেও তাই। সবিনয়ে আমাদের বললেন তিনি, আমি ডি এম-কে জানাচ্ছি জবাব পেলেই জানাব আপনাদের। এ দু'তিনটে দিন একটু কষ্ট করে—

থাকলাম সাতদিন একটু কষ্ট করে ঠাকুরগাঁ সাব জেলে।

তারপরই এসে গেল ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের অর্ডার, মামলা হবে না, ওদের আবার থানামাতেই ফেরৎ পাঠিয়ে দাও।

ব্যস, আবার আমাদের গরুর গাড়ীর কনভয় রওনা হল জনশামা অভিমুখে।

পরিতোষ দারোগা একেবারে ছুটে এসে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল, আসুন আসুন। আজ এই দুপুরে আমার বাড়ীতেই দুটো ডালভাত খাবেন। আমি রান্না করিয়ে রেখেছি।

জিজ্ঞেস করলাম, ডেটিনিউদের এ্যারেষ্ট করবার রীতিটা এবার শিখলেন তো?

১৯৩৭ সালে অন্তরীণ ছিলাম দিনাজপুর জেলারই হরিপুর থানায়।

এখানকার দারোগার নাম আলাউদ্দীন। বেঁটে

দীর্ঘকায়, তেমনি মেদবহুল। যেমন ভোজনবিলাসী, তেমনি ইন্দ্রিয়পরায়ণ। খিলিজি বংশের সঙ্গে তাঁর নাতায় পাতায় সম্পর্ক আছে বলে সগর্বে বলে বেড়ান এবং বোধহয় যমনীতে নবাবী রক্ত প্রবহমান বলেই ইনি আর গ্রামাঞ্চলের পদি টেপী ও আন্নাকালীদের পানে ফিরে চান না, সোজা চলে যান দিনাজপুর শহরে, লখনৌ থেকে নতুন আমদানী সুন্দরী বাইজীর মুখে একখানা ঠুংরী শুনে আসেন, কখনো একটি সোনা হাতও কাটিয়ে আসেন।

এখানেও সঙ্গী রাজবন্দী পেলাম। বরিশালের অনিল সেন। বললেন, আলাউদ্দীন ভীষণ দাম্ভিক। মানুষকে মানুষ বলে গ্রাহ্য করে না। আর ডেটিনিউদের বোধহয় মনে করে তুচ্ছ তেলাপোকা। হাজিরা দিতে গেলে বসতে পর্যন্ত বলে না।

সুতরাং থানায় আলাউদ্দীন যেদিন থাকে, সেদিন হাজিরা দিতে গিয়ে আমি ওর চেম্বারে যাওয়া বন্ধ করে দিলাম, জমাদার অনিল চক্রবর্তীকে জানিয়ে আসতাম শুধু।

আলাউদ্দীন বুঝতে পারল যে, আমি ওকে উপরোধ করছি। সুতরাং তার নবাবী রক্ত উপরগ করে উঠল। প্রতি সপ্তাহে সে আমার বিরুদ্ধে রিপোর্ট করতে লাগল পুলিশ সুপারের কাছে। অখিলবাবু আমায় জানিয়ে দিলেন। ফলে, আমিও লিখতে লাগলাম ওর বিরুদ্ধে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে। মজা হচ্ছে, আমার সব চিঠি ও দরখাস্ত নিয়ম অনুযায়ী খোলা অবস্থায় থানায় দিতে হত, দারোগা তা সেন্সর করে আবার সেন্সর করতে পাঠাত আই বি অফিসে। ওর নামে নালিশগুলো তাই ওর হাত দিয়েই যেতে লাগল।

অবশেষে তদন্ত করতে এলেন ইন্সপেক্টার অমরা প্রসাদ ঘোষ।

সোজা এলেন আমাদের কোয়ার্টারে।

আলাউদ্দীনের রিপোর্টের বিষয়গুলি জানালেন না বটে, তবে আমি জিজ্ঞেস করতেই বলে উঠলেন, ওটা ব্লাউণ্ডেল। রাজবন্দীদের চেনে না, যেখানে গেছে, সেখানেই জ্বালিয়েছে ওঁদের। আমি যাই বিজেনবাবু, ওকে ভাল করে ধুইয়ে দিচ্ছি।

বললাম, আমায় সরিয়ে দিন, তাহলেই গোলমাল মিটে যাবে।

হেসে চলে গেলেন।

গভীর রাতে চুপি চুপি এলেন অখিলবাবু। থানার সামনেই দারোগাকে বাচ্ছেতাই করে বকেছেন ইন্সপেক্টার ঘোষ, থানার সবাই কিরকম উপভোগ করেছেন বলতে লাগলেন। একেবারে অমলাবাবুর কথাগুলিই পুনরুক্তি করলেন, গভর্নমেণ্ট এত টাকা খরচ করে এদের আটকে রেখেছেন কেন? এরা জীবনের পরোয়া করেন না। কিন্তু অত্যন্ত চরিত্রবান ও সজ্জন মানুষ এঁরা। এদের ঘাঁটাতে সুরু করেছেন কিসে? রিপোর্ট দিয়ে? সাবধান করে দিচ্ছি, যেন ঘাঁটাবেন না, তাহলে একদিন আপনার চুড়ি ফাঁসিয়ে খবর দিয়ে যাবে, বুঝলেন?

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আরও অনেক দারোগার কথা মনে পড়ছে। সেযুগে ১৯৩১ সালে গ্রেপ্তার হয়ে দীর্ঘ বছর পর ১৯৩৮ সালে মুক্তিলাভ করেছেন, এমনি রাজবন্দীর সংখ্যা কম ছিল না। সাড়াটি বন্দীজীবনে তাঁদের প্রত্যেককেই বিচিত্র চরিত্রের দারোগাদের সম্মুখীন হতে হয়েছে চরিত্র বিভিন্ন হলেও একটি বিষয়ে ওদের অদ্ভুত মিল ছিল, আই বি অর্থাৎ ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের ওপর ওদের দারুণ রাগ। দারোগা থানাতেও, দারোগা আই বি-তেও একই গ্রেডের মাইনে। অথচ যেহেতু আই বি-র দারোগাকে খাকি ইউনিফরম পরতে হয় না, সাদাপোষাকের পেছনে লেগে থাকতে গিয়ে যেখানে সেখানে যাবার স্বাধীনতা আছে এবং যেহেতু থানার দারোগাকে ঘৃণ্য সব অপরাধ, ছিনতাই, জালিয়াতি, সিঁদকাটা চুরি নারীহরণ নারীধর্ষণ, মার্ডার, ডাকাতি নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়, থানার ওপরওয়ালা এলেই বুটের আওয়াজ তুলে স্যালুট করতে হয়, সেই হেতু আই বি দারোগা মনে করত সে একটু উচ্চ স্থানের এবং সেই হেতু থানার দারোগা হীনমন্যতায় ভুগত। ওদের এই মনোভাবকে আমরা কাজে লাগাতাম। একজনকে তাল দিয়ে অপরের খবর সংগ্রহ করতাম।

তারপর একই থানাতেও দারোগায় দারোগায়, দারোগা-

জমাদারে, জমাদারে ও এস পি-তে, মানে লিটারেয় জমজমাট্টে, দারোগা সিপাইতে এবং সিপাইতে সিপাইতে মন কষাকষি ছিল। অর্থাৎ সবার সঙ্গেই সবার গোলমাল। আমরা সেই গোলমালের দিব্যি সুযোগ নিতাম।

সবদিক একাকার করে দেয়া বোধহয় ভগবানের ইচ্ছে নয়। তাই, দীর্ঘ বন্দীজীবনে প্রতিটি দারোগার সঙ্গে লটাখটি করবার পর একেবারে শেষ যে দারোগাটির সাক্ষাৎ পেলাম, তার সঙ্গে মিশে মনে হল মরক্কান কথাটা শুধু জন্মনয় নয়। তার কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব।

বিবরণ আগেই শুনেছিলাম। অত্যন্ত রসিক এবং কটু-ভাষী। ব্যবহারে অভদ্র এবং একনম্বর মাতলামোতে। দারোগা পূর্ণ বড়ালকে চেনে না, গোটা দিনাজপুর জেলায় এমনি একটিও লোক নেই। যেখানে গেছে, সেখানেই বাপেশুদ্ধকে এক ঘাটে জল খাইয়েছে। সেই ফুলবাড়ীতে যাচ্ছেন !!

ফুলবাড়ীতে যখন এসে পৌঁছলাম, তখন সবে ভোর হয়েছে। থানার বারান্দায় বাক্স ও সুটকেস নামিয়ে রাখা হল। একজন সিপাই গেল খবর দিতে।

একটু পরই এলেন পূর্ণ বড়াল। পশ্চাতে বোধ হয় জমাদার। দুজনেই বয়স্ক, বড়ালের কিছু বেশী হবে।

নমস্কার, নমস্কার, দুজনেই হাত তুললেন।

জিজ্ঞেস করলাম, ডেটিনিউ কোয়ার্টারটা কোন্ দিকে ?

দাড়ান মশাই দাঁড়ান, বুঝলাম ইনিই সেই পূর্ণ বড়াল, বললেন তিনি, কোয়ার্টারে যাবেন পরে। আপনার বাক্স সুটকেস আর বিছানার মধ্যে কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য-টব্য কিছু আছে কিনা, তা আগে সার্চ করে দেখতে হবে তো।

বিস্মিত হলাম, সার্চ ! এক থানা থেকে আর এক থানাতে এলে সার্চ ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনার থানায় নতুন নিয়ম নাকি ?

তা হয়তো হবে। বড়াল জমাদারের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন। বুঝলাম, যা শুনেছি তা সত্যি। বুঝলাম এঁর সঙ্গেও আমার লেগে যাবে। ছয় বছর কেটে গেছে, এখনও শান্তিতে থাকতে পারব না।

বড়াল বলে উঠলেন, তবে আমি নয় সার্চ করবেন উনি, আমার সহকারী। জমাদার হলেও আসলে উনিই দারোগা ওঁরই খানা। কি বাদ, সার্চ করবেন না ছেড়ে দেবেন ?

দাদা মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। যা জলে গেল ! দোষ নাকি কড়া কথা শুনিয়ে ?

আবার বলে উঠলেন বড়াল, থাকগে যাক। পরেই না হয় সার্চ করা যাবে। এখন ওঁকে মুখ-টুখ ধুইয়ে নিতে দিন, তারপর এক কাপ চা—

চা আমার ওখানেই হবে, সতীশবাবু বললেন।

বড়াল মন্তব্য করলেন, তা রাজবন্দীকে চা খাইয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনতে চান, আসুন। তাতে আমার কিছু বলার নেই। তবে আমাকেও এক কাপ চা পাঠিয়ে দেবেন সতীশবাবু।

কয়েক দিন যেতেই এবং আরও আলাপ আলোচনা হতেই বুঝতে পারলাম যে, লোকটি অত্যন্ত স্পষ্টবাদী, তাই অনেক সময় ওঁর কথাবার্তা অত্যন্ত কড়া মনে হয়। অন্তঃ রাজবন্দীদের প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধাশীল সহানুভূতি-সম্পন্ন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমার জন্য একজন কথাও হাত ঠিক করে দিলেন, নাম মতিয়া।

একদিন বললেন, শুনুন বিজেনবাবু, এখানকার বাজারটা আপনার ঘোরাফেরার সীমানার বাইরে পড়ে গেছে। ও নিয়ে ওপরে লিখে লাভ নেই, জবাব পাওয়া যাবে না। তাই যখনই আপনি বাজারে যাবেন, দয়া করে আমায় একটু জানিয়ে যাবেন। আমি একজন সিপাই-এর নামে কথাও সার্টিফিকেট কেটে রাখব—ব্যস, সরকারকে দেখানো হয়ে যাবে যে, একজন সিপাই আপনাকে এলাকার বাইরে নিয়ে গিয়েছিল, আবার নিয়ে এসেছে।

সত্যিই সিপাই যাবে নাকি পেছন পেছন ?

হাসলেন বড়াল, বললেন, আমার নাম পূর্ণচন্দ্র বড়াল, বহরমপুরের সোনার ঘেনে। আমার বাবা পর্যন্ত গয়নার ব্যবসা করেছেন। সোনার ঘেনেকে কেউ কখনো বন্ধুতে পারে ?

আর একদিন বললেন, শুনুন দ্বিজেনবাবু, আপনার চৌকিটা ছোট আর ভাঙা। আপনি নতুন চৌকি তৈরীর জন্য ত্রিশ টাকা চেয়ে পাঠান। আমি লিখব, রাজবন্দী যেই টাকা চেয়েছে, পঁচিশ টাকাতেই ভাল চৌকি তৈরী করানো যায়। আই-বি আবার আরও কলম চালাবে, লিখবে বুঝি টাকায় যা হয় করে দাও। মানে, বেশী লিখলে কাটাকুটি করে ঠিক টাকাটা পাবেন। আর যদি ঠিক টাকা চান, তাহলে হয়তো পাঁচ টাকা স্যাংশন হবে, তাতে চৌকি না হয়ে টিপয় হবে।

ঠিক টাকা চাইলেও কাটা যাবে? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

যা:, কাটা যাবে না? বড়াল জবাব দিলেন, দেখুন সতীশবাবু, কি বলছেন ইনি। আপনি মশাই, গভর্ণমেণ্টের শত্রুপক্ষ। আপনি যা চাইবেন, তা কমিয়ে না দিয়ে আপনার অনুরোধ রক্ষা করলে যে গভর্ণমেণ্টের প্রেস্টিজ চিলে হয়ে যাবে।

আবার একদিন বললেন, আপনি মশাই, খবরের কাগজ পড়েন না, কেমন স্বদেশী? এক কাজ করুন। আমার নামে অমৃতবাজার আনছি। পড়েই ফেরৎ দেবেন কিন্তু। আর মাসের শেষে দয়া করে দামটি আমার হাতে দিয়ে যেবেন। নতুবা দারোগাকে দিয়ে দেবেন না যেন।

সাপ্তাহিক কনফিডেনশিয়াল রিপোর্টও আমার হাতে দিয়ে বলতেন, নিন মশাই, দেখুন, ইংরেজী-টিংরেজী ভুল আছে কিনা। আর দেখুন কি লিখেছি। একেই তো পূর্ণ দারোগার বদনাম, চাকরির শেষ দিকে আর আপনাদের অভিশাপ কেন কুড়োই?

অদ্ভুত মানুষটি: স্পেণ্ডকে ইনি স্পাইডারের স্পেণ্ডই বলেন বটে, কিন্তু সর্ক্ষকথা ও সর্ক্ষকাজের অন্তরালে ওঁর দরদী মনের প্রদীপ জল জল করে জলতে থাকে। সে আলো আমার চোখকে ফাঁকি দেবে কি করে?

মাসখানেক পর আমার এক প্রালক এসে আমার স্ত্রীকে রেখে গেল। গভর্ণমেণ্ট পারমিশন দিয়েছেন।

আত্রেয়ীকে বড়াল আত্রাই-মা বলে ডাকতেন।

যেই শুনলেন আত্রেয়ী ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবে প্রাইভেট ছাত্রী হিসেবে, অমনি বড়াল পাড়ায় যারা ম্যাট্রিক দেবে, তাদের ডেকে এনে আত্রেয়ীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, তোমাদের টিচারদের দেয়া নোট ও সাজেশন-গুলো আমার আত্রাই-মাকে দিও, বুঝলে? তবে লুকিয়ে-চুকিয়ে ডেপ্টিনিউ কোয়ার্টারে এসো, কেউ দেখে ফেললে আমার চাকরীটা যাবে

এই ফুলবাড়ী থানাতে থাকতেই দীর্ঘ ছয় বৎসর তিন মাস পর পেলাম বিনাসর্ত্তে মুক্তির আদেশ ১৯৩৮ সালের ১৬ই মার্চ। আত্রেয়ী তখন বাপের বাড়ীতে।

সেদিন পূর্ণ দারোগা যে কাণ্ড করেছিলেন, আজও তা মনে আছে।

প্রাতরাশ করছি, এমন সময় সিপাই এসে বলল, দারোগাবাবু সেলাম দিয়েছেন।

গিয়ে দেখি, দারোগা আর জমাদার বেশ গম্ভীরভাবে কাজ করছেন। মুখ না তুলেই দারোগা বললেন, বসুন।

একটু পর মুখ তুললেন, আত্রাই-মা আপনার রিলিজের জন্য যে দরখাস্ত করেছিলেন, তার জবাবে গভর্ণমেণ্ট দরখাস্ত রিজেক্ট তো করেইছে, সঙ্গে সঙ্গে আপনার ট্র্যান্সফার অর্ডার পাঠিয়ে দিয়েছে—

ট্র্যান্সফার? কোথায়?

কোথায় যেন সতীশ দাদা?

মুখ না তুলেই জমাদার বললেন, হেডক্লিতে।

বড়াল জের টানলেন: হাঁ হাঁ, হেডক্লীতে। চমৎকার জায়গা শুনেছি। খুব ভাল ক্লাইমেট। রাজস্থানের মরুভূমি গুলো নাকি খুব কাছেই, বেশ বেড়াতে-টেড়াতে পারবেন।

চুপ করে রইলাম। বুঝলাম এতদিনেও ফোড মেটেনি গভর্ণমেণ্টের, তাই এবার পাঠাচ্ছে একেবারে সুদূর রাজস্থানে।

পূর্ণ বড়াল হাঁক দিলেন দরওয়াজা।

সম্মুখে এসে দাঁড়াল সিপাই।

হামারা ডিউটি খতম।

কালো বাক্সটি নিয়ে এল সিপাই। তালা খুলতে খুলতে

বলতে লাগলেন, অর্ডারে লিখছে, এখনই ওদের হতে হবে এগারোটা পঁচিশের ট্রেনে। এসকোর্ট পার্টি এসে গেছে, ওরা খেয়ে নিচ্ছে। রাস্তা কিন্তু কম নয়, যদি বলেন তো কিছু চিঁড়ে গুড় জোগিয়ে দিই। আমরা কি করব বলুন, হুকুমের চাকর বই তো নয়। এই নিন, দেখুন অর্ডারখানা।

অর্ডার দেখে নিঃশব্দে হাসলাম। একেবারে সর্তহীন মুক্তির আদেশ!

বড়াল বলে উঠলেন, আরে মশাই, আপনি মানুষ, না পাথর? সাতে ছয় বছর তো হতে চলল, পেলেন বিলিফ অর্ডার, তাও চুপ করে আছেন?

কি করব?

কেন? ছুটে বেরিয়ে যান রাস্তায়, নাচতে থাকুন, চড়ে বসুন গাছে, ঝাঁপিয়ে পড়ুন পুকুরে, গান না জানলেও চ্যাঁচাতে থাকুন প্রাণপণে—

বললাম বিশ্বাস করুন, দীর্ঘ বন্দীজীবনের শেষ দিকে আপনার এখানে এসে যে শান্তিতে ছিলাম, সত্যি বলছি দারোগাবাবু, তা ছেড়ে যেতে হবে মনে করে কষ্ট হচ্ছে—

ওসব কথা রাখুন, বাধা দিলেন দারোগা, আপনাকে এমন কিছু খাতির করিনি আমি। আমার শুধু এইটুকুই সান্ত্বনা যে চাকরির শেষদিকে আপনাদের মতো দেশ-হিতৈষীদের দর্শন পেলাম, সাধ্যমত আপনাদের সেবা করবার সুযোগ পেলাম।

এরই নাম পূর্ণ দারোগা! সারা সিরাজপুর জেলায় যার বদনাম শুনেছি!

বড়াল বললেন, পুলিসের চাকরি করে যে পাপ করেছি শেষ জীবনে খানিকটা পুণ্য করবার সুযোগ পেলাম। আত্রাই-মাকে বলবেন, বুড়ো ছেলের অত্যাচার যেন ক্ষমা করেন। যদি আমার কথা মনে থাকে, আর আমি বেঁচে থাকি, তাহলে আসবেন একবার বহরমপুরে আমাদের বাড়ীতে।

ষ্টেশনেও এলেন পূর্ণ দারোগা সমাদরকে সঙ্গে করে। ট্রেন ছাড়ার মিনিট দুয়েক আগে সেই যে আমার একখানা হাত দুই হাতের মুঠোয় চেপে ধরেছিলেন, নিঃশব্দে তেমনিভাবে ধরে রইলেন।

কারু মুখে কথা নেই।

ট্রেন চলতে সুরু করতেই হাত ছেড়ে দিলেন।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালাম হাত নাড়তে লাগলাম।

বড়াল পাথরের মতো নিষ্পলক চোখে চেয়ে রইলেন।

ট্রেণ প্লাটফরম অতিক্রম করে বেগে ছুটে চলল।

ভগবানের কি বিচিত্র লীলা!

এর ঠিক পঁচিশ বছর পর স্বাধীন দেশের জাতীয় গভর্ণমেণ্টের অধীনে আমি চাকরি করছি, সুপারিন-টেনডেণ্ট অব সেনট্রাল জেল।

১৯৬৩ সালের ৬ এপ্রিল দমদম সেনট্রাল জেল থেকে বহরমপুরে বদলি হয়ে গেলাম।

মিছিলের সব দারোগার কথা ভুলে গেলেও পূর্ণ দারোগার অনুরোধ ভুলতে পারিনি। আসবেন একবার বহরমপুরে আমাদের বাড়ীতে।

তাই ক'দিন পরেই বেরিয়ে পড়লাম।

খুঁজে বার করলাম পূর্ণ দারোগার বাড়ী।

একজন মধ্যবয়সী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বললেন দু'বছর হল বাবা মারা গেছেন।

কত বয়স হয়েছিল তাঁর?

আটাত্তর বছর।

মিছিল ছেড়ে সরে পড়েছেন পূর্ণ দারোগা! ঠিক বলেছিলেন, পূর্ণ বড়ালকে কেউ ধরতে পারে?

———

দ্বিতীয় স্তরের মানুষ

কবিতা সিংহ

সেই কাল বিকেলে পাঁচটা নাগাদ শেষ টেলিফোন পেয়েছে অতীনের, আর এই অফিসে এসে বেলা দশটায় ডায়াল করছে।

তা'ও অতীনদের রিহার্সাল রুমে কোনো টেলিফোন নেই, পাশের বাড়ি এক বয়স্ক ভদ্রলোকের বাড়িতে টেলিফোন করতে হয়। তিনি অসুস্থ মানুষ। মাঝে মাঝে অতীনকে ডেকে দিতে, বিরক্তও হন।

কৃষ্ণার নিজের ঘরেও তো ফোন নেই। কলে কাল বিকেল পাঁচটার সময় অফিস থেকে যখন সে বেরোলো, তখন থেকেই স্বামীর সংগে কাট্ অফ্। এই আজ সকাল দশটায় আবার জোড়াতালি লাগবে।

কৃষ্ণার দুর্ভাগ্য। লাইন এনগেজড্। তবু ফোন কানে ধরে, সে খানিকক্ষণ বসে রইলো। রবীন বাবুর টেবিলে ফোন। সারাদিনে কবার আর টাই করা যাবে? রবীন বাবুও বেশ বিরক্ত হন।

কাল বিকেলে কৃষ্ণা ইচ্ছে করলে অফিস থেকে বাড়ি না গিয়ে, পুরানো কোনো বন্ধু বান্ধবের বাড়ি যেতে পারতো, একা একা রাস্তায় ঘুরতে পারতো, সিনেমার টিকিট কাটতে পারতো, চাইকি অতীনের বরানগরের রিহার্সালে রুমেই চলে যেতে পারতো, যদিও অতীন তা বিশেষ পছন্দ করতো না। কিন্তু সে কিছুই করেনি, সোজা বাড়ি ফিরে এসেছিলো। বাড়ি মানে ছোট একটা ঘর। ঘরের সংগে রান্নার একচিলতে জায়গা, আর তিনঘর ভাড়াটের সংগে, শেয়ারে, কমন বাথরুম। সেই ছোট্ট, নোঙরা, ঠাসা, দেওয়ালের চটাওঠা, নিরানন্দ ঘরে, সীসে রঙের একটা বিকেল বেলা সে না ফিরলেই পারতো। নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা না করে নিজেকে ইচ্ছে করেই ভয়, আতঙ্ক আর একটা যন্ত্রণাদায়ক চিন্তার কাছে ধরে দিলো কৃষ্ণা। অতীন আজ একমাস ধরে থিয়েটার নিয়ে একেবারে সম্পূর্ণ ডুবে গেছে। আর কোনো বিষয়েই তার মন নেই। না কৃষ্ণাকে অবজ্ঞা বা তাচ্ছিল্য করার কোন প্রশ্ন আসছে না। অতীন কৃষ্ণাকে ভালোবাসে। এ বিষয়ে কৃষ্ণার কোনো সন্দেহই নেই। কিন্তু কৃষ্ণার ভয় অন্যত্র। ভয়, অতীনের অবস্থার পরিবর্তন নিয়ে, অতীনের ভালোবাসার স্থায়ীত্ব নিয়ে।

কৃষ্ণা অফিসের ব্যাগটা রেখে, কোনরকমে বিছানাটুকু ঝেড়ে পরিষ্কার করে নিয়েছিলো। তারপর তার মনে পড়লো, রাতে খাওয়ার ব্যবস্থা কিছু নেই। কুঁজোর তিনদিন আগের বাসি জল তলানিতে ঠেকেছে। ঘরের আলোটা ষাট পাওয়ারের হলেও, বিদ্যুৎ খাট্‌তির জন্যে পঁচিশের মত লাগছে।

কৃষ্ণার ভিতরে, এই পরিবেশ, এই নিজের শরীরের ক্লেদগন্ধ, খিদে মেজাজ-অস্তরীণতা থেকে বেরিয়ে পড়বার একটা ইচ্ছা, ঘট্‌পট্ করে উঠলো। সে নীচে নেমে সামনের মনোহারী দোকান থেকে একটা ছোটো পাউরুটি কিনে আনলো।

মনে মনে ভাবলো আমাকে কষ্ট দিয়ে লাভ কী? অতীন তো আর কেয়ার করছে না। কুঁজোয় টাটকা জল ভরলো, সেও যেনো অতীনের প্রতি প্রতিহিংসা পূরণের জন্য। তারপর ষ্টোভ জেলে, কনডেন্সড্ মিল্ক্ গুলে, দুধ করে, দুখানি খেলো, জল খেলো, মানের ঘর থেকে এক বালতি জল, ঘরে এনে বন্ধমার ধারে বসে গা ধুয়ে নিলো।

সবই, অতীন তাকে দেখছেনা বলে।

কমার ঘরে বড়ো আয়না নেই। কিন্তু কমা জানে সে দেখতে কেলনা নয়। তার শরীর একেবারে কুমারী মেয়ের মতো নতুন। শুধু মুখটা বিশ্বাসঘাতকতা করে, তার তিরিশ বছর বয়সের কথা বলে দেয়। চোখের কোলে অল্প কালি, নাকের দুপাশে রেখা, অনমস্তল গালে কিঞ্চিৎ মালিন্য।

কমা সে জন্যে তার পেশাকে দোষ দেয়। বিয়ের পরে তাকে একটা কমার্শিয়াল আর্টে ছোট কেরাণির চাকরি নিতে হয়েছে। চাকরিটা একঘেয়ে। প্রমোশনের কোনো আশাই নেই। একঘেয়ে কাজ, বুদ্ধি লাগে না, বিদ্যে লাগে না, এমনকি হিসেব পত্রও লাগে না। কমার চারপাশে যারা বসে, তারাও মানুষ হিসেবে বড়ো অকিঞ্চিৎকর, ছোট মাপের, একেবারেই তুচ্ছ। বাড়ি ফিরে, তাদের গল্প করে যে অতীনকে একটু চমকে দেবে, জেলাস্ করে তুলবে, সে উপায়ও নেই

আসলে বিয়ের সময়কার পরিস্থিতি থেকে প্রধানত কমা এত সরে এসেছে, যে, মনে ভীষণ আশঙ্কা হয় কমার, অতীন তাকে আবার অন্য চোখে দেখতে আরম্ভ না করে।

কমার, সত্যি কথা বলতে কি, বিয়ের পর থেকেই মন খুব দমে আছে। হারাই হারাই ভাব ছিলো বলেই অতীনের পাকা চাকরি বাকরি না থাকা সত্ত্বেও, কমা ভেঙে চুঁড়ে বিয়ে করলো। আবার বিয়ে করে, আরো হারাই হারাই ভাব।

বিছানায় শুয়ে ম্যাশ্‌স্‌ পরবে, মশার পিন্‌পিন্ এবং আশ্‌পাশের ঘরের মানুষদের আওয়াজ, কথাবার্তা শুনতে শুনতে কমার যেন শয্যা-কণ্টকী হলো। বদ্ধ ঘরের মধ্যে ছটফট করতে লাগলো কমা।

বিকেল পাঁচটায় অতীন তাকে ফোন করেছিলো।

—কমা, তুমি রাগ করবে, কিন্তু উপায় নেই, আজ রাতে বোধহয় বাড়ি ফিরতে পারছি না।

কমা রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিলো,

—কেন?

—প্রতিভা যেন্ রোলটা করছে না। আজ সকালে চিঠি পাঠিয়েছে।

—সে কি? তুমি যে ডুবে রইবে!

—যাবোই তো, আসলে বেশি টাকার কোনো 'অফার' পেয়েছে, হয়তো!

—এই তো কেরিয়ার স্টার্ট করলো, এরমধ্যে এতো কমার্শিয়াল হয়ে গেছে?

কমা কথাটা মুখে বলল বটে, আসলে মনের ভিতরে ভিতরে একটা চাপ সরে গিয়ে হাল্‌কা বোধ করলো কমা।

—আমি তাই এখন প্রবোধকে নিয়ে একটু সুলতাদির কাছে যাচ্ছি। সুলতাদি জানো তো, এখন আর হাওড়ায় থাকে না, কল্যাণীতে থাকে! আর কল্যাণীতে গেলে, আজ রাতে কি আর ফিরে আসা সম্ভব?

—না।

—সম্ভব নয়তো? বলো?

কমার মনে হ'লো তার হৃৎপিণ্ডটা কেউ মুঠিয়ে ধরেছে। সে চাপা রুদ্ধ গলায় বললো,

—না। সুলতা তোমার নাটকে হিরোইনের পার্ট করবে না, তুমি সুলতার বাড়ীতে যাবে না। দরকার হ'লে প্রতিভার কাছে যাও, তাকে আরো বেশি টাকা, সে যা চায়, অফার দাও, নীলার কাছে যাও, ললিতাদির কাছে যাও। কিন্তু সুলতা না।

—কমা!

অতীন কি যেনো বলতে যাচ্ছিলো, কমা তার কথা কেটে দিয়ে বললো, না সুলতা কখনো না, কখনো না। আমি এতোটা সহ্য করবো না।

ও পাশ থেকে অতীনের বিনীত, পোষা গলাটা একটু অসহিষ্ণু শোনালো। সে বললো,

—কমা এমন আরম্ভ করলে তো কাজ করাই সম্ভব নয়। প্রতিভাকে যখন নিই, তখনও তুমি নানান কথা শুনিয়েছো, নানান রকম সন্দেহ করেছো—কমা তুমিতো জানো আমার কারবারই মেয়েদের নিয়ে। ওরা ক্রিয়েটিভ্ আর্টিষ্ট—এই নাটকটা সাকসেসফুল হ'লে আমরা হয়তো নতুন রাস্তা খুঁজে পাবো। তোমাকে হয়তো আর চাকরি করতেই হবে না, তা ছাড়া দুদিনে

একটা মেনোরোম্—মুলতাদি ছাড়া আর কে তুলতে পারে বলো। তাছাড়া মুলতাদি তো এই রোলে পানিকটা রিহার্সালও করেছে। ব্যাপারটা, ও জানে।

কমা একটা ভয়ঙ্কর শপথের মধ্যে ডুবছিল অতীনকে। তার মনে পড়ছিলো, তার মায়ের দেওয়া সৌখীন এ্যাটাচিকেসে লুকিয়ে রাখা একটা সিলিভে পনেরোটা ঘুমের বড়ির কথা। কিন্তু দূর থেকে, রবীন বাবুকে টেবিলে ফিরে আসতে দেখে, সে অবশ হাতে রিসিভারটা ক্র্যাডেলে নামিয়ে রেখে দিয়ে, ফিরে গিয়ে তার চেয়ারে বসলো।

চারিদিক বেশ নিস্তব্ধ হয়ে এসেছে। শব্দ এবং আলো দুইই কমে গেছে। নিজের দু জানালাওয়ালা বন্ধ ঘরে বসে কমা টের পেলো। শেষে উঠে বসলো।

শূন্য দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে, অতীনকে লক্ষ্য করে সে বললো,

—মুলতার কথা আলাদা!

একটু চুপ করে থেকে সে বলল,

—প্রতিভাকে আমি সইতে পারিনা!

হু হু করে কেঁদে ফেললো কমা। আবার বললো,

—তোমার নাটক আনসাকসেসফুল্ হোক্, তুমি অন্য চাকরি নাও। আমি তোমায় হারাবার এই আতঙ্কের মধ্যে আর বেঁচে থাকতে পারছি না।

কমার মনে পড়লো অতীনের সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার কথা। যে থিয়েটার হল, মালিক এখন লসে বান করার ভয়ে বেচে দিতে চাইছে সেই হলেই মাঝে মাঝে সামান্য কিছু টাকা জমিয়ে অতীনের সৌখীন দল নাটক নামাতো। কমা তার নাটকে অভিনয় করতে এসেছিলো। সে তখন নাটক করে করেই বেড়াতো। কোথাও টাকা নিতো, কোথাও নিতো না। তার গরীব বাবা মা, তার কাছ থেকে টাকা পেলে খুব খুশি হতো, না পেলে চাইতো না। কমা অবশ্য কিছুদিন পরেই ঠিক করেছিলো যে অতীনের দলে টাকা নিয়ে অভিনয় করবে না—আরো কিছুদিন পরে ঠিক করেছিলো অতীনের দল ছাড়া আর কারো দলে অভিনয় করবে না।

কমা জানে অতীন কি দারুণ আকর্ষণীয়। মাঝারী গড়নের সুন্দর সবল চেহারা। শ্যামাটে গায়ের রং। ঘোড়া ঘন ভ্রু, তার তলায়, কাজল পরা মনে হয়, এমনি কালো আর টানা দীর্ঘ পক্ষ চোখে। চিবুকের মাঝখানে একটি ভাঁজ। হাসলে টসটসে লাল ঠোঁটের ফাঁকে সুন্দর গড়নের সাদা ঝকঝকে দাঁত দেখা যায়।

কমা জানে অভিনেত্রীরা সাধারণত নায়কের চেয়ে পরিচালকের প্রেমেই বেশি পড়ে। কারণ পরিচালকই তো পুতুলনাচের আসল সুতোকাটি নাড়ার মানুষটা। তার হাতেই তো চরিত্রগুলোর দ্বিতীয় জন্ম, নাটকের অবয়ব সৃষ্টি হয়।

তার ওপর আবার অতীন ভাল অভিনেতাও।

অতীন নাটক পাগল। না শুধু অশিক্ষিতের মতো মেয়ো নাটক প্রীতি নয়। সে সত্যি করেই আরো জানতে চায়, আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে চায়। কমা বিয়ের আগে অতীনের আস্তানায়, অর্থাৎ তার দাদার বাড়ির একটা প্যাসেজ ধরনের ঘরে, দু একবার গিয়েছিলো। সেখানে শুধু বই। পাকা করা বই। কেবল নাটক আর নাটক বিষয়ের বই।

কিন্তু কমা আরো জানে ডিরেকটর আর অভিনেত্রীর সম্বন্ধ ঠিক প্রাইভেট সেক্রেটারী আর বসের মতো, ডাক্তার আর নার্সের মতো, গবেষক আর তার সহকর্মীর মতো। বড়ো ঘনিষ্ট, সহমর্মীতার। মনের দিক থেকেই শুধু নয়, দেহের দিক থেকেও এতো কাছাকাছি আসতে হয়।

প্রতিভাকে এই জন্যেই কমা ঈর্ষা করে।

কমাও যে একদালে অভিনেত্রী ছিলো।

বিয়ের পর দু বছর কেটে গেছে। পাশ করে কমা বাঁধা চাকরীর মধ্যে চলে আসতে বাধ্য হলো। কারণ অনেক ভেবেচিন্তে সে দেখেছিলো তাদের অভিনয় জীবনের অনিয়মিত রোজগার, অনিয়মিত খাওয়া শোওয়া কাজ ও অবসর দিয়ে, ঠিক সংসার যাত্রা ব্যাপারটা চলে না। কমার দেখাদেখি অতীনও চাকরির দিকেই ঝুঁকেছিল। নিমরাজী হয়েছিল যে কোনো বাঁধা পেশায় যাবার জন্য।

বছর খানেক এক পত্রিকার অফিসের বিজ্ঞাপন সেক্সনে কাজও করেছিল মনে পড়ছে। সে সময়টা সে শুধু মেয়ে পড়ে থাকতো। সন্ধ্যে বেলাও কমাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে যেতোনা। নাটকের বইগুলো শ্যাক্ বাঁধে পেরেক মেরে বন্ধ করে রেখে, দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতো, দেবো একদিন সব টান মেরে গঙ্গায় ফেলে। কমার নিজেকে কি রকম অপরাধী লাগতো। সে ভাবতো, অতীন বেনো জলের মাছ হয়ে, ডাঙায় ছট্‌ফট্ করছে। আর মনে মনে তাকে, এবং তাদের বিবাহিত জীবনকে দায়ী করছে।

কমা অতীনকে খুব সৎ ভদ্র ছেলে বলেই জানতো। বিয়ের আগে কমাকে সে শারীরিক ভাবে খুব একটা স্পর্শ করেনি। কিন্তু সম্ভ্রমপূর্ণ ভালবাসায় ভরিয়ে রেখেছে। যখন প্রেমে পড়েনি কেবল অভিনেত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলো, তখন তার সংযত আন্তরিক ব্যবহারই কমাকে সবচেয়ে বেশী টেনেছিলো। তাই কমা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে খোঁজ নেয়, অতীনের হিরোইন কিংবা সাইড হিরোইনরা কি করে না করে।

ঐ বিজ্ঞাপন বিভাগেই নাটকের বিজ্ঞাপন দিতে এসে হীরেনবাবু অতীনকে আবার ডেকে নিয়ে যান। ওঁর নিজের 'হল,' কিন্তু বাঁধা পড়ে আছে মাড়োয়ারীদের কাছে। এক বছর সময় আছে আর। তারপর 'হল' চলে যাবে, মাড়োয়ারীদের হাতে। পরপর দুটো নতুন নাটক সেখানে হীরেনবাবু অন্য এক পরিচালকের নির্দেশনায় নামান। অতীনের ভূমিকা ছিল হিরোর।

কিন্তু দুটি নাটকই আবার লসে যান করে। অতীন একটা পার্টটাইম চাকরি আর অভিনয় নিয়েছিলো। কমা পছন্দ করেনি।

সকালবেলা মুখোমুখি বসে চা খেতে খেতে কমা হিসেব করতো, কতোটা সময় তার জন্য আর কতোটা সময় থিয়েটারের জন্য ভাগ করা। সন্ধ্যে বেলাগুলো একা। ছুটির দিনগুলো একা। বাসে করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে দেখতো কেমন অফিস ফেরে স্বামী স্ত্রী জোড়ে বাড়ি ফিরছে। স্ত্রী বসার জায়গা পেয়ে, পড়ছে স্বামীর হাতের ভিনিদ। স্বামী, স্ত্রীর ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে। পাড়ার বাজারে দেখতো স্বামী স্ত্রী বাজার করতে যাচ্ছে দেখতো সিনেমা দেখতে যাচ্ছে, রিকশো চড়ে পাশাপাশি বেড়াতে যাচ্ছে।

কমা একা। কোনদিন সে অতীনের পাশাপাশি হেঁটেছে? বিয়ের পর? বাজার তাকে একাই করতে হয়। সংসারের সব ধার দায়িত্ব, তাকে একাই বহন করতে হয়। টাকার অভাবে টিক নয়, ফুর্তির অভাবে তাকে সিনেমার পর সিনেমা বাদ দিতে হয়। অতীন তাকে বোঝায়, মালিক হীরেন বাবু এই প্রথম তাকে একটা নাটক করার বরাত দিয়েছেন বিরাট সুযোগ। যদি এ নাটকটা দাঁড়িয়ে যায়, থিয়েটারও বাঁচবে। তারও ভবিষ্যৎ বদলে যাবে। নৌটন দলের পরিচালক হিসেবে অতীন অনেক সুনাম আর প্রশংসা পেয়েছে। এখন দিন যায় সমাজে উঁচু স্থান ক্রমশ সব অতীনের হাতের কাছে এগিয়ে আসছে।

কমা কল্পনা করলো।

নিউ আলিপুরে বড় বাড়ি। গ্যাস্, রেফ্রিজারেটর, শাড়ি, গাড়ি, মাঝে মাঝে নানান আকাদমি, প্রতিষ্ঠান, উৎসবের আমন্ত্রণে, বিচারকের স্ত্রী হয়ে, অভিনেতার স্ত্রী হয়ে, পরিচালকের স্ত্রী হয়ে রাজধানী যাওয়া, বিদেশ সফর, এবং, আরো এক্সাকীত্ব।

এবং আরো দামী, আরো অল্পবয়সী, আরো সুন্দরী, আরো দুরন্ত মেয়েদের মাঝখানে গিয়ে পড়ে, নিজেকে হারিয়ে ফেলা অতীন।

আর তার দুঃখী একা, ফাঁকা, স্ত্রী কমা।

কমা আবার উঠে বসলো। দুহাত তুলে চাপা গলায় বলে উঠলো,

—আমি চাইনা, চাইনা। শুধু তুমি আমার থাকো, আমার, আমার, তোমার কেরিয়ার গোল্লায় যাক্। তাই কমা খোঁজ নেয়।

কমাকেই প্রশ্ন করতে হয়। আশ্চর্য অতীন আজকাল নিজের থেকে একটি কথাও বলে না। হয়তো ভাবে একটা বেদরকারী অফিসের কেরাণীকে আবার কি কথা বলবে? নাটক আত্মিক, পরীক্ষা নিরীক্ষার কথা কমাকে বলে বেনারসে মুক্তো ছড়িয়ে কি হবে?

কিন্তু দুঃখ যে ওই খানেই।

রুমা যে জানে কোথায় কি হয়! কখন কেমন লাগে। একদিন সে'ও যে অতীনের পাশেপাশে তার সংগে সুখ দুঃখ রোমাঞ্চ হতাশা, সব ভাগ করে নিয়েছে।

সে তাই জিজ্ঞেস করে,

—আচ্ছা নীলা কেমন দেখতে, কত বয়স? কি করে?

কানিনিকা, হীরা, প্রতিভা?

প্রতিভাকে রুমা দেখেছেও। সুলতা রায়কে বাদ দিয়ে যাকে নেওয়া হ'লো।

রুমা জিজ্ঞেস করতো।

—আচ্ছা প্রতিভা কেমন?

—ভালোইতো।

সারা সন্ধ্যে পরিশ্রমের পর রাতে ফিরে চোখ খুলতে পারতো না অতীন! শুয়ে পড়তো।

—গালে একটা বড়ো তিল আছে, না?

—হ্যাঁ!

চমকে উঠতো অতীন।

—বেশ ছিপ্‌ছিপে, টল্ না?

—হুঁ।

—একটু হিপি হিপি সাজ গোজ তাই না?

—হুঁ, ঘুম পাচ্ছে, ঘুমোই রুমা।

রুমা ঝাঁকানি দিয়ে বলতো,

—চানটান করে বেরুলার?

—বাঃ, সে কি করে জানবো?

—কাছে আসে না?

—কি বলছো আজে বাজে কথা!

অতীন বিরক্ত হতো।

—না, আমার গায়ের গন্ধ পেতে, বলতে না?

আমার চুলের গন্ধ!

—শোও তো।

রুমাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়তো অতীন।

উত্তর দিতোনা।

কাল রাত্রে ঐ সব মনে পড়ছিলো। প্রতিভাকে সে নিজের পরিচয় দেয় নি। এক বিয়ে বাড়ি, দূর থেকে কেউ চিনিয়ে দিয়েছিলো। রুমা নিজেকে প্রায় আড়ালে রেখে প্রতিভাকে দেখেছিলো। দেখেই বুঝেছিলো, প্রতিভা শুধু যুবতী আর রূপসী নয় চালাক আর ইতর। তার কথাবার্তা চাল চলনের মধ্যে থেকে ঐ সূক্ষ্ম ব্যাপারগুলো মেয়েদের চোখে সহজেই ধরা পড়ে যাবে। পুরুষদের অবশ্য ধরতে দেরী হবে।

কারণ যে যা চায় সে তাই-ই দেখতে পায়। অতীন নিশ্চয়ই প্রতিভার মধ্যে তার চোট নজরের চালাকী ভরা মনটা দেখতে চাইবে না সে চাইবে সুগঠনশীল আর্টিষ্টকে দেখতে। তারপর দেহমনে পরিপূর্ণ এক নারীকে দেখতে। যে, রুমার মত চেনা, পুরোনো, মাজাই খুশ্রী একজন কেরাণি নয়।

উঠ্‌তি অভিনেত্রী।

আর সুলতা।

বিছে কামড়ানোর জ্বালায় জ্বলতে লাগলো রুমা। নতুন নাটক 'অভিসারিকার' জন্য সুলতাকেই চেয়েছিলো অতীন। সুলতাদিই বলতো রুমা। আজকাল মেয়রা সুলতা বলছে।

সুলতাদির বয়স বছর চল্লিশেক তো হবেই। অতীনের চেয়ে অন্তত সাত আট বছরের বড়ো। কিন্তু এতো বড়ো অভিনেত্রী তো আর নেই। আজকাল সুলতাদি, নাটক ছেড়ে সিনেমাও দুএকটা চরিত্র করছে। তাই নাটক কমাতে হয়েছে তাকে।

সুলতাদির সংগে রুমা একবারই অভিনয় করেছিলো। প্রকাশ মিত্রের স্ত্রী। যেমন বড়ো পরিচালক তেমন বড়ো অভিনেতা। স্বামী স্ত্রী আলাদা বসবাস করে। তবু এখনো একদলে আছে। কথা নেই, যোগাযোগ নেই, অথচ ষ্টেজে চমৎকার নায়ক নায়িকার অভিনয় করে। বাইরের দলে সুলতা অভিনয় করেই না। ক্বচিৎ কখনো মেজাজ হলে নিয়ম ভাঙে।

'অভিসারিকা' নাটক নিয়ে আজ দেড় বছর ধরে অতীন পরিশ্রম করছে। হীরেনবাবু দেড় বছর আগেই

নাটকটা নামাতে চেয়েছিলেন। মহলাও শুরু হয়েছিলো কমা একদিন মহলা দেখতে যায়।

'নাটক' পড়ে সুলতার খুব ভাল লেগেছিল।

হাওড়ার তার বাড়ি ধাওয়াধাও করে অতীন তাকে বিশেষ ভাবে ইম্প্রেস্ করে

সুলতাদি বলতে অতীন তখন অজ্ঞান।

একদিন সানন্দে লাফাতে লাফাতে এসে কমাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে বলেছিলো,

—জানো কমা, সুলতাদির নাটক পছন্দ হয়েছে। আমাকে বলেছেন, অতীন, তুই যদি আমার হিরো হোস্ তাহলে রাজি।

কমা ঠাণ্ডা গলায় বলেছিলো,

—তোমাকে সুলতাদি 'তুই' বলে বুঝি?

—ড্রিংক করলে বলে, অনেককেই বলে।

—ও ড্রিংক করে বুঝি?

—নাঃ, গঙ্গা জল খায়,

অতীন হেসেছিলো।

—এই তুমি খাওনাতো?

—দেখো না, কাছে এসো, গন্ধ শোঁকো।

—অতীনের দুষ্টু বুদ্ধি বুঝতে পেরে, হাল্কা মনে কমা বলেছিলো,

—তোমাকে সুলতাদির সঙ্গে মানাবে?

—কি করবো? সুলতাদি চাইছে, কতবড়ো সম্মান বলো, একটু এক্সট্রা মেক্আপ নেবো! তারপর মাথায় তলায় দুহাত রেখে বলেছিলো,

—কমা, সুলতাদি খুব, খুব, বড়ো অভিনেত্রী। আমার কাছে দুঃখ করছিলো। প্রকাশ মিত্র ওকে ষ্টেপিং স্টোন্ হিসেবে, যা তা ভাবে-ব্যবহার করেছে।

কমার মনে আবার সন্দেহের মেঘ ঘনিয়েছিলো,

—তোমার সঙ্গে অতোসব মনের কথা কিসের?

—আমাকে সুলতাদি ভালবাসে,

একটু খেমে অতীন হেসে বলেছিলো,

—ছোটো ভাইয়ের মতো, কমা দেবীর চিন্তার কোনো কারণ নেই।

কিন্তু কারণ ঘটলো।

সুলতাকে রিহার্সালে এক ঝলক দেখেই কমা বুঝলো বড়ো অভিনেত্রী হলেও, সুলতাদি মেয়েমানুষ হিসেবে অতি নিকৃষ্ট। কমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার পর কমা যখন বলল,

—চিনতে পারছেন না সুলতাদি, আপনার সঙ্গে 'সুমনা' নাটকে নেমেছিলাম?

চিনেও সুলতা বলল,

—না—তো!

কমা অতীনের স্ত্রী, এবং প্রায় নববিবাহিত জেনেও অতীনের গায়ে এমন ভাবে চলে চলে পড়তে লাগল, কমার মনে হলো যেন দেখাতে চায় অতীনের ওপর তার কত বেশী অধিকার।

কমার সবচেয়ে জ্বালা ধরেছিলো সুলতার ভাঙ্গিলা দেখে, সুলতার ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যৌবনের চেহারা দেখে। অতবড় অভিনেত্রী, অত নাম, অত অর্থ, একটা ছোটো দলে যেন দয়া করে অভিনয় করতে এসে সবাইকে, স্বর্গে তুলে দিচ্ছে।

কমার মনে আছে সেদিন রিহার্সালের পর সুলতার নিজের গাড়ী আর হীরেনবাবুর গাড়ী চড়ে অন্তরংগ কয়েক জন মিলে সুলতার বাড়ি যায়। কমাও ছিলো। হীরেনবাবু আর সুলতা শেয়ার করে ভালো মদের খরচ দেয়। তিন চার বোতল হুইস্কী খানা হয়। সুলতা সবচেয়ে বেশী খায়।

অতীন কোনদিনই মদ ভালোবাসত না। সুলতার কথায় ভদ্রতাবশত, একটা গেলাস নিয়ে বসেছিলো। কমাকেও একটা গ্লাস ধরতে বলেছিলো চুপি চুপি। যাতে সুলতা কমার সামনে নিজেকে নীচু বোধ না করে।

কিন্তু সুলতা অতো মাতাল হলে কি হয় সমস্ত ব্যাপারটাই লক্ষ্য করেছিলো। শেষ পর্য্যন্ত চেঁচিয়ে বলেছিলো,

—বন্ধুগণ! অতীন কিন্তু বৌ-এর ভয়ে মদ খাচ্ছে না।

অতীন হেসে বলেছিলো,

—কে বলেছে?

—হ্যাঁ ভাই তুমি এমনি কতো খাও, আর আজ খাচ্ছোনা কেন ?

তখন ঠোঁটে হাসি ফুটিয়ে অভীন বলছিলো,

—কেনো সুলতাদি, মিথ্যে বদনাম দিচ্ছেন ? আমার বৌ বিশ্বাস করে বসবে।

—ওই বৌ, বাছে, কবরেজী, হাকা, যে আমার সঙ্গে একবার সাইড্ রোল করেছিলো ? ওকে অত ভয় ?

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল সুলতাদি।

—আহা, প্রকাশকে এনে দেখানো উচিত। দেখো, দেখো, একটা একস্ট্রার জন্ম অভীন কতো ভাবে, আর তুমি একটা হিরোইন, এতোবড়ো একটা একট্রেস্ সুলতা রায়, তবি, আমি বিয়ের পরে মিত্তির হইনি, রায়ই আছি, —তার দিকে তুমি ফিরেও দেখোনা। তাকে ধারাপ সরকারের হাতে তুলে দিয়ে টাকা নাও !

মাতাল হলে সুলতা একেবারে আত্মহারা হয়ে যায়। কমা অপমানে উঠে দাঁড়াতেই সবাই তাকে চাপা গলায় ঘটনাটা বোঝাতে চাইলো।

কমাও খানিকটা বুঝলো। মহিলা যা বলছেন সব কমপ্লেকস্ থেকে, দুঃখ থেকে।

আবার আরম্ভ করলো সুলতা.

—সতী সাজা হচ্ছে, থাকোনি আমার ঘরে, আমার বেড্রুমে, দিনের পর দিন ? সে সব বলেছো তোমার বৌকে, আমার পায়ে পড়ে কিভাবে রাজী করিয়েছিলে ? নাহলে ওই নাটকে নামে কে ? যতসব ফালতু !

অভীন এবার উঠে দাঁড়িয়েছিলো। রাগে লাল টক্‌টকে করছে চোখ। মদ না খেয়েও ক্রোধে মাথার ঠিক নেই।

—সুলতাদি, আমার নাটক যদি না'ও হয়, আপনাকে আমি চাইনা। আমি আপনার কুৎসিত ইংগিতের কোনো প্রতিবাদ জানাবোনা। শুধু নিজের বয়স আর নোংরা মনটার কথা একটু ভাববেন। আমি চলি।

কমার হাত ধরে বিজয়ীর মতো পার্টি থেকে বেরিয়ে এসেছিলো অভীন।

রাস্তায় কোন কথা বলেনি। বাড়িতে এসেও না। স্বামীর গলে একেবারে লেটে পড়েছিল কমা। রাতে স্বামীর পাশে শুয়ে সেই স্বামীর বুকে একটি হাত রেখেছিল, কমাকে অবাক করে দিয়ে তার হাত ছুঁড়ে দিয়ে রুদ্ধ কণ্ঠে বলেছিল অভীন,

—তোমার জন্যই এতো সব হলো। দেখোতো ! তুমি যদি না যেতে এসব কিছুই হতো না। সব আঁধার হয়ে গেলো। সব শেষ !

কমা পাশ ফিরে স্বামীর সবনেশে উচ্চাশার কথা ভেবে নিঃশব্দে কেঁদেছিলো।

এখন আমার স্বামী কোথায় ?

কমা ভাবলো। কমা শিউরে উঠলো।

সুলতা রায়ের বাড়ি গেছে। 'কল্যাণী'তে।

'কল্যাণী'তে সুলতা রায় একা থাকে।

আমার স্বামীর সঙ্গে অবশ্য প্রবোধ আছে। প্রবোধ আছে, একথাটা অবশ্য আমার স্বামীই বলেছে।

আমার স্বামী উচ্চাশার জন্যে মিথ্যেও তো বলতে পারে।

হয়তো প্রবোধ আদৌ নেই।

কমা বিছানায় ছটফট করতে লাগলো।

তার ডায়েরীতে প্রবোধের ফোন নাম্বার আছে। নীচে নেমে ডাক্তারখানা থেকে একটা ফোন করবে নাকি ?

সুলতা রায়ের বাড়িও তো ফোন করতে পারে। কমা সত্যিই উঠলো।

হাতে খোঁপা জড়িয়ে আঁচলটা টেনে পায়ে চটি গলিয়ে নীচে নামলো। সদর তখনো বন্ধ হয়নি।

মানিকবাবু দোকান বন্ধ করে বাড়ি আসেননি। ওঁর পাইস হোটেল আছে। কমা মোড় পর্যন্ত গিয়ে, হতাশ হয়ে দেখলো কোনো কারণে ডাক্তারখানা এই রাত সাড়ে দশটাতেই বন্ধ হয়ে গেছে। অথচ সামনে দীর্ঘ রাত্রি। কমা বুঝতে পারলো তার ঘুম হবে না।

কমা বুঝতে পারলো বিবাহিত জীবনে একটি দিনও তার নির্ভয়ে কাটেনি। তার স্বামীকে ভাগ্য ক্রমশ তার কাছ থেকে ঘুরে আরো ঘুরে নিয়ে যাচ্ছে। বিয়ের দুটো

বছরের মধ্যেই স্বামীকে কত কম কাছে পাচ্ছে রুমা। স্বামীকে উজ্জ্বার দিকে রাতে বাইরে থাকতে দিতে হচ্ছে। রুমা যত অধিকার চাইছে, অন্তীন ততো অধিকার নিচ্ছে। না দিলে জোর করে কেড়ে নিচ্ছে তার রাগ দুঃখ যন্ত্রণাকে, ছেলেমানুষী হিষ্টিরিয়া এসব বলে হাল্কা করে দিচ্ছে।

রুমা কি করবে।

পাশাপাশি রুমা নিজেকে আর অন্তীনকে তুলনা করে বুঝতে পারলে, সংসারের ভার নেবার জন্য সে কি ভাবে নিজেকে স্বধর্মচ্যুত করেছে। এমন একটা পথে চলে গেছে যার সঙ্গে তার আদর্শের কোন যোগ নেই।

অথচ অন্তীন!

সারারাত রুমা, কল্পনার দুর্লঙ্ঘ্যতার দোষার পরে নিজের কল্পিত ভবিষ্যতে, বিচ্ছেদে, এমনকি আত্মহত্যার মধ্যে ঘুরে ঘুরে বেড়ালো।

সকালেও তার ঘুম এলোনা।

এখন সকাল দশটায়, সে অফিসে! অন্তীনকে যে নাম্বারে পাওয়া যায় সেখানে ডায়াল করে, এনগেজড্ পাচ্ছে!

রুমা এখন কি করবে?

খালি, বড়ো একঘর। চেয়ারগুলো কেউ আসেন নি! রুমা একা।

রুমার চোখ ঝাপ্সা হয়ে এলো।

—কি আজ সকাল সকাল?

রুমা চমকে তাকালো।

স্বয়ং ম্যানেজিং ডাইরেক্টর?

ভরতনাথ রায়চৌধুরী।

ষাট বছর বয়স তো হবেই। কিন্তু দীর্ঘ সুন্দর শরীর। মেদহীন, সোজা। মাথার সমস্ত চুল মনে হয় যেন ব্লিচ করে সাদা করে দিয়েছে কেউ। চোখে মুখে ভারি একটা সৌম্য ভাব। মুখ রেখা-ময়। কিন্তু এককালে অত্যন্ত রূপবান ছিলেন। বোঝা যায়। রুমা আমতা আমতা করছিলো।

—তুমি বলছি, কিছু মনে করোনা। ঠিক কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করো?

এন্টাবলিশমেন্টে।

রুমা লক্ষ্য করলো যে মানুষ কারো দিকে কখনো চোখ তুলে তাকান না তিনি নির্নিমেষে রুমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি শুধু রুমাকে দেখছেন না, দেখার আরো গভীরে প্রবেশ করেছেন।

এ অফিসে কতদিন আছো?

—দু' বছর!

—মাত্র দু বছর। তাহ'লে তো নর্মাল কোর্সে প্রমোশনের দেরী আছে।

—রুমা বললো,

—শুনেছি আমার নাকি কোনো প্রমোশনের চান্সই নেই?

—কে বলেছে?

হাসলেন ভরতনাথ। এখানে, আমি চাইলে কি না হয়?

রুমা মাথা নীচু করলো।

—আচ্ছা! কাজ করো!

ভরতনাথ চলে গেলেন।

রুমা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো।

দুপুরে টেলিফোন অপারেটরের কাছে গেলো রুমা। মেয়েটির নাম শীলা। নিজে যতবার ট্রাই করেছে অন্তীনের লাইন এনগেজড্ পাচ্ছে। এতক্ষণে অন্তীনেরও তো ফোন করা উচিত ছিলো।

শীলা বললো,

—দাঁড়াও, তোমার নাম্বারটা ট্রাই করছি। জানিনা, আজ ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের কি ব্যাপার। ওঁর দার্জিলিং থেকে দুবার ট্রাঙ্ককল এলো, উনিও দু তিন জায়গায় ট্রাঙ্ককল করলেন। বুঝছিনা।

—দার্জিলিং-এ ওঁর কে আছেন!

ফ্যামিলি, ওঁর স্ত্রীতো আবো ছিটগ্রস্ত। একটি ছেলে হায়দ্রাবাদের অফিসে ট্যুরে গেছে। মেয়েটির সামনের মাসে বিয়ে।

—আচ্ছা!

হতাশ হয়ে ফিরে এলো রুমা।

সারাদিন অতীনের কোন খবর নেই। সুলতা রায়ের আইনত স্বামী একজন, বেআইনী প্রেমিক অনেক। তার কবলে পড়লে সে বাকি কাউকে সহজে ছাড়েনা।

বিকেল পাঁচটার সময় একটা অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো।

ম্যানেজিং ডাইরেকটর তাকে ডেকেছেন। ফোন করে অপারেটর খবর জানালো।

ক্ষমা কাঁপতে কাঁপতে ঢুকলো তাঁর ঘরে। কারণ সে অনেক নীচের মানুষ তার দৌড় রবীনবাবু পর্যন্ত। তার উপর সেকসনাল্ ডিভিশনাল আরো কত কি, তারপর ম্যানেজিং ডাইরেকটরের সুন্দরী মেমসাহেব পি. এ, তারপর স্বয়ং তিনি।

আজ আর পি এর ঘরে কেউ নেই, খালি।

—আসতে পারি, বলে ক্ষমা ঢুকে পড়লো।

ভরতনাথ চৌধুরী পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ক্ষমাকে দেখে ফিরলেন। নিওনের নীলাভ আলোয় ক্ষমা কি তাঁর চোখে দু ফোঁটা জল দেখলো? না'কি বৃদ্ধ মানুষদের চোখ এমনিতেই ছল ছল করে।

অনেকক্ষণ ক্ষমার দিকে তাকিয়ে থেকে চাপা গলায় তিনি বললেন,

—ক্ষমা, আমাকে আজ তুমি একটু দয়া করবে?

ক্ষমা রুদ্ধ কণ্ঠে ঢোঁক গিললো শুধু।

—আজ আমার সঙ্গে ডিনার খাবে?

ক্ষমা মাথা নাড়লো।

মাথা নাড়া ছাড়া উপায়ই বা কি? হঠাৎ তার মনে হলো যদি অতীন আজও না ফেরে, হয়তো ভালোই হয়।

ভরতনাথ তার বাবার বয়সী হলেও পুরুষ বস। হয়তো সকালে তাকে দেখে তাঁর কিছু মনে হয়েছে। তিনি তার 'সঙ্গ' চান। যদি খারাপ অর্থে চান, তাহলে সেতো ফিরে আসতেই পারে। কে তাকে আটকাবে। আর যদি নির্দোষ সময় কাটানোর জন্য তাকে পেতে চান, তাহলেই বা মন্দ কি। ধনী লোক। কতো চেনা জানা তাঁর। হয়তো ক্ষমার ভবিষ্যৎ খুলে যাবে!

ভরতনাথ বললেন,

—তাহলে রাজি!

ক্ষমা মাথা নাড়লো।

—নীচে যাও, আমার গাড়িতে বসো!

ক্ষমা এবার একটু ইতস্তত: করলো।

—একবার বাড়ীতে যাবোনা?

—কি পোশাক পাল্টানোর জন্য! তোমার ভাবনা নেই, চলো, আমার বাড়িতে চলো, পোসাকের অভাব হবেনা।

ক্ষমা এর আগে কখনো দামী, এয়ার কণ্ডিশন করা গাড়ী চড়েনি। ক্ষমা কখনো কোনো দু'তালা বাড়ীর সবচেয়ে ওপর তলায় এমন স্বর্গ রাজ্যে আসেনি। বাড়িতে, গেটে দারোয়ান ছিলো। কিন্তু দু' তলায় ভরতনাথের একেবারে শো-উইণ্ডোর মতো সাজানো ঘরগুলোয়, ক্ষমা কোনো লোকজন দেখতে পেলোনা। চাকর বাকর তো নয়ই।

হঠাৎ ক্ষমার মনে পড়লো, ভরতনাথের পরিবারের সবাই দার্জিলিং-এ। একটা আতঙ্ক ক্ষমাকে ঘিরে ধরলো।

—তুমি এক কাজ করো, লিফ্‌টে, কিংবা সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলায় যাও। ওখানে করিডোরের ডান দিকের প্রথম ঘরটায় শাড়ি ব্লাউজ, যা যা তোমার দরকার সব পাবে। আর বাথরুম আছে, স্নান করে নিও।

ক্ষমা মাথা নেড়ে চলে যাচ্ছিলো, ভরতনাথ তাঁর বসার হলের ড্রিঙ্কস্ ক্যাবিনেটের দিকে এগোতে এগোতে অদ্ভুত নরম গলায় বললেন,

—আর শোনো, লাল পরো, লালরঙের কিছু!

ক্ষমার অটোমেটিক্ লিফ্‌ট রপ্তই ছিলো, তবু সে ভাববার অবকাশ পাওয়ার জন্য সিঁড়ি দিয়ে নামলো।

পাঁচতলার ঘরগুলোও জনশূন্য। কেউ নেই। কার্পেট মোড়া চওড়া 'হল' দিয়ে ক্ষমা ডান দিকের ঘরে ঢুকে, উজ্জ্বল আলো জ্বাললো।

ঘর নয় ফ্ল্যাট্। বসার ঘর শোয়ার ঘর, বাগানমুখী লাউনজ। কোনো মেয়ের ঘর। কোনো তরুণী মেয়ের। ক্ষমা অবাক হয়ে সাজান ঘরগুলি ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। শোওয়ার ঘরে, একদিকের দেওয়াল জোড়া

ব্রন্জ ও সোনালী তারের কাজ করা ওয়াড্রোব। হাতল ধরতেই খুলে গেলো। অসংখ্য শাড়ি, পোষাক, নাইট গাউন, হাউস কোট সারি সারি হ্যাঙারে ঝুলছে।

রুমা অবাক হয়ে দেখতে লাগলো। তারপর তার আবছা মনে পড়লো তাকে ভরতনাথ, লাল শাড়ি পরতে বলেছেন। রুমা, কার জানে না, সেই অজানা তরুণীর লাল একটি কাতান বেনারসী আর ম্যাচিং ব্লাউজ সংগে নিয়ে বাথরুমে এলো। বিরাট বাথরুম, মস্ত বাথটব। ঠাণ্ডা আর গরম জল। রুমা ড্রেস্ ক্যাবিনেটে নিজের শাড়ি ব্লাউজ সায়া সব তুলিয়ে রেখে বাথটবের গরমজলে গিয়ে শরীর ডুবিয়ে দিলো।

রুমার আর কোন সন্দেহ নেই।

অনেক দূরে অতীনের মূর্তিটা কেমন আবছা আর ছোটো হয়ে আসছে। রুমা অতীনের দিকে মনস্থির করতে চাইলো। তার ছবিটা স্পষ্ট করে মনে আঁকতে চেষ্টা করলো। তার বুকে বেনো পিন্ ফুটতে লাগল। মনে পড়লো অতীনও কল্যাণীতে সুলতা রায়ের কাছে গেছে। সুলতা রায় হয়তো ট্রেনের ময়লা কাপড় ছাড়ার জন্যে অতীনকে পাশের কোনো ঘরে যেতে বলেছে। হয়তো ভালো তাঁজ ভাঙা পোষাক ধুতি এনে দিয়েছে। তারপর বলেছে, ওই বাজে মেয়েটা, তোমার সেই বউ, তার কাছে আজ ফিরে গিয়ে আর কি হবে ?

রুমা বুঝতে পারলো ভরতনাথও এইজন্যেই তাকে ডেকেছেন। তিনি বড়ো একা। একসংগে ডিনার, তারপর ?

রুমা বুঝতে পারলো, আজ রাতে বাড়ি ফেরা আর হবে না তার। অফিসের ম্যানেজিং ডাইরেক্টরের প্রিয়-পাত্রী হওয়া। তাঁদের পুরুষানুক্রমিক ব্যবসায় তিনি সর্বেসর্বা। তিনি ইচ্ছে করলে কি না পারেন ? চাই কি রুমা যদি চায় তাহলে অতীনকে একটা নিজস্ব স্টেজও বানিয়ে দিতে পারেন। অবশ্য রুমা অতীনকে চাকরী দেবে, ব্যবসাতেও বসিয়ে দিতে পারে, কিন্তু থিয়েটার নয়। বাজে মেয়েরা চারপাশে ঘিরে থাকলে, ওই যে বলছে না, পুরুষের মন না মতি।

ভরতকেও তো দেখেছে রুমা। ষাট বছর বয়স হলো, একদিনও রুমার দিকে ফিরে তাকান নি। আজ, এক মুহূর্তে হঠাৎ !

একটু হেসে রুমা নিখুঁত করে সাজ গোজ করলো। ছ' তলায় উঠে এসে দেখলো ভরতনাথ চেয়ারে গা এলিয়ে বসে বাদামী রঙের পানীয়ে চুমুক দিচ্ছেন। রুমাকে দেখে হাত তুলে তিনি বললেন,—তোমার খুব ভাল লাগছে না আমি জানি। কিন্তু একজন মানুষকে তার জীবনের এক অন্তিম দিনে তুমি অনেক কিছুই দিলে। চলো ডিনারে যাই।

ডিনারের জন্যে তারা গেলো শহরের সবচেয়ে জম্-কালো হোটেলে। রুমার কাছে সবই যেন স্বপ্নের মতো, অভাবনীয়। ডিনারের পর গাড়িতে উঠলেন ভরতনাথ। ইতিমধ্যে তিনি এতো সহজে কথাবার্তা বলেছেন যে তারা দুজনে প্রায় বন্ধু হয়ে গেছে। রুমার জীবন, স্বামী, বাবা মা সব কিছু সম্বন্ধেই তাঁর সব জানা হয়ে গেছে। কিন্তু রুমা প্রায় কিছুই জানে নি।

রুমা শুধু ভাবছিলো একটি রাতের ব্যাপার। কেই বা জানছে। আর যদি একরাত নাই-ই হয়, না হয় কয়েক রাত।

রাত না হয়ে দিনেও তো ব্যবস্থা হতে পারে ! অতীনের তাচ্ছিল্য উদাসীনতার প্রতিশোধ নেওয়া হবে। চাকরিটা আরো ভালো করা যাবে। আরো কত কি ?

রুমা চাপা গলায় বললো,

—অফিসে কোনো ভাল পোষ্ট্ খালি হয়না ?

ভরতনাথ বললেন,

—সেই কথাই তো ভাবছিলাম, তুমি বড়ো কম মাইনে পাও।

রুমা ঠিক করলো ফিরে গিয়ে সে পাঁচতলার সেই অজানা মেয়েটির ওয়াড্রোব থেকে কালো লেসের 'নেগলিজি'টা পরবে। ভরতনাথের শোবার ঘরটা সে উঁকি দিয়ে দেখেছে। আশ্চর্য সুন্দর।

ভরতনাথ গাড়ির ড্রাইভারকে রুমার বাড়ির রাস্তা বলে দিতেই রুমার বুকটা ধ্বক্ করে উঠলো।

—আপনি বাড়ি যাবেন না ?

—হ্যাঁ যাবো, তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাবো ?

কমা কথা বললো না। পিছনের সিটে হেলান দিয়ে ভাবলো কিসে এতো রাগ করলেন ভরতনাথ, সে কি একটু বেশি দামী পোশাক পরে ফেলেছে, না চাকরীর কথা বলেছে বলে ? চালে ঠিক কোথায় ভুল হলো।

কমাদের বাড়ির সামনে গাড়ি থামতেই ভরতনাথ ওর হাতটি চেপে ধরলেন।

—তুমি জানো না, আজ তুমি আমাকে কতো দিয়েছো। সকালে তোমাকে দেখেই আমার এক বড় প্রিয়জনের সঙ্গে তোমার মুখের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলাম। সে আমার মেয়ে। আজ আমার বড় মেয়ে, ও আমার একটিই মেয়ে, চন্দ্রার জন্মদিন ছিলো। চন্দ্রা লাল শাড়ি পরতে খুব ভালবাসে। আজ ট্রাঙ্কে খবর এসেছে আমাদের সঙ্গে সব সম্বন্ধ ছেড়ে, অন্যায় বিয়ে করে ছেলেটির সংগে চলে গেছে। কোথায় গেছে কেউ জানে না।

আচ্ছা। চলি।

ভরতনাথের কণ্ঠস্বর আরো ক্লান্ত আরো অসহায় লাগলো কমার।

নিজের ভিতরে নিজে সে হি হি করে উঠলো। সে বুঝতে পারলো মনে মনে সে কতো নীচুস্তরের মানুষ। আর একটু হলেই তার মনোভাব ভরতনাথের কাছে ধরা পড়ে যেতো। যদি তিনি রুচি খেতে ডাকতেন। যদি সে সেই আমন্ত্রণকে তার মনোমত আহ্বান ভেবে, নীচ থেকে পোষাক বদলে, কালো নেটের সেই রাত পোষাক পরে তাঁর কাছে উঠে আসতো ?

সিঁড়ি দিয়ে উঠে কমা ঘরে এলো। অতীন ভিতরে বিছানায় শুয়ে আছে। পরণে তার দুদিনের বাসী জামা। কমাকে দেখে উঠে বললো।

—কোথায় ছিলে ? এসব কার পোষাক ?

কমা বানিয়ে অনেক মিথ্যে বললো। বিয়ে বাড়ি, বন্ধুর কাছে ধার করা শাড়ি ইত্যাদি ইত্যাদি। তারপর অতীনের পাশে বসে বললো,

—তোমার কি হলো বলো ?

—আমি ?

অতীন হাসলো,

সুলতাদিকে ফোন করেছিলাম। সুলতাদি একটা সর্তে অভিনয় করতে রাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু তোমার কথা মনে পড়তে, আমি আর কল্যাণীতে যেলাম না, যেতে পারলাম না। কালরাতে প্রবোধের ওখানে ছিলাম। আজ সকালে বারান্দতে গিয়ে জ্যোৎস্না মিত্রকে ঠিক করে, এই ফিরছি।

কমা চাপা গলায় বললো,

—সুলতাদি কি সর্ত দিয়েছিলো ?

অতীন বললো,

—চরিত্রহীন, নীচ স্ত্রীলোকের কি সর্ত থেকে, জানোনা ?

অবশ্য তুমি ভাববেই বা কি করে ?

কমা মরমে মরে গেলো। তার একার পাপ নিয়ে সে এখন কি করে ?

অতীনের পাশে বসে আছে, তবু মনে হলো অনেক উঁচুতে অতীন। সে যেন একটা কূয়োর মধ্যে পড়ে আছে। অনেক নীচে। সে নিজের অজান্তেই অতীনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। অতীন তার হাত ধরে বললো,

—কি, কি হলো আবার ?

কমার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়ছে। সে কান্না আর রাখতে পারছিলো না। কোন মতে বললো,

—শুনেছি স্বামী স্ত্রীর নাকি অনন্ত কালের সম্বন্ধ। আমি যদি অন্যত্র থাকি, পড়ে যাই, তুমি আমাকে ধরে তোমার কাছে তুলে নিতে পারোনা ?

অতীন হেসে বললো,

—তুমিও তো পারো কমা। কাল তুমি ফোন না করলে, হয়তো !……

আস্তে আস্তে, অনুতাপে, আবেগে স্বামীর বুকে মুখ নামালো কমা।

রজনীগন্ধার রং লাল

গৌরীশংকর দে

কালো বড়ো-বড়ো চোখ তুলে তাকালো মেয়েটি। বালতি-ব্যাগ খুলে একগোছা রজনীগন্ধা বের করলো। টেবিলের ওপর রাখলো। বললো : 'আজ আমার জন্মদিন! সকালে এই ফুলগুলি এসেছে।'

'এ নিয়ে উদ্বিগ্ন হওয়ার কি আছে?'

'শুধু উদ্বিগ্ন নয়, ভীষণ ভয় পেয়েছি।' মেয়েটির চোখে শংকা ফুটে উঠলো। 'আমাদের পরিবারের আরো দু'জন তাদের জন্মদিনে অজ্ঞাত লোকের কাছ থেকে এমনি রজনীগন্ধা পেয়েছিলেন। দুজনেই ওই দিন মারা যান।'

'ঘটনাগুলি একটু খুলে বলবেন কি?'

মেয়েটি বললো : 'আমার কাকা শুভেন্দু রায় আর্মি অফিসার ছিলেন। অবসর নেবার পর বাড়ীতে একাই থাকতেন। বাড়ি করেছেন নিউ আলিপুরে। জন্মদিন উপলক্ষ্যে আমাদের নেমন্তন্ন করেছিলেন। এই সব উৎসব অনুষ্ঠানে আমার উৎসাহ সকলের চাইতে বেশী। সবার আগে আমিই গিয়ে হাজির হলাম কাকার বাড়িতে। সঙ্গে নিয়ে গেছি ভীমসেনের লংপ্লেয়িং একখানা রেকর্ড। কাকাকে উপহার দেবো। গান বড়ো ভালোবাসতেন।

গিয়ে দেখি দরজা বন্ধ। কলিং বেল টিপলাম। কোনো সাড়াশব্দ নেই। অথচ আলো জ্বলছে। অস্বাভাবিক মনে হলো। ইতিমধ্যে আরো কয়েকজন আত্মীয় স্বজন এসে পৌঁচেছেন। শেষ পর্যন্ত দরজা ভাঙা হলো।'

'তারপর?'

'ভেতরে ঢুকতেই চোখে পড়লো রজনীগন্ধা। প্রায় ডজন খানেক হবে। এলোমেলো ছড়িয়ে আছে মেঝের কার্পেটের ওপর। ভেঙে টুকরো হয়ে আছে কাচের একটা ফুলদানি। মেঝেতে একটা জায়গায় এসে জমেছে জল।

দেখলাম কয়েকটা রজনীগন্ধার রং শাদা নয়, লাল। দেখে আমি চীৎকার করে উঠেছিলাম। পাশেই মেঝেতে শুয়ে আছেন কাকা। তার মুঠিতে একটা পিস্তল। বুকের একপাশে চাপচাপ রক্ত।

'তারপর?'

'পুলিশ এলো। তদন্ত চললো। রিপোর্ট আত্মহত্যার ঘটনা ব'লে।

রজনীগন্ধাগুলি পুলিশের চোখেও পড়েছিলো। কিন্তু তারা গুরুত্ব দেয় নি। আমার কাছে কিন্তু তাৎপর্যময় মনে হয়েছিলো। কারণ, আমি জানতাম কাকা ফুল দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। বলতেন—মানুষ যে-রকম দুঃখী, দুখের প্রতীক এই ফুলগুলিকে সহ্য করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সেই মানুষ ফুলদানিতে রজনীগন্ধা সাজিয়ে রাখবেন এ অবিশ্বাস্য। কেউ ফুল দিলে তিনি অতিথি চ'লে যাবার পরে জানালা দিয়ে বাইরে ফেলে দিতেন। কাচের ফুলদানির আবির্ভাবও রহস্যময়। ফুল ভালবাসতেন না ব'লে, ফুলদানিও কাকা রাখতেন না।'

চা এলো। মেয়েটির দিকে কাপ এগিয়ে দিতে দিতে রমেন বাবু বললেন, 'মাপ করবেন, আপনার নামটাই আমার জানা হয়নি।'

'আমার নাম তাপসী রায়।'

চায়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে তাপসী আবার বলতে শুরু করলো :

"দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটে মাত্র মাস দুই আগে। এবার মারা যান আমার পিসীমা। জন্মদিনে। নিমন্ত্রণ পেয়ে গিয়েছিলাম পিসীমার বাড়ীতে। যাদবপুরে। যেতেই পিসীমা বললেন—একটু আগে এক জন লোক এসে এক-গুচ্ছ রজনীগন্ধা রেখে চ'লে গেছে। লোকটাকে দেখার সুযোগও পাই নি।

রজনীগন্ধার কথা শুনে বুকের ভিতরে কেমন একটা ভয়

জেগে উঠলো। কাকার কথা মনে পড়লো। তবু মনে হলো ভয়ের কী আছে! ওই তো পিসীমা বসে আছেন। ঘর-ভরা অতিথি।

উৎসবের শেষে বাড়ি ফিরে এলাম। রাত তখন দশটা। ঘণ্টা খানেক পরেই ফোন বেজে উঠলো। ফোন ধরলাম। কে?

আমি বরদী।

বরদী মানে পিসীমার বিশ্বস্ত ভৃত্য। কেন সে ফোন করছে? কী হলো আবার এত রাতে!

কী। পিসীমা মারা গেছেন!

সে কি। একটু আগেও তো

হাসিখুশী—অবশ্যই।

আবার হাজির হলাম পিসীমার বাড়িতে।

ড্রয়িং রুমের টেবিলের সামনে বসে আছে পিসীমা। তার মাথাটা টেবিলের উপরে হেলেপ'ড়ে আছে। পাশে এক কাপ কফি। দেখা গেলো তার অর্ধেকটা খেয়েছেন।

পুলিশ রিপোর্টে পরে জানা গিয়েছিলো কফিতে মেশানো ছিলো একরকমের উগ্র বিষ। পুলিশ ব্যাপারটাকে খুনের ঘটনা বলেই সন্দেহ করেছিলো, কিন্তু বিশেষ তদন্তও করেনি, কিনারাও করতে পারেনি। অনেকটা আমাদের নিষ্ক্রিয়তার জন্যই চাপা প'ড়ে গিয়েছিলো বলা যায়।

তারপর আজকের ঘটনা।'

তাপসী একটু থামলো।

রমেনবাবু উৎসুক হয়ে তাকালেন।

তাপসী শঙ্কিত কণ্ঠে বললো: 'আজ আমার জন্মদিন। আর, একটু আগে একজন অপরিচিত লোক বাড়ীতে রেখে গেছে এক গোছা রজনীগন্ধা।'

'উৎসব তো সন্ধ্যার পরে, তাই না?' 'আজ্ঞে হ্যাঁ। সব আত্মীয়-স্বজনরা আসবেন।'

—'আপনার কোন শত্রু আছে ব'লে জানেন?'—'সে রকম তো আমার জানা নেই।'

—'আপনি খুব ধ'নে আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে কারো লাভ হয়,'

তাপসী একটু ভেবে নিয়ে বললো 'তা হ'তে পারে। অনেক টাকা রেখে আমার বাবা মারা গেছেন। মারা যাওয়ার আগে উইল ক'রে দিয়ে যান যে সব টাকা সমান ভাগে ভাগ করা হবে। এক ভাগ পাবেন কাকা, এক ভাগ আমি আর বাকি দুই ভাগ দুই পিসীমা।'

'এক পিসীমা তো মারা গেছেন, তা হলে।'

'আমার আরেক পিসীমা আছেন। বিভা রায়। অবিবাহিতা। দুর্গাপুরে চাকরী করেন। যে পিসীমা মারা গেছেন তাঁর নাম মনোরমা রায়। উনি ছিলেন বিধবা।'

'মৃত কাকা আর মৃত পিসীমার সম্পত্তির কী হলো? 'উইল অনুসারে তার মালিক এখন আমি আর বিভা পিসী।'

'মানে আপনার বাবার টাকা কড়ি ও সম্পত্তির মালিক এখন আপনারা দুজন?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বিভা দেবী কি আজকের অনুষ্ঠানে আসবেন?'

'হ্যাঁ, সে-রকমই তো চিঠিতে জানিয়েছেন। ঠিক আছে, আপনার জন্মদিনে অন্য সবার মতো আমি একজন অতিথি হতে চাই আপত্তি নেই তো?

'আপত্তি? সেই আমন্ত্রণ জানাতেই তো আমি এসেছি! আপনি নিজে থেকেই প্রস্তাব দেয়াতে যে কী কৃতজ্ঞ বোধ করছি!'

বাড়ির ঠিকানা রেখে তাপসী যখন চ'লে গেলো। রজনীগন্ধার গুচ্ছও। ওই ফুলগুলি কি সত্যিসত্যি মৃত্যুর নিঃস্বপ পরোয়ানা! যে পাপড়ি গুলি এত সাদা এত স্নিগ্ধ তাই কি লাল হয়ে উঠতে পারে কোনো হতভাগ্যের রক্তে?

• • •

চারদিকে যেমন রাতের আবছা অন্ধকার নেমে এসেছে, ঠিক তেমনি রাস্তার আলোও জ্বলে উঠেছে সারি সারি। একটা বাড়ির সামনে এসে থামলেন রমেনবাবু। হলদে রঙের দোতলা বাড়ি। চকোলেট রঙের প্যান্ট আর ক্রিম রঙের শার্টপরা রমেন বাবুকে এখন আর পুলিশের

লোক বলে মনেই হচ্ছেনা। দরজার কলিংবেল টেপবার আগে একবার বাড়িটা পেছন দিক থেকে ঘুরে এলেন। সাদা পোষাক পরা একজন পুলিশের লোক সেখানে দাঁড়িয়ে বাড়িটার ওপর নজর রেখেছে। সেই লোকটিকে ইশারায় নিজের উপস্থিতি জানিয়ে রমেনবাবু আবার ফিরে এলেন বাড়ির সামনের দিকে।

কলিংবেল টিপতেই দরজা খুলে গেলো। অভ্যর্থনা জানাবার জন্ত তাপসী নিজেই এগিয়ে এলো। সে বোধ হয় এতক্ষন উৎকণ্ঠিত হয়ে রমেনবাবুর জন্তই অপেক্ষা করছিল। তাকে দেখে হেসে বললে, 'দেখছেন তো এখনো সশরীরে জীবিত আছি। জানতুম আপনিই প্রথম আসবেন।'

রমেনবাবুর মুখ গম্ভীর। বললে, একটা কথা আপনাকে বলে দিচ্ছি। আজ রাতে এক মিনিটের জন্তও কারো সঙ্গে একা থাকবেন না। যদি সে রকম পরিস্থিতি দেখা দেয় তবে যে কোনো ছুতো করেই হোক আমাকে সঙ্গে রাখবেন। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন? ব্যস, আর কিছু আপনাকে বলার নেই।

ঘরের এক কোণে একটি মস্ত, সুদৃশ্ত পিয়ানো। তার ওপর রুপোর পাতে সাজিয়ে সাজিয়ে রাখা হয়েছে রজনী-গন্ধার গুচ্ছ। যেন মৃত্যুকে তুচ্ছ করার চেষ্টায়।

ঘরে অনেক অতিথি সকলেই আলাপরত।

আবার বাইরের দরজায় কলিংবেল বেজে উঠলো। এবার এসে ঢুকলেন তাপসীর অবিবাহিতা পিসী বিভা রায়, হাতে একটা সুটকেস।

বিভারায়ের জন্ত নির্দিষ্ট রয়েছে দোতলার সিঁড়ির কোলের ঘরখানা। তাঁকে সেই ঘরে নিয়ে গেলো তাপসী। যেই মাত্র বিছানার ধারে সুটকেসটা নামিয়ে রাখতে গেছে অমনি বিভা রায় হঠাৎ ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর আতঙ্কের কারণ একটা কালো বেড়াল। একটা মরা ইঁদুর নিয়ে সেটা তখন খাটের তলায় খেলা করছিলো। 'তুমি তো জানোই তাপসী, বেড়াল আমার দু-চক্ষের বিষ'।

তাপসী বললে, 'বেড়ালটা এখানে এলো কেমন ক'রে তাই ভেবে পাচ্ছি না।' বেড়ালটাকে বের করে দেয়া হলো ঘর থেকে। তবু বিভা পিসী শান্ত হতে পারলেন না। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন এখানে থাকুক আর না থাকুক একটু আগেও যেখানে বেড়াল ছিলো সেখানে রাত কাটানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব।

তাপসী দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, 'ঠিক আছে, আমি এই ঘরে ঘুমোবো। আপনি না হয় আমার ঘরে ঘুমাবেন।'

রমেনবাবু ঘরে ঢুকতে গিয়ে কথাটা শুনলেন। ঘরে না ঢুকে ফিরে গেলেন।

জন্মদিনে উৎসবটি বড়োই নিরানন্দ মনে হচ্ছিলো। সবচেয়ে করুণ তাপসীর অবস্থা। ওর দিকে কারুরই মনোযোগ নেই। অথচ ওরই আজ জন্মদিন।

টেবিলের চারধারে যারা গোল হয়ে ব'সে আছে তাদেরই একজন খুনী। অবাক হয়ে ভাবলো রমেন। কিন্তু খুন করার আগে রজনীগন্ধা পাঠাবার মতো কল্পনা এদের একজনেরও আছে ব'লে তো মনে হয় না।

• •

পরিচারিকা এসে খাবার আর কফি দিয়ে গিয়েছিলো। সবাই তার সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত। তাপসী কফির পেয়ালা ঠোঁটের কাছে নিয়ে হঠাৎ ভ্রু কুঁচকে আবার নামিয়ে রাখলে টেবিলে। ঠিক সেই মুহূর্তে রমেনবাবু বলে উঠলেন, 'তাপসী দেবী, আমার মনে হয় কফির পিয়ালাটা একটু বদলে গেছে। আপনার হাতে যেটা সেটা আমার। আর এটা আপনার।

তার হাত থেকে কাপটা নিয়ে নাকের কাছে তুলে ধরবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন কেন তাপসী ঠোঁটের কাছে নিয়েও কফি খায়নি।

মনে মনে উত্তেজিত হলেন রমেনবাবু। পাটিটা তাঁহ'লে এতক্ষণে সত্যি সত্যি জমে যাচ্ছে। একুণি একটা কোন কড়া ধরণের এ-কথা জানিয়ে উঠে দাঁড়ালো রমেনবাবু। তার হাতে ধরা রয়েছে কফির কাপ। তাপসীই তাকে নিয়ে গেল পাশের ঘরে। সে ঘরে যেতেই তাপসী জিজ্ঞেস করলে, 'আচ্ছা, কাপ দুটো আর

সত্যি বলতে পারিনি। তাহ'লে আপনি আমার কাপড়টা নিয়ে নিলেন কেন ?"

'আপনিই বা ঠোঁটের কাছে নিয়েও চুমুক না-দিয়ে কাপড়টা টেবিলে রাখলেন কেন ?

'কী রকম একটা গন্ধ পাচ্ছিলুম'

রমেনবাবু বললেন, 'গন্ধটা প্রুসিক অ্যাসিডের। আবার শুঁকে দেখুন।' তার হাতে তুলে কাপড়টা দিলেন। 'অ্যাঁ!' মুখটা হাঁ হয়ে গেলো তাপসীর। হাত থেকে পড়ে চুরমার হয়ে গেল কফির কাপটা। বললে, কী সাংঘাতিক। এরই মধ্যে আমাকে খুন করার একটা চেষ্টা হ'য়ে গেলো! কফির সঙ্গে কে ওই এসিড মেশাতে পারে ?

'আমিও সেই কথাই ভাবছি। আমি এক মিনিটের জন্য একটু বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলুম এর মধ্যে এই হাত সাফাইয়ের কাজটুকু কে করলে ? অবশ্য, উপস্থিত যারা আছেন, তাদের যে কেউই তা পারেন। এমনকি পরিচারিকাটিকেও সন্দেহ করা চলে।, টাকার লোভে সে হয়তো কারো নির্দেশ মতো—'

আপনি ড্রয়িং রুমে যান। আমি এক মিনিটের মধ্যে যাচ্ছি।'

তাপসী তবু একা যেতে ইতস্তত: করলে। তারপর বেশ অনিচ্ছা নিয়েই ফিরে গেলো ড্রয়িং রুমে।

রমেনবাবু মেঝের দিকে তাকালেন। পেয়ালার ভাঙা অংশগুলির চারদিক বেশ খানিকটা কফি জমা হয়েছে। রমেনবাবু পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে সেই কফিতে রুমালটা জবজব ভিজিয়ে নিলেন। শেলফের ওপর একটা ছোটো খালি বোতল পড়েছিলো। তার ভেতরে রুমালটা ভরে কর্ক এঁটে পকেটে রাখলো রমেনবাবু, চলে গেলো বাড়ির পেছনদিকে। সাদা পোষাকপরা পুলিশের লোকটি তখনো সেখানো দাঁড়িয়েছিলো। রমেনবাবু তার হাতে বোতলটা দিয়ে বললেন, তক্ষুণি ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করে সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসতে।

ড্রয়িং রুমে ফিরে এসে রমেনবাবু দেখেন ঘরের আবহাওয়া এমন শান্ত আর নিরীহ যে মনেই হয়না যে খানিক আগে ঠাণ্ডা রক্তে সুপরিকল্পিত ভাবে একটা খুনের চেষ্টা হয়ে গেছে। বিভা পিসী অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত। তাপসীও ভয়ার্ত চোখ মেলে একটা সোফায় একা বসে আছে।

দেয়াল ঘড়িতে ঢং ঢং করে দশটা বাজলো। বিভা পিসী বড়মড় উঠে জানালেন এবার তিনি ঘুমোতে যাচ্ছেন। যাবার আগে তিনি রমেনবাবুকে নমস্কার জানিয়ে গেলেন।

রমেন বাবু তাপসীকে বললেন, 'এবার আপনিও গিয়ে শুয়ে পড়ুন।'

'শুয়ে পড়বো ?'

'হ্যাঁ। নিজের
নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারেন।'

'কিন্তু আপনি যে বললেন খুনীকে ধরবেন।

আবার হেসে রমেনবাবু বললেন, 'আমার মনে হয় খুনীকে ধরতে পেরেছি। আপনার আর দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। যদি আমি ভুল ক'রে না থাকি তবে এটুকু বলতে পারি অন্তত: আজ রাতে আপনাদের পরিবারের কেউ আততায়ীর হাতে প্রাণ হারাবেন না! কাল একেবারে ভোরে আমি আসবো। নমস্কার ;"

বাড়ির পেছনে গিয়ে সাদা পোশাকপরা পুলিশের লোকটাকে বাড়িটার ওপর কড়া নজর রাখতে বলে সোজা পুলিশ কোয়ার্টারে ফিরে গেলেন রমেনবাবু।

নিশীথসেনকে অবাক করে দিয়ে জানালেন কাল তাপসী রায়ের বাড়ীতে গেলেই তিনি মনোরমার হত্যাকারীকে গ্রেফতার করতে পারবেন। পুলিশ ল্যাবরেটরীতে গিয়ে রমেনবাবু জানালেন কফিতে প্রুসিক অ্যাসিড নয়, রয়েছে তেতো বাদাম তেল।.....

নিজের ঘরে চুপচাপ বসেছিলেন রমেনবাবু। সন্ধ্যার ঘটনা গুলির কথাই ভাবছিলেন ;

ঘর থেকে বেরিয়ে বিদ্যুৎবেগে গাড়ি ছুটলো তাপসী রায়ের বাড়ির দিকে ; একটুকুর জন্য বোধ হয় জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটি করে ফেলেছেন। যদি এখনো

শোবরানো যায় এই আশায় স্পিডো-মিটারটাকে উত্তেজনায় প্রায় শেষ সীমায় নিয়ে গেলেন রমেনবাবু।

গাড়িটাকে থামিয়ে নেমে পড়লেন বাড়ির পেছন দিকে। পুলিশের লোকটি তখনো পাহারা দিচ্ছিলো।

আর একটুও দেরী না করে জানালা দিয়ে তাপসীর ঘরে ঢুকে পড়লেন রমেন বাবু।

ঘরের ভেতরে আবছা অন্ধকার। একধারে একটা বিছানা। সেখান থেকে ঘন-প্রশ্বাসের শব্দ আসছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন রমেনবাবু। যাক, তাহলে দেরি হয় নি।

পা টিপে-টিপে এগিয়ে গেলেন বিছানার কাছে ঘুমন্ত দেহ অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। পাশেই একটা টিপয়। তাতে কী একটা সাদা জিনিস। রমেনবাবু হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেখলেন একটা গ্লাস। তাতে খানিকটা দুধ। জিভের ডগায় একটু ছুঁইয়ে দেখলেন টক-টক লাগছে। সামান্য স্বাদ থেকেই মনে হলো দুধে কোন মারকদ্রব্য মেশানো হয়েছে।

কতক্ষণ ঘরের ভিতরে অন্ধকারে চুপ ক'রে দাড়িয়ে ছিলেন রমেনবাবুর নিজেরই খেয়াল নেই। ফিরে যাবেন কি না ভাবছেন এমন সময় বারান্দায় কার পায়ের শব্দ শোনা গেলো। শব্দটা ক্রমেই কাছে আসছে।

ঘরের সামনে এসে শব্দটা থামলো আস্তে আস্তে দরজাটা খুলে গেলো। পায়ের শব্দ ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে চ'লে এলো।

ঘর একেবারেই অন্ধকার। আগন্তুক জানালা বন্ধ ক'রে দিয়েছে। তারপর মনে হলো সে এগিয়ে চলেছে মারকদ্রব্যের ঘোরে অচেতন তাপসীর বিছানার দিকে তার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি রমেনবাবুর কাছে আর অস্পষ্ট নয়।

সন্ধ্যাবেলায়ই সব ঘরের সুইচের অবস্থান তিনি দেখে নিয়েছিলেন। দরজার পিঠ দিয়ে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপলেন। ঘরটা সঙ্গে সঙ্গে আলোকিত হলো। দেখা গেলো ঘুমন্ত দেহটির শিয়রে দাঁড়িয়ে একজন। আলো জ্বালবার সঙ্গে সঙ্গে সে হাত সরিয়ে নিচ্ছে ঘুমন্তের গলা থেকে।

রমেনবাবু অবাক হয়ে দেখলেন। আততায়ী বিভা রায় নয়—তাপসী রায়। তিনি জানতেন না ঘর বদল হয়েছে। সন্ধ্যাবেলা সে পরেছিলো চাপায়ফুলেরশাড়ী, এখন কালোশাড়ি তার পরনে। যেন সে দেখতে পাচ্ছে না এমন ভাবে তাকিয়ে আছে রমেনবাবুর দিকে।

রমেনবাবু ঘরের স্তব্ধতা ভেঙ্গে ব'লে উঠলো, 'যাক তাহলে খুনীকে হাতে নাতে ধরা গেছে। আমারই ভুল হয়েছিলো ও কথা বলা যে আজ রাতে আর কোনো খুন হবে না। যাক, ভুল শুধরে নিয়েছি।

তাপসীর দিকে তাকিয়ে থেকেই রমেন বাবু বললেন, 'কয়েক মিনিট আগেও বাধনা করতে পারিনি যে ঘরে আগে বিভা পিসীর থাকবার কথা ছিলো সেখানে আপনিই ইচ্ছা করে বেড়াল ছেড়ে দিয়েছিলেন। ফলে আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হলো।

বিভাপিসী বেড়াল সহ্য করতে পারেন না বলে ঘর বদলাতে বাধ্য হলেন। এ রাতটা পোহালেই সবাই দেখতে পেতো বিভাপিসী ঘরে আছেন আপনার বিছানায়। যেহেতু অনেকেরই জানা নেই যে আপনিই কায়দাটি করে ঘর পাল্টেছেন তাই সবাই ভেবে নিতো খুনী আপনাকেই খুন করতে গিয়ে ভুল করে বিভা পিসীকে খুন করেছে।

একটু থেমে রমেনবাবু আবার বললেন, 'রাতে যখন আমি এখান থেকে চলে যাই তখনই জেনে গিয়েছিলুম আপনি নিজেই ইচ্ছা করে কফির কাপে বিষ মিশিয়ে ছিলেন। না হলে আপনি কাপটাকে ইচ্ছা করে ভাঙতেন না। কোনটা অভিনয় তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারি। আপনি প্রখর বুদ্ধি ধরেন তা আমি বুঝেছিলুম কিন্তু বুদ্ধি না দুর্বুদ্ধি।

অদ্ভুত একটা বিষয়ে আপনার বুদ্ধির তারিফ না ক'রে পারছি না। একজন পুলিশের লোককে নিজের রক্ষাকর্তা হিসেবে সামনে রেখে লোক খুন করার যে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন তা সত্যি অভিনব। আপনার কল্পনা-শক্তিরও তারিফ করছি।'

তাপসী উত্তরে শুধু অসহায় ভাবে হাত মুঠো করলো।

রমেন বাবু বললেন: 'যতদূর মনে হয় শুভেন্দু বাবুকে আপনি খুন করেন নি সত্যি তিনি আত্মহত্যা করেছিলেন। আত্মহত্যার কারণ অবশ্য অজ্ঞাত। তার মৃত্যুতে অপ্রত্যাশিত ভাবে বেশ কিছু টাকা পেয়ে আপনার মাথা ঘুরে গেলো তক্ষুনি স্থির করলেন মনোরমায়ার কে খুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবেন। সরিয়েও দিলেন। এলো আরো মোটা অংকের অর্থ। শেষ অংশীদার রইলেন বিভা রায়। তাকেও সরাবার জন্য গত রাতে আয়োজন করেছিলেন একটি সুন্দর নাটকের।'.....

তাপসীর গ্রেপ্তারের দিন ক'য়েক পরে রমেন বাবু দেখলেন তার টেবিলের উপরে শুকিয়ে আছে রজনীগন্ধার গুচ্ছ। ওগুলি নিয়েই তাপসীরায় দেখা করতে এসেছিলো। মনে হলো এর মধ্যেই সব ঘটনা কেমন ধামুলী আর পুরনো মনে হচ্ছে।

বিশুলাল

মহাশ্বেতা দেবী

সবাই তাম্রফলক পাচ্ছে দেখে আমার বিশুর জন্ত বড় কষ্ট হল।

বিশু আমাদের চাকর ছিল। মতঃফরপুরের লোক, কি করে যে রংপুরে দুর্ভিক্ষের সময়ে এসে পড়েছিল জানি না।

রংপুরে দুর্দান্ত শীত পড়ত। খুব ভোরবেলা উত্তরের দিকে চাইলে কি যেন একটা পাহাড়ের বরফ ঢাকা চূড়োও দেখা যেত।

রোদ উঠলে আর দেখা যেত না বলে 'দেখেছি' ব্যাপারটা স্বপ্ন বলে মনে হত। নামটা জানতে তখনো চেষ্টা করিনি, এখনো ইচ্ছে হয় না।

থাক না একটা নাম-না-জানা চূড়ো, আমার কৈশোরের স্বপ্ন হয়েই থাকুক আমার মনে। রংপুরে ত শীতকালে কত পাখিও দেখেছি। নাম-না-জানা বিদেশের পাখি সব। উড়ে উড়ে বিলের ধারে এসে বাসা বাঁধত। তাদের ডানার রং আমার কৈশোরের স্মৃতির মধ্যেই থেকে গেছে। পাখিগুলোর নাম আজও জানি না।

কিন্তু নাম-না-জানা চূড়ো আর নাম-না-জানা পাখির গল্প বলতে বসিনি।

গল্প বলা জিনিসটাই ঠিক নয়। যেই গল্প ফেঁদে বসলে, অমনি তুমি সরে গেলে বিষয়বস্তু থেকে, বাইরে থেকে দেখে দেখে নিটোল গল্প বললে একটা।

ভেতরে ঢুকে গেলে আর গল্প থাকে না। তখন সব একাকার হয়ে যায়।

বিশুর কথা থেকে কি দূরে সরে গেলাম?

রংপুরের সেই দুরন্ত শীতে, ষাট বছরের বুড়ো একটা গাছতলায় পড়ে নিউমোনিয়ায় মরছিল।

বাবা ওকে তুলে নিয়ে আসেন।

সেই থেকে বিশু আমাদের বাড়ি থেকে গেল।

ও ঘর ঝাঁট দিত, জল তুলত, বাজার করত। আমাদেরও শিখিয়েছিল কেমন করে ফাঁদ পেতে পাখি ধরতে হয়, কেমন করে সাপ তাড়া করলে দৌড়ে পালাতে হয়।

সন্ধ্যাবেলা আগুন জেলে ও হাত-পা তাপাত। তখন ও অনেক গল্প করত।

এখন নাকি কলিযুগ, পৃথিবী পাপে ভরে গিয়েছে। বিশু বলত কলিযুগ শুরু হয়েছে ক্ষুদিরামের ফাঁসির পর থেকে। তার আগে, যে যাই বলুক, সত্যযুগই ছিল।

ও ক্ষুদিরাম আর প্রফুল্ল চাকীকে দেখেছিল। ওর কোমরে একটা ছোট্ট কৌটোয় ক্ষুদিরামের চিতাভস্ম ছিল।

বাবা হাসতেন। বলতেন, তা কখনো হয়?

বিশু বলত, বাবু কিছুই জানে না। জানবে কোত্থেকে? বাবু ত তখন ছোট ছেলে। কি জানে ক্ষুদিরামের কথা? আমি জানি। আমি তখন চব্বিশ বছরের ছেলে!

ও যে কি জানে, তা কখনো বলতে চাইত না।

একদিন বলে ফেলেছিল।

রংপুরে তখনো প্রায় বাংলার মত কিছু কিছু প্রথা ছিল।

ওখানে আমাদের এক আত্মীয় থাকতেন। ওঁদের বাড়িই ওখানে।

ওঁদের বাড়িতে লোকজন খেলে ওঁরা আমাদের মাকে সাদা ঘোড়ার গাড়ি পাঠিয়ে নিয়ে যেতেন। ওঁদের বাড়িটা খুব অদ্ভুত ছিল। বাড়ির মেয়ে বউরা কেউ রান্নাঘরে ঢুকতেন না। ঠাকুর রাঁধত। ঠাকুর না থাকলে বাড়ির পুরুষরা রাঁধতেন!

শৌখিন রান্নার যার খুব নাম ছিল বলে ওঁরা মাকে নিয়ে যেতেন।

আমরা সব সময়ে সঙ্গে যেতাম না।

সেদিনও আমরা বাড়িতে ছিলাম। বেশ মনে আছে,

সকালে যাহেরা পাখি বেচতে এসেছিল। বেলেহাঁস কেনা হয়েছিল। বেলেহাঁসের মাংস রান্না হচ্ছিল। রান্না করছিল মদন।

মা ও বাড়ি গিয়েছিলেন, বাবা গিয়েছিলেন হাটে।

আমাদের বিশু তখনি সেই গল্পটা বলে।

বিশুর কাকা জেলে কাজ করত। কাজ করতে করতে কাকা মরে গিয়েছিল। কাকার কোন ছেলে ছিল না। তিনটে মেয়েকে কাকা ভাল বিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। সরকার কাকার চাকরিটা বিশুকে দিয়েছিল।

'তখন আমার ছোয়ান বয়স দিদি! রোজ খাওয়ার পর তৈঁসার দুধ দু সের খেয়ে নিই। খুব জন খোঠকি করি। জেল পুলিসের কাজ, ভারি কাজ। খুব তাগদ দরকার হয়। সাহেব খুব ভালবাসে। হঠাৎ আমরা জানতে পারলাম কলকাতা থেকে দুজন বাঙালী ছোকরা এসে বোমসে মেমসাহেবকে খুন করেছে। একটা ভেগে গেছে। আরেকটা জেলে আসছে।

'আরে বাপ রে! সে কি ভয় সকলের। ওয়ার্ডার সাহেব বলল, যে আসছে সে বাঘের চেয়ে রাগী, ডাকু একটা। খুব সাবধানে থাকতে হবে আমাদের।

'এল যখন, তখন ত আমরা অবাক! আরে, এ যে দুধের ছেলে। একে এত ভয়?

'সবাই বলল বাঙালীর বাচ্চা দেখতে দুধের ছেলেই হয় কিন্তুওরা হাতকে নয় করতে পারে। ওর ত কেঁদে উঠল, রামলা চলল, সে তোমরা বইয়ে পড়ে নিও। ওকে সেলে রাখলেও, সবসময়ে সামনে পাহারা থাকত। আমি থাকতাম রাতে। ক'দিন বা জেলে ছিল! আমি রাতে বারোটা থেকে চারটে ডিউটি দিতাম।'

'রোজ?'

'ক দিন বা ছিল! সে তোমরা কাগজে বইয়ে পড়ে নিও এখন। আমি ডিউটি দিতাম আর গল্প করতাম, ও কি করত? 'ও ঘরে পায়চারি করত। কখন বা আপনমনে গান করত, কবিতা বলত। তারপর, যখন ভাবছি চুপ করে আছে কেন, তখন দেখতাম ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'ঘুমোবে না!'

'আরে ও ত জানত ওর ফাঁসি হবে। আমরা জানতাম ওর ফাঁসি হবে যার ফাঁসি হবে, সে অমন ঘুমোতে পারে?'

'তুমি কি করতে?'

'বসে থাকতাম। ও ঠিক রাত তিনটের জেগে উঠত। তখন আমাদের গল্প হত।'

'কি গল্প করতে?'

'আমি বলতাম বাবু, তোমার কি ভয়ডর নেই কিছু? ওরা সাহেব, ওরা রাজা, ওদের তুমি মারতে গিয়েছিলে?

'ও বলত, ভয় নয়, দুঃখ হয়।

আমি বলতাম, কেন?

বলত মাজিস্টরকে মারব তা মেয়েছেলেকে মারলাম!

'আমি বলতাম, তোমার ভয় করে না?

'ভয় হবে কেন? ও বলত।

'আমি বলতাম, দুঃখ হয় না, যাকে কত কষ্ট দিলে?

'ও হাসত। সব কথায় হাসতে জানত ও। বলত, মাকে আমার মনেই পড়ে না। দিদির জন্যে কষ্ট হয়। দিদি আমাকে ছেলের মত করে মানুষ করেছিল!

'আমি বলতাম, কেন এ কাজ করলে বাবু? তোমার ফাঁসি হবে জেনে আমাদের কত দুঃখ হচ্ছে।

'ও বলত, বা, দেশের কাজ করতে হবে না?

'আমাকে ওই সব শিখিয়েছিল-কাকে বলে দেশ, কেমন করে দেশের কাজ করতে হয়। একদিন আমাকে বলল, তুমি আমাকে'রাম চরিত মানস' একটু শোনাতে পার?

'আমি তখন ভাবলাম, ওকে বই শোনালে হয়ত আমার চাকরি চলে যাবে। কিন্তু ভগবানের নাম শুনতে চাইলে আমি কেমন করে 'না' বলি?

'আমি তাই বললাম, বাবু, 'রাম চরিত মানস' ত আমি ঠিক জানি না। আমি তোমায় গান শোনাতে পারি।'

'গানই ওকে শোনাতাম।'

আমরা জিগ্যেস করলাম, 'কি গান?'

'কেন, ভগবানের গান? আমরা গ্রামে থাকতাম, কত গান জানতাম। সব ওকে শোনাতাম।'

'ও শুনত ?'

'নিশ্চয়। তা ছাড়া, আমি ভাবতাম, বড় বড় ডাকু বদমাশও ফাঁসি যাবার আগে ভয় পায়। কাঁদে, খারাপ স্বপ্ন দেখে। এ কি রকম ছেলে, যে একবার বলে না বিশু, ফাঁসে মরতে কত টাইম লাগে ? কোন দড়িতে ফাঁসি হয় ?

'আমি একদিন বলেছিলাম বাবু, তুমি ভয় পাওনা কেন ?

'তখন ও হেসে বলল বিশু, একরকম করে ফাঁসে মরতে দেখেছ ত ! এবার দেখবে অন্যরকম করেও ফাঁসে মরা যায়। হেসে হেসে ফাঁসে মরতে দেখেছ ? আমি দেখাব।'

তখন রাত সাড়ে তিনটে। বিশুর মনে সে কথায় আশ্চর্য ভাবান্তর হয়েছিল। ওর মনে হয়েছিল খুব একটা কিছু করে ফুলিরামের জন্যে, খুব বড় কিছু একটা। অনেক ভেবে চিন্তে ও বলেছিল 'বাবু, পরমাটা যখন দেহ ছেড়ে চলে যায়, তখন খুব সাহসের দরকার হয়। সাহস তোমার থাকবে, আমি জানি। তবু, আমার খুব ইচ্ছে, একটা জিনিস তোমাকে দিই।'

'কি দেবে ?'

'আমার পরদাদা দব তীর্থ করেছিল। এক মহাৎমা তাকে একখানা চাদর দিয়েছিল। সে চাদরে অনেক মহাৎমার পায়ের ধুলো আছে। চাদরখানা আমি নিয়ে আসব। চাদরটা একখানা চন্দনকাঠের বাক্সে থাকে। বাক্সটা আমি আনব তুমি চাদরখানা একবার কপালে ঠেকিয়ে নিও, তোমার কোন কষ্ট হবে না।'

'কষ্ট আমার হবে না বিশু, কিন্তু চাদরটা আনলে যদি তোমার মন ভাল লাগে তবে তুমি আন।'

'হ্যাঁ বাবু, তুমি আমার ছোট ভাইয়ের চেয়েও ছোট। তুমি আমার কথাতেই চাদরটা আনতে বল। তোমার যে বড্ড কষ্ট হবে বাবু। তুমি ত জাননা।'

বিশু বলল, 'আমার কথা শুনে ও আবার হাসল।

বলল ভাই হোক বিশু। কিন্তু ওটা আনবে কি করে? জেলে যে এখন সব সময়ে সার্চ করে তবে ঢুকতে দেয়!

'আমি বললাম তবু ও আনবে!

'ও বলল কাজ চলে যাবে।

'তবু ও আনবে, আমি বললাম।

'ও হেসে বলল ভাই হোক। বিপদকে ভয় না করতে শেখো। এখন থেকেই শেখো।

'আমি যে কেমন করে বাক্স আনলাম, কেমন করে ওর হাতে চাদরটা দিলাম, কেমন করে সে চাদর ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম, তা আজও বুঝিনা। জানতে পারলে চাকরি কেন, বুঝি জানই চলে যেত তখন। সায়েবদের তখন হাপিট কি ছিল।'

'তারপর?'

'তারপর কার কথা আমি বলব? অমন হাসিমুখ আর দেখব না। অমন হাসতে হাসতে মরতে কাউকে দেখব না। সে রাতেও ও আমার হাতে হাত রেখেছিল। বলেছিল, বিশু, তুমি আমার বন্ধু। কিন্তু ফাঁসির মাচায় চড়ল যখন, একবার চাইল না আমার দিকে? একবার কথা বলল না?'

'কেন?'

'বাঃ, তাহলে সবাই যদি আমাকে শাস্তি দেয়? আমার ত ওকে পাহারা দেবার কথা ছিল। সখাওৎ করবার কথা ত ছিল না?'

'তারপর?'

'ওর চিতার ছাই আমার কাছে রেখে দিয়েছিলাম। ও বলত, একদিন ওর কথা সবাই জেনে যাবে, সবাই বলবে, ও যা বলত, সব সত্যি হয়েছে।'

'তারপর তুমি কি করলে?'

'আমি খুব খারাপ হয়ে গেলাম দিদি। আমি আর ভাল থাকলাম না। যে ফাঁস দিয়েছিল, সে ও ভিক্টিটিই করেছিল। তাকে একদিন খুব পিটালাম। জেলে খুব হলস্থূল হল। চাকরি চলে গেল আমার।

আমি তখন ভেগে গেলাম।'

'কোথায়?'

'আগে গাঁয়ে গেলাম। কি যে খারাপ হয়ে গেলাম আমি। বরাবর জমিদার আমাদের গরু কেটে নেয়, তখন খাজনা দিই না। বরাবর মেনে নিই। খুব হারদাঙ্গা করলাম জমিদারের লোকের সঙ্গে। আমাকে তাড়িয়ে দিল গাঁ থেকে। হারতাড়া দিয়ে বেলে কাজ নিলাম। তারপর একদিন কিসে রাগ হল কে জানে, দিলাম ফিরিঙ্গি গার্ডের নাক কাটিয়ে।

'চলে গেল চাকরি! সেখে গিয়ে জুটলাম আরাতে।

আমাকে নিয়ে গেল মঙ্গল সিং বাবু। বলল যারা দেশের কাজ করে, তারা ছিপকে ছিপকে থাকে, তাদের তাত রেঁধে দিবি, জঙ্গলে থাকবি, তাদের বই কাগজ রাখবি।

'সেই কাজ করতে করতে কত জায়গায় যে ছিটে বেড়ালাম। শেষকালে বাবু জীবনদাতা, বাবু জীবন দিল।'

ওর জীবনকথা শেষ করে বিশু বলল, 'জান, এর নামও দেশের কাজ। একদিন না একদিন দেশে স্বরাজ হবে। তখন ত সবাই জানবে। হাঁ, বিশুলালও দেশের কাজই করেছিল, না কি বল?'

বিশুর তারপর কি হল, তা আর মনে নেই। কিন্তু এখন সবাই তাম্রফলক পাচ্ছে দেখে মনে হল, বিশুও ত দেশের কাজই করেছিল? ক্ষুদিরামের চিতাভস্ম কাছে ছিল সেই জোরেই ত একটা গরীব, প্রায়ীণ লোক সারা জীবন ওর বা সাধ্য সেইমত প্রতিবাদ জানিয়ে জানিয়ে বেড়িয়েছিল? ওর মত লোকদের হিসেব অনুযায়ী ও ত সর্বস্ব ত্যাগই করেছিল? আর কাকে সর্বস্ব ত্যাগ করা বলে?

সেইজন্যে ওর কথা মনে করলে দুঃখ হয়। এখনো, কত কম ত্যাগ করে কত বেশি পেয়ে যাচ্ছে মানুষ আজকাল, গদী, সম্মান, ঐশ্বর্য।

বিশু কিছুই পেল না। অথচ ও চাকরি, নিরাপত্তা, সংসারের সুখ সবই ত্যাগ করেছিল।

———

সম্রাট

সুশীল রায়

সে দেখা পরম অতর্কিত দেখা।

ট্রেণ চলেছে দ্রুতগতিতে। পাশের কামরায় হাত্তি বাজিয়ে হরেরাম-গান করছিল ভিরি। সারা গাড়ির লোক কান পেতে শুনছিল ঐ গান। মাঝে মাঝে বিরক্তও হচ্ছিল তারা। তার কারণ অন্য। ট্রেনের চাকায় যেন পাথোয়াজ বাজছে, তা বাজুক। কিন্তু বড় বেতালা বোল তার। এই গানের সঙ্গে ঐ বাজনা মানায় না। যেন গানের গালে এক-একটা থাপ্পড় মারছে ট্রেণের চাকার ও আওয়াজ।

ভিখারী মানুষের এমন গলা? গলা নয়, যেন তুড়ি-বাঁশি। এ লাইনে গানের উৎপাত নিত্য এমন কত ভিখারী হাজির হয়। কিন্তু আজকের এই ভিখারীর এমন আচমকা আবির্ভাবটা যেন তাজ্জব একটা চমক। এমন গান কেউ কখনো শোনেনি। না এমন গলা, না এমন দরদ।

ভেজি-প্যাসেঞ্জারের দল অবাক হয়ে চেয়ে থাকে। আট হাঁটু একত্র করে তার উপর কোঁচা বিছিয়ে নিয়ে তাস খেলা চলছিল, সে খেলা হয়ে গেল ভণ্ডুল।

ও কামরায় গলাবাজি করছিল নিত্যানন্দ। এই তার বেলাভি। কাটা ঘা, পোড়া ঘা, চোখ-ওঠা, মাথা-ধরা ইত্যাদি হরেকরকম রোগের শুধু বেচার জন্যে মুখর করা বক্তৃতা দিচ্ছিল সে প্রাণপণে।

হঠাৎ তার বক্তৃতা মাঝপথে থমকে থেমে গেল। কান পেতে সে কী যেন শুনতে লাগল একমনে।

পাশের কামরা থেকে গানের শব্দ তার কানে এসেছে। নিত্যানন্দের অভ্যাস আছে, এমন কুঁকি তাকে নিতে হয় রোজ। চলন্ত ট্রেণের দরজা খুলে সে অদৃশ্য হয়ে গেল। চলে এল সে পাশের কামরায়।

হাত্তি বাজিয়ে গেয়েই চলেছে ভিরি। নিত্যানন্দ তার হাতের সুটকেসটি বাঙ্কের উপর রাখল, এক হাতে লোহার শিকল ধরে আর এক হাত কোমরে দিয়ে সে শুনতে লাগল ঐ গান।

নতুন একটা গান ধরেছে ভিরি—

খ্যাপা মন আমার
হরি ব'লে ডাক রে রসনা।
হরি ব'লে যাবি চলে
যম ছুতে পারবে না।

নিজের ক্যানভাসারির কাজ স্থগিত রেখে মন্ত্রমুগ্ধ ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে নিত্যানন্দ শুনছে ঐ গান। অবাক হয়ে যাচ্ছে সে। ট্রেনে ট্রেনে শুধু ভিরি করে বেড়ানোই তার কাজ। কত রকমারি ভিখারীর সঙ্গে তার দেখা হয় প্রত্যহ। কিন্তু এমন পাকা গাইয়ে ভিখারী সে আর দেখেনি।

চলন্ত ট্রেনের কামরা বদল করার কায়দা নিত্যানন্দ জানলেও ভিরি তা জানে না। তাই আপাতত তার গান সাঙ্গ হলেও সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল এক কোণে। পরের স্টেশনে গাড়ি থামলে সে অন্য কামরায় যাবে, আবার ধরবে সেখানে গান।

ভিরি দাঁড়িয়ে আছে একপাশে, আর একপাশ থেকে নিত্যানন্দ-ক্যানভাসার গুণ পেতে রয়েছে, তার চাউনি দেখে মনে হচ্ছে সুযোগ পেলেই ওই ভিখারী-গাইয়েটাকে সে ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে।

মেচেদায় গাড়ি দাঁড়াল। ভিরি নেমে গেল। তার পিছন-পিছন নামল নিত্যানন্দ। প্লাটফর্মে দুজন দুজনের মুখোমুখী হয়ে দাঁড়াল। তাদের এই দেখাটা সত্যিই বড় অতর্কিত দেখা।

এই অভাবিত ঘটনাটির পর কেটে গেছে প্রায় দশ-বারো বছর। ত্রিগুণ এখন আর ভিখারী নয়। সে এখন ত্রিগুণাতীত। সে এখন সম্রাট। যেমন তার নামডাক, তেমনি তার খাতির। কিন্তু নিত্যানন্দের জীবনের কোন বদল হয়নি এখনো সে আগের মতই নিতাই-ক্যানভাসার।

সে আজ দশ-বারো বছর আগের কথা। মেচেদা স্টেশনে পথ আটকে দাঁড়িয়ে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'কী নাম তোমার?"

"ত্রিগুণাতীত।"

মনে মনে হেসেছিল নিত্যানন্দ। ভিখারীদের আবার উচ্চারণে গলতি থাকতে পারে। কিন্তু কথা বলেই যার জীবিকা-অর্জন তার উচ্চারণে ত্রুটি থাকবে কেন। নিত্যানন্দ একটু থেমে বলল, 'তার মানে ত্রিগুণাতীত। কী বল?'

মাথা নেড়ে ত্রিগুণ জানিয়েছিল, "হাঁ।"

"গাড়িতে উঠতে জানে না? একুণি ছেড়ে দেবে। এসো।" নিত্যানন্দ তাকে ডেকে নিয়েছিল।

সেই ডাকে কোনো যাদু ছিল কিনা—ত্রিগুণাতীত আজও ভেবে পায় না। গাড়িতে না উঠে সে নিতাই ক্যানভাসারের পিছন পিছন হাঁটতে লাগল।

তীব্র হুইসল বাজিয়ে মেচেদা থেকে ছেড়ে গেল ট্রেন।

নিতাই তার দিকে ফিরে চেয়ে বলল, "ভিক্ষে তোমার কাজ নয় হে, ভিক্ষে তোমার কাজ নয়। অমন গলা যদি থাকত আমার তাহলে দুনিয়াটাই জয় করে নিতাম হে।"

নিজের গলার তারিফ শুনে খুশি হল ত্রিগুণ। কিন্তু এই গলা বাজিয়ে দিনে দেড়-টাকা কি দু-টাকা যার আমদানি তার গলার দাম কী, তাই ভাবছিল ত্রিগুণ।

নিতাই বলল, "বিবি আরামে বসে পায়ের উপর পা তুলে দিয়ে রেওয়াজ চালাও, দুনিয়াই তোমার কাছে এসে ধরা দেবে।"

একটু থেমে সে জিজ্ঞাসা করল, তোমার? মা ভাই-বোন—"

মাথা নাড়ল ত্রিগুণ, জানাল, কেউ নেই।

একটু রঙ্গ করে নিতাই বলল, "কোনো ভিখারিণী?"

"না।"

"তবে তো লাট হে তুমি, তবে তো তুমি রাজা। এস।"

পরম অনুগতের মত ত্রিগুণাতীত তাকে অনুসরণ করেছিল।

সে আজ দশ-বারো বছর আগের কথা।

নিতাই-ক্যানভাসার যেন জাদু হয়ে গেছে ওই জাদুকরী গলার আওয়াজে। তার নিজের রেওয়াজ বলে কিছু নেই। কিছু যদি তার থাকত তাহলে সে বুঝি সবই ঢেলে দিত ওই জাদুকরের পায়ের কাছে।

নিতাইও সাকসুরু মানুষ। উলুবেড়িয়ার জীবনঘন চাকীর মেয়ে বনলতাকে সে বিয়ে করেছিল রূপের জন্যে নয়, তার গলার জন্যেই। কিন্তু বনলতাটা বড় অভিমানিনী। তিন দিনের জ্বরে হঠাৎ চম্পট দিল পরপারে।

সেই থেকে নিতাই একেবারে একা।

ফাঁকা জীবনের ফাঁক পূরণের পথ পেয়ে গেল যেন সে। ধরে নিয়ে এল ত্রিগুণকে।

কোলাঘাট স্টেশন থেকে বাঁধ ধরে হেঁটে গেলে পনেরো-বিশ মিনিট লাগে, রূপনারায়ণ নদীর একেবারে কিনারেই সে ত্রিগুণকে ঠিক করে দিল একটা ডেরা। বলল, "কোন চিন্তা নেই, কোনো ভয় নেই। এখানে বসে গলা ছেড়ে গলা সাধো। ভিক্ষে করা তোমার কাজ নয় হে।"

অপলক চোখে ত্রিগুণ তাকাল নিত্যানন্দের দিকে।

নিতাই বলল, "বুঝেছি। ভাবনা নেই। আমি আছি হে, আমি আছি। কাটা ঘা, পোড়া ঘা, মাথাধরা—মানুষের থাকবেই, আমার কারবারও থেকে যাবে। তুমি আর আমি—দুটিমাত্র তো জীব। বুঝেছ?"

স্বপ্ন দেখছে কিনা তা যেন বুঝতে পারছে না ত্রিগুণ। এমন কথা চট করে বিশ্বাস করে নিতে তার বাধা ছিল।

নিতাইয়ের গলাটাও বেশ সাফ, বেশ মাজাঘষা।

ট্রেনে-ট্রেনে লেকচার দিয়ে দিয়ে দুরস্ত করে নিয়েছে সে ভাষাটাও। তাই তার কথায় কোনো জোর নেই, ধার নেই।

আরও স্পষ্ট করে সে বলল' "ভাসিয়ে দাও ওই হাঁড়ি। তুমি গাইয়ে। তোমার গানের জন্যে যা সরঞ্জাম দরকার তার ব্যবস্থা একটা হবেই।"

তিরির মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে নিতাই নিজের বুকে হাত দিয়ে বলল, "আমি—এই নিতাই ক্যানভাসার। কি, বিশ্বাস হচ্ছে না? ভাবছ, কোনো মতলব নিশ্চয়ই আছে আমার।"

তিরি কোনো কথা বলল না। অবাক হয়ে বসে রইল।

কয়েকদিন পরেই নিত্যানন্দ এসে হাজির করল তানপুরা বাঁয়া তবলা।

আশ্চর্যই হল তিরি। এই কাণ্ড দেখে সে যেন আকাশ থেকে পড়েছে। কোনো কথা সরছে না তার মুখে। তার চোখ দুটো একবার চকচক করে উঠল, তারপর সে ধীরে ধীরে চোখ নামাল।

তার সমুখে উবু হয়ে বসে নিত্যানন্দ বলল, "ওকি হে। চোখ অমন ছলছল করে উঠল কেন।"

গলা দিয়ে স্বর বার হল না ত্রিতীর্থেশের। বাষ্পে গলা তার বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

নিত্যানন্দ বলল, "তুমি গুণী। এমন কত মানুষ বেঘোরে পড়ে মার খেয়ে গেছে। তোমাকে সেই মারের হাত থেকে বাঁচাতে চাই। আমার মতলব বলে যদি কিছু থাকে তবে তা এই।"

রূপনারায়ণের কিনারে বেজে ওঠে জুড়ি বাঁশির মত নিথর গলা। নদীর জলস্রোতের সঙ্গে মিশে এই গলা যেন বাজতে থাকে জলতরঙ্গের ধ্বনির মত। সেই বেলোয়ারি আওয়াজে রূপনারায়ণ পুলকিত হয়ে ওঠে।

নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে ত্রিতীর্থেশ গলা সাধে। ভোর রাত থেকে আরম্ভ হয় তার রেওয়াজ। মনে হয় যেন রূপনারায়ণ তার স্রোত থামিয়ে কান পেতে শুনতে থাকে ঐ আওয়াজ।

জলের উপর সাঁতার কেটে কেটে ঐ গলা চলে যায় অনেক দূরে।

এইভাবে কাটতে থাকে বছরের পর বছর। এইভাবে ছড়িয়ে পড়তে থাকে ত্রিতীর্থেশের গান।

কখনো কখনো নৌকো এসে ভিড়ে যায় ঐ আখাটায়।

হাতে সুটকেস ঝুলিয়ে কোলাঘাট স্টেশনে পায়চারি করছিল নিত্যানন্দ। কলকাতা থেকে যে ট্রেন আসছে ওই ট্রেনে চেপে সে তার সর্বরোগহর ওষুধ ফিরি করতে মজাপুর পর্যন্ত যাবে। এই ফাঁকেও সে প্লাটফর্মের যাত্রীদের মধ্যে ঘুরে-ফিরে তার ওষুধের গুণ বর্ণনা করে চলেছে।

এমন সময়ে হুড়মুড় শব্দে ট্রেন এসে হাজির।

একটা ভিড় জমে গেল নিমেষের মধ্যে প্লাটফর্মে। বহু প্যাসেঞ্জার নামছে উঠছে।

ঝলমলে আর ঝকঝকে পাঞ্জাবী গায়ে জন চারেক ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নেমে একটা কুলীকে কি যেন জিজ্ঞাসা করছিল।

কৌতূহল হল নিত্যানন্দের। সে একটু এগিয়ে গেল। কান পেতে সব শুনল। কুলীটা কিছু বলতে পারল না।

পাশ থেকে নিত্যানন্দ উপযাচকের মতন বলল, "আসুন আমার সঙ্গে।

কলকাতা থেকে এঁরা এসেছেন ত্রিতীর্থেশের খোঁজে। তাকে এঁরা নাকি একবার নিয়ে যেতে চান।

গর্বে বুক ফুলে উঠল নিত্যানন্দের। সে আগে আগে হেঁটে চলল বাঁধের উপর দিয়ে।

নিত্যানন্দ ফিরে তাকাল, একটু দাঁড়াল, বলল, "আপনারা শুনেছেন ওঁর গান?"

"উঁহুঁ। গান শোনা হয়নি। নাম শুনেছি খুব। তাইতো তাঁর গান শোনবার জন্যে সকলের এত আগ্রহ।"

আর কোনো মন্তব্য করল না নিত্যানন্দ, আবার হাঁটতে লাগল আগে আগে। আনন্দে দু'পা যেন চলে যাচ্ছে তার। বাঁধের উপর থেকে টাল খেয়ে গড়িয়ে না যায় যেন ঐ নদীর চালুতে।

কলকাতায় গিয়েছিল ত্রিতীর্থেশ। এত দূরে গান গাইতে যাওয়া জীবনে এই তার প্রথম। নিতাইও সঙ্গে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গেল না। বলা যায় না, সেখানে গিয়ে তিরি যদি যথেষ্ট খাতির না পায় নিতাইয়ের তা এতটুকু ভালো লাগবে না।

কিন্তু নিতাইকে তাক লাগিয়ে ফিরে এল ত্রিতীর্থেশ। একটা রুপোর মেডেল খুলিয়ে এল বুকে।

আরও দিন যায়, আরও বছর কাটে। দিনে-দিনে গর্বে বুক ফুলে ওঠে নিত্যানন্দের। কিন্তু কাজে তার বিরাম নেই। ক্যানভাস করতে-করতে কোনো-কোনো দিন সে বজবজ পেরিয়ে চলে যায় মেদিনীপুর পর্যন্ত। এক-এক দিন হঠাৎ সে তার লেকচার থামিয়ে প্যাসেঞ্জারদের আলাপে কান পাতে। হ্যাঁ, যা আন্দাজ করেছিল, তাই। গানের গলা করছে ওরা, ওরা তিরিয় কথাই বলাবলি করছে। রামপুরের রাজবাড়িতে জলসা হয়ে গেছে পরশু। কলকাতা ও পাটনা থেকে নামকরা ওস্তাদরা এসেছিলেন, আর, এখান থেকে গিয়েছিল ত্রিতীর্থেশ। সে নাকি মাতিয়ে দিয়ে এসেছিল সে আসর। সেই গল্পই করছিলেন ভেলি প্যাসেঞ্জাররা।

কিছুক্ষণ ঐ আলাপ শুনে নিতাই ঠিক হয়ে দাঁড়াল। এ আলোচনার মধ্যে সে কেন। নিজের মত বেড়ে উঠুক ত্রিতীর্থেশ। নিজের মনে কাজ করে যাক নিত্যানন্দ।

লেকচার আরম্ভ করল সে গলা ছেড়ে। পৃথিবীর যাবতীয় অসুখের অদ্ভুত দাওয়াই আছে তার জিম্মায়। যে রকমের রোগ হোক, যে কোনো পুরাতন ব্যাধি—একবার ব্যবহারেই উপশম, তিনবার খেলেই—

একজন প্যাসেঞ্জার মন্তব্য করলেন, "আচ্ছা? সব জ্বালাযন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই?"

ক্যানভাসারদের মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে হয়, নিত্যানন্দ হেসে বলল, "হ্যাঁ। শান্তি পাবেন। আরোগ্য লাভ করবেন। এক কৌটো নিয়ে যান সঙ্গে করে। পরীক্ষা করে দেখুন।"

অবিশ্বাসী ভদ্রলোকটি একটু ভাবলেন। তারপর একটা কৌটো তিনি নিলেন শেষ পর্যন্ত।

ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-ধাক্কা কথা—সব উপেক্ষা করার অদ্ভুত শক্তি অর্জন করে নিতে হয়েছে তাকে। এই শক্তি সে লাভ করেছে বলেই তার বেসাতি চলেছে তার মনের মত। একা মানুষের সংসার তো নয় এখন। তারা এখন দুজন। আসলে, নিতাই নিজে আর জন, বেড়া হচ্ছে ত্রিতীর্থেশ। গাইয়ে মানুষকে রীতিমত তোয়াজ না রাখলে তার গলা খুলবে কেন।—এ কথা ভেবে নিতাই নিজের কাছেই নিজের গর্ব যেন জাহির করল।

কোলাঘাটের স্টেশন মাস্টার অতি গুণগ্রাহী ভদ্রলোক। নিতাইকে ডেকে বললেন, "ওহে শোনো। বন্ধুর জন্যে এত তো করছ। কিন্তু নাম প্রচারের জন্যে কিছু তো করছ না, একটু লাগো।"

নিতাই বলল, 'কিসের কথা বলছেন?'

"নামের কথা। নাম ডাক যদিও হয়েছে খুবই। তবুও পাড়িতে-পাড়িতে ঘুরে বেড়াচ্ছ। ওই সময় কথার ছলে তোমার বন্ধুর নামটা প্রচার করলেও তো পার। ওঁর মত গাইয়ে যে নেই—এটা প্যাসেঞ্জারদের জানিয়ে দিলে নাম তাদের মুখে-মুখে আরও ছড়িয়ে যাবে চারদিকে।"

নিতাই একটু যেন বিরক্ত হয়েছে এইভাবে শুধু বলল, "আচ্ছা।"

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল সে, বলল, "আসল মালের কি ক্যানভাস করতে হয়, মাস্টারমশায়? সাচ্চা গুণীর গুণ প্রচার করতে হয় না। আপনিই তার খুশবু ছড়ায়। যা নিয়ে ক্যানভাস করি তা হচ্ছে ক্যানভাস করার মাল।"

একটু থেমে বলল, "গোলাপফুল নিয়ে ক্যানভাস হয় না, গোলাপজল নিয়ে হয়।"

সস্নেহ তিরস্কারের ভঙ্গিতে মাস্টারমশায় বললেন, "বেশ। বড় সায়েক হয়ে গেছিস। বড় কথা শিখেছিস।"

কিন্তু কথা শিখবে না কেন সে? কথা বেচেই তো তার জীবিকা। কথা যেদিন বন্ধ হবে সেদিন হয়ও বন্ধ হয়ে যাবে তার।

এবার ত্রিতীর্থেশের ডাক এসেছে একটু দূর থেকে। ভাগলপুর থেকে। লখনউ এলাহাবাদ বোম্বাই আর কলকাতা থেকে বাছাই-বাছাই গাইয়ে নিয়ে মস্ত-একটা গানের আসর বসছে সেখানে। ত্রিতীর্থেশকেও যেতে হবে।

যাবে। নিতাই খুব উৎসাহ দিতে লাগল তাকে। হেসে বলল, "হাটে হাঁড়ি ভাঙব না। সে হাঁড়ি ভাঙা হবে

গেছে অনেক আগে কিন্তু ভাই, তুমি কী ছিলে, কী হলে ! তুমি যে এখন সম্রাট্ !'

কৃতজ্ঞতা জানাবারই কথা। কিন্তু উপযুক্ত ভাষা কই ? ত্রিতীর্থেশ অপলক চোখে তাকাল নিতাইয়ের দিকে। চোখ-দুটো চকচক করে উঠল তার।

নিতাই বলল, "তোমার এ খ্যাতির জন্যে তোমার আনন্দ খুবই। কিন্তু তার চেয়েও আনন্দ কার বেশি বলো তো !"

উত্তর দিল না ত্রিতীর্থেশ, উত্তর দেওয়ার ভাষাও তার নেই। নিতাইয়ের কাঁধে সে কেবল একটা হাত রাখল। নিতাইয়ের জিজ্ঞাসার বুঝি জবাব দিল সে এইভাবে।

ত্রিতীর্থেশ বলল, "এবার তুমি সঙ্গে চলো।"

"আমি ? আমি কেন ?"

"এমনি ! অমন আড়ালে লুকিয়ে থাকা চলবে না তোমার। আমার অনুরোধ এবার তোমাকে রাখতেই হবে।"

যে বেশি কথা বলে না তার একটি কথারই ওজন খুব। অগত্যা তাই রাজি হতে হল নিত্যানন্দকে।

খালি-হাতে সে কখনো ট্রেনে চড়েনি। সব সময়ই তার হাতে-হাতে লেগে থাকে একটা ওষুধ-ভরতি সুটকেস। এবার সে সুটকেসের দরকার নেই। এবার সে চলেছে অন্য কাজে। তাই হাত কেমন ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকছে। হাত-দুটো যেন বাড়তি মনে হচ্ছে, কোথায় রাখবে ঠিক করতে পারছে না। একবার হাত পকেটে রাখে, একবার হাত দিয়ে কোঁচা আঁকড়ে ধরে। তার উপর, আরও অস্বস্তি আছে। সে একজন ক্যানভাসার—তাকেও এরা কি রকম-খাতির-যত্ন করতে-করতে নিয়ে চলেছে।

ত্রিতীর্থেশকে দেখিয়ে নিত্যানন্দ বলে, "ওঁর দিকে নজর দিন্। দেখুন কিছু দরকার আছে কি না।"

"ওঁর কাছে লোক আছে।"

ভাগলপুরের আসর নাকি সাতদিন ধ'রে চলবে। বিরাট ব্যাপার। চোখে ধাঁধাঁ লাগার মত কাণ্ড। নিতাই চোখ বড়-বড় ক'রে চারদিকে তাকায়। তার মনে পড়ে দশ-বারো বছর আগের কথা। সেই এক দিন, আর এই এক দিন। সেদিনের সেই তিরি আজ সম্রাট্।

এখানে যাঁরা গান গাইবেন তাঁদের সকলের নাম কখনো শোনেনি নিত্যানন্দ। এবার গাইতে এলেন একজন। বোম্বাইয়ের খুব নাম-করা গাইয়ে নাকি ইনি। সারা ভারতের মধ্যে এঁর আসন নাকি খুব উঁচুতে। গান আরম্ভ হলে নিত্যানন্দ বুঝল—হ্যাঁ, এমন ধাঁর গান তাঁর গান উঁচুতে হবে বই-কি।

একটানা দেড় ঘণ্টা গেয়ে গেলেন তিনি। গান থামার পর সারা আসর ফেটে পড়ল হাততালিতে। নিত্যানন্দ তাতে যোগ দিল।

আরও দু-তিন জন গাইবার পর আসরে এসে বসল ত্রিতীর্থেশ। নিতাইয়ের বুকটা দুর-দুর করে উঠল। একেবারে প্রথম লাইনের একটি চেয়ারে সে বসেছে। এখান থেকে সে বেশ স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছে ত্রিতীর্থেশকে।

ঘোষণা করে জানিয়ে দেওয়া হল যে, ইনি এখন গাইছেন রামকেলি রাগে খেয়াল, তার পরে একটি ঠুংরি শোনাবেন।

শুরু প্রতীক্ষায় বসে আছে পুরো আসরটা।

ঝংকারে বেজে উঠল তানপুরা। চোখ বন্ধ করে বসে আছে ত্রিতীর্থেশ। তারপর সে শুরু করল আলাপ। একটা সুচ পড়লে শব্দ পাওয়া যায় চারদিক এমনি স্তব্ধ।

এত উঁচু ঘরের গাইয়ে হয়ে গেছে নাকি ত্রিতীর্থেশ ? যত বড় বলে সে জানত, এ যে তারও বড় হয়ে গিয়েছে। আসরে তারিফের শব্দ বেজে উঠছে মাঝেমাঝে।

দু ঘণ্টার বেশিই হবে। ত্রিতীর্থেশ করজোড়ে নমস্কার করে খেয়াল গান শেষ করল।

এর পর আছে ঠুংরি। কিন্তু আসর তখন উচ্ছ্বাসে উত্তরোল। করতালি আর থামে না কিছুতে।

কয়েকটা ফুটফুটে মেয়ে চকচকে জামা-কাপড়ে সেজে ত্রিতীর্থেশের গলায় মালা পরিয়ে দিতে গেল। অমনি উঠে দাঁড়াল সে। ইশারায় তাদের ডেকে নিয়ে গেল মঞ্চের নেপথ্যে। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে বসল নিজের জায়গায় তানপুরা নিয়ে।

হঠাৎ এ কী ব্যাপার ? চমকে উঠল নিত্যানন্দ। তার গলায় মালা দিতে এসেছে ঐ মেয়েরা ?

নিতাই বাধা দিল। উদ্যোক্তাদের মধ্যের প্রবীণ এক ভদ্রলোক এগিয়ে এসে বললেন, "ওঁর কাছে আমরা সব শুনেছি। ট্রেনে আসতে-আসতেও বলেছেন, এখনও আবার বললেন। নিন্, বাধা দেবেন না মেয়েদের।"

নিতাই উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "না, না! তা হয় না।"

তানপুরা শুইয়ে রেখে ত্রিতীর্থেশ নেমে এল। বলল, "আমার কাছে দিন্। এ মালা আমিই পরিয়ে দেব

নিতাইয়ের গলায় মালা পরিয়ে দিতে-দিতে ত্রিতীর্থেশ আসরের সকলের উদ্দেশে বলল, "যে গানটা এবার ধরছি সেটা শেষ করেই আমি সব বলব আপনাদের।"

ত্রিতীর্থেশ উঠে গেল মঞ্চে। গান ধরল। নিতাই তার খালি হাত দুটো এবার কাজে লাগিয়ে নিল—তারি মালার ঝুলন্ত দিকটা দুই হাত দিয়ে ধ'রে হতভম্ব হয়ে বসে রইল।

পৃথুলা

বাণী রায়

আজকে দেরী হয়ে গেল না কি ?

নীল সাদা চেকবোনা শাড়ীখানি পরা মেয়েটি চওড়া ও উঁচু সিঁড়ি ভেঙে চারতলার ছাদে উঠছে।

ছোটখাটো গলির বড় বাড়ী। চারতলার ছাদে মাথায় অ্যাসবেস্টস্ চাপিয়ে একখানা নূতন ঘর তোলা হচ্ছে। সেখানে সোডা ইত্যাদি মজুদ। একপাশে ছাদে টিনের ক্যান্টিন-জাতীয় চালা।

একটি হুস্ কিস্কোপানী। গুঁড়োদাড়া জল নিচে এখানে। প্রজাপতি হয়ে যাতে নীচু উড়তে পারে তজ্জন্য প্রজাপতির ডানার রং ধার করে আকর্ষণ হচ্ছে সেরার লোভারদের।

বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক' নিয়ে এরা নামতে চেয়েছিলেন। আমি এক অতীত কাহিনী বলছি অবশ্য-অতীতকে বলা হয় বর্ত্তমানের রং ধরিয়ে। সেটাই নিয়ম।

বিরাট পটভূমিকায় অনেক লোক লাগবে। নিজেদের মধ্য থেকে নেওয়াই ভালো। তাই অনেককে ডেকে এনে ঘন ঘন চা-পান দিয়ে মধুমক্ষিকার মত আকর্ষণ করা হচ্ছে।

এই নানাবিধ আকর্ষণের পটভূমিকায় ব্যালেরিণার মত পা ফেলে দাঁড়াল মেয়েটি।

কোণের কলাসে তাকিয়ায় হেলে বসা লোকটি তাকাল। এ সেই তন্ময়ের চোখ, যে চোখ সুন্দরী নারী থেকে একপাত্র চায়ের দিকে পর্য্যন্ত একভাবে তাকাতে অভ্যস্ত গভীর প্রেমের দৃষ্টিতে।

বিশাল অথচ একটু বসা চোখের আসন মুখখানি জলছে। খুব মসৃণ, তাই ইটালিয়ান ধাঁচের মুখ প্রদীপ্ত। অন্তর্জ্বালা আগুনে। একটু দীর্ঘ, মধ্যদেহী লোকটির অধরে জলন্ত সিগারেট।

না, এখনও পার্বতী আসেনি।

তন্ময় যতদূর সম্ভব কাছে এগিয়ে বসে লোকটির। কোন কথা না বলে পঙ্কজ সিগারেটে ঘোরে টান দেয়। "বইটা ভাল করে পড়েছ ?"

তন্ময় হাসিখুসী, কথা বলার আগেই একবার হেসে নেওয়া অভ্যাস তার। একটু মোটার দিকে, কিন্তু লাবণ্যময়ী। পঙ্কজ ভাবী ডিরেক্টর। ইতিপূর্বে একটি দুটি চিত্রকল্পের রূপদানে যশস্বী।

"হ্যাঁ।"

কোণের মুরুব্বি বললেন, "পঙ্কজবাবু, তন্ময়া কিন্তু রাজপুত বিধবা কন্যা হতে চায় না। ও চায় তান্ত্রমতীর ভূমিকা।"

"কি বিপদ ! যাকে যা মানাবে, তাই দিতে হবে না ?"

তন্ময়া বজ্রাহতের মত তাকাল পঙ্কজের দিকে। যাকে যা মানাবে !

পঙ্কজ প্রশ্ন করল, "বইখানা পড়েছ ভাল করে ? যা বলেছিলাম ?"

"হ্যাঁ", ভারী মুখে তন্ময়াকে একটি তন্ময়তা ঘোটা মেয়ে লাগল।

যতই না চেপে পাতলা জর্জেট পরি, কিছুতে ওদী সাজা চলে না আমার।

(—"মেয়েটির পরণে ছিন্ন মলিন বস্ত্র সঙ্গে দু' তিনটি ছোট ছোট রোরুদ্যমান বালক-বালিকা," • •

• • 'ঐ কুন্তাই দেবীসিং রাজপুতের বিধবা স্ত্রী। এক সময়ে লবটুলিয়া থেকে কিংখাবের ঝালর দেওয়া পালকি চেপে কুশী ও কদমবলিয়ার সঙ্গমে স্নান করতে যেত, বিকানীর মিছরী খেয়ে জল খেত।"—আরণ্যক

মুরুব্বী হরিবাবু কাকা হচ্ছেন তন্ময়াকে এখানে আনার মূল। অপেশাদার কয়েকজন সাহিত্যিক ও তন্ময়া মিলে একটি

সিনেমা কোম্পানী এরা খুলেছে, যেখানে প্রয়োজন কম অথচ অপেশাদারী নায়ক-নায়িকা দিয়ে চমক লাগানো। তাই জীবনের নানা ক্ষেত্র খুঁজে এরা একত্রে মিলেছে। হরিরাম বললেন, "তন্দ্রা একটু ভারী হয়ে গেলেও চমৎকার চেহারা। প্রধান নায়িকা হোবার পাত্রার মেয়ে তান্ত্রমতী সাজান ওকে, পঙ্কজবাবু। চমৎকার মানাবে।"

"উঁহুঁ, তান্ত্রমতী চাই স্লিম্।"

এহেন সময়ে এক ট্রে-ভর্তি চা নিয়ে চোকরা বেয়ারা বঙ্কবিহারী প্রবেশ করল।

এলোমেলো চুলে ঝাঁকুনী দিয়ে বঙ্কবিহারী সসম্ভ্রমে চায়ের পাত্র পঙ্কজের দিকে প্রথমেই এগিয়ে দেয়, 'স্যার, চা ইচ্ছা করুন।"

পাঞ্জাবী পরা বঙ্ক সাধারণ বেয়ারা থেকে একটু পৃথক। প্রয়োজনে এসেছে সিনেমার ছায়ায়। যদি ছোটখাটো একটা পার্ট পাওয়া যায় সেজন্য পঙ্কজের প্রতি অনুগত। এখানে পঙ্কজই অথরিটি, কারণ এঁরা প্রত্যেকেই আনাড়ী। সিনেমা দেখা ভিন্ন নির্মাণে যৎসামান্য অবদানও নেই।

অতএব ব্রজকুলে একমাত্র পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, যিনি বর্তমানে 'পঙ্কজ' নাম ধরে ধরণীর পঙ্কে অবতীর্ণ।

তন্দ্রা তখন ব্যথাদূতা। বড় আশা করে সে এসেছিল। এসেই পঙ্কজকে দেখেছিল। মনে হয়েছিল পুরুষের মধ্যে যা খুঁজেছিলাম পেয়ে গেছি।

চায়ের কাপে সরস অধর স্থাপনা করে পঙ্কজ একটু হেসে বলল, "রাজপুত বৌ-এর ডিগার ভাল চাই: বিধবা হ'লেও কুত্তা বুত্তা ছিল না তো।"

একটু হাসির আভায় জ্বলে ওঠে তন্দ্রা, আবার তৎক্ষণাৎ দরজার বাইরে চোখ মেলে স্তব্ধ হয়ে যায়। এসে দাঁড়িয়েছে পার্বতী যাকে পঙ্কজ তান্ত্রমতীর ভূমিকা দিয়েছে।

ডুরে শাড়ী, গলায় পুঁতি ও কড়ি গেঁথে বিচিত্র মালা। ("তান্ত্রমতী মিটোল স্বাস্থ্যবতী, মুঠায় মেয়ে। লাবণ্য মাখা মুখশ্রী —তবে পরণের কাপড় সভ্য সমাজের শোভনতা রক্ষা করিবার উপযুক্ত প্রমাণ মাপের নয়। মাথার চুল রুক্ষ, গলায় কড়ি ও পুঁতির মালা।")—'আরণ্যক'

সদ্য 'আরণ্যক' পড়া মনে তন্দ্রার ভেসে এল তান্ত্রমতীর মূর্তি। তান্ত্রমতী যেকে হাস্যির হয়েছেন, দেখ! সবুজ লাল ডুরে শাড়ীও বেশ উঁচু করে পরা। এতও জানে?

কিন্তু ষোলআনার মত কাঁপকটি পার্বতীর দেখে যে নিঃশ্বাস পড়ে। ছিপছিপে দেহ তার দেখবার মতই। মুখ তন্দ্রার চেয়ে ভাল নয়, কিন্তু শরীর যে যাদু।

পঙ্কজ সন্তর্পণ স্বরে ডাকলেন, "এসো পার্বতী, তন্দ্রা আজ তোমার আগে হাজির। অনুদিন তুমিই ফার্স্ট। নাও চায়ের পাত্র ধর।"

পার্বতী গ্রীবা বক্র করে তাকাল তন্দ্রার দিকে। একটু হাসল। তারপর যতদূর সম্ভব ভাবী পরিচালকের কাছে বসে চা-এর কাপ নিল।

গলা বাঁকাবার ভঙ্গি কি! আরে, তোর গলা যে লম্বা আমি জানি। আমার গলা কম লম্বা নয়, শুধু মেদ জমেছে। তাই আমি ইচ্ছামত ঢং করে ঘোরাতে ফেরাতে পারিনে। ধানবাদে যেয়ে আমি ভুল করেছি এবার। আরও ওজন বেড়ে গেল চেহে। গাদা গাদা দুধ মাখন খেয়ে খেয়ে দেহ হাতী হ'ল। মাকে এত বোঝাই যে এসব আমার খাওয়া উচিত নয়, শোনেননা তিনি। বলেন, উঠতি বয়সে একটু দুধ ঘি না খেলে চলে নাকি?

কি যে করি! মেঘ ভগবানের দান, কিন্তু আমি যে হেরেই গেলাম। তান্ত্রমতীর পার্ট না পেয়ে পেলাম কুত্তার পার্ট। আবার সব দিকেই হেরে যাচ্ছি দেখছি!

চা-টা বিস্বাদ লাগল।

"চিনি দাওনি, বঙ্ক?"

"দিয়েছি তো দিদি, কম হয়েছে বুঝি? নেই এনে।"

বঙ্ক চিনি দিয়ে এলে অভ্যাসবশতঃ তন্দ্রা হাত বাড়াল, কিন্তু তক্ষুণি সামলে নিল নিজেকে। আজ থেকে সে চিনিছুট চা খাবে, মাখনবিহীন শুকনো টোস্ট চিবোবে। না, আর ছেড়ে দেওয়া চলে না।

বিকৃত মুখে বিস্বাদ চা পিলে তন্দ্রা লক্ষ্য করতে লাগল পার্বতীকে।

চোয়ালের হাড়, কণ্ঠার হাড় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, অনুই-এর হাড়। চলা ফেরায় তার নিজের মত গোল বৃত্ত রচিত

হয় না পার্বতীর, হয় সোজা শক্ত লাইন। তাই বুঝি সৌন্দর্য।

পার্বতী শান্ত সুরে বলে, "তবে শুটিং শুরু হবে?" হরিরাম পার্বতীকে পছন্দ করেন না, প্রধান কারণ তিনি ভানুমতী দাশাতে চেয়েছিলেন তাঁর প্রতিভি তন্দ্রাকে। অনেক বলে করে তন্দ্রার অভিভাবকদের কাছ থেকে চেয়ে এনেছেন ওকে। কিন্তু ক্যামেরার চোখে নায়িকা সে হ'ল কই?

ওদিকে পার্বতীর নুরুন্নি কংসারি মিত্র যথেষ্ট ধনশালী। প্রাইভেট লিমিটেড হলেও এক-আধজন বন্ধুলোক লাগে। পার্বতীকে তিনি পুশ্ করেছেন। এদিকে ডিরেকটরও মনোনয়ন দিয়েছে। কিছু করতে না পেরে রামহরি ক্রুদ্ধ। এখন বিরক্ত সুরে বলে দিলেন, "তবে শুটিং? স্ক্রিপ্ট তৈরী হয়েছে না কি? শুটিং হবে না।"

পঙ্কজ তাড়াতাড়ি বলে, "না, না, রামহরি বাবুর যেমন কথা! শুটিং হবে শিগ্‌গির। সামনের মাসেই ট্রফিও ভেট দেবে। আমি স্ক্রিপ্ট লিখছি, এই যে।"

একতাড়া কাগজ ও 'আরণ্যক' বইটি দেখাল সে, ফরাসে পাশে রাখা আছে।

কাগজের তাড়া তুলে পাতা ওল্টায় পঙ্কজ—"এই যে ভানুমতীর স্কুলের নাচের দৃশ্যটা কেমন সাজিয়েছি—দেখো।"

(—"আর সেই পূর্ণিমার জ্যোৎস্না প্লাবিত বনান্তস্থলীতে প্রায় ত্রিশটি কিশোরী তরুণী গাছটিকে ঘিরিয়া ঘুরিয়া নাচিতে লাগিল। ... ভানুমতীকে বেড়িয়ায় এই দলের পুরোভাগে মেয়েদের খোঁপায় ফুলের মালা, গায়ে ফুলের গহনা"— 'আরণ্যক')

"এই দৃশ্যটা চমৎকার জমবে। কালারে করতে পারলে আরও ভাল হ'ত!"

সহৃদয় ভাবে তন্দ্রার দিকে তাকিয়ে পঙ্কজ বলল, "এই নাচের দলে তোমাকে দেব। কুন্তার যেরকম বদলে।"

পার্বতী আস্তে আস্তে কি যেন বলল।

পঙ্কজ বলে, "হ্যাঁ তা ঠিক। প্রফেশানাল নাচের মেয়ের দল আনতে হবে। তুমি ঠিক যদি ওদের সঙ্গে তাল রেখে পারো তন্দ্রা, তবেই।"

তন্দ্রার গা জ্বলে উঠল, "পার্বতী যদি পারে আমি পারব না কেন? ও তো প্রফেশানাল্ নয়।"

পার্বতী গলায় মধু ঝরিয়ে অতঃপর বলল বিঁধিয়ে বলে, "আমি প্রফেশানাল্ না হ'লেও ব্রেস কেলতে ধীর হয়ে যাবো না।"

—তুই যদি পারিস, হাড়গিলে, আমিও পারব! না খেয়ে আমি কয়েকদিনের মধ্যেই কমিয়ে ফেলব দেহ। কেবল যাতে আমি ভাল রোল্ না পাই সেই চেষ্টা করছে পার্বতী। চাঁদের আলোয় ফুলের গহনা পরা সাজ ওঁর একারি হবে নাকি? ইস্!—

রামহরি কাকা আবার সহায় হন, "না, না, এ তন্দ্রা ছেলেবেলায় নাচত। ওর অভ্যাস ছিল।"

পার্বতী অপাঙ্গে একবার তন্দ্রার দিকে চেয়ে ঈষৎ হাসল। আরক্ত অধরের হাসিটুকু বিদ্রূপাত্মক।

আরও জ্বলে উঠল তন্দ্রা।

যথাকালে কয়েকটি শেয়ারহোল্ডার মিলে দায়সারা একটা মিটিং করার পরে দুইদিন বাদে মেয়েদের আসতে বলা হল। ইতিমধ্যে স্ক্রিপ্ট লেখার কাজ খানিকটা এগিয়ে রাখা যাবে, যাতে সেইদিন থেকে রিহার্সেল বসানো চলে।

(৫)

দুইদিন পরে আবার তন্দ্রাকে দেখা গেল ঘরে। সে সকলের আগে এসেছে। বন্ধুবিহারী ছাড়া কেউ নেই।

সোফায় বসে তন্দ্রা দুচারটে দেখা বিলাতী মাসিকের পাতা ওলটায়। খুবই কাহিল লাগছে ওকে, মুখের সতেজ লালিমা ঈষৎ পাণ্ডুর।

প্রাণপণে ডায়েট করেছে ক'দিন তন্দ্রা। বাড়ীর লোকের মানা নিষেধ শোনেনি। ফলে শরীর শীর্ণ হয়নি, মুখ শুকিয়ে গেছে।

শুধু তাই নয়, একটা বাথ্‌সেট কিনে ফেলেছে, পরেও এসেছে। পাতলা সিল্ক্ পেঁচিয়ে শাড়ীপরায় একটু আঁটসাঁট লাগলেও বাইশ বছরের মেয়ের ছরন্ত যৌবনের প্রাচুর্য কমানো যায়নি।

ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে-পাল্টে ছবি দেখছে তন্দ্রা, পাশে তদ্গত বন্ধুবিহারী।

"চা দেব, দিদি ?"

"না, এখনি কেন ? পঙ্কজবাবু এলে দিও।"

আড়চোখে তন্দ্রার দিকে চেয়ে বন্ধু বলে, "পঙ্কজবাবু এখনি এসে যাবেন। আর সঙ্গে সঙ্গে পার্বতী দিদি এসে যাবে।"

সিনেমা কোম্পানীর আধুনিক ছোকরা এখানকার অলিখিত নাটকের সন্ধান রাখে।

তন্দ্রার মন হাহাকার করে উঠে। সাধারণ বেয়ারার পর্যন্ত চোখে পড়েছে এদের যোগসূত্র। তাহলে ?

তীব্র উৎকণ্ঠায় জ্বলে ওঠে তন্দ্রা, হঠাৎ বলে ওঠে, "পার্বতী দিদিকে কেমন দেখতে বন্ধু ?"

স্নানকালপাত্রের বিচার চলে যাওয়া তন্দ্রার প্রশ্নে বন্ধু সাধুসুলভ ভঙ্গিতে বলে, কোথায় ভাল দেখতে ?

খুবই রোগা তবে চা কিগার আছে। কিন্তু দিদি, দেখতে আপনাকেই ভাল লাগে।' গলাটা আবেদনের করে বন্ধু বলে "দিদি একটা টাকা দিননা, সিনেমা দেখব।" মাঝে মাঝে বন্ধুবিহারী তন্দ্রাকে অর্থাদি চেয়ে বিব্রত করে।

একটা টাকা আজ প্রসন্ন মনে বার করে দিল তন্দ্রা। হোকনা বেয়ারা তবু এই মুহূর্তে বন্ধুর স্তুতি প্রয়োজন ছিল। বিলাতী ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে বলে তন্দ্রা "আচ্ছা বন্ধু আমাকে কেমন দেখতে এদের মধ্যে বলতো।"

ছবিতে একসারি মহিলা ক্যাপশন প্যারাগ্রাফে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে বন্ধু একটি দিব্য মোটাসোটা মেয়েকে দেখিয়ে অবলীলাক্রমে বলল এইরকম।

বলকি বন্ধু ? এ যে দারুণ মোটা।"

কোথায় মোটা ! দিব্যি দোহারা। দিদি কলকাতা বড় খরখরে জায়গা এখানে থাকলে আপনি রোগা হবেন না। বরফ ভরুনো জায়গায় বেয়ে আচ্ছা করে হাঁটাহাঁটি করে আসুন, ঘুরে যাবেন।"

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। কালো ভেলভেটের চটীপরা পায়ের ছন্দবদ্ধ ধ্বনি। পঙ্কজ এসেছে।

তন্দ্রার মন, তন্দ্রার চোখ আলো করে এলেন তিনি অথবা উষা হলেন।

আহা কী সুন্দর ! দেখ কেমন একগাছা বাঁশের মত ঋজু। সকলেই ছিপ্‌ছিপে। একমাত্র আমিই এমনি ঢাকাই ভালো।

পঙ্কজ সহাস্যে বল "কী তন্দ্রা ? আজ ভাই তুমি।"

সেই মুখের হাসিতে সেই গলার স্বরে তন্দ্রার মন সুখসাগরে ডুবে গেল।

স্বপ্নের সম্ভাবনা এক এক সময় চোখে প্রকাশ হয় জীবন্ত রূপে।

একটি বিজ্ঞাপনের প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানে হঠাৎ প্রথম হয়ে এক মাসের বিদেশ সফরের টিকেট পেল তন্দ্রা। লাগবপারে উধাও। কিন্তু কোম্পানী থেকে একমাস বিদায় নিল সে।

কেমন যেন বুকে টান লাগছিল ছেড়ে ঘুরে যেতে পুরো ত্রিশদিনের মত ! কিন্তু এখানে থেকে রোজ রোজ পার্বতীর 'ভাঁট' দেখার চেয়ে নিজে 'ভাঁট' দেখিয়ে ঘুরে আসি। আমার খবর শুনে ওর মুখখানা যা হয়েছিল। পঙ্কজবাবু পর্যন্ত মোহিত। দাঁড়াও আমিও দেখিয়ে দেব। অন্য মানুষ হয়ে ফিরব। মাত্র একমাস সময়। ক্ষতি কিছু হবে না এদিকে।

গল্পের প্রথমাংশের মত যে মেয়েটি আজ চারতলার সিঁড়ি ধরে উঠে এল সত্যই সে অন্য মানুষ।

ষোলতার মত সরু কোমর কিছুটা অবশ্য কম্‌প্লেট্‌ মাহাত্ম্যে। মুখচোখে দামী কস্‌মেটিকস্‌। প্রাণপণে রোগা হ'বার চেষ্টায় মাপজোক ও বাথ নিয়ে তন্বী না হ'লেও তন্দ্রার মেদ ঝরে গেছে।

লোভা চলে এসেছে এখানে। সকালে প্লেন থেকে নেমেছে মাত্র। চেহারা দেখে যাত্রীর লোক মূর্ছিত। তন্দ্রা সুন্দর হয়েছে, তন্দ্রা তন্বী হয়েছে।

কোম্পানীর ঘরের দরজা বন্ধ। আগেই সে এসেছে নাকি, না এখন ছেরীতে সবাই বসছে ?

চারদিকে তাকিয়ে ক্যান্টিনের দিকে এগিয়ে সে ডাকল বন্ধু ও বন্ধু !"

বন্ধুর আস্তানা ছাদের কোণের ঘরে, সেখান থেকে সে বেরিয়ে এল। রোজকার ধোপদুরস্ত বন্ধুবিহারী নয়। এলোমেলো লাট্‌পাট্‌ পোষাক।

"একি, দিদি এলেন? ভাল ছিলেন তো? খুবই রোগা হয়ে এসেছেন দেখছি।"

বন্ধু নমস্কার করে বলে ওঠে।

পরম কৃতার্থ মুখে ভদ্রা বলে "রোগা হওয়া যে ইচ্ছা করলেই হয় সেটাই দেখিয়ে দিলাম। তোমাদের খবর কি বন্ধু? দরজা এখনও খোলনি কেন?"

"আসুন দিদি দরজা খুলে দিচ্ছি। কেউ এলে-টেলে তবেই দরজা খোলা হয়।"

"সে কি? কেউ-এলে-টেলে মানে? রোজ লোক আসে না? কাজকর্ম হয় কি করে?"

দরজা খুলে ধুলোপড়া সোফা বেড়ে বন্ধু বলে আপনি অনেকদিন ছিলেন না তাই জানেন না। কোম্পানী উঠে গেছে।"

চৌকাঠে পা রেখে বজ্রাহতা ব্যাকুল প্রশ্ন করে "উঠে গেছে! কেন?"

"সে অনেক কথা দিদি। কর্তাবাবুকে এঁরা বহু আশা করে এনেছিলেন, তিনি টাকা দিলেন না। অন্যেরাও সরে পড়লেন। কোম্পানী উঠে গেল।"

"তারপর?" কণ্ঠশ্বাসে প্রশ্ন করে ভদ্রা। সেই ঘর, কবিনের স্বর্গ পুরনো বিলিতী মাসিকের পাতা ফড়্‌ফড় করে উড়ছে, ঝুলো ঝেকেছে আসবাবপত্র। জনশূন্য নীরব ঘর, প্রতীক্ষার সূর্যাস্ত লেগে রয়েছে।

বিদেশে প্রথম হেমন্তের পাতা-ঝরা দিনগুলির বুকে তন্ময় হয়ে ভদ্রা এই ঘরখানিরই স্বপ্ন দেখত। নীল সমুদ্রের জলে ভেসে আসত পরিচিত মুখ।

"আর কি বলব, দিদি? পরদিনই পার্বতী-দিদিকে নিয়ে উনোপ্‌ করলেন। এখানেই যা দেখেছিলেন যাবা-মাবি দুজনের যাবার আগে, সেটাই বাড়াবাড়ি হওয়ায় পার্বতী দিদির বাবা মেয়েকে ঘরে আটকে রাখলেন। আর ভাইতো দুজনে পালিয়ে গেল।"

ধুলোপড়া সোফার বুকে তৎক্ষণে বসে পড়েছে ভদ্রা। এক মাস নয়, তিরিশ দিন। কত কি ঘটতে পারে তিরিশ দিনে। বন্ধুবিহারী বলে চলেছে, "এ মাসটাই ঘর রাখা আছে। সামনের মাসে ছেড়ে দেওয়া হবে। আমি সামনের মাসে বেকার হয়ে যাব। দিদি, আমাকে একটা চাকরি দিন না।"

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ভদ্রা। তবীতদ্ব সে কাকে আর দেখাবে? জীবন এক মুহূর্তে উদ্দেশ্যহীন।

পাতা ঝরে যায়, মেঘ ঝরে যায়। কিন্তু ভদ্রার যে মন ছিল না দিনও ঝরে যায়।

—"যে সুন্দর, তাকেই ডাকি; যে ভালো, তাকেই ডাকি। যে আমার ডাক শুনে, তাকেই ডাকি! এই যে আশ্চর্য্য ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া, বিস্মিত হইয়া আছি, ইহাকেই ডাকি। এই অনন্ত সুন্দর জগৎ-শরীরে যিনি আত্মা, তাঁহাকে ডাকি; আমিও ডাকি, তুইও ডাকিস। জানিয়া ডাকি, না জানিয়া ডাকি, সমান কথা তুইও কিছু জানিসনা, আমিও জানিনা; তোরও ডাক পৌঁছিলে আমারও ডাক পৌঁছিবে। যদি সর্ব্বশব্দগ্রাহী কোন কর্ণ থাকে, তবে তোর ডাক পৌঁছিবে না কেন? আয় ভাই, একবার মিলে মিশে দুইজনে পঞ্চমস্বরে ডাকি।" —বঙ্কিমচন্দ্র

Support Nutrition

With

vinkola-12

THE IRON VITAMIN TONIC

A nutritive elixir recommended for young and old alike—provides vital nutrients to help build red blood cells, stimulate appetite, strengthen resistance and stamina, promote growth and increase vigour.

STANDARD PHARMACEUTICALS LTD. CALCUTTA

।। এক অধ্যায় ।।

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

খুট, খুট, খুট।

খুব সন্তর্পণে কে যেন দরজায় কড়া নাড়ছে। অনুপের কানে শব্দটা ঠিক গিয়েছিল। শুয়েছিল বটে, কিন্তু ঘুম আসে নি। মাঝে মাঝে তন্দ্রার আচ্ছন্নভাব। তারপরই ঘোর কেটে গেছে। কড়া নাড়ার আগে বেশ কয়েক জোড়া বুটের আওয়াজও সে শুনতে পেয়েছিল।

সুশীতল গভীর ঘুমে অচেতন। দুজনে মেঝের ওপরই শুয়েছিল। শয্যার বিলাসিতা সব সময়ে তাদের ভাগ্যে জোটে না।

কড়া নাড়ার শব্দ আরও জোর।

অনুপ সুশীতলকে ধীরে ধীরে নাড়া দিল।

উঁ।

সুশীতল পাশ ফিরে শুল। এবার অনুপ তাকে আরো জোরে নাড়া দিল। কানে কানে বলল, পুলিশ।

কাল হ'ল।

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতন সুশীতল উঠে বসে মাথার কাছে রাখা অটোমেটিক হাতে তুলে নিল।

এককোণে মোমবাতির নিষ্প্রভ আলো। অনুপ নিজের ঠোঁটের ওপর আঙুল রাখল, তারপর ইঙ্গিত করল তাকে অনুসরণ করার জন্য।

পিছনের দরজা খুলে দুজনে জঙ্গলের মধ্যে এসে দাঁড়াল। আকন্দ, ঘেঁটু আর বাংচিতার ঝোপ। একদিকে ইটের ভগ্নস্তূপ। এসব দুজনে পার হয়ে এল।

নিরন্ধ্র অন্ধকার। হু'হাত দূরের সব কিছু অদৃশ্য। পদে পদে ভয় যে কোন মুহূর্তে পঙ্কশয়ন হয়ে পচা ডোবার মধ্যে পড়তে পারে।

একেবারে জঙ্গলের ধার ঘেঁসে দুজনে দৌড়াতে লাগল। দুজনের মুঠে বন্ধ হাতে অটোমেটিক।

যেতে যেতেই তারা শুনতে পেল পিছনে দরজা ভাঙার আওয়াজ। সম্ভবত বুটের ধাক্কায় কিংবা বন্দুকের বাঁটের গুঁতোয় কপাটের অবরোধ ভেঙে পড়েছে।

পুলিশ এতক্ষণে ভিতরে ঢুকে কানিংহামের হত্যাকারীর জন্য তন্ন তন্ন করে সন্ধান চালাচ্ছে।

দুঃসাহসিক হত্যাকাণ্ড, সন্দেহ নেই।

কানিংহাম প্যারেড পরিদর্শন করে ঘোড়ার পিঠে বাংলোয় ফিরছিলেন। সঙ্গে এক আর্দালি ছিল। একটু আগে কানিংহামই তাকে হাটে পাঠিয়েছিলেন। প্রায় যখন বাংলোর কাছাকাছি এসে গেছেন, তখন পাশের জঙ্গল থেকে পরপর দুটি গুলি।

অব্যর্থ লক্ষ্য।

একটা বিঁধল কপালে, আর একটা চোয়ালে। ঘোড়ার পিঠ থেকে কানিংহাম ছিটকে পড়েছিলেন। কানিংহামের যেন বারান্দায় অপেক্ষা করছিলেন। সমস্ত দৃশ্য সংঘটিত তাঁর চোখের সামনে। তিনি দেখতে পান সেরুমা রংয়ের দ্রুত অপসরণ। কজন ঠিক সেটা খেয়াল করেন নি।

কানিংহামকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু বৃথা। ডাক্তার দেখেই মাথা নেড়েছিলেন।

কিছু করার নেই।

তারপরই পুলিশ তৎপর হ'ল। আশপাশের সমস্ত গ্রাম আঁচড়ে ফেলল। বেশ কিছু দূরে খবর নিল। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার নেমেছে চারদিকে। গঙ্গর পাল তাড়িয়ে রাখাল বাড়ী ফিরছিল, হঠাৎ জলের আলোড়ন শুনে চমকে মুখ তুলে দেখতে পেয়েছিল।

খাল সাঁতরে দুজন লোক তীরে এসে উঠেছিল। রাখাল ছেলেকে জিজ্ঞাসা করেছিল। এ গাঁয়ের নাম কি?

নন্দীপুর।

উত্তর শুনে একটুও অপেক্ষা করেনি। দ্রুত পায়ে চলতে শুরু করেছিল। এ গাঁয়ে আগে তাদের কোনদিন দেখা যায়

নি। পুলিশ রাখালের নির্দেশ ধরে চলল। মাইল দুয়েক পরে একটা দোকান মিলল। সেখানে আরও সন্ধান পাওয়া গেল। দুটি ছোকরা এই দোকানে মুড়ি কিনেছে।

তারপর জঙ্গলের মাঝখানে পোড়ো বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছে। মাঝরাতে পুলিশ পরস্পর গিয়ে দাঁড়াল।

পায়ে চলা পথ ছেড়ে অরূপ আর সুশীতল জঙ্গলে ঢুকল। জঙ্গল বিশেষ ঘন নয়। আত্মগোপন করার কোন সুবিধাই নেই।

একটা কাঁকড়া গাছের তলায় দুজনে বসল। খুব গরম নয়, বরং বাতাসে শীতের আমেজ রয়েছে। কিন্তু তবু দুজনের সারা শরীর ঘর্মাক্ত। একটু পরেই লক্ষ্য করল, জোরালো টর্চের আলো এদিক ওদিক। তার মানে, পোড়ো বাড়ীতে কাউকে না পেয়ে পুলিশ পথে বেরিয়ে পড়েছে। আলো দু একবার তাদের ওপরেও এসে পড়ল। আর অপেক্ষা করা নিরাপদ নয়।

অরূপ আর সুশীতল উঠে দাঁড়াল। শরীরের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে তীব্র অবসাদ। পা কাঁপছে। কিছুদূর ছোটার পর দেখল, এক জায়গায় আলোর শিখা দেখা যাচ্ছে। পিছন দিকে চোখ ফেরাল। না, টর্চের আলো আর নেই।

আলোর শিখার কাছাকাছি গিয়েই দুজনে থমকে দাঁড়াল। একটি কুঁড়ে ঘর। তার উঠানে ধুনি জ্বলছে। ধুনির সামনে এক সাধু। দুচোখ নিমীলিত। বাহ্যজ্ঞান রহিত। পরণে গেরুয়া। কাঁচা পাকা দাড়ি। জটার ভার কাঁধ পর্যন্ত নেমেছে। দুজনেই ভাবল, এই কুঁড়ে ঘরে রাতটা কাটানো যেতে পারে। তারপর কাল সকালে আবার যাত্রা শুরু।

কিন্তু তা হ'ল না। অনেক দূর থেকে চৈ হল্লার শব্দ। মনে হচ্ছে পুলিশদের সঙ্গে গ্রামবাসীরাও যোগ দিয়েছে।

অরূপ সুশীতলের কানে কানে কি বলল, তারপর দুজনেই অটোমেটিক দুটো সাধুর আসনের পাশে নিঃশব্দে নামিয়ে রাখল।

আবার দৌড়াতে আরম্ভ করল।

রাত ভাল।

পথের ওপর একটা গরুর গাড়ীর সাক্ষাৎ মিলল। তার-বোঝাই হয়ে নলডাঙ্গার হাটের দিকে চলেছে। গাড়োয়ানকে বুঝিয়ে দুজনে ধুতি মুড়ি দিয়ে গাড়ীতেই উঠে পড়ল। তাদের আড়ালে আত্মগোপন করে রইল।

চারজন পুলিশ, একজন ইন্‌স্পেক্টর।

সাধুর সামনে এসে দাঁড়াল।

শুনছেন, ও সাধুবাবা। চোখ খুলুন।

ইন্‌স্পেক্টর চেঁচাতে লাগলেন।

সাধুর ভ্রূক্ষেপ নেই। হঠাৎ একজন পুলিশের নজরে পড়ে গেল। আসনের পাশ থেকে অটোমেটিকের নল দেখা যাচ্ছে। নীচু হয়ে পুলিশ সেটা কুড়িয়ে নিল। তার পাশেই আর একটা। দুটো নিয়ে ইন্‌স্পেক্টরের হাতে সমর্পণ করল। ইন্‌স্পেক্টর সেগুলো তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করে বলল। এই সাধুর কাছে দুজন দাঁড়াও। দুজন আমার সঙ্গে এস, এই কুঁড়েটা সার্চ করতে হবে।

পাশাপাশি দুটো ঘর। একটা ঘরে কিছু তৈজসপত্র, অন্য ঘরে একটা বাঘের ছাল পাতা আর কয়েকখানা বই। এ ছাড়া আর কিছু নেই।

ইন্‌স্পেক্টর যখন বাইরে এল, দেখল সাধু উঠে দাঁড়িয়েছে। একজন পুলিশ বলল।

হুজুর, চোখের ওপর জোর টর্চের আলো ফেলতেই ধ্যানের রূপ শেষ হয়ে গেছে। আমাদের ওপর মেজাজ দেখাচ্ছে।

ইন্‌স্পেক্টর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নাম কি হে তোমার?

সাধু একবার ইন্‌স্পেক্টরের আপাদমস্তক দেখল, তারপর বলল।

ধীরানন্দ।

চাবকে তোমাকে একেবারে অধীরানন্দ করে তুলব। এ মাল কোথা থেকে পেলে?

সাধু হেঁট হয়ে অটোমেটিক দুটো দেখল, তারপর বলল।

আগ্নেয়াস্ত্র।

অসীম জ্ঞান দেখছি। দুটোরই চেম্বারে একটি করে কার্তুজ কম। কানিংহামের শরীরে ঠিক এই মাপের কার্তুজ পাওয়া গেছে।

কানিংহাম কি মারা গেছে?

সাধুর নিষ্কম্প তেজদৃপ্ত কণ্ঠস্বর।

ইন্‌স্পেক্টরের ধৈর্যচ্যুতি হ'ল। চীৎকার করে পুলিশকে

বলল। বাঁধ বেটাকে। নিয়ে চল থানায়। রসিকতা করা বের করছি। দুজন পুলিশ কোমরে দড়ি বাঁধল। ইন্‌স্পেক্টর জিজ্ঞাসা করল। কিছু সঙ্গে নিতে চাও?

সাধু কি ভাবল, তারপর বলল। সঙ্গে? সঙ্গে বিবেক যাবে আর কৃতকর্মের ফল।

ইন্‌স্পেক্টর আবার চটল।

এসব তত্ত্ব কথা ভক্তদের সামনে বল। এখানে সুবিধা হবে না।

পরের দিন সকালে চারদিকে হৈ হৈ পড়ে গেল। ধীরানন্দকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে থানায় আটকে রেখেছে। থানার চারপাশে গ্রামের লোকেরা ভীড় করে দাঁড়াল। শুধু ভীড় করাই নয়, রীতিমত চীৎকার।

থানার দারোগা বাইরে এসে দাঁড়াল। কি হয়েছে কি?

সব চুপচাপ। কিছুক্ষণ পরে দু' একজন বলল। ধীরানন্দকে গ্রেপ্তার করেছেন কেন?

হাতের বেঁটে লাঠিটা দারোগা সজোরে দেয়ালে ঠুকল।

তার কৈফিয়ৎ কি তোমাদের দিতে হবে? দশ পর্যন্ত গুণব তার মধ্যে একটি লোক যেন থানার কাছাকাছি না থাকে।

দশ পর্যন্ত গুণতে হ'ল না। তার আগেই চারদিক ফাঁকা হয়ে গেল।

এবার দারোগা ধীরানন্দের মুখোমুখি দাঁড়াল।

একটা ছেঁড়া কম্বলের ওপর ধীরানন্দ বসেছিল। রাত্রে শুয়েছিল এই কম্বলের ওপর।

সিপাই দারোগাকে খবর দিয়েছিল।

আসামী সারারাত আরামে ঘুমিয়েছে হুজুর।

শোন ধীরানন্দ, আমি জানি হত্যাকাণ্ড তুমি নিজের হাতে করনি, তোমার সাকরেদরা করেছে। তাদের নাম-ঠিকানা আমাদের জানাতে হবে।

ধীরানন্দ হাসল।

কি করে বুঝলেন হত্যা আমি করিনি?

খুব সহজ। দুটো অটোমেটিক তাহলে তোমার কাছে থাকত না। বোঝা গেল, এগুলো তোমার কাছে রাখতে দিয়েছিল। তাই না? [হবে।]

খুব নিস্পৃহভাবে ধীরানন্দ উত্তর দিল। ইন্‌স্পেক্টর খিঁচিয়ে উঠল। ওভাবে উত্তর দিলে বিশেষ সুবিধা হবে না।

কি ভাবে উত্তর দিতে হবে?

তোমার আসল নাম কি?

ধীরানন্দ মৃদু হাসল।

সন্ন্যাস গ্রহণ করা মানে সাংসারিক মৃত্যু। সংসারী হিসাবে আমার কি নাম ছিল, সেটা এই মুহূর্তে নিষ্প্রয়োজন। আমার পিতার নামও বলতে পারব না। আমার নাম ধীরানন্দ বলেই ধরে নিন।

কতদিন এই দলে নাম লিখিয়েছ?

কোন দলে?

বোমা বাজদের দলে। ইংরাজ মারার দলে।

আমার কথা বিশ্বাস করবেন?

ভনিতা থাক, বলে যাও।

আমি প্রত্যক্ষভাবে এ দলে না থাকলেও ইংরাজদের আমি শত্রু বলে মনে করি। দেশের শত্রু, জাতের শত্রু, সমস্ত মানবতার শত্রু। মুসলমানরা এ দেশ শাসন করেছে, কিন্তু তারা এ দেশের অর্থ, এ দেশের সম্পদ এ দেশেই রেখেছিল, কিন্তু ইংরাজরা তা করেনি। দেশকে সম্পূর্ণভাবে শোষণ করেছে, প্রতি ঘরে কান্নার রোল তুলেছে। ধর্ম-শক্তিকে নিঃশেষ করার চেষ্টা করেছে।

হঠাৎ থানায় একটা আলোড়ন শুরু হ'ল। সিপাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

ইন্‌স্পেক্টর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

কালো গাউন পরিহিতা একটি ইংরাজ মহিলা থানার মধ্যে ঢুকলেন। সঙ্গে পুলিশের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার। কানিংহামের বিধবা স্ত্রী।

পুলিশ অফিসার ইন্‌স্পেক্টরকে লক্ষ্য করে বলল। এই সাধুকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে?

হ্যাঁ স্যার। এর কাছেই দুটো অটোমেটিক পাওয়া গেছে।

কি বলছে?

কাজের কথা এখন বলেনি কিছু। তবে কি করে কথা বলাতে হয় আমি জানি।

অফিসার কানিংহামের স্ত্রীর দিকে ফিরল। দেখুন তো লোকটি চিনতে পারেন কিনা?

মিসেস কানিংহাম চোখ তুলে দেখলেন। সে দৃষ্টিতে চেনার চিহ্ন নেই, বরং বিজাতীয় ঘৃণার প্রকাশ।

চোখ নামিয়ে অফিসারকে বললেন। আমি অল্পক্ষণের জন্য সেরেস্তা কাপড়ের আভাস দেখতে পেয়েছিলাম। কথা-বার্তা ইংরাজীতে হচ্ছিল। ধীরানন্দ সেংকার ইংরাজীতে বলল। আমি সবসময়েই সেরেস্তা পরি। আমার অন্য রংয়ের বসন নেই।

মিসেস কানিংহাম চুপ করে উঠলেন।

গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর। সাধুর দুটি চোখ যেন জ্বলছে।

আমার স্বামী তোমার কি ক্ষতি করেছিল?

এখানে ব্যক্তি-বিশেষের প্রশ্ন নয়। আপনার স্বামী অত্যাচারী একটা জাতের প্রতীক। তাছাড়া মিস্টার কানিংহামের হুকুমে বিপ্লবী হরনাথ ঘোষের ফাঁসি হয়েছিল।

মিসেস কানিংহামের সারা মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। থেমে থেমে যেন শক্তি সঞ্চয় করে বললেন। আমার স্বামী বিচারক ছিলেন। তিনি ন্যায় বিচারই করেছেন।

ধীরানন্দ এত জোরে হেসে উঠল যে মনে হ'ল থানার দরজা-জানালাগুলো যেন থর-থরিয়ে কেঁপে উঠল।

বিচার? ন্যায় বিচার? হরনাথের অপরাধটা কি? দেশকে ভালবাসা? ভালবাসার পথে যারা যারা বাধা তাদের অপসারিত করা? তাহলে সব দেশপ্রেমিকই তো অপরাধী।

অফিসারটি নীচু হয়ে ফিস ফিস করে মিসেস কানিংহামকে বলল। চলুন, এ সমস্ত লোকের সঙ্গে বাদানুবাদ করা বৃথা। দুজনে বের হয়ে গেল।

ধীরানন্দ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

ইন্‌স্পেক্টর একটু লোটানায় পড়ল।

তার ঠিক মনে আছে দুজন লোক ছুট দিল। টর্চের আলোয় অস্পষ্ট দেখতে পেয়েছিল।

দুজন বেঁটে লোক। মাথায় কদমছাঁট চুল।

এখন হওয়া সম্ভব লোক দুটো যে দলের এই সাধু সে দলের নেতা।

লোকের চোখে ধুলো দেবার পক্ষে এদেশে গেরুয়া আদর্শ আবরণ। শুধু লোককে ফাঁকি দেওয়াটাই নয়, মানুষের শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্যও এ পোশাক খুব কার্যকরী।

ধীরানন্দকে কোর্টে চালান দেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

পেনাল কোডের অনেকগুলো সেকশনের জালে লোকটাকে আবদ্ধ করাই ভাল। যাতে একটা থেকে নিষ্কৃতি পেলে, আর একটায় জড়ানো যায়।

ইদানীং আরেকটা মুসকিল হয়েছে। তেজী উকিল ব্যারিষ্টারের দল আসামীর পক্ষে দাঁড়ায়।

কূট তর্কে, শাণিত বক্তৃতায় সরকারি উকিলের সমস্ত গড়ে তোলা অভিযোগের সৌধ ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়।

পর পর অনেকগুলো আসামী ছাড়া পেয়ে গেছে। তাছাড়া বিচারক আর সরকারী উকিল রীতিমত সন্ত্রস্ত।

কলকাতায় হাইকোর্টের সিঁড়িতে বিপ্লবীর গুলিতে একজন সরকারি উকিলকে প্রাণ দিতে হয়েছিল।

আততায়ী অবশ্য ধরা পড়েছিল, কিন্তু এরা প্রাণের মায়া করে না। কারো প্রতি এদের মমতা নেই।

খুব যত্ন নিয়ে কেস সাজানো হ'ল।

যে দুটি লোককে যারা দেশ ছাড়তেও পাওয়া গেল না তখন যাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া গেছে, তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে আইনের বাঁধনে বাঁধতে হবে।

সরকারি উকিলের মত, যে পুরোহিত পাঠার কপালে সিঁদুর ছোঁয়ায় আর যে ঘাতক খড়্গের ঘায়ে তাকে কাটে, দুজনের অপরাধ সমান।

এই লোকটা পালের গোদা। এরই নির্দেশে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। কাজেই তার অপরাধের গুরুত্ব কম নয়।

কোর্টে কেস ওঠবার আগে ধীরানন্দ হাজতে রইল। ইন্‌স্পেক্টর রোজই একবার করে দেখা করে। কিন্তু ধীরানন্দ পাথরের মতন অটল। একটি কথাও তার মুখ থেকে বের করা যায় না।

অবশেষে ইন্‌স্পেক্টর একদিন জিজ্ঞাসা করল। তোমার কোন রকম অসুবিধা হচ্ছে?

অসুবিধা? কিসের অসুবিধা? এই খাওয়া দাওয়ার?

আমি সংসার ত্যাগী। কামনা বাসনা বিসর্জন দিয়েই এ পথে এসেছি। ভোগ বিলাসের শখ আমার নয়।

তোমার কিছুর প্রয়োজন আছে?

প্রয়োজন? ধীরানন্দ কয়েক মুহূর্ত চিন্তা করল, তারপর বলল, আমাকে একটা গীতা এনে দিতে পারেন? আমার কুটিরে একখানা ছিল, কিন্তু যে ভাবে আমাকে নিয়ে এলেন, সেটা সঙ্গে আনতে পারিনি।

গীতা। ঠিক আছে জোগাড় করে দেব।

পরের দিনই ইন্‌স্পেক্টর সিপাইকে দিয়ে একখানা গীতা পাঠিয়ে দিল।

ঠিক কদিন পরেই এল রায়বাহাদুর গোলক সরকার।

দুঁদে গোয়েন্দা। নির্যাতন বিশারদ। অনেক বাঘা বিপ্লবীকে ঘায়েল করেছে।

পিঠে কম্বল জড়িয়ে তার ওপর নিরেট আঘাত, নখের মধ্যে পিন ফোটানো, পা দুটো কড়ি কাঠে বেঁধে মাথা নীচের দিকে ঝুলিয়ে রাখা দিনের পর দিন। কত বিপ্লবীর মুখ দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।

শুনতে অবশ্য ভোষণ করে। চাকরি দেবার প্রলোভন। ভাল খাদ্য মুঠো মুঠো টাকা।

গোলোকবাবু ঢুকে দেখল ছেঁড়া কম্বলের ওপর বসে ধীরানন্দ দুলে দুলে গীতা পাঠ করছে।

গোলোকবাবু মেঝের ওপর বসে পড়ল।

প্রণাম স্বামীজি।

ধীরানন্দ মুখ তুলে দেখল তারপর গীতা বন্ধ করে একপাশে সরিয়ে রাখল। আমি সরকারের তরফ থেকে মার্জনা চাইতে এসেছি।

মার্জনা?

হ্যাঁ, ভুল বশতঃ আপনাকে ধরে আনার জন্য। আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন, মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। আগ্নেয়াস্ত্র দুটো আপনার আসনের কাছে পাওয়া যেতে পুলিশ আপনাকে সন্দেহ করেছে। এটা ওদের মাথায় ঢোকেনি যে দুর্বৃত্তরা পালাবার সময় ও দুটো আগ্নেয়াস্ত্র আপনার কাছে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যেতে পারে।

ধীরানন্দ কোন কথা বলল না। একদৃষ্টে গোলোকবাবুকে দেখল।

প্রৌঢ় কিন্তু দেহের বাঁধুনি কঠিন। ধূর্ত দুটি চোখ। মুখে অমায়িক হাসি।

আপনি তো ভৈরব আশ্রমের স্বামী ধীরানন্দ। আপনার সব খোঁজই আমি রাখি। কুষ্ঠদের জন্য আপনি কি পরিশ্রম করেছেন তাও জানি। বছর দুয়েক আগে ময়ূরাই নদীর বাঁধ ভেঙে যখন দু পাশের গাঁয়ের অবস্থা সঙ্গীন, তখন আপনি গ্রামবাসীদের নিয়ে বাঁধ মেরামত করেছিলেন, সে খবরও আমার জানা আছে।

সবই তাঁর ইচ্ছা। আমি নিমিত্ত মাত্র।

ধীরানন্দের কথার সঙ্গে সঙ্গে গোলোকবাবু চোখ বন্ধ করে ফেলল।

নিশ্চয়। একশবার। তিনিই তো মালিক। মুখের মতন বলে বেড়াই, আমি করেছি। সেই যে গান আছে না, তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।

হঠাৎ গোলোকবাবু গলার সুর পালটাল।

ইস, এই ঘরে আপনাকে রেখেছে। ব্যাটাদের একটু আক্কেল নেই। আমি উঠি আবার কাল আসব।

গোলোকবাবু বেরিয়ে গেল। তার একটু পরেই গেরুয়া পরা এক স্বামীজি ঢুকল। সঙ্গে একজন উকিল। স্বামীজিকে দেখে ধীরানন্দ সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়াল।

এ কি আপনি?

হ্যাঁ। খবর পেয়ে আমি হরিদ্বার থেকে ছুটে আসছি। কি ব্যাপার বলতো ধীরানন্দ, এ সবে জড়ালে কি করে?

ধীরানন্দ হাসল।

অদৃষ্ট কিংবা প্রারব্ধ।

স্বামীজি বলল।

ইনি আমাদের উকিল বিনোদ গোস্বামী। আশ্রমের সব কিছু দেখেন। এর কাছে সব খুলে বল।

বিনোদগোস্বামী এদিক ওদিক দেখল। ফটকের ওপাশে একজন সিপাই দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলল।

এ আর খুলে বলা কি। আপনি সাধন ভজনে তন্ময় ছিলেন, সেই সময় দুর্বৃত্তরা অটোমেটিক দুটো ফেলে পালিয়েছে তাইত।

ঘটনাটা অবশ্য তাই, কিন্তু পুলিশ এখন আর এসব

বিশ্বাস করবে না। পুলিশকে বিশ্বাস করানোর ভার আমার। আপনি শুধু সত্যি কথাটা বলুন।

আমি তো একটি মিথ্যা কথাও বলিনি।

আমি শুনলাম কানিংহামের বিরুদ্ধে আপনি, অনেক কথা বলেছেন।

সে কথাগুলো মিথ্যা নয়। ইংরাজ সম্বন্ধে যা আমার মনের ভাব তাই আমি প্রকাশ করেছি।

কিন্তু আপনি সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী।

সংসার থেকে সরে এসেছি, তাবলে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারিনি। পারিপার্শ্বিক ঘটনা আমাকে আলোড়িত করে বই কি। সে সম্পর্কে আমার মত আমি বিসর্জন দিতে পারি না।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে দুজন বেরিয়ে এল। ঠিক তার পরের দিন এল আর একজন সাধু। পুলিশকে বলল সে এসেছে রতনপুর আশ্রম থেকে। সেই সাধু ঢুকেই ধীরানন্দের পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। ধীরানন্দ বিস্মিত কণ্ঠে বলল। একি, কে আপনি?

আমাকে আপনি চিনবেন না। এ পোশাক আমার ছদ্মবেশ।

আপনাকে তো চিনতে পারলাম না। অবশ্য সব আশ্রমের সবাইকে আমি চিনি না।

আমি আশ্রমের কেউ নয়। আমি কানিংহামের হত্যাকারী। কিছুক্ষণ সব নিস্তব্ধ। কোন কথাবার্তা নেই। ফটকের বাইরে সিপাই দুলে বসে খৈনি টিপছে। একটু পরে ধীরানন্দ মৃদুকণ্ঠে বলল। আপনি এসেছেন কেন? আপনার এভাবে ঘোরাফেরা করা নিরাপদ নয়।

তা জানি। প্রাণের ভয় আমাদের নেই, তবে এভাবে ধরা দিতেও আমরা চাই না। কিন্তু যখন শুনলাম, আপনি আমাদের অপরাধ ঘাড়ে নিতে চলেছেন, তখন আর না এসে পারলাম না।

ধীরানন্দ স্মিত হাসল।

আপনাদের জীবনের দাম অনেক। দেশের লোক আপনাদের কাছে অনেক কিছু আশা করে। আপনাদের বাঁচা দরকার।

আর আপনারা?

সমাজ সংস্কারকরা বলেন, আমরা পরগাছা। সমাজের ভার স্বরূপ। তাছাড়া আপনাদের অপরাধের বোঝা তো আমি নিইনি

আপনি জানেন না, কানিংহামের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে এরা বদ্ধপরিকর। বিলেত থেকে চাপ এসেছে। যেমন করে হ'ক একটা আসামী এরা খাড়া করবেই।

সেজন্য আমাকে হত্যাকারী তৈরি করতে এদের দেরি হবে না, এই তো? ইংরাজের বিচার পদ্ধতির সঙ্গে আমি পরিচিত। তার জন্য আমি প্রস্তুত।

কিন্তু তা হলে আমাদের পরিত্রাণের সীমা থাকবে না।

আমার তো মনে হয়, আপনাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত দেশমাতৃকার মুক্তি সাধন। তার জন্য ছোটখাট ক্ষয় ক্ষতির দিকে নজর দেওয়া উচিত নয়।

সুশীতল এসেছিল সাধুর ছদ্মবেশে।

সে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইল, তারপর বলল।

এরপর বাধ্য হয়ে কিন্তু আমাকে ধরা দিতে হবে নির্দোষের শাস্তি হবে এ আমি সহ্য করতে পারব না।

ধীরানন্দ কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে সুশীতলকে দেখল।

আপনি গীতা পড়েছেন?

পড়েছি।

তারপরেও আপনি বলবেন সব কিছু আপনার জন্য হচ্ছে। কিছুই আমরা করি না। জন্ম, মৃত্যু, সৃষ্টি, স্থিতি, লয় সব কিছুর মূলে অন্য একজন। তিনি সর্ব কর্ম নিয়ামক। তাঁকে অতিক্রম করে কোথাও কিছু সংঘটিত হয় না।

সুশীতল হতাশ হয়ে উঠে গেল। পরের দিন সকালে গোলোক সরকার। আগের বারের শান্ত চেহারার মানুষটি এবার এল রুদ্ররূপে। ঘরের মধ্যে পা দিয়েই হুঙ্কার ছাড়ল। চাবকে তোমার সাধুগিরি আমি বের করে দেব। দলের কে কোথায় আছে বলবে কিনা?

ধীরানন্দ গলার স্বর শুনে ভ্রূ কোঁচকাল তারপর চুপচাপ বসে রইল।

কি কথা কানে যাচ্ছে না?

গেছে কিন্তু উত্তর দেওয়া প্রয়োজন বোধ করছি না।

তার মানে?

মানে অতি সরল সব সময়ে ধমকে সব কিছু আদায় করা যায় না।

যায় কিনা দেখবে ?

গোলোকবাবুর ইঙ্গিতে দুজন জাঁদরেল সিপাই এসে দাঁড়াল। তারা ধীরানন্দকে পিছমোড়া করে বাঁধল।

একটা মোটা কম্বল চাপাল তার পিঠে, তারপর নির্মম বেত্রাঘাত চলল তার পিঠের ওপর।

প্রথমে কয়েকবার মৃদু আর্তনাদ তারপর ধীরানন্দ অচেতন হয়ে পড়ল। কম্বল তুলে নিয়ে, ধীরানন্দের বাঁধন খুলে গোলোকবাবু বেরিয়ে এল। পরের দিনও ধীরানন্দ উঠে বসতে পারল না। ইন্‌স্পেক্টর যখন ঢুকল, তখন ধীরানন্দের দুটি চোখ লাল।

ইন্‌স্পেক্টর নিরীহকণ্ঠে বলল।

তোমার মতন লোকের জেল হাজতে থাকা কি উচিত।

ধীরানন্দ ম্লান হাসল। সে হাসিতে বেদনার ছোপ।

আমাদের উপাস্য দেবতার জন্মই তো জেল হাজতে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম কংসকারাগারে। এ জায়গা তো আমাদের কাছে তীর্থ।

ইন্‌স্পেক্টর বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বলল।

এখনও ঠিক ওষুধ পড়েনি। আরো কড়া ডোজ দরকার। রায়বাহাদুরকে আবার খবর পাঠাতে হবে।

• • •

কেস কোর্টে উঠল। সব দিক রেখে কেস সাজানো হয়েছে। ধীরানন্দ বিপ্লবী দলের নেতা। নিজের হাতে কিছু করে না। সকলের অস্ত্র তার কাছেই জমা থাকে। সেই নির্দেশ দেয়।

কানিংহামের হত্যার ব্যাপারে ধীরানন্দ নিজে জড়িত থাকা বিচিত্র নয়। কারণ মিসেস কানিংহাম গেরুয়া বসনের কিছুটা দেখতে পেয়েছিলেন।

কোর্ট রুমে তিল ধরণের স্থান নেই।

আশ্রমের সাধুর সংখ্যাও প্রচুর।

ধীরানন্দের পক্ষে উকিল বিনোদ গোস্বামী।

প্রথম সাক্ষী মিসেস ক্যাথারিন কানিংহাম।

তিনি বললেন, সেদিনের কথা তিনি জীবনে বিস্মৃত হবেন না। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর মনে থাকবে। গাছপালার অন্তরালে পলায়মান যে বস্তুমূর্তি তিনি দেখেছিলেন, তার সঙ্গে আসামীর মুখের মিল।

এবার জেরা করতে বিনোদ গোস্বামী উঠল। রুক্ষ মুখের ভাব। স্বল্প কয়েকটি চুল বাতাসে উড়ছে।

তীক্ষ্ণধার যুক্তি। ধৃষ্টতার পর্দকে প্রতিপক্ষের ব্যারিষ্টারও কাবিল হয়ে পড়ে।

তাহলে মিসেস কানিংহাম আমাদের কি এই বুঝতে হবে যে মারাত্মক আহত স্বামীর দিকে দৃষ্টি না দিয়ে আপনার দৃষ্টি ছিল তার আততায়ীর প্রতি ?

একটু থেমে মিসেস কানিংহাম বললেন বলবার তো পলকের জন্য আততায়ীকে দেখেছিলাম।

স্বীকার করবেন স্বামীর ওই অবস্থা দেখে আপনি যথেষ্ট পরিমাণে বিচলিত ছিলেন।

স্বাভাবিক।

সেই সময়ের লোক চেনার কোন আশা আপনি করা যায় না। এটা স্বীকার করতে নিশ্চয় আপনার কোন অসুবিধা নেই।

মিসেস কানিংহাম নীরব।

তখন সময় পৌনে ছটা। শীতকালে এ সময়ে চারদিকে বেশ অন্ধকার ঘনিয়ে আসে। ঠিক কিনা ?

হবে।

তা সত্ত্বেও সেই আধো অন্ধকারে আপনি আততায়ীর গৈরিক বসন চিনতে পারলেন ?

অস্তসূর্যের আলোয় আমি দেখতে পেয়েছিলাম।

এবার বিনোদ গোস্বামী বিচারপতির দিকে ফিরল।

মি লর্ড, এই ফটোটা আমি এক্সিবিট হিসাবে ফাইল করতে চাই।

কিসের ফটো ?

এই ফটোতে দেখা যাবে স্বামী ধীরানন্দ নন্দীপুর গ্রামে একটি প্রাইমারি স্কুলের দ্বারোদ্ঘাটন করছেন। সময় তখন সাড়ে ছটা।

প্রমাণ ?

আমি শঙ্খধ্বনী সংবাদপত্রের প্রতিনিধিকে সাক্ষী হিসাবে ডাকছি। তিনিই এটা প্রমাণ করবেন।

বিচারপতি ছুটোটি নথী তুলে করলেন।

একটানা পনের দিন চলল। একভাবে।

তারপর দুই উকিলের আর্গুমেন্ট চলল।

সরকারি উকিল জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা শুরু করল।

যারা বিনা প্রয়োচনায় মানুষের জীবন হানি ঘটায়, একমাত্র অপরাধ হয়তো আক্রান্তরা শাসকশ্রেণীর স্বজাতি, তারা সাধারণ হত্যাকারীর চেয়েও ঘৃণ্য। এভাবে অন্যায়রূপে রক্তপাত করে একটা রাজত্বের ভিত টলানো যায় না, বিদেশীকে বিতাড়িত করা সম্ভব নয়, অতএব দেশ স্বাধীন করা যায় না। অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় সাধুর পবিত্র আবরণ অঙ্গে জড়িয়ে এ দেশের লোক হীনকাজে নিজেদের নিয়োজিত করে। এমন একটা বলুষিত দেশেই সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্ভব।

পুরোদিন বক্তৃতা চলল। হলঘর জনাকীর্ণ। সকলে নিস্তব্ধ হয়ে শুনল।

যুক্তিতর্কের জাল বিছিয়ে সরকারি উকিল প্রমাণ করার চেষ্টা করল যে ধীরানন্দ পাকা বিপ্লবী। কানিংহামের হত্যার সঙ্গে সরাসরি যোগ না থাকলে পরোক্ষে এর সঙ্গে ধীরানন্দ জড়িত, একথা সন্দেহের অতীত।

তারপর বিনোদ গোস্বামী উঠল।

কালো গাউন বাতাসে উড়ছে।

জোরালো বক্তৃতা নয়, বিনোদ গোস্বামী থেমে থেমে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কথা বলে। এত তীক্ষ্ণ যে মনে হয় যেন অঙ্গে দাগ করে দিচ্ছে।

বোঝা যায় মানুষ বয়স হ'লে ছেঁড়ালে হয়ে যায়, অন্তত মস্তিষ্কের ব্যাপারে। আমার বন্ধু সরকারি উকিলের সেই অবস্থাই হয়েছে। তা না হলে, ধান ভানতে শিবের গীত গাইবার কোন প্রয়োজন ছিল। তাঁর সব বক্তব্যই প্রমাণ সাপেক্ষ। এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে ধীরানন্দ জড়িত, এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ তিনি উপস্থাপিত করতে পারেন নি। অপরপক্ষে সাক্ষী দিয়ে আমি প্রমাণ করেছি যে কানিংহাম যখন নিহত হন, তখন ধীরানন্দ অন্য জায়গায় একটি সংকাজে ব্যাপৃত।

পুলিশ প্রকৃত আততায়ীকে ধরতে সক্ষম হয়নি। তাদের সেই অক্ষমতা ঢাকবার এ একটা প্রয়াস। সংসারত্যাগী এক সাধুকে হত্যাকারীর বেশ পরিয়ে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধন করা। আসামী তাঁর স্টেটমেন্টে বলেছেন, তিনি দেশকে ভালবাসেন। কানিংহামকে হত্যা করলে তিনি অনুশোচনা প্রকাশ করতেন না। দেশকে ভালবাসা অপরাধ নয়। কানিংহাম বিদেশী নির্যাতনের প্রতীক। তাকে অপসারণের কথা সেইভাবেই আসামী চিন্তা করেছেন।

বিনোদ গোস্বামীও প্রায় ঘণ্টাদুয়েক বলল।

বিচারপতি আর জুরির দল চুপচাপ শুনল।

তারপর বিচারপতির জুরিদের কেস বোঝাবার ভার।

বিচারপতি বাঙ্গালী জুরিদের মধ্যে অধিকাংশ ইউরোপীয়।

ফল যা হবার হ'ল।

জুরিরা অভিমত দিল, ধীরানন্দ কানিংহাম হত্যার জন্য দোষী।

বিচারপতি তাদের সঙ্গে একমত হয়ে রায় দিল, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

সঙ্গে সঙ্গে বুলেটের আঘাতে বিচারপতি চেয়ার থেকে ছিটকে পড়ল।

সারা আদালত ঘরে চাঞ্চল্য। হুটোপাটি।

একমাত্র ধীরানন্দ শান্ত, সমাহিত।

পুলিশ প্রস্তুত ছিল। আততায়ীকে ধরে ফেলল।

কিন্তু আততায়ীর প্রাণহীন দেহ।

পুলিশ স্পর্শ করার আগেই সুশীতল সায়নাইডের পুরিয়া মুখের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

———

ঝংকার

নীলিমা দাশগুপ্ত

—পাঁচ মিনিটে আর কতটুকু বোঝা যায় ?—শত শত অভিনন্দন গ্রহণ করতে করতে ভাস্কর ভাবছিলেন অনুপস্থিত অরুণেশের কথা। সাহিত্যিক অরুণেশ বসু। কলেজের কিছুকালের বন্ধু।

স্ত্রী মিলির তাগিদে ঠিকানা সংগ্রহ করে ভাস্করকে নিজে যেতে হয়েছিলো বন্ধু অরুণেশের কাছে।

"হালো মিঃ মুখার্জি! কনগ্র্যাচুলেশনস্—হাইলি কন্—"

"থ্যাঙ্ক ইউ—থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ—" আনন্দ উদ্ভাসিত মুখে সামান্য কুঁকে ভাস্কর স্যার উমাপতির সঙ্গে করমর্দন করে সোফায় বসলেন দুজনে। আত্মপ্রসাদে চোখ দুটো চিক চিক করে উঠলো ভাস্করের। শরীর বিছিয়ে উমাপতি বললেন,

"বাবা আসতে পারলেন না শেষ পর্যন্ত—?"

"না। এ্যাসেম্ব্লির মিটিং শেষ না হওয়া পর্যন্ত—" জিভে মিহি শব্দ তুলে ভাস্কর বাবার না আসার আফসোস জানালেন। ভাস্করের সঙ্গে গলা মিলিয়ে এই আফসোস জানালেন আরো অনেকে।

হ্যান. উইলিয়াম জেম্স কার্বের চীফ এনজিনীয়ার ভাস্কর মুখার্জির উৎসব মুখর ড্রইংরুম। বিকেল পাঁচটা। কলকাতার ওপর তলার প্রায় সকলেই উপস্থিত। ড্রইংরুম অলংকৃত করে যাঁরা বসেছেন, বয়সে তাঁরা প্রায় প্রবীণ। সেই হিসেবে ভাস্কর মুখার্জি তাঁদের হাঁটুর বয়সী। এখনো ত্রিশ পেরোয়নি। কিন্তু মর্যাদায় সমান। বাড়ি, গাড়ি, প্রতিপত্তি, সামাজিক প্রতিষ্ঠা সব উঁচুদরের। ভাস্কর সার্থক পুরুষ। পিতৃকুল, মাতৃকুল এবং শ্বশুরকুল তিনটি কুলই কুলীন। সাধারণের অনেক ঊর্দ্ধে। ভারতের কর্ণধার এক একজন। অনভিভিরিলেই গৌরবের এই যে উচ্চাসনে ভাস্কর সুপ্রতিষ্ঠিত, এর জন্য ওকে কোনো ক্লেশ বা শ্রম বা অমানুষিক-তপস্যা কিছুই করতে হয় নি। সৌভাগ্য যেন হাতে ধরে ওকে এনে দুর্লভ আসনে বসিয়েছে।

আই. এস্ সি. পড়তে পড়তেই জার্মানী যাত্রা। মামা সেখানে নামী একটা কারখানার এনজিনীয়ার। বছর পাঁচেক পরে জার্মানী থেকেই ভাস্কর চাকরী নিয়ে বিদেশেই এই কাজে যোগ দিয়েছেন। তারপর তো সাতটা বছরও শেষ হলো না চীফ এনজিনীয়ার হয়ে। আজকের উৎসব ওঁর পদোন্নতির উৎসব।

ড্রইংরুমের পশ্চিম দিকে বসেছিলেন মহিলারা। গোধূলির আলোয় তাঁদের শরীর ও বিচিত্র বর্ণের পোষাক আরো রমণীয় দেখাচ্ছিলো। গল্পে সবাই মশগুল এবং খুশি। অন্ততঃ তাঁদের দেখে তাই মনে হচ্ছিলো। মোহিনী মিলি অলোক গুচ্ছ দুলিয়ে সেখানে একপাক দিয়ে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

"কৈ, মিঃ বাসু তো—"

চোখের ইসারায় স্ত্রীকে থামিয়ে পাইপ থেকে এক ঝলক ধোঁয়া ছাড়লেন ভাস্কর, "এক্সকিউজ মী ফর এ মিনিট—"সুস্মিত মুখে অভ্যাগতদের দিকে কথা কটি ছুঁড়ে ড্রইংরুমের পাশের ঘরে ঢুকলেন। মিলি অনুগামিনী হলেন।

"অরুণেশের জন্য এত উতলা হয়েছো কেন? ও আসবে তাকে মানায় না—"

"তার মানে?" স্বামীর কপালের আঁচড়, ঠোঁটের প্রখর ভঙ্গি ও মুখের গাম্ভীর্যকে আমল দিলেন না মিলি। কণ্ঠস্বরে কাঁঝ ছড়িয়ে চোখ পাকালেন.

"তুমি তাঁকে নেমন্তন্ন করোনি?···

"না, মানে, গিয়েছিলাম তো···তবে—"

"আসতে বলোনি···কী কাণ্ড···" প্রায় গালে হাত দেবার মতো মিলির মুখের চেহারা। "····এদিকে আমি

পিকুদিকে বলেছি মিঃ বাসু তোমার বিশেষ বন্ধু···তবু পিকুদি নয়, আমাদের ক্লাবের মহিলারা সকলেই অরুণেশ বাসুকে দেখতে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব—তুমি তো জানোনা বাসুর বইয়ের এডিশন মাসে দুবার করে হয়···" হঠাৎ হো হো করে খুব জোরে হেসে ফেললেন ভাস্কর। মজার কথা শুনলে মানুষ যেমন করে হাসে তেমনি কিন্তু মিলিকে বাক্যে গায়েন করার আগেই—বিশেষ বন্ধু—কথাটা ভাস্করের হৃদয়ের কোন্ গুহ্যতে ঝংকার দিলো যেন। মুহূর্তে ভাস্কর বর্তমানের বেড়া ডিঙিয়ে বারোটা বছর পার হয়ে চলে গেলেন।·····

ছোটো একটা এক্সারসাইজের খাতা হাতের মুঠোয় গোল করে নিয়ে সেদিন ভাস্কর ঠিকানা খুঁজে খুঁজে কলেজ ম্যাগাজিনের সহকারি সম্পাদক অরুণেশের বাড়ি গিয়েছিলো। গাড়ির হর্নের শব্দে নিখিলেশ বেরিয়ে এসেছিলো এবং—'দাদা বাড়ি আছে'—বলেই ছুটে গিয়েছিলো ভেতরে। চোদ্দ বছরের নিখিলেশের বোধ হয় বাইরের ঘরটা একটু ভব্য করার ইচ্ছে হয়েছিলো কিন্তু সুযোগ পায় নি। রঙীন ডুরে শাড়িখানা অরুণাপাশে বিছানোর আগেই ঘরে এসে ঢুকেছিলো ভাস্কর। —কেরোসিন কাঠের টেবিলের ওপর নানা আয়তনের বিচিত্র কাগজ ছড়ানো আর তার ভেতরে যেন ডুব দিয়েছে অরুণেশ। শুকনো স্বাস্থ্যের ভাবুক ছেলেটি।

"আরে বসো বসো—" দাদা ডাকু আর ভাস্করের পায়ের শব্দ যুগপৎ কানে এসেছিলো অরুণেশের।

"এক মিনিট ভাই···একটা মিনিট—, এই নিখিল চা নিয়ে আয়—" একমিনিট নয়, দশ মিনিট পরে চোখ তুলেছিলো অরুণেশ।

লাখোপতি আদিত্য মুখার্জির একমাত্র দুলাল সেদিন অপমানিত বোধ না করে নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছিলো শুধু। ভাস্করের পরিচিত পৃথিবী থেকে এ ছেলেটি যেন একেবারে আলাদা।

—কী এমন আছে ঐ দোমড়ানো খালি কাগজের পাতায় যা চুম্বকের মতো টেনে রেখেছে অরুণেশের চোখ দুটোকে? ···অরুণেশের চোখের দিকে তাকিয়ে তাকে বুঝবার তার মনটাকে হাতড়াবার চেষ্টা করছিলো ভাস্কর।

এক্সারসাইজের প্রথম পাতায় ও একটি কবিতা লিখে নিয়ে এসেছিলো। কবিতার নাম শিল্প। বড় বড় অনেক তমকালো শব্দ ছিলো তাতে। অরুণেশ কবিতার নাম নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি রকম প্রশংসা করেছিলো। পরে বুঝেছিলো ভাস্কর কবিতাটা কবিতাই হয় নি। সেদিন ভাস্করের আগ্রহে ও অনুরোধে অরুণেশকে খালি কাগজের রচনাটা পড়ে শোনাতে হয়েছিলো। একটি কবিতা। অরুণেশের লেখা। —বৃষ্টিতে ছোগলার বেড়ার ওপর ছোটো একটি চড়ুই—। কবিতাটি ষোলো বছরের ভাস্করের এত ভাল লেগেছিলো, ও রোমাঞ্চিত হয়েছিলো। এমন সজীব কবিতা যেন ও আর কখনো শোনেনি। ····ছোগলার ভিজে বেড়ার ওপর ছোট্ট চড়ুইর বাচনাবাচি ভাস্কর দেখতে পেলো। তার ডানা ঝাপটানোর উল্লাস কিচিমিচি আনন্দ গান যেন শুনতে পেলো, যেন বৃষ্টির ভারা পক্ষ চড়ুইর শরীর থেকে ভাস্করের নাকে এসে আছড়ে পড়লো। ভাস্করের জীবনে সেদিন একটি স্মরণীয় দিন। অভিভূত ভাস্কর বিস্ফারিত বিস্ময়ে নির্নিমেষ অরুণেশের সরু সরু আঙুলের দিকে তাকিয়েছিলো।

তারপর আলাপ ঘন হলো। বিকেলে অরুণেশের বাড়ি যাওয়াটা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ালো ভাস্করের কাছে। সাত আট মাস আনাগোনা করেছিলো ভাস্কর। দীর্ঘ একটি কবিতা লিখে সহপাঠীদের কাছে অনেক প্রশংসা কুড়িয়েছিলো। 'মুখার্জি ম্যানসন' এর পশ্চিম কোনার বুড়ো বাদাম গাছকে নিয়ে লিখেছিলো। অরুণেশ জুগিয়েছিলো উপকরণ ও প্রেরণা।

আদিত্য মুখার্জি পুত্রের মতিগতিতে বিশেষ ভাবিত হয়েছিলেন। —সাহিত্যে টাহিত্যে কোকা মানেই ক্যারিয়ারের গুবলেট খাওয়া। ভাস্করের যাতায়াতের হাল হদিস পেয়েছিলেন ড্রাইভারের কাছে। ড্রাইভারের দোষ নেই। টিনের চাল ছাওয়া বাড়িতে খোকাদাদাবাবু ঘন্টার পর ঘন্টা কাটাচ্ছে, কেমন যেন এক ধরণের হীনতা সে অনুভব করতো। ···না। আদিত্য বিলম্ব করেন

নি। ভাস্করের আই. এস্‌সি. পড়ার ব্যাপারেই ডালকের পরামর্শ মতো জার্মানীতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।—

স্ত্রীর কণ্ঠস্বরের ঝাপটায় বর্তমানে ফিরে এলেন ভাস্কর।

"কী আবার বলবে—"পাইপ নাড়িয়ে ভাস্কর খানিকটা উদাস হাসি হাসলেন,.....'বলে দাও, অরুণেশ অসুস্থ—"

ভুরু কুঁচকালেন মিলি। বেতে বেতে ঘাড় ফিরিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে গেলেন, স্বামী অরুণেশকে আদৌ নেমন্তন্ন করছেন কিনা।

উৎসব ভাঙলো সাড়ম্বরে। হোটেলে অর্ডার দেয়া ছিলো। উর্দিপরা বয়রা ঘুরে ঘুরে আহার্য ও পানীয় পরিবেশন করলো। পরম পরিতোষের হাসি দামান্ত বিরতির পর পরই ডুইংরুমের চার-দেয়ালে ছড়িয়ে পড়ছিলো। ভাস্কর মুখার্জির কিছু ভালো লাগছিলো না। এই প্রথম এ সব ক্লান্তিকর লাগছিলো। উৎসবী হাসি, শোভন কথাবার্তা, সরব স্তুতি সব যেন আজ চকচকা গতানুগতিক মনে হচ্ছিলো। মিলিকে ফাঁকা মনে হচ্ছিলো। আড়ুরে আড়ুরে খুকীপনার পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে মিলি—এইসব বাজে কথা মনে হচ্ছিলো। ক্রমশঃ কথা বলার ও শোনার আগ্রহ একেবারে কমে আসছিলো। শুধু ঠোঁটের কোনে সার্থক হাসির আভাস ভাস্কর বজায় রেখেছিলেন আপাগোড়া।

কিছু পরে বয় মুখ খোলা একটা খাম দিয়ে গেলো। ভেতরে অরুণেশের চিঠি।—ভাই ভাস্কর, রাগ করিসনে। আজকের আসরে যোগ দিয়ে ভাল মন্দ খেয়ে আসব তেমন ভাগ্য করিনি। কাবুলিওয়ালার মতো সম্পাদক মশায়ের মুণ্ড দোর গড়ায় দাঁড়িয়ে। রচনাটা আজকেই পাবেন কথা আদায় করে নিয়েছিলেন। আর কি ছাড়েন? শিগগির আসছি একদিন।—অরুণেশ। চিঠিটা দলা পাকিয়ে ফেলে দিলেন ভাস্কর।

এখন সাড়ে আটটা। ভাস্কর আজ আর গেলেন না ক্লাবে। একটা ভার ভার ঔদাসীন্য ঘিরে ধরেছে। সব আনন্দ চাপা দিয়ে যেন অস্বস্তিকর একটা অস্বস্তি পীড়ন করছে স্নায়ুগুলোকে। সূর্তি টুর্তি কিছু ভাল লাগছে না।.....

উৎসব মাৎ করলেন মিলি একাই। যেন কথার আর হাসির ফোয়ারা খুলে দিয়েছিলেন মিলি। হাসে-লাস্যে চটকের ওপরে সেই কুমারী বয়েসের আকর্ষণীয়া করে তুলেছিলেন নিজেকে।

"বা—ই....." শূন্যে হাত নেড়ে স্বামীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দলবলের সঙ্গে বড়গাড়ি নিয়ে চলে গেলেন মিলি। ছোটো গাড়িটা সুন্দর সিং এখনো গ্যারেজে ঢোকায়নি। প্রভুর আদেশের অপেক্ষায় আছে।

বীর মন্থর পায়ে ভাস্কর পাইচারি করছিলেন ড্রইংরুমের পাশের বড় ড্রয়িংরুমটায়। চারপাশে ভালবাসার সামগ্রী সাজানো। কলমলে খুশি নিয়ে কিউরিওগুলি যেন শিল্প আর সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। পৃথিবীর নানা জায়গায় বিখ্যাত শিল্পিদ এ ঘরের চারদেয়ালে। ভাস্কর একটু তাকালেন। চার পাঁচ মুহূর্তের বেশী নয়। তিনটি জমকালো উৎসব হয় এ বাড়িতে। মুখার্জী দম্পতির বার্থডে ও এ্যানিভারসারিতে যোগ দিয়ে অনেকে নিজেদের ধন্য মনে করেন। মায়নার বড় একটা অঙ্ক ব্যয় করে উপহার কিনে আনেন। উজ্জ্বলিত ঐশ্বর্যে আরো যোগ হয়। ভাস্কর পেতলের বিরাট বুদ্ধমূর্তির কারুকার্যের দিকে তাকালেন। কে এটি উপহার দিয়েছে স্মরণে আনবার চেষ্টা করে ছেড়ে দিলেন। ধীরে ধীরে দক্ষিণ দিকের জানলার পাশে এসে দাঁড়ালেন।

টেনিদ্‌লনের চারপাশে বিচিত্র বর্ণাঢ্য রঙের ঘরগুলি ফুলের কেয়ারি। দেখলেন কি দেখলেন না, সরে এলেন সেখান থেকে। একটা ধমকা বাতাসে জানলার পর্দাটা দুলে উঠল। জানলার গ্রীলের রঙের সঙ্গে পর্দার রং অবিকল ভাবে এক। 'ভাস্কর মঞ্জিল' শেষ হবার পর দিল্লী থেকে অভিজ্ঞ ডেকোরেটার এসে ঘর দুয়ার সাজিয়ে দিয়ে গেছে। তার পেশাই এই। ধনীদের বাড়ী রুচি সম্মত ভাবে সাজানো। ভাস্করের চোখে এসব দাগ কাটলোনা।

লাইব্রেরী-রুম পার হয়ে শোবার ঘরে এলেন। তারপর বাথের দরজা দিয়ে মিলির শোবার ঘরে। বিছানার কোন ঘেঁষা টিপয়ের ওপর ফুল-সমেত ভাসটি চোখে

পড়ার মতো। ফুল সাজানোর সুবিধার জন্যে বটে। আবছা-টাবিলাম্পগুলির ডায়লেট্ট সুলিনের আলিঙ্গনে ধরা দিয়ে যেন মিটি মিটি হাসছে। সুলিনগুলিও অর্ধ-স্ফুট। ঠিক এমনি ভাস্ ভাস্করের বিছানার পাশেও আছে। প্রতিদিন ভোরে বুড়িগুলি ঝলমলে সুপ্রভাত জানায় ভাস্কর-মনজিলের মিষ্টার-রিসেপকে। ফুলের কারুকার্য এক একদিন এক এক রকম।

"প্রান্তিক ভাস্কর ভ্রুকুটি করে নিজের ঘরে এলেন। বেল টিপে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জলের আদেশ দিলেন বন্ধুকে। খাটের বাজুতে ঘাড় এলিয়ে দিয়ে বসলেন। বন্ধু বালকরাম বিস্মিত হলো। এমনি সাদা জল কখনো তো খাননা সাহেব! রঙীন পানীয় নাহলে লাইট টি। এ অভ্যাসের ব্যতিক্রম কখনো ঘটেনি। পানের মাত্রা বোধ হয় খুবই বেশী হয়ে গেছে আজ অন্যদিন বালক রামই প্রভুকে পানীয় পরিবেশন করে। আজ হোটেলের লোক করেছে। পরিমানটা জানা নেই বালকরামের। ইতস্ততঃ করে ফ্রীজ থেকে কনকনে একগ্লাস জল নিয়ে এলো। জলটা নিঃশেষ করে, বিসেপ ফিরলে ডিনার খাবেন জানিয়ে শুয়ে পড়লেন ভাস্কর।

—পাঁচমিনিটে আর কতটুকু বোঝা যায়?—

ভাস্কর বালিশে বাঁ গাল চেপে ক্লান্ত হলেন।

কাকুলিয়া লেনের একতলা বাড়ির বাইরের ঘরটায় পাঁচমিনিট ছিলেন ভাস্কর···। এক আকাশ সৌভাগ্যের মালিক ভাস্কর বসু পবিত্র পা ফেলে ফেলে ঢুকেছিলেন কী?—তুচ্ছ করতে কী চেয়েছিলেন একতলা বাড়িটার সঙ্গে তার অধিবাসীকে?···

ভাস্কর পাশ বদল করলেন।

সেদিন ভাস্করের নির্বাক দৃষ্টিবাণ উজ্জ্বল ঝকঝকে একটি মানুষের মুখের ওপর এসে থমকে গেছিলো। সে এখন রোগা না মোটা চোখে পড়েনি। কালো কি ফরসা তাও না। চোখে পড়েছিলো মানুষটির চোখের দীপ্তি আর দুটো ঠোঁটের আত্মপ্রত্যয়ের দৃঢ় ব্যঞ্জনা। মানুষটি একটি মাঝারি আকারের টেবিলের সামনে বসে মন ডুবিয়ে অত্যন্ত দ্রুত কী যেন লিখছিলো। ঘরে অনেক লোক। অনেক জন। দেখে মনে হলো ওরা সব ছাত্র। আনন্দ আর হল্লা যেন ওদের মুখে মাখামাখি। যেন ওরা অরুণেশের ভালবাসার সামগ্রী। যেন ওরা অরুণেশের খুশির ফসল। যেন জীবনের তাপ ছড়িয়ে আছে কাকুলিয়া লেনের ঘরটার সর্বত্র। খুব অবাক লেগেছিলো ভাস্করের।

মুহূর্তে ঘরের দৃশ্যপট বদলেছিলো। কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়েই ছাত্রেরা বিদায় নিয়েছিলো অরুণেশ উঠে দাঁড়িয়ে মহাসমাদরে ভাস্করকে চেয়ারে বসিয়েছিলো। উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠেছিলো অরুণেশের চোখমুখ। হৈ-চৈ করে হাঁক ডাক লাগিয়েছিলো,

"রুচি···! মিগগির দেখে যাও—"

"কলমের কালি ছুরিয়েছে বুঝি—" দ্রুতপায়ে ঢুকলো মেয়েটি। মহিলা না বলে মেয়েটি বলতেই ইচ্ছে করে। দীঘল-উজ্জ্বল-মায়াবী-চোখের মেয়েটি। স্নিগ্ধ সুষমায় শ্যামল মুখখানি খুব কোমল। অরুণেশ বললো, "দেখো কে এসেছে—। আমার বন্ধু ভাস্কর·····ভাস্কর মুখার্জি। চা আর খাবার বানাতে বলে এসো মিগ্‌গির—" মুহূর্তে ভুলে নমস্কারের ফাঁকে সানন্দ কৌতূহলে চোখ বড় করলো রুচি। ভাস্করের মনে হলো চকিতে ওর আপাদমস্তক বুঝি জরীপ করে নিলো মেয়েটি।

"আর বসার জো নেই—" কথায় ব্যস্ততার টান এনে চা খাবারের কথা এক কথায় কেটে ভাস্কর উঠে পড়লেন। নিমন্ত্রণ জানালেন অরুণেশকে। রুচিকেও। রুচি মিষ্টি হেসে মাথা নেড়ে নিলো।

"আপনার বন্ধুটি আমার কোথায় বেড়ানোর জো রেখেছেন নাকি? ওঁর লেখা নকল করতে করতে প্রাণটা আমার গেলো—রচনাটি কালকেই চাই অথচ তার অর্ধেকও—" মুখে অসন্তোষ ভঙ্গি ফোটালো রুচি কিন্তু অরুণেশের রচনা নকল করার গোপন গর্বটা রুচির কণ্ঠস্বরে বড্ড স্পষ্ট প্রকাশ পেলো।

"আহা, সেই সর্তেই তো আমার বিয়ে করা—"

"সেই সর্তে?···" স্বামীর সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে রুচি মুখচোরা ভাবে হেসে উঠলো। ভাস্করের দিকে দুচোখ সম্পূর্ণ করে মেলে দিয়ে তাকালো,

—"আপনার বন্ধু যখন কী পদার্থের জানেনই তো—"

ভাস্কর চুপচাপ দেখছে। রুচির রাশটানা বেশবাস ও গন্ধ স্নাইতা কি মুগ্ধ করলো ওকে ?

"রুচি, কাল বিকেল পাঁচটায় ভাস্করের বাড়ি যেতে হবে···মনে রেখো, তুলোন ক্রত প্রসঙ্গ পাল্টানোর চেষ্টাতে অরুণেশ নিজের অপদার্থতা আরো প্রমাণ করালো, "বোধা ভাষা কাপড় আছে তো—?"

"আছে, আছে···সব আছে—" মায়াবী চোখের মেয়েটি ঝরণার মতো ঝর ঝর করে হেসে ফেললো। সেদিকে তাকিয়ে ভাস্কর মুখার্জির, যাঁর ভাগ্যের ঘট পূর্ণ, যে লাখের মধ্যে এক ব্যতিক্রম, তাঁর বুকের কোথায় একটা টান পড়লো। সমস্তটা পথ অচেনা একটা দুঃখ বোধ গ্রাস করে রইলো তাঁকে। অত্যন্ত কষ্টের সঙ্গে ভাস্করের মনে হলো অরুণেশের জীবনে যে নিরুদ্বেগ প্রশান্তি আছে যা জীবনকে সুখী করেছে সুন্দর করেছে তার স্বাদ ভাস্কর কোনদিন পাননি।

বিছানা ছেড়ে ভাস্কর উঠলেন। ইতস্তত: পা ফেলে এগিয়ে এলেন বারান্দায়। তাকিয়ে রইলেন সামনের দিকে। সবই যেন ছবির মতো শ্বাসরুদ্ধ মনে হচ্ছে। দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপ হাতে নিলেন। ধোঁয়া ভাল লাগছেনা। কটু, বিস্বাদ। বিচলিত ভাস্কর সতর্ক দৃষ্টি ভাসালেন বিক্ষিপ্ত মনটার দিকে।

—অতীত স্মৃতিকে রোমন্থন করার ইচ্ছের পেয়ে বসলো কেন ? বারে বারে মনটাকে ছুঁতে চাইছে যুবক বয়েসের সেই উদ্দাম অনুভূতি।

এক একটা স্মৃতির পরমায়ু বড় অদ্ভুত তো !···

'মুখার্জি ম্যানসনে'র পশ্চিম কোণে ঝড়ে-জলে-রুদ্ধ রে বাদাম গাছটা ধীরে ধীরে যেমন বড় হয়েছিলো, ভাস্করের খাতার পাতায় তেমনি ধীরে ধীরে আকার নিয়েছিলো বাদাম গাছটা। জন্ম, শৈশব, কৈশোর তারপর অনেকগুলি বছর পেরিয়ে পরিণত হয়েছিলো যৌবনে। সেই সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছিলো অরুণেশ। যেন ভাস্করের একটি নতুন সত্তাকে জাগিয়ে দিয়েছিলো। তখন অরুণেশের খুব কাছের মানুষ হয়েছিলো ভাস্কর। একটা নতুন ধরণের সুখ বুকের ভেতর যেন খেলা করতো তখন। সেই আনন্দ-অনুভূতি ভাস্কর কোনদিন বোঝাতে পারবেনা কাউকে।

...আশ্বিনের এক ঝলক হাওয়া গায়ে কাঁপন দিলো। ভাস্কর কেঁপে উঠলেন একটু।···

ছোটো গাড়িটার ওপর চোখ গেলো। খানিকক্ষণ পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন গাড়িটার দিকে। যেন নিষ্প্রাণ অস্তিত্ব নিয়ে একটা ধরা পাখি পড়ে আছে। কপালের দুপাশের শিরাগুলো কাঁপতে লাগলো। ভাস্কর ঘুরে দাঁড়ালেন গ্রীলে পিঠ ঠেকিয়ে। নিবিষ্ট চোখে তাকিয়ে রইলেন ভাস্কর-ম্যানসনের দিকে। বাড়িটাকে মনে হচ্ছে যেন ছায়াছবির বাড়ি। যেন অলীক। যেন একটু পরে মিলিয়ে যাবে।···এ বোধ আজ নতুন নয়। এর আগেও যাকে মাঝে মনে হয়েছে। তখন বাড়ি গাড়ি সব কিছু অচেনা মনে হয়। যেন কিছু নিজের নয়। যেন সব কিছুই মস্ত একটা ভেতি। তখন বুকের তলায় একটা বোবা ব্যথা ঢেউ তোলে, নিজেকে মনে হয় যেন হারিয়ে গেছেন। যেন জীবন থেকে সব উৎসাহ উদ্দীপনা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে তাঁর। যেন তিনি মানুষ নন। শুধু একটা যন্ত্র। যেন ভাস্কর মুখার্জির সত্তার টুটি চেপে ধরেছে মস্ত বড় একটা কারসাজি। সেই দুঃস্বপ্নের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্ত ভাস্করের ফুসফুসের বাতাস ছটফটিয়ে ওঠে তখন।

জোরে জোরে শ্বাস নিলেন ভাস্কর। অশান্ত আঙুল দিয়ে দপদপে কপালের রগ টিপে ধরলেন। আয়ত্ত হলেন দেয়াল ঘড়ির ন'টার ঘোষণা শুনে। জোরে হেসে গ্রীলে পিঠ ছেড়ে দিয়ে পাইপ থেকে এক ঝলক ধোঁয়া ছাড়লেন। মানুষের মন নামক যন্ত্র বানাইটাকে চ্যালেঞ্জ করার মুখেই দুরন্ত ইচ্ছেটার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে গেলেন। নিজেরও অগোচরে মনটা অরুণেশের সঙ্গে পাবার জন্ত উন্মুখ প্রতীক্ষার অপেক্ষা করে আছে। এক নিঃশ্বাস ধরকালেন।

—আজ আর যাওয়া চলেনা। হয়তো অরুণেশ এখনো ব্যস্ত···

ফেরে আসাই যাক না···

—কিন্তু রাত্রি ন'টায় কী···

—কলকাতায় রাত্রি ন'টা কিছু নয়···

বারান্দা ছেড়ে ভিতরে এলেন।

গাড়ি বার করতে বললেন সুন্দর সিংকে।

শকুন-শিল্পী

অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

পুরী গিয়েছি অনেকবার। সেবার পূজার অবকাশে পুরী না গিয়ে ওয়ালটেয়ারে গেলাম। সেখানকার শান্ত কোলাহলবিহীন পরিবেশটি ভারী ভাল লাগল। গিয়েছিলাম একাই। দু'তিন দিনের মধ্যেই সেখানে একটি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে পরিচয় হল এবং অচিরেই ঘনিষ্ঠতা জমালো। কর্তা, গিন্নী, মেয়ে এবং জামাই। কর্তা বিশ্বাসবাবু যেমন শিক্ষিত তেমনি অমায়িক। তাঁর গৃহিনী করুণাময়ী যেন সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি। তাঁদের একমাত্র সন্তান গীতা। সুশ্রী মেয়ে কিন্তু বড় ম্লান, বড় শীর্ণ। দেখলেই মনে হয় যেন কোন কঠিন অসুখে ভুগছে। তারই স্বাস্থ্যের জন্যে তাঁরা সবাই এখানে এসেছেন। সঙ্গে এসেছে গীতার স্বামী নিশীথ। একরত্তি চমৎকার ছেলে।

সুদূর প্রবাসে এই শিক্ষিত ভদ্র বাঙালী পরিবারের সংস্পর্শে এসে দিনগুলি অনাবিল আনন্দের মধ্যে দিয়ে কেটে যাচ্ছিল।

প্রতিদিন সকাল সন্ধ্যায় আমরা দল বেঁধে বেড়াতে বেরুতাম। অল্পপথ চলেই শ্রান্ত হয়ে পড়ত। তখন নিশীথ তাকে নিয়ে বালুবেলার উপর বসত। গীতা নিশীথের কাঁধে মাথা হেলিয়ে দিয়ে বিশ্রাম করত। আমরা এগিয়ে যেতাম।

•

দিন পনেরো কেটে গেছে। গীতা এরই মধ্যে অনেকখানি সজীব ও সুস্থ হয়ে উঠেছে। তার বাবা এবং মা তাঁদের কন্যার স্বাস্থ্যের উন্নতি দেখে খুবই উৎফুল্ল। নিশীথের আনন্দই সবচেয়ে বেশী। সকলেরই আশা ও বিশ্বাস, গীতা এখান থেকে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে কলকাতায় ফিরবে।

ইতিমধ্যে আর একটি লোকের সঙ্গে আমাদের আলাপ হয়েছে। লোকটি সেখানকারই বাসিন্দা। তার নাম জানতাম না। পরিচয়ের পর তার পেশা অনুসারে তাকে আমরা 'শিল্পী' বলে ডাকতাম। লোকটির বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। ছিপছিপে চেহারা। চোখ দুটি অসাধারণ উজ্জ্বল। নম্র মিষ্টক স্বভাব।

একটি মাদ্রাজী হোটেলে আমরা ছিলাম। শিল্পী সেই হোটেলে প্রায়ই আসতো এবং প্রায় রোজই আমাদের সঙ্গে বেড়াতে বেরুতো। তার সঙ্গে থাকতো একটি ছোট হাতা ইজেল আর ছবি আঁকার সরঞ্জামপূর্ণ চামড়ার ব্যাগ। সমুদ্রের ধারে গিয়ে কোন সুন্দর দৃশ্য দেখলেই আঁকতে বসে যেতো।

একদিন সূর্যাস্তের সময় আমরা সকলে বিস্তৃত বালুচরের এক জনবিরল জায়গায় বসে আছি এমন সময় শিল্পী তার ব্যাগ নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হল এবং কিছুদূরে গিয়ে আমাদের দিকে সুমুখ করে বসে ব্যাগ খুলে আঁকবার সরঞ্জাম বার করে ছবি আঁকতে আরম্ভ করে দিল।

বললাম, ভদ্রলোক দূরে গিয়ে বসল বোধহয়, যা আঁকছে তা আমাদের দেখাতে চায় না।

নিশীথ বললে, বোধহয় আমাদের কারুর ছবি আঁকছে। দেখছেন না, ঘন ঘন এই দিকে চাইছে।

দেখলাম, তাই বটে। শিল্পী বোধ করি আমাদেরই কারুর প্রতিকৃতি তুলির রেখায় ফুটিয়ে তুলছে।

আকাশের রং বদলাতে লাগল। সূর্যাস্তের সে কী অপূর্ব শোভা। সকলে তন্ময় চিত্তে প্রকৃতির সেই অনির্বচনীয় সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করতে লাগলাম। কারুর মুখে কোন কথা নেই।

ক্রমে সন্ধ্যা নামল। শিল্পী একসময় তার ব্যাগ-পত্র গুটিয়ে নিয়ে আমাদের অভিবাদন করে চলে গেল। একটু পরে আমরাও উঠলাম।

সন্ধ্যাসন্ধির অস্পষ্ট আলোয় গীতাকে সেদিন অপরূপ

সুন্দর দেখাচ্ছিল। সাজগোজের পরিপাটীও লক্ষ্য করবার মতো। সবচেয়ে সুন্দর দেখাচ্ছিল, তার মস্তবড় খোঁপায় শ্বেত কবরীর মালা জড়ানোর বাহার! তার মুখে চোখেও আজ যেন নতুন প্রাণের দীপ্তি

• •

খাওয়া দাওয়ার পর দোতলার প্রশস্ত বারান্দায় বসে সকলে মিলে গল্পগুজব করছি (প্রতিদিনই রাতের আহারের পর আমরা এইভাবে কিছুক্ষণ বসে আলাপ আলোচনা করি) এমন সময় নীচে দুই ব্যক্তির তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শুনে পেলাম।

একজন হোটেলওয়ালা। অপরজন? হ্যাঁ, তার কণ্ঠস্বরও আমাদের পরিচিত, সে সেই শিল্পী। দু'জনের মধ্যে যেন তুমুল বচসা চলছিল।

কিছুক্ষণ পরে হোটেলওয়ালা বিড় বিড় করে বকতে বকতে উপরে উঠে এলো।

নিশীথ উঠে দাঁড়িয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করল, হ্যাঁ মশায়! কার সঙ্গে কথা বলছিলেন? যে লোকটি ছবি আঁকে, তার সঙ্গেই কি বচসা হচ্ছিল আপনার?

হোটেলওয়ালা ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ, তার সঙ্গেই তো!

নিশীথ বললে, ভদ্রলোক কে? নাম কি! থাকেন কোথায়?

হোটেলওয়ালা বারেক সিঁড়ির দিকে চেয়ে রুষ্টকণ্ঠে বললে, কে জানে, কোথায় থাকে, কি নাম! আমরা ওকে বলি—পিশাচ:

—পিশাচ! সে আবার কি?

আমি বললাম, উনি তো একজন শিল্পী!

হোটেলওয়ালা উত্তপ্তকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, শিল্পী। বেশ পেশা বটে!

—কেন শিল্পীর পেশা তো খারাপ নয়!

হোটেলওয়ালা বললে, আরে মশায় ও তো সে রকম শিল্পী নয়। ও কেবল মরা মানুষের ছবি আঁকে। এখানে যেদিন যখনই কেউ মারা যায় সেই দিনই ও তার ছবি এঁকে মৃতের আত্মীয়দের কাছে নিয়ে যায়—বিক্রি করবার জন্যে। আর শোকগ্রস্ত আত্মীয়রাও তাদের প্রিয়জনের শেষ ছবি চড়া দামে কিনে নেয়। লোকে বলে, মারা মারা যায় ও তাদের ছবি আগে থাকতেই এঁকে রাখে। কে মরবে না মরবে, ও যেন তাদের দেখেই ঠিক বুঝতে পারে। শকুনির দৃষ্টির মতো ওর লক্ষ্য কোনদিন ব্যর্থ হয় না।

তার কথা শুনে সকলেই চকিত হয়ে উঠলাম। করুণাময়ী আর্তনাদ করে উঠলেন। তাঁর কোলের উপর মীতা মূর্ছিত হয়ে এলিয়ে পড়েছে।

নিশীথ ঝড়ের বেগে নীচে নেমে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমিও।

শিল্পী তখন হোটেলের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

নিশীথ এক হাতে তার একটা কাঁধ চেপে ধরল। আর এক হাতে তার চামড়ার ব্যাগটা টেনে নেবার চেষ্টা করল।

শিল্পী তার ব্যাগ ছাড়বে না। নিশীথও তার ব্যাগ না কেড়ে নিয়ে ছাড়বে না। ভীষণ ধস্তাধস্তি লেগে গেল।

আমি তো বিমূঢ়! নিশীথকে সাহায্য করবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু নিশীথ তখন যেন ক্ষেপে গেছে।

টানাটানিতে ব্যাগের মুখটা খুলে গিয়ে ভিতরকার জিনিষপত্র চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

সহসা সভয়ে সবিস্ময়ে দেখলাম, ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কাগজ-পত্রের মধ্যে একখানি লম্বা চওড়া কাগজের উপর একটি তরুণীর মুখ আঁকা। মীতার মুখের মতোই সে মুখ, একেবারে অবিকল। চোখ দুটি মুদ্রিত। মাথায় মস্ত খোঁপায় শ্বেত কবরীর মালা জড়ানো।

• এই শতাব্দীর দ্বিতীয় তৃতীয় দশকে কন্‌স্টিনেন্টাল সাহিত্য সারা বিশ্বে তার দুর্দমনীয় প্রভাব বিস্তার করেছিল। বুর্গোশ্রান্ত লেখক জ্যান নিরুদা সেই সময় কয়েকটি ছোট গল্প লিখে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর 'দি ভ্যাম্পায়ার' নামক গল্পটি 'বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প' সংকলনে স্থান পেয়েছিল। 'শকুন-শিল্পী' দি ভ্যাম্পায়ার-এর ভাব অবলম্বনে রচিত।

5%=25.64%

দেখুন কী ভাবে

সাত বছরের জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেটে (দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইস্যু) **এই আয় করা যায়**

	15,000	30,000	50,000	70,000 টাকা
করমুক্ত ও তার উপরে শতকরা পাঁচ ভাগ আয় করযোগ্য হারের নিম্নতর শ্রেণিতে যাঁরা	5.95%		12.73%	25.64%

করমুক্ত জাতীয় সঞ্চয় সার্টিফিকেটে বিনিয়োগ করুন

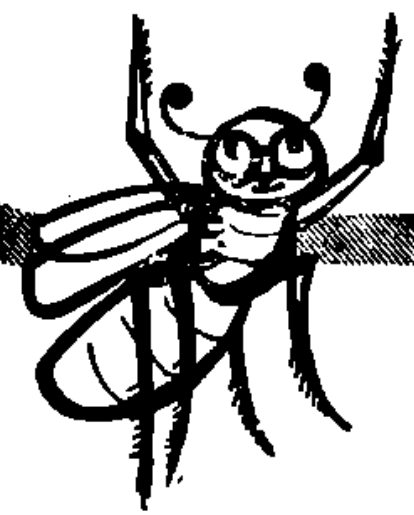

জাতীয় সঞ্চয় সংস্থা
ভারত সরকার

ভারতবর্ষ

উৎপল চক্রবর্তী

আবছা অন্ধকারে মূর্তিটিকে দেখে আমি চমকে উঠলুম।

অবিশ্বাস্য, প্রায় অবাস্তব দৃশ্য বলে মনে হচ্ছে! সেই ভদ্রলোক এই অন্ধকারে গঙ্গার পাড়ে নির্জন এক জায়গায় এমন ধ্যানস্থ রয়েছেন এটা ভাবাই যায় না। কৌতূহলী পায়ে আর একটু কাছে গেলাম। গঙ্গার দিকে মুখ করে স্থির শান্ত এক অকম্পিত মূর্তি, ভাঁজে ভাঁজে চাদরটি তাঁর সমস্ত শরীরকে এক অপার্থিব অবয়ব দান করেছে।

কিন্তু তা কি করে সম্ভব। মিস্টার ব্যানার্জীর মতো অমন উগ্রসাহেবী মানুষ এই গঙ্গার তীরে ধ্যানমগ্ন হল কি করে! একটু দূরে হরিনাম কীর্তনের অবিশ্রাম ধ্বনি উঠছে। আরো দূরে কোথাও শাঁখ ঘণ্টার বিলম্বিত লয়। সম্মুখে অনন্ত গঙ্গা। সমস্ত পরিপ্রেক্ষিতের মাঝখানে আশ্চর্য অবিভাজ্য অংশের মতো তাঁর মূর্তিটিকে লাগছে বটে, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে মিস্টার ব্যানার্জীর মুখ মনে পড়তেই ছবিটা কেমন বেমানান ঠেকছে।

খুব কাছাকাছি গিয়েও ফিরে আসতে হলো। যদি তিনি না হন, তবে এমন তন্ময়তা ভেঙে দিলে হয়ত ক্রুদ্ধ হবেন এবং এই পবিত্র সন্ধ্যার ধ্যানে আমার কর্কশ সন্দেহ আমারই ক্ষতি করবে।

ফিরে এলাম। মিস্টার ব্যানার্জীর অভাব আমার সঙ্গে এল।

স্পষ্ট মনে পড়ছে, আমাদের ট্রেনিং কলেজে উনিই ছিলেন সরকার নিয়োজিত চিকিৎসক। সপ্তাহে একদিন স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের ক্লাশ নিতেন। হোষ্টেলে এসে আমাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যেতেন। দামী স্যুট টাই, কোট, সুদৃশ্য চকচকে চুল আর দাঁতের ডগায় আটকানো পাইপের এই পুরো সাহেবী মানুষটি তখন আমাদের ভবিষ্যৎ স্বপ্নের এক মূর্তরূপ, আমাদের বিস্ময় সম্ভ্রম কেড়ে নিয়ে তিনি দামী সুতোর আওয়াজ তুলে চলে যেতেন দূরে! মনে হতো, আমাদের পরিচিত পৃথিবীর বাইরে।

শুনেছিলাম, মিস্টার ব্যানার্জীর পরিবারটিও এই শহরের এক ব্যতিক্রমের ছবি। চারদিকের মধ্যবিত্ত জলাভূমির উপরে এক অগম্য রহস্যময় দ্বীপের মতো তাঁর বাড়িটি। সেখানে তাঁর গাউন পরা মেমের কোমল আঙুলে পিয়ানোর টুংটাং ওঠে বিকেলে। অত্যন্ত স্মার্ট সুশোভিত দুজন তরুণ টেনিস খেলে সামনের লনে।

মিস্টার ব্যানার্জীর পাইপটি ঠিকই আটকে থাকে দাঁতের ডগায়। নেকড়ের মতো একটা অ্যালশেসিয়ান চেনে বেঁধে তিনি বৈকালিক ভ্রমণে বের হন।

এই শহরের নদীর ধারে যে বাঁধ রোড, সেখানে সারা দিনের প্রমক্লান্ত মানুষেরা কিছু মুক্ত হাওয়ার ফুসফুসের শুশ্রূষার জন্য প্রতিদিন বিকেলে আসেন, মিস্টার ব্যানার্জী সেখানে যেতে থাকেন না। শহরের শেষপ্রান্তে যেখানে সিভিল সার্জেনের কোয়ার্টার আছে সেদিকে চলে যান। লোকে বলে, কোয়ার্টারটি তিনি দেখতে যান ওখানেই বসবাস করার ইচ্ছে তাঁর প্রবল। এবং তা এখনই সম্ভব হচ্ছে না বলে মিস্টার ব্যানার্জীর মেজাজটাও অমন রুক্ষ। ইংরেজীতেই প্রায় সব কথা বলেন এবং কথা খুবই কম বলেন। কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলে তাচ্ছিল্য ও বিরক্তিতে তাঁর ভ্রূ স্থানচ্যুত হয়। আমাদের অধ্যক্ষ অধ্যাপকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ও তা কোমল হয় না। মিসেস ব্যানার্জীর মুখ আমার মনে পড়ছে না। শুধু একটা ধূসর রঙের দ্রুতগামী অ্যামব্যাসাডর, বব্ করা চুলের একাংশ, টকটকে রঙের মুখের সামান্য আভাস, এবং একঝলক সুন্দর গন্ধের স্মৃতি এখন মনে আছে। অনুসন্ধিৎসু সহপাঠীদের একনিষ্ঠ তদন্তে জানা গিয়েছিল ঐ গাড়ী এবং বাড়ীর মালিকই হলেন মিস্টার ব্যানার্জী। এই সব কিছু মিলিয়ে তাই মানুষটি দূর দ্বীপবাসী জীব হয়েই ছিলেন। তাঁকে

একটা চাদর গায়ে এতদিন পর হরিনাম কীর্তনের পরিমণ্ডলে ধ্যানস্থ দেখলাম, যতবার ভাবছি ততবারই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাচ্ছি। সেই হোস্টেল ছেড়ে এসেছি অনেকদিন, আজ নতুন করে সব কিছু মনে পড়ছে।

পরদিন সন্ধ্যায় তীব্র কৌতূহলী পায়ে গঙ্গার ঘাটে গেলুম। সেই ধ্যানমগ্ন মূর্তিটি প্রত্যাশিত ভাবেই চোখে পড়ল। নিঃশব্দের হবার জন্ত আমি সামান্ত দূরত্ব রেখে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালুম। হ্যাঁ, সেই চুল, সেই অবয়ব, শুধু দাঁতের ডগায় পাইপটি নেই। আরো একটু এগিয়ে মুখ তুলে গলা ঝাড়লুম। একবার। দুবার। যেন গভীর সমুদ্র থেকে উঠে এলো দুটো চোখ। আমার দিকে অপলকে তাকালেন। আমি সম্ভ্রম নমস্কারে বললুম,

—যদি কিছু মনে না করেন একটা কথা জিজ্ঞেস করবো?

উত্তর অনাবশ্যক বিবেচনা করে তিনি তাকিয়ে রইলেন। সাহস সঞ্চয় করে বললুম, —আপনিই কি মিস্টার ব্যানার্জী?

মন্দিরের ঘণ্টার মতো গম্ভীর গলায় বললেন,

—হ্যাঁ। আপনি কে?

আবিষ্কারের সাফল্যে আমি উত্তেজিত গলায় বললুম,

—আমাকে ঠিক চিনতে পারবেন না। ট্রেনিং কলেজ হোস্টেলে থাকতুম। আপনি আমাদের ডাক্তারবাবু ছিলেন।

তাঁর স্মৃতি নড়ে উঠল। ঈষৎ অন্তমনস্ক গলায় বললেন,

—তা হবে।

আমি আরো এগিয়ে বললুম,

—আর একটা কথা জিজ্ঞেস করবো।

মিস্টার ব্যানার্জী আমার দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বললেন,

—আমি জানি কি জিজ্ঞাসা করবে।

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলুম,

—হ্যাঁ, আপনাকে ঠিক এই ভাবে দেখব—

উনি থামিয়ে দেবার ভঙ্গিতে হাত তুলে বললেন,

—এখন নয়। এখানে নয়। আমার বাড়ীতে যেও।

চকিতে আমার মনে শিয়ালদার টুংটাং, অ্যালশেসিয়ান, অ্যাম্বাসাডর ভেসে উঠল। ঐ রকম বাড়ীতে আমি ঢুকতে পারো ভাবতেই যেন রোমাঞ্চ হলো। বললুম,—কোথায় বাড়ী?

আমাকে সম্পূর্ণ বিস্মিত করে উনি ডান পাশে আঙুল তুলে কিছুদূরের একটা নিঃসঙ্গ দোতলা বাড়ী দেখিয়ে বললেন,

—ঐখানে যেও। সকালের দিকে।

আমি প্রণাম করতেই চোখ বন্ধ করলেন তিনি। আমি বিস্ময়ে স্তব্ধ। এই বাড়ী! অপেক্ষা সইছিল না। পরদিনই ন'টা নাগাদ চকুল পায়ে উঠে গেলুম দোতলায়। কোন কোন ঘরে ঢুকলে যেমন একজাতীয় স্নিগ্ধতার ছায়া নেমে আসে মনে, ঘরে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই তেমন অনুভূতি আমার হলো। গঙ্গার দিকে মুখ করে একটা ইজিচেয়ারে তিনি শুয়েছিলেন। নিরাভরণ শুভ্র দেয়ালে একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি ছবি, অপরদিকে আর একজন আমার অপরিচিত ভদ্রলোকের। মেঝেতে একটি শুভ্র বিছানা। পাশে একটি ছোট আসনে পাঁচখণ্ড শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, একটি গীতা। ধূপকাঠি জ্বলছে। আমি সসম্ভ্রমে ডাকলুম, 'স্যার'! যেন প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, এমন অবায়াস ভঙ্গিতে উঠে এসে ঘরের কোনে রাখা একটি আসন এনে পেতে দিয়ে বললেন, 'বোসো।' ইজিচেয়ারটি টেনে আনলেন আমার মুখোমুখি। দাঁতের ডগায় পাইপ আটকানো মিস্টার ব্যানার্জীর মূর্তিটিকে আমি ক্রমে মিলিয়ে যেতে দেখলুম।

—আমি তোমাদের সেই শহর ছেড়ে চলে আসি একটা বিশেষ কারণে। তিনি কোন ভূমিকা না করেই বলতে শুরু করলেন,

—এখানে একটি নার্সিং হোম খুলি, প্রাইভেট প্র্যাকটিশ শুরু করি এবং একটি বিখ্যাত হাসপাতালের সঙ্গেও যুক্ত হই। তোমরা যারা আমাকে তখন দেখেছো, তারা নিশ্চয় অনুমান করতে পারবে এই জীবন আমার কাছে সুখের ছিল। আমার পরিবারের আর সকলের কাছে আকাঙ্ক্ষিতও ছিল। হোটেল, ক্লাব, পার্টি, ডিনার

ত্যাগ—আধুনিক জীবনের যা নাকি কাম্য সবই হাতের মুঠোয় ছিল। এরই মধ্যে একটা ঘটনা ঘটে গেল একদিন।

অনেক রাতে পার্টি থেকে ফিরেছি। কলিং বেল বেজে উঠল। 'কলে' যেতে হবে। বলে পাঠালুম এখন সম্ভব নয়। কিন্তু কোন আপত্তিই টিকল না। যেতে হলো। এই বাড়ীরই নীচের তলায় সেদিন রাতে আমি এসেছিলুম। ঘরের চেহারায় কোন আভিজাত্য ছিল না, কিন্তু রুগীটিকে দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। পিঠে একটি বিরাট ফোঁড়া হয়েছে, যার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়বার কথা, অথচ ভদ্রলোক অদ্ভুত এক প্রশান্তি নিয়ে বসে আছেন। আমি বুঝতে পারলুম অপারেশন করতেই হবে, কালকেই। সেকথা জানালুমও। ভদ্রলোক প্রশান্ত হেসে বললেন,

—কাল সম্ভব নয়। তিনদিন পর।

বিরক্তি গলায় এনে বললুম,

—তবে এত রাতে আমাকে ডাকলেন কেন?

যিনি ডাকতে গিয়েছিলেন তিনি শশব্যস্ত হয়ে বলে উঠলেন,

—না, না, উনি ডাকতে বলেন নি আমিই ডেকে এনেছি।

ভদ্রলোকও অপরাধী গলায় বললেন,

—ছি ছি, এই সামান্য ব্যাপারে আপনাকে কষ্ট দেওয়া হলো।

কিছু মনে করবেন না।

রাগে তখন আমি বেশ কিছুটা বিচলিত। কঠোর গলায় বললুম,

—কাল অপারেশন হবে না কেন?

ভদ্রলোক ধীর গলায় বললেন,

—কাল থেকে তিনদিন এখানে হরিনাম গান হবে।

আমি ক্রোধে তখন স্তব্ধ। ভদ্রলোক এবার সবিনয়ে বললেন,

—আপনি যদি দয়া করে আসেন।

আমি উত্তর না দিয়ে সোজা গিয়ে গাড়ীতে উঠলুম। ভদ্রলোকের সঙ্গীটি আমাকে নির্দিষ্ট ভিজিটের টাকাটি দিয়ে গেলেন।

পরদিন নানাকাজের ফাঁকে ফাঁকে ভদ্রলোকের অচঞ্চল চোখদুটো বারবার আমাকে টানছিল। সন্ধ্যেবেলায় গাড়ীর মুখ ঘুরিয়ে দিলুম সেই বাড়ীর দিকে। তেমনি প্রশান্ত, তেমনই সমাহিত, সেই ভদ্রলোক আমাকে দেখে এগিয়ে এলেন।

—আপনারই জন্ত অপেক্ষা করছি। চলুন।

কোন প্রশ্ন না করে ঘটনাটা পুরো দেখবার জন্ত ওঁর সঙ্গে উঠলুম দোতলায়। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে ওঁর কষ্ট হবার কথা কিন্তু ওঁর আচরণে কিছুই আমি বুঝতে পারলুম না।

বোধহয় অসংখ্য ধূপকাঠি জ্বালানো হয়েছিলো, তাই সুন্দর একটা গন্ধ উঠছিল ঘর থেকে। দেখলুম, মেঝের একপাশে চন্দনচর্চিত গায়ক বাদকের দল, অপরদিকে শ্রোতাদের আসন। প্যান্টের অসুবিধে সত্ত্বেও বসলুম। কোন কালেই ভক্ত নই, সঙ্গীত-রসিকও নই, মন তাই গায়ক এবং শ্রোতার দিকেই নিবদ্ধ ছিল। তবে কান খোলা ছিল বলে গায়কের কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে আমাকে সচকিত করছিল। গান শেষ হবার পর ভদ্রলোক আবার আমার কাছে এসে সবিনয়ে বললেন,

—কাল আসবেন।

আমি অস্পষ্ট সম্মতি জানিয়ে বেরিয়ে এলুম এবং পরদিন আবার গেলুম। বুঝতে পারছিলুম, ঐ পরিবেশের একটা তীব্র আকর্ষণ আছে। সেদিনও সেই আন্তরিক অভ্যর্থনা, সেই সুন্দর গন্ধ, সেই প্রাণময় কণ্ঠস্বর। গান শেষ হলে সেদিনও ভদ্রলোক বললেন,

—কাল আসবেন।

আমি সম্মোহিতের মতো নীচে নেমে এলুম। মনের মধ্যে একটা অস্থিরতা অনুভব করলুম সারাদিন। একটা অপারেশন বন্ধ রাখলুম। সন্ধ্যেতে বাড়ীতে একটা পার্টি ছিল, জরুরী অপারেশনের অছিলায় বেরিয়ে এলুম। ঐ দিন সামান্য ভুল করেছিলুম আমি।

ভদ্রলোক একটু থামলেন। আমি ব্যগ্রতা মুখে অঙ্কুর রাখলুম।

—সেদিন প্যান্টের বদলে ধুতি পরেছিলুম, আর তাতেই আমার স্ত্রীর মনে সন্দেহ হলো। তখন বুঝিনি কিছু। সেই গান, ভদ্রলোকের স্নিগ্ধ চোখে আমি তখন আবিষ্ট। সেদিনই প্রথম ঐ নামকীর্তনের আড়ালে একটা ব্যাকুলতা আছে টের পেলুম।

গানের শেষে ভদ্রলোক আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। কিন্তু আমি তার মুখের দিকে তাকাতেই চমকে গেলুম। একটা গভীর কালো ছায়া পড়েছে সেই প্রশান্তির ওপর। ভদ্রলোক বললেন,

—কাল অপারেশন করতে পারবেন?

ব্যস্ত হয়ে বললুম,

—নিশ্চয়। নার্সিং হোমে চলে আসুন।

ভদ্রলোক অন্যমনস্কের মতো বললেন,

—না। এখানেই হবে।

অসুবিধে ছিল, তবু নানা কথা ভেবে সম্মতি জানালুম, যথারীতি পরদিন সহকারীকে সঙ্গে নিয়ে তৈরী হয়ে গেলুম। বললুম,

—অজ্ঞান করতে হবে।

উনি ম্লান হেসে বললেন,

—দরকার হবে না। আমি একটু আসছি।

উপরে উঠে গেলেন। সেদিন তাঁর যন্ত্রণা চলার গতিকে মন্থর করে দিচ্ছিল। নেমে এলেন। বললেন,

—আপনার কাজ শুরু করুন।

একটি চেয়ারে বসলেন, চোখ বন্ধ করলেন। আমি বিস্মিত হাতে ছুরি তুললুম। প্রথম স্পর্শের সময় একটু কেঁপে উঠলেন। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তারপর থেকে আর একটিও যন্ত্রণার অভিব্যক্তি নয়। অপারেশনের পর ব্যাণ্ডেজ বেঁধে বললুম,

—আপনার লাগে নি?

যেন দীর্ঘ সমাধি থেকে উঠে এলেন, এমন গলায় বললেন,

—আজ্ঞে না।

সবিস্ময়ে বললুম,

—সে কি।

মৃদু হেসে বললেন,

—ওই দিক থেকে মনটাকে সরিয়ে নিয়েছিলুম। মনে যদি ব্যথা না লাগে তবে ব্যথার সাধ্যি কি আমাকে কষ্ট দেয়।

আমার দীর্ঘ ডাক্তারী জীবনে এমন কথা শুনিনি। কথাটা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক কিন্তু এর পেছনের বৈজ্ঞানিক সত্যও আমি দেখতে পাচ্ছিলুম।

আমি সেদিন ভিজিট নিতে পারলুম না। ভদ্রলোক উঠে এসে আমার হাত ধরে বললেন,

—অনেক ধন্যবাদ। আমি কৃতজ্ঞ। আবার আসবেন তো?

আমাকে যে আসতেই হবে, বেশ বুঝতে পারছিলুম। আমি তাঁকে এই প্রথম সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে সম্মতি জানালুম। এরপর আমার চার্জ গেল, পার্টি গেল, নার্সিং হোম গেল এবং বাড়ীতে তুল বোঝাবুঝি শুরু হলো। সন্ধ্যে হলেই এক দুর্বার আকর্ষণে আমি চলে যেতুম ভদ্রলোকের কাছে। এই জগত এই জীবন নিয়ে নানা কথা হতো। অ্যানাটমির বাইরে যে মানুষের সত্তা তার সন্ধান পেলুম। সম্পূর্ণ নতুন এক জগৎ আমার পুরনো পরিবেশকে ভুলিয়ে দিল।

কিন্তু যে সমস্যার শুরু হয়েছিল তা চরমে উঠল এবার। আমার স্ত্রী সন্দেহ করতে লাগলেন এবং একদিন আমার অগোচরে গাড়ী নিয়ে 'ফলো'ও করলেন। বাড়ী ফিরতেই কৈফিয়ৎ চাইলেন। আমি পুরনো মেজাজে প্রতিবাদ করতে গিয়ে সেই ভদ্রলোকের চোখ দুটো টেনে আনলুম। খুব স্বাভাবিক ঠাণ্ডা গলায় বললুম,

—ব্যাপারটা বুঝতে চাও, বোঝাতে পারি। না বুঝতে চেয়ে প্রতিবাদ করলে আমার কিছুই বলার নেই।

আমি একদিন বাড়ী ছেড়ে দিলুম, তখন দেখলুম, এখন দুকূল রক্ষা করলে আমার পারিবারিক সম্মান রক্ষা হবে না। ছেলেরা ভালো চাকরী করে, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, আমি স্বচ্ছল। চলে এলুম এই বাড়ীতে।

মিষ্টার ব্যানার্জী সামান্য থামলেন। আমি চমকে উঠে বললুম,

—বাড়ী ছেড়ে দিলেন আপনি ?

মৃদু হেসে তিনি বললেন,

—হ্যাঁ। তখন এঁর ডাক আমি শুনতে পেয়েছি। পরে অবশ্য বাড়ীর লোকেরা নিরুপায় ভেবে বিরক্ত করেনি আমাকে। কিন্তু,

একটু থেমে মিষ্টার ব্যানার্জী দেয়ালে টাঙানো সেই অপরিচিত ব্যক্তির ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন—

—উনি বাঁচলেন না বেশীদিন। যাবার আগে বলেছিলেন, যদি সত্যিই শান্তি খুঁজে না পাই, যদি সত্যিই কোন কিছুরই সন্ধান না পাই তবে যেন এখানে আর না থাকি।

মিষ্টার ব্যানার্জী ইজিচেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন। তারপর জানালার ধারে গিয়ে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে রইলেন স্তব্ধ ভঙ্গিতে। আমি উত্তেজিত গলায় বললুম,

—আপনি তার সন্ধান পেয়েছেন ? আপনি কোন জিজ্ঞাসার উত্তর পেয়েছেন ?

অনেকক্ষণ পর মন্দিরের ঘণ্টার মতো গম্ভীর উত্তর এল,

—সন্ধ্যেবেলায় গঙ্গার ধারে যেও।

আমার কৌতূহল তখন তীব্র হয়ে উঠেছে। দারুণ অস্বস্তি নিয়ে ফিরলুম। সন্ধ্যে হতে না হতেই আবার গেলুম।

সন্ধ্যে গাঢ় হয় নি। আবছা অন্ধকারে দূর থেকে দেখলুম। সেই ধ্যানস্থ মূর্তি। আমি ব্যাকুল পায়ে তার কাছে গেলুম। সশব্দ ভঙ্গীতে ডাকতে গেলুম, মিষ্টার ব্যানার্জী—

আর ঠিক তখন, দূরে কোথাও প্রবল স্বরে মন্দিরে সন্ধ্যারতির শঙ্খ ঘণ্টা বেজে উঠল। অদূরে গঙ্গার কলোচ্ছ্বাস, মন্দিরের সন্ধ্যাবন্দনার দূরাগত ধ্বনি, আর এই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর ধ্যানময় মূর্তি আমাকে স্তব্ধ করে দিলো। আমি আর এগিয়ে যেতে পারলুম না। কিছু না বলে আমি ফিরে এলুম।

কি ভাবে ডেকে ঐ মগ্নতা ভাঙাবো তাঁর। এখন কিছু জিজ্ঞাসা করা সম্পূর্ণ অনুচিত। উত্তর দেবেন কিনা সন্দেহ—

কেননা, উনিই বোধ হয় এখন উত্তর খুঁজছেন।

"আধ্যাত্মিক ও জাগতিকের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় সাধন করতে হবে, কারণ আত্মা, দেহ ও মনের ভিতর দিয়ে কার্য্য করে। কিন্তু ইউরোপ এখন যে একান্ত বুদ্ধিগ্রাহ্য বা বিশেষ জড়বাদী সভ্যতার পরিপোষক তাহাতে সে তার অন্তরে মৃত্যুর বীজ বহন করছে ; কারণ সৃষ্টির জীবন্ত লক্ষ্যই হ'ল স্বর্গরাজ্যের উপলব্ধি। যদিও শাশ্বতের প্রতিই ভারতের প্রবণতা এবং যদিও তাহা উচ্চতম আদর্শ ও সম্পূর্ণ বাস্তবধর্মী, তথাপি তার সংস্কৃতি ও দর্শন শাশ্বতের ও জগতের মধ্যে যুগ্ম-সমন্বয় সাধন করেছে এবং বাহির থেকে এ বিষয়ে তার সাহায্যের কোন প্রয়োজনই হয় নি। একই নীতি অনুসারে সমন্বয়যুক্ত সৃষ্টিতে আত্মা, মন ও দেহের পারস্পরিক নির্ভরতার রূপের যেমন প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন পবিত্র আত্মার নির্ভরতা ; কারণ ঐ রূপই আত্মার ছন্দ। এ থেকে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে ঐ রূপের গভীর অর্থে আত্মার স্বপ্রকাশে বিঘ্ন ঘটান বা তাকে চরম সঙ্কটে নিপাতিত করা। রূপের পরিবর্তন ঘটাতে পারে ও ঘটবে, কিন্তু ঐ বিশেষ রূপ পরিগ্রহণ, অন্তর থেকে বিকশিত কোন নূতন আত্মবিকাশ অথবা আত্মসৃষ্টি হতেই হবে ; উহা আত্মারই বিশিষ্টতায় পূর্ণ হওয়া চাই—উহা বৈদেশিক বা অপরের স্বভাব হতে ধার করা বস্তু হবে না।"

—শ্রীঅরবিন্দ

অতিরঞ্জিতা

সুবোধ বসু

গল্পটার মুখ্য চরিত্র তিনটি, আর ঘটনার কাল পাঁচ বছর। নায়ক নায়িকা একরকম নেই বললেই চলে।

কবি অনীশ এসেছিল "নীহারিকা" মাসিক পত্রিকার অফিসে। ছাপাবার জন্য কবিতা দিতে নয়, সম্পাদকের সঙ্গে সখ্য অব্যাহত রাখবার জন্য। উদ্দেশ্য সমাপ্ত হবার পরে কিছু লাভও হয়ে গেল। 'দাঁড়ান, দাঁড়ান', সম্পাদক হন্তদন্ত হয়ে বলে উঠলেন। 'শ্রাবণ সংখ্যায় কবিতা দুটোর জন্য সামান্য দক্ষিণা নিয়ে যান···।'

'পারিশ্রমিক?' অনীশ মুচকি হেসে বললে। 'কবিতার জন্যও!'

'আর লজ্জা দেবেন না! আপনাদের মত উদীয়মান কবিদেরও পারিশ্রমিক দিতে পারি না, এটা আমাদের লজ্জা। টাকার অঙ্কে বাঙালি পাঠকদের সাহিত্যপ্রীতির নিদর্শনও গর্ব করার মত নয়···' সম্পাদক ড্রয়ার থেকে নগদ কুড়িটা টাকা বের করে বললেন।

অনীশ তা হলে সত্যিই কবি হিসেবেই নাম করেছে, নইলে কবিতার জন্য কোনও সম্পাদকই টাকা দেয় না। ছাত্র-জীবনেই কবিতা লেখা শুরু করেছিল। পড়া সমাপ্ত করে পাঁচবছর ধরে কলেজে সাহিত্যের অধ্যাপকগিরি করছে। দশ বছরে হাজার খানেক কবিতা; তিনটে প্রশংসিত কবিতাসংগ্রহ গ্রন্থ। এদের কল্যাণে কুড়িটাকা পারিশ্রমিকের যোগ্যতা অর্জন করেছে।

রাস্তায় বেরিয়ে ভাবতে লাগল, প্রকাশকের দোকানেও একবার ঢুঁ মেরে যাবে কিনা। সাত আট মাস খোঁজ করেনি, হয়তো এতদিনে বইয়ের খরচ উঠে এসে থাকবে। লভ্যাংশ হিসেবে আরও যদি কুড়ি টাকা হাতে আসে। তাতে হয়তো আরও আট জনের কবিতা লেখার ইনস্পিরেশন এসে যেতে পারে—মনে মনে হেসে বললে অনীশ।

'কে, অনীশ না?'

আহত হয়ে ফুটপাথের মাঝখানেই দাঁড়িয়ে পড়ল অনীশ।

'কৎদিন পরে দেখা তোর সঙ্গে! ছাত্রজীবনের পর দেখা হয়েছেই বলে মনে হয় না। ফুটপাথ-ঘেঁষে-দাঁড়ানো মোটরগাড়ী থেকে নেমে লম্বা চওড়া সুদর্শন খদ্দর পরা এক যুবক কাছে এগিয়ে এলো। 'শুনেছিলাম প্রফেসারি করছিস্! ব্রিলিয়ান্ট স্কলার, তোরাই তো প্রফেসারি করবি····'

'তবে তো ব্রিলিয়ান্ট স্কলার না হওয়াই ভালো'। হেসে জবাব দিলে অনীশ।

'তা যা বলেছিস'। অনীশের বন্ধু জোরে হেসে উঠে বললে। 'ভালো ছেলে হলেই গিয়েছিলাম। চাকরিতে ঢুকে পড়তাম। পাঁচশো, হাজার, দেড় হাজার—সম্ভাবনা ঐ পর্য্যন্তই। ওদিকে সুবিধে না হওয়ায় পলিটিক্স্-এ নেমেছি। পার্টির প্রদেশ কমিটির জয়েন্ট সেক্রেটারি হয়েছি। কমল মুখার্জির বিবৃতি আর কার্য্য-কলাপের খবর ইতিমধ্যে খবরের কাগজে বের হচ্ছে, হয়তো লক্ষ্য করেছিস। এবার যদি পার্টিকে ইলেকশনে জেতাতে পারি, তবে হয়তো নিজেরও একটা সুরাহা হতে পারে···'

'কৎদিন হলো পলিটিক্স্-এ নেমেছিস্?'

'ভলান্টিয়ারীর মেয়াদটা বাদ দিলে বছর পাঁচেক হবে। তবে হ্যাঁ, পিতৃদেব সঞ্চিত অর্থের কিঞ্চিৎ ব্যয় হয়েছে। অন্যত্র যেমন, এখানেও ক্যাপিটেল একটা মস্ত সুবিধা। তারপর তোর আর কি খবর? এখনও কবিতা লিখিস?····'

'হাঁ, এই তো কুড়ি টাকা উপার্জন করে নিয়ে এলাম!' অনীশ গম্ভীরভাবে বললে।

'চল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দুটো কোকাকোলা খেয়ে নিই,' রাস্তার ধারের ঠাণ্ডা পানীয়ের স্টলের দিকে পা বাড়িয়ে কমল মুখার্জি বললে। 'আজ আর সময় নেই। গিয়ে বক্তৃতা করতে হবে। শুনেছি একটা ফটো বেরিয়েছে সাপ্তাহিক বিজলীতে। স্টল থেকে এক কপি সংগ্রহের জন্ত নেমেছিলাম···কেষ্টবিষ্টু হওয়ার জন্ত এসবও দরকার।'

কোকাকোলা পান ও সাপ্তাহিক বিজলী সংগ্রহের পর নিজের ফটো সাগ্রহে দেখতে দেখতে, এবং অনীশের কাছে একদিন সময় করে' যাবে এই আশ্বাস দিয়ে কমল মুখার্জি নিজের গাড়ীতে গিয়ে চাপল। বন্ধু কোন্ দিকে যাবে জিজ্ঞাসাও করেছিল। অনীশ বিপরীত দিক নির্দেশ করায় তাকে একাই চলে যেতে হলো।

ধনী বাবা থাকা সৌভাগ্য ; তার সঙ্গে যদি পলিটিক্স্ নেওয়া যায় তবে বড় ভিত্তিতেও আশা করা যেতে পারে, মনে মনে বললে অনীশ। ছাত্রদের চাঁই ছিল কমল মুখার্জি কলেজ জীবনে। মারামারি, ধাক্কা-ধাক্কানো, কলেজ-ইনিয়ন দখল, বিক্ষোভ সংগঠন এসবই তার ছাত্র-জীবনের তপ ছিল। দু'বার ফেল করা সত্ত্বেও এমন ছেলে উঠবে, এ আর আশ্চর্য্য কি।

'অনীশদা, চিনতে পারছেন ? আমি গুলী।'

অনীশ চমকে তাকাল। দুয়েক সেকেণ্ড দেরি হলো চিনতে, তারপর সবিস্ময়ে বললে, 'তুমি এখানে কি করে ?'

'কেন, কলকাতা কি আপনাদের একচেটিয়া !' গুলী নাচুনে ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে গুলির মত দ্রুত জবাব দিলে। 'এসেছি অনেকদিন। কিছুই খোঁজ রাখেন না, অথচ আপনাদের শহরের অন্তত আধ ডজন কাগজ এরই মধ্যে অনিন্দিতা দেবী ওরফে গুলীর ছবি ছাপিয়ে জগৎবাসীকে তার অস্তিত্বের আর কৃতিত্বের খবর দেবার চেষ্টা করছে···'

মফঃস্বল শহরে অনীশদের বাড়ীর প্রায় লাগোয়া বাড়ী গুলীদের। ধবধবে ফর্সা রং, টানা টানা নাক চোখ, পোষাক ভঙ্গি প্রভৃতির সঙ্গে মিলিয়েই বোধহয় স্কুলের ফার্সী প্রতিশব্দটি ডাক-নাম হিসেবে মনোনীত করা হয়েছিল। মুখটা একটু বোকা-বোকা, প্রকৃতিটা আমুদে, একটু গায়ে-পড়া ; ইস্কুলে ঠেকে ঠেকে কয়েক ক্লাস উঠে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল ; মা বাড়ীর কাজ করিয়ে নিতেন, কিন্তু বাসন মাজতে মাজতেও ওর গান চলত, সাজগোজ করার অভ্যাস একটুও কমেনি, সতর শ্বাসনোচ্ছ্বাস বৈশোরেই যৌবনের চাকচিক্য এনে দিয়েছিল। অনীশকে এসব সত্বরে লক্ষ্য করতে হয়েছে এই জন্ত যে, কলকাতার কলেজের মেধাবী ছাত্র অনীশের প্রতি একবার ইনি একটু বেশি রকম মনোযোগী হয়ে পড়েন। অতিকষ্টে ওর অন্তরঙ্গ হবার প্রচেষ্টা তাকে ব্যর্থ করতে হয়। কিন্তু ভাগ্যের কথা গুলীর স্বভাবটা ধলিতা ফণিনীর মত নয় ; এর ফলে কোনও বিশেষ তিক্ততার সৃষ্টি হয় নি কখনও।

'ফিল্মে নামোনি তো !' পরিহাস-তরল কণ্ঠেই প্রশ্ন করল অনীশ।

'আলবৎ নেমেছি।' আহ্লাদী খুকী তথা সিনেমার নায়িকার ভঙ্গিতে বললে গুলী। 'কিন্তু খবর রাখেন না দেখছি, অথচ অনিন্দিতার আবির্ভাবের খবর জানে না এমন কোনও আধুনিক ছেলে মেয়ে আছে তা ভাবা অসম্ভব। প্রথম থেকেই বেরোয়নি। একটা ছবি শেষ হয়েছে, শিগগিরই রিলিজ হবে ; ট্রেইলার দেখানো হচ্ছে সিনেমাগুলিতে। আরও দুটো ছবির কনট্রাক্ট হয়ে গেছে, তৃতীয়টা দু' এক দিনের মধ্যেই সই···'

'ঢুকলে কি করে ফিল্মে ? কেউ জানাশুনো আছে ?'

'মা থাকলে কখনও ঢোকা যায় ?' অনীশের অজ্ঞতায় প্রায় কৃপা বোধ করল গুলী। 'আমাদের ওখানের কাঁদারি সা'র কাঠের আর পাটের আড়ত মনে আছে ? ওর ছেলে গোপীবল্লভকেও নিশ্চয়ই দেখেছেন। সে এখন ডাকসাইটে ফিল্ম-প্রডিউসার—ওরে বাবা জরুরী সিটি, বেন ধমক···চলি অনীশদা, গোপীবল্লভের হাঁক আসছে ইলেকট্রিক হর্ণে, এবার পালাতে হবে···'

'পালাও।' পরামর্শ ও অনুমতি দিলে অনীশ।

এর পর পাঁচ বছর কেটে গেছে। অনীশ অনেক বক্তৃতা দিয়েছে ক্লাসে, আর অনেক কবিতা লিখেছে

কাগজে। আরও পাঁচটা কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য-সভায় তার কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা হয়, নামকরা সাহিত্য-সমালোচকেরা অনীশের abstract সৌন্দর্যতত্ত্বের বিশ্লেষণ করে এর অভিনবত্বের দিকে কবিতা-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে আরম্ভ করেছেন। ফলে, শিক্ষিত বাঙালীর পাঁচ শতাংশ তার নামের সঙ্গে ও ·০১ শতাংশ তার কবিতার সঙ্গে পরিচিত। জনসাধারণ অবশ্য তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই জানে না।

এত অল্প বয়সের কবি যখন একাডেমীর পুরস্কার পেয়ে গেল তার আধুনিকতম কাব্য-সংকলনের জন্য, তখন বুড়ো কবিরা যেমন অসন্তুষ্ট, ছোকরা-কবিরা তেমন উৎসাহিত হয়ে উঠল। দু'চার জায়গায় অনীশকে ডেকে অভিনন্দন দেওয়া হলো, দু'চারটা দামি ফাউন্টেনপেন এবং তত-দামি নয় হাত ঘড়ি পাওয়া গেল। খুবই কৌতুক বোধ করল অনীশ। মাত্র দশ বছর দিন রাত খেটে, স্বপ্ন দেখে, তাচ্ছিল্য উপেক্ষা করে ব্যর্থতা হজম করেই এতটা সৌভাগ্য ক'জন লেখকের হয়? এ জন্যই বোধ হয় তার নগদ পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার পাওয়াটা কলকাতার সাহিত্যিক মহলে এতটা আলোড়ন জাগিয়েছে। অনীশ সিদ্ধান্ত করল, টাকাটা পেলেই সে ভালো দেখে এক জোড়া জুতো কিনবে।

আমন্ত্রণ এসেছিল বেশ কয়েক মাস পরে। পুরস্কার বিতরণী সভায় হাজির হবার জন্য। অনীশ ঠিক করেছিল যাবে না, গরহাজিরা পুরস্কার লাভ করবে। কিন্তু বন্ধুরা চটে গেল। এ রকম তাচ্ছিল্য দেখাবার মানেটা কি? পুরস্কারে তার লোভ নেই? মিথ্যে কথা। সে যখন সুস্থ ও সবল আছে, তাকে যেতেই হবে দিল্লীতে সম্মান স্বহস্তে গ্রহণ করতে। সভায় তার অনুপস্থিতি, সারা বাংলা সাহিত্যেরই অনুপস্থিতির সামিল; এটা শুধু তার ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ব্যাপার নয়। হাতে সময় ছিল না, বন্ধু ও অনুরাগীরা মিলে প্লেনের টিকেট কিনে নিয়ে এলো। অগত্যা এরোড্রোমে হাজির হওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর কি।

'আরে অনীশ না, কোথায় যাচ্ছিস?'

পেছনে তাকিয়ে একগাদা স্যুটপরা এবং সমসংখ্যক চাপরাশ-আঁটা লোকের পুরোভাগে কমল মুখার্জিকে আবিষ্কার করল।

'দিল্লী যাচ্ছি সেন্টারের সঙ্গে একটা ব্যাপার take-up করতে।' কাছে এগিয়ে এল কমল মুখার্জি। 'মিনিষ্টার হওয়া কম ঝকমারি নয়। একদিকে ইলেকট্রোরেটকে খুশি করতে হবে, অন্য দিকে সেন্টারের কাছ থেকে সুবিধে আদায় করতে গলদঘর্ম···কতবার ভেবেছি তোর কাছে একদিন যাই, গল্প করে আসি কিছু ইন্টেলেকচুয়াল রসদ সংগ্রহ করে আনি, কিন্তু সময় আর করে উঠতে পারি না, তারপর ভুলে যাই···'

একটু মৃদু হাসল অনীশ। মিনিষ্টার-বন্ধুর এমন কথাও কম অনুগ্রহ নয়।

'এক মিনিট দাঁড়া। আমি ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে আসছি। এদের ছাড়া গতি নেই, থাকে বলে আমলাতন্ত্র! এরাই সব ফাইল তৈরি করে, ব্রীফ তৈরি করে, কারণ উদ্ভাবন করে। আমি ইয়েস, নো, ভেরি ওয়েল বলে কোনটা কাটি, কোনটা রাখি। কিন্তু ওদের ছাড়া উপায় নেই। কাজ ওরাই জানে।— কোথাও যাচ্ছিস?—'

'হাঁ, দিল্লী যাচ্ছি।'

'তবে তো চমৎকার। প্লেনে বসে প্রাণ খুলে গল্প করা যাবে।' বলে কমল মুখার্জি দ্রুতভাবে অপেক্ষমান ও সময়-অপচয়ে-উদ্বিগ্ন সেক্রেটারি, জয়েন্ট সেক্রেটারি, চাপরাশি ও আর্দালীদের দিকে এগিয়ে গেল।

প্লেন ছাড়তে দেরী হলো। অনীশের সামনের আসনেই আসীন হয়েছিল মিনিষ্টার কমল মুখার্জি; তাঁর পাশের আসনটি তখনও খালি ছিল। খালি আসনের প্যাসেঞ্জারের জন্য একটু উদ্বিগ্নভাবেই যে মুখার্জি অপেক্ষা করছিল, তা বুঝে নিতে অনীশের কষ্ট হয়নি। এবার কমল মুখার্জির এই উদ্বেগ ও সম্ভবতঃ প্লেন ছাড়ার বিলম্বের কারণ নিজ মুখেই ব্যক্ত করল। 'পাটনার প্লেন হয়ত এসেই পৌঁছাই নি'! ঘড়ির প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' সে

বললে। 'সহায়ের জন্যই বোধহয় অপেক্ষা করছে। জরুরী আর ইম্‌পর্টেন্ট কনফারেন্স, সরাসরি টিকেট না মেলায় কলকাতা হয়ে যাচ্ছে বেচারি, তাও যদি avail না করতে পারে তবে কনফারেন্সে হাজির...আরে আরে, আ জাইয়ে সহায়জী ; আমি ভাবলাম তুমি বুঝি শুয়ে থাকবে ; কতক্ষণ আর দেরী করবে প্লেন...বৈঠিয়ে... আচ্ছা এর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই—বিহারের ফিনান্স মিনিষ্টার অভীক সহায়। আর ইনি আমার বিশেষ বন্ধু বাংলার বিখ্যাত কবি অনীশ গাঙ্গুলী

'নোমোস্কার।' অভীক সহায় কবির প্রতি সৌজন্য সহকারে নমস্কার জানিয়ে বললেন। 'খুব বেঁচে গেছি। ভাগ্যবশত প্লেনটা লেট করে ছাড়ছে, নইলে আর দিল্লী যাওয়া হতো না, সব ভণ্ডুল হ'তো·· কি জানি নামটা আপনার কবি-জী। আমি একটু একটু বাংলা পড়ি। আপনার দু' একখানা কিতাবের নাম বলুন, পড়ব...'

'সে চেষ্টা করবেন না,' কমল সরলে বললে। 'যাদের মাতৃভাষা বাংলা তারাই এঁদের কবিতার অর্থ বুঝতে পারে না, এমন হাই ফ্লাস লেখা...আচ্ছা, দেখুন বলতে পারেন, প্লেন ছাড়তে এত দেরী হচ্ছে কেন···প্রায় কুড়ি মিনিট পার হয়েছে সিডিউল টাইমের পর...'

পরবর্তী প্রশ্নটি সেবা বিতরণকারিণী এয়ার হোস্টেসের প্রতি। প্রশ্নকর্তার সম্যক পরিচয় অবগত আছেন মেয়েটি ; তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এসে সসম্ভ্রমে বললে, 'বম্বের কোন্ এক ফিল্মস্টারের চারদিকে নাকি এমন ভিড় হয়েছে যে তাঁকে প্লেনে আনাই যাচ্ছে না ভিড় সরিয়ে··· তিনি এই ফ্লাইটেই দিল্লী যাচ্ছেন...'

'গুড্‌নেস্ মি !' কমল হতাশার ভঙ্গি করে' বললে। 'আমি ভাবলাম, ফিনান্স মিনিষ্টার সহায়কে প্লেনে তোলবার জন্যই ওই বিলম্ব ···'

'আরে ভাই, আমাদের কি সে রকম নসিব !' সহায়জী পরিহাস তরল কণ্ঠে শ্লেষোক্তি করলেন। 'আমরা মাত্র দফতরের জীব, ওরা আশমানের...'

কিন্তু আর বেশি দেরী করতে হলো না, বাইরে ফিল্লাবাদ ধ্বনি ও ভেতরে হুহুঙ্কার উৎসুক চোখের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে দামি চিনাংশুক, হীরা, জহরত ও উগ্র প্রসাধনে অতিরঞ্জিতা চিত্তহারিকা সভয় পদক্ষেপে এগিয়ে এসে অনীশের বিপরীত দিকের পংক্তির প্রথম আসনটিতে আপনাকে নিশ্চিন্ত করলেন।

'কে, অনীশদা না ?' আকাশে উড়বার প্রাথমিক প্রক্রিয়া হিসেবে রান্‌-ওয়ে দিয়ে ছোট শুরু করা বিমান-যানের গর্জন ভেদ করে' শানিত মিষ্টি গলার প্রশ্ন শোনা গেল। 'চিনতে পারছ না, ড্যাবাগঙ্গারামের মত ফ্যাল-ফ্যাল করে' তাকিয়ে আছ ? আমি গুলী, ফিল্মস্টার অনিন্দিতা···'

'তোমারই জন্য কি প্লেন ছাড়তে দেরি হলো ?' অনীশ এবার পাশে তাকিয়ে গুলীকে আবিষ্কার করল এবং কিছুটা পরিহাসের সুরে বললে।

'তবেই একবারে স্টারের প্রতাপ দেখো !' গুলীও একই সুরে জবাব দিলে। 'কোনও মিনিস্টারের সাধ্য ছিল এমন করে' প্লেন হাঁড় করিয়ে রাখে ?··· (সামনের আসন দুটির দিকে অনীশের চোখের নির্দেশ সে উপেক্ষা করল) ··· কলকাতায় মেয়ে বয়েতে গিয়ে পরপর তিনটা হিট্ পিকচারের হেরোয়িন, কলকাতার ফ্যান্‌দের ঘোষ কি বলো ? কুড়ি মিনিট দেরি মেক্-আপ করতে কিছুই কষ্ট হবে না—ঠিক সময়ই পালম-এ পৌঁছনো যাবে··· কেমন আছ বলো ? অনুদির সঙ্গে হঠাৎ নিউ মার্কেটে দেখা হয়েছিল। বল্লে, দাদা কবিতার জন্য দিল্লী থেকে কি একটা পুরস্কার পেয়েছে, পাঁচ হাজার টাকা ! কবিতা লিখে কি লাভ বলো ? পড়ে, ভেবে মাথা খামিয়ে কি লাভ হয় ? কলেজের সওয়া তিনশো···তার উপর বড় জোর কখনও বা পাঁচ হাজারের প্রাইজ ! ব্যস্, ঐ। আমাকে দেখো। দুটো নাচিয়ে ঠ্যাং, দুটো গোলগাল হাত, পাকা মর্তমান কলার মত মুখ আর, গায়ের রং, ইচ্ছেমত এদিকে ওদিকে ঘুরোতে পারা চোখের দুষ্টু চাউনি, ব্যস্ লাখ লাখ টাকা, কাগজে কাগজে নাম আর ছবি, লক্ষ লক্ষ 'ফ্যান', আরও অনেক কিছু। অন্যেরা গল্প বানায়, ডায়ালোগ লেখে, একজন বলে দেয় এইখানে

এই করবে, এই বলবে আর এই রকম ভাবে বলবে, আরেকজন পেছন থেকে গান গেয়ে দেয় বা কোন্‌দিক থেকে শট নিলে আমার মুখ আর ভঙ্গি ভাল দেখাবে ভেবে মরে। আমি স্রেফ্ সঙের মত হুকুম তামিল করে যাই। কিন্তু যেই ছবি হিট্ হলো, পঞ্চাশের ভাগ কৃতিত্ব আমার! সুন্দর শরীরকে তাচ্ছিল্য করতে, ভেবে দেখ, মাথার চেয়ে তার দাম কত বেশি!...' প্লেনের আওয়াজে অর্ধ নিমজ্জিত কণ্ঠস্বর অন্যদের কাছ থেকে আড়াল করবার চেষ্টায় পাশ দিয়ে বসে যথাসাধ্য অনীশের কানের কাছে মুখ নিয়ে এসেছে গুলী।

'গোপীবল্লভের খবর কি?' গুলীর উচ্ছ্বাস নিরস্ত করার চেষ্টায় অনীশকে বলতে হলো।

'এখন সব রাঘব-বোয়াল ঘোরাঘুরি করছে, চুনো-পুঁটির সুযোগ কোথায়!' সহাস্যেই জবাব দিল গুলী। 'একবার এসো না বম্বেতে। জুহুর সমুদ্রতীরে আমার একটা সুন্দর বাংলো আছে। সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করবে আর সমুদ্রের ঢেউয়ের দিকে চেয়ে চেয়ে গুছন গুছন কবিতা লিখবে...'

'আর যদি ভিন্নী গান লিখি, চালিয়ে দিতে পারবে কি?'

'সে তোমাকে দিয়ে হবে না। তার জন্য অন্য ধরনের কবি চাই। ফরমাস খাটবার লোকই তুমি! কিন্তু ঠাট্টা নয়। নিশ্চয়ই একবার বম্বে এসো। আমি কম কৃতজ্ঞ নই তোমার কাছে। ভাগ্যে তখন বিয়েতে রাজি হওনি...'

প্লেন পৌঁছে গেল পালামে। যাত্রীদের জন্য ভূমিতে অবতরণের সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হলো।

'কোথায় উঠবি অনীশ? কিনাল মিনিট্ থেকে একটা গাড়ী আসার কথা। তোকে আস্তানায় পৌঁছে দিয়ে যেতে পারি।' আসন ত্যাগ করে' নামবার জন্য প্রস্তুত হয়ে কমল মুখার্জি বন্ধুর খিদমতে বলল।

'আমার কিছু দরকার হবে না।' অনীশ বললে। 'তুমি তাড়াতাড়ি কনফারেন্সে হাজির হতে পারলেই আমার আর সারা পশ্চিমবঙ্গের লাভ...'

'আচ্ছা তবে ঠিক আছে। আবার দেখা হবে। "বম্বে যাবার নিমন্ত্রণটা ভুলবে না কিন্তু; এই আমার কার্ড, এতে আমার জুহুর ঠিকানা আর ফোন নম্বর লেখা আছে...'

'আচ্ছা।'

এয়োড্রোমের বাইরে এসে ট্যাক্সি জোগাড়ের চেষ্টায় অগ্রসর হলো অনীশ। কিনাল মিনিট্টির দুই গাড়ী দুই মিনিটার ও দুজন অভ্যর্থনাকারীসহ হুস্ করে' পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। কমল মুখার্জি হাত নাড়তে ভুলল না। কিন্তু জনুস অন্য দিকে। বহু সংখ্যক গাড়ী, বিচিত্র সাজপোশাক পরা বহু যুবকযুবতীর ভিড়, উল্লাসধ্বনি ও ফুলের মালার সমারোহ। কারণটা অনীশের বুঝে নিতে কষ্ট হলো না। কি জানি নামটা বলেছিল গুলী? অনিন্দিতা না অভিরন্দিতা?

আগামী কাল অনীশ উপরাষ্ট্রপতির হাত থেকে সনদ আর পাঁচ হাজার টাকার ইনাম গ্রহণ করবে। প্রাদেশিক অর্থমন্ত্রী কমল মুখার্জি ও অভীক সহায় অন্যান্য সতীর্থসহ কেন্দ্রীয় বিত্তমন্ত্রীর সভাপতিত্বে ডিম্বাকৃতি টেবিলের চারদিক ঘিরে আলোচনায় বসবে; নিজ নিজ রাজ্যের জন্য যতটা সম্ভব বেশি সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করবে। আর রাষ্ট্রপতি ভবনে স্বয়ং রাষ্ট্রপতির পাশের আসনে বসে রাষ্ট্রপতির জন্য বিশেষভাবে আয়োজিত নতুন 'হিট্' পিক্‌চারের প্রদর্শনী উপভোগ (এবং পরে প্রশংসা আদায়) করবে চিত্রের সুবিখ্যাত নায়িকা গুলী।

চাই—হুইস্কি···বিয়ার···রাম

সুলেখা দাশগুপ্ত

সব জায়গায়ই যখন অস্থিরতা তখন কেউ-ই বুঝি স্থির শান্ত থাকতে পারে না। নইলে মহাশ্বেতার চঞ্চল হবার তো তেমন কোন কারণ নেই, তবু তার ভেতরটা মাঝে মাঝেই এমন অস্থির চটফটানিতে ভোগে কেন?

কার জন্য? কিসের জন্য?

বিশ্বজিতের জন্য কি?

কিন্তু সে আর নেই। শত অস্থির হলেও আর তাকে পাওয়া যাবে না এক স্মৃতি রোমন্থন করা ছাড়া। কিন্তু ঐ কাজটি করা থেকে সে সভয়ে দূরে থাকে। স্মৃতি এক অদ্ভুত বস্তু! কাঁটা ভরা দিনের পর্যন্ত সমস্ত কাঁটা ঝরিয়ে দিয়ে সে কেবল তার সৌরভটুকুই ধরে রাখে। সেই সৌরভে পেয়ে বসলে আর উপায় থাকে না। মন কেবল স্মৃতি রোমন্থন করতে চায়। মনের এই স্বাধরত্বকে মহাশ্বেতা তাই মনের কাছেও ঘেঁষতে দেয় না।

জীবনটাকে মহাশ্বেতার মনে হয় অসীম ক্ষমতাশালী এক লেখকের কলমে লেখা কাঁচা উপন্যাস। পারম্পর্যহীন, অর্থহীন স্রোতে নানা বিক্ষিপ্ত ধারার আবোল তাবোল লিখে চলেছে। কোন ঘটনার সঙ্গে কোন ঘটনার সঙ্গতি নেই। মিল নেই। ধারাবাহিকতা নেই স্বাভাবিকত্বের! পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়, "এর পর তো এটা হবার কথা ছিলো না! এ আবার কেমন আচমকা অন্য গতি নিল? এর ভেতর স্বাভাবিকটা কোথায়? এ চরিত্রটা হঠাৎ এমন হয়ে গেলো কি করে? আর কেবল, হায়! এটা যদি না করতাম: ওটা যদি করতাম—দিয়ে ভরা।

কিন্তু উপন্যাস শতবার পালটে লেখা যায়।

জীবনটা একবারও পালটে লেখা যায় না!

না, বিশ্বজিতের কথা সে ভাবতে চায় না। মনে করতে চায় না। কারণ মনে করতে গেলেই সেই স্মৃতি রোমন্থন করতে বসতে হয়—যেটা সে করতে ভালোবাসে না এবং যেটা করতে বসা থেকে সে সভয়ে দূরে থাকে।

আর বিশ্বজিতের কথা মনে পড়েই বা কই? সময়ের ধুলো পড়ে পড়ে ঢেকেও তো এলো সেই দিনগুলি। তার কথা মনে পড়ে কই? সেই বা মনে করতে চায় কই?

কিন্তু বিশ্বজিতেরই তো এই সংসার। তারই তো সন্তান স্ত্রী ঘর বাড়ি সব!

কিন্তু সে কি এখনও বিশ্বজিতের আছে?

কিংবা কোন দিনও ছিলো?

না।

শুধু সেই নয়, কোনদিনও কেউ কারু হয় না। হতে পারে না—শত চেষ্টা করেও না—

মধ্যাহ্ন-বিশ্রাম শয্যায় এপাশ থেকে ওপাশে ফিরলো মহাশ্বেতা। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেললো। ভাবতে লাগলো, স্নেহ প্রেম প্রীতি দিয়ে ঠাসা এই পৃথিবী, কিন্তু তবু কেউ কারু হয় না কোন দিনও! মানুষের ব্যাকুল দুই হাত কাউকে বুকে ধরে রাখতে পারে না। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সমস্ত জীবন মানুষকে কেবল একজন থেকে আর একজনের হওয়ার খেলা খেলে যেতে হয়। একবার করে বুকে আকুল ভাবে আঁকড়ে ধরতে হয়; আবার মুঠো আলগা করে দিয়ে ছেড়ে দিতে হয়।

একি দুর্বাসা মুনির মতো ক্রুদ্ধ রাগান্ধ কোন ঋষির অভিশাপ? স্নেহ মমতায় সংসার নিয়ে আকুল নারীর দরজায় ভিক্ষা প্রার্থী হয়ে স্নেহান্ধ নারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে দুর্বাসার মতো অভিশাপ দিয়ে গেছে নারীকে ঋষি, 'যাকে বুকে আঁকড়ে ধরবি সেই জনের মতো গলে বেরিয়ে যাবে তোর বুক থেকে। কাউকে ধরে রাখতে পারবি নে 'আমার' বলে!'

যদি তাই হয় তবে এ শাপমোচন কবে ঘটবে?

কিংবা আর কি কোনদিনও ঘটবে না?—

একটু বোধহয় চোখ লেগে এসেছিলো মহাশ্বেতার।

মেঘের গুরুগুরু ডাক শুনে তন্দ্রাটুকু চলে গেলো। উঠে বসলো সে বিছানার ওপর। তারপর উঠে পড়ে জানালাগুলি খুলে দিলো। একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক এসে ঘরে ঢুকলো। এতো গরম ছিলো দিনটা যে, পাখার তলায় শুয়েও মহাশ্বেতা ঘামছিলো। গলার ভাঁজের তলায় জমে ছিলো ঘাম। ঠাণ্ডা হাওয়ায় তারি আরাম লাগতে লাগলো। দাঁড়িয়ে রইলো সে জানালার গ্রিল ধরে। শরীর ঠাণ্ডা হয়ে এলো—বাতাসে। মাথার আবোল তাবোল চিন্তাও এলো শান্ত হয়ে। মেঘের এক সঙ্গে জড়ো হওয়া দেখতে দেখতে হঠাৎ যেন তার মনের ভেতর একটা আবেগ এসে গেলো। জানালা ছেড়ে ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে খোঁপা বাঁধলো। শাড়ি পালটালো। ব্যাগে গোটা পঞ্চাশেক টাকা ভরলো, রুমাল ভরলো, গায়ে সেন্ট স্প্রে করলো, তারপর পাশের ঘরে ঘুমিয়ে থাকা আয়াকে জাগিয়ে তুলে বললো, 'আমি একটু বেরুচ্ছি। তুই আর ঘুমোস নে কদম। বাড়ি খালি রইলো। রতন বলে গেছে এক বন্ধুর জন্মদিনের নেমন্তন্ন আছে, ফিরতে দেরী হবে ওর। অজু আর অলকানন্দা স্কুল থেকে ফিরলে দুই খেতে দিস।' বলে চলে যেতে গিয়েও মুখ ফিরিয়ে বললো, ঠিকের ঠাণ্ডা খাবার দিস নে যেন। গরম করে দিস···আমি সন্ধ্যার আগেই ফিরে আসবো···সব ঠিক মতো করিস কিন্তু···'

মস্ত হাই তুলে উঠে বসল সুশীলা। বলল, অত বলতে হবেনিকো আমাকে। তুমি যাচ্ছ যাও না। আমি দশ বছর ধরে দেখছি ওদের—তবু তোমার কেবল বলা।'

সত্যি বাচ্চাদের দেখার সুশীলার ত্রুটি হয় না। হেসে বেরিয়ে এলো সে। নীচে নামল। ট্রামের একেবারে সামনের সিটে বসে বালিগঞ্জ থেকে এসপ্লানেড, ফের এসপ্লানেড থেকে বালিগঞ্জ, এ রকম ঘুরতে সন্ধ্যা বেলা কিংবা বেলা দিনে তার বেশ লাগে। মাঝে মাঝেই মহাশ্বেতা এ রকম ঘোরে। এখনও সেই উদ্দেশ্যেই বেরিয়ে পড়েছে। রাস্তায় এসে ট্রাম স্টপের দিকেই যাচ্ছিল। কিন্তু দুপুরের চিলে চাহিদার বাজারে একটা ট্যাকসি এসে নিজেই থামল তার কাছে। চালকের চোখে জিজ্ঞাসা, 'ট্যাকসি চাই?'

হঠাৎ ট্যাকসিটাতেই উঠে পড়ল সে কিন্তু ট্যাকসিতে ওঠা মানেই কোথাও যেতে বলা। কোথায় যেতে বলে এখন ড্রাইভারকে!

কিছু মেঘ, কিছু হাওয়া ঢুকল এসে গাড়ির ভেতর। মহাশ্বেতা আচমকাই বলে উঠল, 'বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট চলো।'

গাড়ি চলতে লাগল বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট অভিমুখে।

আর মহাশ্বেতা অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, আচ্ছা, আমি বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট যেতে বললাম কেন? আমি কি রমেনের অফিসে গিয়ে উপস্থিত হবো নাকি? লিফটে গিয়ে চারতলায় উঠব? তাকে বলব, ওঠ, আমি মেঘ দেখতে বেরিয়ে পড়েছি? তুমি আমার সঙ্গী হও? রমেনের সঙ্গে মাঝে মাঝে বেড়াতে বের হয়, রেস্তোঁরায় বসে চা কফি খায় কিন্তু তাই বলে তার অফিসে যাওয়া? তাকে টেনে তুলে নিয়ে বেড়াতে বেরুনো! ভাবতে পারছে কি করে সে!

কিন্তু সে এটা কিছু ভেবে করেনি।

ভেবে করলে কখনই সে এ কাজ করতে পারতো না। আকাশে মেঘ দেখলে কেবল মযূরই পেখম মেলে নেচে ওঠে না; মানুষের মনও বুঝি নেচে ওঠে। সেই মনের ময়ূরই কি এই অদ্ভুত 'ইচ্ছা' ওর মনে জাগিয়ে দিলো?···জাগিয়ে দিলো মানে? তবে কি 'ইচ্ছাটা' ওর মনে ঘুমোনো ছিলো? —কিংবা এমন গভীর কিছু ব্যাপার নেই রমেনের কাছে আসার? সমুদ্রের ঢেউ-এর যেমন কোন নির্বাচন থাকে না, লতা-পাতা কাগজ খোসা যা পায় আপন উদ্বেলতার টানে টেনে নিয়ে চলে—ওর এই রমেনের কাছে আসাটাও তেমনি কিছু? ওর হৃদয়-তরঙ্গ কাকে টানছে ও জানে না। সে টানে কে এসে পড়ছে আর না পড়ছে তার কোন বিশেষ অর্থ নেই, কোন নির্বাচন নেই?—

বেশ লাগছে···রমেন কিন্তু ওকে দেখে একেবারে চমকে যাবে...রমেনের অফিসে এসে উপস্থিত হওয়াটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে···কিরবে? কিন্তু তখন দুপুর ওর

মনকে বড় ছটফট করায়...বিশ্বজিতের মৃত্যুর পর দিনগুলো কেটে গেছে রতন অতন আর অলকনন্দাকে নিয়ে। রতন তখন সবে আটে পা দিয়েছে। অতন আর অলকনন্দা ছ' আর চার। ওদের তদারক করতে করতেই দিন কোথা দিয়ে চলে গেছে টেরও পায় নি। আজও সকাল সন্ধ্যা তাই যায়। কিন্তু দুপুরটা ওর বড় খারাপ লাগে···সন্ধ্যাবেলাও যখন ওরা পড়তে বসে তখন বড় নিঃসঙ্গ মনে হয়···রতন প্রিইউনিভারসিটি পরীক্ষা দিয়েছে। ভালই পাশ করবে এখন পড়া নেই। কেবল আড্ডা দিয়ে বেড়াচ্ছে...আজ তো বলেই গেছে রাত হবে—বন্ধুর জন্মদিন···বাড়িতে খাবে না···।

হঠাৎ বাইরের দিকে তাকিয়ে ঝপ্ করে গদি থেকে পিঠ তুললো মহাশ্বেতা—বললো, 'অনেকটা ছাড়িয়ে চলে এসেছি! গাড়ি ব্যাক করতে হবে যে...'

ড্রাইভার গজগজ করে উঠলো, 'বলবেন তো।'

মহাশ্বেতা বললো, 'আমারই ভুল হয়ে গেছে। আপনার দোষ নেই।'

ড্রাইভার শান্ত হলো।

মহাশ্বেতার নির্দেশ মতো গাড়ি ব্যাক করে নিয়ে গিয়ে একটা বিরাট অফিস বাড়ির কাছে দাঁড় করালো। তরুণীর মত চট করে গাড়ী থেকে নেমে পড়ে, ঝপ্ করে গাড়ির দরজা বন্ধ করে নিজেকে মহাশ্বেতার বেশ নতুন নতুন লাগলো। মজাও বোধ করতে লাগলো যেন। ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বললে সে আপত্তি করলো না। দুপুরের পড়তি চাঁদিদার সময় অপেক্ষা করতে পারে সে। বেশী দেরী হলেও আপত্তি নেই। দিব্য ঘুমিয়ে নেওয়া যাবে গদিতে হেলে সামনে পা তুলে দিয়ে।

কোলাপসেবল গেটের দারোয়ান আর. কে. রায়ের কথা বলতেই সসম্ভ্রমে লিফটের দরজায় মহাশ্বেতাকে এনে দিয়ে গেলো। বলে দিল, পাঁচতলায় উঠে যান। চাপরাসীকে বললেই সাহেবের ঘর দেখিয়ে দেবে।

পাঁচতলায় লিফট থামল। লিফটের খাঁচা থেকে অনেকের সঙ্গে মহাশ্বেতাও বেরিয়ে এলো। এদিক ওদিক তাকিয়ে কোন চাপরাসী দেখতে না পেয়ে লম্বা করিডোর দিয়ে সামনে এগোতে লাগল। কিছুটা যেতেই চোখে পড়ল ঝকঝকে বার্নিশ করা দরজায় নেমপ্লেট আঁটা রয়েছে, আর. কে. রে। পাঁচতলায় আর ক'জন এক নামের থাকবে। নিশ্চয়ই রমেনের ঘর এটা। এতবড় একটা চাকচিক্যময় অফিস বাড়িতে ঢুকে অস্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিল মহাশ্বেতা। রমেনের ঘর দেখতে পেয়ে স্বস্তি বোধ করল। শুকুনি পুল-ডোর ঠেলে ঘরে ঢুকে পড়ল সে। কিন্তু ঢুকেই দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। রমেনের মস্ত মাস আঁটা ঝকমকে টেবিলের তিনদিক ঘিরে পাঁচ ছ'জন হোমরাচোমরা গোছের ব্যক্তি বসে রয়েছে। আর একদিকে রমেন স্বয়ং। মনে হলো মিটিং চলছে।

রমেনই বক্তা। সেই কিছু বোঝাচ্ছিল সামনের উপবিষ্ট ব্যক্তিদের। ঘরের মধ্যে আচমকা মহাশ্বেতাকে দেখে হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু তার মুখের বক্তব্যে এতটুকু বাধা পেল না। শুধু বাঁ হাতটা একটু তুলে সে যে মহাশ্বেতাকে দেখেছে জানান দিয়ে নিল বা সম্ভাষণ জানিয়ে নিল।

মহাশ্বেতা যে কি করবে বুঝে উঠতে পারলে না। বেরিয়ে যাবে কি? তাকালো রমেনের দিকে। দেখল সে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের লক্ষ্য করে যেমন কথা বলছিল, তেমনি বলে চলেছে। চলে আসবার জন্য মহাশ্বেতা পিছু ফিরতে যাচ্ছিল, কিন্তু দেখল যতই রমেন ভদ্রবৃন্দের দিকে তাকিয়ে কথা বলে চলুক, নজরটা মহাশ্বেতার দিকেই রয়েছে। সে পিছু ফিরতে যেতেই আবার হাত তুলে ওকে থামালো। তারপরই উপবিষ্ট ব্যক্তিদের 'গাইজ এ মিনিট'—বলে মহাশ্বেতার দিকে তাকিয়ে হাত জোড় করে অপরাধীর ভঙ্গিতে বলল, 'আপনার সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়টা যে আমার খেয়াল ছিল না, তা কিন্তু নয় মিসেস বোস। কিন্তু একটা জরুরি মিটিং আমাকে ডাকতেই হলো—আপনি আমার ঘরে গিয়ে বসুন। মিটিং হয়ে গেলেই আপনাকে ডাকব।' বলেই বেল বাজাল রমেন। বেয়ারা এলো। রমেন তাকে নির্দেশ দিল, মেমসাহেবকে নিয়ে গিয়ে তার বসবার ঘরে বসাতে।

রমেনের অফিস ঘরের সঙ্গেই তার বিজনেস বসবার ঘর। বেয়ারা মহাশ্বেতাকে সে ঘরে বসিয়ে চলে গেল। মহাশ্বেতা বসল। দেখতে লাগল রমেনের বসার ঘর।

এয়ারকণ্ডিশন তো বটেই। তবু এটা প্রয়োজনীয় বিলাস। কিন্তু অপ্রয়োজনীয় বিলাসের সজ্জায় ঘরটা যেন নর্তকীর মতো অতিরিক্ত আভরণে সেজে রয়েছে। কি নেই সে ঘরে? চীনের ড্রাগন আঁকা এ্যাসট্রে। জাপানী তরুণীর হাতার ফুলদানী। তিব্বতী বুদ্ধমূর্তি সোনা রঙের। নটরাজের মাথার ওপর মোরাদো চক্রের বেষ্টনের ভেতর ছোট বিদ্যুৎ মণি সাত রং এর আলো—জ্বলছে আর নিবছে। হীরে মুক্ত চুনি পান্নার মতো। পায়ের তলায় লাল হলুদের ফুল তোলা নরম কার্পেট। দেয়ালে চা সংগ্রহকারিণী পাহাড়ী মেয়ে আর আদিবাসী রমণীর সেপ্ত-এ্যান্ড্রিলি ছবি। দরজায় দরজায় মোটা পর্দা। এয়ার কণ্ডিশনের ঠাণ্ডা ঘরে রাখবার জন্য। মেঘ দেখে বেরিয়ে পড়ে এ কোন অন্ধকূপে এসে ঢুকল সে। কিছু সময় অপেক্ষা করে ফোন তুলে নিলো। খট্‌খট্ শব্দে ডায়াল ঘুরিয়ে রিসিভার কানের ওপর চেপে ধরলো।

ও পিঠ থেকে গম্ভীর গলা এলো, 'আর. কে. যে কথা বলছি।'

'আমি মহাশ্বেতা।'

'ও, ইয়েস: আপনার জন্য কি করতে পারি?'

'আমি চলে যাচ্ছি। নমস্কার জানাচ্ছি। একটা প্রতি নমস্কার জানাতে পারো। তোমার অভিনয় দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। সিনেমায় নেবে যাও না কেন?'

বোধ হয় এতগুলো লোকের ভেতর কথা বলার কায়দা পাচ্ছিল না রমেন। বিব্রত ভাবেই যেন বললো, 'আমার অস্ত্রবিধের দিকটা একটু অবশ্যই আপনাকে কন-সিডার করতে হবে—'

'ও সব বুঝিনে। এই অন্ধকূপে আমি বসে থাকতে রাজী নই। আর পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। না এলে চলে যাবো।'

'মেক ইট ফিফটিন—বেন চায়ের ঘর করছে রমেন।

'আচ্ছা। কিন্তু তারপর আর এক সেকেণ্ডও নয়।' বলে ফোন রেখে দিল মহাশ্বেতা। একটা ম্যাগাজিন দেখতে লাগলো।

মিনিট দশেক বাদে স্নাত মুখ রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে ব্যস্ত-ব্যস্ত পায় পুস ডোর ঠেলে ঘরে ঢুকল, রমেন।

হাতের ম্যাগাজিন নামিয়ে রেখে মহাশ্বেতা বলল, 'হলো?"

মহাশ্বেতার পাশে বসে পড়ে রমেন বলল, 'হয় কি আর! জোর করে হওয়ালাম। অর্থাৎ কালকের জন্য মুলতবী রেখে এলাম।' তারপর আরো এক মোড় মহাশ্বেতার দিকে ঘুরে বসে বলল, 'আমার দুঃখ তুমি কি বুঝবে! তোমার এমন একটা আবির্ভাবকে আমি আহ্বান জানাতে পারলাম না—বসে থাকতে হলো কতগুলো কাটখোট্টা লোকের মাঝে—আমার এ ক্ষোভ মরলেও যাবে না। আমি আনন্দে সুখে আজ অভিভূত মহাশ্বেতা ....কি খাবে বলো? চা না কফি?'

'কিছু খাবো না। আকাশ মেঘে কালো। হাওয়া অপূর্ব ঠাণ্ডা। ট্যাকসি দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি। চলো বেরিয়ে পড়ি।'

'চা নয় কফি—যা হয় একটা খেয়ে নেও?'

'বাইরে খাবো। ওঠ।' বলে মহাশ্বেতা ব্যাগ নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

কিন্তু রমেন উঠল না। মহাশ্বেতার হাত ধরে বসাবার জন্য আকর্ষণ করে বলল, 'প্লিজ বোস একটু মহাশ্বেতা। তোমাকে একদিন না একদিন আমার এ ঘরে নিয়ে আসব—এ ভেবে কত স্বপ্ন দেখেছি তুমি জানোনা।'

মহাশ্বেতা আশ্চর্য হয়ে বলল, 'কেন? এ ঘরে এলাম তো এলাম। না এলাম তো না এলাম। এটা নিয়ে স্বপ্ন দেখবার কি আছে?'

একটা নিঃশ্বাস ছাড়ার ভিতর দিয়ে রমেন বলল, 'সেটা নিজে না বুঝলে, অন্যে বোঝাতে পারে না। যাক্। রেস্তোঁরার চা তো রোজই খাচ্ছি। আজ আমার এখানে খেয়ে যাও—এসেছই যখন। প্লিজ।' হাত টেনে বসিয়ে দিল রমেন মহাশ্বেতাকে।

বসতে বাধ্য হল মহাশ্বেতা। বলল, 'বললাম। কিন্তু তোমার বন্ধ ঘরে বসতে আমার দম আঁটকা আঁটকা লাগে। এয়ারকণ্ডিশনের ঠাণ্ডাটা লাগে সাপের গায়ের কাল মতো।

'আমার ঘরটা তোমার ভাল লাগেনি!'

'তোমার ঘরটা ....তা মন্দ কী! তবে বড্ড বেশী সাজ।'

'মানে ফিনিস বেশী বলছ? বেশ তুমি সাজিয়ে দিও।'

'তোমার ঘর দেখে আমার চোখ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।' ঘরের আধেক ফিনিস তবে ফেলে দেবো কিন্তু?

'আমাকেও নিশ্চয়ই?'

তোমাকে? ও.....তা সেটা ভেবে দেখতে হবে।' বলে হাসল মহাশ্বেতা। বলল, কিন্তু তোমাকে ফেলে দিলে আমার কর্ত্রীত্বও তো চলে যাবে?'

'যে মালিক আসবেন, তিনিই খুশি হয়ে তোমাকে কর্ত্রী বানাবেন। তুমি হলে একটি সুন্দরী উদাসীন মহিলা।'

'ধন্যবাদ। কিন্তু তোমার কফি কোথায়? আর কতক্ষণ বসব?'

রমেনের ভেতর একটা অন্যমনস্কতা কাজ করছিল। কফির কথা তার মনে ছিল না। সে 'সরি' বলে চাপরাসীকে ডাকবার জন্য বেল বাজাতে গেল।

বাধা দিল মহাশ্বেতা। আর শুধু বাধাই দিল না, রমেনের হাত ধরে টেনে তুলে দরজা ঠেলে বেরিয়ে এলো এক রকম জোর করেই।

মহাশ্বেতার বাইরের দিকে টেনে নিয়ে যাবার হাতের টানটাকে ঘরের দিকে ফিরিয়ে এনে মহাশ্বেতাকে বুকের উপর চেপে ধরবার ইচ্ছাটা সাহসের অভাবে করে উঠতে পারলো না রমেন। সে জন্য লিফটের মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজের উপরই ক্ষোভে বিরক্তিতে মুষড়ে পড়তে লাগল রমেন।

লিফট থেকে নেমে বাইরে বেরিয়ে এসেই আকাশের দিকে তাকাল মহাশ্বেতা। মেঘ তখন আর নেই তবে রোদও অবশ্য ওঠেনি। মহাশ্বেতা বলল, 'দিলে তো মেঘকে তাড়িয়ে?'

'আমি দিলাম?'

'তুমি নয় তো কে। দেরী করিয়ে দিলে বলেই না মেঘ চলে গেল।' বলে হাসল সে।

'তা হলে মেঘ তোমাকে ভালবাসে না। ভালোবাসলে তোমার জন্য প্রতীক্ষা করত!'

'ঠিক বলেছ।'

ড্রাইভার এতক্ষণে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছিল। মহাশ্বেতার ডাকে লাল চোখ কচলে উঠে বসলো।

উঠে বসলো ওরাও।

রমেন জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাবে? 'ফুরি না টিকা?'

মহাশ্বেতা বলল, 'আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। আর তুমি কেবল ভেতরে ডাকছ।' তারপর ড্রাইভারকে বলল, 'আপনি অফিস পাড়াটা থেকে আগে বেরিয়ে পড়ুন। তারপর বলছি কোথায় যাবো।'

গাড়ি চললো।

একটু ভেবে হঠাৎ উৎসাহের সঙ্গে মহাশ্বেতা বলল, 'গ্রামের দিকে যাই চলো। সেখানে গাছতলায় চায়ের দোকানে ভাঁড়ের চা খেয়ে আসি। বেশ নতুন রকম হবে?'

'আমি পুরোনোপন্থী। আমার নতুনত্বের দরকার নেই। ফুরি টিকাই থেকে থাক আমার।'

ফুরতে টান দিল মহাশ্বেতা। 'তোমরা পুরোনোপন্থী?'

'আমি আমার কথা বলছি। তোমরাটা আবার কে?'

'তোমার দিকে তাকালে আমি কেবল তোমাকে দেখিনে। একটা পুরো জেনারেশনকে দেখি।'

'আর তখনই তোমার বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে তাই না?'

মহাশ্বেতা হেসে বললো, 'বলতে পারো।'

'তা আমাদের জেনারেশন তো যা হবার হয়েই গেছে।

পারবে নেকস্ট্ জেনারেশনকে অর্থাৎ তোমার ছেলে-মেয়েদের এই দীর্ঘশ্বাস থেকে বাঁচাতে ?'

'চেষ্টা করবো—'কিন্তু আমার দুহাতে কত শক্তি আছে কিনা তা জানিনে

'আমি জানি নেই আমাদের জেনারেশনকে দেখে ফেলো তোমার এই দীর্ঘশ্বাস অনেক বড় করে ফেলতে হবে নেকস্ট্ জেনারেশনকে দেখে—একথা বলে দিলাম।'

'হয়তো তোমার কথাই সত্য। বিশ্বজুড়ে ধ্বংস লেগেছে—কে কাকে রক্ষা করবে !'

অফিস পাড়া থেকে গাড়ি বেরিয়ে আসতেই মহাশ্বেতা তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, 'তাড়াতাড়ি হাসপাতালের দিকে যান আপনি।'

ড্রাইভার তাই চললো

রমেন সিগারেট বের করে একটা ধরিয়ে নিলো।

অন্যমনস্কভাবে বাইরের দিকে তাকিয়ে সিগারেট টেনে চললো।

মহাশ্বেতা বললো, 'সত্যি দেশের কাণ্ডকারখানা দেখে আমার ভয় ধরে গেছে রমেন। এ কিসের খেলা, কাদের খেলা বলতে পারো ?'

রমেন বাইরের থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে মহাশ্বেতার দিকে তাকালো।

মহাশ্বেতা বলে চললো, 'বিয়ের পর ধনী শ্বশুরঘরে গিয়ে দেখলাম ড্রিঙ্কের ছড়াছড়ি। শ্বশুর ভাসুররা সব ড্রিঙ্ক করে ঘরে ফিরে ধ্বংস করে। কাপ ভাঙে প্লেট ভাঙে। বৌদের মাথা লক্ষ্য করে বোতল ছুঁড়ে মারে। দাঁতে দাঁত চেপে তখন জ্বালেরা সহ্য করে। প্রতিশোধ নেয় তারা দিনের বেলা। কথা বলে না। বললে কলহ করে। চেঁচিয়ে গালাগাল দেয়। তারাও তখন এটা ভাঙে। ওটা ভাঙে। খাবার থালা দেয়ার সঙ্গে ঠেলে দিয়ে অন্য ঘরে চলে যায়। দেখলাম রাতটা ও বাড়িতে ছেলেদের। দিনটা মেয়েদের।'

হাওয়ায় ওড়া উড়ন্ত চুল হাত দিয়ে চেপে ধরে মহাশ্বেতা বলে চললো, 'বিশ্বজিতের হাতের গ্লাস একদিন টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম জানালা দিয়ে। হাসি মুখে বিশ্বজিৎ সেটা মেনে নিল। পালিয়ে এলাম ওখান থেকে ভিন্ন বাড়িতে। ছেলে দুটোকে তো ভালো পরিবেশে মানুষ করতে হবে···ভালোই চলছিলো···কিন্তু রক্তের মধ্যে নেশা একবার বাসা বাঁধলে আর তাকে ওপড়ানো যায় না। একদিন ভীষণ ড্রিঙ্ক করে অনেক রাতে ফিরে এসে বিশ্বজিতের সাহস হলো না আমার কাছে আসার···সে দরজা ধাক্কালো না ডাকলো না···সে শক্তিও তার ছিলো না···পড়ে রইলো খোলা বারান্দায় মাতাল হয়ে। রাতে ঝড় জল হলো। পুরো ঝড় জল তার ওপর দিয়ে গেলো। আমি জানতেও পারলাম না সে মাতাল অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে বাইরের বারান্দায় পড়ে রয়েছে ! আমি তখন ঘড়ি দেখছি। ঘরের মধ্যে অস্থির হয়ে হাঁটছি। নানা জায়গায় ফোন করছি ! সকাল বেলা কলম দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠলো। মাতাল অচৈতন্য শরীরের ওপর দুই বলে গিয়ে ডবল নিমোনিয়া হলো···সাত দিনের দিন চলে গেলো। একটু থামলো মহাশ্বেতা। কান্নাটা বোধ হয় চেপে নিলো। তারপর বললো, 'এখন এসেছে আবার ড্রিঙ্কের ওপরে ড্রাগ। হাশিস, মারিজুয়া, হেরোইন···কত কি বিষ গলায় ঢালছে ছেলেগুলো। পাশের বাড়ির একটা ছেলে ওসব খেয়ে অর্ধ উন্মত্ত অবস্থায় চেঁচায়। বাপ মা তেতলার ঘরে ছেলেকে তালা দিয়ে রেখে কেবল কপাল চাপড়ায়। বিশ্বজিতকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে পালিয়েছিলাম—তবু রক্ষা করতে পারলাম না···ছেলেদের কি করে রক্ষা করবো ? কোথায় পালাবো···দেশের অবস্থা দেখে ভয়ে আমার বুক যেন কেমন করে আকুল ভাবে রমেনের হাত চেপে ধরলো মহাশ্বেতা—'তুমি বিশ্বজিতের বন্ধু। এখন আমারও। তুমি পথ বলে দিতে পারো ?'

রমেনকে দেশের অবস্থার কথা এতটুকুও স্পর্শ করলো না। করলো মহাশ্বেতার হাতের স্পর্শ। অফিসে মহাশ্বেতাকে পাওয়ার পর থেকেই তার রক্ত দুলছে। তার হাতের ছোঁয়া আরো দুলিয়ে দিলো তার রক্তকে। সে বললো, 'তুমি বিশ্বজিতকে খুব ভালোবাসতে ?'

ওর আকুলতার উত্তরে এমন কথা শুনে—রমেনের হাত

ছেড়ে দিলো মহাশ্বেতা। নিজের অস্থিরতাকে সুস্থ করে তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে···বড় পাওয়া কত কঠিন—কত কঠিন···।

বাঁ হাতের সিগারেট ডান হাতে নিয়ে, বাঁ হাতটা রমেন প্রসারিত করে দিলো মহাশ্বেতার ঘাড়ের পেছনে। বললো আরো একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে। বললো, 'বিশ্বজিতের মৃত্যুর সময় আমি এখানে ছিলাম না। জানতাম না নিমোনিয়া হবার কারণটা যে এই। শুনে মন খারাপ হয়ে গেলো। বিশ্বজিৎ···'

'অন্য কথায় যাও রমেন। বাইরের মেঘ ভালো। কিন্তু মনের মেঘ বড় কালো।'

'তুমি খুব ভালোবাসতে বিশ্বজিতকে—তাই না?'

মহাশ্বেতা মুখে কিছু বললো না। শুধু হাত উলটালো এমন ভাবে, যেন বললো, 'কে জানে!'

সেটা লক্ষ্য করে রমেন বললো, ও ভাবে হাত ওলটালে কি হবে। তুমি তাকে ভালোবাসতে। তোমার চোখে জল এসে গেছে।'

হেসে উঠলো মহাশ্বেতা—'আঠারো বছর ঘর করলাম—অভাববোধ করবো না।'

'ফিজিক্যালি না মেনট্যালি?'

সঙ্কোচবোধের একটা লাল আভা ছড়িয়ে পড়লো মহাশ্বেতার মুখে। যেন শুনতে পায় নি এমনি ভাবে সে তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে।

'কি বললে না?'

'কি বলবো?'

'এই যে আমি জিজ্ঞাসা করলাম?'

'কি জিজ্ঞাসা করলে?'

'শোন নি?'

'না তো।'

'বিশ্বজিতের অভাববোধ কর বললে। আমি জিজ্ঞাসা করছি, সেটা ফিজিক্যাল না মেনটাল?'

'বোধ্—' বলে দু হাতে মুখ ঢেকে হেসে উঠলো মহাশ্বেতা।

দু হাত দিয়ে মুখ আবৃত করাটা মহাশ্বেতার ছল। দু চোখের পাতার তলায় জল জমেছিলো। মুখ ঢাকার ছলে হাতের উলটো পিঠ দিয়ে সেই জলটা মুছে ফেললো সে।

কিন্তু সে শুরু বুঝতে বাকী রইল না রমেনের। নীরবে সিগারেট টানতে লাগল সে। সিগারেটটা জলে জলেই ফুরিয়ে আসছিল, দু একটান দিয়ে সেটা আনলা গলিয়ে ফেলে দিয়ে রমেন বলল, 'রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ভালো লাগছে না। চলো প্রিন্সেপ্ ঘাটের দিকে। সেখানেও গাছতলায় চা পাবে।'

গঙ্গার পাড়ে গিয়ে নামল রমেন মহাশ্বেতা। ট্যাকসি মিটার গিয়ে উঠেছে ত্রিশ টাকা। রমেনের দুচোখ বড় হয়ে উঠল। বলল, 'ত্রিশ টাকা? কখন নিয়েছিলে তুমি ট্যাকসি?'

'ঠিকই আছে। দুটোর সময় নিয়েছি। পাঁচটা বাজে—উঠবেই তো।' কথার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ খুলে ভাড়া মিটিয়ে দিল মহাশ্বেতা।

'আরে করছ কি—আমি দিচ্ছি।' বলে ট্রাউজারের পকেটে হাত ঢুকিয়ে বলল, 'একশ' টাকার নোট আবার আমার কাছে—'

'ব্যস্ত হবার কি আছে। আমি তো দিয়ে দিয়েছি।' বলে মনে মনে একটু হাসল মহাশ্বেতা।

রমেন টাকার ব্যাগ বের করতে করতে ভার ভাড়া চুকিয়ে দেওয়া হয়ে যায় এই সময়।

গঙ্গার পাড়ে তখনও লোকজন আসা শুরু হয়নি। একটা অশ্বত্থ গাছের নীচে এক ছোকরা চা নিয়ে বসেছিল। কলসীর মধ্যে ছিদ্র করে কল লাগিয়ে নিয়েছে। কল খুলে চা দেয়। কাঠ কয়লার উনানের ওপর কলসী চাপানো। চা চাইতেই খোরায় করে ধোঁয়া ওঠা জিব পোড়া গরম চা এনে দিল ওদের। গরম চায়ে ফুঁ দিতে দিতে রমেন বলল, 'তোমার সব সখ আজব। কোথায় ফুরিতে বসে চা পেস্ট্রি খেয়ে নেবো। তা নয় গাছতলায় চা। খাও এখন ছেন্না চা জিব পুড়িয়ে।'

খোরাটা এত গরম হয়ে গিয়েছিল যে হাতে রাখতে পারছিল না মহাশ্বেতা। হাতের ছোট্ট রুমালের ওপর বসিয়ে নিয়ে বলল, সখ আজব হওয়াটাই হলো বিশেষত্ব।'

চা খেয়ে খোরা ছুঁড়ে ফেলে পয়সা মিটিয়ে দিল রমেন। এবার সে বেশ চটপট হাতেই পয়সা বের করে দিল। তারপর ছোট রেল লাইন পার হয়ে এলো একেবারে গঙ্গার ধারে। এ বোট সে বোট ডিঙিয়ে টপকিয়ে এসে বসল ওরা একটা অচল বোটে।

বড় সুন্দর জায়গাটা। মাঝ নদীতে যেন এসে পড়েছে ওরা। জলের স্রোত আর ঘূর্ণি জল বোট কেটে ভরভর করে বয়ে চলেছে। মনে হয় বোটটা যেন চলছে। কোন টানার পেলেই ঢেউ এসে বাড়ি মারছে বোটে। দুলে উঠছে বোট। সঙ্গে সঙ্গে বাঁশ শিকলগুলি বেজে উঠছে টুং টাং করে। যেন কেউ সেতারের তার বাঁধছে। মহাশ্বেতা মুগ্ধ কণ্ঠে বলল, বসবার এমন ভালো জায়গা আর কোনদিনও পাইনি কিন্তু আমরা।'

কিন্তু এটা তো ছিল এখানেই। আমরা দেখিনি। এ রকম কত পাওয়াই হয়তো আমাদের হাতের কাছে থাকে। না দেখতে পাওয়ার জন্য হারিয়ে যায়। 'যখন মনের মানুষ এলো দ্বারে, মন তখন জাগলি না রে।' এই তো ঘটে মানুষের দুর্ভাগ্য কপালে! পাওয়া হাতের কাছে এসে চলে যায়। পাই না।'

'তোমার ভালো লাগছে?' আবিষ্ট কণ্ঠ রমেনের।

'ভীষণ ভালো লাগছে। তোমার কাছে আমি বড় কৃতজ্ঞ রমেন। তোমার সঙ্গ পেয়ে এই এক নদীরই কত রূপ দেখলাম। শান্ত নদীতে শান্তিবারির মতো স্নিগ্ধ-ঝিরে বৃষ্টি। বর্ষার ভরা নদীর সমুদ্রের দিকে ছুটে চলা। পাতালের দিকে টেনে নেওয়া জলের ঘূর্ণা। রাশি রাশি জলের ঝোড়ে আসা দুরন্ত বান। বড়ে উড়িয়ে নেওয়া উত্তাল হাওয়া। ঘরের চার দেয়ালের ভেতর মন যখন থাকতে চায় না, বাইরে নিয়ে এসে বন্ধুর মতো সঙ্গ দেও। তোমার সঙ্গে গ্রীষ্মের ঠাণ্ডা স্নিগ্ধ হাওয়ায় ট্র্যাওরোডের রাস্তায় রাস্তায় বেড়াই। ঘুরি শীতের রাতের নির্জন নিস্তব্ধ পথে কুয়াশার ভেতর অস্পষ্ট দুটো ছায়ার মতো। হিমের হাওয়া কাঁপিয়ে দিয়ে যায় শরীর। ঠাণ্ডা করে দিয়ে যায় মুখ—সত্যি রমেন আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

বিরস গলায় রমেন বলল, 'তোমার এ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ আমাকে একটুও খুশি করে না মহাশ্বেতা। তুমি প্রকৃতির সান্নিধ্যে মুগ্ধ। কিন্তু প্রকৃতির প্রকৃত-রূপ তুমি চেনো না।'

'কি রকম?'

'তুমি প্রকৃতির যে নৈসর্গিক রূপে মুগ্ধ, ভুলে যেও না তার রক্তে রক্তে আদিমতা

'তুমিও এ কথা ভুলে যেও না রমেন, রক্তে রক্তে আদিমতা রয়েছে বলেই প্রকৃতিকে বাঁধাও হচ্ছে রক্তে রক্তে। কিন্তু প্রকৃতির কথা থাক। তুমি নিশ্চয়ই পরোক্ষে এ দিয়ে মানুষের আদিম প্রবৃত্তির কথাই স্মরণ করিয়ে দিতে চাচ্ছ?'

'তাই বলছি।'

'তা হলে উত্তরে আমি বলব, শুধু কাম নয়—রাগ, হিংসা, ক্ষুধা, শোক ইত্যাদি নামে আরো অনেক আদি-প্রবৃত্তি মানুষের রয়েছে। সে সব প্রকাশকে মানুষ সুন্দরে নিয়ে এসেছে। শোকে চুল ছিঁড়ে মাথা কুটে কাঁদে না। খুশিতে হি হি করে দু পাটি দাঁত আর মাড়ি বের করে হাসে না। ক্ষুধায় মাংসের বিশাল খণ্ড মুখে ভরে হামড়ে কামড়ে খায় না। মান তো?'

রমেন সিগারেট ধরাচ্ছিল, টানছিল, আধেক শেষ না হতেই নদীর জলে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছিল। আবার ধরাচ্ছিল। চঞ্চলতা চলছিল তার মনে। এবার সিগারেটের প্যাকেট বের করে দেখল, নেই একটাও। ছুঁড়ে ফেলল জলে সেটাকে। বলল, 'হ্যাঁ। তারপর?'

বাতাসের ঝাপটে এলোমেলো মুখের ওপর এসে বিরক্ত করা চুলগুলি হাত দিয়ে চেপে ধরে মহাশ্বেতা বলল, 'এসব ক্ষেত্রে যেমন মানুষ রুচিবোধ নিয়ে এসেছে, ঠিক তেমনি নর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও মানুষ সেই আদি পর্বে ঠেকে নেই। সেখানেও রমনীয়তা স্থান পেয়েছে। সৌরভ স্থান পেয়েছে। নিয়ে এসেছে নারী পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে সখ্যতা বলে একটি নতুন প্রীতি সৌহার্দের মধুময় সম্পর্ক। যা ছিল একমাত্র কৃষ্ণ দ্রৌপদীর সখ্যতায়।'

'আর কাম বুঝি একেবারে হাওয়া হয়ে গেছে?'

'না। তা যাবে কেন। বেশ বিরাট ভাবেই আছে।

সর্বগ্রাসী ভাবেই আছে। কিন্তু সেও উলঙ্গ নেই। দেহ সর্বস্ব নেই। প্রণয়ের মধুর ভাষায় সে সজ্জিত। ভাষার অনুভূতির স্পর্শে সে অনুরঞ্জিত। 'বঁধু এমন বাদলে তুমি কোথা—' এ গান তোমাকে অনুভূতির যে স্তরে নিয়ে যাবে, সাধ্য কি কাম সে জায়গায় নিয়ে যায়।'

'আমি নিস্তারই অনুভূতির মোটা স্তরের বাসিন্দে।'

'তবে তোমার সঙ্গে আমার এ জায়গায় মিলল না।'

'মিল নেই, মিলনও তোমার সঙ্গে আমার নেই, আমি তা জানি। তোমার বঁধু আমি নই। কিন্তু কে?'

'নেই।'

'নিশ্চয়-ই আছে।'

'তবে চিনি না। জানি না আছে কি না। এমন সুন্দর জায়গায় যে এই বোটটা ছিল জানতাম কি? পেয়ে গেলাম।'

'এখনও পাওনি—সে কথা আমি জানি। কিন্তু আমি পেয়েছি। তুমিই আমার বঁধু।'

'আমি তবু সত্য অকপটে স্বীকার করলাম। তোমার সে সরলতাও নেই। আসলে বঁধুটঁধু তোমরা চাও না। চাও একটি নারী। কেউ হাতের কাছে এসে গেলেই হলো।'

সিগারেটের জন্ম পকেটে হাত চুকিয়ে আবার বের করে আনল রমেন। মনে পড়ল ফুরিয়ে গেছে। রমেন মহাশ্বেতার কথায় কোনই রস পাচ্ছিল না। একটু নড়ে চড়ে বসে বলল, 'বাজে কথা থাক। আজ তোমাকে বলতে হবে, আমাকে তুমি ভালোবাস কি না।'

মহাশ্বেতা হাসলো।

'তুমি ভালোবাসা সম্বন্ধে খুব সিনিক?'

'বোধ হয়।'

'ভালোবাসার কথা ভাবতেও চাও না?'

মহাশ্বেতা হেসে বলল, 'ঈশ্বর-বিশ্বাসীর চাইতে নাস্তিক ব্যক্তি ঈশ্বরকে ভাবে বেশী জেনো।'

'কথাটা বুঝতে পারলাম না।'

'নাস্তিক গাছ মাটি নুড়ি পাথরকে ভগবান ভাবতে পারে না। সে বসে বসে কেবল ভাবে ভগবান আছে কি? থাকলে, কোথায় পাব তারে।'

'আমাদের ভালোবাসা তুমি ভালোবাসাকে খুঁজছ?'

মহাশ্বেতা হাসল। 'এই রকমই কিছু।'

'কিন্তু, ফাগুন যখন যাবে গো নিয়ে ফুলেরি ডালা, কি দিয়ে তখন গাঁথিবে মালা হে গরবিনী?'

রমেনের দিকে সপ্রশংস চোখে তাকিয়ে মহাশ্বেতা হেসে বলল, 'ফাগুন নিয়ে গেছে ফুলের ডালা। মালা গাঁথা আর হলো না। আমার বয়স কত জানো?'

'জানি। তুমি বিশ্বজিতের চেয়ে তিন বছরের ছোট ছিলে। তবে আমারও তিন বছরের ছোট তুমি। আমার বয়স এখন আটত্রিশ। অতএব তোমার বয়স পঁয়ত্রিশ। সোজা হিসেব। কিন্তু বয়স দিয়ে কি হবে?'

'বয়স দিয়েই সব হয়। তোমাকে মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম আমার বয়স—আর তার সঙ্গে মনে করিয়ে দিতে চাচ্ছিলাম আমার বড় ছেলের বয়স সতেরো।'

'দেখলে, মনে আছে আমার! তারপর?'

'এ কথাগুলি তোমায় পথ দেখাবে।'

'আমি পথ হারিয়েছি?'

'যেন না হারাও—সেই জন্যই বলা।'

'না, মহাশ্বেতা, আমি অলরেডি পথ হারিয়ে বসে আছি। ফুলের মালা চাই না। শুধু হাত দুটোই তুমি আমার গলায় পরিয়ে দেও। তবেই আমি চরিতার্থ হবো।'

মহাশ্বেতা হাসির ভাব করে নদীর দিকে তাকিয়ে রইল।

রমেন বলল, 'হাত দুটো গলায় পরিয়ে দিতে বলতেই তোমার মুখের এতো কথা বন্ধ হয়ে গেল? আমাকে তোমার ভিক্ত লাগে মনে হয়।'

মহাশ্বেতা নদী থেকে চোখ ফিরিয়ে এনে বলল, 'ছেলে মানুষী হয়ে যাচ্ছে। এ সব কথার কোন মানে হয় না। কাজ থেকে তোমাকে টেনে তুলে নিয়ে এলাম কি আমি এমনি? ভালো লাগে বলেই তো।'

'বেশ, গলায় না হয় হাত নাই পরালে। শুধু আমার হাত হাতে তুলে নেও দেখি?'

বিস্তর বোধ করল মহাশ্বেতা। 'এই না বয়স মনে করিয়ে দিলাম ?'

'ধ্যাৎতেরি তোমার বয়স। বিবাহিত থাকলে কি তোমার দাম্পত্য জীবন ফুরিয়ে যেত ? না মহারাজীর মতো দুজনে ভাই বোন সম্পর্ক পাতিয়ে নিতে ?'

'বিবাহিত তো নেই।'

'তবে আমার হাত ধরতে তোমার আপত্তি কি ? সে থাকলে কখনই তোমাকে আমি এ কথা বলতাম না।'

'তোমার স্ত্রীটি কি হারিয়ে গেল ?'

'স্ত্রী থাকলে বুঝি কেউ ভালোবাসতে পারে না কাউকে ?'

'উচিত নয়।'

'ঠিক আছে। আমি তোমার মতো উচিতের খুঁটিতে গরু বাঁধা হয়ে নেই।'

'আমি আছি।'

মুখ খরখরে করে রমেন বলল, 'তোমার আকর্ষণ এই জায়গার প্রতি। আমার প্রতি নয়—এটা আমি বেশ বুঝতে পারছি।'

মহাশ্বেতা নরম গলায় বলল, 'না রমেন, তোমার এ অভিযোগ সত্য নয়। এই যে প্রাকৃতিক দৃশ্য বসে বসে আমি এতো উপভোগ করি—এতো খুশি হয়ে উঠি—তুমি সঙ্গে না থাকলে কি এ সবের ভেতর সুখ থাকত ? একা বসে দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম।'

'সত্য বলছ ?'

'সত্য বলছি। সখ্যতার মতো সুন্দর কিছু আছে নাকি ?'

এ কথা কানে গেল কি না রমেনের বোঝা গেল না। সে যেমন অন্যমনস্ক তেমনি অশান্ত হয়ে উঠেছিল ভেতরে ভেতরে। তার হাত দুটো কাঁপছিল। যেন অন্যমনস্কতার সাথে একটা বিরাট আলোড়নও চলছে মনের মধ্যে। হঠাৎ একেবারে উঠে পড়ে বলল, 'খিদে পেয়ে গেছে। চলো কোথাও বসে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।'

বোট ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে না করলেও তক্ষুণি উঠে পড়ল মহাশ্বেতাও। একে তখন রমেনকে খেতে দেয় নি তা পেট্টি। এখন আর আপত্তি করা চলে না। তাতে এখন না উঠলে বাড়ি ফিরতে দেরী হয়ে যাবে। এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে।

সন্ধ্যার গঙ্গা তখন লোকের ভিড়ে অরণ্য। সিঁথি গুজরাটী পাঞ্জাবী বাঙালীর সাত মেশালো নারী পুরুষ শিশুর ভীড়। ফেরিওলার ভিড়ে পা ফেলার জায়গা নেই। কোন মন্ত্রে বেরিয়ে এলো রমেন আর মহাশ্বেতা। হাঁটতে হাঁটতে অনেকটা পথ গিয়ে তবে ট্যাকসি পেল। ট্যাকসিতে বসে মহাশ্বেতা বলল, 'আর কিন্তু আমি দেরী করব না। ছেলে মেয়েরা বাড়িতে একা রয়েছে।'

উস্‌কো চুলের ভেতর হাত চালাতে চালাতে রমেন শুধু বলল, 'হুঁ।'

'হুঁ মানে ?'

'তোমার আত্মা আছে তো।'

'আত্মা থাকলেই হয়ে গেল নাকি ? আত্মা আর মা কি এক ?'

'সে তো নিশ্চয়ই নয়।' চুলগুলি আঙুল দিয়ে সমানে পেছনে ঠেলতে লাগল রমেন।

'তুমি যেন হঠাৎ অন্য জগৎ থেকে কথা বলছ মনে হচ্ছে ?'

'তোমাকেও সে জগতে নিয়ে যাবো—একা যাবো না।'

'মানে ? তোমার কথা আমি বুঝতে পারলাম না।'

'তোমাকে আমি কোন সময়ই বুঝতে পারলাম না। তুমি না হয় একদিন আমায় বুঝতে নাই পারলে।'

মহাশ্বেতা চুপ করে গেল।

একটা রেস্তোঁরায় এসে নামল ওরা। ট্যাক্সি ভাড়া মিটিয়ে দিতে হলো মহাশ্বেতাকেই। কারণ রমেনের পকেটে একশ' টাকার নোট।

রেস্তোঁরার ভেতরে ঢুকে যেমে পড়ল মহাশ্বেতা। নদীর পাড়ে খোলা আকাশের তলায় মানুষগুলি শুধু দাঁড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। কিন্তু এখানে ঘরের টেবিলে টেবিলে যেন মাথায় মাথায় গিজগিজ করছে মানুষ। এই

ঘরেরই কোনের দিকে আবার নানা রঙের বাঁশের কঞ্চির বরফি-বেড়া দিয়ে তৈরী একটা ফ্যামনবেল বার। হালকা লেসের পর্দা পাখার হাওয়ায় দুলছে। সেখানেও এক গাদা মানুষ বসে রয়েছে ড্রিঙ্কের গ্লাস হাতে। অস্ফুট কণ্ঠে মহাশ্বেতা বলে উঠল, 'চলো এখান থেকে শিগ্‌গির। খাবারের গন্ধে, ড্রিঙ্কের গন্ধে, মানুষের গন্ধে আমার গা গোলাচ্ছে।'

বেরিয়ে এলো ওরা।

মহাশ্বেতার চোখের ওপর ভেসে উঠল গঙ্গার পাড় থেকে শুরু করে ছোট বড় মাঝারি সব হোটেল রেস্তোঁরা চায়ের দোকানগুলি। সর্বত্রই লোকে লোকারণ্য। আর সবাই কেবল খাচ্ছে। সন্ধ্যার কলকাতা কেবল বুঝি খায়-ই।

'কি করবে?' জিজ্ঞাসা করল সে।

রমেন যেন কী ভাবছিল। মহাশ্বেতার প্রশ্নে সজাগ হয়ে বলল, 'একটু দাঁড়াও। আমি এক্ষুণি আসছি।'

মহাশ্বেতাকে দাঁড় করিয়ে রমেন চলে গেল। একটু বাদেই ফিরে এসে বলল, 'চলো।'

ওরা গিয়ে লিফটে উঠল। লিফটটা সরসর করে ওপরে উঠে চলল। বেশ অনেক উপরে গিয়ে থামল। কী'তলা উঠল মহাশ্বেতা বলতে পারবে না। লিফট চালক দরজা খুলে দিল। ওরা বেরিয়ে এলো খাঁচা থেকে। মনেই হলো মহাশ্বেতার এ যেন অন্য জগতে এসে নামল সে। গরমে গায়ের ব্লাউজ ভিজে গিয়েছিল নীচে। এখানে শীতের আমেজ। একটু বাদেই বোধ হয় চাদর গায় দিতে ইচ্ছে করবে। নানা গন্ধে নীচের তলায় নিঃশ্বাস চেপে আসছিল। এখানে বারান্দায় চলতে চলতে প্রতি নিঃশ্বাসে টেনে নিচ্ছে সে মৃদু কস্তুরি গন্ধ। মহাশ্বেতার মনে হলো ওরা দুজন আর যে বেয়ারা ওদের নিয়ে চলেছে—এই তিনজন ছাড়া এখানে আর জনমানব নেই। এ জায়গাটার যেন মাটির সঙ্গে কোন যোগ নেই। আকাশের সঙ্গেও না। মাঝখানে ঝুলছে।

চওড়া বারান্দা দিয়ে বেশ কতকটা চলে বেয়ারা একটা ঘরের কাছে থামল। বন্ধ দরজার চাবি খুলে পুসডোর ঠেলে ধরল।

রমেন ভিতরে ঢুকে মহাশ্বেতাকে ডাকল 'এসো।'

ঢুকতে হলো মহাশ্বেতাকে।

বেয়ারা ছেড়ে দিতে নিজেই বন্ধ হয়ে গেল দরজা। মহাশ্বেতা তাকাল ঘরটার দিকে। বুঝল এই রেস্তোঁরার উপর তলাটা প্রথম শ্রেণীর হোটেল। এই ঘরটা তারই একটা সিঙ্গল-বেড কামরা। একদিকে সুন্দর কার্পেটের উপর সোফা সেটার টেবিল সাজানো বসবার ব্যবস্থা। অন্যদিকে স্প্রিংয়ের খাটে ডানলোপিলোর বিছানা। ফোন আছে। ড্রেসিং টেবিল আছে। ফুল আছে।

রমেন ঢুকেই বসে পড়ছিল। মহাশ্বেতাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে কেন? বোস।'

বসল মহাশ্বেতা।

বেয়ারা দরজায় নক্ করল।

রমেন তাকে ভেতরে আসতে বলল। ভেতরে এসে বেয়ারা 'কি দেবে' সেই আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইল।

রমেন বলল, 'কষি চিকেন হাওউইচ্—আর কিছু—' মহাশ্বেতার দিকে তাকাল সে।

'না। আমার দেরী হয়ে যাচ্ছে।'

বেয়ারাকে বিদায় দিল রমেন। তারপরই 'আসছি' বলে উঠে গেল। মিনিট চার পাঁচ বাদে ফিরে এলো দু'প্যাকেট ব্ল্যাক এণ্ড হোয়াইট সিগারেট হাতে। বসল, সিগারেট ধরালো। পা দুটো ছড়িয়ে দিল সামনে।

মহাশ্বেতার ভালো লাগছিল না। মাটির সঙ্গে সংস্পর্শ নেই এমন বাড়িগুলিকে সে বলে আকাশ-কবর খানা। তার ধারণা এ সব বাড়িতে বেশীদিন বাস করলে মনের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু সে কিছুক্ষণের জন্য এসে বসেছে মাত্র—সেটা কিছু নয়। কিন্তু এখানকার পুরো আবহাওয়াটাই অস্বাভাবিক লাগছিল তার। তাই অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছিল সে। এখানে যেন অনেক কিছু ঘটে—যা কুৎসিত আর নোংরা। এই পরিবেশে একটা

দোবার ঘরে রবেনের সঙ্গে বসে থাকতে অস্বস্তি বোধ করছিল এমনিতেই—তার উপর রবেনের চাল চলন, অন্যমনস্কতা, দু পা ছড়িয়ে বসা আরো বিশ্রী লাগছিল ওর।

রবেন বোধহয় মহাশ্বেতার মুখের কাঠিন্য আঁচ করল। একটু সচেতন হলো সে। ছড়ানো পা গুটিয়ে নিয়ে বলল, 'একেবারে চুপ যে? তোমার চুপে ঘরটা পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে আছে।'

'কথা বলো। তবেই আর ঘর স্তব্ধ থাকবে না।'

'কথায় তো তোমার একচেটিয়া অধিকার। তাতে কথা বলার আটটিও আয়ত্তে রয়েছে তোমারই।'

'মেয়েরা কথা বলতে ভালোবাসে।'

'ছেলেরা ভালোবাসে আসল কাজ।'

কথাটার অশ্লীল ইঙ্গিতে মহাশ্বেতার কানদুটো গরম হয়ে উঠল। কিন্তু সে সহজ রইল। বলল, 'একটা কিছু কথা তোল। তারপর না হয় আমিই বলে যাবো।'

'নিজের গাড়ি থাকতে ট্যাকসির পেছনে ছোটাছুটি আমার আর সহ্য হচ্ছে না। এ বিষয়ে তোমার মত কি—সায়মন দেও। তোমার কথায় তো সায়মন বস্তুটি থাকে।'

'তবু বন্ধু থাকা ভালো আবর্জনা থাকার চাইতে।'

রবেন তাকিয়ে ছিল একলক্ষ্যে মহাশ্বেতার শরীরের দিকে।

বেয়ারা দরজায় নক্ করে ট্রে হাতে এসে ঘরে ঢুকল। সেন্টার টেবিলের ওপর ট্রে নামালো। মহাশ্বেতা স্তম্ভিত হয়ে দেখল ট্রেতে হুইস্কির বোতল রয়েছে···তবে হুইস্কি দেবার কথা বলতেই রবেন উঠে গিয়েছিল। বেয়ারা চলে যাবার জন্য অপেক্ষা করতে লাগল মহাশ্বেতা। বেয়ারা পেগ মেপে গ্লাসে ঢেলে, সোডার বোতল খুলে সোডা মিশিয়ে চলে গেল। সোজা হয়ে বসল মহাশ্বেতা। শক্ত গলায় বলল, 'এর মানে কি?'

'তুমি কফি ড্রাংকউইচ খাবে। আমি সসেজ্ দুইস্কি খাবো—পরিষ্কার মানে। আমি ড্রিঙ্ক করি তুমি জানো।' বলে বসবার আসন থেকে কিছু এগিয়ে বসে নিজেই মহাশ্বেতার কফি তৈরী করতে লাগল রবেন।

'কিন্তু আমার সামনে কখন ড্রিঙ্ক করেছ!'

'কখনও যা করিনি, কোন দিনও তা করব না এমন কোন কথা নেই।'

'কোন দিন যা করোনি আজ তা করবে কেন?'

কফির পেয়ালা মহাশ্বেতার দিকে রেখে রবেন বলল, 'তুমি আমাকে নিয়ে খেলছ।'

'আমি তোমাকে নিয়ে খেলছি না। আমি যতটুকু বাইরে চলি, ততটুকু আমার ভেতরেও সত্য। কিন্তু তুমি কি করছ? ভালোবাসছ আমাকে?' বিদ্রূপে শানিয়ে উঠল মহাশ্বেতার ঠোঁট।

রবেনের ঠোঁটও ভোঁতা নেই। দু চোখ ছোট করে তীক্ষ্ণ চোখে মহাশ্বেতার দিকে তাকিয়ে বলল, 'না ভালোবাসছি নে। কাজের জগৎ পুরুষের দখলে। তাই মেয়েরা কাজের জগতে এগোনোর সহজতম পথ বেছে নিয়েছে পুরুষের বিহারের নৌকোয় উঠে বসে ভরতর করে এগিয়ে যাওয়া। আর তুমি নৈসর্গিক শোভা দেখার লোভে আমার নৌকায় একেবারে উঠে না বসে শুধু একটু পা রেখে চলছিলে, আমি টান দিয়ে নৌকায় তুলে নিচ্ছি।'

'টান দিয়ে! মানে ওওামি করে? আমি বিশ্বাস করছি না ও কথা। কখনই তুমি আমার সঙ্গে কোন বর্বর ব্যবহার করতে পারো না।' গলা কাঁপতে লাগল মহাশ্বেতার।

'বর্বর ব্যবহার? আমার সঙ্গে একা একা রাত পর্যন্ত ঘুরেছ কেন?'

'একা একা! তবে কি আরো নিয়ে ঘুরব বাকি?'

'ঘুরছ যখন তখন তুমি যতই অস্পর্শ থাকো—সে কথা কেউ বিশ্বাস করবে না।'

'আমি বাইরের বিশ্বাস চাই না। আমার নিজের প্রতি নিজের বিশ্বাসটাই বড় কথা। পুরুষের সঙ্গে বলেই যদি কেউ সভ্যতার গায় কালা ছিটায়—কিছু এসে যায় না আমার। প্রথম যে মেয়ে জুতো পরেছিল, তার পায় জুতো ছুঁড়ে মারা হয়েছিল। নতুন পথে সব ব্যাপারেই শহীদ হতে হয় কিছু লোককে।'

তারপর কাতরতার সঙ্গে নরম মিষ্টি সুর মিশিয়ে রমেনকে শান্ত করবার উদ্দেশ্যে বলল, 'তোমাকে বন্ধুত্ব দিয়ে খুশি করতে পারছি না—এটা আমারই দুর্ভাগ্য। এটা জেনো রমেন, ইচ্ছে করলেই প্রেম করা যায়। কিন্তু ইচ্ছে করলেই প্রেমে পড়া যায় না। একটু আগেই তুমি বলেছিলে, আমি তোমাকে নিয়ে খেলছি। কিন্তু খেলছি না বলেই যে প্রেম করছি না—এটা বুঝছ না। আমি সত্যি তোমার বন্ধুত্ব চাই রমেন।'

'এ সব বন্ধুত্বের কোন মানে নেই আমার কাছে।'

'তোমার সঙ্গে এই যে বেড়িয়েছি, খেয়েছি, ঘুরেছি, কত গল্প করেছি দুজনে বসে—এ সবের কিছু মানে নেই? মানে আছে শুধু একটা বিছানায়? তবে তো আগের দিনে চলে যেতে হয়। শত হাত দূরে থাকতে হয় তোমাদের কাছ থেকে।'

কোন উত্তর না দিয়ে রমেন হুইস্কির গ্লাস তুলে নিয়ে ঠোঁট ডোবালো।

মহাশ্বেতাও তক্ষুনি এক ঝটকায় রমেনের মুখের গ্লাস কেড়ে নিয়ে কার্পেটের উপর হুইস্কি ঢেলে ফেলে দিল। তারপর শূন্য গ্লাস ট্রের ওপর রেখে বলল, 'বেয়ারাকে দিয়ে একটা ট্যাকসি আনিয়ে নেও। আমি চলে গেলে যত ইচ্ছে খেয়ো। ম্যানেজারকে বললে খেয়েও পেয়ে যাবে।'

চোখ কুঁচ্‌কে মহাশ্বেতার দিকে তাকিয়ে রইল রমেন।

'আমিই ডাকছি বেয়ারাকে—' বলে উঠতে যেতেই, রমেন উঠে দাঁড়াল। বলল, 'বেয়ারাকে বললেই সে তার কাজ ফেলে ট্যাকসি আনতে ছুটবে না। আমি ম্যানেজারকে বলে আনিয়ে দিচ্ছি—' রমেন দরজা ঠেলে বেরিয়ে গেল।

রমেনকে আর বিশ্বাস করে না মহাশ্বেতা। সে সত্যি ট্যাকসি আনার কথা বলতে গেল, না অন্য কোন মতলব মাথায় এসেছে কে জানে! ওকে এখান থেকে এক্ষুনি চলে যেতে হবে। দরজা ঠেলে সেও বেরিয়ে এলো বারান্দায়। নিথর পড়ে রয়েছে বারান্দাটা। এক কোনে একটা বিরাট এয়ারকণ্ডিশন চলছে। সেই শব্দ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। লিফটটা কোন দিকে? এদিক ওদিক তাকাতে লাগল মহাশ্বেতা। বুঝতে পারল না। একটি কামুক-দুরন্ত ছেলে ভীষণ ডিঙ্ক করে এ দিকেই টলমলে পায় আসছে দেখে তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে পড়ল মহাশ্বেতা। দরজার পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল যেন ঘরে ঢুকতে না পারে তারপর বেশ কিছু সময় পার হয়ে গেলে—এসে বসে পড়ল সোফার ওপর। তার সর্ব্ব শরীর তখন কাঁপছে। আর বেরুতে সাহস করল না। বাধ্য হয়েই অপেক্ষা করতে লাগল রমেনের।

রমেন যখন এলো তখন তার চুল মাথার ওপর উড়ছে। পা টলছে। দু চোখ জবা ফুলের মতো টক-টকে লাল।

ঝট্‌ করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মহাশ্বেতা—'ড্রিঙ্ক করে এলে!'

টলতে টলতে সোফার মাথাটা ধরে টাল সামলে রমেন বললো, 'ড্রিঙ্ক করে নয়—মদ খেয়ে এলাম—মদ।' গালে হাসির ভাঁজ ফেলে জড়িত জিবে বলে চলল রমেন, 'দেখলাম মদ না খেলে তোমার সঙ্গে পেরে উঠব না। চক্‌ চক্‌ করে কয়েকটা ব্ল-পেগ গলায় ঢেলে এসেছি—পা-টা একটু টলছে—ডোণ্ট মাইণ্ড। কি খেয়া করছে? তোমার ওভলয়া বাণীর মূল্য দিই না বটে কিন্তু কথাগুলি খুব মনে থাকে।—কবে যেন—বলেছিলে—একদিনের জন্যও দেশের নেতৃত্ব পেলে তুমি সেই মুহূর্তে মদ বন্ধ করে দিতে। ঈশ্বর বেঁচে থাকুন—এক সন্ধ্যার রাণীও তুমি—কোন—দিন হতে পারবে না।' মাথা নাড়তে লাগল রমেন—'এক সন্ধ্যার রাণীও না। আমরা নিশ্চিন্ত চিত্তে মদ খেয়ে যেতে পারব। বরং শ্রীমতী মহাশ্বেতা দেবী প্রস্তুত হোন—দিনে দিনে আরও মদের 'বার'—বাড়ন্ত দেখবার জন্য। লেন থেকে বাই লেনে বাঁকা মাথায় ফেরিওলা হেঁকে যাবে—চা-ই হ-ই-স্কি বি-য়া-র রাম। চা-ই, ব্রা-ণ্ডি; জিন—জাম্পেন। লেস কিন্তা কাচের চুড়ি কিনতে কিনতে মেয়েরাও দু এক গ্লাস ফেরিওলা ডেকে খেয়ে—নিতে পারবে। আমরা—তোমাদের কোন রসে বঞ্চিত—রাখতে চাই না। কোন

বসে না। তোমরা রসবতী হলে—তবে না আমরা রসময়। মাতাল মেয়ের মোহময় মত্ততার কাছে সাধা চোখের মেয়ে ছাইভস্ম—।

মহাশ্বেতার ভয়ে মেঝেয় সিঁটকে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত ভাবে সোফার হাত তুলে নিতে গিয়ে আবার টাল খেল রমেন। তবু আর সোফার মাথা ধরল না। আচ্ছন্নের ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার—মেয়ের—আমার কি আসে যায়?—কি আসে যায়—তুমি? আই—ডোণ্ট—কেয়ার—আমি গ্রাহ্য করি না—' বলেই পা বাড়াতে গেল রমেন।

মহাশ্বেতা দু পা পিছিয়ে গেল। রাগে অপমানে ফুলতে লাগল সে। কোনমতে বলল, 'আর মাত্রা ছাড়াবে না বলছি। অনেক ছাড়িয়েছ।'

'মাত্রা?' তলার ঠোঁটটা ঝুলিয়ে দিল রমেন। বলল, 'হাতের লেখা—যেদিন শেষ করেছি—তারপর—থেকে মাত্রার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নেই—কোন সম্পর্ক—না—' বলেই এগিয়ে গিয়ে মহাশ্বেতার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বিছানার দিকে টেনে নিয়ে চলল।

নিজেকে রমেনের কবল থেকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করতে গিয়ে মহাশ্বেতার শাড়ি খুলে গেল। ব্লাউজ ছিঁড়ল। খোঁপা ভাঙল। হাতের ঘড়ি ছিটকে চলে গেল যেন কোথায়। শেষ পর্যন্ত নিজেকে ছাড়িয়ে এনে মহাশ্বেতা হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, 'মদকে ঘৃণা করি কেন—দেখো। যতক্ষণ মদ খাওনি, তবু মানুষ ছিলে। পশু হবার জন্য মদ খেয়ে আসতে হলো। গলিতে গলিতে মদের দোকান খোলা হচ্ছে, তোমাদের পশু বানিয়ে রাখার জন্য-ই।'

খুলে যাওয়া শাড়ি পেটের কাছে জড়ো করে মুঠোয় ধরে কোনের কাছে গিয়ে ফোন তুলে নিল মহাশ্বেতা। বলল, 'আমি তোমার স্ত্রীকে ফোন করব।'

হাঁপাচ্ছিল রমেনও। এগিয়ে এসে মহাশ্বেতার হাত চেপে ধরল রমেন ফোন সুদ্ধ।

মহাশ্বেতা বলল, আবার যদি তুমি পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়—আর বাধা দেব না। কিন্তু এটা জানবে, ভীষণ—সাংঘাতিক প্রতিশোধ নেবো। তোমার স্ত্রীকে জানাবো। চাকরী খেয়ে নেবো—'

সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাট ওজনের থাপ্পড় এসে পড়ল মহাশ্বেতার মুখের ওপর। চোখে অন্ধকার দেখল সে। 'মাগো—' বলে দু হাতে মাথা ধরে বসে পড়ল সে কার্পেটের উপর। মাথা ঝিমঝিম করছিল। কতক্ষণ বসে থেকে সামলে নিয়ে মাথা তুলতেই দেখল রমেন ঘরে নেই। মুহূর্তে উঠে দাঁড়াল সে। রমেন আবার আসবার আগেই তাকে এখান থেকে সরে পড়তে হবেই। ক্ষিপ্র হাতে শাড়ি পরল, চুল জড়িয়ে নিল। চোখে পড়ল ঘড়ি নেই! কোথায় পড়ল ঘড়ি? বুঝতে পারল না কোথায় পড়েছে। ট্যাকসিতে, গঙ্গার ধারে না রাস্তায়? কিংবা এখানে? ঘরটার এদিক ওদিক একটু খুঁজে দেখল। কিন্তু সময় নেই। রমেন কি অবস্থায় এসে হাজির হবে কে জানে। তার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে ওকে।

দরজায় নক্ করছে কে?

বুকটা ধড়াস করে উঠল মহাশ্বেতার। কিন্তু তখনই বুঝল—অকারণ ভয় পাওয়া। রমেন সাড়া দিয়ে আসবে না।

ঘরে এলো বেয়ারা। মহাশ্বেতা যেন বাঁচল বেয়ারাকে দেখে। ভড়িৎ কণ্ঠে বলল, 'তোমাদের লিফট কোন দিকে?

একটা ছোট্ট থালার উপর একটা কাগজ বেয়ারা বাড়িয়ে ধরল মহাশ্বেতার দিকে।

মহাশ্বেতা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি এটা?'

'বিল।'

'বিল সাহেবকে দেবে। লিফট কোন দিকে সেটা বল আমাকে।' ব্যগ্র পা চলার দিকে রেখে জিজ্ঞাসা করল সে।

বেয়ারা বলল, 'কিন্তু সাহেব তো চলে গেছেন।'

'সাহেব চলে গেছেন!' উরু থেকে পা পর্যন্ত মুহূর্তে পাথর হয়ে গেল যেন মহাশ্বেতার। কত টাকার বিল—থালা থেকে বিলটা তুলে নিল সে হাতে। নিষ্পলক

দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। বিলের যোগফলের অঙ্কের দিকে—এক রাতের থরচাড়া....একশ' টাকা। ব্রাণ্ডউইচ ....আট টাকা। সন্দেশ....আট টাকা। কফি...তিন টাকা পঞ্চাশ। ডিঙ্ক....বাট টাকা। মোট একশ' উনাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বিলটা যেন রমেনের হাতের আর একটা থাপ্পড়ের মতো মুখের উপর এসে পড়ল মহাশ্বেতার। মাথাটা ঝিম করে উঠল। পঞ্চাশ টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল পঁয়ত্রিশ টাকা চলে গেছে ট্যাকসি ভাড়ায়।...দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরে দাঁড়িয়ে রইল সে একটুক্ষণ। তারপরই গলার চিরন হারটা খুলে বেয়ারার হাতের ছোট থালাটার উপর ফেলে দিল। বলল তোমাদের বিলের চাইতে এটার দাম অনেক বেশী। ম্যানেজারকে বিলের টাকা দিয়ে বাকী টাকা তুমি নিও—বকশিশ। এখন আমাকে তোমাদের লিফট দেখিয়ে দেও।'

বেয়ারার চোখ চকচক করছে। মাথা নুইয়ে মস্ত সেলাম ঠুকল সে মেমসাহেবকে। বলল, 'ট্যাকসি ডেকে দেবো মেমসাহেব।'

'না—লিফট।'

'আসুন আমার সঙ্গে।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে এলো মহাশ্বেতা। আস্তে আস্তে চলতে লাগল রাস্তার দিকে লক্ষ্য রেখে ট্যাকসির জন্য। মনের অবস্থা কি, শরীরের হাল কি—এসব সে ভাবছে না। সে এখন শুধু বাড়ি গিয়ে পৌঁছোতে চায়।

কে যেন পাশে এসে তার সঙ্গে চলতে লাগল।

মহাশ্বেতা তাকাল। রমেন! বলল না কিছু! যেমন চলছিল তেমনি চলতে লাগল! যেন পথিক কেউ। ও চেনে না।

রমেনও সঙ্গে সঙ্গে চলতে চলতে বলল, 'তোমার কাছে আসবার সাহস দেখে তুমি অবাক হচ্ছ জানি। কিন্তু একটা দৃশ্য তোমাকে দেখানো কর্তব্য মনে করেই এলাম। কর্তব্যের ধারটার আমি ধারিনে। তবে বোধহয় তোমার অতন্দ্রা বাণী কিছু কাজ করেছে—' হাসল রমেন। 'বিবেকবোধ জাগল দেখলাম। আমার সঙ্গে এলে তোমাকে একটা চমৎকার দৃশ্য দেখাতে পারি। যা নিজের চোখে না দেখলে তুমি বিশ্বাস করবে না আমার কথা। দেরার সঙ্গে চাবকে দিয়ে বলছি

মহাশ্বেতার প্রতি তুরন্ত আক্রোশে রমেন ফুলছিল। প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য ছটফট করছিল। এতো শিগ্‌গির —ঠিক এই মুহূর্তেই যে তার সেই স্পৃহা পূর্ণ হবে, রমেন ভাবেনি। আনন্দে তার দুই চোখ চকমক করছে।

মহাশ্বেতার কানে যেন রমেনের কোন কথা যায় নি। রমেন যে সঙ্গে হাঁটছে তাও সে জানে না। মহাশ্বেতা হাঁটতে হাঁটতে ট্যাকসির অন্বেষণই করতে লাগল।

রমেনও নাছোড়। সে থামল না। বলল, যে দিকে যাচ্ছ, সে দিকেই আর কিছুটা গেলে একটা 'বার'। সেখানে তোমার ছেলেকে দেখতে পাবে বন্ধু বান্ধবীদের সঙ্গে বসে তাদেরই কাক জন্মদিন সেলিব্রেট করতে—'

একটা খালি ট্যাকসি দেখে হাত তুলে থামাতে যাচ্ছিল মহাশ্বেতা—হাত ঝুলে পড়ল।

সেটা লক্ষ্য করে রমেনের প্রতিহিংসা উদ্দাম হয়ে উঠল। মহাশ্বেতাকে হনন করার অস্ত্র জিহ্বায় শানিয়ে নিল। কিন্তু বাইরে ভঙ্গিটা রাখল নির্লিপ্ত—শুধু যেন ঘটনা বিবৃতকারী সে। বলল, 'তাদের সবার হাতেই হুইস্কির গ্লাস। খেয়েছেও তারা বেশ। আমি ঢুকেছিলাম আরো কিছু গলায় ঢেলে নিতে—দৃশ্যটা দেখে ভাবলাম, তোমাকে যদি পেয়ে যাই তো দেখাই—'

মহাশ্বেতার কপালময় বিন্দু বিন্দু ঘাম একের পর এক ফুটে উঠতে লাগলো। গলা বেয়ে ঘাম নামতে লাগলো। হৃদপিণ্ডটা আছড়াতে লাগলো কাটা কৈ মাছের মতো! শরীরটা এমন করতে লাগলো যে, সেও যেন মদ খেয়েছে পা টলছে। পৃথিবী দুলছে।

তবু হাঁটতে লাগলো সে।

আরো কিছু যেতেই রমেন হাত দিয়ে সামনে দেখিয়ে বললো, 'ঐ যে ঐ বারেই আছে রতন বন্ধুদের সঙ্গে। ভেতরে ঢুকবে?'

মহাশ্বেতা নীরবে পাশের পান-সিগারেটের দোকানের টুলটার ওপর বসে পড়লো।

রমেন ব্যস্তভাবে বললো, 'শরীর খারাপ লাগছে, ট্যাক্সি ডাকবো ?'

'আমি এখানে বসছি। তুমি থাকো।'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারছিলো না রমেন। এরপরও মহাশ্বেতার মতো মেয়ে থাকতে অনুরোধ করছে কতটা—চারদিক শূন্য দেখলে। রমেনের মনটাও মোচড় খেলো। আস্তে বললো 'আছি।'

পানের দোকানের মস্ত বয়কের চাঙড়টায় হাত বুলিয়ে বুলিয়ে ঠাণ্ডাজল এনে মহাশ্বেতা কপালে কানের পাশে বুলাতে লাগলো নিজেকে সুস্থ রাখার জন্য।

রমেন দাঁড়িয়ে লক্ষ্য রাখতে লাগলো 'বার'টার প্রতি।

কিছুক্ষণ পরই রমেন বললো, 'ঐ যে ওরা বেরিয়েছে। তোমাকে যদি দেখে ফেলে।'

মহাশ্বেতার কানে সে কথা গেলো না। সে তাকিয়ে রইলো নিষ্পলক দৃষ্টিতে রঙমহলের দলটার দিকে। সে দেখল তার প্রি-ইউনিভারসিটি দেওয়া সতেরো বছরের ছেলে বন্ধু আর বান্ধবীদের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে ঘরের 'বার' থেকে কলরব করতে করতে। কার পা টলছে। কার দু চোখ লাল। কেউ অতিরিক্ত হাসছে। কার পায়ের চটি একজায়গায় থেকে অন্য জায়গায়। এক-একজন এক-এক কথা বলছে আর হাসির হররা পড়ে যাচ্ছে।···· এই বাড়ি গিয়ে কি বলবি রে ? কিছু না। মাথা ধরেছে বলে শুয়ে পড়বো। আবার হাসি···নে এলাচ দানা খা···এক বান্ধবী ব্যাগ খুলে সবাইকে এলাচ-দানা পরিবেশন করতে লাগলো।····এলাচ দানা চাকবে দুইস্কির গন্ধ! বুদ্ধু কোথাকার। আমি খাবোনা···একজন এলাচদানা দাতৃ মেয়েটির মুখের কাছে হাত নেড়ে গেয়ে উঠলো—'রূপ তেরা মস্তানা····'

ওরা উলটো দিকে চলে যেতে লাগলো হল্লা করতে করতে।

মহাশ্বেতা দোকানের খুঁটি শক্ত মুঠোয় চেপে ধরে শরীরের কাঁপুনি থামাতে লাগলো। তার দু কানের ভেতর থেকে যে সিস্ দেওয়ার মতো শব্দ বেরুতে লাগলো সেটাকে তার ঘূর্ণায়মান মাথার মনে হতে লাগলো তীক্ষ্ণ সাইরেনের শব্দ। আর সেই সাইরেনের শব্দের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া শব্দ শুনতে লাগলো ফেরিওলা সেন বাই-লেনে হেঁকে চলেছে, চা-ই··· দুইস্কি, বিয়ার, রাম···· চাই মারিজুয়ানা····; হাশিস—হেরোইন····

• • •

"যে জাতি তার একান্ত অবস্থিতি পরিত্যাগ করে, যে সভ্যতা তার সক্রিয় আত্ম-সমর্থনে অবহেলা করে, তা নিশ্চিহ্ন হবে এবং যে জাতি তার সমর্থনে পুষ্ট হয়, তার আত্মা যায় হারিয়ে ও তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। প্রত্যেক জাতি বিকশিত মানব আত্মার এক একটি শক্তি বা ক্ষমতা এবং তা যে নীতির ধারক তা অনুসরণ করে। ভারবর্ষ-ভারতশক্তি—মহান আধ্যাত্মিক ভাবধারার এক জীবন্ত প্রতীক—তার প্রতি একান্ত আনুগত্য তার অস্তিত্বের মূল নীতি। কারণ একমাত্র তার ধর্মের জন্যই ভারত জগতে অমৃতত্বের অধিকারী দেশ-সমূহের অন্যতম; একমাত্র তাই তার বিস্ময়কর অবিচলিত স্থিতির এবং দীর্ঘ জীবনের অক্ষয় শক্তির গূঢ় রহস্য।"

—শ্রীঅরবিন্দ

প্রতিক্রিয়া

সমর বসু

—তোমার বিত্তের সঙ্গে আমার চিত্তের কোনও সম্বন্ধ নেই—দয়া ক'রে এই কথাটুকু স্মরণে রেখো।

—অর্থাৎ কি বলতে চাও তুমি?

মৃদুলা কিন্তু আর দাঁড়ালো না। শেখরের প্রশ্নের জবাবও দিল না।

প্রবল উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করল শেখর। তারপর জানালার কাছে এসে দাঁড়াল। দৃষ্টিকে প্রসারিত ক'রে দিল সুদূর দিগন্তে।.....

দূরের মাঠে গুটিকয় রাখাল ছেলে ছাগলছানাদের সঙ্গে খেলা করছিল। আরও দূরে একটি সাঁওতালদের মেয়ে মাটির কলসী কাঁখে নিয়ে বোধ হয় নদী থেকে জল আনতে যাচ্ছিল—ওদের খেলা দেখে থমকে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল। কলসী নামিয়ে একটি ছাগলছানাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতে লাগল।

জানালা থেকে সরে এল শেখর।.....উত্তেজনা আর নেই। তবে মৃদুলার কথাগুলো তখনও কানে বাজছে। "...তোমার বিত্তের সঙ্গে আমার চিত্তের কোনও সম্বন্ধ নেই!"—বাঃ, বেশ সুন্দর কথা বলেছে মৃদুলা। বেশ অর্থপূর্ণ কাব্যিক সংলাপ। অথচ এর অর্থটাই সে জানতে চেয়েছিল মৃদুলার কাছ থেকে।—আশ্চর্য!

আপন মনে একটু হাসল শেখর। তারপর টেবিলের ড্রয়ার খুলে একখানা লম্বা খাতা বার করে নিয়ে এল। সংলাপটি তার নূতন উপন্যাসের নায়িকার মুখেও বসিয়ে দিতে হবে। কিন্তু কোথায়! কোন্ সিচুয়েশনে।

পাতা উল্টাতে লাগল শেখর। (উপন্যাসটির চিত্রনাট্যও শেখরকে লিখতে হবে। কেননা, এর আগে—অন্য লেখকের লেখা কয়েকটি উপন্যাসের সার্থক চিত্রনাট্য রচনা করে সিনেমা জগতেও শেখর বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে)।...

একটি ছোট দৃশ্য। নায়ক অফিসে বেরুবে—এমন সময় নায়িকা এসে বলল,—বিকালে আমি একটু মার্কেটে বেরুবো। গাড়িটা পাঠিয়ে দিও।

গলায় 'টাইটা' আঁটতে আঁটতে নায়ক বলল—'বিকালে আমার engagement আছে। তুমি Taxi করে যেও!'

কোটটা কাঁধের উপর ফেলে একটা সিগারেট ধরাল নায়ক। নায়িকার মুখের রেখা গুলো ক্রমশঃ কেমন কঠিন হয়ে যাচ্ছে মনে মনে তা দেখতে লাগল। কিন্তু সোজাসুজি মুখের দিকে তাকাল না।

নায়িকা কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কি যেন বলতে গেল—কিন্তু বলল না। ধীর পায়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।.....—

....ঠিক এই জায়গায় সংলাপটি কি বসানো যাবে!—নাঃ! বেখাপ্পা শোনাবে।...

আরও দু'একটি পাতা উল্টালো শেখর। আর একটি দৃশ্য।.....

মফঃস্বল শহরের প্রান্তে একটি আবাসিক বালিকা বিদ্যালয়ের ফটকের সামনে নায়কের গাড়ী এসে দাঁড়াল। ড্রাইভার নেই! নায়ক নিজেই গাড়ী চালিয়ে এসেছে।

দারোয়ান সেলাম ঠুকল,—বোধ হয় গাড়ীকেই। ভাঙা বাঙলায় জিজ্ঞেস করল—"কাঁহাসে আয়েছেন বাবু-সাহেব। আজি তো ইস্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে।"

গাড়ী থেকে নামল নায়ক। ফটকের কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল,—দিদিমণিরা কোথায় থাকেন?

—কৌন্ সা দিদিমণি?—দারোয়ান জিজ্ঞেস করল।

নায়ক কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল—'সুরঞ্জনা মিত্র।'

দারোয়ান মুখ গম্ভীর ক'রে আকাশ পাতাল কি ভাবতে লাগল। তারপর ঘাড় নেড়ে রূঢ়স্বরে জানালো—ও নামে এখানে কোনও Teacher নেই।

এতক্ষণে খেয়াল হল নায়কের যে নামটি সে নিজেই দিয়েছিল—অবশ্য বিয়ের আগে। এবং পদবীটি বিয়ের পর সে পেয়েছে। কিন্তু স্কুল-কলেজের মাটিফিকেটে লেখা আছে তার কুমারী নাম এবং পদবী। সেই সার্টিফিকেট দেখিয়েই যখন চাকরি—তখন সুরঞ্জনা মিত্রের আবরণ অথবা আভরণটি খুলে ফেলে দিয়ে আইপোরে সুধাময়ী বসুই হয়ে যেতে হয়। হয়তো সিঁথির সিঁদুরটাকেও ঢেকে দিতে হয় (একেবারে তুলে দিতে না পারলে—পারাটা অবশ্য খুব সহজ নয়) কুঞ্চিত কেশের আড়ালে কবরী রচনার বিশেষ কৌশলে। অতএব সুরঞ্জনা নয়, বিশুদ্ধ সুধাময়ী।

নায়ক বলল, 'আচ্ছা! সুধাদিদিমণিকে তুমি চেন?'

—হাঁ, হাঁ, খুব চিনি! আপনি এই ঘরে এসে বসুন। আমি ভেতরে খবর দিচ্ছি। —লেকিন্ আপকা কেয়া নাম! দিদিমনি যখন পুছবে তখন কি বলব!

নায়ক একটু চিন্তিত হল। ঠিক নাম বললে সুরঞ্জনা হয়তো দেখা করবেনা, কোনও অজুহাত দেখিয়ে দারোয়ানকে তাগিয়ে দেবে। অথচ সুরঞ্জনার সঙ্গে আজ দেখা করতেই হবে। এত তেল পুড়িয়ে এতখানি পথ সে এসেছে—দেখা না করে ফিরে গেলে সবটাই লোকসান সুতরাং নায়ক আর ইতস্ততঃ না করে বলল,—দিদিমণিকে গিয়ে বলবে—কলকাতা থেকে তাঁর একজন দাদা এসেছেন—দেখা করতে। বললেই সে বুঝতে পারবে।

দারোয়ান সেলাম ঠুকে চলে গেল।

বিয়ের আগে সুধার সঙ্গে যখন প্রথম পরিচয় হয়েছিল তখন সুধা ওকে দাদা বলেই ডাকত। বলত—পার্থদা! পরে অবশ্য আরও ঘনিষ্ঠ হলে—আধুনিকাদের মত কখনও নাম ধরত, কখনও বা বলত—'এই'।

অতীতের সেই দৃশ্যগুলিই নায়কের চোখের সামনে ফুটে উঠল। মৃদু হেসে আপন মনে বলল,—তুমি যখন অনায়াসে এতদিন পরে সুধা হতে পার, তাহলে আমার পক্ষে পার্থদা হতে বাধা কোথায়!

সুতরাং নিশ্চিন্ত নায়ক—বিশ্বাসের এবং তাকে ঘিরে যে পরিবেশ গড়ে উঠেছে তারই মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখল।...

দূর থেকেই পার্থকে দেখতে পেয়েছিল সুধা। মুহূর্তের জন্য—বিচলিতও হয়েছিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে দুর্বলতাটুকু কাটিয়ে নিয়ে অত্যন্ত সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে এসে মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল,—কী খবর পার্থ! বলা নেই, কওয়া নেই, একেবারে দশরীরে এসে সাক্ষাৎ। ঠিকানা পেলে কোথায়!

দারোয়ান ফটকের পাশে বসে খৈনী তৈরী করছে আর মাঝে মাঝে চোরা চোখে চাইছে এদের দিকে।

সেখর তা লক্ষ্য করল। এবং লক্ষ্য করে বুঝতে পারল সুধার সাবলীল ব্যবহারে বিস্ময় প্রকাশ করা চলবেনা। তাই অত্যন্ত মৃদু গলায়—যাতে শুধু সুধাই যেন শুনতে পায়,—আর কেউ না,—জিজ্ঞেস করল—তুমি কি এইখানেই থাকবে সুরঞ্জনা! বাড়ী ফিরবেনা? মানে আমার কলকাতায় আর যাবে না?

—একথা তো চিঠি লিখেই জানতে পারতে, তার জন্য তেল পুড়িয়ে ব্যবসারে ক্ষতি করে এতদূরে আসবার তো কোনও দরকার ছিল না। তবে তুমি যদি ভেবে থাক যে তোমার physical presence এ আমি অভিভূত হব, তা হলে জেনে রেখে দিও—সেখানেও তুমি ভুল করেছ।

একটা সিগারেট ধরাল পার্থ। কপালের ঘাম মুছে নিয়ে বলল,—আমার প্রশ্নের উত্তরটা কিন্তু এখনও পাইনি।

সুধা শব্দ করে হেসে উঠল। বলল,—এখনও তুমি ঠিক আগের মতই বোকা আছ। সোজাসুজি উত্তর না দিলে কিছুই বুঝতে পারনা। সুতরাং স্পষ্ট করেই বলি,—তোমার কাছে ফিরে যাওয়া বোধ হয় আমার পক্ষে আর সম্ভব হবে না।

—'বোধহয়' কেন বলছ? তাহলে এখনও তুমি নিঃসংশয় হতে পারনি।

সুধা চুপ করে রইল।

পার্থ উৎসাহ পেয়ে জোরে বলল,—তাহলে মনে হচ্ছে তুমি একটা শর্ত আরোপ করতে চাও। অর্থাৎ নিঃসর্ত আত্মসমর্পন করতে তুমি রাজী নও। কিন্তু তুমি কি একবার ভেবে দেখেছ—আমার বাড়ী, গাড়ী, Bank Balance, মান সম্মান, সামাজিক প্রতিষ্ঠা—সবকিছুই তোমারই

জন্যে। তুমি ছাড়া এ'সবই আমার কাছে অর্থহীন। তোমার জন্যেই আমি উদয়াস্ত পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জন করেছি, এখন তুমি যদি সে সব ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসিনী হও,— তাহলে আমার অবস্থাটা কি হয় তা একবার ভেবে দেখেছ?

—সেটা কি আমার ভেবে দেখার কথা?

—তাহলে তোমার কথাটা কি? সে-ই দর্ত।

—হ্যাঁ! —তোমার ঘর ছেড়ে যেদিন আমি একেবারে নিঃসম্বল অবস্থায় রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিলাম—সেদিন যে কথা বলেছিলাম—আজ আমার সেই একই কথা,— তোমার সোনা সংগ্রহশালায় যে পরিমাণ কালোটাকা তুমি স্তূপীকৃত করেছ তার সবটাই যদি তুমি সরকারের হাতে তুলে দিতে পার তবেই আমার পক্ষে তোমার ঘরনী হয়ে থাকা সম্ভব। কালোটাকা আর আমি কখনই একসঙ্গে থাকতে পারবোনা। আমার ভরণ পোষণের দায়িত্ব তুমি নিয়েছিলে,—সেইটুকুই পেলে আমি সুখী—। কালোটাকার পাহাড়ে বসে আমি দিবাস্বপ্ন দেখতে চাইনা।

ছাইদানীর মধ্যে সিগারেটটা গুঁজে দিয়ে পার্থ বলল,— বিয়ের আগে তোমার যৌবনপুষ্ট সুঠাম দেহের দিকে আমি যখন আমার লোভের হাত বাড়িয়েছিলাম, তখন তুমি আমাকে সাবধান করে দিয়ে বলেছিলে—এখন নয় বিয়ের পরে। —তোমার সে – Ethics আমি মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু অর্থ উপার্জনের ব্যাপারে তোমার এই শুচিবাই কেন—তা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

—না পার—অন্য মেয়েকে ঘরে নিয়ে এসো; ছেলেমেয়ে হোক,—তাদের নিয়ে সুখে থাকো। আমার মত নীতিবাগীশ মেয়ে তোমার ঠিক পোষা নয়।

—ছেলেমেয়ে তো তোমারও হতে পারে। তার জন্য আবার অন্যমেয়েকে ঘরে আনতে হবে কেন?

—হতে পারতো। কিন্তু তাগ্যি হয়নি। হলে হয়তো তাদের জন্যই তোমার ঘরে পড়ে থাকতে হত।

—আচ্ছা টাকার উপর তোমার অত রাগ কেন? টাকা ছাড়া তুমি যে এক মুহূর্ত বাঁচতে পারবেনা।

—হ্যাঁ, আমিও তো সেই কথাই বলছি। বাঁচার জন্য টাকার প্রয়োজন, শুধু টাকার জন্য বাঁচার কোনও প্রয়োজন নেই। যাক এ বিষয়ে অনেক কথা এর আগেও হয়ে গেছে। সুতরাং কথা বাড়িয়ে লাভ নেই।

—কিন্তু আমি একাই তো এ পথের পথিক নই।

—তা জানি আর এ-ও জানি যারা ভারতবর্ষে লক্ষিত কালোটাকার যারা মালিক— তারা সকলেই 'রামায়ণ মহাভারতের' প্রতি ভারী শ্রদ্ধাশীল। কেউ কেউ আবার ঘরের মেয়েদের আদর করে নাম রাখে মৈত্রেয়ী। জানো না—ঐ নামটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কত গভীর একটা তত্ত্ব। ওটা তো একটা নাম নয়—ওটা হল উপনিষদের মন্ত্র।

এরপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল সুধা। ছেলে বলল,— তুমি তো এ-সব কথা শুনতেই চাও না—অথচ এসবই হল ভারতবর্ষের কথা। ভারতবর্ষের একটা নামকরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের তুমি ছিলে একজন নামকরা ছাত্র। তোমার ঐ নামের পাশে দেশের গুদেশের কত ছাপ। ঐ ছাপ দিয়েই তোমার পরিচয়—নাম দিয়ে নয়।

—ইচ্ছে করলে আমার নামটা তুমি বদলে দিতে পার। কেননা ঐ নামটা আমার মানায় না। পা-র্থ— পা-র-থি! ওরে বাব্বা। উনিই তো মহাভারতের সব। বাবা কেন যে ঐ নামটা পছন্দ করল—জানি না। এখন তুমি যদি দয়া করে বদলে দাও তো বেঁচে যাই।

কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে চুপচাপ বসে রইল সুধা। তারপর ধীর গলায় বলল,—গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে কি বলেছিলেন জান। বলেছিলেন—পুত্রকে ত্যাগ করতে। অর্থের চেয়ে পুত্র নিশ্চয়ই প্রিয়তর!—আমার কী ইচ্ছে হয় জান!

পার্থ হাতঘড়ি দেখল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, তোমার ইচ্ছেটা আর একদিন এসে জেনে যাবো। ইতিমধ্যে তুমিও ভেবো দেখো। এইভাবেই থাকবে না আমার কাছে ফিরে যাবে।

পার্থের হাত ধরে আবার তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিল সুধা। তারপর বলল,—তুমি বোধহয় জানোনা—আমরা শুধু স্কুলেই পড়াই না—বাড়ী বাড়ী টিউশনি করি। দুটি-

চাটাতে বেশী করি। এবং যাদের বাড়ীতে পড়াতে যাই তাঁরা সবাই ঐ কালোটাকার মালিক। Lady teacher বলে অন্দরমহলে অবাধে প্রবেশ করতে পারি এবং গিন্নীদের সঙ্গে নানা কথায় মেতে উঠি। যাঁরা বাইরে বাইরে ঘুরে সিন্দুক ভরে কালোটাকার স্তূপ তৈরী করছেন তাঁরা জানতেও পারেন না,—অন্দরমহলে—gun-powder এর স্তূপও কম জমছে না। সুতরাং তোমার একার ঘর ভাঙেনি পার্থ! সকলকারই ঘর ভাঙবে। কেননা তোমাদের বিত্তের সঙ্গে আমাদের চিত্তের সংঘাত অনিবার্য।

শেখর কথাগুলো এইমাত্র ছুড়ে দিল শেখর। তারপর পাণ্ডুলিপিটা সরিয়ে রেখে ভাবতে লাগল,—কিন্তু আমার সংসারে তো তেমন কোনও Situation হয়নি যাতে মৃদুলা অত কড়া কথা আমায় শুনিয়ে দিতে পারে। ···পার্থর মত নোংরা পথ বেয়ে আমি তো অর্থ উপায় করিনা। আমি সাহিত্য-সৃষ্টি করেছি। মস্তিষ্কের কারখানা থেকে গরম কটির মত উৎপাদন করেছি নূতন নূতন উপন্যাস, আমার কলম থেকে কালি ঝরছে যত, তার চেয়ে বেশী ঝরছে তরুণ তরুণীদের অর্থাৎ আমার পাঠক-পাঠিকাদের লালসায় লালা। হাজারে হাজারে—বই বিক্রী হয়েছে, ঘরে এসেছে প্রচুর টাকা। এবং তাইতেই ঘরের চেহারা যেমন বদলে গেছে,—আভরণের জৌলুষে তেমনি বদলে গেছে গৃহিণীরও রূপ। নইলে কে চিনত শেখরকে। একটা অনামা মার্চেণ্ট অফিসের নিরীহ কেরাণী! কিন্তু মৃদুলা এ-সব কথা একবার ভেবে দেখেনা কেন? মৃদুলা তো জানে—পার্থর মত সে ঘোটালে খানা-পিনার ব্যবস্থা করে Contract আদায় করেনি। উঁহু উঁহু মস্তানদারীদের খুশী করবার জন্য উপায় পন্থা থেকে কাঁচা কাঁচা মেয়েগুলোকে ধরে এনে দেয়নি—তাহলে—মৃদুলা ও-কথা বলল কেন? অবশ্য উপার্জিত অর্থের পরিমাণ অনুযায়ী সরকারকে যা দেয়নি। এবং তার জন্য নানা কৌশল তাকে অবলম্বন করতে হয়েছে।···কিন্তু মৃদুলা তো সে-সব কিছুই জানেনা। তাহলে!···

শেখর আবার অস্থির হয়ে উঠল। আবার সুরু করল পায়চারি। তারপর একসময় বোধ করি ক্লান্ত হয়ে কৌচে এসে বসল। আর ঠিক সেইসময় সুমিতাকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকল মৃদুলা।

শেখর সুমিতার দিকে এমনভাবে তাকাল যেন কোনও দিনই তাকে দেখেনি। সুমিতা মায়ের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে চুপিচুপি বলল—আমি কিন্তু বলতে পারব না। তুমিই বল।

মৃদুলা মৃদু ধমক দিয়ে বলল,—তা হয় না, তোকেই বলতে হবে।

সুমিতাকে যেন উৎসাহ দিয়ে শেখর বলল,—কি হয়েছে রে সুমি! ভয় কি! বলনা আমাকে।

মায়ের কাছ ছেড়ে সুমিতা একটু এগিয়ে এল। কিন্তু কিছু বলতে পারল না।

—কি, চুপ করে রইলি কেন! বাবার সঙ্গে কথা বলবি তো এত ভয় কিসের! মৃদুলা যেন আবার ধমক দিল। —দুদিন বাদে এম. এ. পাশ করে যখন চাকরি করতে যাবি তখন Interview board এ হোমরা-চোমরা সেসব সাহেবদের সঙ্গে কথা বলবি কি করে!

ভয়-ভয় ভাবটা কাটিয়ে নিয়ে সুমিতা সোজা হয়ে দাঁড়াল। তারপর বাবার দিকে না তাকিয়ে,—মাকে উদ্দেশ করেই বলল—বাবার আর একখানা বই বেরিয়েছে মা! যা নাকি পড়া যায় না—এত খারাপ। ক্লাসে মেয়েরা আমাকে যা-তা বলল। Dr Banerjee আমাদের senior Professor. বাংলার head of the Dept. তিনিও খুব নিন্দে করলেন।

শেখর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করল,—কোন্ বইটার কথা বলছে সুমিতা?

মৃদুলা জবাব দেবার আগে সুমিতা বলল,—বইখানা অবশ্য চোখে দেখিনি। তুমিও বোধহয় কপি পাওনি। গতকাল নাকি বেরিয়েছে। কি যেন নাম!—'আলোর আকাশ পেরিয়ে।'

—ওঃ!··গতকাল বেরিয়েছে! একদিনেই কলেজের ছাত্রী, প্রোফেসর সকলেরই পড়া হয়ে গেল। শুধু পড়া নয়—সমালোচনাও। অথচ আমি এখনও খবরও পেলাম না। দেখলে তো মৃদুলা! আমার বই কিরকম কাটে!

মৃদুলা মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অন্যদিকে তাকাল।

সুমিতা বলল,—এই বইটাতেও তুমি এমন সব ঘটনার অবতারণা দিয়েছ যা পড়লে গা ঘিন্ ঘিন্ করে। এই নিয়ে পর পর পাঁচখানা এমন বই তুমি লিখলে যার জন্যে আত্মীয়-স্বজনের কাছে মুখ দেখানো আমাদের ভার হয়ে উঠেছে। এবার কলেজ যাওয়াও বন্ধ করতে হবে। পাড়া-পড়শিদের সঙ্গে মেলামেশা তো অনেকদিনই বন্ধ হয়ে গেছে।

মাথা দোলাতে দোলাতে শেখর বলল,—তুই তো বাঙলা সাহিত্যের ছাত্রী। দেশবিদেশের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করিস। আমার লেখা কি সেই তুলনায় খুবই খারাপ। অর্থাৎ নাক-উঁচু সমালোচকেরা যাকে বলে অশ্লীল—আমি কি ঠিক সেইরকম কিছু লিখি! না সাহিত্যে অশ্লীল বলে কিছু আছে!

একটু ভেবে নিয়ে সুমিতা বলল, Dr. Banerjee বলছিলেন—তোমার লেখাগুলো ঠিক সাহিত্য নয়। 'পর্ণোগ্রাফী!' আমাদেরও তাই মত। এবার থেকে এসব লেখা বন্ধ কর বাবা! নইলে আমাদের অন্য কোথাও রেখে এসো।

হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়াল করতে করতে শেখর বলল,—তোরা বোস। পাবলিশার্সের সঙ্গে একটা দরকারী কথা বলে নিই। তারপর তোর কথার জবাব দেবো।

মৃদুলা বেরিয়ে যাচ্ছিল। সুমিতা তাকে যেতে দিল না। বলল,—তোমাকেও তোমার মত জানাতে হবে মা। চলে গেলে চলবে না। দাদা এলে দাদারও মতামত জেনে নেবো, আজ একটা হেস্তনেস্ত করতেই হবে।

সুমিতা খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ল।

প্রকাশকের কাছ থেকে যে সংবাদটি সংগ্রহ করল শেখর, চিবিয়ে চিবিয়ে মৃদুলা আর সুমিতার উদ্দেশে সেই কথাই সে আবৃত্তি করল। বলল,—গতকালই ৫০০ কপি শেষ হয়ে গেছে। অর্ডার এসেছে হাজার তিনেক। বাইণ্ডার পেয়ে উঠছে না। বুঝলে, এমনই demand আমার বই-এর। আর তোমরা বল,—আমি যা-তা লিখি। তোমাদের কথা অনুযায়ী যদি আমি চলি, তাহলে দু'দিন বাদেই সকলকে গিয়ে ফুটপাথে দাঁড়াতে হবে। দুবেলা পেটভরে ভাত জুটবে না।

সুমিতা আর থাকতে পারল না। একটু উত্তেজিতভাবেই বলল,—তোমার পাঠকদের রুচিকে তুমি বিকৃত করেছ। তুমি একজন Social criminal—হ্যাঁ, মনে পড়েছে, দাদাও সেদিন ঠিক এই কথাই বলেছিল। তোমার শাস্তি হওয়া উচিত।

শেখর গম্ভীর গলায় বলল—এ-ঘর থেকে তোমরা এখন যেতে পার, আমি একটু নিরিবিলিতে থাকতে চাই।

ওরা চলে যেতেই ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল শেখর। তারপর আলমারীটা খুলল। —নাঃ! একটাও বোতল নেই! কাল রাত্রেই মৃদুলা সব নষ্ট করে দিয়েছে। এতক্ষণে রাত্রের কথা মনে পড়ল শেখরের। আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল—Situation তাহলে আগেই তৈরী হয়েছিল।

চিন্তের সঙ্গে বিত্তের শুভগত দ্বন্দ্ব যতই মিল থাকুক না কেন, শেখর আর পার্থর সংসারে তা দ্বন্দ্বঘটন ঘটাবেই। Harmony! না—Contradiction! এ জগতে কোন্‌টা সত্যি!

একটা নতুন গল্প লেখার প্রবল ইচ্ছা শেখরের সমস্ত চেতনাকে যেন আলোড়িত করতে লাগল। কিন্তু কিন্তু একটাও বোতল নেই!

• •

"এই বিশ্বজগতে, যেখানে যেদেশে হোক, যে-মনুষ্য নিপীড়িত, যে দেশ লাঞ্ছিত, আমি তাহার স্বদেশবাসী।

স্বাধীনতার যে শত্রু সমস্ত মানবজাতির সে শত্রু।"

—রাজা রামমোহন রায়

দূরকে নিকট করার শুভলগ্ন

আকাশে মেঘ
ইতিমধ্যেই হালকা হতে সুরু করেছে।
লঘুপক্ষ পাখির মতো তাদের আনাগোনা।
আন্দোলিত তরুশাখায় দূরের হাতছানি।
শান্ত নদীর ঢেউয়েও দেখো যাবার তাড়া।
বেরিয়ে পড়ার দিন। ঘরে ফেরার দিন।
দূরকে নিকট করার শুভলগ্নও বলতে পারো।
সত্যিসত্যিই পূজা এল।

নির্বিঘ্ন যাত্রায় পুজোর আনন্দ নিবিড় হোক

পূর্ব রেলওয়ে

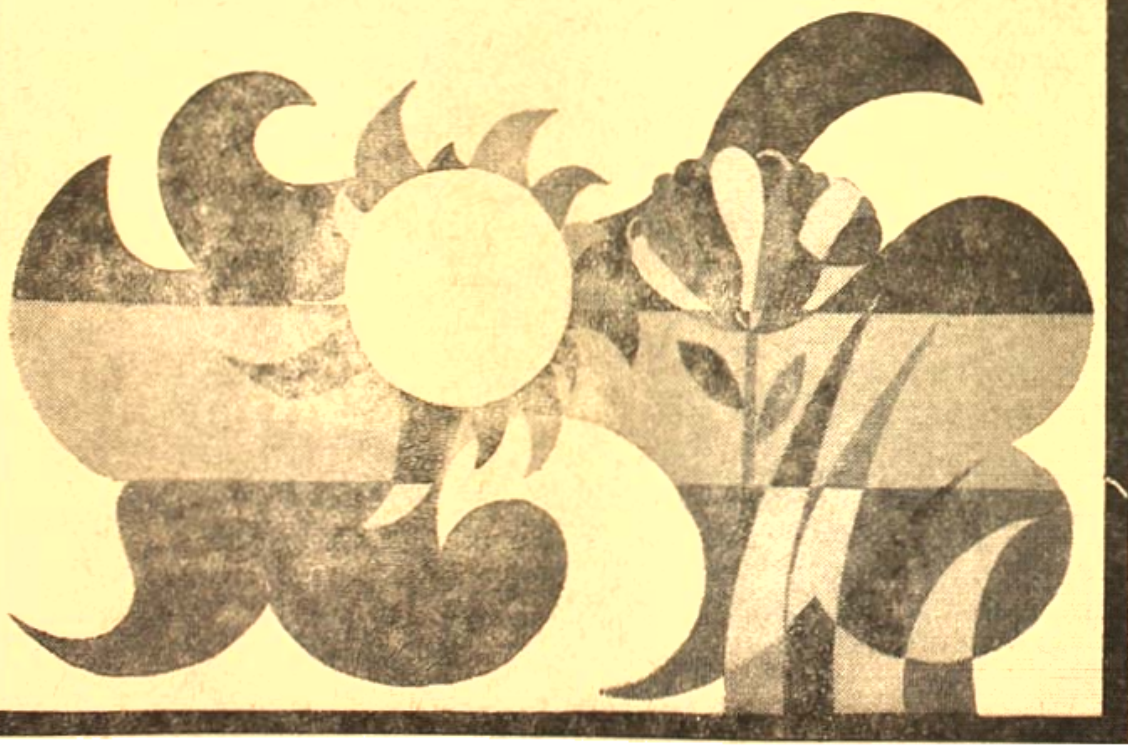

রমনী

মায়া বসু

বাজারের থলে হাতে বাড়ির মধ্যে ঢুকতেই নজরে পড়ল রান্নাঘরের বারান্দার ওপর বাসন্তীর হাতের কাজ করা সাটিন কাপড়েমোড়া সুদৃশ্য মোড়াটা আর তার পাশেই পুরু চায়ের কাপ ডিস। কাঁসার ঝুলকাটা রেকাবি।

হাতের থলেটা নামিয়ে রেখে বেশ একটু ভয়ে ভয়েই বাসন্তীর মুখের দিকে তাকালাম।

যা ভয় করেছিলাম তাই! কোঁচকানো ভুরু। অপ্রসন্ন মুখ। দু' চোখে একরাশ বিরক্তি নিয়ে বাসন্তী বঁটি পেতে বসে শুকিয়ে যাওয়া বাসি পটলগুলোর খোসা ছাড়াচ্ছে।

আমি নির্বিকার মুখে, খুব নরম গলায় (সব জেনে শুনেও জটিল পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে) প্রশ্ন করলাম, 'সুরপতি বাবু আজও এসেছিলেন বুঝি?'

বঁটিটা ঝুম করে সরিয়ে রেখে বাসন্তী ঘর ঘর করে উঠলো; ছাকা। জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাও করে না। দেখতে পাচ্ছনা মোড়া, চায়ের কাপ? তোমার ওই হাবরে লক্ষ্মীছাড়া বন্ধুটি ছাড়া সাত সকালে পরের বাড়িতে আর কে চা খেতে ছুটে আসবে, শুনি?

বিব্রত হয়ে গলাটাকে আরো কয়েক ডিগ্রি শীতলতার দিকে নামাই 'অমন করে গালাগালি দিচ্ছ কেন ভদ্রলোক কে? এক কাপ চা বইতো নয়।'

'এক কাপ চা বইতো নয়' বাসন্তী আমার কথা দিয়েই আমাকে ভেংচে উঠল। 'তোমার কথা শুনলে গা জ্বালা করে। কেন তুমি ছাড়া ওর আর কোন বন্ধু নেই? আর কোন চুলোয় চা খেতে খেতে পারে না তোমার বন্ধু? দোকানে চা বিক্রি হয় না? পাড়ায় আর কোন চেনা বাড়ি নেই? সাত সকালে কাজের সময় এসে জ্বালাতন করা, চায়ের জন্যে হা-পিত্যেস করে মুখের সামনে বসে থাকা আমি মোটেই ভালবাসিনে বাপু। তা যদি মাঝে সাঝে এক আধদিন হত। একটু চক্ষুলজ্জা বলেও কি কিছু নেই লোকটার? আর আসবে নাইবা কেন? তোমার মত বোকা বুদ্ধুর ঘাড় ভাঙতে তো আর অসুবিধে নেই। ঢের ঢের বোকা লোক দেখেছি বাপু, কিন্তু তোমার মত বোকা হাঁদা আমি আর দুটি দেখিনি।'

বাসন্তীর উত্তরোত্তর অভিযোগের বন্যায় আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বরের দামান্য প্রতিবাদ স্রোতের মুখে কুটোর মত ভেসে যাবার যোগাড় হল। তবু প্রাণপণে পরিস্থিতি সামলে নেবার চেষ্টা করলাম, দেখ মানুষকে তুচ্ছ কারণে অমন করে বলতে নেই। সুরপতির বৌ মারা গেছে। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে গেছে ছেলে বিদেশে চাকরি করে। বাড়িতে থাকবার মধ্যে তো বিধবা বুড়ি পিসিমা। ভোর বেলা চায়ের নেশা। কে ওকে চা করে দেবে বল! মর্ণিং ওয়াকে বেরোয়, পার্কের বাবার রাস্তাতেই আমাদের বাড়ি পড়ে বলে, আর আমি ওর বিশেষ বন্ধু বলে তাই যাবার পথে একবার আসে। তুমি দয়াপরবশ হয়ে চা করে দাও, তাই খায়। না দিলে কি জোর করে খেত? বৌ বেঁচে থাকলে কি আর ঘর ছেড়ে পরের বাড়ি এক কাপ চায়ের জন্য ও আসতো? ওকে অমন করে খোঁটা দেবার আগে এই আমার কথাই ভাবনা। আমারও তো তুমি ছাড়া বাড়িতে আর কেউই নেই। ধর, তুমি যদি না থাকতে। তাহলে হয়তো আমাকেই চায়ের জন্য অন্য কারু বাড়ি ছুটতে হত। কে আর সাত সকালে উঠে—

মুখের কথা শেষ হলো না।

বাসন্তী বাজারের থলেটাকে হাতে তুলে নিয়ে রান্না ঘরের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল। আমার কথার মাঝ খানেই থমথমে গম্ভীর মুখে, শীতল চোখে আমার দিকে ফিরে তাকাল। অত্যন্ত শান্ত এবং শীতলতম কণ্ঠে বলল, তোমার বন্ধু সুরপতিবাবু তবু অনেক ভালো।

মাস গেলে এক কাঁড়ি টাকা পেনসন পাচ্ছেন। বুড়ি পিসীমাকে মায়ের মত নিজের কাছেই রেখে দিয়েছেন—তবু পিসী নিজের নয়—বৌয়ের পিসি নিজের পিসি শাশুড়ি। তুমি হলে? আমি যারা গেলে? আমার শ্রাদ্ধের পরদিনই আর একটা বিয়ে করে ঘরে আনতে। তোমার হাড় হদ্দ জানতে আর আমার বাকি আছে কি না। সুরপতিবাবু আর তুমি! আকাশ আর পাতাল তফাত বুঝলে?

আমাদের এই দাম্পত্য কলহ (অবশ্যই অনুপস্থিত একজন বন্ধুকে নিয়ে) শুনে আপনারা যেন ভুলেও একথা কল্পনা করবেন না যে আমরা নববিবাহিত অথবা অল্পকাল বিবাহিত দম্পতি। সুরপতির মত আমারও পঞ্চান্ন বৎসর পেরিয়ে গেছে। বাসন্তীরও প্রায় সাত-আট চল্লিশ বৎসর বয়স হয়েছে। সুরপতির মত আমারও একটি ছেলে একটি মেয়ে। দু জনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। মেয়ে জামাই বিলেতে, ছেলে দিল্লীতে। দু তরফের দুটি নাতিনাতনিও হয়েছে। ছেলে কালে ভদ্রে ছুটি ছাটায় আমাদের কাছে আসে। মেয়ে তো আসেই না। আসা সম্ভব নয় বলেই। সুরপতির মত আমিও রিটায়ার্ড পেনসনার। আমাদের দুজনের পারিবারিক ক্ষেত্রে মিলটা বেশী বলে বন্ধুত্বটাও একটু বেশী। আগে বন্ধুত্বটা এত বেশী গভীর ছিল না। চাকরি শেষ হয়ে যাবার পর ঘনিষ্ঠতা বেশী হয়েছে। তার কারণ চাকরিহীন অবসর সময় গুলোর বেশ খানিকটা অংশ একসঙ্গে কাটানো। বিকেলে পার্কে বসে গল্প করা, মেলামেশার অন্যেও বটে আবার সুরপতি ও আমি একই পাড়ার প্রতিবেশী বলেও বটে।

তবে সকালে সুরপতির আমার বাড়ি চা খেতে আসাটা দীর্ঘ দিনের নয়। বৌ মারা গেছে বছর দুয়েক। ছেলে মেয়েরা বেশ কিছুদিন সুরপতির কাছেই ছিল। কিন্তু চিরদিন শোকাতুর বাবাকে সামলানোর অথবা কাছে থাকার উপায় তাদের ছিলনা। সুরপতি বৌয়ের নিঃসন্তান বিধবা পিসিমা অনেক কালই ওদের সংসারে আছেন। শেষ পর্যন্ত সুরপতির সব দায়দায়িত্ব দেখা-শোনার ভার তাঁর ওপরই পড়ল।

মাকে শরীরটা খুব খারাপ হয়েছিল বলে ডাক্তার সুরপতিকে ভোরে বেড়ানোর উপদেশ দিয়েছিলেন। খুব ভোরে ওঠার পর এক কাপ গরম চা পেলে কার না ভাল লাগে। বিশেষ করে চা নেশাখোরদের। সুরপতির বাড়িতে সম্প্রতি এই জিনিষটার একান্ত অভাব ঘটেছিল।

সুরপতির মর্ণিং ওয়াক ও আমার বাজার করা (এটি আমার সখ বলুন সখ, বাতিক বলুন বাতিক, হবিও বলতে পারেন) দুজনের এই দুটি বিশেষ কাজ একই সময়ে হওয়ার দরুণ প্রায়ই আমাদের দুজনের পথে দেখা হত। ওর কাছে ওর মর্ণিংটি না পাওয়ার ব্যাপার শুনে সত্য সত্যই আন্তরিক দুঃখিত হয়ে ওকে আমি মাস খানেক আগে বাড়ির ভেতর ডেকে এনেছিলাম। আমার স্ত্রী বাসন্তী, বয়সে প্রৌঢ়া হলেও তার চেহারাটি একেবারে যুবতী যুবতী। একটা চুল পাকেনি, একটা দাঁতও নড়েনি। ও শুধু সক্ত সমর্থ স্বাস্থ্যবতী সুশ্রী কর্মিষ্ঠা মহিলাই নয়, উচ্চ শিক্ষিতাও। তার রুচি প্রবৃত্তি কথাবার্তা অত্যন্ত মার্জিত। আমি বাসন্তীকে অত্যন্ত সমীহ করে চলি। (ঈর্ষাপরায়ণ বন্ধুরা এজন্যে আমাকে যেন পেকট্ বিশেষণে বিভূষিত করেছে। তা যা ইচ্ছে বলুক গে আমি তাদের ঠাট্টা বিদ্রূপে বিন্দুমাত্রও বিচলিত হই না। ব্যক্তিগত জীবনে এবং বিবাহিত জীবনে আমি সুখী কেননা বাসন্তীর সব কথায় আমি সায় দিয়ে থাকি, আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ওর কোন কাজেই আমি প্রতিবাদ জানাই না।

আমরা সুখী দম্পতি হলেও মাঝে মাঝে আমার মনোগত একটি তীব্র গুপ্ত অভিলাষ আমাকে প্রায়ই উত্তেজিত ও উদ্দীপ্ত করে তোলে। সেটা হচ্ছে, কেমন করে, কি ভাবে আমি আমার প্রচণ্ড ব্যক্তিত্ব জাহির করে বাসন্তীকে আমার প্রতি আরো বেশী শ্রদ্ধাশীল ও মনোযোগী করে তুলতে পারি।

বাসন্তী আমার বন্ধুবাৎসল্যে প্রথম প্রথম যে খুব বিরক্ত হয়েছিলেন তা নয়। সুরপতিকে বন্ধু হিসাবে পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের বিষয়। ছাত্র জীবনে স্কুলে কলেজে

ও মেটার ফলারশিপ মেডেল ইত্যাদি সব কিছুরই অধিকারী ছিল। তারপর চাকরি জীবনে মুনসেফ থেকে জেলা-জজ হাইকোর্টের জজ হয়ে দীর্ঘ বহু বৎসর কাটিয়ে বৎসর কয়েক মাত্র রিটায়ার করেছে। তারপরেই ওর স্ত্রী মারা গেছে। সুরপতির বয়স হলেও মাথার চুল এখনো বেশীরভাগ কালোই আছে। তার ওপর তার সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ সুদর্শন চেহারায় তাকে বয়সের চেয়েও অনেক কম বলে মনে হয়।

এ হেন সুদর্শন গুণবান মানুষটিকে (তার ওপর বিপত্নীক) সকালে চা করে খাওয়াতে বাসন্তী মোটেই অখুশী অথবা বিরক্ত হয়নি। আমি বাজারে চলে গেছি, ফিরে এসে দেখেছি কালোর দেয়া সুন্দর মোড়াটির পাশে চায়ের কাপের সঙ্গে বাসন্তী সুরপতিকে এটা সেটাও খেতে দিয়েছে। কোনদিন বিস্কুট, কখনো আলুভাজা চিড়ে ভাজা কি ওমলেট, অথবা দুচারখানা পরম বেগুনি পেয়াজিও ভেজে দিয়েছে।

সুরপতি তৃপ্তির সঙ্গে চায়ের কাপ ও জলখাবারের ডিস শূন্য করে শত মুখে আমার স্ত্রীর ও সহস্র মুখে আমার স্ত্রী ভাগ্যের প্রশংসা করেছে। আমি মনে মনে গর্বিত হয়েছি (যদিও মুখে সে কথা প্রকাশ করিনি) রিটায়ার্ড জজ সাহেবে আদালতে কড়া হাকিম বলে নাম করেছিলেন। তার স্ত্রী তাঁর ওপর আরো কয়েক ডিগ্রি কড়া ও খিটখিটে মেজাজের ছিলেন, এ কথা আমরা সকলেই জানতাম।

শরীর খুব বেশী খারাপ না হলে অথবা জরুরী কোন কাজে আটকে না পড়লে সুরপতি বেড়াতে যাবার পথে আমার বাড়ি ঘুরেই যেতেন। আমি বাজার থেকে ফিরে এসে বাসন্তীর মুখে তাঁর কথাবার্তা শুনতাম। সুরপতির ছেলে মেয়েদের খবর, তাঁর শিশুশাশুড়ির ছুঁচিবাই, রান্নার লোকটা যেমন ছুড়ে তেমনিই বদমেজাজের, ইত্যাদি তাঁর সাংসারিক সব গল্পই শুনতে পেতাম। বাসন্তী মুখে যাই বলুক, মনে মনে সুরপতির ওপর যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিল, একথা বুঝতে আমার দেরী হত না।

প্রথম প্রথম সুরপতির ওপর প্রসন্ন থাকলেও কিছুদিন পর থেকেই বাসন্তীর সুর বদলাতে সুরু করল। সুরপতি প্রায়ই (নিত্য নৈমিত্তিকই বলা যায়) চা খেতে আসা নিয়ে ও ক্রমশই বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল। ভদ্রতার খাতিরে ওকে কিছু বলতে পারতনা বলে তার সবটুকু রাগ ও আমার ওপরেই ঝাড়তে সুরু করল।

অবশ্য ওর রাগের একটা বিশেষ কারণও ছিল। সুরপতির এই সাত সকালে আসা নিয়ে ওকে অনেকের কাছ থেকেই ঠাট্টা তামাসা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ রসিকতার কথা শুনতে হত। বিশেষ করে আমার ছোট বোন রেনুর কাছ থেকে। আমার মোড়ালার ভাড়াটে গিন্নি, বাসন্তীর বান্ধবী মিসেস সেনের কাছ থেকে। পাশের বাড়ির গিন্নি শ্রীমতী ঘোষের কাছ থেকে। আরো দু' একজন পরিচিতার কাছ থেকেও।

রেনু আর তার স্বামী প্রমথ দু' জনেই ভারী হাসিখুশী আমুদে ভাল মানুষ। এই স্বভাবের জন্যে আমরা দু জনেই ওদের খুব ভালবাসি। মাঝে মাঝেই ওরা এখানে আসে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসে সারাদিন খুব হৈ চৈ করে যায়। আমরা একলা থাকি বলে ওদের এই হৈ হুল্লোড় হাসি গল্প আমাদের সত্যি ভীষণ ভাল লাগে। মাস খানেক ওরা না এলেই বাসন্তী চিন্তিত হয়ে ওঠে, ফলে ওর তাগাদায় চোটে আমাকে প্রমথর বাড়ি ছুটে যেতে হয় তাদের খোঁজ খবর নেয়ার জন্যে।

বয়সে রেনু বাসন্তীর চেয়ে বছর সাত আট ছোট হলেও তার স্বভাবটা আরো ছেলে মানুষের মত। সুরপতির এবাড়ি আসা চা খাওয়ার ব্যাপারটা কানে-শুনে চোখে দেখে ওই বেশ জোর গলাতেই বৌদিকে ঠাট্টা করতে শুরু করল। 'বৌদি সুরপতি বাবু বুঝি রোজই চা খেতে আসেন ?'

'আর বলিসনারে রেনু। তোর দাদা আমার ঘাড়ে ওই এক আপদ জুটিয়ে দিয়েছেন। কবে একদিন ভদ্রতা করে সকাল বেলা ওঁকে সঙ্গে করে এনে চা খাইয়েছিলেন, সেই থেকে রোজ আসা ধরেছেন।

মুখে কিছু বলাও যায় না। বাড়িতে যত্ন করার লোক নেই—তার ওপর বুড়ো মানুষ—'

বুড়ো মানুষ না ছাই। চোখে দেখলে মনে হয় দাদার চেয়ে অনেক ছোট। পঞ্চাশও পেরয়নি। স্নেহ চোখ টিপে মুখ টিপে হেসে হেসে বলতে থাকে, আর সত্যিই মানুষটার মুখের ওপর কোন কথা বলা যায় না। বলা গেলেও, প্রাণ ধরে তুমি কি বলতে পারতে বৌদি।

এক কাপ চায়ে রঞ্জনো কি বলব বলতো। নিজের ঘটে যদি বুদ্ধি শুদ্ধি না থাকে! কেমন করে যে ভদ্রলোক এই বুদ্ধি নিয়ে জজগিরি করতেন কে জানে? বাসন্তীর কণ্ঠস্বরে একরাশ বিরক্তি ঝরে পড়ে।

শুধু এক কাপ চায়ের জন্যে! কি যে তুমি বল বৌদি? তোমার ঘটেও খুব বুদ্ধি আছে বলেতো মনে হচ্ছে না। উনি কি শুধু এক কাপ চায়ের লোভেই রোজ সকালে এখানে আসেন? মোটেই না। তোমার সুন্দর মুখ খানা দেখবার লোভেই ভোর হতে না হতেই ছুটে আসেন।

বাসন্তীর সুন্দর মুখখানা লাল হয়ে ওঠে। 'কি যে তুই বলিস স্নেহ তার ঠিক নেই। তোর মুখে কিছু আটকায় না।'

বাসন্তীকে লজ্জিত ও অপ্রস্তুত হতে দেখে স্নেহ আরো হাসে। কলকাতা শহরের গলিতে গলিতে চায়ের দোকান। পয়সা ফেললেই চা কিনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এমন সুন্দর হাতের তৈরী চা খেতে পাওয়া কি সহজ কথা? বৌদি সুরপতিবাবু তোমার প্রেমে পড়েছেন।

আঃ স্নেহ তোর বয়স না বাড়ুক আমার বাড়ছে। এখন অসভ্য ইয়ার্কি করিস কেমন করে!

বাসন্তীকে যথার্থই রেগে উঠতে দেখে স্নেহ তার গলা জড়িয়ে ধরে তেমন ভাবে হাসতে হাসতেই বলে, সত্যি বৌদি তোমাকে দেখে মনেই হয় না—তোমার মেয়ে জামাই নাতি নাতনি আছে। তোমার বয়স একটুও বাড়েনি।

দোতলার ভাড়াটে শ্রীযুক্তা বিনতা সেন একজন স্কুলমিস্ট্রেস। সুরপতিকে নিয়ে তিনি বাসন্তীকে মাঝে মাঝে ঠাট্টা তামাসাও করেন। বাসন্তী রেগে যায়। আমাকে শোনায়, বাবাঃ মুখ বটে মহিলার। যত লেখাপড়াই শিখুক আর যত কালচারই হোক না কেন, মেয়ে মানুষের মন বড় কুটিল। সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত। সুরপতিবাবু আমার বাড়ি আসেন, তাতে ওর কি বলতো! ভালমানুষ সেজে কত কথা জিজ্ঞাসা করল, যেন স্বর্গের দেবী। উনি যেদি সকালে প্রায়ই আসেন, বেশ চেহারা, আহা স্ত্রী মারা গেছেন বুঝি —আপনার যখন বাড়িতে থাকেন না, বাজারে যান, তখনি ওঁকে আসতে দেখি—আরো কেন তেন কত কথা।

আমি বাসন্তীকে শান্ত করি। 'বললেই বা। ওদের কথা গায়ে মাখ কেন সবাই তো আর তোমার মত হতে পারে না।'

গায়ে মাখব কেন, একটা বোকা ভাপা মানুষকে যদি সকালে এক কাপ চা করেদি, তাতে এমন কিছু অপরাধ করা হয় না! সুরপতিবাবু যদি রোজ বিনতা সেনের ঘরে ঢুকে চা ছেড়ে ভাতও খেয়ে আসতো, নাও জন্মে আমি তাই নিয়ে মাথা ঘামাতাম না কাউকে বলতেও যেতাম না।

তোমাদের মেয়ে জাতটাই খারাপ যেমন হিংসুটে তেমনিই নিন্দুক। সব কিছুতেই দোষ খুঁজে বেড়ায়।

'মোটেই না। জাত তুলে নিন্দে করবে না বলে দিচ্ছি। বাসন্তি ফোঁস করে ওঠে। এই যে আমি, তিরিশ বছর তোমার ঘর করছি, এ পাড়ায় বাস করছি এবাড়ি ওবাড়ি কম কেলেঙ্কারী তো আর হয় না। বিনতা সেনের খবরও রাখি মিসেস ঘোষের খবরও জানি। পাশের বাড়ির মিত্তির কেলেঙ্কারী কাণ্ডও চোখে দেখা। কিন্তু তাই নিয়ে কখনো কারুকে বলতে গেছি? তোমাকে বলেছি। আমার মুখ থেকে কোন পুরুষ কি কোন মেয়ের নামে কোন নিন্দে কেচ্ছা তুমি কখনো শুনেছো? বলনা, বলেছি তোমার

কাছে

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠি, 'কক্ষনো না। কোন-দিনও না। তুমি ওদের মত সাধারণ মেয়ে নও। তোমার জ্ঞান বুদ্ধি শিক্ষাদীক্ষা ওই সব মহিলাদের চেয়ে হাজার গুণে বেশী। এম. এ টা দিলে না ভাই, দিলে—'

বাসন্তী আমাকে কথা শেষ করতে দিল না। (কখন না দেয়।) 'খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, কেবল পরনিন্দা আর পরচর্চা। পাশের বাড়ির নমিতা, সে কি কম সুরপতি বাবু যখনই আসবেন, জানালা খুলে তাঁর দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকবে। পঞ্চাশ বৎসরের বিধবা, এতটুকু চক্ষুলজ্জাও নেই। তোমার বোনটিও কম যায় না। এখানে তো বলেই, কে জানে আর কোথায় কোথায় এসব কথা বলে বেড়াচ্ছে। আমি তো ভেবেই পাই না কেমন করে একজন শিক্ষিত ভদ্র মহিলা অন্য একজন ভদ্র মহিলার নামে এই সব অকথা কুকথা বলতে পারে? সুরপতিবাবুর মত অমন সৎ-চরিত্র দেবতুল্য মানুষের নাম নিয়ে যারা আমাকে ঠাট্টা তামাসা করে, তাদের মন যে কত সঙ্কীর্ণ তারা যে কত ছোটলোক—ভাবতেও আমার ঘেন্না হয়।

আমি গম্ভীর মুখে সমবদারের ভাব ফোটাই। 'ভাগ্যিস তুমি ওই সব হালকা স্বভাবের মেয়েদের মত নও।'

'ওদের মত হলেই হল? বাসন্তী সগৌরবে উদ্ভাসিত মুখে বলতে থাকে আমার ঠাকুর্দা দেশের ইস্কুলের হেড-মাষ্টার ছিলেন। আমার বাবা কলেজের প্রিন্সিপাল। আমি সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে তখনকার দিনে বি. এ. পাস করেছি। ও সব নোংরা কথা চিন্তা করার সময় কোনদিনও পাইনি। সে শিক্ষাও পাইনি। বংশ বলে তো কথা আছে? কেমন বংশের মেয়ে আমি, জাননা!

সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় নেড়ে বলি 'তাতো বটেই। তাতো বটেই—কয়েকদিন পরেই মুখোমুখি হয়ে গেলাম, সেই সকাল বেলাটিতেই। সুরপতি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন, আমি বাজারের থলে হাতে ঢুকছি। এমন সময়ে।

ওকে একটু অপ্রস্তুত ও বিব্রত মনে হলো। 'আজ চা খেতে দেরি হয়ে গেলো। বিলেস ডিম এত ঘন করে ডিমের চপ করে খাওয়ালেন, কিছুতেই ছাড়লেন না, উঠতে দেরী হয়ে গেল।'

'তাই বুঝি? আমি মুখে সরল মধুর হাসি ফোটাই। ডান হাতের ভারী বাজারের থলেটা বাঁ হাতে চালান করে কপালের ঘাম মুছি। 'আজ আর আপনার মর্নিং ওয়াক হল না। রোদ উঠে গেছে।'

'উঠুকগে রোদ। একটু থামি ঘুরেই বাড়ি ফিরে যাব। সত্যি মশাই, আপনার স্ত্রীর মত মহিলা সংসারে বিরল। যেমন কথাবার্তা তেমনই সেবাযত্ন। কি চমৎকার ডিমের চপ ভেজে খাওয়ালেন। মুখে যেন লেগে আছে। এমনটি আগে আর কখনো খাইনি। কাল আবার আসতে বললেন, কি একটা নতুন খাবার করে খাওয়াবেন।'

বাড়ি ঢুকতেই বাসন্তীর অন্ধকার মুখ চোখে পড়ল। চোখা চোখি হতেই ভারী গলায় বলল, 'তুমি বাপু তোমার ওই বেহায়া বন্ধুটিকে রোজ রোজ আসতে বারণ করে দিও।'

'কেন! আবার কি হল! বাজারের থলেটাকে সাবধানে নামিয়ে রেখে আমি জিজ্ঞাসা করি।'

'হবে আবার কি। বাসন্তীর গলায় ঝাঁঝ। 'সাত সকালে ছোট বাসি এসেছিলেন তার বৌয়ের সাবের নেমন্তন্ন করতে। সুরপতিবাবুকে দেখে কত কথাই শুনিয়ে দিয়ে গেলেন। তুমি যখন বাড়িতে থাকনা, রোজ রোজ তখনই বা আসেন কেন, আমারই বা অত ডিমের চপ ভেজে খাওয়ানো কেন, বৌ মারা গেছে, ঘর করার লোক নেই, আর একটা বিয়ে করলেই তো হয় আজকাল বুড়ি বুড়ি আইবুড়ি মেয়ের তো আর অভাব নেই আরো কত শত কথা।'

'বললেন তো কি হয়েছে! তুমিই বা অত রেগে গেলে কেন।'

'রাগ কি সাধে হয়! সুরপতিবাবুর মত ভাল-মানুষের সঙ্গে চা খেতে খেতে একটু গল্প গাছা করি এটা যেন সবার চক্ষুশূল। কি নোংরা মন এই মেয়েদের ছি, ছি। না বাপু তুমি যখন বাড়ি থাকবে না, তখন উনি যেন এখানে না আসেন। পর নিন্দে, পরচর্চা, মিথ্যে বদনাম, ঠাট্টাতামাসা করতেই পারি না, শুনতেও ভাল লাগে না।'

সত্যি কথা বলতে কি ব্যাপারটা আমারও খুব ভাল লাগল না। ভদ্রলোকের বুদ্ধি এত কম কেন। রোজ রোজ ভোর বেলা অন্য কারু বাড়ি গিয়ে বসলে তাদের কত অসুবিধে হয় সেটা বোঝেন না কেন। সেদিন তো কম পান না। বেশীটাকা মাইনে দিয়ে একটা ভাল লোক রেখে দিলেই তো পারেন। সকালে উঠে চা করে দেবে।

ভাবলাম দু' তিনদিন সকালে বাজারটা বন্ধ রাখব। বাড়িতেই বসে থাকব। কথায় কথায় ইসারা ইঙ্গিতে বুঝিয়ে কথাটা বলব।

কিন্তু ঈশ্বর আমাকে দয়া করলেন। এতবড় একটা কঠিন কাজের হাত থেকে তিনিই আমাকে বাঁচিয়ে দিলেন। সহসা সুরপতিবাবুর আমার বাড়ি আসা বন্ধ হয়ে গেল। পার্কেও তাঁকে আর কদিন দেখতে পেলাম না।

বাসন্তী মুখে বলল, 'বাবাঃ বাঁচা গেল। ভদ্রলোকের বুদ্ধি হয়েছে। এতদিনে বুঝতে পেরেছেন, আমরা ওঁর এভাবে আসাটা পছন্দ করছি না।, তুমি কিছু বলনিতো ওঁকে সত্যি সত্যি।'

আমি বললাম 'না তো। বলবার সময় পেলাম কোথায়? দুদিন যেতে না যেতেই বাসন্তীই আবার গম্ভীর মুখে বলল, 'বলিহারি আক্কেল তোমার। আমাদের বাড়িতে না হয় নাই এলেন, পার্কে কেন আসছেন না ভদ্রলোক, একবার খবরটা নিলেও তো পার। হয়তো অসুখ বিসুখ করেছে মানুষটার।'

যাব যাব করেও আরো কটা দিন কেটে গেল। তারপর একদিন বাসন্তীর কড়া ধমক খেয়ে সুরপতির বাড়ি গিয়ে ওর খোঁজ খবর নিয়ে এলাম।

বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই বাসন্তী সাগ্রহে প্রশ্ন করল, 'সুরপতিবাবু ভাল আছেন তো?'

উত্তর দিলাম, 'হ্যাঁ উনি ভালই আছেন তবে ওঁর স্ত্রীর সেই বুড়ি পিসিমা, মানে ওঁর পিসশাশুড়ির খুব অসুখ। তাঁকে নিয়েই ব্যস্ত আছেন। আমাকে বলে-লেন, পিসিমা একটু ভাল হলেই আবার আপনার বাড়ি খাওয়া করব মশাই, গিন্নিকে জানিয়ে দেবেন।'

প্রসন্ন উজ্জ্বল মুখে বাসন্তী হাসল, 'থাক থাক। আমাকে আর জ্বালাতে আসতে হবে না। যাই বল মানুষটি খুবই ভাল। পিসশাশুড়ীর জন্যে বেড়ানো বন্ধ। খুব সেবা করছেন বোধহয়?'

'সেবা করছেন। পিসশাশুড়ীর। কই নাতো। আমি বেশ অবাক হয়ে জবাব দিই।'

'তবে বাড়িতে আর কে আছে যে বুড়ি পিসির সেবা যত্ন করবে।'

'সুরপতিবাবুর শালী, মানে বুড়িপিসির বিধবা ছোট মেয়ে মায়ের কাছে এসে আছে। আমি স্বচক্ষে দেখে এলাম ভদ্রমহিলাকে। ভারী সুন্দর দেখতে। খুব সেবাযত্ন করছেন মায়ের।'

'তাতো করবেই। যা বলে কথা। যদ্দিন না ভাল হন পিসিমা, শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে তাকে তো এখানে থাকতেই হবে।' বাসন্তী বিবেচনা করে বলল।

তারপর মাস খানেক কেটে গেল। সুরপতি বাবুর পিসিমা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠলেন। বাসন্তী যথা সময়ে খবর পেল। কিন্তু সুরপতিবাবু আর এমুখো হলেন না। বাসন্তীর হাতে চা খেতেও না।

বাসন্তী কটু গলায় বলল, 'কী ছোটলোক কী নেমকহারাম দেখেছ? আর এপথ মাড়ায় না।'

আমি দেবতার মত সরল মুখে বললাম, 'কেন আসবে বল? এখন শালী রোজ ভোরে উঠে জামাই বাবুকে চা ডিমের চপ তৈরী করে খাওয়াচ্ছে।'

কট মট করে আমার দিকে তাকিয়ে বাসন্তী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'ভালইত। খাওয়াক না কদ্দিন খাওয়াবে

এখানে আর কতদিন পড়ে থাকবে মায়ের সেবার নাম করে। শ্বশুর বাড়ি ফিরে যেতে হবে না?'

দু-তিনদিন বাদে সান্ধ্যভ্রমণ শেষ করে পার্ক থেকে বাড়ি ফিরে এসেই চমকে উঠলাম। কালিঝাপা চুলে গুম হয়ে বসে আছে বাসন্তী। চোখ মুখের চেহারা দেখলে মনে হয় কিছু একটা ঘটেছে। খুবই খারাপ কিছু।

'কি হয়েছে!' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

'হয়েছে আমার মাথা আর তোমার মুণ্ডু। আগ্নেয় গিরির বিস্ফোরণের মত ফেটে পড়ল বাসন্তী। তীক্ষ্ণ কটু ক্রুদ্ধ গলায় বলতে লাগল, বলিহারি তোমাকে। অমন একটা চরিত্রহীন লম্পট লোককে বাড়িতে ঢুকিয়েছিলে। অমন লোকের মুখ দেখাও পাপ।

'কার কথা বলছো।' পৃথিবীর সরলতম মানুষের মত বিস্মিত প্রশ্ন আমার।

'কার কথা আবার বলব? তোমার প্রাণের বন্ধু ঐ স্বরূপতির কথাই বলছি। পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে বিশ্বাস করিনি। ভাবলাম নিজের চোখে দেখেই আসি। পিসিমার সঙ্গেতো আলাপ আছে। গিয়ে দেখি, লোকে যা বলে মিথ্যে নয়, বিধবা শালীটা তার মায়ের রোগের সেবা করতে এসেছিল দিন কতকের জন্যে। এখন তোমার বন্ধুর প্রাণ দুঃখে বিগলিত হয়ে গেছে। শ্বশুর বাড়ি যেতে না দিয়ে তার বাড়িতেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে তাকে রেখে দিয়েছে। ছি ছি। কি কেলেঙ্কারি।'

'ওঃ এই কথা। এ কথাতো আমরা সবাই জানি। এতে আর কেলেঙ্কারির কি হল। ভদ্রমহিলার শ্বশুরবাড়িতে জা ভাশুর ছাড়া আর কেইবা আছে বল। এখানে তবু মা রয়েছেন। নিজের একটা ছেলেপুলেও নেই। অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল শুনেছি। তা ভাশুর আয়ের কাছে ছিল, এখন না হয় ভগ্নিপোতের কাছে আছে। এতে ক্ষতিটা কি। নিন্দেই বা হবে কেন।'

'তাতো বটেই। নিন্দেই বা হবে কেন। আগুনে ঘি পড়ার মত বাসন্তী আমার কথায় আরো জ্বলে উঠল। বয়েসেতো আমার চেয়েও অনেক ছোট। ছেলেপুলে হয়নি চেহারা খানাও তো চলচলে সাজ পাটের বাহার দেখে মনেও হয় না বিধবা। শ্বশুর বাড়ি ছেড়ে এখানে পড়ে আছে মাস দুয়েকের ওপর হয়ে গেল। রোগা ভোগা বুড়ো মাকে ফেলে এখন দিবারাত্রির জামাইবাবুর সেবাযত্ন হচ্ছে। ছি ছি।'

'এত ভাল কথা। স্বরূপতির সেবাযত্ন করার লোক নেই। শালী যদি একটু সেবাযত্ন করে তাতে হয়েছেটা কি।'

'শালী! বলি স্বরূপতির কি ও নিজের শালী! পিসশাশুড়ীর মেয়ে। মহিলার আক্কেল খানাই বা কি, নিজের শ্বশুর বাড়ি থাকতে, আপনার ভাশুরপো ভাশুরঝিরা থাকতে মাসীতো বোনের স্বামীর বাড়ি থাকতে লজ্জা করে না। তার ওপর বোন যখন মারা গেছে। স্বরূপতিবাবুকে আমি ভাল মানুষ সচ্চরিত্র মানুষ বলেই জানতাম এতদিন। কিন্তু এখন দেখছি লোকটা একেবারে নোংরা স্বভাবের—লম্পট, চরিত্রহীন।

'আঃ। যা মুখে আসে তাই বলে যাচ্ছ যে।' আমি এবার একটু রাগ করে উঠি। ভাশুর থাক আর জা থাক আর তাদের ছেলে মেয়েরা থাক, নিজের বলে তো কেউ নেই সেখানে এখানে তবু মহিলার মা আছেন। মায়ের কাছে যদি থাকেই তাতে দোষ কিসের। ওরও একটা আশ্রয় জুটল, মায়েরও দেখাশোনার সুবিধে হল। আর স্বরূপতিরও একটা সেবা যত্ন করার লোক হল। এত এক পক্ষে ভালই হল।'

'সেবাযত্ন।'

বাসন্তীর মুখখানা কুটিল। চোখের দৃষ্টিতে শঙ্কীর ইঙ্গিত। কণ্ঠস্বরে একরাশ ঘৃণা ছড়িয়ে জবাব দিল, 'সেবা যত্ন করার লোকই বটে। সোজা কথায় —সেবাদাসী।

'ছি ছি। কী যে নোংরা কথা বল তার ঠিক নেই। আমি সত্যি ভীষণ লজ্জিত হয়ে উঠি বাসন্তীর মুখ থেকে অপ্রত্যাশিত নোংরা কথাগুলো শুনে।'

দুচোখে আগুন ঝরিয়ে বাসন্তী তেমন বিষাক্ত

গলাতেই জবাব দিল, 'তোমার বন্ধুর স্বভাব চরিত্রের কথা জানতে এপাড়ায় আর কোন ভদ্র মহিলারই বাকি নেই। বিনতা নমিতা মিলেস ঘোষ স্নেহ সকলই শুনেছে। ঢের ঢের লোক দেখেছি বাপু কিন্তু তোমার মত বোকা গাদা মানুষ আমি আর দুটি দেখিনি। তুমিও দেখে এসেছ ওই মাগীটাকে, আমিও দেখে এসেছি। তুমি কিছুই টের পেলেনা, অথচ আমি এক নজর দেখেই বুঝে নিয়েছি ও কেমন স্বভাবের মেয়ে। মায়ের সেবা যত্ন দেখাশুনা করার জন্যে স্বয়ংপতি ওকে ঘোটেই এখানে আনেনি—এনেছে নিজের সেবার জন্যে—নিজের—'

বাদবাকি অশ্লীল নোংরা অংশটা আর নিজের মুখে উচ্চারণ না করে বাসন্তী চোখের ভাষা ও মুখের কুটিল অভিব্যক্তি দিয়েই আমার মত বোকাহাবাকে ভাল করে বুঝিয়ে দিল।

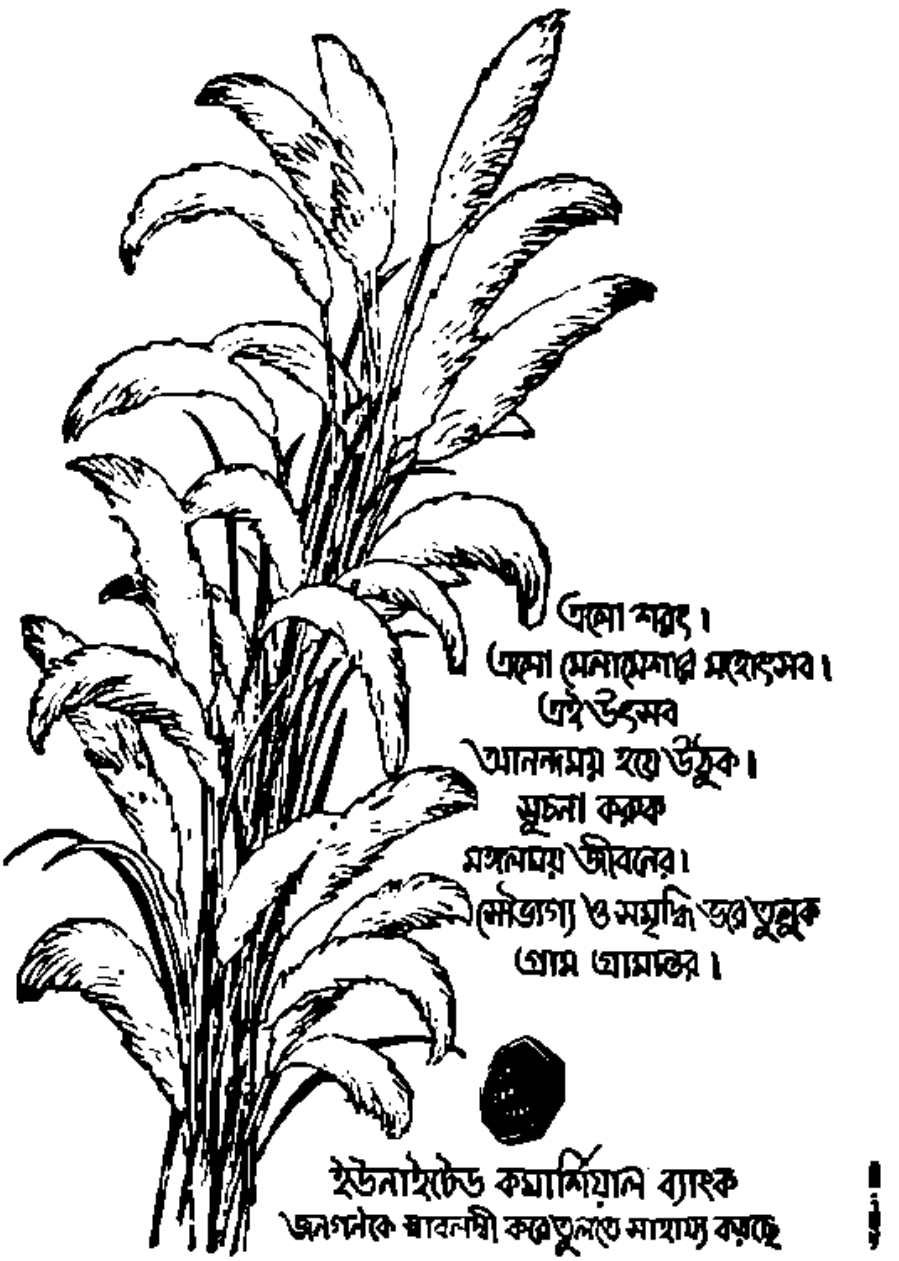

দক্ষিণ সমুদ্রের গান

নির্মলেন্দু মাত্রা

কথামুখ

না—সুশান্ত আজ বাড়ি যাবে না। এখন ভাদ্রের আকাশে বেড়াল ছানার মতো সাদা তুলতুলে আদুরে মেঘ নরম রোদ্দুর মেখে মিচ্ছে। এই সময় কাজরীকে মনে পড়ে। অফিসের ছুটি হলেই সে রোজ হাওড়ার ট্রাম ধরে বি-বি-ডি বাগ থেকে। আজ ধরবে না। যতক্ষণ পারবে সে কাজরীকে ভুলে থাকবে।

কতদিন ধরে কি সুন্দর সামান্য একটু সুখ তার জন্যে অপেক্ষা করত। সন্ধ্যেবেলা ছাতে বসত সে, গল্প চলত কাজরীর সঙ্গে। আর সে সব কিছুই হবে না। ভাবতে কষ্ট হচ্ছে সুশান্তর। কাজরী আর হেসে কথা কইবে না।

শরতের বিকেল নামছে কলকাতায়। আকাশে সাদা মেঘের বেড়াল কালো কর্কশ বন বেড়াল হয়ে যাচ্ছে—লাল দিঘির জলে তারই প্রতিফলন। সুশান্ত দেখতে লাগল জলের গভীরে একটা তীব্র বেড়াল ক্রমেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে।

এই বিকেল—এই মেঘ—এই বেড়াল আজ তার কাছে অন্য রকম ঠেকছে। হয়তো এরই নাম সময়—যা জীবন পাল্টে যায়; হয়তো এরই নাম জীবন—যা কিছুতেই স্থির থাকে না। বছর দশেক আগে একটি অষ্টাদশীর সঙ্গে মালা বদল করেছিল সে—কাজরী। তার বয়েস তখন পুরো পঁচিশ। সালটাও মনে পড়ছে তার উনিশশো আটান্ন। না: বড্ড বেশি দিন বেঁচে রয়েছে সে। অথচ এককালে তার কি ভালোই না লাগত বেঁচে থাকতে। ভাবতে কষ্ট হোত একদিন সে আর এই সুন্দর পৃথিবীতে থাকবে না। আজ তার মন থেকে সে ইচ্ছে মুছে যাচ্ছে।

অথচ এতদিন সে যা কিছু করেছে সবই তো বেঁচে থাকার জন্যে। কেন সে অর্থনীতির মাস্টার্ ডিগ্রীটা পকেটে পুরেছিল? সেকি তার ভালো লাগে বলে? আদৌ না। ঐ সব কেইনস্-পিগু-রবিনসনের থিয়োরি তার চ' চক্ষের বিষ। তার ভালো লাগে কবিতা-গান-সাহিত্য। অর্থনীতি পড়লে চাকরি পাওয়া যাবে তাই সে পড়েছিল। কিন্তু কি হোল তাতে!

কাজরী বলেছে, 'আমি হব একটা চাকরের বউ? তার চেয়ে বিষ খেয়ে মরা ভালো।'

'তাহলে প্রফেসারি করতে হয়।' সুশান্ত বলেছিল, 'যদিও আমার ভালো লাগবে না।'

'মাস্টারের বউ? তার চেয়ে জলে ডু'বে মরা ভালো।' কাজরী বলেছিল. ব্যবসা করতে পার না? আমার অনেক টাকা চাই—অনেক অনেক। হাওড়ার গলি ঘুঁজিতে তোমাদের এই পোড়ো বাড়ি আমার একদম পছন্দ নয়। বেশ বালীগঞ্জে বাড়ি হবে। আমার ঘরের বেশ গাড়ি থাকবে। তুমি ড্রাইভ করবে আর আমি তোমার পাশে বসে থাকবো। বেশ লাগবে জীবনটা। আমি—আমি উপভোগ করতে চাই তারই নাম বাঁচা—'

অতি কষ্টে হাজার সাতেক টাকা জোগাড় করে ব্যবসায় নেমেছিল সুশান্ত। দু' খানা লেদ মেসিন নিয়ে কারখানা ইউনিয়ন ইণ্ডাস্ট্রিজ। কলকারখানার ব্যাপার ভালো বোঝে না বলে এক বন্ধুকে অংশীদার করেছিল।

কলেজের বন্ধু মানেই প্রাণের বন্ধু। কাজেই পার্টনারশিপ ডিডখানা পরে রেজেস্ট্রি করলেই চলবে। আগে তো কারবার চলুক। কারবার চলল। সুশান্ত একদিন বলল, 'তাহলে আমার লাভের অংশটা—'

বন্ধুবর আকাশ থেকে পড়লেন, 'লাভের অংশ আবার কিসের? টাকা তো তুমি আমায় ধার দিয়েছো। বেশ—সুদ সমেত টাকা ফেরৎ নিয়ে যাও। তা ভাই বেশি পারব না, মাসে পঞ্চাশ টাকা করে শোধ।'

মাসে পঞ্চাশ টাকা করে হলে শুধু আসল সাত হাজার টাকাই ফেরৎ পেতে কত মাস কত বছর লাগবে!

সুশান্ত চোখে অন্ধকার দেখল। তার পুঁজি ভেঙে গেল। মন ভেঙে গেল।

চটকল আর কাপড়ের কলের মেসিন পার্টস সাপ্লাই করত সে বড় বড় অফিসে। অনেক জানা শোনা হয়েছিল। একদিন যেখানে সে অনেক আশা আর স্বপ্ন নিয়ে মাথা উঁচু করে ঢুকতো এখন সেখানে সে তাদের করুণার প্রার্থী হয়ে দাঁড়াল।

'ইউ মিস্টার সামন্ত, কি বলছেন আপনি, এ যে বিশ্বাস করতে পারছি না, আপনি করবেন চাকরি? সরি—ভেরি সরি—কোনো পোস্ট খালি নেই—' এর আগে তারত জুট মিলের বড় সাহেব বলেছিলেন। এবং আরো অনেক অফিসের বড় সাহেব তাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

তারপর একদিন চারশো টাকা মাইনের একটা নিয়োগ পত্র নিয়ে সে কাজরীর কাছে ফিরে গিয়েছিল, 'এই গ্যাখো—মাসে চারশো—ক্রমশ বাড়বে—যাক বাবা, বেঁচে গেলুম—'

কাজরী মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, 'বালীগঞ্জে আমি যে মোটর গাড়িটার চড়বো ভেবেছিলাম তার তেল-মবিল আর চাকরের খরচা এই চারশো টাকা—কি হবে এই ক'টা টাকায়—ওতে কি বাঁচা যায়!'

ওই হোল সূত্রপাত। তারপর দিন গড়িয়ে মাস গেল, গড়িয়ে বছর। কাজরী একদিন বলল, 'ক্লাস টেনে উঠে পড়া ছেড়েছিলুম, আমি কের পড়ব, কের স্কুলে যাব, তারপর কলেজে, তারপর চাকরি করব—সোজা কথা আমার টাকা চাই—তোমার রোজগারের আশায় থাকলে আমি মরে যাব—'

সুশান্ত বলল, 'তা কি করে হয়, কে আমার অফিসের ভাত রেঁধে দেবে? তাছাড়া এখন হায়ার সেকেণ্ডারী হয়ে গেছে, কোনো স্কুল তোমায় নেবে না, নিলেও সবাই হাসাহাসি করবে, এই বয়সে কেউ স্কুলে যায় না।'

আবার কিছুদিন চুপচাপ। দিনের শেষে মনোরম সন্ধ্যা নামে। সে কাজরীর সঙ্গে গল্প করে, চা খায়। ভাবে—এই ভাবেই দিন যাবে। কিন্তু দিন যায় না।

বছর দুয়েক আগের কথা। একদিন সন্ধ্যে বেলায় বাড়ি ফিরে সুশান্ত দেখল ঘরে আলো জ্বলেনি, অন্ধকার বারান্দায় কাজরী গালে হাত দিয়ে বসে আছে।

'কি হোল আবার।'

'কিছু না।' কাজরী বলল, 'এমনি। কিছু ভালো লাগছে না।'

'তাহলে নিশ্চয় কিছু একটা হয়েছে।'

'না, এমন কিছু নয়। আজ আমি একটু বেরিয়ে ছিলুম।

'একা? না কোনো বান্ধবীকে নিয়ে?'

'একা।'

'সিনেমা?'

'না—এই একটু কলকাতা গিছলুম।'

'ভালো।' সুশান্ত নিশ্চিন্ত হোল। ওর কথায় কোনো গুরুত্ব দিল না।

চা খেতে খেতে কথা চলতে লাগল। কাজরী বলল, 'কলকাতায় কোথায় গিয়েছিলুম জানতে চাইলে না তো।'

'কোথায় আবার!' সুশান্ত হালকাভাবে বলল, 'হয় তালতলায় তোমার বাপের বাড়ি, নয় নিউ মার্কেট তিন টাকার জিনিষ পাঁচ টাকায় কিনেছ, নয় সিনেমা দেখে।'

'না, ওর কোনোটাই নয়।' কাজরী চুপ করে গেল। গম্ভীর ভাবে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'আমি দেখতে গিছলুম এঁরা এক কতদূর যাওয়া যায়।'

'তার মানে ?' সুশান্ত কৌতূহলী হয়ে উঠল।

'আমি গ্রেট ইস্টার্ণ' হোটেলে গিছলুম—'

'হ্যাঁ, ওদের চীনে রেঁস্তোরা খুলেছে।'

'খেতে নয়, দেখা করতে গিছলুম।'

'কার সঙ্গে ?' সুশান্ত সোজা হয়ে বসল।

'লায়ীর সঙ্গে।' কাজরী দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'ও অনেক-দূর এগিয়ে গেছে, আর আমি কোথায় কানা গলিতে পড়ে আছি।'

সুশান্ত মাথা নিচু করে চুপচাপ বসে রইল। ওর ছোট তালিকা লহরী কিছুদিন হোল খোলে গিয়েছে। সেখানে কিন্তু লাইনে বিশেষ সুবিধে করতে পারেনি। অতিকষ্টে একটা নাচের দৃশ্যে একটুখানি জায়গা করে নিয়েছে। সিনেমা পত্রিকায় ছবি বেরিয়েছিল। খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছে কাজরী। অতি বিশ্রী ভঙ্গীতে কদাকার নাচ নেচেছে লহরী। এবং কাজরীর মতে এবারে ও একটা ভালো রোলে চান্স পাবে। আর তার পরেই ফিরোইন। অঢেল টাকা, বাড়ি, গাড়ি।

লহরী তাহলে কলকাতায় এসেছে। খবরটা জানত না সুশান্ত, জানা হোল। আরো অনেক কিছুই জানত না সে। জানত না বিয়ের দিন থেকেই সুরু হয়ে গেছে আর এক জীবন, আরো অনেকদূর গড়াবে।

লালদিঘি থেকে হাঁটতে হাঁটতে সুশান্ত অনেকদূর চলে এসেছিল। মিশন রো এক্সটেনশন ধরে এখন সে চলেছে সোজা পুবদিকে। একবার পেছন ফিরে তাকাল। সেই সুন্দর নরম সাদা মেঘ এখন কি ভয়ঙ্কর কালো হয়ে উঠেছে। বিকেলের আলোয় কেউ বুঝতে পারছে না কিন্তু সুশান্ত বুঝতে পারল—ওই মেঘের ভেতর বিদ্যুৎ চোখ রাঙাচ্ছে।

না—তবু সুশান্ত আজ এখনি বাড়ি ফিরবে না।

হন হন করে হাঁটতে লাগল সে।

সেদিন রাত্রে সবে তন্দ্রা এসেছে সুশান্তর, কাজরী আস্তে আস্তে বলল, 'ওগো শুনছো ?'

'বলো।'

'তোমাদের এই চারশো টাকার সংসারে আমি আর টিঁকতে পারছি না।'

'আমার মাইনে বেড়েছে, আরো বাড়বে।' সুশান্ত ঘুমের ঘোরে বলল, তোমাকে সুখী করার জন্যে আমি তো সাধ্যমত করছি।'

'সেই তো বিপদ, তোমার সাধ্য কতো সে তো আমি বুঝে ফেলেছি—'

'কিন্তু তোমার স্বামী চরিত্রবান, তোমার শ্বশুর শাশুড়ী অত্যন্ত স্নেহ করেন তোমার সুখী হতে বাধা কোথায় !'

এবার কাজরী কেঁদে ফেলল, কপাল চাপড়ে বলে উঠল। 'না-না আমি সুখী নই, আমি এমন ভাবে বাঁচতে চাইনি, আমায় তোমরা ছেড়ে দাও, আমি চলে যাই।'

ঘুম ছুটে গেল সুশান্তর। সে উঠে বসল ধড়ফড় করে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে ?'

'যেখানে। লায়ীর সঙ্গে। সে চান্স করিয়ে দেবে বলেছে।'

'না না—চীৎকার করে উঠেছিল সুশান্ত। কাজরীর হাতদুটো জড়িয়ে ধরেছিল সে, সেই প্রথম তার মনে হয়েছিল কাজরী শুধু সুন্দরী নয়, অসাধারণ সুন্দরী। সংসারের তাপে পুড়ে পুড়ে ওর রূপ একটু মলিন হয়েছে, অভাবের আঁচে ওর রূপ কিছু ঝলসে গেছে কিন্তু তা হোল একটা পাতলা ভস্মের আবরণ, প্রখর আলোয় নীচে গিয়ে যদি ও দাঁড়ায় তাহলে এখনো ওর সৌন্দর্য ফুটে উঠতে পারে।

অন্ধকার ঘরে কাজরী যেন আলো হয়ে জ্বলে রয়েছে। ভাল নয়, এত রূপ ভালো নয়। কেন সে সুন্দর দেখে বিয়ে করতে গেল ! ভীষণ ভয় পেয়ে গেল সুশান্ত, বার বার বলতে লাগল, তুমি কি চাও বলো, শাড়ি-গয়না-টাকা—সব এনে দোব, ওই কথাটা আর মুখে এনো না, আমি তাহলে মরে যাব।'

নিদারুণ আতঙ্কে সুশান্ত স্থির হয়ে বসে রইল। কাজরী পাশ ফিরে শুলো, বলতে লাগল, 'আমি ভুল করেছি, আমি ঠকে গেছি তোমায় বিয়ে করে—'

ধর্মতলা স্ট্রীটে ইসমাইলের রেস্তর্ঁর দোকানের সামনে

এসে হাজির হোল সুশান্ত। ফুটপাথের ওপরেই ওর দোকান। বড় মিঠে একটা সং প্লেইং লাগিয়েছে ওর বন্ধু, যেন কোন দূর সমুদ্র থেকে সুরের ঢেউ উঠে আসছে, কালো রেকর্ডখানা ঘুরছে ওর নিয়তির চক্রের মতো, স্টাইলাস উঠছে নামছে বুকের স্পন্দনের মতো।

'কার এল. পি ব্রাদার ?' সুশান্ত জিজ্ঞেস করলে।

'নিয়ে যান দাদা, মাত্র সতেরো টাকা,' ইসমাইল হাসলে, 'শুনে বুঝতে পারছেন না—বিগ বেন হাওয়াইয়ান ব্যাণ্ড।'

'কি আছে এতে ?' রাস্তায় দাঁড়িয়ে গোটা রেকর্ড শুনতে গেলে আর ঘণ্টার ওপর সময় লাগবে। সেটা সম্ভব নয়। তাই জানতে চাইল সুশান্ত।

'আরে দাদা, এতে শুধু হাওয়াইয়ান গীটারের কাজ, সমুদ্রের গান।' ইসমাইল হাসতে লাগল।

'এটা কি সুর বাজছে ?'

'কভারে লিস্ট আছে, দেখে নেন, বড় খাপসুরৎ এর মাম—ওয়াকিং দ্যাক টু হ্যাপিনেস—'

'তাই নাকি ? তার মানে—' সুশান্ত মনে মনে বললে, 'সুখের কাছে ফিরে যাওয়া।'

ইসমাইলের দিকে চেয়ে একটু হাসল সে, 'নেবো। একটু চলুক, বড়ো নরম সুর।'

চাকা ঘুরতে লাগল। সুশান্ত দাঁড়িয়ে রইল। ছোট-খাট ভিড় জমে গেছে রাস্তায়। সবাইকে তার ভাল লাগছে। এতক্ষণ অতীত স্মৃতি তার বুকে ভারী পাথরের মতো চেপেছিল। এখন গীটারের তালে তালে হৃদয়ের দুলদুলানি সে শুনতে পাচ্ছে। সুশান্ত আবার সুখের কাছে ফিরে যাবে। কেউ যেতে পেরেছে ? কেউ কখনো পারে ? বিশেষ যার একবার ঘর ভেঙে যায়—যেমন হয়েছে তার। কে জানে ! তবু মন চাইছে তার—সে সুখের কাছে ফিরে যাবে। তার বুকের ভেতরে বড় জ্বালা।

২

কথারম্ভ

বিদিরপুরের নাম শুনলেই সুশান্তর মনটা কেমন উদাস হয়ে যায়—সেই মহাকবির স্মৃতিভরা সংঘাট—মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্র—সেই বন্দর—অনেক জাহাজের ভিড়—কেউ থাকবে না—সব একদিন না একদিন সমুদ্রে চলে যাবে।

আদি গঙ্গার পুল পেরিয়ে চৌরাস্তার মোড় বাঁ দিকে নামল সুশান্ত, সোজা দক্ষিণে গার্ডেনরিচ রোড ধরে একটু এগিয়েই ডানদিকে রামকমল সেন স্ট্রীট ধরে হাঁটতে লাগল।

কার্তিকের শেষ—শিয়রে বৈদূর্য মণির মতো মধ্য হেমন্তের আকাশ বেয়ে সন্ধ্যা নামছে। রবিবারের শান্ত, নিঃঝুম পথ। সুশান্ত ভাবছিল—টেলিফোন না করে আসাটা কি ঠিক হোল !

কিন্তু এই সন্ধ্যেবেলায় বাড়িতে থাকা ওর পক্ষে অসম্ভব, বিশেষ এই ছুটির দিনে, তার কষ্ট হয় চুপচাপ একা একা বসে থাকতে। তার কিছুই করার নেই—কাজরীর কাছে সে একটা ভার অবস্তি,—একটা বাড়তি বোঝা। কতকটা পুরাণো চটি জুতোর মতো—অনেকদিন হয়ে গেছে—এবার ফেলে দিলেই হয়—তবু ফেলে দেয়া যাচ্ছে না—

বছরখানেক আগে একটি দিনের কথা মনে পড়ল সুশান্তর। সেদিনও ছিল এমনি ছুটির দিন, হেমন্ত-সন্ধ্যা। একটু বেশি সাজগোজ করে ফেলল কাজরী। হাওড়া হাট থেকে যে বেগনী-রঙা শাড়িটা কিনেছিল একুশ টাকায়, সেইটে পরতেই ওর শরীর থেকে যেন দশটা বছর কমে গেল। বিকেলে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করেছে, তাইতেই ওর সাতাশ বছরের ভরাট যৌবনে লাবণ্যের চল নেমেছে। আয়নার সামনে বসে একটু স্নো মাখল, পাউডার বুলিয়ে নিল, চোখে লাগাল কাজল, অমনি একটি গৌর আভা সন্ধ্যার আলোয় সলজ্জ কনের আদল নিয়ে আয়নায় ফুটে উঠল।

খুব খুশি হতে যাচ্ছিল সুশান্ত, বলছিল, বাঃ এই তো চাই ! সংসারে আমাদের যেটুকু আছে সেটুকু নিয়েই আমরা সুন্দর হব।'

'আর লেকচার দিও না।' কাজরী ওকে থামিয়ে দিয়েছিল, তোমার কত সুযোগ আমার জানা আছে, তোমার যে ছুটো মাসিমাগ আছে তাই নেড়েচেড়ে তুমি

বাঁচোখে, আমি ওর মধ্যে নেই—অনেক অপেক্ষা করেছি—অনেক দিন ধৈর্য ধরেছি—দশ-বশটা বছর—আর ওর মধ্যে নেই—

তার মানে? ধাক্কা খেয়ে স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে রইল সুশান্ত, একবার ঢোক গিলে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি কোথাও বেরোচ্ছ?'

'বেরোতে আর দিলে কোথায় যে বেরোব?' কাজরী মুখটা ঘুরিয়ে নিল, আমায় স্কুলে-কলেজে যেতে দিলে না, বোধে যেতে দিলে না, আর কোথায় যাব! বাঁশতলার ঘাটে?'

কিছুই বুঝতে না পেরে সুশান্ত চুপচাপ বসে রইল। তার খুব কষ্ট হচ্ছিল। ইচ্ছে করছিল কাজরীকে একটু আদর করে। আঃ লাজলি! কতদিন পরে ওকে সুন্দর-সুন্দর লাগছে। একটু কাছে পেতে মন চাইছে। কিন্তু ঘৃণা—রাগ—অভিমানের একটা দুর্ভেদ্য প্রাচীর ও তুলেছে সুশান্ত আর নিজের মধ্যে। সুশান্তর সাধ্য নেই সে প্রাচীর ভেঙে ফেলে। সে কেবলই নিজেকে জিজ্ঞেস করে আমি কি দোষ করলুম?—কিন্তু কোনো উত্তর পায় না।

একটু পরেই সেদিন ঝোড়ের কড়া নড়ে উঠেছিল। কাজরী ছুটে গিয়ে দরজা খুলে দিল, এক ভদ্রলোক হাসি-মুখে দাঁড়িয়ে, সুশান্তর সম্পূর্ণ অপরিচিত।

কাজরী পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, 'ইনি আমার স্বামী সুশান্ত, ইনি অপেশদা, বেতার-জগতে এর ছবি বেরিয়েছিল জানো? ইনি আমার গুরু।'

'কিসের গুরু? কবে থেকে আবার এসব হোল? সুশান্তর মনোভাব বুঝেই সেদিন কাজরী আবার বলেছিল, 'আমার গানের গুরু, আমি গীটার শিখব।'

• • • •

'আরে অপো এসো, বাবু দিদিকে তবু মনে পড়ল অনেকদিন বাদে।' সাদর অভ্যর্থনা জানালেন পর্ণরী। সুশান্তকে ড্রেসিংরুমে ঢুকিয়ে দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাজু কেমন আছে? তাকে আনলে না কেন?'

'তার কথা আর বলবেন না দিদি।' সুশান্ত উত্তর করল, 'ওই যে ঢেউ উঠেছে—নারীজাতির মুক্তি, তিনি মুক্তি খুঁজছেন; কাজেই আমার সঙ্গে কেন যেয়োবে বলুন, আমি তো একটা বন্ধন।'

বলতে বলতে তার বুকের ভেতরটা রাগে-ঘৃণায়-ক্ষোভে টনটন করে উঠল; এই সেদিনও যে মুগ্ধ সে নিজের চোখে দেখেছে তারপর—হ্যাঁ তারপর সত্যিই একসঙ্গে থাকা চলে না; তার যদি পয়সা থাকত তাহলে সে কোনো হোটেলে গিয়ে উঠত।

নিজের ঘরে সুশান্তকে বসালেন পর্ণরী। বেশ সাজানো গোছানো ঘর। ইজিচেয়ার, লেখার চেয়ার টেবিল আর তিন আলমারী বই। দেয়ালে উদয়শঙ্কর, আন্না পাভলোভা, বালাকাইন আর মেরি উইগম্যানের ছবি। টেবিলে ছোট্ট নটরাজ মূর্তি।

দু'বোনে কত তফাৎ! সুশান্ত ভাবছিল। কাজরীর পাশে বেশ ময়লা দেখায় সাবিত্রিকে, মুখশ্রী অত ভালো নয়, কাজরীর দেহের যে চাপ—তাও নেই সাবিত্রির। বয়েসও হোল প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি।

কিন্তু বাইরে চাকচিক্য না থাকলে কি হবে, পর্ণরীদির অন্তরে এক অন্যের ছন্দ লুকিয়ে আছে সুশান্ত দেখতে লাগল, দিদির কথাবার্তায় হাবভাবে সেই ছন্দ কেমন প্রকাশিত হচ্ছে।

বোনে বোনে কি আশ্চর্য অমিল! অভাবে অতৃপ্তিতে কাজরী জ্বলছে দিনরাত আর দিদি—কত ধীর, কত শান্ত। অথচ খ্যাতি অর্থ প্রতিপত্তি কি না পেতে পারেন তার বড়দি, প্রায় হাতের নাগালেই রয়েছে, একটু চেষ্টা একটু আপোষ করে চলতে পারলেই সম্ভব অনিবার্য, উনি যে সব নৃত্যনাট্য তৈরী করছেন সেগুলো অত শক্ত অত পরীক্ষামূলক না করে বেশ তরল লোভনীয় লোকপ্রিয় করে আসরে ছেড়ে দিলেই বাজার মাত।

'তুমি এই ইজিচেয়ারটায় বেশ হেলান দিয়ে আরাম করে বোস, আমি এই চেয়ারে, সাবিত্রি সহজ সুরে বলে গেলেন, তোমার দাদা মাঝে মাঝে ওইখানে বসেন, আমি তাকে নাচের গল্প শোনাই।'

'আপনি ঠিক কি করতে চাইছেন? আমার বিয়ের পর দশ বছর ধরে দেখছি আপনি কিছু প্রবন্ধ লিখেছেন

কাগজে, কিন্তু আমেরেচার পার্টি আপনার স্টিরেকশানে বেচেছে, ওরচি আপনি চব্বিশ বছর ধরে এ লাইনে লেগে আছেন, বাস্ হয়ে গেল? মা-মা একটা বই লিখেছেন বটে—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নৃত্যকলা। বাস্। কাজরী বলে—'

'কি বলে আমার বোনটি?' শর্বরী খুব আলতো করে হাসলেন।

'ও বলে আজকের দিনে সব কিছুই পেশা হওয়া চাই—শিল্পও, শিল্প হবে পুরোপুরি জীবিকা, আমাকে টাকা দেবে পয়সা দেবে মান দেবে, তবে তো আমি তার পায়ে সর্বস্ব উপুড় করে দোব।' সুশান্ত থামল।

'সর্বনাশ! লায়ী ওই করে ভেসে গেল। হ্যাঁ বলতে পার আপনার ছোট বোন এখন বম্বে কিন্নের জাদরেল, কিন্তু সেটা আমার পক্ষে আনন্দের বিষয় নয়, খুব লজ্জার দুঃখের বিষয়।' শর্বরী বলে উঠলেন।

'কেন?' সুশান্ত গোঁজা হয়ে বসল, সে ঠিক বুঝতে পারছে না দিদির কথা।

'জানো, একটা কথা বলি তোমাকে, আমার কাছেও অনেক পার্টি অনেক টাকার অফার নিয়ে আসে, আমার সব নৃত্যনাট্যের কাহিনী লেখা আছে আমি তাদের পড়তে দিই, পছন্দ হয় না, আমিও অন্য কোন নাচ দেখাতে নারাজ, সেজন্যে আমি ডিক্টেটরী করি, তোমার দাদা উল্লাস কাজ করেন। কিন্তু না আমি ভেবে দেখেছি—জীবনে শিল্প নিয়ে ছেলে খেলা চলে না, শিল্প জীবিকার উপকরণ নয়, শর্বরী আরো বললেন, সাধনার ফলে শিল্প আর জীবন যেখানে একটি ফুল হয়ে ফুটে উঠেছে সেখানেই তা সার্থক।'

শর্বরী থামলেন। ঘরের আবহাওয়া গভীর গম্ভীর হয়ে উঠল।

সুশান্ত বার বার আনমনা হয়ে যাচ্ছিল—কাজরী—কাজরী কি করছে এখন? তার উপেক্ষা কি এনেছে? কেন ওর এই সীটারের খেলা। কি করছে ওরা দুজনে! আঃ যত মনে করছে কিছুতেই ওদের কথা ভাববে না, ততই যেন মনে পড়ে যাচ্ছে!

'মতুন কিছু কম্পোজ করলেন দিদি?' চায়ের কাপটা টেনে নিয়ে সুশান্ত খুব সহজ হতে চাইল।

'হ্যাঁ ভাই, ইদানীং নৃত্যনাট্যের একটা নতুন ইমেজারী রূপ-রসের কথা ভাবছি, তার ভেতর দিয়ে বলতে হবে আজকের এই নিঃস্ব রিক্ত সর্বস্ব খোয়ানো ব্যক্তি মানুষের ভেতরকার কথা, ওর আত্মিকের ভেতর দিয়ে আনতে হবে সমাজতন্ত্রতা, আর সেটা কোন তত্ত্বকথা হলে চলবে না, শিল্পীকে ধরণ দিয়ে অনুভব করতে হবে জীবনের গভীর অভাব, অসামঞ্জস্য, অনিশ্চিত অবস্থা—আমাদের ভেতরে যে দ্বিধা, সন্দেহ, অবিশ্বাস—তার ভেতর দিয়ে আনতে হবে শিল্পীকে।' মৃদু হাসলেন শর্বরী, বললেন,—নেচে টাকা রোজগার করতে পারিনি বলে হয়তো কাজের কাছে আমি ব্যর্থ, আসলে আমি ব্যর্থ অন্য জায়গায়, আমি যা অনুভব করছি তাকে রূপ দিতে পারছি না।'

'একটা গল্প শোনাননা বড়দি।' সুশান্ত আগ্রহ করে বলল, 'আপনার নতুন নাচের গল্প।'

'আগে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলি?' বড়দি যেন অনুমতি চাইলেন, 'যেখান থেকে নাচ গল্প নিয়েছে।'

'সেটাই তো দুর্লভ—যা কেউ জানে না—কোনদিন জানবে না—' সুশান্ত বলে উঠল।

—'শোন তবে আমাদের এই বাড়ির ছাদে উঠে একদিন বিকেলে বেড়াচ্ছি, পশ্চিমে গঙ্গা বয়ে যাচ্ছে, জাহাজের উঁচু মাস্তুল দেখা যাচ্ছে, বন্দরের ক্রেনগুলোর মাথায় সোনালী রোদ—কি ভেবে শর্বরী নেমে পড়লেন কথার মাঝখানে।

'না-না, বলুন, শুনেছি—'

'একটু ব্যক্তিগত বিষয় এসে পড়ছে—'

'তা আসুক, অবশ্য যদি আপনার আপত্তি না থাকে—'

'না-মানে আজ্ঞা শোন তবে সেদিন তোমার দাদার সঙ্গে খুব ঝগড়া হয়েছে, ওনার মা রোজগার তাতে খেতে পরতেই সব ফুরিয়ে যায়, ছেলেমেয়ের মুখ চেয়ে অনেক কষ্টেসৃষ্টে কিছু জমাতে হয়; তা আমি তোমার দাদাকে.. বলেছিলাম—বাড়িটা মেরামত করা দরকার, শ্বশুরমশায় মারা যাবার পর ছ'বছর হয়ে গেছে. মিস্ত্রীর হাত পড়েনি। উনি বললেন—পারব না, অনেক খরচা। কথায় কথায়

তক্ষুণি। রাগের মাথায় বলে ফেলাম—ভালর জন্যই বলেছিলাম, আমার কি, যার বাড়ি সে বুঝবে।'

ঘরের ভেতর শুব্ধতা। টেবিলল্যাম্পের আলোয় সুশান্তর মনে হোল—বড়দি অসুন্দরী নয়।

'উনি গম্ভীর হয়ে গেলেন, দুজনে কথা নেই, ওই কথাটা নিয়ত বুকের ভেতর ঘা মারতে লাগল, আমি কি সত্যি কথা বলে ফেলিছি? এই ঘর এই দোর এই বাড়ি—এসব কিছুই আমার নয়? সে-যে কি মর্মান্তিক যন্ত্রণা তোমায় বোঝাতে পারব না সুশান্ত, মনে করে দেখ—সেই সদ্য বেদনা নিয়ে ছাদে উঠেছি, চোখের সামনে দিগন্তরেখা, পশ্চিমাকাশ, লম্বা ক্রেণ—আমি আলসের ধারে দাঁড়িয়ে কাঁদছি—হঠাৎ আমার ভেতরে কি যেন হয়ে গেল, আমি একটা জাহাজ চোখের সামনে দেখতে পেলাম, আমার দু'চোখ ভরা জলের ভেতর সেই মস্ত জাহাজ আস্তে আস্তে আবছা অস্পষ্ট হয়ে গেল, তারপর ফুটে উঠল এক তরুণীর রূপ ধরে।'

'বাঃ।'

'তার হাতে মাস্তুলে ওড়বার পাল, ওড়না উড়ছে—উড়ছে—সে চলেছে—ভেসে ভেসে চলেছে—পৃথিবীর যত সাগর-উপসাগর সমুদ্র পথে পথে সে চলেছে আর বলছে—আমি ঘরে ফিরব; বন্দরে বন্দরে সে নোঙর ফেলছে আর বলছে—না, এ আমার ঘর নয়, আমি নিজের ঘরে ফিরে যাব।'

'বেশ।'

'তারপর একদিন ক্যাপ্টেন বলল—জাহাজের মুখ ভারতবর্ষের দিকে ফেরাও, অমনি তরুণীর মুখে হাসি ফুটল, দিনরাত শুধু ভারতবর্ষের স্বপ্ন দেখল আর বলল—এবার আমি আমার ঘরে ফিরে চলেছি, আমার মতো সুখী আর কেউ নেই, আমি সারা পৃথিবী খুঁজে দেখেছি কোথাও ভারতবর্ষের মতো দেশ নেই। খুব আনন্দিত মনে সে বন্দরে প্রবেশ করল, আস্তে আস্তে সবাই তাকে ছেড়ে চলে গেল, সে একা দাঁড়িয়ে আছে, বিকেল ঘনিয়ে এসেছে, ঘুরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সে ভাবছে—কই, মানুষজন সব কোথায় গেল! কতকাল পরে কত দেশ ঘুরে নিজের ঘরে এলুম, কেন আমাকে কেউ বরণ-বন্দন করে নিচ্ছে না। এই সে ভাবছে—এমন সময় আলো মশাল জ্বালিয়ে এক রাশ লোক হৈ-হৈ করে তার চারপাশে ভিড় করল, সে ভাবল—এরা আমাকে ঘিরে আনন্দ করতে এসেছে। লোকগুলো সত্যিই তাকে ঘিরে ফেলল, কিন্তু কই ওরা তো তাকে নিয়ে আনন্দ করছে না, ফিসফিস করে কি সব বলাবলি করছে, যেন ষড়যন্ত্র আঁটছে, ওদের ঝুলি থেকে দেখি, হাতুড়ি, করাত বেরুচ্ছে কেন! তার অন্তর অজানা আশঙ্কা-আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। এতদিনে বহু কষ্টকল্পনা পেরিয়ে নিজের ঘরে ফিরলে কি হবে—পৃথিবীর সাত সমুদ্রে পাড়ি দিতে দিতে কখন সে প্রবীণ প্রাচীন জীর্ণ হয়ে পড়েছে তা সে জানে না। এখন তাকে আর দরকার নেই। এখন তাকে ভেঙে ফেলা হবে, তার মরণ-কাল ঘনিয়ে এল।'

পর্দাটা থামলেন। সুশান্ত চুপ করে রইল। ভেতর শুব্ধতা।

•

একখানা ফাঁকা ট্রামে বাড়ি ফিরছিল সুশান্ত। আদি গঙ্গার পুল পার হলেই ফাঁকা গড়ের মাঠ। চলন্ত ট্রামের জানালা দিয়ে সে চোখ ছড়িয়ে দিল প্রবাহিত পথ প্রধাবিত নক্ষত্রের দিকে। তার মন কেবলই বলছিল—আমরা সবাই চলেছি ঘর খুঁজতে, ঘর যখন খুঁজে পাব তখন দেখব সেখানে আমি বাড়তি, আমি অতিরিক্ত, অপ্রয়োজনীয় কোনো অর্থ নেই ঘরে থাকার, এই বেদনা কি কোনদিন ঘোচবার নয়।

চোখ বন্ধ করতেই সে একদিনের ছোট্ট একটি দৃশ্য দেখতে পেলে। সারাদিন ঘেটেঘুটে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল সে। তাই সোজা দোতলায় তার নিজের ঘরের সামনে হাজির হয়েছিল। সব দালান পেরিয়ে ঘর। ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ। ভেতরে উচ্ছ্বসিত হাসির তরঙ্গ। সুশান্ত অন্ধকার দালানে স্থির হয়ে গেছিল, তার পা আর চলতে চায়নি!

'নরম করুন, হাতটাকে নরম করুন, তবে কজি ঘুরবে, তপেশ বলছিল, 'খুব চমৎকার আঙুল আপনার, লম্বা

কিছুকের মতো, পুরীতে এক রকমের বিহুক দেখেছিলুম ভ্যারিগেটেড টায়েট—ঠিক সেই রকম।'

'আমার হাতটা টিপে দেখুন, কত নরম—কাজরী বলল। এক মুহূর্তের স্তব্ধতা। 'আঃ কি শক্ত হাত আপনার, ছেড়ে দোহা।'

কাজরীর কণ্ঠস্বর। 'আঃ ছাড়ুন।'

হিম—আরো হিম হয়ে যেতে লাগল সুশান্ত। বোধহয় একেবারে জমে যাবে। কোন রকমে দরজার টোকা মারল।

'কে?' কাজরী সরে বসল তপেশের কাছ থেকে।

'আমি—সুশান্ত।' ভেতরে ঢুকল সে। গম্ভীর মুখে স্বামীর কাছে উঠে গেল কাজরী। তার ক্লান্ত শরীরের দিকে ফিরেও তাকাল না সে, সেবাযত্নের সামান্য চেষ্টাও করল না, শুধু বলল, 'তুমি কি লোক বলো তো!'

'কি হোল আবার!'

'তোমায় কত বার বলেছি—আমি যখন তপেশদার কাছে গীটার শিখব তখন তুমি নিচের ঘরে বসবে, ওপরে আসবে না, আমার ডিসটার্ব হয়।'

সেদিন ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে সুশান্ত শুনেছিল তপেশ বলছে, 'আপনার জন্যে নতুন গৎ এনেছি—টুয়েলভ্‌থ্‌ স্ট্রীট ট্র্যাফিক জ্যাম। নিন শুরু।'

কী অদ্ভুত মুন্সিয়ানা তপেশের। কী আশ্চর্য ধাতব সুর এই গীটারের। সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে যেতে সুশান্তর মনে হয়েছিল—স্ট্র্যাণ্ড রোড, ব্র্যাবোর্ন রোড মায় পৃথিবীর সব পথে সব গাড়ি থেমে গেছে, তাদের ইঞ্জিন গর্জমান, ধাতব শরীর কম্পমান, আরোহী অস্থির; চাপা, কঠিন, উচ্ছৃঙ্খল চিৎকারে পথ ভরে গেছে। না—তার ঘরে কেয়া হোল না—হোল না—তার জন্যে কোনো সুর অপেক্ষা নেই—প্রতীক্ষা নেই—অধীরতা নেই—ব্যাকুলতা নেই—'আঃ ছাড়ুন' কি অর্থ এই কথার। কে কাকে ধরেছে! কে কাকে ছিনিয়ে নিচ্ছে কার কাছ থেকে!

ট্রামের জানালায় মাথা রাখল সুশান্ত। আর সে ভাবতে পারে না।

৩

কলকাতার কাঁকুড়গাছিতে কো-অপারেটিভ হাউসিং স্কিমে খুব সুন্দর সুন্দর ফ্ল্যাট বাড়ি তৈরী হয়েছে, তারই একটা তেতলার ফ্ল্যাট কিনেছেন সুশান্তর শ্বশুর কৃষ্ণপদ বাবু। সেইখানে জিনবোমে খেলা হয়ে গেল অনেকদিন পরে। একরকম হঠাৎই। আগে থাকতে কোন ঠিক ছিল না। অদ্ভুত যোগাযোগ ঘটে গেল।

কৃষ্ণপদবাবুর ইচ্ছে ছোল তাঁর বড় মেয়ে সাবি তাঁকে একবার দেখে যাক, বৃদ্ধ হয়েছেন, শরীর বিশেষ ভাল যাচ্ছে না, অগ্রহায়ণের শীত পড়তেই সর্দিজ্বর শুরু হয়েছে।

শর্বরী খবর পাঠালেন, তিনি এখন রিহার্স্যাল নিয়ে খুব ব্যস্ত, তা সত্ত্বেও আগামী শনিবার সকালের দিকে যাবেন।

আর ওদিকে বৃহস্পতিবার বোম্বে থেকে লহরী কলকাতায় এসে হাজির, শুক্রবারে হিন্দী ফিল্ম 'কালা মোটর সাদা চাকুর' উদ্বোধন রজনী। তাতে ও নায়ক-নায়িকার সঙ্গে মঞ্চে উপস্থিত থাকবে। তিনখানা নাচ আছে ওর এই ছবিতে। কাগজে ঘোষণা পড়েই কাজরী ফোন করল প্রাতে। অনেক কষ্টে লাইন পেল, লারি বলল, 'যদি সময় পাই শনিবার সকালেই বাবাকে দেখতে যাব, বোধহয় ঐ দিন বিকেলেই আমাদের বোম্বে ফ্লাইট।'

শনিবার সকালেই একখানা ট্যাক্সী করে ছুটে গেল কাজরী। সুশান্তর পক্ষে আসা সম্ভব নয়, তার অফিস আছে।

কথা রাখল লারি। একখানা ঝিয়াট ঝকঝকে ক্রাইস্লার ঢুকল হাউসিং এস্টেটের চত্বরে, অনেকগুলো আগ্রহী জানলা খুলে গেল, অজস্র কৌতূহলী দৃষ্টি পরিতৃপ্ত হোল, কিন্নর উত্তি আর্টিস্ট লহরী যেমন শাড়ির হিল্লোল তুলে কৃষ্ণপদবাবুর ফ্ল্যাটে প্রবেশ করল।

কাজরী তাকে দু'হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরল, 'আসতে পারলি তাহলে। ও গাড়িটা কার ভাই? কি সুন্দর!'

'ওটা আমাদের ইস্টার্ণ সারকিটের ডিস্ট্রিবিউটারের।' লারি তাচ্ছিল্য ভরে বলল।

খানিকবাদে শর্বরী দেবী একা গাড়ি নিয়ে বাড়ির কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করলেন। বাস থেকে নেমে পায়ে হেঁটেই এলেন। হাতে একটি প্লাস্টিকের ঝোলা, তাতে বাবার জন্যে আপেল কমলালেবু, ওষুধপত্র। কেউ লক্ষ্যই করল না তাঁকে।

কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করল না কাজরী। দিদিকে প্রণাম করে শুধু বলল, 'তিনু-বিনুকে নিয়ে আসতে হয়, তারা একবার মামার বাড়ি ঘুরে যেত।'

শর্বরী গম্ভীর হয়ে বললেন, 'মা আর মাসী একই কথা, আমার ছেলেমেয়ে যথেষ্ট বড় হয়েছে, আমি চাই না তারা তাদের ছোট মাসী সম্পর্কে কোন অশোভন কৌতূহল প্রকাশ করুক।'

ভাগ্যিস লহরী ঘরে ছিল না। কাজরী দারুণ চটে গিয়ে বললে, 'তাহলে তুমি যে নাচ শেখাও নাচের স্কুলে, তাতে ছেলেমেয়ে খারাপ হয় না?'

'আমি ছেলেমেয়েদেরই নাচ শেখাই।'

'তাহলে খারাপটা কিসের? লারি যাতে নেচেছে তা তুলতে চল্লিশ লক্ষ, টাকা খরচ হয়েছে, টেকনিকালার ফিল্ম, এক একটা নাচের সিকোয়েন্স লাখ লাখ টাকা লেগেছে. ড্রেস, সেট-সেটিং, লাইটিং, মিউজিক, প্রে ব্যাক, অর্কেস্ট্রা, এক্সট্রা, তারা ওপর এক একটা নাচের ব্যাকগ্রাউণ্ডে কখনো হিমালয়ের ছুটি হিলস, কখনো কাশ্মীর—' কাজরী বলেই যাচ্ছিল, বাধা পড়ল শর্বরীর মাথা নাড়ার ভঙ্গীতে।

তিনি বললেন, 'ও সব কিস্যু না।'

'তার মানে?' কাজরীর মুখ ছাই বর্ণ হয়ে গেল। লহরী ঘরে ঢুকল।

শর্বরী বললেন, 'এখন এসব কথা থাক।'

কাজরীর জেদ চেপে গেল, বললে, 'না, থাকবে কেন, বেশ চলছিল, চলুক না।'

'কিসের নাচ? ঘন্টা সব ছেলেমানুষি কাণ্ড, শাস্ত্রের হিসেবে দেখলে ওর কোন মূল্য নেই।' শর্বরী বললেন।

'মূল্য নেই কেন?' এবার লহরী এগিয়ে এসেছে।

'তাহলে তোকে নাচের ব্যাকরণ বুঝতে হয়, আট বুঝতে হয়।'

'তাহলে কি তুমিই সব বোঝো আর কিল্ম লাইনে কোটি কোটি টাকা নিয়ে সব মূর্খা লোক বসে আছে—' লহরী বিরক্ত হোল।

'এরপ ভাবে কথা কথা বললে আর এগিয়ে লাভ নেই, আমি কাউকে আঘাত করছি না, শুধু বলছি—কোটি কোটি টাকা নিয়ে ইণ্ডাস্ট্রি হয়, কিসেও তাই হচ্ছে, শিল্প-কলা সম্পূর্ণ অন্য জিনিস।' শর্বরী বললেন, 'নাচের যে সব ডকুমেণ্টারি বিদেশে তোলা হচ্ছে তাতে নবরসময় মঞ্চকে পুরোপুরি দেখানো হচ্ছে কেননা শিল্পী তার সেরা দেহ দিয়েই তো শিল্পরূপ ফোটাচ্ছে। কাজেই ক্যামেরা যখন তাকে অর্ধেক কি সিকি দেখে, পর্দায় যখন তার দেহের অংশ বিশেষ দেখা যায় তখন যা হয় তাকে আর নাচ না বলাই সঙ্গত।'

'বড়দির যেমন কথা!' লারি রাগ করে আর খেলল না, সন্দেশের ডিশটা সরিয়ে রাখল, 'তুমি যদি এতই নাচের মর্ম বোঝ তাহলে তোমার পার্টিকে কেউ ডাকে না কেন?'

'ডাকে না এই কারণে আমি তোর মত স্ন্যাকস পরিয়ে আমার ছাত্রিদের দিয়ে কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গী করাই না।' শর্বরী বেশ গরম গরম উত্তর দিলেন।

ঘরের ভেতর গুমোট অস্বস্তিকর আবহাওয়া। প্রায় বিবর্ণ মুখ লারি অকস্মাৎ সবাইকে অবাক করে দিয়ে হেসে উঠল, সমকে সমকে হাসির ঊর্ধ্বমুখী গাইসার ছড়িয়ে দিলে। 'দিদি কিন্তু—,' হাসির তোড়ে কথা আটকে গেল ওর, 'বলে যেন।' আবার হাসি, 'এখনো আমাদের ছেলেমানুষ ভেবে রেখেছে।'

কাজরী চুপ করে বসে রইল। সে শর্বরীর কোন কথাই মানতে পারছিল না। কিল্ম লাইনে কত খ্যাতি অর্থ প্রতিপত্তি সেসব কিছুই নয় তা কখনো হতে পারে নাকি! নাচ-টাচ আসলে কিছু না হলেও ক্ষতি নেই, পাবলিক যদি পয়সা দেয় তাহলেই ছবি সার্থক।

লারি আর কারুর দিকে তাকালেই না। সোজা মা-বাবাকে প্রণাম করে বলল, 'আমার অনেক অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ঐ জন্যে গাড়ি দাঁড়িয়ে, আমি আসি।'

যাবার সময় চাপা গলায় লারি যাকে বলল, 'টাকার দরকার থাকলে বোলো, পাঠিয়ে দোব।'

লারিকে নিয়ে বিরাট গাড়িখানা বেরিয়ে গেল।

• • •

পৌষের রাত প্রায় ন'টা। সুমুদ্র দাঁতরা লেন এরই মধ্যে নির্জন নিঃসুম হয়ে পড়েছে। সুশান্ত বাড়ি ফিরছিল। আজকাল ও সকাল সন্ধ্যে ছেলে পড়ায়। দুশো টাকার ওপর রোজগার বেড়ে গেছে প্রতি মাসে। কিন্তু তার জন্যে বড্ড বেশি মাথুল গুণতে হচ্ছে। সকাল-দুপুর সন্ধ্যে—কোথাও বিরাম নেই।

ও আজকাল নিজেকেই প্রশ্ন করে—কেন আমার আজ এই অবস্থা! কেন জিনিষপত্রের দাম আগুন! কেন আমার সংসার চলে না!

সুশান্ত বেশ বুঝতে পারে আড়ালে নিদারুণ পাপা খেলা চলেছে তার মতো হাজার হাজার মানুষের ভাগ্য নিয়ে, সে এক অসহায় চালের ঘুঁটি এক ঘর থেকে আর এক ঘরে ছুটে চলেছে।

খুব ক্লান্ত লাগে নিজেকে মনে হয় বেঁচে থাকার কোন অর্থ নেই। কত সে খুন যাগাপি! চতুর্দিকে ত্রাসের রাজত্ব, এখনি এই গলিরই আড়াল থেকে যে কেউ বেরিয়ে এসে তার বুকে ছুরি মারতে পারে, চোখ দুটো উপড়ে নিতে পারে, কেউ ফিরেও তাকাবে না, সে অসহায় ভাবে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে, কিন্তু তা বৃথাই।

তবু ভয় লাগছে না সুশান্তর অনেকদিন ধরে বোমার শব্দ শুনে, বারুদের গন্ধ শুঁকে, ভয়বাহীর আস্ফালন দেখে তার সব কিছু-অসাড় হয়ে গেছে। চারদিক দেখতে দেখতে সে তার ঘরের দিকে এগোচ্ছিল।

হঠাৎ এক জায়গায় তার চোখ আটকে গেল। বেশ বড়সড় পোষ্টার পড়েছে দেয়ালে। অনেকখানি লেখা, লাল জায়গায় হরফে অজস্র নাম, অক্ষর থেকে অক্ষরে দৃষ্টি লাফাতে লাগতে এক জায়গায় আটকে গেল; পোষ্টারে শিল্পী শ্রীমতী কাজরী দেবী।

ভয়ে বিস্ময়ে সে কিছুক্ষণ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। এরই মধ্যে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে, সে কিছুই জানে না, তাকে জানাবোর দরকার মনে করেনি কেউ, যেন সে কাজরীর আশা-আকাঙ্খা-উন্নতির পথে মস্ত বাধা, তাই তাকে এড়িয়ে সব করা হচ্ছে, আর তাই তাকে বিচিত্রানুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন পড়ে জানতে হচ্ছে কাজরী এখন সম্মানিত শিল্পী, হাওড়ার একটা বিরাট জলসায় সে শুধু আমন্ত্রিত নয় তার নাম জনপ্রিয় হয়ে গেছে, খুব দ্রুত সে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে, অত্যন্ত তাড়াতাড়ি সে চলেছে, তার অনেক টাকা চাই, অনেক সুনাম, তার আর ভেবেচিন্তে কিছু করার—বুঝে শুনে এগোনোর—সময় নেই।

আর কি রকম ছুটেও গেছে ভাইনে বাঁয়ে—লাল জ্বালিতে খুব বড় হরফে ছাপা হয়েছে—অর্কেস্ট্রায় তপেশ কুমার (পাশ্চাত্য যন্ত্রসংগীত)—লাস্যনৃত্যে মিস লারি (বোম্বে)।

কথাগুলো চোখে পড়া মাত্রই ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মতো চমকে সুশান্ত পেছু হটে এসেছে, তারপর দ্রুত পা চালিয়ে চলে এসেছে নিজের বাড়ীতে উঠে, এসেছে দোতলায়, দাঁড়িয়েছে নিজের ঘরের সামনে।

ঘরের দরজা বন্ধ ভেতর থেকে ভেসে আসছে হাওয়াইয়ান গীটারের সুর, সুশান্ত বুঝতে পারলে দুটো গীটার বেজে চলেছে, একজন ধরেছে 'ষ্ট্রেঞ্জার অন দি শোর'—বেলাভূমিতে বিদেশী, আর একজন তাল দিচ্ছে।

অতি মধুর সুর। সুশান্ত থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কোথায় কোন দক্ষিণ সমুদ্রে, কোন অজানা দ্বীপে, নারকেল কুঞ্জে বাসের ঘাঘরা পরা মেয়েরা নেচে চলেছে, তাদের গলায় লাল ফুলের মালা, চোখে আমন্ত্রণ। সেই সুদূর পলিনেশীয় প্রবাল দ্বীপে কে সেই নবীন আগন্তুক—আমি? কাজরী? তপেশদা? সুশান্ত বার বার নিজেকে প্রশ্ন করতে লাগল—এমন অপরূপ সুর কেন মানুষের মনকে ভরিয়ে দিতে পারল না? কেন সে এই সুরকে মূলধন করে ব্যাপ্তি আর ঐশ্বর্যের দিকে ছুটে যায়?

আস্তে আস্তে দরজা খুলল সুশান্ত। বলল, 'আমার একটু কথা ছিল।'

বাজনা থামিয়ে কাজরী মুখ তুলল, হাতের স্টিকগুলো

খুলতে খুলতে বললে, 'ছিঃ তো সব মাটি করে, কি এমন দরকারী কথা ?'

বেশ একটু চীৎকার করেই বলল সুশান্ত, 'আমাকে না জানিয়ে এসব কি হচ্ছে ?'

'চেঁচাবে না, এটা ভদ্রলোকের বাড়ি, ভদ্রভাবে কথা বলো। কাজরী উঠে দাঁড়াল, 'যা বলার পাশের ঘরে গিয়ে বসবে চলো, ছাঁ করবার আগেই আমি হাই ধরতে পারি, তোমার মতো মিচকে শয়তানের কথা বুঝতে আমার এক সেকেণ্ড লাগে।'

তপেশও ততক্ষণে উঠে পড়েছে। হাসিমুখেই সে বলল, 'কাল আসব, একদিন ভালো করে রেয়াজ করতে হবে।'

'না, আপনাকে আর আসতে হবে না, কাল থেকে আপনার ছুটি, কত মাইনে পাবেন বলুন মিটিয়ে দিচ্ছি।' সুশান্ত বলল।

তপেশ কাজরীর দিকে চেয়ে চোখ টিপল, অর্থাৎ ব্যাপার কী! কর্তা দারুণ খেপে গেছে।

'ঠিক আছে, তপেশদা, কাল একটু ভাই তাড়াতাড়ি এসো, অনেকগুলো মোটেশন তুলতে হবে।' খুব সহজ ভাবে বলল কাজরী।

'এটা আমার বাড়ি, যদি আমি ঢুকতে না দিই ?'

'ঠিক আছে, তাহলে কাল থেকে আমি তোমার বাড়িতেই যাচ্ছি ভাই তপেশদা, একটু ভালোমন্দ জল খাবারের ব্যবস্থা রেখো।'

কাজরীর ঔদ্ধত্যে সুশান্ত বিষম রেগে গেল, 'আমি তোমাকে বাড়ি থেকে বেরুতে দোব না, মনে রাখবে তুমি আমার বিবাহিতা স্ত্রী।'

'মাথা-টাথা খারাপ হয়ে গেছে না কি! কি পাগলের মতো যা তা বকছো !'

'পাগল আমি না পাগল তুমি ? মাথাটা কার খারাপ হয়েছে শুনি ? কার নামে পোষ্টার পড়েছে ? আমার ? না তোমার ? না ওনার ?' তপেশকে দেখিয়ে দিল সুশান্ত।

'এ রকম চান্স খুব কমই জোটে নতুন আর্টিস্টের ভাগ্যে।' তপেশ বলে উঠল, 'এতে তো আপনার আনন্দ হওয়ার কথা। আপনি রাগছেন কেন ? এতো শ্যামবাজার কি বালীগঞ্জ নয় যে উঁচু সার্কেলে মেলামেশার সুযোগ থাকবে, হাওড়ার এই লোহাকাটা গলি থেকে আর্টিস্ট হয়ে বেরুনো মানেই ভাগ্যের কথা, কলকাতার কেউ চান্স দিচ্ছিল না, কত লড়তে হয়েছে ওকে জানেন ?'

'না জানিনা, জানতে চাইও না,' তপেশ বলল, 'আমি তোমাকে কলসায় যেতে দোব না।'

'কেন ?'

'কেন ?'

ওরা দুজনেই এক সঙ্গে প্রশ্ন করল।

'এত বলে দিতে হবে তবে বুঝবে ?' সুশান্ত জানাল, 'দিনকাল অত্যন্ত খারাপ, চতুর্দিকে গণ্ডগোল, বোমা বাজী, খুন খারাপী লেগেই আছে।'

'ঠিকই বলেছেন, তবে এর জন্যে ঘুমিয়া খেমে নেই, ঠিকই চলেছে, তপেশ বলল, 'এটা জেনে রাখুন যারা বিচিত্রানুষ্ঠান করছে তারাও মাস্তান, গণ্ডগোল হলে তারাও লড়তে জানে।'

মাস্তান : শব্দটা শুনেই সুশান্ত ভয় খেয়ে গেল, 'তাহলে দেশের শিল্প সংস্কৃতি আজকাল মাস্তানদের হাতে চলে গেছে।'

'শুধু তাই নয়'—নির্বিকার ভাবে বলল তপেশ, 'বৌদি টাকাও এডভান্স নিয়েছেন, এখন যদি আপনি বলেন যেতে দোব না তাহলে আপনার মুণ্ড যাবে।'

সুশান্ত বোকার মতো ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালো। এই গলিতে তিনটে লাশ পড়ে গেছে গত এক বছরে, এখন প্রতিদিন পাঁচটা করে খুনের খবর কাগজে বেরোয়, সে বুঝতে পারছিল ক্রমশঃ কোন ঠাঁদা হয়ে যাচ্ছে সে, কোথাও পালাবার পথ নেই।

'ঠিক আছে, কাল আসব খন।' তপেশ আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে।

কাজরীর হাত দুটো জড়িয়ে ধরল সুশান্ত, 'আমাকে না জানিয়ে কেন তুমি এমন কাজ করলে ?'

'আমি তো এখনো বুঝতে পারছি না খারাপ কি

করেছি।' কাজরী নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিল, আর্টিস্ট হতে গেলে তাকে অনেক'ই বাজাতেই হবে, তাকে ঘরের বাইরে বেরুতেই হবে।'

'ওইখানেই আমার আপত্তি।'

'কে শুনছে তোমার কথা! আমি মুক্তি চাই। কি বিশ্রী তোমাদের এই সংসার! শুধু মূলো পালংশাকের চচ্চড়ি, শুধু ঝুচো চিংড়ির হিসেব।'

'কিন্তু তুমি কি জানো—আমাদের এই সমাজটা খুব পচা পুরনো-ভাঙাচোরা, নানা দুর্নীতিতে ভরে গেছে, বহু অসৎ মানুষে কিলবিল করছে, খুব হিসেব করে, অত্যন্ত সর্তক হয়ে না চললে মেয়েদের খুব বিপদ—'সুশান্ত আরো কি বলতে যাচ্ছিল, কাজরী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

যাবার সময় ও শুধু বললে, 'তুমি একটা লেকচারের বাচ্চা। টিউশানী করে করে এমন বয়ভোল হয়ে গেছে যে সর্বসময়ে লেকচার।'

সুশান্ত কপাল চাপড়াল।

৫

পারলে কার্ডখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলত সুশান্ত, কিন্তু পারেনি। তার জন্যে আবার গেস্ট কার্ড—সে আজ বিশিষ্ট অতিথি। সামনের সারিতে তার আসন।

গেটে ঢুকতে গিয়েই সে হোঁচট খেয়েছে, সব কটা গেটকিপার পরনে নবাবের ওর্ডা। একবার ভেবেছে আসরে যাবে কি যাবে না। তার আদৌ ভালো লাগছিল না। সবটাই জোর করে আসা। তাই বাইরে অনেক-ক্ষণ পায়চারি করেছে সে।

হাওড়া ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের যে বিরাট চওড়া রাস্তাটা কদমতলা বাজারের কাছে এসে থেমে গেছে ঠিক তারই ব্যাঙ্কের মুখোমুখি, তার ওপর বসেছে আসর। চতুর্দিক টিন দিয়ে ঘেরা। আসরের ঠিক পেছনেই বড় বড় ড্রেন পাইপ বসবে বলে সারা রাস্তাটা খোঁড়া, একটা বিশাল পুকুরের মতো হয়ে রয়েছে, জলের ওপরটা কচুরিপানায় ভর্তি। এরই নাম রাজা প্রতাপ রায় তলা। আগে ছিল শুধু বস্তি। গুণ্ডার আড্ডা। এখন হয়েছে মশা আর কচুরী পানার আড্ডা।

গ্রীণরুম গিয়ে একবার কাজরীর সঙ্গে দেখাও করে এল সুশান্ত। খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছে ওকে, 'তুমি কিছু ভেবোনা, রাত হলে বাড়ি চলে যেয়ো, আমাকে ওরা গাড়ি করে পৌছে দেবে।' এমনও সে বলেছে। তপেশ ভীষণ ব্যস্ত তার পার্টি নিয়ে। লহরী একটা ঘেরা জায়গায় চুপ করে বসেছিল। ওকে দেখেই ছুটে এল, 'দাদাবাবু, আমার ড্যান্স দেখে যাবেন, মাথা ঘুরিয়ে দোব আজ।'

'শুধু আমার কেন, অনেকেরই দেখে, নইলে হাজার হাজার টিকিট বিক্রী হয়!'

'না, এমন কেউ কেউ এখনো এ পৃথিবীতে আছে যার আদৌ ভালো লাগে না আমার নাচ।'

'যথা—'

'আমার বড়দি—সাবিদি—'

'কিসে বুঝলে?'

'তাকেও এরা অফার করছিল, মোটা টাকার অফার, সাবিদি বলে দিয়েছে—যে আসরে বোম্বাই-মার্কা নাচ হয় সে আসরে সে নামবে না। বলুন, বোম্বাই মার্কা নাচ যদি এত খারাপই হবে তাহলে এত লোক ছুটে আসে কেন?'

• • •

লোক শুধু ছুটে আসেনি, মঞ্চ যুদ্ধের মতো তখন নিশ্চল হয়ে গেছে। রাত প্রায় বারোটা। বিশাল প্যাণ্ডেল লোকারণ্য। পর্দা উঠলো। মৃদু আলো পড়ল স্টেজের মাঝখানে, লহরীর প্রায় বিবসনা মূর্তি।

আলো জোর হতে লাগল। নেপথ্যে অর্কেস্ট্রা প্রখর থেকে প্রখরতর। মূর্তি নড়ে উঠছে, সমস্ত চোখ কানে যেন বাঁধা লেগে যাচ্ছে, স্নায়ু অসাড় হয়ে পড়ছে।

হঠাৎ স্টেজের কোণ থেকে ধোঁয়া লাল পর্দায় আগুন, প্যাণ্ডেলের বাইরে ঘোমার শব্দ, লোকের চীৎকার।

সুশান্ত প্রথমে ভাবল ইলেকট্রিক তারের শর্ট সার্কিট হয়ে আগুন ধরে গেছে, কিন্তু সেই টিনের প্রাচীরের বাইরে

সোডার বোতল কাটতে লাগল আর আধলা ধান ইট পড়তে লাগল আসরের মাঝখানে তখনি সেই বিশ্রী ভয় সুশান্তর বুকের ভেতর বেজে উঠল।

ততক্ষণে বাইরে বেরোবার জন্যে ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে গেছে, একদল ছেলে চেয়ার ভাঙতে আরম্ভ করেছে।

সুশান্ত স্টেজে উঠতে গিয়েও উঠতে পারল না। আগুন খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। আগুনের হল্কা তার দিকে ছুটে আসছে, কালো ধোঁয়া আর কাপড় পোড়া গন্ধে জায়গাটা ভরে গেছে।

প্যাণ্ডেল থেকে কোন রকমে সুশান্ত বেরিয়েছে কিন্তু তখনো বাইরে যাবার গেট খুঁজে পায়নি হঠাৎ আলো নিভে গেল। অত জোরালো তীব্র আলোর পরই একরাশ চাপা অন্ধকার। সুশান্ত কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ধাক্কা খেয়ে দুবার পড়েও গেল। তার হাঁটুতে দামান্য চোট। ভয়ে তার বুক টিপ টিপ করছে।

আগুন তখন সারা মঞ্চ গ্রাস করেছে, গ্রীণরুম ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার।

অন্ধকারে কে একজন তার হাত থেকে ঘড়িটা ছিনিয়ে নিল। সে দুবার 'পুলিশ' 'পুলিশ' বলে চেঁচিয়ে উঠল। লোকটা তার গালে ঠাস করে তার গালে একটা চড় কষিয়ে সরে পড়ল।

গ্রীণরুম থেকে বাইরে যাবার একটা গেট সুশান্তর সামনে পড়ল। তার কোলাপসিবল খোলা। সে একলাফে বাইরে বেরিয়ে এল। দূরে একটা নারী কণ্ঠের আর্ত চীৎকার -'মা মা, আমায় মেরো না—মেরো না—'

সুশান্ত ছুটল একটা ঝোপের দিকে।

শীতের গভীর রাত। চাপা কুয়াশা চতুর্দিকে। শুধু বোমার শব্দ, লোকে চীৎকার। কি যে ঘটছে সে কিছুই বুঝতে পারছে না।

ছুটতে ছুটতে সে একটা আম গাছের নীচে হাজির হোল। পাশেই কচুবন, আকন্দর ঝোপ। সুশান্তর মনে হোল সেখানে কে যেন শুয়ে রয়েছে। পকেট থেকে দেশলাই বের করল সে। তার হাত কাঁপছে ফস করে একটা কাঠি জ্বালতেই চোখে পড়ল—লহরী শুয়ে আছে, নীরব, নিঃস্পন্দ, তার বুকে আর তলপেটে ছোরার অজস্র চিহ্ন।

কাঠি নিভে গেল। আতঙ্কে সে কয়েক পা পিছিয়ে এল।

তাহলে কাজরী? কাজরী কোথায়? তার গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরোচ্ছে না। কি করবে সে। কোথায় যাবে! কোনখানে খুঁজবে।

প্যাণ্ডেলের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছিল সে। গেটের কাছাকাছি আসতেই জন চারেক ছোকরা তাকে ঘিরে ফেলল, একজন ফস করে মানি ব্যাগটা তার পকেট থেকে তুলে নিল, আর একজন হুঙ্কার ছাড়লে, 'এ্যাই শুয়োরের বাচ্চা, ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? শিগগির এখান থেকে সরে পড় চাঁদু, নইলে এই দেখতে পাচ্ছ চাকু চলে যাবে।'

একজন ধারালো ছোরা উঁচিয়ে ধরল।

নিতান্ত নিরুপায় হয়ে সুশান্তকে বাড়ি ফিরতে হল। অনেকক্ষণ সে কাঁদতে ভুলে গিয়েছিল। এখন সমস্ত শোক অশ্রু হয়ে তার বুকের ওপর নেমে এল।

পরের দিন অনেক খোঁজাখুঁজি করে কচুরীপানার ভেতর থেকে কাজরীর লাশ পাওয়া গেল। তপেশ এজাহার দিয়েছিল পুলিশের কাছে—বিপদ বুঝে কাজরী আর লহরীকে নিয়ে সে গেটের বাইরে আসতেই জনা কয়েক দাড়ান লহরীকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যায়, কাজরী তখন ছুটতে থাকে। কয়েকজন কাজরীকে তাড়া করতেই সে অন্ধকারে বুঝতে না পেরে পুকুরের মত জলভর্তি নর্দমায় পড়ে যায়। তপেশ বাধা দিয়েছিল প্রাণপণে, কে একজন পেছন থেকে তার মাথায় ভাঙা ঘুরতেই সে ঘুরে পড়ে যায়, তারপর আর কিছু তার মনে নেই।

৬

কথাশেষ

এসব কতদিনকার আগের কথা। তারপর বছর চারেক যে কোথা দিয়ে কেটে গেছে সুশান্তর সে হিসেব

নেই। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় খুব ছোট একটা অনুষ্ঠান হোল একাডেমী অফ ফাইন আর্টসে। সুশান্ত ইদানীং একলা থাকতে ভালবাসে। কোথাও যায় না। তবু সেদিন গিয়েছিল।

বড়দি এসেছিলেন। সুশান্ত তাকে প্রণাম করে কুশল প্রশ্ন করেছিল। তিনি সামান্য হেসেছিলেন।

সভায় বড় ভীড় জমা পঁচিশ-তিরিশ লোক হয়েছিল। সব কাগজে বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল সেদিন—শ্রীমতী শর্বরী দেবীর সম্বর্ধনা সভা। কিন্তু কলকাতায় তো কত সভা হয়, কে তার খোঁজ রাখে! বিশেষ এ সভায় কোন আকর্ষণ ছিল না। তিরিশ চল্লিশ মিনিটেই সব শেষ। কাজেই লোক হয়নি।

সভার শেষে হাওড়ার ট্রাম ধরবে বলে সুশান্ত সেন্ট পলস ক্যাথিড্রালের পাশ দিয়ে হাঁটছিল আর কত কি ভাবছিল আপন মনে।

পশ্চিম জার্মানীর কলসাস খুব সুন্দর করে বললেন, মানচিত্র দেখলেই বুঝতে পারা যাবে পশ্চিম জার্মানীর দুইপাশে দুই শক্তিধর। না, তিনি রাজনৈতিক শক্তির কথা বলছেন না। বলছেন নৃত্যকলার কথা। পশ্চিম জার্মানীর ডাইনে দাঁড়িয়ে আছে তার বলশয় ব্যালে নিয়ে। তার বাঁ দিকে আমেরিকা দাঁড়িয়ে আছে তার ব্যালাক্লাইন, মার্থা গ্রাহাম আর জোফ্রেকে নিয়ে, এর মাঝখানে নানা ছড় ছড়ার মধ্যে মেরি উইগম্যান দাঁড়িয়ে আছেন আজকের পশ্চিম জার্মানীতে। এ যুগের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বেদনা ওঁর নৃত্যে উদ্ভাসিত। তাই শ্রীমতী শর্বরী দেবীর মতো গুণী শিল্পীকে পশ্চিম জার্মানীতে আমন্ত্রণ জানাতে পেরে তিনি আনন্দিত। তিনিও তাঁদের মাঝে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যকে মেলাবেন এ আশা তিনি রাখেন।

শর্বরীদি উঠে দাঁড়ালেন। সামান্য কয়েকটি কথা বললেন। এখনো সুশান্তর কানে বাজছে সেইসব কথা—'একালের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট-বেদনা মানুষের শরীর সন্ধান করে ফিরছে, যদি আত্মার দ্বারা উজ্জীবিত শরীর তারা পায় তবে তারা নেমে আসবে নৃত্যে—ভঙ্গিমায়-চলচরণে-হস্তমুদ্রায়। আমাদের এমন সব গোপন-গভীর মর্মবেদনা আছে যাকে কথায় ধরা যায় না—রঙে-রেখায় ধরা যায় না—ক্যামেরায় ধরা যায় না—কেবল নৃত্য পারে তাকে ধরতে। সেই যন্ত্রণাকে আমি জানি। আমি এখন দেশে-দেশান্তরে তার কায়ারূপ সন্ধান করে ফিরছি।'

সভার শেষে সুশান্ত জিজ্ঞেস করেছিল শর্বরীকে, 'নতুন কি কম্পোজ করলেন?'

শর্বরী উত্তর দিলেন, 'কাজরী আর লহরীকে নিয়ে একটা কোরিওগ্রাফি হয়েছে। আজকের সব মানুষ এই কাজরী আর লহরী, অর্ধ আর খ্যাতির দিকে ছুটে চলেছে। তাই আমার নাচের অর্ধেকটা বাস্তব, অর্ধেকটা স্বপ্ন।'

'কি নাম দিয়েছেন?'

'দক্ষিণ সমুদ্রের গান।'

চলতে চলতে সুশান্তর মনে পড়ল অনেকদিন আগে তার ঘরে কে যেন বাজাতো হাওয়াই দ্বীপের সুর, ওরাই কিকি বেলা কুমির গান, কেয়ালাকেকুয়ার কুমারীদের জীবনস্পন্দন। এখন সে ঘর শূন্য, নীরব, নিঃস্পন্দ। বৃথাই সুশান্তর পথ চলা। আর কোনোদিন সে সুখের কাছে ফিরে যাবে না, কোনোদিন না।

• • •

একটি মেয়ের স্বামী এসেছে; অল্প অল্প সমবয়স্ক ছোকরাদের নিয়ে বাহিরের ঘরে বসেছে। এদিকে ঐ মেয়েটি ও তার সমবয়স্কা মেয়েরা জানালা দিয়ে দেখছে। তারা বরটীকে চেনে না ঐ মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করছে, ঐটি কি তোর বর? তখন সে একটু হেসে বলছে না। আর একজনকে দেখিয়ে বলেছে ঐটি কি তোর বর? সে আবার বলেছে না। শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা করলে—ঐটি কি তোর বর? তখন সে হ্যাঁও বললে না, নাও বললে না; কেবল একটু কিক করে হেসে চুপ করে রইল। তখন সমবয়স্কারা বুঝলো যে ঐটী তার স্বামী। যেখানে ঠিক ব্রহ্মজ্ঞান সেখানে চুপ। —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেব

অবলম্বন

মানবেন্দ্র পাল

চৌধুরী মশাইয়ের চার বিঘে জমির চাষ বহু কাল ধরে করে আসছে হাবু মিঞা। চৌধুরী মশায়ের বয়েস এখন যদি হয় সত্তর—তবে হাবু মিঞার আশি তো বটেই।

তাবাই যায় না আশি বছর বয়সের একজন বুড়ো—পিঠ বেঁকে গিয়েছে, তবু লাঠির ওপর ভর করে কাঁপতে কাঁপতে আসছে চৌধুরীবাবুর কাছে সারের খরচ নিতে।

ভাগে চাষ। এতকাল কোন হাঙ্গামা ছিল না। ধান কাটা হলেই গাড়ি বোঝাই করে পাঠিয়ে দিত হাবু মিঞা বাবুদের বাড়ী তুলে দিয়ে যেত।

কিন্তু গোল বাধল গত বছর থেকে।

হাবু মিঞার একমাত্র নাতি (সেই এখন গতর খাটিয়ে চাষ করে) আকলু মিঞা এমন বেশ মাতব্বর হয়ে উঠেছে। বাবরিকাটা চুল, সরু গোঁফ, পরণে চেক চেক লুঙ্গি, মুখে চলতি হিন্দি গান। দল পাকিয়েছে বেশ। সেই দল নিয়ে রোজই প্রায় কাড়িয়া করে বেড়ায় এপাড়া ওপাড়া। গাঁয়ের লোক ভটস্থ আকলুর নামে। কিছুদিন আগে সুলতানগঞ্জে যে বড়োরকমের ডাকাতিটা হয়ে গেল, লোকের সন্দেহ তার দলপতি ছিল আকলু।

সেই আকলু বলে বসল ফসলের ভাগ দেব না। লাঙ্গল যার জমি তার।

এই সময়টায় দেশে রাজনৈতিক অরাজকতা চলেছে। যেকী সহানুভূতি দেখিয়ে বর্গাদারদের নিয়ে চলেছে রাজনৈতিক দাবাখেলা। জীবনে যারা কোনোদিন পল্লী-গ্রামের মাটিতে পা দেন নি, সরকারী নিউজ রিলে ছাড়া যারা কখনো কৃষককে চোখেও দেখেননি তাঁরাই হয়ে উঠলেন কৃষকদরদী! কৃষকদের প্রতি কে কত দরদ দেখাতে পারে পাল্লা দিয়ে তৈরি হচ্ছে লাগল নতুন নতুন আইন। আর সবচেয়ে সুবিধে নিল অসাধু কৃষকরা। তারা মনে করে নিল ভাগ ফসল না দিলেও উচ্ছেদ করা সাধ্য হবে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেল গরিব সেরেফরা—যাদের একমাত্র সম্বল ঐ জমিটুকু।

আকলু মিঞা সেই রাজনৈতিক অরাজকতার একটি ফসল। সে বললে, একটুও ধান দেব না। দেখি শালা বাবুরা কী করে!

বুড়ো হাবু মিঞা শুনে মাথা চুলকে বললে, তা কি হয়? তেনাদের প্রাপ্য ফসল—

—রেখে দাও প্রাপ্য ফসল। তেনাদের অভাব কী?

কথাটা যুক্তিসঙ্গত বটে। তবু কিন্তু কিন্তু করে বুড়ো বললে, না বাপু, সেটা ঠিক হবে না। ধর্মে সইবে না।

দাদুকে কষে এক ধমক দিয়ে আকলু বললে, তোমার ধর্ম তোমার থাক্। পাপ হয় আমার হবে।

বুড়োর তবু মন থেকে খটকা যায় না। হাজার হোক বহুকালের অভ্যাস তো। গোটা ফসল মেরে দেবে?

ভেবেচিন্তে বললে, কিন্তু বাবুরা যদি নিজেরাই ফসল নিতে আসে?

আকলু মিঞা তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, বাবুরা মানে 'নাটুকে চৌধুরী' তো? এলে খুলি কাটিয়ে দেব। এটা নাটশালা নয় যে ভয় পাবে।

যথাসময়ে বাবুর কাছ থেকে হাবু মিঞার ডাক এল। হাবু লাঠিতে ভর দিয়ে ঠক্ ঠক্ নড় নড় করতে করতে চলল।

চৌধুরী মশাই জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ হাবু?

—ভালো নেই বাবুমশাই। এখন খোদা দোয়া করলেই হয়।

চৌধুরীমশাই হেসে বললেন, তার পথ চেয়ে তো আমিও রয়েছি। দোয়া মিলছে কই? এ যে নরকযন্ত্রণা। দিন দিন দেশের অবস্থা কী হয়ে উঠছে হে! সর্ষের তেল আট টাকা কিলো! আতপ চালের মতো বাহু—তাই কিনা ছ' টাকা!

হাবু মাথা নাড়াতে নাড়াতে বললে, আপনারা হলেন গিয়ে বাবুমশাই। আপনাদেরই যদি এই হাল হয় তাহলে আমরা গরিব মানুষ দাঁড়াই কোথা? পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই—আমার পরিবারটা তো লজ্জায় ঘর থেকে বেরোতে পারে না।

চৌধুরী মশাই-এর দু চোখ ছলছল করে উঠল। বললেন, আমি বৌমাদের বলে দেখব যদি—

এমনি সময়ে বাবুর নাটুকে ছেলে পান চিবুতে চিবুতে অন্দরমহল থেকে বাইরের ঘরে এসে দাঁড়ালো।

চৌধুরী মশাই তাড়াতাড়ি স্বর বদলে বললেন, সবার ধান গোলায় উঠে গেল আমার ধান কই?

বুদ্ধিমান হাবু বাড়ির পথে না গিয়ে অন্য পথ ধরল। যাবা দুইয়ে বললে, দেব। এই মাসের শেষেই দেব।

নাটুকে বাবু খুব ব্যস্ত। সম্ভবত আজকালের মধ্যেই কোনো বই নামাবেন। বাইরের ঘর থেকে সাইকেলটা নিয়ে বেরোচ্ছিলেন হাবুর কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখ পাকিয়ে বললেন, ওসব মতলব আমি বুঝি। আসছে রবিবারের মধ্যে ধান ঠিকমতো না পৌঁছলে কেমন করে তোমার উঠোনে ধান উঠে দেখে নেব।

বলেই সাইকেল নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। চৌধুরী মশায়ের এই কবির পুত্রটি একটি রত্ন বিশেষ। বাপের চেষ্টায় দু তিন জায়গায় চাকরি পেয়েছিল, কিন্তু বড্ড বেশী পরিশ্রম করতে হয় বলে ছেড়ে দিল। ইদি নাটক করতে খুব ভালবাসেন বলে সবাই এঁকে নাটুকে চৌধুরী বলে। পূজোর-পার্বণে এঁর দল যাত্রার আসর মাতিয়ে তোলে।

কিন্তু এইটিই তার একমাত্র গুণ নয়। এ ছাড়াও তাঁর অন্য গুণ আছে। এঁর ছত্রছায়ায় এখানকার অনেকগুলি উঠ্‌তি যুবক আশ্রয় নিয়েছে। এঁদের ভয়ে পাড়া তটস্থ। নাটুকে চৌধুরী আবার রাজনীতিও করেন। যখন যেমন তখন তেমন। কখনো গলায় লাল রুমাল বেঁধে 'লাল সেলাম' করেন, কখনো ভেরাঙা পতাকা হাতে নিয়ে 'যুগ যুগ জিয়ো' বলে চিৎকার করেন। যোদ্ধা কথা সবাই এঁকে বেশ একটু সমীহ অর্থাৎ ভয় করে চলে।

হাবু মিঞা বাড়ি ফিরেই নাতিকে বললে, কর্তার মন ভিজিয়ে ফেলেছিলাম, কিন্তু বাগড়া দিলে ছোটো ছেলেটা। খাসিয়ে গেল।

আবদু বললে, বাড়ি বসে সব খালাই খাসাতে পারে। আসুক এখানে।

মাসের শেষেও পাওনা ধান এল না। এবার কর্তা নিজে বিদ্যা নিয়ে গেলেন হাবুর ওখানে। হাবু হাত জোড় করে বললে, অভাবে খেয়ে ফেলেছি। সামনের বার পুষিয়ে দেব।

সে বছর চৌধুরীমশাই ছেলেকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করলেন। কিন্তু পরের বছরও যখন ঐ একই অজুহাতে ধানের ভাগ দিল না তখন ছেলেকে আর ঠেকিয়ে রাখা গেল না। সে তার দলবল নিয়ে হাবু মিঞাকে উচ্ছেদ করতে যাবে।

এ যে কত বড়ো বে-আইনি ব্যাপার আর এর পরিণতি যে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে বৃদ্ধ চৌধুরী মশায়ের সে জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। তিনি ছেলেকে ডেকে নরম সুরে বললেন, বাবা বীরু, অধৈর্য হোয়ো না। গোঁয়ার্তুমি করলে শেষে পরিতাপ করতে হয়।

বীরু চটে উঠে বললে, তোমার প্রশ্রয় পেয়ে পেয়েই তো আজ ওদের এত বাড় বেড়েছে। আর তোমার কথা শুনব না। আজই এস্পার ওস্পার যা হোক একটা করে আসব। খুনখারাপি হয় হোক।

চৌধুরী মশাই তাড়াতাড়ি উঠে ছেলের মুখ চাপা দিয়ে বললেন, চুপ—চুপ কর হারামজাদা।

—কেন চুপ করব? আমাদের 'রাইট' আমরা বুঝে নেব না? আর জমি রাখতে গেলে কবে কোথায় না রক্তপাত হয়েছে?

চৌধুরী মশাই বললেন, রক্তপাতের দরকার কী বাবা? এখনো তো দেশে কোর্ট কাছারি আছে। আইনকানুন তো একেবারে লোপ পেয়ে যায়নি। আমি কেস করব।

ভাগচাষ আপিসে নালিশ করা হল। চৌধুরী মশাই এই বলে প্রার্থনা করলেন—যেহেতু গত বছরের প্রাপ্য ভাগফসল বর্গাদার দেয়নি, ফসল খেয়ে ফেলেছে সেই

জন্যে তার মূল্য বাবদ তিনশত টাকা জমির মালিককে দেওয়া হোক। আর যেহেতু ব্যবসময়ে ভাগ দেয়নি সেই জন্যে নালিশী জমি থেকে বর্গাদারী অবসানকল্পে উচ্ছেদ চাই।

ভাগচাষ অফিসার বিচার করে এই মর্মে রায় দিলেন যে, জমির মালিক দাবীকৃত ফসলের মূল্যের জন্যে অ্যাওয়ার্ড পাবে। আর ফসল কাটার পরই নালিশী জমির দখল বর্গাদার জমির মালিককে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে।

রায় শুনে হাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

আকলু সান্ত্বনা দিয়ে বললে, ঘাবড়াচ্ছ কেন দাদু? আদালত তো আর কেবল ভাগচাষ অফিসটুকুর চৌহদ্দির মধ্যে নয়। আরো আদালত আছে।

ঐ অ্যাওয়ার্ডের বিরুদ্ধে আকলু এবার স্থানীয় এস. ডি. ও-র আদালতে ভাগ আপীল দায়ের করল।

যথাসময়ে তারও রায় বেরোল। দেখা গেল এস. ডি. ও সাহেব নিম্ন ভাগ-অফিসারের আদালতের রায়ই বহাল রেখেছেন।

জরে বেঘোর বৃদ্ধর কপালে জলপটি দিতে দিতে নাতি বললে, এখানে সব শালা ঘুষখোর। টাকা দিয়ে চৌধুরীরা মুখ বন্ধ করেছে। ঠিক আছে—বাবারও বাবা আছে। এবার কলকাতা হাইকোর্ট।

হাবু মিঞা একটু সুস্থ হলে নাতিকে ডেকে দুহাত জড়িয়ে ধরে বললে, পাগলামো করিস নে ভাই। যা হবার তা তো হয়েছে. এখনো সময় আছে—চ' যাই। বাবুর কাছে মাপ চেয়ে নিই গে।

আকলু ঝেঁজে উঠে বললে, মাপ? কিসের জন্যে মাপ চাইবো? ঘুঁষ দিয়ে এস. ডি. ও সাহেবের মুখ বন্ধ করেছে বলে? আমি ও বাপ্পা নই। হাইকোর্ট পর্যন্ত লড়ব।

স্তম্ভিত হাবু নাতির মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বললে, অত টাকা পাবি কোথায়?

—সে তুমি ভেবো না। জানাশোনা উকিল আছে। এক পয়সা লাগবে না।

—নাতির এই দুঃসাহসিকতায় দাদুমিঞা চমকিত হল।

হাইকোর্টে সিভিল রুল মোসান করা হল।

চৌধুরীমশাই-এর বাড়িতেও হুলুস্থুল পড়ে গেল। হাইকোর্টে কেস! হবুর এত বড় স্পর্ধা! নাও, এখন ঠেলা সামলাও! কোথায় টাকা—কোথায় অ্যাডভোকেট! কত টাকাই বা ছি!

চৌধুরীমশাই ভয়ে ভয়ে ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন—এখন কলকাতায় ছোটাছুটি করবে কে?

ছেলে বিন্দুমাত্র না ভেবে বললে, কেন! তুমি।

—আমি! আমি এই সত্তর বছর বয়েসে কলকাতায় ছুটব!

—কেন? সত্তর বছর বয়েসে মুখ্যমন্ত্রিত্ব করতে পারে, আর তুমি কলকাতায় যেতে পারবে না? আমাদের প্রেসিডেন্টের বয়েস কত জান?

অকাট্য যুক্তি বটে। বৃদ্ধ চৌধুরী কোনো উত্তর দিতে পারলেন না।

বীর চৌধুরী তখন বাপের কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললে, ঘাবড়িয়ো না। কেস বেশি দিন চলবে না। বুড়ো হবুটাকে সরিয়ে দিতে পারলেই—ব্যাস!

ছেলের কথা শুনে চৌধুরীমশাই শিউরে উঠলেন।

শুনানীর দিন পড়েছে। তার আগে একবার কলকাতায় গিয়ে উকিল-ব্যারিস্টারের সঙ্গে কথা বলা দরকার। কেস বুঝিয়ে দিয়ে আসতে হবে। একটা ঝাড়নে কাগজ পত্র মুড়ে দুর্গানাম স্মরণ করে চৌধুরীমশাই বেরিয়ে পড়লেন। সঙ্গে কেউ গেল না।

ট্রেন এল। সামনেই যে বগী পেলেন চৌধুরীমশাই তাতেই উঠে পড়লেন। বেজায় ভিড়। আজকালকার ছেলেছোকরারা বুড়ো মানুষ দেখেও কেউ জায়গা ছেড়ে দেয় না। তিনি বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চললেন। তিন চারটে ষ্টেশন যাবার পর ওঁর পা কাঁপতে লাগল। তিনি আর দাঁড়াতে পারলেন না, ঝাড়ন-জড়ানো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মাটিতে রেখে তারই ওপর বসে পড়লেন।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই চমকে উঠলেন—এ কী বাবু! তুমি কোথায়?

বাবুও মাটিতে ঘাড় নিচু করে বসেছিল। পিঠটা ধনুকের মতো বাঁকা। লাঠিটা ছিল পাশে। চৌধুরী মশাইকে দেখে তাড়াতাড়ি হাত জোর করে বললে, এ কী! কত্তামশাই আপনি!

বলে কোনরকমে লাঠিতে ভর দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়াল। তারপর প্রত্যেক প্যাসেঞ্জারকে হাত জোর করে একটু জায়গার জন্যে বললে।

—আমার জন্যে বলছি না মোশাই, আমার এই কত্তা-বাবুটির জন্যে বলছি। স্থান একটু জায়গা স্থান দয়া করে

কিন্তু কুলের কথায় কর্ণপাত করার ধৈর্য কারো নেই।

অগত্যা বাবু নিজের গায়ের ছেঁড়া চাদরটা মাটিতে পেতে দিয়ে হাত জোর করে বললে, আপনি দয়া করে এটার ওপর ভালো করে বসুন।

চৌধুরীমশাই অনুরোধ এড়াতে পারলেন না।

—যাওয়া হচ্ছে কোথায়? কলকাতায় নাকি?

—আর লজ্জা দেবেন না কত্তামশাই। ঐ দায়াবদ্যা নাতিটার মামায়—

কথা শেষ হল না। খক্ খক্ করে কাশতে লাগল। তারপর অতি কষ্টে দম নিয়ে বললে, শরীরের তো এই হাল। পথেই না মরে যাই।

যা বলেছ। আমারও সেই অবস্থা। লো-প্রেসার। মাথাতো সব সময়ই টলছে। তবু আমাকেই কলকাতা ছুটতে হবে। তার ওপর এই ভিড়! কলকাতার তো শুনেছি ট্রামে বাসে ঝুলতে ঝুলতে লোক যায়। ট্যাক্সির জন্যে নাকি এক ঘণ্টা লাইন দিতে হয়। এসব কি আমার পোষায়? পথঘাটও তো ভুলে গেছি।

—কেন, আপনার ছেলে?

—সে বাবু আসবে এই কষ্ট করতে! তাহলেই হয়েছে। সে তো আমার মুখ্যমন্ত্রী দেখিয়ে দিলে। বাপের দুঃখু বুঝবে এমন ছেলে আমার কপালে জোটে নি বাবু।

বাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, ঠিক যা বলেছেন। আমার ছেলেটা অবশ্য ভালো ছিলো। কিন্তু টিকল না। আল্লা টেনে নিলেন। ওলাওঠায়ে মরল। এখন ঐ নাতি। পাজির পা ঝাড়া! কিন্তু কী করব কত্তা, সবে ধন নীলমণি। ঐ আমার শেষ অবলম্বন। বড্ড দুর্বল হয়ে পড়ি। কোনো কথা ঠেলতে পারি না। নইলে এত বড়ো অধর্মের কাজ আমি করতে পারি? বলতে বলতে বাবু ছেলে মানুষের মতো কেঁদে ফেলল।

ট্রেন হাওড়া ষ্টেশনে এসে ঢুকল। অফিস টাইম। ডেলিপ্যাসেঞ্জার বাবুরা হুড়মুড় করে নামতে লাগল। তাদের ধাক্কায় ভয়ে চৌধুরী মশাই কোন রকমে উঠে দাঁড়িয়ে বাবুকে ফেলে রেখেই তাড়াতাড়ি প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়লেন।

এমনি সময়ে গাড়ির মধ্যে থেকে পরিচিত অতি কর্কশ দুটো একটা কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেন—বাবুমশাই, আপনার কাগজ—

চমকে উঠলেন চৌধুরী মশাই।—আরে সর্বনাশ! মাড়ন জড়ানো মামলার কাগজ পত্রগুলোই ফেলে যাচ্ছিলেন।

দুই বুড়োতে পাশাপাশি ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগল।

—সাবধান বাবু। কলার খোসা—

চমকে উঠে বাবু, চৌধুরী মশায়ের হাতটা চেপে ধরল।

—আর কতটা হাঁটতে হবে বাবু?

চৌধুরী মশাই ঘোলাটে চোখ মেলে তাকালো। বাবু ঝিঙা এত কষ্টের মধ্যেও হাসলেন। বললেন, এখনি?

দুজনে অতি কষ্টে ভিড় ঠেলে হাওড়া ষ্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ালো।

—এবার?

—বলো কোনদিকে যাবে?

জন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে নিরুপায় বাবু ঝিঙা বললে, কিছুই তো ঠাওর করতে পারছি না।

একটু থেমে ঢোক গিলে বললো, আপনি?

চৌধুরী মশাই পুরু লেন্সের চশমাটা নাকের ওপর ঠেলে দিয়ে চারিদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললেন, আমিও কিছু বুঝতে পারছি না। সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে।

—তাহলে?

চৌধুরী মশাই বললেন, যাক গে যাক। বড্ড ভেটা পেয়েছে। চলো আগে দুটো ভাব তো খাই।

বলে নিজেই বাবুর হাত ধরে টান দিলেন।

—আমার হাতটা ছাড়বেন না কত্তা। তাহলে আমি পড়ে মরে যাব।

চৌধুরী মশাই এবার কোনো উত্তর দিলেন না। বাবুর হাতটা শুধু শক্ত করে ধরে সাবধানে চলতে লাগলেন।—

মহামানব চলে গেলেন

যোগিসত্ত মৈত্রেয়

মুখের দিকে তাকিয়ে আমার আর পা সরল না। ঐ প্রশস্ত কপাল, কতোদিনের ধূলা আর কাদা যে ওখানে শুকিয়ে আছে তা কে জানে। ঐ কপাল থেকে নেমে আসা লম্বা বাঁকানো-কাটা নাক, তার দু'পাশে জোড়াভুরুর মাঝের আর্চ মসৃণ ভ্রমে বিবর্ণ। গর্তে ঢুকে যাওয়া দু চোখ বোজা। মুখে ঘাড়ি গোঁফের জংগল মাখায় এক ঝাঁকা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চুল। চুল-দাড়ি সব জট বেঁধে, কাদারসঙ্গে মিশে শুকিয়ে উঠেছে। প্রকাণ্ড মুখ খানা, এখন শুকিয়ে প্রায় মমির মুখের মতো দেখাচ্ছে। দেহটাও বিরাট, কিন্তু কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে আছে। যেন ক্রুশ বিদ্ধ যিশুর বিজয়ী দেহটাকে কেউ এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল, কোন এক সুযোগে তাকে ফুটপাথের এই জায়গাটায় শুইয়ে রেখে গেছে।

চোখে মুখে লেগেছে মৃত্যুর প্রশান্তি। মনে হয় অসম্ভব আত্মস্থ। হোক কাদা-ধূলা মাখা বিবর্ণ তবু আমার চোখে এই সময়ে এই মুখ খানা বড় মহিমান্বিত, বড় সুন্দর লাগল। আমি এখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। রাস্তার ধারে রেলিং-এ হেলান দিয়ে দেখতে লাগলাম সেইমুখ খানাকে পলকহীন দৃষ্টিতে।

আকাশ মেঘে ছাওয়া। ঝিরঝির করে ইলশে গুঁড়ি বৃষ্টি ঝরছিল। মনে হল এ পুণ্য বৃষ্টি, মহামানবের যাবার পথে ফুল ছড়াচ্ছে। এখন হয়তো আকাশের একটা কোন কেটে যাবে, সেখান দিয়ে নেমে আসবে ইন্দ্রের রামধনু-রাঙা পুষ্পক রথ। বিদায়ী সূর্য্যের রক্ত রাগে রাঙিয়ে দেবে মহামানবের যাত্রা পথের সমস্তটা।

মহামানবকে কোন সুখ-শয্যা বলে মানতে পারেনি। ধরিত্রী ছাড়া ওঁকে এখন অঙ্কে ধারণ করবে কে? সমস্ত পৃথিবীর অর্দ্ধ-মূর্খ-লোকেরা যে কলঙ্কের কাদা ওঁর অঙ্গে ছুড়েছে তাই মেখেই তো উনি শুয়ে আছেন।

না: বুকের বুক বুকুনিটা এখনও থামেনি। এক কালে বুকের খাঁচাটা ওঠানামা করছে। কাকের দল এখনও ঘুরে ঘুরে ডাকাডাকি করছে। কুকুরগুলোও ওঁর কাছে ঘেঁসছে না। পিঁপড়ের সার এখনও শরীরের ওপর অভিযান সুরু করেনি।

পাশের মেডিকেল কলেজথেকে দুটো ডোম চারদিকে তাকাতে তাকাতে ওঁর চারপাশে বার দুই ঘুরল। একবার একজন চট করে নাকের নীচে হাত দিয়ে দেখে নিল। ওরা জানে এটা কে-ওয়ারিশ লাশ। একবার বুকের বুক-বুকুনিটা থেমে গেলেই হয়। রাতের আঁধারে তুলে এনে মাখবে ওদের ডেরায়। মুশলী হাতে জোড়নের ওপর থেকে খণ্ড খণ্ড করে সারা দেহটা বিচ্ছিন্ন করে ফেলবে ধারাল অস্ত্রে। ফুটন্ত জলে রাসায়নিক মিশিয়ে সিদ্ধ করে একটা একটা করে মাংস, স্নায়ু, শিরাগুলো আলাদা করে ছিঁড়ে ফেলবে। বার হবে শ্মশানে ঝকঝকে সাদাকংকাল। মহামানবের কংকালের ওপর চলবে শব সাধনা।

কি অসম্ভব ধ্যানমগ্ন! চওড়া ফুটপাথের ওপর দিয়ে চলেছে শ'য়ে শ'য়ে লোক। পাশে সেন্ট্রাল এ্যাভেন্যুর চওড়া রাস্তাতে অজস্র গাড়ী ঘোড়ার স্রোত। তাদের হর্নের আওয়াজ, গর্জন, বিপুল কোলাহল। এসব উপেক্ষা করে উনি গভীর ধ্যানে মগ্ন।

কিন্তু এ ধ্যান না ভাঙা?

হাবুকে একবার এ সময়ে কাছে পেলে হত। ডাক্তার মানুষ, বুঝতে পারত আসল অবস্থাটা।

মেডিকেল কলেজে আউট ডোরে প্রচণ্ড ভীড় ঠেলে একটু এদিক ওদিক করতেই হাবুর দেখা মিলল।

—তুই এখানে?

একটু বাইরে আয়। ভীষণ দরকার।

কারুর অসুখ নাকি? তা অমন হাঁপাচ্ছিস কেন?

একটা কেস দেখতে হবে। একটু বাইরে যাব।

এক্ষুণি তো আসতে পারব না। হাতের রুগীগুলো শেষ করে আসছি, ঘণ্টা খানেক লাগবে। তুই বাইরের বেঞ্চে বস।

হাবুকে বসবার জন্য বেঞ্চে দিয়ে বললাম। এই এক ঘণ্টা সময় আমার কাছে মনে হতে লাগল যুগ যুগান্তর। আমি দেখছিলাম সেই যুগ যুগান্তরের পথ বেয়ে আসছিলেন মহামানব। আসছিলেন দুঃখ জৈন্য ক্লিষ্ট, শীর্ণ শরীর। দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ, দীর্ঘপথ অতিক্রম করে আসায় দু'পা ক্ষত বিক্ষত। বেদনায় আপ্লুত সারা শরীর। কিন্তু মুখের চুল দাড়ি গোঁফের জংগলের ভিতর দীর্ঘায়ত দুটি চোখে করুণার ধারা বহুনা। মানবের প্রতি করুণা। মূর্খ, অন্ধ, আত্মঘাতী মানুষ, হতাশায় বিধ্বস্ত মানুষের প্রতি করুণা।

মহামানব বলতেন, মানুষ অন্ধ বলেই তো অন্যায় করে। চোখ থাকলে কি কেউ এই রকম একটা সহজ, সরল সত্যকে না দেখে পারে?

আমি জিজ্ঞেস করতাম, সত্যটা কি?

তুমি যার বীজ পুতবে গাছ হবে সেই জাতের। ল্যাংড়া হিমসাগরের চারা বসাও, ফল হবে ঠিক সেই রকম। আবার ডেঁতুলের বীচি পোত, ফলবে ডেঁতুল।

একটু চুপকরে থেকে উনি আবার বলতেন, কিন্তু যারা অন্ধ এই সত্যটাকে দেখতে পায় না। তারা পোতে ডেঁতুলের বীচি আর অহরহ আশা করে হিমসাগর ল্যাংড়া আম। তা কি হয় হর্ষবাবু?

তাতো হয় না। কিন্তু ব্যাপারটার সবটা তো বুঝতে পারলাম না।

উনি শান্ত দুটী চোখ আমার মুখের ওপর রেখে বলতেন, কেন অনুবিধেটা কোথায়? অধ্যাপনা করছেন, এত ছেলে মেয়ে ঘাঁটা ঘাঁটি করছেন, বোঝেননা কোনটা খাঁটী, কোনটা সরেশ আর নিরেশ? সেখানেই দেখবেন ভাল সরেশ, সেখানেই জানবেন সেটা বাপ পিতামহ শুধু নয় চোদ্দ পুরুষের পুণ্যের ফল। আসলে আপনারা বায়োলজিষ্টরা যাকে জিনিক প্যাটার্ণ বলেন, তাই-ই হল চরিত্র গঠনের ভিত। বিশেষ করে বাপ-মায়ের জিনিক প্যাটার্ণ, আর ছেলে মেয়েদের তৈরী করার পদ্ধতি উত্তর পুরুষের চরিত্র তৈরী করার সবচেয়ে বড় উপকরণ।

আমি অবাক হতাম ওঁর কথা শুনে। এই অজ গ্রামাঞ্চলে একটা ছোট আবাসিক কলেজের একজন সাধারণ অধ্যাপকের মুখ থেকে 'জিনিক প্যাটার্ণ' এই শব্দটাই আমার কানে অদ্ভুত। আরও অবাক লাগত এই ভেবে যে উনি ফিজিক্স এর অধ্যাপক, যার সঙ্গে বায়োলজির আপাত সম্পর্ক কিছুই নেই। উনি এ সব ব্যাপার জানলেন কেমন করে?

তবু আমি বিজ্ঞ হবার ভান করে একটু তর্ক তুলতাম। তা হলে সমাজে যারা নামী লোক, তাদের ছেলেরা নিয়ম করে নামী হয় না কেন? বিদ্যাসাগর মশায়ের— আমি বুঝতে পেরেছি আপনার বক্তব্য। কিন্তু তার উত্তর তো আপনিই আমাকে ভাল ভাবে দিতে পারেন। আপনি তো ফুলজিতে এম্, এস্ সি পাশ করেছেন, পড়েছেন জেনেটিক্স্। ইভল্যুশনের তত্ত্বগুলোও তো আপনার আজানা থাকার কথা নয়।

টাটকা এম্, এস্, সি পাশ করেছি নিঃসন্দেহে, এবং অধ্যাপনাও করছি। কিন্তু ইভল্যুশনের তত্ত্বগুলোর সঙ্গে এই মানুষ জাতের বা মানব সমাজের আসল যোগ যে কোথায়, তা নিয়ে কে কবে মাথা ঘামিয়েছে? জেনেটিক্স্ বলতে আমরা বুঝেছি কেবল ওনকির জন্মগতি ও বংশ-গতি। তার মধ্যে মানুষের বংশগতির সমস্যা সমাধানের সূত্র কোথায় লুকিয়ে আছে, তার খবর কে রেখেছে? আসলে আমরা যা কিছু পড়েছি তা পরীক্ষা পাশ করবার জন্য। গলাধকরণ করেছি সাপ—ব্যাঙ, গিনিপিগ কি সাপেদের শারীর তত্ত্ব বিশদ ভাবে, পরীক্ষার খাতায় সেগুলো হুবহু উগরে দেবার জন্য। প্রাণীতত্ত্ব পড়ার যে আসল উদ্দেশ্য তা থেকে আমরা গোড়া থেকেই বিচ্যুত হয়ে বসে আছি। আমরা চেয়েছি ভাল ফল ও একটা ভাল চাকরী। সামাজিক সমস্যাগুলির ওপর বংশগতি তত্ত্বের যে কি প্রভাব, তা ভাববার এতটুকু অবকাশ বা ইচ্ছা আমাদের হয়নি। আর সত্যি কথা বলতে কি

আমাদের শিক্ষকরা আমাদের সে সব কথা ভাবতে কোন দিনও উৎসুক হননি।

সেই ফিজিক্সের অধ্যাপক তখন হয়ে যেতেন বায়োলজির অধ্যাপক। হাতের মতো আমাকে বুঝিয়ে বলতেন, জীবের শারীরিক ও মানসিক গঠনের ব্যাপারটা নির্ভর করে দুটো কারণের ওপর। একটা হল জীবকোষের মধ্যেকার জিনিষ জিন, আর অপরটা হল এনভিরোনমেন্ট বা পারিপার্শ্বিকতা। জিন হল বনেদের ইট পারিপার্শ্বিকতা হল চুন-সুরকী। মানুষের বাচ্চাকে ঠিক ঠিক তৈরী করতে হলে ঐ দুটোরই দরকার। আপনি খুব ভাল জাতের গোলাপ পুঁতলেন, যার জিনিক প্যাটার্নটা উচ্চাঙ্গের কিন্তু জমিতে দিলেন না সার। রোদ-বাতাস ঠিকমতো লাগতে দিলেন না গাছে, ডাকলেন না পোকা-মাকড়, ফুল কি ভাল হবে? আবার জিনিক প্যাটার্নটা যদি খারাপ হয় তাহলে সে গাছের ভাল ফুলতো আশাই করা যায় না। মানুষের ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনি। এ দুটো কারকের কোনটা উন হবার যো নেই। ভাল জাতের ফুল যদি খারাপ হয়, দোষ তবে গাছের নয়, মালী যারা চাষ করছে তাদের। তাদের আলস্য ও অজ্ঞতার। তারকবাবু যা করতে যাচ্ছেন, তা হল প্রচণ্ড অন্যায় দোষ ছাত্রদের নয়, দোষ আমাদের, শিক্ষক-বাপ-মা-গভর্ণিং বডি মেম্বারদের। উর্দ্ধতন পুরুষের।

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়। প্রিন্সিপ্যাল তারক সেনের সঙ্গে ছাত্রদের একটা টাগ-অব্-ওয়ার চলছে গত ক'দিন ধরে। মনে পড়ল সে কথা।

বললাম, কিন্তু স্যর, তারকবাবুই বা কি করবেন? ছেলেরা বড্ড বাড় বেড়েছে। হুমকি দিয়েছে অধ্যাপক চৌধুরীকে যদি তাড়ান না হয়, আসছে সোমবার থেকে স্ট্রাইক করবে। আপনি কি ছেলেদের এই দাবীটাকে অসঙ্গত বলে মনে করেন না?

উনি একটু বেদনার্ত হাসি হাসলেন। চোখ বুজিয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। হঠাৎ এক সময়ে চোখ মেলে চেয়ে বললেন আদবে নয়। চৌধুরীর অধ্যাপক হবার মতো কোন গুণই নেই।

দেখলাম চোখের সেই আগের ক্লান্ত ভাবটা একেবারেই নেই। সে জায়গায় একটা অদ্ভুত কাঠিন্য ফুটে উঠেছে। উনি গম্ভীর গলায় বলে চলেছেন, পড়াবার এতোটুকু যোগ্যতা নেই। ব্যক্তিগত চরিত্র যা তা এ অঞ্চলের ছোট বড় কারুর অবিদিত নয়। তার ওপর ছেলেদের সঙ্গে ব্যবহার যৎপরোনাস্তি খারাপ। ছেলেরা তাকে সহ্য করবে কেন?

কিন্তু গভর্ণিং বডি যখন দেখে শুনে একবার এ্যাপয়েন্ট করেছেন, তখন ছেলেদের বলবার কি থাকতে পারে?

ঈষৎ অসহিষ্ণু গলায় জবাব এল, গভর্ণিং বডি অন্যায় করলে তার কেউ প্রতিবাদ করবে না, এ কথা আপনাকে কে বলল? পূর্ব পুরুষের পাপ থেকে মোচন করবে বলেই তো উত্তর পুরুষের অভিধা হল পুত্র। অনেক যুগ ধরে রামচন্দ্রের দোহাই পেড়ে পুত্রদের মুখ চাপা দেওয়া হয়েছিল। ও দোহাই এখন পুরোন হয়ে পচে যাচ্ছে। এখন পিতৃ পুরুষের উত্তম পিণ্ড দানের ব্যবস্থা করবে নতুন যারা আসছে।

কিছুক্ষণ আমরা উভয়েই নির্বাক। একটু পরেই ঝাঁঝালো গলায় উনি বললেন, জানেন কি ঐ চৌধুরী হল প্রেসিডেন্টের বখাটে ছেলেটার অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওকে নেওয়া হয়েছিল একজন ট্রিলিয়াণ্ট ছাত্রের দাবী অগ্রাহ্য করে। চৌধুরীর গায়ে হাত দেবার ক্ষমতা তারক সেনের নেই।

—আপনি একটু প্রিন্সিপ্যালকে বুঝিয়ে বলুন না, যাতে চৌধুরীকে সাবধান করে দেন।

—তাঁকে আমি কি বোঝাব। তিনিই তো আজ এসেছিলেন আমাকে বোঝাতে যে ছাত্ররা অন্যায় করছে। আমি যেন ছাত্রদের ঠাণ্ডা করবার চেষ্টা করি। কিন্তু যখন চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি অন্যায়টা জমা নিচ্ছে ওপর তলায়, সেখানে ছেলের ওপর সেটা চাপিয়ে দিলে আমি তা মেনে নেব কি করে?

সঙ্গে সঙ্গে আরও একটা ছবি চোখের সামনে ফুটে উঠল।

কলেজের কম্পাউণ্ডের ভিতর গেটের মুখে দলে

বলে ছাত্ররা জমা হয়েছে। তাদের প্রচণ্ড উত্তেজনা অগ্নি গর্ভ আগ্নেয়গিরির মতো ফুলে ফুলে উঠছে। দমকে দমকে সমবেত কণ্ঠে হুঙ্কার উঠছে, অধ্যাপক চৌধুরীর পদত্যাগ চাই। একটি ছাত্রও ক্লাসে নেই আমরা অধ্যাপকরা উৎকণ্ঠায় অধীর হয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি দোতলার বারান্দায়। প্রিন্সিপ্যালকে কলেজে পাওয়া যাচ্ছে না। একজন বেয়ারা বলল, তিনি নাকি দূর থেকে কলেজ গেটে ভীড় দেখে কেটে পড়েছেন।

একজন ছাত্র একটা টুলের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা সুরু করল। ছেলেটার চেহারাটা আচমকা করলার মতো গন্‌গনে। গলায় বাজের আওয়াজ। এ অন্যায় আমরা সহ্য করব না। যে শিক্ষক পড়াতে পারেন না, যে শিক্ষক ছাত্রদের সম্মান রেখে কথা বলেন না, তাঁকে আমরা চাই না। তাঁকে এখুনি পদত্যাগ করতে হবে। আমরা ভাল কথায় বলছি, তিনি সসম্মানে সরে যান। নৈলে—

হুড়মুড় করে একদল লাল পাগড়ী পুলিশ হাতে ব্যাটন নিয়ে কলেজে ঢুকে পড়ল। শুরু হয়ে গেল দক্ষ-যজ্ঞ। পুলিশের হাতের ব্যাটনগুলো দমাদম পড়তে লাগল ছেলেদের মাথায়, পিঠে, যেখানে সেখানে এলো পাথাড়ি। তাদের মধ্যে দু'জন ব্যাটন উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল টুলের ওপর দাঁড়ানো ছেলেটির উপর। চকিতের মতো দেখলাম, দু'ফুট দীর্ঘ একখানা চেহারা, মুখে দাড়ি গোঁফের জংগল, মাথায় ঝাঁকড়া চুল। লম্বা দু'হাত বাড়িয়ে তিনি ধরে ফেলেছেন পুলিশের ব্যাটন দুটো। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটা অন্ধ নিষ্ঠুর ব্যাটনের ঘা পড়ল তখুনি তাঁর উঁচু মাথাটাতে। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। এবার ছেলেরা হৈ হৈ করে ঝাঁপিয়ে পড়ল পুলিশের ওপর। তাদের প্রচণ্ড চাপে পুলিশের দল হটে দাঁড়াল। ছেলেরা তাদের হাতের ব্যাটন ছিনিয়ে নিল। জনাকয়েক ছেলে ধরাধরি করে সেই দু'ফুট চেহারাটা নিয়ে এসে শুইয়ে দিল ফিজিক্স্ লেবরেটারীর বারান্দায়। আমরা অধ্যাপকরা ছুটে গেলাম নীচে। এগিয়ে এল একজন ব্রিটীশ অফিসার, জেলা পুলিশের লোক। সেই আহত রক্তাক্ত দু'ফুট চেহারার কাছে গিয়ে কুঞ্চ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, হু ইজ্ হি।

এ প্রোফেসর। আমাদের মধ্যে একজন জবাব দিলেন।

হি এ্যাপিয়ারস্ টু বি এ রেডস্যুপানোরি।

উনি তখন মাথার রক্ত মুছে, উঠে বসেছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, আমি বিস্মিত হচ্ছি পুলিশ এ কলেজে কেন এল।

তোমাদের প্রিন্সিপ্যাল নিজে গিয়েই তো থানায় বলে এসেছে এখানে পলিটিক্যালি মোটিভেটেড ছাত্ররা কম্যু-ন্যাল রায়ট বাঁধাবার চেষ্টা করছে। এণ্ড হি ফিলস্ ইট্ সিকিয়োরড্ কম্যুনাল রায়টের ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ দিয়েছে সিরিয়স এ্যাকশান নেবার। প্রিন্সিপ্যাল কোথায়?

উনি বললেন আমার এখানে হিন্দু মুসলমান দুটোন সব ছাত্রই আছে। তারা কম্যুনিলিজমকে ঘৃণা করে। আপাততঃ যে ব্যাপারটা হচ্ছিল তা হল আমাদের একান্ত ঘরের ব্যাপার শিক্ষক ছাত্রদের মধ্যে ভুল বোঝা বুঝি। আপনি এখন আপনার দলবল নিয়ে বিদায় হোন।

—ব্যাট হোয়্যার ইজ্ ছ প্রিন্সিপ্যাল?

চারদিকে তাকিয়ে প্রিন্সিপ্যালকে দেখতে না পেয়ে অফিসার পুলিশের দল নিয়ে বিদায় হল।

ওঁকে মহামানব নামটা নিতান্ত পরিহাস ছলেই দিয়েছিলেম অধ্যাপক চৌধুরী। টিচার্স রুমে অধ্যাপকদের জমাটি আড্ডা বসত। সেখানে উনি আসতেন কদাচিৎ। সেখানে চৌধুরী একের পর এক সিগারেট টেনে যেতেন, আর পায়ের উপর পা দিয়ে বসে ওঁর ফুটি কাটতেন। চেহারাখানা দেখেছেন, যেন যীশুখৃষ্ট। একটা আলখাল্লা পরিয়ে দিলেই হয়। মদ-তাড়ির কথা ছেড়েই দিই একটা বিড়ি-সিগারেট এমনকি একটিপ নস্যি পর্যন্ত নয়। মহামানব, মহামানব! নিঃসন্দেহে মহামানব। মেয়েছেলের মুখের দিকে চান না। স্ত্রী সঙ্গ একেবারে বর্জিত।

তারপরেই চোখ মটকে, সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে

ছাড়তে বলতেন, কিন্তু দাদা বৌটা গলায় ঘড়ি দিয়েছিল কোন দুঃখে?

বলেই হাঃ হাঃ করে কুৎসিত হাসি হাসতেন জনা কয়েক অধ্যাপক চৌধুরীর সঙ্গে সেই হাসিতে গলা মিলিয়ে দিতেন। কিন্তু বেশীর ভাগ অধ্যাপকই ওঁর সম্বন্ধে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। সংস্কৃতের অধ্যাপক রসিকলাল শাস্ত্রী মশাই বলতেন, চৌধুরী, সংস্কৃতে একটা কথা আছে। আত্মবৎ মন্যতে জগৎ। নিজে যেরকম, দুনিয়াকে সেই রকম দেখে। ওঁর পায়ের নখের যুগ্যি তুমি নও। ওঁর মতো সত্য-সন্ধানী আজকের যুগে বিরল।

চৌধুরী রুখে উঠে উঠে বলতেন, যান যান! ও রকম ভণ্ড অনেক দেখা আছে। সত্য সন্ধানী না ঘুষোর সন্ধানী! যদি সত্যসন্ধানীই হবেন তবে মহাত্মা গান্ধীর সমালোচনা করেন কেন? খদ্দর পরাকে ভণ্ডামী বলেন কেন?

রাসকলাল শাস্ত্রী তখনকার মতো চুপ করে যেতেন। কারণ, কথাটার মধ্যে যাথার্থ ছিল। উনি গান্ধীর সমালোচনা করতেন প্রসঙ্গ উঠলেই। বলতেন নিরামিষাশী গোঁড়া, টিকিধারী বৈষ্ণব হয়ে, মুখে রঘুপতি রাঘব গান করে, হিন্দু মুস্লিম একতা যায় না। তেমনি বর্ণাশ্রম ধর্মের গোঁড়ামীর ওপর দাঁড়িয়ে রাজনীতি করলে ধর্ম ও রাজনীতি কোনটাই ঠিকমতো করা যায় না।

কোন স্বদেশ প্রেমিক ছাত্র হয়তো বলে উঠত, মহাত্মাজীই তো ভারত স্বাধীনতার জন্য সবচে ত্যাগ করেছেন। দেশে যদি স্বাধীনতা আসে তো ওঁর জন্যেই আসবে, তার।

তার তখন বলতেন, স্বাধীনতা অত সহজে আসার জিনিষ নয়। বৃটীশ চলে গেলেই যে দেশে স্বাধীনতা আসবে এ কথা যদি মনে করে থাক তো ভুল করবে। স্বাধীনতা কেউ কাউকে দিতে পারে না। তাকে অর্জন করতে হয়। আত্মার মার্জনা না হলে স্বাধীন হওয়া যায় নয়। তোমরা স্বাধীনতা স্বাধীনতা করে লাফাচ্ছ, আর ওদিকে হলে বৃটিশ প্রতিনিয়াল অটোনমি দিয়েছে। দেশী লোকেরা এখন প্রদেশের শাসনক্ষমতা খানিকটা পেয়েছে। কিন্তু তাতে মান্ধাতার আমলে পুরোন পচা শিক্ষা ব্যবস্থার একটুকু পরিবর্তন হয়েছে কি? পরিবর্তন হওয়া তো দূরের কথা, কেউ চিন্তা করেছে কি যে এই শিক্ষা ব্যবস্থা আমূল বদলান দরকার। যে শিক্ষায় মানুষ চিন্তা আসে যে শিক্ষায় একটা ছেলে মানুষ পশু-যন্ত্র হয়ে আত্মনির্ভর হয়ে উঠতে পারে, তার প্রস্তুতি কোথায়?

আর একজন ছাত্র হয়তো ঈষৎ প্রতিবাদ জানাত। তার, স্বাধীন না হলে কি এসব ব্যবস্থা করা যায়?

উনি ঈষৎ হেসে জবাব দিতেন, চার দিকে যে সব নমুনা দেখছি, নেতাদের যে রকম ক্ষমতার লোভে নিজেদের মধ্যে মারামারি দেখছি, দেশ স্বাধীন হলে, বৃটিশ চলে গেলে, এরা দেশটাকে দু'দিনে শকুনের মতো ছিঁড়ে-খুঁড়ে খেয়ে শেষ করে ফেলবে। দেশ শাসন করার মতো দক্ষতা ও নিরপেক্ষ বিচারবোধ এদেশের ছোট বড় কারুই এখনও গজায়নি। তাই বলি, তোমরা দেশপ্রেমিক না হয়ে, রাজনীতিতে মাতামাতি না করে ন্যাশন্যাল হতে শেখ। সুযুক্তি আর কুযুক্তির তফাৎটা বুঝতে শেখ।

আমরা অধ্যাপকের দল তখন স্বাধীনতার রঙীন স্বপ্নে বিভোর। ওঁর ওই কথাগুলো আমরা আদবেই ভাল ভাবে নিতে পারতাম না। চুপ করে থাকতাম। তাই চৌধুরীর চ্যালেঞ্জের প্রতিবাদও আমরা করতে পারতাম না।

রসিকলাল শাস্ত্রী তবু প্রতিবাদ জানাতেন। বলতেন, তুমি ওঁর সম্বন্ধে কতটুকু জান? এই যে তুমি ওঁর স্ত্রীর মৃত্যু নিয়ে রসিকতা করলে, একমাত্র আমি ছাড়া এ ঘটনার সত্যিকারের ইতিহাস এখানে কেউ জানে না। আমার গায়ে যদি যথেষ্ট শক্তি থাকত, তোমার জিভটা টেনে ছিঁড়ে ফেলে আমি এর জবাব দিতাম। অতঃপর আমাদের দিকে ফিরে রসিকলাল শাস্ত্রী সেই ঘটনার উল্লেখ করতেন।

শ্রীহট্টের পল্লী পরিবেশে একটা আধুনিক ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন মহামানব শাস্ত্রী মশাই তখন সেখানকার সংস্কৃতের অধ্যাপক। কলেজে অধ্যক্ষই

সংসর্গ। উনি নিয়ম করেছিলেন ছাত্র ও শিক্ষক থাকবে কাছাকাছি। বলতেন ছাত্র ও শিক্ষক পরস্পরের অনুপূরক ও পরিপূরক। ছাত্ররা তো শুধু এখানে চাকরী পাবার জন্য ডিগ্রী নিতে আসবে না, আসবে মানব ধর্ম শিখতে আর শিক্ষকরা? তাদের চরিত্রের ত্রুটিটুকু শুধরে নেবেন ছাত্রদের কাছ থেকে। তাই শিক্ষকরা তাঁদের পরিবার বর্গ নিয়ে বাস করতেন ছাত্রদের সঙ্গে একই হোষ্টেলে। অধ্যক্ষও এই নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলেন না।

বাঁশ আর খড়ের চালা দেওয়া ব বড় মাটির হল ঘর। তারই মধ্যে কয়ক ঘ পার্টিশান দেওয়া শিক্ষকদের পরিবারবর্গ নিয়ে থাকবার আস্তানা। আর লাগোয়া হল ঘরে সারি সারি কাঠের চৌকী পাতা ছাত্রদের শোবার ও বসে পড়বার জায়গা। মাথার কাছে একটা করে টেবিল, তাতে লাগান থাকে বই পত্র। একটা প্রকাণ্ড হলে শ' দুই খাবার জায়গা। শিক্ষকরা তাঁদের পরিবারের সবাই ও ছাত্ররা একসঙ্গে খেতে বসে কয়েকটা ব্যাচে। 'কমন কিচেন' থেকে রান্না হয়ে আসে। সবাই খায় এক খাবার, ব্যতিক্রম হবার যো-নেই। নিয়মের কোন ফের ফেব নেই।

ওঁর দেশের বাড়ীতে ছিল প্রকাণ্ড আমের বাগান। সেখান থেকে প্রতি বছর নৌকা বোঝাই করে আম আসত। উনি সবটা দিতেন 'কমন কিচেনে'। ছাত্র শিক্ষক সবাই খেয়ে প্রচুর আনন্দ পেত। ওঁর দেশের জমিতে যে সব চাল-ডাল উঠত, সেটাও উনি এনে দিতেন কলেজের কিচেনে।

ওঁর স্ত্রী কিন্তু এ ব্যাপারটা পছন্দ করতেন না। এই নিয়ে প্রায়ই অশান্তি করতেন। মাঝে মাঝে চলে যেতেন বাপের বাড়ী। দীর্ঘ-দিন কাটিয়ে আসতেন। একমাত্র ছেলে থাকত কাছে।

একবার আমের ফলন ভাল হয়। এল মাত্র কয়েকটা ঝুড়ি ওঁর স্ত্রী ওঁর অলক্ষে সেই ঝুড়ি নিয়ে তুললেন নিজের ঘরে। তার থেকে কয়েকটা ঝুড়ি পাঠালেন কিচেনে। রাতে খাবার সময় দেখা গেল সেদিন ব্যাচের প্রায় জনা পঞ্চাশ শিক্ষক ও ছাত্রের পাতে আম পড়ল না।

সেই রাতে ঘরে ইঁদুর মারতে গিয়ে অধ্যক্ষ দেখলেন চৌকীর তলায় লুকোন রয়েছে দুটো বড় বড় আমের ঝুড়ি। গম্ভীর গলায় স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমের ঝুড়ি এখানে এল কি করে?

স্ত্রী জবাব দিলেন, প্রত্যেক বছরেই তো গাছের আম সবটাই যায় হোষ্টেলে। এবার আম কম, তাই কিছু রেখেছি ঘরের জন্য।

উনি ক্রোধে ঘৃণায় আত্মসংযম হারালেন। বললেন এই সমস্ত হোষ্টেলটাকে এখনও তোমার নিজের ঘর বলে ভাবতে শিখলে না? ছেলেদের নিজের ছেলে, শিক্ষকও তাদের পরিবারদের নিজের ভাই বোনের মতো দেখতে শিখলে না? এতো নীচ মন তোমার শেষের দিকে ছেলে গুলো আম খেতে না পেয়ে কিরকম মুখ কাচু মাচু করে উঠে গেল তা কি তোমার নজরে পড়ল না? তোমার মতো স্ত্রীলোকের বাঁচার চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। আমি কালই আমার সমস্ত সম্পত্তি কলেজের নামে দান-পত্র করে দিয়ে আসব। এ কথার অন্যথা হতে পারে এক সর্তে, যদি তুমি কাল সকালে ঐ আমের ঝুড়ি দুটো নিয়ে সমস্ত ছাত্র আর শিক্ষকদের সামনে নিজের অপরাধ স্বীকার করে মাপ চাও।

কিন্তু মাপ তিনি চাননি। সেই রাতেই হোষ্টেলের প্রেয়ার হলে নিজের পরণের কাপড়ে গলায় ফাঁসী লটকে মরে ছিলেন।

এই ঘটনার পরেই উনি ওঁর সমস্ত সম্পত্তি দানপত্র করে দেন কলেজকে। হাত চেপে ধরে ছিলেন শাস্ত্রী মশাই। বলেছিলেন, ও সম্পত্তি তো আপনার নিজের রোজগার নয়, পূর্বপুরুষ থেকে পাওয়া। সেই পাওয়ার অধিকার থেকে আপনার ছেলেকে বঞ্চিত করছেন কেন?

উনি বলে ছিলেন, শতকরা পনেরো আনা লোকই বিগড়ে যায় এই কালচু সম্পত্তি পেয়ে, তাকে কষ্ট করে রোজগার করতে হয় না আমাদের জাতের সর্বনাশের মূলে সবচেয়ে বড় কারণ কি জানেন শাস্ত্রী মশাই? প্রয়োজনের চেয়ে বেশী অর্থের লালসা আর অনাবার প্রবৃত্তি। তাই জড় আমি মেরে রাখতে চাই। আমার ছেলেকে আমি মানুষের মতো তৈরী করব। নিজের পরেই হবে তার সবচেয়ে বড় নির্ভর। নিজের দায়িত্ব সে নিজেই নিতে পারবে।

শাস্ত্রীমশাই ওঁকে পাল্টা আক্রমণ করেছিলেন, আপনি যে এই সমস্ত সম্পত্তিটা কলেজকে দান করলেন এতো কম টাকার ব্যাপার নয়। তার জন্য আপনার মনে অহংকার আসবে না।

উনি কোন জবাব দেননি। রসিক শাস্ত্রীর কথার প্রতিবাদও করেননি সেদিন! একমাসের মধ্যে সেই কলেজের অধ্যক্ষের পদ ছেড়ে তিনি চলে এসেছিলেন পূর্ববঙ্গের আর এক কোণে। শ্রীহট্ট থেকে বহু দূরে এই কলেজের ফিজিক্সের অধ্যাপক পদ নিয়েছিলেন তিনি। শাস্ত্রী মশাই ছিলেন ওর একান্ত অনুরাগী বন্ধু। তাই উনি চলে আসবার ছ' মাসের মধ্যেই শাস্ত্রী মশাইও আসেন এই কলেজে। সে বহুদিন আগেকার কথা। তখন এখানে অধ্যক্ষ ছিলেন একজন অরসিক মানুষ। তিনি মহামানবের মূল্য বুঝেছিলেন। নামে তিনি অধ্যক্ষ থাকলেও তাঁকেই তিনি ভার দিয়েছিলেন কলেজের সব রকম ডিসিপ্লিন রক্ষার ও হোষ্টেলের ছেলেদের দেখাশোনার। পারতপক্ষে তিনি মহামানবের সমস্ত মতামতকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করে বসেছিলেন যতদিন তিনি বেঁচেছিলেন! তিনিই একবার শাস্ত্রী মশাইকে বলেছিলেন এরকম একটি অদ্ভুত চরিত্রের লোক যে এ যুগে থাকতে পারে, তাও আমাদের মতো অতি সাধারণ মানুষদের মধ্যে অতি সাধারণ মানুষের বেশে, তা ওঁকে না দেখলে বুঝতে পারা যায় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশে বিদ্যাসাগরের মতো মানুষ তো আর জন্মাচ্ছে না, ওঁকে চেনবার লোকই আর পাওয়া যাবে না।

আমিও ওঁকে প্রথম প্রথম চিনতে পারিনি। মানুষটি অতি সাধারণ। বেশে বাসে কোনরকম বৈশিষ্ট্য কোনদিন চোখে পড়ে নি। কথাবার্তা বলতেন অত্যন্ত কম, তাতে তাঁকে বেশ খানিকটা দাম্ভিক মনে করা যেতে পারত। কিন্তু ভুল ভাঙল একদিন।

নতুন বছর সুরু হয়েছে। নতুন ছেলেরা হোষ্টেলে আসছে। হঠাৎ একদিন বিকালে দেখি সেই বিরাট পুরুষ মাথায়-একটি বিরাট ট্রাঙ্ক নিয়ে হোষ্টেলের দিকে চলেছেন, পিছনে একটি অত্যন্ত কম বয়সী ছাত্র বিছানার বাণ্ডিল মাথায়। আমি দৌড়ে গিয়ে বললাম, একি আপনি মোট মাথায় করেছেন কেন? লোকজন নেই? ছেলেরা সব কোথায়? দিন আমাকে দিন।

উনি হোষ্টেলের বারান্দায় অবলীলায় ট্রাঙ্কটা নামিয়ে বললেন, ছেলেরা এখন খেলতে গেছে। লোকজন হয় তো ছিল। কিন্তু তারাও তো কাজে ব্যস্ত। আমার পক্ষে তো এ কিছুই নয়, বাচ্চা ছেলেটা এটা টেনে আনতে পারত না গেট থেকে। কিন্তু এর জন্য আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন হর্ষবাবু? আপনি যান ওকে চোদ্দ নম্বরের ঘরটা দেখিয়ে দিন তো।

দশটার ঘণ্টা পেটা ঘড়িতে বাজার সঙ্গে সঙ্গে উনি কলেজে ঢুকতেন, তা ওঁর ক্লাশ থাক বা না থাক। ঢুকতেন ফিজিক্স লেবরেটরীতে। নানারকম যন্ত্রপাতির মধ্যে ডুবে থাকতেন বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত। কখনও সঙ্গে থাকত দু' একজন ছাত্র, কখনও একা। মধ্যে গিয়ে ক্লাশ নিয়ে আসতেন, কিম্বা প্রাকটিক্যাল ক্লাশে গিয়ে ডিমনস্ট্রেশন দিতেন। মাঝে মাঝে দেখা যেত লাইব্রেরী ঘরের এক কোণে চেয়ার পেতে বসে বইয়ের গাদার মধ্যে ডুবে থাকতে। ষ্টাফ রুমে, অন্য শিক্ষকদের আড্ডা জমত, জমজমাট হয়ে। ইন্টেলেকচুয়াল আলোচনার নামে হত অত্যন্ত বাজে তর্কবিতর্ক, চেঁচামেচি, সাহিত্য আলোচনার অজুহাতে বইত বেয়াড়া আদিরসের বন্যা। সেখানে তিনি আসতেন কদাচিৎ। কিন্তু যখনই আসতেন তখনই সমস্ত ঘরের আবহাওয়াটা পাল্টে যেত, সবাই সংযত হত। এমনকি প্রিন্সিপ্যাল তারক সেন পর্যন্ত।

মেলখাটা কংগ্রেস কর্মী গৌরমোহনবাবু প্রায়ই চীৎকার করে বৃটিশ সরকারের শ্রাদ্ধ করতেন। ঘুষি পাকিয়ে দমাদম মারতে থাকতেন সামনের টেবিলে। মনে হত যেন হাজার লোকের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন তিনি। আর একবার সেই বক্তৃতা সুরু হলে তা অনর্গল চলতে থাকত বেশ কিছুক্ষণ। প্রিন্সিপ্যাল পর্যন্ত হাঁ করে সেই বক্তৃতা শুনতেন। এমন সময় হয়তো মহামানব ঢুকতেন ষ্টাফ রুমে। গৌরবাবুর সামনে গিয়ে

মৃদু গম্ভীর গলায় বলতেন, প্রোফেসর চ্যাটার্জি, পনেরো মিনিট হল ক্লাশ সুরু হয়ে গেছে। দেশোদ্ধারটা আপাততঃ স্থগিত রাখুন না।

বলেই ঘর থেকে চলে যেতেন। প্রিন্সিপ্যাল ঘড়ির দিকে তাকিয়ে অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলতেন, তাইতো এবার আপনার ক্লাশে যাওয়া উচিত।

গৌরবাবু ঝট করে মাঝপথে তাঁর বক্তব্য থামিয়ে মুখ লাল করে রেজিষ্টার খাতা, খড়ি-ডাষ্টার নিয়ে ছুটতেন ক্লাশে।

ওঁর নিজের ক্লাশ যে হলে হত তার দরজার সামনে ফিজিক্সের বেয়ারা নিরাপদকে ডিমনষ্ট্রেশনের জিনিষপত্র রেজিষ্টার খাতা, ডাষ্টার-খড়ি নিয়ে হাজির থাকতে হত পাঁচ মিনিট আগে থেকে। পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে উনি গিয়ে দাঁড়াতেন দরজায়। আগের অধ্যাপক তটস্থ থাকতেন, ঘণ্টা পড়লেই তিনি ক্লাশ শেষ করে বার হয়ে আসতেন। উনি গিয়ে দাঁড়াতেন ব্ল্যাক-বোর্ডের সামনে। শুষ্ক, দীর্ঘ চেহারা। রেজিষ্টারে রোল কল হতে সময় লাগত বড় জোর মিনিট দুই। সুরু হয়ে যেত মৃদু গম্ভীর গলায় পদার্থবিদ্যার পাঠ।

হোষ্টেলে স্থানাভাবের জন্য কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের জনাকয়েক আবাসিক শিক্ষককে স্থান দিয়েছিলেন ঐ হলের লাগোয়া কয়েকখানা ঘরে। আমার যখন ক্লাশ থাকত না, আমি ঘরে বসে শুনতে পেতাম ওঁর বক্তৃতা। শুনতাম আর মনে করতাম আমার ছাত্রজীবনে পদার্থবিদ্যা যা পড়েছি তা আমি কিছুই বুঝিনি। বিষয়টাতে যে এত মজা আছে তা আমাকে আগে কোন শিক্ষকই কোনদিন শেখান নি। পদার্থবিদ্যার কঠিন তত্ত্বগুলি উনি ছাত্রদের শেখাতেন সহজ, সরল, বিশুদ্ধ বাংলায়। বোঝাবার পদ্ধতিটা ছিল এত চমৎকার যে ছেলেরা ফিজিক্স পড়ত না, ফিজিক্সকে ভালবাসত।

বেশ মনে পড়ে, উনি বোঝাতেন নিউটনের গতিতত্ত্ব। বলতেন, এই তত্ত্ব শুধু যে ফিজিক্সেরই বিধি তা নয়, এ হল বিশ্বের যাবতীয় ঘটনার মূল বিধি। এভ্‌রি এ্যাকশন্ হাজ-ইট্‌স্-ইকোয়াল এণ্ড্ অপোজিট রিএ্যাকশন। প্রত্যেকটি ক্রিয়ার ঠিক অনুরূপ প্রতিক্রিয়া সব সময়েই আছে। তার মানে সোজা বাংলায়···ইটটা মারলে পাটকেলটা খেতে হবে। তুমি যা করবে ফল পাবে ঠিক তারই অনুরূপ। আমি যতটা বল প্রয়োগে এই দোলকটা দুলিয়ে দিচ্ছি, ঠিক অনুরূপ শক্তিতেই সে আবার জায়গায় ফিরে আসবে এবং তার দোলনকে অব্যাহত রাখবে।

ছাত্ররা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনত। একটি ছাত্র দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করত কিন্তু স্যর, সামাজিক আর রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপারে এই বিধি কি সত্য হয় ?

উনি তখনই বলতেন, নিশ্চয়ই, হতে বাধ্য। তবে সব সময়ে তা আমরা বুঝতে পারি না। সন্ধ্যায় আমার ওখানে এসো বুঝিয়ে বলব।

আবার চলতে থাকত পদার্থবিদ্যার পাঠ। নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। মাঝে মাঝে ব্ল্যাক-বোর্ডে অঙ্কপাত। একটা টিকটিকির আওয়াজ পর্যন্ত শোনা যেত না। এমনি ক্লাশে নীরব ঐকান্তিকতায় চলত শিক্ষা গ্রহণ ও শিক্ষণের কাজ। যদি কোন ছাত্র কখনও সেই নীরবতা ভাঙত, পাশের ছেলের সঙ্গে কথাবার্তা বলত, উনি ক্ষুব্ধ হতেন। ভুরু দুটো কুঁচকে উঠত। বকাবকি আদবেই করতেন না। কারুর দিকে তাকাতেন না। শুধু গলার আওয়াজে ঈষৎ ক্ষোভ ফুটিয়ে বলতেন, এটা বিজ্ঞান শেখার ক্লাশ বাবারা। বিজ্ঞান হল জ্ঞানের সেরা জ্ঞান। সে জ্ঞান নেবার সময় চঞ্চল হতে নেই, আজেবাজে কথা বলতে নেই।

তারপর একটু থেমে বলতেন, অসমোসিস জান কাকে বলে জান কি ? খানিকটা চিনির সরবত আর তার দুগুণ জল যদি একই জারের মধ্যে পাশাপাশি রাখা যায় আর তাদের মধ্যে থাকে একটা পার্চমেণ্ট পেপার, তবে একটু পরে দেখবে ওই চিনির সরবতের সঙ্গে জলের স্তর এক পর্যায়ে এসে গেছে। আর পার্চমেণ্ট পেপারের দু' দিকেই জলই হয়ে গেছে মিষ্টি। দুনিয়ার নিয়ম হল এই, গুরু আর লঘু যদি পাশাপাশি থাকে আর মাঝখানে তাদের পরস্পর যোগসূত্র কিছুটা থাকে তাহলে গুরু কিছুটা লঘুত্ব পায়, আর লঘু সেই সঙ্গে কিছুটা গুরুত্ব অর্জন করে। শেখা আর শেখান হল এই অসমোসিসের ব্যাপার।

আমার মধ্যে যে জ্ঞান আছে তা আমি সঞ্চার করতে চাই তোমাদের মনের মধ্যে। তোমরা সেটার দরকার সহজভাবে হতে দিলেই তবে শেখান আর শেখার কাজ সম্পূর্ণ হবে। সে কাজে ধ্যান দরকার। তোমাদেরও আমারও। চকল হলে সে ধ্যান ভেঙে যায়। ছাত্রটি লজ্জিত হত; অনুতপ্ত হত। আবার চলতে থাকত পঠন-পাঠনের কাজ। আমি পাশের ঘরে বসে শুনতে শুনতে একজন ছাত্র হয়ে যেতাম। আমার মধ্যেও চলতে থাকত অনুশোলনের ক্রিয়া ধীর ও অনিবার্য গতিতে। ঢং করে ঘণ্টা বাজত। কোথা দিয়ে যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় চলে যেত তা বোঝাই যেত না। উনি যেখানে বোঝাচ্ছিলেন সেইখানেই থামতেন। চুপ করে দু' সেকেণ্ড দাঁড়াতেন ধ্যানস্থের মতো। পরক্ষণে খাতাপত্র গুছিয়ে নিতে নিতে বলতেন, সন্ধ্যার সময় আমার ওখানে এসো। সোজা হল থেকে বার হয়ে গিয়ে ঢুকতেন লেবরেটরীতে।

অন্য দিকে তখন টিচার্স রুমে গিয়ে দেখতাম নিদারুণ হাসাহাসির পালা চলছে। অধ্যাপক চৌধুরী তারস্বরে চেঁচাচ্ছেন, গালাগাল করছেন মুখচোখ লাল করে! ক্লাশ করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন ছেলেরা ডায়াসের দিকে পিছন ফিরে বসে আছে। কি নিদারুণ অপমান। এক-জন অধ্যাপক আমার কানে কানে মন্তব্য করলেন, ছেলেদের আর অপরাধ কি। এই রকম যাচ্ছেতাই পড়া শুনতে কার ভাল লাগে? ক্লাশ কনট্রোল করতে গেলে ভাল পড়ানোর ক্ষমতা থাকা চাই।

সেদিন কলেজের ছুটি হলে আমি মহামানবের সঙ্গে মিলাম। উনি একটু মৃদু হেসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার?

আপনার বাসায় যাব। আজ আমিও আপনার ছাত্র। গতিতত্ত্বে নিউটনের বিধিগুলো ভালভাবে বুঝতে হবে।

বিস্তৃত সুন্দর হাসি হেসে উনি বললেন, তা বেশ, তা বেশ চলুন।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে এসে পড়লাম। চৌধুরীর ব্যাপারটা এতক্ষণ ধরে ওঁকে বলতে বলতে এলাম। নদীর ধারে আসতেই আসন্ন সন্ধ্যার একটা বিষণ্ণ ভার চারা মেলে ধরল। উনি এতক্ষণ একটা কথাও বলেন নি। এবার ভয়ঙ্কর গম্ভীর স্বরে বললেন, এ ব্যাপারটা হল, নিউটনস্ থার্ড ল অব মোশানের একটা বিশেষ উদাহরণ এভরি এ্যাকশান হ্যাজ ইটস ইকুয়্যাল এণ্ড অপোজিট রিয়্যাকশন। শিক্ষক আর গভর্নিং বডির পাপে ছেলে গুলো নষ্ট হচ্ছে।

ওঁর সারা শরীর মন্থন করে একটা দীর্ঘশ্বাস বার হয়ে এল। গলার আওয়াজটা ক্লেদে, বেদনায় অসম্ভব আর্ত মনে হল। বললেন, সামনে বড় ভয়ানক দুর্দিন আসছে হর্ষবাবু! জাতটা সাংঘাতিক শয়তান হয়ে উঠেছে। সমাজের কিসে কল্যাণ হয় সে জ্ঞান লোপ পেতে পেতে একেবারে নেগেটিভের পর্যায়ে এসে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত নীতিবোধের সঙ্গে হারাচ্ছে উত্তর পুরুষের উচ্ছৃঙ্খলতা বোধ করবার সব রকম ক্ষমতা। উচ্ছৃঙ্খল বাপের কথা ছেলে না শুনলে, যেমন সে ছেলেকে বাপ জন্তুর মতো পিটতে পিটতে খুন করতে চায়, এও ঠিক সেই রকম। দেখবেন শয়তান তার নিজের ছেলের ঘাড় মটকে যেমন রক্তচুষে খেয়েছিল, এ জাতটাও তেমনি উত্তর পুরুষের রক্তপান করবে। সেদিনে আর খুব বেশী দেরী নেই। তবে আশার কথা এই যে প্রকৃতি সব সময়ে সাহায্য করেছে উত্তর পুরুষকেই। বুড়ো সর্দার হাতীটাকে দাঁত দিয়ে গুঁতিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে একসময়ে যুবা হাতিই দলপতি হয়। এ হতভাগা আত্মজ্ঞানহীন নীতি জ্ঞানহীন জাতটার যদি কোন দিন মরণ হয় তবে তা হবে এই উত্তর পুরুষদের দিয়েই। তারা ছেড়ে কথা কইবে না।

কিছুদূর এগিয়ে এসে তিনি থামলেন। নির্জন নদী তীরে এক জায়গায় বসে তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, একটু অপেক্ষা করুন।

নদীর পাড়ের ওপরে ছোট একটা জায়গা লাল সিমেন্টের ঘের দিয়ে বাঁধান। সেখানে একটা বটগাছ উঠেছে। গাছটার উচ্চতা হবে পনেরো কুড়ি ফিটের মতো। সতেজ, সবল তরুণ বনস্পতি। উনি ধীরে ধীরে

সেই শান বাঁধান জায়গাটার কাছে গেলেন। পা থেকে জুতো খুলে ফেললেন। উঠলেন বাঁধান চত্বরটার ওপর। গাছটার পাশে দাঁড়িয়ে দুচোখ বুজে সেই নধর সবুজ পত্র-পল্লবের ওপর ধীরে ধীরে হাত বোলাতে লাগলেন। যেন ধ্যানের মধ্যে উনি সেই বৃক্ষের আত্মার সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছেন।

মিনিট পনেরো সময় কেটে গেল। আবার একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ শোনায়। দেখলাম উনি ধীরে ধীরে নেমে আসছেন। আমার কাছে এসে বললেন চলুন।

গলার আওয়াজটা ভিজে ভিজে। একটু খাঁকারি দিয়ে গলাটা সাফ করে নিয়ে বললেন, আমার ছেলেটা ওখানে শুয়ে আছে। সারাদিন সময় পাই না। এখন একটু দেখে যাই।

আমার বুকের ভিতরটা একটা অজানা ব্যথায় মুচড়ে উঠল। গলার কাছটায় হঠাৎ এক ঝলক অশ্রু উঠে এল। কোন প্রশ্ন আমার মুখে দিয়ে বার হল না। বেশ কিছুক্ষণ পরে উনি শান্ত গলায় বললেন, সেবার ভীষণ বন্যা হয়েছিল। নদীর জল পাড়ের ওপর পর্যন্ত উঠে এসেছিল একবুক। এ অঞ্চলের বাড়ীঘর সব ভেসে গিয়েছিল। দশ বছরের ছেলেটাকে প্রতিবেশীর জিম্মায় রেখে আমি গিয়েছিলাম তিন গাঁয়ে বন্যাত্রাণের কাজ করতে। সেখানে অবস্থা ছিল আরও ভয়ানক। নদীর বাঁধ ভেঙে গ্রামকে গ্রাম উত্তাল জলের ঢেউয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কয়েকদিন পরে একটা সন্ধ্যাবেলা ডিঙি করে ফিরতে ফিরতে দেখি ওই জায়গায় একটা প্রকাণ্ড বটগাছ জলে পড়েছে, আর তার নীচে জলের ওঠা নামার সঙ্গে একটা কিছু ডুবছে ভাসছে। ডিঙি নিয়ে কাছে যেতেই শুনতে পেলাম শিশুর কান্নার আওয়াজ। খুব ক্ষীণ চিঁ চিঁ আওয়াজ। দেখি ধসে পড়া গাছটায় একটা ডালের সঙ্গে একটা বড় বালতি বাঁধা। বালতিটা দুলছে, তার মধ্যে রয়েছে একটা জীবন্ত দুধের বাচ্চা। আর নিচে কাপড়ে জড়িয়ে ডুবে রয়েছে আমার ছেলেটা। যখন তাকে তুলে নিয়ে এলাম, তখন তার শরীরে এতটুকু প্রাণ নেই। জল খেয়ে ফুলে ঢোল হয়ে উঠেছে।

উনি একটু থামলেন। একটু নিঃশ্বাস নিলেন। চাদরের খুঁটটা তুলে ধরে চোখটা মুছে নিলেন। তারপর ভরা গলায় বললেন, জানেন ডাক্তারবাবু, আমার বুকটা ফেটে গিয়েছিল। তবু আমি এক সময়ে বুক বেঁধেছি এই ভেবে যে আমার ছেলে প্রাণ দিয়েছিল এই কচি বাচ্চাটাকে বাঁচাবার জন্য। বন্যার জলকে সে ভয় করে নি। মরা-বাঁচার কথা কেউ বলতে পারে না। কিন্তু আমার হাতে সে মানুষের মতো তৈরী হয়ে উঠেছিল। আমার এক্সপেরিমেন্টের ধারাটা ছিল নিখুঁত। বেঁচে থাকলে সে মহীরুহ হত নিঃসন্দেহে। তাই ওইখানেই আমি তাকে দাহ করি। পরে ওখানে একটা বট গাছের চারা এনে লাগিয়েছিলাম। আর ছোটেলের ছেলেরা ঐ জায়গাটা নিজেরাই সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়ে গেছে। আসুন এই যে আমার আস্তানা।

রাস্তার ওপরে একানে একটা দোতলা বাড়ী। গেটটা ঠেলে উনি আমাকে নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দিলেন, পরমানন্দ আলো নিয়ে এসো।

একজন সবল চেহারার লোক এসে হাজির হল, হাতে লণ্ঠন। পরনে তার সাবানে ধোওয়া ফতুয়া ধুতি। এসেই বললে, স্যার ফোর্থ ইয়ারের ফতীন নাগের আবার জ্বর এসেছে। টেম্পারেচার একশো পাঁচ। খুব কাঁপুনি হচ্ছে। বেলা সেখানে বসে আছে। ডাক্তারবাবুকে খবর দিয়েছি, তিনি এলেন বলে।

উনি বললেন, আপনি বসুন। ছোঁয়াচে রোগ আপনার গিয়ে দরকার নেই। যে অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেলেন। তারপর আমি বসে বসে দেখতে লাগলাম। ডাক্তারবাবু এলেন। কয়েকজন ছেলে দৌড়ো দৌড়ি করতে লাগল। একজন গেল বরফ আনতে। আর একজন গুণুনি সাইকেল নিয়ে চলে গেল চৌদ্দ মাইল দূরে শহরে ওষুধ আনতে। সমস্ত বাড়ীটা এক ব্যস্ততায় জেগে রইল রাত বারোটা অবধি। এর মধ্যে ওঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হল না। একটা সদ্য রোগ-মুক্ত ছাত্রের কাছে শুনলাম, এই বাড়ীটাকে উনি হাসপাতাল করে রেখেছেন। যে কোন ছাত্র অসুস্থ হলে তাকে নিয়ে আসা হয় এখানে। কলেজের ডাক্তার

চিকিৎসা করেন বটে, সেবা আর পথ্যের ভার ওঁর নিজের। পরমানন্দ আর বেলা দুজনেই ওঁর নিজের লোক, জেলা হাসপাতাল থেকে ওরা নার্সের ট্রেনিং নিয়ে এসেছে।

সেদিন রাত বারোটায় ঘরে ফিরতে ফিরতে কেবল আমার মনের মধ্যে ভাসছিল সেই জরুর বট গাছের ছবিটা। মহামানবের বীজ!

মহামানব বললেন, জানেন হর্ষবাবু, মালীরা যেমন ফুলের গাছগুলো যেমন সূর্যের আলো না পেলে বাড়ে না, তেমনি শিক্ষকদের হৃদয়ের উত্তাপটুকু না পেলে কোন ছাত্রের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে ফুটে উঠতে পারে না।

কিন্তু সেই সঙ্গেই ছাত্রদের ওপর ওঁর কঠোরতা দেখে আমরা বিস্মিত হতাম। ছাত্রদের কোন রকম ইচ্ছাখলতা এতটুকু ক্ষমা করতেন না। ওঁর নিয়মানুবর্তিতা চলত ঘড়ির কাঁটার মতো। কলেজে ঢুকে থেকে শেষ অবধি উনি ফিজিক্স লেবরেটরীতে প্রায়ান্ধকার ঘরের মধ্যে বসে অদৃশ্য ঘড়ির কাঁটার মত কাজ করতেন। সেই ঘড়ির সঙ্গে তাল রেখে চলতে হত প্রিন্সিপ্যাল থেকে প্রত্যেকটি ছাত্রকে। তার একটু এদিক ওদিক হওয়া চলত না।

হোষ্টেলের উনিই ছিলেন ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক। উনি নিয়ম বেঁধে দিয়েছিলেন সকালে বিছানা থেকে ওঠার, ব্যায়াম করার, পড়তে বসার, বিকেলে খেলাধুলো করার ও সন্ধ্যায় আবার পড়তে বসার। এর মধ্যে চার বার খাবার সময়। যে ছাত্র এই নিয়মের হেরফের করত, তার এক বেলা এবং ক্ষেত্র বিশেষে দু'বেলা আহার বন্ধ করে দেওয়া হত। এর নাম ছিল মিল কাট। হোষ্টেলের ছেলে-দের টাকা পয়সা সব জমা থাকত সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের কাছে। চাইলেই তা পাওয়া যেত না। কাজেই যেখান সেখান থেকে পেট ভরিয়ে আসার কোন সুযোগই ছিল না। আর হ্যানীয় কোন ছাত্র যদি কলেজের নিয়ম ভাঙত, তবে মহামানব সশরীরে যেতেন তার বাড়ীতে। এ ব্যাপারে এমন কোন অভিভাবক ছিল না যে মহামানবের কথা অগ্রাহ্য করতে পারত।

একটা ঘটনার কথা এই কলেজে প্রায় প্রবাদ বাক্যের মতোই হয়ে গিয়েছিল। কোন ছাত্র খুব বেচাল হলে অন্য ছাত্রেরা অথবা শিক্ষকরা পর্যন্ত তাকে সাবধান করে বলতেন, তোমার অবস্থা রমাপদর মতো হবে দেখছি।

রমাপদ ছিল নদীর ওপারের এক জমিদারের ছেলে। একটু বেশী বয়সেই সে এসেছিল কলেজে পড়তে। থাকত আবাসিক ছাত্র হিসাবে হোষ্টেলে। কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় তার পূর্বপুরুষেরা যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করেছিলেন, এই অহংকারে সে ধরা কে সরা জ্ঞান করত। অধ্যাপকদের সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না, তা ছাত্রদের তো কথাই নেই। প্রকাশ্যে সিগারেট ধরিয়ে হোষ্টেলের মধ্যে ঘরভর ঘোরাঘুরি করত। ঠাকুর চাকরদের ধমকাতো। রমাপদকে সকাল-সন্ধ্যায় প্রায়ই হোষ্টেলের ঘরে পাওয়া যেত না। সে ঘরে ফিরত রাত করে, সকালে বিছানা থেকে উঠত বেলা আটটায়। প্রথমে তো 'মিল কাট'। কিন্তু তাতে রমাপদর কিছুই যেত আসত না। বাজারের সব দোকানদার ছিল তার চেনা। তাকে ধার দিতে কারুরই আপত্তি ছিল না।

রমাপদ হোষ্টেল কম্পাউণ্ডের মধ্যে শিক্ষকদের যুবতী স্ত্রী কন্যাদের দেখলেই বিকৃত অঙ্গ ভঙ্গি করে, অশ্লীল গান গায়। নিয়মে বাঁধা হোষ্টেলের সুস্থির আবহাওয়ার মধ্যে রমাপদর আবির্ভাব একটা কুৎসিৎ হাওয়া বয়ে নিয়ে এল। শিক্ষক-ছাত্র সবাই বড় অস্বস্তি বোধ করতে লাগল।

মহামানব প্রিন্সিপ্যালকে জানালেন এ কথা। জবাবে প্রিন্সিপ্যাল বললেন, জমিদারের ছেলে ওরকম একটু আধটু হয়েই থাকে। ওর ঠাকুর্দারা অনেক টাকা এণ্ডাউমেণ্ট করে গেছেন কলেজ ফাণ্ডে। সে টাকা না হলে কলেজ তৈরী হত না। ওকে আপনারা একটু সহ্য করে নেন।

উনি প্রিন্সিপ্যালের কাছ থেকে গম্ভীর মুখে ফিরে এসেছিলেন। তারপরের দিনই গিয়ে হাজির হয়েছিলেন নদীর ওপারে জমিদার বাড়িতে রমাপদর বিধবা মায়ের কাছে। দু'জনের মধ্যে কি কথা হয়েছিল তা কেউ জানে না।

এক শীতের হাতে কঠিন ঠাণ্ডার মধ্যে রাত এগারোটার সময় শাল মুড়ি দিয়ে, হাল্কা নেশার আবেশে শিষ দিতে দিতে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালতেই রমাপদ সামনে সাপ দেখার মতো আঁৎকে উঠেছিল। ঘরের মধ্যে চেয়ারে বসে আছেন ফিজিক্সের অধ্যাপক।

উনি একটি কথা বলেন নি। শুধু কঠিন হাতে রমাপদর গা থেকে শাল থেকে সুরু করে সমস্ত জামা খুলে নিয়েছিলেন। গায় গরমের কাপড়টা পর্যন্ত। রমাপদ একবার বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সেই প্রচণ্ড শক্তিমান হাতের থাবার চাপে তার হাতের আঙুলগুলো গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম হতেই, যে সে চেষ্টা ছেড়ে দিয়েছিল। উনি তার ঘাড় ধরে টানতে টানতে কুয়ো-তলায় এনে ফেলেছিলেন। কুয়োর থামের সঙ্গে আষ্টে পৃষ্ঠে এবং পরনের কাপড়টা দিয়ে বেঁধে ছিলেন তাকে। কোমরে জড়িয়ে দিয়েছিলেন একটা গামছা। তারপর বালতি বালতি জল তুলে ঢেলে ছিলেন তার আপাদমস্তকে। সেই অবস্থায় রমাপদ ছিল সারারাত। সকালে ছাত্র শিক্ষক সবাই এসে দেখেছিল শীতে আধমরা হয়ে রমাপদ তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছে।

রমাপদকে উনি শুধরে দিয়েছিলেন আগাগোড়া। সেই রমাপদ এই কলেজ থেকে ভালভাবে ডিগ্রী নিয়ে পাশ করে যায়। তারই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার বিধবা মা হোষ্টেলের কাঁচা মাটির বাড়ী ভেঙ্গে কোঠা বানিয়ে দেন।

একবার রাজনৈতিক আন্দোলনের ঢেউ উঠে সারা ভারতের স্কুল কলেজের ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে তোলে। সর্বত্র ধর্মঘট সুরু হয়ে যায়। এই মফঃস্বলের কলেজেও সেই ঢেউ এসে লেগেছিল। গৌরমোহনবাবুর দল গরম গরম বক্তৃতায় ছাত্রদের উত্তেজিত করে তুলেছিলেন। ছাত্রদের কথা ছিল, বৃটিশ সরকারের কেরানী তৈরী করার শিক্ষা আমরা নেব না। আমরা স্কুল-কলেজ সব বয়কট করব।

মহামানব গৌরমোহনবাবুকে ডেকে সে সময়ে বলেছিলেন, ছেলেগুলোকে শুধু শুধু ক্ষেপাচ্ছেন কেন।

—আপনি বলেন কি, শুধু শুধু! সারা ভারতবর্ষের ছাত্ররা ধর্মঘট করছে। ছাত্রদের রাজনৈতিক চেতনা না এলে দেশ স্বাধীন হবে কেমন করে? পাল্টা জবাব দিয়েছিলেন গৌরমোহনবাবু।

—আপনি তো জানেন, আমাদের কলেজ সরকার থেকে এড্ পায়। তাহলে সবার আগে আপনারা চাকরী গুলো ছাড়ুন, সরকারের অসহযোগ করুন। না হলে মাসে মাইনে নেবেন আর ক্লাশ না করে কেবল ছেলে ক্ষেপিয়ে বেড়াবেন, এ কেমন কথা? এতেই কি আপনি মনে করেন দেশ স্বাধীন হবে?

গৌরমোহনবাবুর দল ওঁর কথা শোনেন নি। তখন উনি ছাত্র নেতাদের ডেকে ছিলেন। —বাবারা তোমরা স্কুল কলেজ ছাড়তে চাইছ খুব ভাল কথা। কিন্তু স্কুল কলেজ ছেড়ে দিয়ে তোমরা করবে কি?

—আন্দোলন করব। স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন।

—তোমাদের তো বয়েস হয়েছে। প্রায় সবাই সাবালক। তোমাদের রোজগার খাওয়া পরা চালাবে কে? বাপ-দাদাদের অনুগ্রাস হয়ে স্বাধীনতার মূল্য বুঝতে পারবে কি?

ছাত্র নেতারা জবাব দিতে পারে নি। শুধু বলেছিল, এ শিক্ষণ ব্যবস্থা অসার, এ আমরা গ্রহণ করব না।

—বেশ ভাল কথা, কোরো না। কিন্তু এর চেয়ে ভাল শিক্ষণ ব্যবস্থা এদেশে কোথায় আছে তার কি হদিশ দিতে পার? সেই মামার চেয়ে যখন কানা মামা ভাল, তখন এই শিক্ষাতেই আমাদের লেগে থাকতে হবে। নৈলে এখুনি সব ছেড়ে দেব বলে যদি সবাই স্কুল কলেজ ছাড়ে তা হলে দেশে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে তার পূরণ রাতারাতি করবে কে? আমার ধারণা যে শিক্ষাটুকু তোমরা পাচ্ছ, সেটুকুও যদি তোমরা না নাও তোমরা উজ্জ্বলে যাবে। রাজনীতিতে তো আর শৃঙ্খলা নিয়মানুবর্তিতা শেখায় না। ডিসিপ্লিন ও শেখায় না। তৈরী জিনিষগুলোকে ভাঙা খুব সোজা। নতুন করে কিছু একটা গড়ে তোলাই কঠিন কাজ। আমার কথা শোন, ক্লাশে যাও।

ছাত্ররা প্রকাশ্যে ওঁর প্রতিবাদ করে নি। কিন্তু ধর্মঘটের সঙ্কল্প থেকে বিচ্যুত হয় নি।

তখন উনি চরম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। ছেলেরা ধর্মঘটের জন্য কলেজ গেটে পিকেটিং সুরু করতেই উনি এক বোতল কেরোসিন তেল আর দেশলাই বাক্স নিয়ে সবার সামনে হাজির হয়েছিলেন। বলেছিলেন, তোমরা আমার কথা শুনলে না। বেশ! আমি বেঁচে থাকতে তোমাদের এই উচ্ছৃঙ্খলতা দেখতে পারব না। তার আগেই তোমাদের সামনে পুড়ে মরব। কেরোসিনের বোতলটা উনি নিজের গায়ের ওপর ঢেলে দিয়েছিলেন।

ছাত্ররা ওঁকে চিনত। জানত ওঁর যা কথা তাই কাজ। তখুনি ওরা ধর্মঘট বন্ধ রেখে ওঁর পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল।

এরই সঙ্গে আর একটা রাতের কথা স্পষ্ট মনে পড়ল।

ভারত স্বাধীন হয়েছে। বাংলা দু'ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে আমি চলে এসেছি কলকাতার একটা বেসরকারী কলেজে। উনি কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের সেই কলেজ ছেড়ে কোথাও গেলেন না। তবে কলকাতায় আসতেন নানা কাজে। এলে আমার মেসে উঠতেন।

একদিন স্বাধীন ভারতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর গুলী চলল। রাজেশের নামে একটি ছেলে সেই গুলীর আঘাতে মারা গেল। সমস্ত সহর স্তব্ধ। বৃটিশের ফেলে যাওয়া বন্দুকগুলো এখন মুখ উঁচু করেছে এদেশের লোকেদেরই ওপর। দেশের লোক এটা আশা করে নি। শোকে সারা সহর মুহ্যমান। শিক্ষক হিসাবে আমার বুকের মধ্যে কাঁটা বিঁধছিল সারাক্ষণ। মনে পড়ছিল মহামানবের কথাগুলো। বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছিল না।

দুপুর রাতে আমার মেসের ঘরের দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ হতেই দরজা খুলে দিলাম। দেখি সম্মুখে দাঁড়িয়ে মহামানব। বড় ক্লান্ত, বড় বিধ্বস্ত দেখাচ্ছিল ওঁকে। কিন্তু চোখ দুটো ওঁর জ্বলছিল ধক্ ধক্ করে।

বললাম, আসুন আসুন। আজকে আপনাকে মনে পড়ছিল ভীষণ ভাবে। কিন্তু আপনি এত রাতে কোথা থেকে এলেন? এতো ক্লান্ত লাগছে কেন?

উনি এসে আমার তক্তাপোষের ওপর বসলেন। পাশে ঝোলাটা নামিয়ে রেখে বললেন, দর্ষবাবু একটু জল খাওয়াতে পারেন গলা বুক সব শুকিয়ে গেছে।

পরপর কয়েক গ্লাস জল খেলেন উনি। বললেন, আজই বিকেলে এসে নেমেছি শিয়ালদাতে। সেক্রেটারীর কিছু যন্ত্রপাতি আর কিছু বই কিনে নিয়ে যাব। নেমেই শুনলাম স্বাধীন দেশের স্বাধীন শাসক ইউনিভার্সিটির ছেলেদের ওপর গুলী চালাচ্ছে। শুনেই দৌড়ে গেলাম। গিয়ে দেখি ইউনিভার্সিটির সামনে কলেজ স্কোয়ার রণক্ষেত্র। সেখানে রক্তাক্ত দেহে একটি ছেলে পড়ে আছে গুলী খেয়ে। ছেলেরা হৈ হৈ করছে। ছেলেটির মুখের দিকে তাকালাম। কী বীর্য! কী তেজ! সমস্ত ছাত্রদের মিলিত উত্তেজনা তখনও তার চেহারায় ফুটে বার হচ্ছে। মুর্খরা বুঝল না, স্বাধীন রাষ্ট্রের একখানা পাঁজর খসে গেল। আমি জানতাম দর্ষবাবু, আমি জানতাম এই রক্তমাটাই হবে।

বলতে বলতে সেই পরম সহিষ্ণু, সিংহের মতো পুরুষ শিশুর মতো মুখে হাত চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন। একটু পরে চোখের জল মুছতে মুছতে বললেন, সেই ছেলেটির শবানুগমন করে গেলাম কেওড়াতলায়। চিতার আগুনটা ধক্ ধক্ করে জ্বলে উঠতেই আমার বুকের মধ্যেও আগুন জ্বলে উঠল। রাত তখন দশটা। সটান গেলাম বিধেটার রোডে স্বাধীন পশ্চিম বাংলার স্বাধীন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ীতে। এক সময় একসঙ্গে কলেজে পড়েছিলাম। নাম পাঠাতেই দেখা হল। ওঁকে প্রশ্ন করলাম, ছেলেদের ওপর গুলী চলল কেন?

তখন সবেমাত্র মুখ্যমন্ত্রী লালবাজারের কন্ট্রোলরুম থেকে ফিরেছেন। মেজাজ খুব চড়া। চড়া গলায় উত্তর দিলেন, ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খলতা একেবারেই সহ্য করা হবে না। এইসব উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের তিনি শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন। আমি পালটা প্রশ্ন করলাম, এই সব ছেলেদের উচ্ছৃঙ্খল করল কে? দু বছর আগে এদের এই উচ্ছৃঙ্খলতাকে আপনারা রাজনৈতিক নেতারা বাহবা দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন। আর দু'বছরের মধ্যেই তাদের কপালে

ছুটবে ওরা! যারা ওদের এত দিন ধরে ভাতাল টেনে শৃংখলা ভেঙে দিয়ে করল ইচ্ছামত তারা এখন সব দাদু! ক্ষমতাটা তাদের হাতে বলেই কি এই অবিচার চলবে? মুখ্যমন্ত্রী আমার প্রশ্নের জবাব দেন নি। কিন্তু আমি তাঁকে ছাড়িনি। আমি আরও একটা প্রশ্ন করেছি। ছাত্রদের শিক্ষা দেবার তাদের বাপ-দাদাদের, শিক্ষক আর রাজনৈতিক বাবা-চাচা-দাদাদের নীতি শিক্ষার ব্যবস্থা কি আপনার রাজত্বে কিছু হয়েছে? তা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে শুধুমাত্র ছেলেদের দিয়ে পিটিয়ে মারলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে?

বিজ্ঞানের ডিগ্রীধারী, সর্বত্যাগী দেশহিতৈষী, মুখ্যমন্ত্রী আমাকে জবাব দিতে পারেন নি।

বললাম, আমি আপনার জন্ত কিছু কিনে আনি। আপনার হয়তো কিছুই খাওয়া হয় নি। উনি বারন করলেন। বললেন, আপনার এখানে একটু জিরিয়ে নেব। সকালেই চলে যাব ভেবে। এখানে আর মোটে থাকতে ইচ্ছে করছে না।

আলো নিভিয়ে দিলাম। বললাম, শুয়ে পড়ুন। রাত অনেক হয়েছে। উনি খাটের ওপর, আমি নীচে শুয়েছি একটা মাদুর পেতে। বুঝলাম উনি ঘুমাচ্ছেন না। একটু পরেই বললেন, হর্ষবাবু আপনাকে আমি একদিন বলেছিলাম, জাতটা শয়তান হয়ে উঠেছে। এরা নিজেদের ছেলেদের রক্ত নিজেরাই চুষে খাবে। আসলে টাটকা তাজা, প্রাণশক্তিতে ভরপুর ছেলেগুলোর সামনে আত্মনিষ্ঠ হয়ে, খোলা বুক নিয়ে দাঁড়াবে, তাদের ভালবাসবে, শাসন করবে, পথ দেখাবে, এমন চরিত্র ভারতের দু'ভাগের মধ্যে কোনখানেই নেই। যে সব নেতাদের আজ চোখের সামনে হিরো বলে মনে হচ্ছে আসলে তাদের সবাই বদ্ধ পচা কেরিয়ারিজমের দাস। দেশের সত্যিকারের কল্যাণের কথা তারা কেউই ভাবে না। অথচ আর বিবেদনের এই-টাই ছিল আসল সন্ধিক্ষণ। গতানুগতিকতার অবসাদে বৃটিশের ফেলে যাওয়া নোকাতেই তারা শাসনের পাড়ি জমাতে চাইছে। মনে করছে এতেই বুঝি মোক্ষলাভ হবে। আমি দেখছি যানচাল আসন্ন। তারই চিহ্ন আজ স্বচক্ষে দেখলাম। আজ বেশ বুঝতে পারছি এই এক রাজ্যের একদিন হাতার হবে। ভবিষ্যতের তাজা রক্তে রক্ত গঙ্গা বইবে। বিজয়- এভারি এ্যাকশান হাজ ইটস্ ইকোয়াল এণ্ড অপোজিট রিএক্শন।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে উনি চলে গেলেন।

তারপর দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। সংবাদ আর কিছুই পাই নি। এর মধ্যে পূর্ব বাংলার বেশ কয়টা বড় বড় ধর্মীয় দাঙ্গা ঘটে গেছে। তাদা নিয়ে মারণ যজ্ঞ হয়েছে। এপারে ওপারে যাতায়াত ক্রমশঃ কঠিন থেকে কঠিনতর হয়েছে। দু'একখানা পত্র দিয়েছিলাম, উত্তর আসেনি। এরপর দেখেছে পূর্ব বাংলার মুক্তি সংগ্রাম। গণহত্যার আতঙ্কে লাখে লাখে লোক চলে আসছে পশ্চিম বাংলায়।

কিন্তু মহামানবের কথা আমি ভুলতে পারি নি। কলেজে পড়াই, প্রতিনিয়ত ছাত্রদের অবস্থা দেখি, দেখি শিক্ষকদের হাল চাল। স্বাধীনতা লাভের পর যখন নিজেদের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালাম, দেখলাম ডিমের খোলা ভেঙে বার হল পচা ধরা এক সমাজ। সে পচন দিনের পর দিন বাড়ছে। শিক্ষকরা আর মহান শিক্ষাব্রতী নয়, অভাবে তাদের স্বভাব নষ্ট হয়েছে। অন্যান্য ব্যবসাদারী পেশার মতো তারাও শিক্ষার ব্যবসা শুরু করেছে। সেই ব্যবসার স্বীকার হল ছাত্র সমাজ। ওদিকে সব রকম আদর্শ বিচ্যুত, বিবেকহীন রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের ক্ষমতার লড়াই-এ ছাত্রদের ব্যবহার করছে যুদ্ধের সৈনিকের মতো। আর ছাত্রদের বাবারা? তাদের মধ্যে সুযোগ সন্ধানীরা তুলছেন ইট-কাঠ পাথরের ইমারত, চড়ছেন একখানার জায়গায় পাঁচখানা গাড়ী, কালোবাজার ছেয়ে তৈরী করছেন কালো টাকা। যাদের সে সুযোগ নেই তাঁরা দৈনন্দিন পেট ভাত জোগাড় করতেই পরিশ্রান্ত। কখনও কখনও তাঁদের চোখ ধাঁধিয়ে ঘুরে। রাজনীতি। মনুমেন্টের তলায় মিটিং করছেন। কিন্তু ছাত্রদের দিকে কে তাকায়? গত পঁচিশ বছরের অক্ষম সরকারী প্রশাসন সমাজ বিরোধীদের শাসন করতে পারে নি। সমাজ

কল্যাণের আদর্শকে সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে পারে নি। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ঢুকছে লোভী ভাইরাসের দল। স্বাস্থ্য নেই, পুষ্টি নেই, মনের মার্জনায় উপযুক্ত শিক্ষা দীক্ষা কিছুই নেই। চারদিকে চাপ চাপ হতাশার কালিমা। মনুষ্যত্ব কথাটা এখন আভিধানিক শব্দ মাত্র। শুধু মাত্র প্রাণ ধারণের গ্লানি নিয়ে এই অবরুদ্ধে ওরা সমাজে কোন রকমে বেঁচে আছি।

মহামানবের কথা আমরা কেউ শুনি নি। বোধ হয় মহামানবদের কথা কেই কোন দিন শোনেও না। অন্ধ মানুষ, লোভী মুখে মানুষ নিজেকে এতটুকু শোধরাবার চেষ্টা কোনদিন করে নি। আমরাও আমাদের শুধরে নেবার চেষ্টা করি নি। বরঞ্চ আগের থেকে আমাদের বুদ্ধির চটুলতা বেড়েছে, সর্বনাশা মতলবে আমরা নিজেদের ঠকিয়ে চলেছি পদে পদে। আমরা আমাদের উত্তর পুরুষদের এতটুকু ভালবাসতে পারি নি। তাদের জন্য কোন রকম সত্যিকারের ত্যাগ স্বীকার করতে কাচ করিনি। তাদের আমরা ব্যবহার করেছি ক্ষুদ্র স্বার্থের হাতিয়ার হিসাবে। উত্তর পুরুষদের আমরা আপাগোড়া ঠকিয়েছি। কিন্তু তবু আমরা আশা করছি তারা আমাদের সুবিচার করুক। তারা আমাদের বাধ্য হোক এবং হোক আদর্শ চরিত্রের।

মহামানবের কথা তাই আমার প্রায় প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়। আমরা হারাচ্ছি—তেঁতুলের বীচি আর আশা করছি ল্যাংড়া বোম্বাই আম। তারপর সেই জলদ গম্ভীর স্বরে বলা চরম সত্যকথা—এভরি এ্যাকশান্ হ্যাজ ইট্স্ ইকোয়াল এণ্ড অপোজিট রিয়্যাকশন—প্রতি পদক্ষেপে তার প্রমাণ দেখতে পাই। সর্বত্র শুনতে পাই ছেলেমেয়ে গুলো উচ্ছন্নে গেল, এ কি যুগ এল রে বাবা!

হাবু আউটডোর থেকে ফিরে এল। বললে, চল দেখি কোথায় তোর রুগী। ওকে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম গেটের বাইরে ফুট পাথের ওপর গাছ তলায়। বললাম, দেখ তো ওঁর অবস্থাটা কি?

হাবু এক মুহূর্ত আমার মুখের দিকে চেয়ে হেসে উঠল, তোর মতো সব!

তারপর উপু হয়ে ওঁর পাশে বসে বলে উঠল, আরে এ লোকটা তো হাসপাতালের ফ্রি বেডে ছিল দু'মাস। আমিই ভর্তি করেছিলাম, মনে আছে। কোমরের কাছে হেরুতে একটা ফ্যাকচার হয়েছিল। লোকটা শুধু বলেছিল, আঘাত পেয়েছে। কিন্তু কিসের যে আঘাত তা ওর কাছ থেকে বার করতে পারি নি। শুধু বলেছিল, কালের আঘাত, প্রত্যাঘাত। আমি অত শত বুঝি নি। তবে চেহারাখানা দেখে খুব একটা রাস্তায় পড়া লোক বলে মনে হয় নি। তাই হাসপাতালে ভর্তি করেছিলাম। চিকিৎসা কিছুটা হয়েছিল। তবে জানিস তো, আজ কাল সবাই ছোড়াতালির কারবার। হাসপাতাল ফ্রি বেডে বেশীদিন রাখতে চায় নি। তাই এই দু'সপ্তা হল রিলিজ করা হয়েছিল। তা এ যে এখানে পড়ে আছে নজরে পড়ে নি। তুই চিনিস নাকি?

বললাম, মহামানব। একটু ভাল করে পরীক্ষা করে দেখতো অবস্থাটা কি?

হাবু দ্বিরুক্তি করল না। উপু হয়ে বসে নাড়ী, হার্ট ল্যাংসাস্ পরীক্ষা করল। তারপর মুখ উঠিয়ে ঘাড় নাড়ল। নাঃ কিছুই আশা নেই। কিছুক্ষণ ওর হয়ে থেকে বললে, হাটের যা অবস্থা দেখছি যে কোন মুহূর্তেই কার্ডিয়াক ফেলিওর হতে পারে।

বললাম, একটা ট্যাক্সি আনছি। তুলে আমার বাসায় নেওয়া যাবে?

তা হয় তো যাবে। তার আগে দাঁড়া একটু কোরামিন দিয়ে দিই।

ওঁকে আমরা দু'জনে ধরাধরি করে আমার বেসের ঘরে নিয়ে এলাম। গরম জল করে যথা সম্ভব ধুইয়ে মুছিয়ে পরিষ্কার বিছানায় শুইয়ে দিলাম। তখনও উনি অজ্ঞান। এসব করতে করতেই হাবুকে মোটামুটি ওঁর কথা শুনিয়ে দিলাম। হাবু গোটা কতক ইঞ্জেকশান দিয়ে দিল। আমি এখন এখানে আছি।

ঘণ্টা দুই পরে উনি চোখ খুললেন। আমি ঝুঁকে পড়ে বললাম, আমাকে চিনতে পারবেন?

সেই ক্লিষ্ট মুমূর্ষু মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল।

যেন পৃথিবীর ওপার থেকে ক্ষীণ আওয়াজ এল, ঘর্ঘরাবু।

চারদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখলেন। আবার আওয়াজ এল, এটা তো আপনার বেস। এলায় কি করে?

একটু চুপ করে থেকে বললেন, গোপাল, আমার বাল্য বন্ধু গোপাল বোস কোথায় বলতে পারেন? দৌলতপুর কলেজে পড়াত, এখানে চলে এসেছিল কোন একটা কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে। ঐ গোপালই এখন আমার একমাত্র দীপ শিখা। কোথাও আলো দেখি না, চারদিকে বড় অন্ধকার। গোপালের খোঁজেই এসেছিলাম এদেশে। কোথায় আছে সে বলতে পারেন?

আমার বুকের ভিতরটা ঘুচড়ে উঠল। সারশরীর শিউরে উঠলো। মাত্র কয়েকদিন আগে খবরের কাগজে অধ্যাপক গোপাল বসুর মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি, ট্রেনে কাটা পড়ে মরেছেন। একটা ছাত্র পরীক্ষায় ফেল করে ট্রেনের তলায় ঝাঁপ দিতে গিয়েছিল তাকে বাঁচাতে গিয়ে তিনি প্রাণ দিয়েছেন।

উনি যেন একটু ঝিমিয়ে পড়ছিলেন। হঠাৎ দু'চোখ ওঁর বড় বড় হয়ে ঠেলে বার হয়ে এল। দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, আরে গোপাল এসো, এসো। তোমাকেই খুঁজছিলাম ভাই। আমাকে একটু ধরতো তোমার সঙ্গে যাব। এখানে বড় অন্ধকার।

একবার ঠেলে ওঠবার চেষ্টা করলেন। আমরা ধরে শুইয়ে দিলাম। কিন্তু চোখ দুটো তেমনি বড় বড় হয়ে তাকিয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড স্থির হয়ে। যেন সমস্ত জগতের মুখের ওপর একটা স্থির প্রশ্নের মতো। তারপর ধীরে ধীরে পাতা দুটো বন্ধ হয়ে গেল।

ঘর্ঘরাবু ওঁর বুকে একবার হেঁথো লাগিয়ে বলে উঠল, উনি চলে গেলেন।

• • •

...."জীবনচক্রের গতি দেখিয়া ভীত হইয়াছ? স্বভাবের নির্মম ভাঙাগড়াহীন কার্য-কারণ সম্বন্ধ বুঝিতে না পারিয়া ম্রিয়মান হইয়াছ? কিন্তু তোমাদেরই অন্তরে দৈবদৃষ্টি আছে, তাহা উজ্জ্বল কর। দেখিতে প্রকৃতির মধ্যে একটা দিশা, একটা উদ্দেশ্য দেখিতে পাইবে যে, এই বিশ্ব জীবন্ত, জড়পিণ্ড মাত্র নহে। তাহার আধার উত্তাপিণ্ড, তাহার শিরায় শিরায় গলিত ধাতুর স্রোত প্রবাহিত হইতেছে। সামান্য ধূলিকণাও বিনষ্ট হয়না, ক্ষুদ্র শক্তিও বিনাশ পায় না। জীবনও হয়ত ভবে অবিনশ্বর। মানসিক শক্তিতেই জীবনের চরমোৎকর্ষ। দেখ, তাহারই বলে পুণ্যদেহ সঞ্জীবিত রহিয়াছে! সেবা দ্বারা, ভক্তি দ্বারা, জ্ঞান দ্বারা একই স্থানে উপনীত হই। তোমরাও তাহার একটি পথ গ্রহণ কর। জীবন ও তাহার পরিণাম, এই জগৎ ও অপর জগৎ, তোমাদের সাধনার লক্ষ্য হউক।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু

রজনীগন্ধা

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

গোপাল গোবিন্দর মন্দির, বাহুল্য বর্জিত পরিচ্ছন্নতা চোখকে আনন্দ দেয়, মনকে ভরিয়ে তোলে। মন্দিরের বাহ্যিক চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার অভ্যন্তর ভাগ এবং সম্মুখের দরদালান আজ বিশেষভাবে ফুল দিয়ে সাজান হয়েছে। বছরের এই নির্দিষ্ট দিনটিতে এবারের জন্যও নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেনি। শুধুই রজনীগন্ধার শুভ্রতায় মন্দিরের পবিত্রতা স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে।

দরদালানে গুচ্ছ গুচ্ছ রজনীগন্ধা পরিবেষ্টিত হয়ে স্থির হয়ে বসে আছেন আজ যিনি দেবতার সম্মুখে সঙ্গীত পরিবেশন করবেন—এককালের বহুখ্যাতা স্বনামধন্যা নন্দরাণী। মন্দিরের অনুসজ্জার সঙ্গে বড় সুন্দর মানিয়েছে তাঁকে। নন্দরাণীর চেহারার সঙ্গে তার ধপ ধপে সাদা অনাড়ম্বর পোষাকের সঙ্গে, মন্দির পরিবেশ একাকার হ'য়ে গেছে।

মন্দির স্থাপন করেছেন নির্মল কার্লেকার নিজের বাস-ভবনের একাংশে। প্রতি সন্ধ্যায় এখানে সঙ্গীত পরিবেশিত হয়। কিন্তু এই দিনটি বিশেষ করে ঘরোয়া পরিবেশে শুধু নিমন্ত্রিতদের জন্যই আয়োজিত।

আজ যিনি গান শোনাবেন এককালে তাঁর খ্যাতি আগুনের মত চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, নন্দরাণী যখন খ্যাতির স্বর্ণশিখরে এমনি দিনেই হঠাৎ তিনি রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হয়ে গেলেন। কেন যে এতবড় একজন নামজাদা শিল্পী স্বেচ্ছা নির্বাসন বেছে নিলেন তা নিয়ে প্রচুর গবেষণা হ'লেও কেহই তাঁর সন্ধান পায়নি। বহু অনুসন্ধানের পরে বিফলতার হতাশায় আকাশ বাতাস ভারী হ'য়ে উঠেছে। তারপর একদিন আবার যথা নিয়মে সবই থেমে গেছে। কিন্তু আজও এই শিল্পীকে ভুলতে পারেন নি নির্মল কার্লেকার। তাই দীর্ঘ তিরিশ বছর পরে দূর থেকে নন্দরাণীকে দেখে তিনি চমকে উঠেছিলেন। এক বিচিত্র অনুভূতি তাঁকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিল। এবং তাঁকে দেখার মধ্যে যে ভুল হয়নি তা যাচাই করে দেখবার জন্য এক অভিনব প্রস্তাব করে পাঠালেন নির্মলের একান্ত সচিবের মারফৎ।

যে দুখানি গান অতীতকালে নন্দরাণীকে উচ্চশ্রেণীর শিল্পী বলে চিহ্নিত করেছিল সেই দুখানি গান গাইবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন গৃহস্বামী।

আত্মনিমগ্না নন্দরাণী হঠাৎ যেন ধাক্কা খেয়ে ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন। ভিতরে ভিতরে একটা অস্বস্তি বোধ করলেও মুখে তাঁর মিষ্টি মধুর হাসি ফুটে উঠল। যে সন্দেহ তাঁরও মনে আনা গোনা করছিল তার জবাব তিনি পেয়ে গেছেন।

যৌবনে নন্দরাণীও এক নির্মল কার্লেকারকে জানতেন। তার অর্থের প্রাচুর্য্য, আকর্ষণীয় সুগঠিত চেহারা ওকে অনেকখানি আকর্ষণ করলেও নির্মলের প্রচণ্ড অহঙ্কার আর উপুল দুটি বড় বড় চোখের লুব্ধ দৃষ্টি তার মনকে বিষাগ্রস্ত করে তুলেছিল। তবুও কিন্তু পিছিয়ে যেতে পারেনি। সে যে কি দুর্নিবার আকর্ষণ···নন্দরাণী শেষে নিজেকে শাসন করলেন।

সেদিনের দিনগুলি আজ অতীতের ইতিহাস। সে যুগের নন্দরাণীর বহুকাল পূর্বেই মৃত্যু ঘটেছে।

সত্যিই কি মৃত্যু ঘটেছে নন্দরাণীর? তাহলে আবার মনের কোণে এ প্রশ্ন জেগে উঠছে কেন? কেন কুতূহল চরিতার্থ করতে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন? কেন তিনি চমকে উঠেছেন তাঁর অনুরোধ জানতে পেরে?

এই নামটি বহুদিন ধরেই নন্দরাণী শুনে আসছেন। কিন্তু তাঁর পরিচিত একদিনের কার্লেকারের সঙ্গে আজ ত বিন্দুমাত্র মিল নেই! বর্তমানের নির্মলের টাকা আছে কিন্তু অহঙ্কার নেই। এক পরম ধার্মিক সদানন্দ পুরুষ, আপন সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আসক্তিহীন কিন্তু পরদুঃখে দুঃখী হন। আর নন্দরাণী নিজে···

তাঁর চিন্তায় ছিন্ন ঘটল।

কার্লেকারজির একান্ত অনুরোধ···তিনি নিজেই এ অনুরোধ জানাতে আসতেন কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমাকেই তাঁর ইচ্ছের কথাটা আপনার গোচরে আনতে হলো। তিনি শুধু শুধুই গান দুখানি শুনবেন।

আবার এক ঝলক হাসি ফুটে উঠেছে তাঁর চোখে মুখে সেই সঙ্গে খানিক প্রচ্ছন্ন উত্তেজনা আর ভীতি। নন্দরাণী একবার গোবিন্দর মূর্তির পানে চোখ ফেরালেন তারপর স্থির কণ্ঠে বললেন, আপনার কার্লেকারজিকে বলবেন তাঁর হুকুম পালন করতে আমি সাধ্যমত চেষ্টা করবো।

কার্লেকার সচিব একটু কিন্তু হ'য়ে বললেন, হুকুম না অনুরোধ মা।

আমার কাছে একই কথা।

আপনি ত অর্থের বিনিময় গান শোনাতে আসেন নি। কার্লেকারজি বলে দিয়েছেন অসুবিধা হলে প্রয়োজন নেই।

অসুবিধা হবে বইকি কিন্তু, সেকথা সোজাসুজি স্বীকার করতে পারেন না নন্দরাণী। হয়তো মনের ভাগিদেই পারেন না। অথচ এই তাগিদ মেটাতে গিয়ে যে চিত্রটি স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দিল তা নন্দরাণীর শিল্পী জীবনের যে কত বড় ব্যর্থতা তা অনুভব করে তিনি ভিতরেরভিতরে শুধরে কেঁদে উঠলেন। উপস্থিত একটি মানুষকেও তিনি আনন্দ দান করতে পারেন নি। উদ্দীপনা এবং ঔৎসুক্যের প্রকাশ নেই, হাততালি নেই এবং উঠে গেলে নিমন্ত্রিত অতিথিকে অপমান করা হবে বলেই সকলে এক কঠিন সংযমের পরীক্ষা দিয়ে চলেছেন এই ভাবটি? সকলের ভাবলেশহীন মুখের পানে চেয়ে অনুভব করলেন নন্দরাণী।

চাবুক খেয়ে আবার যেন নতুন করে জেগে উঠলেন তিনি। আপনিই তার চোখ বন্ধ হ'য়ে গেল। আয়ত্ত হ'তেই নিজেকে আবার ফিরে পেলেন নন্দরাণী। ডুবে গেলেন তার সমুদ্রের গভীরতায়। কণ্ঠে তার দুলে দুলে দুলে উঠতে লাগল বন্দনার ভাবময় সুর মাধুর্য্য।

অদ্ভুত শ্রোতৃমণ্ডল আবার স্থির হয়েছে। ঝড় নয় প্রশান্তি, আবেদন নয় নিবেদন, আকাঙ্ক্ষার অস্থির আকুতি নয় প্রাপ্তির আনন্দ উপচে পড়ছে তাঁর সর্বাঙ্গ দিয়ে। মুছে গেছেন নন্দরাণী। সুর থেকে শেষ একাকার হয়ে গেছে।

·····তলিয়ে না গেলে কি আসল রত্নের সন্ধান পাওয়া যায় বেটী? সুর নিজেই হ'লেন ব্রহ্ম। পার্থিব প্রত্যাশা নিয়ে এগোতে চাইলে তিনি ধরা দেবেন কেন কণ্ঠে। ডুবে যা·····একেবারে আত্মভোলা হয়ে তলিয়ে যা তবেই না বুঝতে পারবি সুরের মাহাত্ম্য বুঝতে পারবি কতটুকু পেলি।

কথাটি একদিন বলেছিলেন এক সাধক পুরুষ নন্দরাণীর গান শুনে। আহত হয়েছিলেন নন্দরাণী। বিস্মিত এবং ব্যথিত হ'য়ে উঠেছিল তাঁর অহঙ্কারী মন। অবজ্ঞাভরে চলে এসেছিল সেখান থেকে। মানুষটি ওঁর চলে যাবার ধরন দেখে একটুখানি হেসেছিলেন।

এই ঘটনার মাস কয়েক পরে এই মানুষটির সঙ্গেই ঘটনাচক্রে সাক্ষাৎ ঘটল নন্দরাণীর। সাক্ষাৎ ঘটেছিল কাশ্মীরের এক পর্বত গুহার সম্মুখে। পথ ভুল করে সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন তিনি। এক অত্যাশ্চর্য্য কণ্ঠস্বর তাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করেছিল। এই কণ্ঠস্বর সেদিনের সেই সাধক পুরুষটির। মুদিত নেত্রে তিনি ভগবানের আরাধনায় ধ্যানস্থ। এক অপার্থিব দ্যুতি তাঁর সর্বাঙ্গ থেকে ঠিকরে পড়ছে। প্রশংসায় মোহ নেই, হাততালির প্রতি আকর্ষণ নেই নিজের সর্বস্বকে যথাস্থানে পৌঁছে দেবার সাধনায় বিভোর।

বহুক্ষণ স্তব্ধ কিম্বা স্থিরবিন্দুর মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই অপূর্ব সুরের গভীরে হাবুডুবু খেয়েছেন নন্দরাণী। সাধকের সাধনার প্রকৃত রূপ বুঝি এইটিই। মিথ্যা অহঙ্কারের বস্তু সেদিন তাকে অন্ধ করে রেখেছিল। কিছুই তিনি দেখেননি কিছুই তিনি বুঝতে চেষ্টা করেননি কিন্তু সেই মুহূর্তে নন্দরাণীর মনে হয়েছে, তাঁর এতকালের সকল শিক্ষাই মিথ্যা। তার সংগ্রহের ঝাঁপি শূন্যই হয়ে গেছে। যা পেয়েছেন বাহ্যিক রং বেরং-এর পোষাক মাত্র। আসল বস্তু নন্দরাণীর চোখের আড়ালেই রয়ে গেছে।

স্থান কালের হিসেব রইল না নন্দরাণীর কাছে। দুচোখে তাঁর জলের ধারা। ভুল বুঝেছিলেন তিনি। অহঙ্কার তাঁকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। সত্যকে তাই চিনতে পারেন নি, সহ্য করতে পারেননি সত্যভাষণের স্পষ্টতাকে। অশ্রদ্ধা ভরে চলে গিয়েছিলেন বুকের মধ্যে একটা অসহ্য অপমানের জ্বালা নিয়ে।

হাততালি, ফুলের মালা, প্রশংসা আর স্তবস্তুতির কুয়াসা ভেদ করে তার বিচার বুদ্ধি আলোর সন্ধান ক'রে নিতে সক্ষম হয় নি। দ্বিতীয় বার কিন্তু নন্দরাণী ভুল করেননি। তাঁর চোখের দৃষ্টি খুলে গেছে। যে দৃষ্টি দিয়ে তিনি নিজেকেও চিনেছেন আর চিনেছেন ঐ সাধক পুরুষকে। সেই দিনই প্রথম উপলব্ধি করলেন কিছুই তার জানা হয়নি। সংসারে এইটিই বুঝি নিয়ম—না জানাই জানবার পথ থেকে বিপথে ঠেলে নিয়ে যায়।

ইচ্ছে হচ্ছিল চীৎকার করে বলে, ওগো সুরের আধার তুমি আমায় ক্ষমা করো। ক্ষমা করো আমার মিথ্যা অহঙ্কারের ঔদ্ধত্যকে। তোমার সাধনালব্ধ ফলের এক কণা আমাকে দাও। আমি গ্রহণ করে ধন্য হই।

চোখ মেলে তাকালেন সাধক পুরুষ। মুখে তাঁর ক্ষমা সুন্দর হাসি। চোখে করুণা সিন্ধু আর কণ্ঠে স্নেহ সুধা।

বললেন, আমার মন বলেছিল তোকে আবার একদিন ফিরে আসতেই হবে মা। পরমেশ্বর যে তোকে অমূল্য সম্পদের অধিকারী করেছেন তার অপব্যবহার কিছুতেই করতে পারিস না বেটি। তোর কণ্ঠের ঐ অপূর্ব সুর তাকে নিবেদন কর তোর জ্বালা দূর হ'য়ে যাবে! বুক ভরে উঠবে।

আর ফিরে যাওয়া হল না নন্দরাণীর। যদিও এই সিদ্ধান্ত প্রবল অন্তরায় রূপে তাঁর কাঁচা বয়সের চঞ্চল যৌবন, তাঁর উষ্ণ রক্তের উন্মাদ তরঙ্গ নন্দরাণীকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা করেছে। তিনি কতবার যে এগিয়ে গিয়েও আবার পিছিয়ে এসেছেন, তার হিসেব নেই।

একদিন যারা তাঁর জীবন পথে বারে বারে উঁকি দিয়েছে জীবন সম্বন্ধে নানা বর্ণের চোখ ধাঁধানো মন ভুলানো ছবি এঁকে ওদের নিজ নিজ ইচ্ছার নাগপাশে ধরা দিতে প্রলুব্ধ করেছে তারাই আবার সারিবদ্ধ ভাবে এগিয়ে এসে নন্দরাণীকে ডাকছে। সে আকাশে নিশি পাওয়া মানুষের মত এগিয়ে গেছেন তিনি কিন্তু ঘোর কেটে যেতেই আবার পিছু ফিরে পালিয়ে এসেছেন। একদিন বা দুদিন বা বছরের পর বছর দেহের সঙ্গে, মনের সঙ্গে, অনুভূতির সঙ্গে তাঁকে কি কম সংগ্রাম করতে হয়েছে। তারপর ধীরে ধীরে তিনি স্থির হলেন।

চমকে উঠলেন নন্দরাণী, কে আবার তাকে অতীতের সেই পুরানো নাম ধরে ডাকছে? নন্দা—…এই ডাকটিই কি আবার নতুন করে শুনবার জন্য নন্দরাণী এতকাল পরে নির্মল কালোঁকারের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ পেয়েই ছুটে এসেছে।

বন্ধুর মধ্যে এই নির্মলই একদিন তার অন্তরের অনেক-খানি জুড়ে বসতে সক্ষম হয়েছিল। একটি মানুষকেই তিনি পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারতেন না।

কতকটা ভীত সন্ত্রস্ত, ভাবে একবার চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন নন্দরাণী। মন্দিরের গোবিন্দর পানেও মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টি গিয়ে থমকে দাঁড়াল। অকারণেই দুচোখ তাঁর আপসা হয়ে গেল। তারপরেই ঠোঁটের কোণে মিষ্টি এক টুকরো হাসি ফুটে উঠল। পরীক্ষা করতে চাও পাথরের ঠাকুর? দেখতে চাও আজও নন্দরাণীর মনের কোণে যৌবনের রং লেগে আছে কিনা?….

নন্দরাণীর কণ্ঠে আবার সুরের ব্যঞ্জনা। গোবিন্দর চরণে তিনি তাঁর শেষ আকাঙ্খাটুকুও আজ বিসর্জন দিয়ে মুক্ত মনের অধিকারি হতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। আত্মবিস্মৃতি ঘটেছে নন্দরাণীর। বাস্তব সত্তা মুছে গেছে—বাস্ত জ্ঞান হারিয়ে সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করেছেন তিনি। তারপর একসময় আপনিই গান থেমে গেছে, নন্দরাণীর খেয়াল নেই। উপস্থিত সকলে একে একে মন্দির প্রাঙ্গণ ত্যাগ করে গিয়েছেন আর তাকেও যে ফিরে যেতে হবে সে কথাও যেন…. ….

আবার চমকে উঠলেন নন্দরাণী। আবার সেই আহ্বান, নন্দা….

আর ভুল করবেন না নন্দরাণী। ঠাকুরের মিষ্টি ছলনায় আর তিনি কান দেবেন না।

যখন উৎকর্ষই বিবেচ্য!
সুলেখা
Sulekha
এক্সিকিউটিভ ইঙ্ক
পছন্দমত রঙে পাবেন—
পার্মানেন্ট :
ব্লু ব্ল্যাক • মেডি ব্লু
সুপার ব্ল্যাক • ডার্ক ব্রাউন
ওয়াশেবল্ :
রয়াল ব্লু • এমারাল্ড গ্রীন
স্কারলেট রেড • ক্রিমসন ভায়োলেট
সুলেখা ওয়ার্কস লিমিটেড

আবার সেই একই আহ্বান। আরও স্পষ্ট আরও মধুর।

ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকালেন নন্দরাণী। শান্ত সমাহিত দুটি চোখের উদাস দৃষ্টি মেলে সম্মুখের লোকটির পানে তাকালেন। কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলেন না।

নির্মল বললেন, তুমি কি আমায় চিনতে পারছ না নন্দা ?

মিষ্টি হেসে নন্দরাণী বললেন, কেন পারব না। চিনেছি বলেইতো তোমার ডাক শুনে ছুটে এসেছি নির্মল। সব ছেড়ে পালিয়ে এলেও অনেকখানি লুকিয়ে রেখেছিল নন্দা। তাই ছুটে আসতে হয়েছিল। নিজের সঙ্গেও এতকাল ধরে নিশ্চয়ই লুকোচুরী খেলেছি নইলে নন্দরাণীর বুকের মধ্যে আজও নন্দা বেঁচে রইল কেমন করে? তাইতো ওই ঠাকুরের পানে চেয়ে চেয়ে ভাবছিলাম একি নন্দরাণীর পতন না নতুন এক রূপের সাক্ষাৎ। আচ্ছা নির্মল সত্যি করে বলবে কি এতক্ষণ ধরে তুমি যে নন্দাকে ডাকছিলে তার দেখা পেয়েছো কি ? না আমিই পেলাম অতীতের নির্মলকে।

নির্মল কার্লেকার অবাক বিস্ময় চেয়ে আছেন।

নন্দরাণী স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলতে থাকেন, সময়ের দীর্ঘ পথ ডিঙিয়ে আমরা যেখানে এসে আজ উপস্থিত হয়েছি সেখান থেকে আবার সেই পুরানো জীবনে ফিরে যাওয়া যে সম্ভব না তা বোধহয় আমাকে দেখে তুমি বুঝতে পারছ নির্মল।

নির্মল স্নিগ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলেন, তুমি বোধহয় আমাদের দেহকে ইঙ্গিত করছো ? নন্দরাণী শান্ত হেসে বললেন,

মনটা কি দেহাশ্রয়ী নয় নির্মল ! দেহই বলো আর মনই বলো সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রং ফিকে হয়ে যেতে বাধ্য।

নির্মল তেমনি মৃদু গলায় বললেন, মনের রং কাপড়ের রং নয় নন্দা।

নন্দরাণী বাধা দিয়ে বললেন, আমার কিন্তু কোনওকালে আছে বলে মনে হয় না নির্মল। নইলে নন্দরাণীর কণ্ঠে নন্দার সে দিনের সে গান কেন আজ জমে উঠল না। কেন ব্যর্থ হলো নন্দরাণী ? কেন ফিরে যেতে পারল না তার অতীত দিনগুলির মধ্যে। কেন আগুন জ্বলে উঠল না কণ্ঠে ? কেন একটি মানুষও পাগল হয়ে উঠলো না ! সত্যি করে বল দেখি নির্মল সেদিন যে দুখানি গান তোমাকে উন্মাদ.....

বাধা দিলেন নির্মল কার্লেকার। বললেন, থাক নন্দা। আমি বোধহয় তোমাকে কিছুটা বুঝতে পেরেছি। তবে এটা সঠিক বোধগম্য হচ্ছে না যে, অতীতের সব কিছু যদি, নিছক অতীতের বস্তু বলে ভুলতে হয় তাহলে বর্তমানের মূল্য কতটুকু ? অতীত এবং বর্তমানের যোগ ফলই একটি সম্পূর্ণ বস্তু নয় কি ? আজ অতীতের সূত্র ধরেই নন্দরাণীর নির্মলের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয়েছে একথাও কি ভুল।

নন্দরাণী মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হলেন, তারপর স্নিগ্ধ কণ্ঠে পুনরায় বলতে থাকেন, মিথ্যে হবে কেন। আমি বলতে চাই যে অতীত শুধু অতীত আর বর্তমান শুধু বর্তমান। একের সঙ্গে অপরের নিকট সম্বন্ধ থাকলেও তাদের রূপ আলাদা, কর্ম আলাদা, জাতও আলাদা।

নির্মল শান্ত কণ্ঠে বললেন, তবুও নন্দার সে দিন পালিয়ে যাবার প্রয়োজন হয়েছিল কেন বলবে কি ?

নন্দরাণী একটুখানি হাসলেন, সেদিনের নন্দা আজ আর নেই নির্মল। সব কথা তার মনেও নেই। তবুও বলবো, নন্দা তোমার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে তার সর্বগ্রাসী লেলিহান শিখা দেখে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। আপন সত্তার অবলুপ্তির ভয় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। নন্দার কামনার নিবৃত্তি চাইলেও ঘুমে মরতে প্রস্তুত ছিল না।

নির্মল বললেন, তার মানে নন্দার ভালবাসায় বিশ্বাসের অভাব ছিল ? নন্দরাণী স্নিগ্ধ কণ্ঠে জবাব দিলেন, আজ আর সে কথা অস্বীকার করে কোনো লাভ নেই। আসল কথা সেদিনের নন্দা সবার ওপরে তার নিজের কথাটাই চিন্তা করেছে। একটি পুরুষের উষ্ণ সান্নিধ্যের চেয়ে তার নিজের সুনাম প্রতিষ্ঠা আর অন্যান্য ভাল মন্দের কথাকেই অগ্রাধিকার দিয়েছিল। কিন্তু এসব পুরানো কথা নিয়ে আলোচনা করে কি হবে তার চেয়ে অনুমতি করো আমি আমার নিজের ডেরায় ফিরে যাই।

এত কথার পরেও নির্মল নন্দা খানিকটা উত্তেজিত ভাবেই নন্দরাণীর একখানি হাত নিজের হাতে তুলে নিয়ে শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, তোমাকে যদি আমি যেতে না দিই নন্দা ?

নন্দরাণীর ধৃত হাতখানি ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করলেন না। মিষ্টি করে একটু হেসে বললেন, তাতে কোন লাভই তোমার হবে না নির্মল। একটা মৃত মানুষ তোমার কোন কাজেই আসবে না। আজকের নন্দরাণী যেভাবে—শিখেছে জ্বালাবার মন্ত্র সে ভুলে গেছে বইলে তোমার এত কাছে চলে আসবার সাহস ও পেত না নির্মল।·· ····

নির্মল বিস্মিত অবাক। তাঁর চোখের সম্মুখ থেকে নন্দা আবার নতুন করে মুছে যাচ্ছে। নন্দরাণীকেও সে খুঁজে পাচ্ছে না। তার স্থানে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে আর এক শুভ্র রজনীগন্ধা যার যেন শুভ্র গাত্র বর্ণের সঙ্গে একাত্ম হয়ে রয়েছে তারই মিষ্টি নরম আর স্নিগ্ধ সুবাস।

নন্দরাণী আবার গুণ গুণিয়ে উঠলেন। তাঁর নিমীলিত দুই চোখের কোণে আনমনাজ, কণ্ঠে নিবেদনের আবেগ মধুর সুর। সে সুর বেঁপে বেঁপে বলছে, এ মুক্তি শুধু আমার একলার নয়—এ মুক্তি তোমারও নির্মল, এ মুক্তি তোমারও।·····

• • •

স্বদেশ প্রেমের যে উজ্জ্বল ভাগীরথীধারা আধুনিককালের দেশনায়কগণ দেশের দিকে দিকে সঞ্চারিত ক'রে পরাধীনতার পাপ পঙ্ক থেকে দেশকে উদ্ধার করেছেন, একদা দক্ষিণেশ্বরের পবিত্র রামকৃষ্ণ হিমাদ্রির তুষার মৌলী হ'তে তাকে গঙ্গোত্রীর ভূমিতে অবতরণ করিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ।

আদর্শের রিক্ততায়, সদুপদেশের অভাবে দেশ আজ বিপর্যস্ত, দেশের যুবকবৃন্দ দিক্‌ভ্রান্ত ; পথের সন্ধান না পেয়ে বিমূঢ় নরনারী অন্ধকারে মাথা ঠোকাঠুকি করে মরছে। এই সঙ্কটের অবস্থায় স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্রের প্রদীপ্ত জীবন হ'তে অনুপ্রেরণার দু'একটি স্ফুলিঙ্গ সংগ্রহ করতে পারলে জীবনের পথ আলোকিত হবে, এবং সেই আলোকরশ্মি প্রভাবে কিংকর্তব্যের স্বরূপ দেখতে পেয়ে দেশের যুব শক্তি সুষ্ঠু এবং সবলভাবে যথার্থ পরিণতি লাভ করতে পারবে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

চাঁদ

অনিলকুমার ভট্টাচার্য

এর আগে এই ঘরের দিকে তাকালে অম্লানেরও গাটা রী রী করে উঠত। শোওয়ার ঘর তো নয়, যেন একখানা গোডাউন। খাটের বিছানার জড় করা বালিশ, অপরিচ্ছন্ন চাদর, বিছানার তলায় কত রকমের শাড়ি, ব্লাউজ, দেওয়াল ভর্তি ছবি, বিয়ের সময় পাওয়া যত সব উপঢৌকন—এলোমেলো ছড়ানো। অম্লানের প্রথম বিবাহিত জীবনের ঘর সংসার এমনি আগোছালো এবং অপরিচ্ছন্ন ছিল কয়েক বছর ধরে।

তারপর অম্লানের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এসে এ ঘরের চেহারা একদম পালটে দিলে। ঘরের দেয়ালে রুচি কলাপাতার রং। আসবাব পত্তরও পছন্দ মাফিক সাজানো গোছানো। ফ্লুরেসেন্ট আলোর পাশে নীল মৃদু আলো। জানলায় ভাপে টাটকা রজনীগন্ধার দল, ঘরের একদিকে ওয়ার্ডরোবে সুবিন্যস্ত পোষাক পরিচ্ছদ, আর একদিকে ছোট একটা ড্রেসিং টেবিল, পাশে মৃদুস্বর রেডিওগ্রাম। দক্ষিণের জানালা ঘেঁসে ইংলিশ প্যার্টার্নের দুখানি সিঙ্গেল শীচেস্ নীচু খাট। দরজা জানালার পর্দার রং এর সঙ্গে শুধু দেওয়ালের ডিসটেম্পারের রং নয় খাটের বেড শীটের রংও ম্যাচ করা।

কে বলবে এ ঘর অম্লানের সেই আগেকার ঘর। মল্লিকার এ রুচি অম্লানকে সত্যিই খুশি করেছে। তাকে ঘরে এনে অম্লানের জীবনে সত্যিই নতুন রং-এর প্রলেপ লেগেছে।

মল্লিকা অম্লানের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারের মেয়ে সে। স্কুল থেকে কলেজে পড়ার সুযোগ ঘটেনি তার জীবনে। কেরানি বাপের ছাঁ-পোষা ঘরের আই বুড়ো মেয়ে সংসারে বোঝা হয়ে ছিল এতদিন। বুড়ি থেকে বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুড়ি হওয়ার উপক্রম; তবু এরই মধ্যে থেকে তার মনের রুচি এমন ভাবে কী করে গড়ে উঠেছিল মল্লিকার অতি আপন জনেরাও সে কথা ভেবে পায় না।

মল্লিকা কী নিজেও তা জানে? বিস্মিত কুমারী জীবনে স্বাচ্ছন্দের সুখ কোন দিনই সে দেখে নি—সে হঠাৎ ফুলের ঘর এবং সহচর বর পেয়েই যেন তার সুপ্তমনের সব বাসনাকে জাগিয়ে তুললে।

অম্লান মধ্যবিত্ত হলেও অভাব অনটনের ধোকায় বিপীড়িত নয়। কলকাতা শহরে তার পৈত্রিক বাড়ি। অফিসের চাকরিতে ধাপে ধাপে উঁচু সিঁড়ি বেয়ে পদোন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। সংসারেও তার দায় দায়িত্ব কিছুই বিশেষ নেই। তিন ভাইয়ের মধ্যে সেই সর্বকনিষ্ঠ। একভাই কর্মোপলক্ষে বিদেশে। সেখানেই তার ঘর সংসার। আর এক ভাই এই বাড়িতে থাকলেও ভিন্ন সংসার। বাপ-মা পরলোকগত।

মল্লিকার সঙ্গে অম্লানের বয়সের বেশ কিছু পার্থক্য আছে। চল্লিশ বছর বয়সে অম্লান দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহের কালে চব্বিশ বছরের মল্লিকাকেই পছন্দ করলো। সম্বন্ধটা এনেছিলেন মল্লিকার বাপের এক সহকর্মী বন্ধু।

মল্লিকার মা প্রথমে একটু কিন্তু কিন্তু করেছিলেন পাত্র বয়স্ক এবং বিপত্নীক শুনে; কিন্তু পাত্রের আর্থিক স্বচ্ছলতার কথা জেনে আর অমত করেননি।

মল্লিকাও অসুখী নয়। বিবাহিত-জীবনে কোন বিষাদ নেই তার। ঘরে ঘরে সুখ, ঐশ্বর্য, দিব্যি হাসিখুশি ঘর-সংসার তার।

তবু থেকে থেকে কেমন যেন হয়ে যায় মল্লিকা। কেমন এক উদাসীন উদাসীন ভাব। অম্লান তখন যেন তার মনের নাগাল ছুঁয়ে পায় না।

কীসের অভাব মল্লিকার সমস্ত সংসার জুড়ে তারই তো আধিপত্য। মল্লিকার ওপর প্রভুত্ব করবার মতন লোক সংসারে আর কেউ নেই। তবে। তবে কী মল্লিকার একাকীত্ব?

না। তাও নয়।

অম্লান দু'একবার বলেছে—যদি চাও তো আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে আর কাউকে এনে রাখি।

কেন?

তুমি একলা একলা থাক। হয়তো কষ্ট হয়।

একলা কেন? তুমি তো আছ!

মল্লিকার কথায় অম্লান বলে—তবুও হয়ত ফাঁকা ফাঁকা লাগে তোমার। বাপের বাড়িতে অনেকের সঙ্গে ছিলে। এ বাড়িতে তো তেমন আর কেউ নেই।

স্বামীর চোখের দিকে চোখ রেখে মল্লিকা গভীর স্বরে বলে—তুমি একাই অনেক।

মল্লিকা চট করে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। অম্লানের অনেক কাছে সে সরে আসে। মল্লিকার মধ্যে তখন তার উদাসীনতাকে খুঁজে পাওয়া যায় না।

পরদিন সকাল মল্লিকার কাজের আর অন্ত থাকে না।

সকাল বেলা উঠে চায়ের পর্ব। স্বামীর সঙ্গে একত্রে চা-পান। খবরের কাগজ পড়া শেষ হলে অম্লান বাজার যাবে। মল্লিকা বাজারের ফর্দ স্বামীর হাতে দিয়ে রান্না ঘরে ঢোকে।

বাজার এলে পাচিকার পাশে বসে ছুটনো ছোটা, রান্নার তদারকি করা, তারপর স্বামীর টিফিনের ব্যবস্থা করা।

অম্লান তৎক্ষণ স্নানপর্ব সেরে খাওয়ার-টেবিলে এসে বসে।

মল্লিকা নিজ হাতে স্বামীকে পরিবেশন করে খাওয়ায় তারপর অম্লানের অফিস-যাওয়ার পর্ব। স্বামী অফিস চলে গেলে মল্লিকার আর কাজ কী?

অফিস যাওয়ার সময় মল্লিকাকে কাছে টেনে নিয়ে পোহাগের সুরে মাঝে মাঝে অম্লান সেই কথাই জিজ্ঞেস করে—কী গো, এইবার তোমার বড্ড একা একা ঠেকবে। তাই নয়?

মল্লিকা উত্তর দেয়—তা কেন?

কী করে সারা দুপুর কাটাবে?

কেন, ঘর সংসারের কাজ কী কম?

ঘর-সংসার? বিস্ময়ের দৃষ্টি মেলে অম্লান মল্লিকার দিকে তাকিয়ে থাকে।

হ্যাঁ, ঘর-সংসার। ঘরগুলোকে পরিষ্কার করা। যা নোংরা করে রাখো তুমি!

তারপর?

স্বামীর প্রশ্নের উত্তরে মল্লিকা বলে—তারপর শুয়ে শুয়ে তোমার কথা ভাবা!

আমার কথা ভাবা? আমার কথা নতুন করে আর কী ভাববার আছে।

বাবে, টিফিনে ছানার পুডিংটা খেতে তোমার কেমন লাগবে?

মল্লিকার কথায় অম্লান হেসে বলে—এই কথা ভাবতে ভাবতে সমস্ত দুপুর তোমার কেটে যাবে?

ধুর, তা কেন?

তবে?

তারপর আরো কত ভাবনা আছে।

কী ভাবনা শুনি?

হঠাৎ মল্লিকা কথার মোড় ঘুরিয়ে দেয়—আচ্ছা, তুমি তো রঞ্জনের বাড়িতে গেলে না একদিন! রঞ্জা অম্লানের প্রথম পক্ষের স্ত্রী সহোদরা। কিছুদিন আগে অম্লানকে পত্রযোগে আহ্বান জানিয়েছে একবার দেখা করার জন্যে। মল্লিকার মুখে এ প্রসঙ্গ শুনে অম্লান গম্ভীর হয়ে যায়।

মল্লিকা স্বামীর ভাবান্তর দেখে বলে -আচ্ছা, আর কোনদিন ওকথা বলবো না তোমায়।

অম্লান অনুনয় করে, প্লিজ, মল্লিকা ও প্রসঙ্গ তুলো না কোনদিন। ওদের সঙ্গে আমার আর কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না।

মল্লিকা মিষ্টি হেসে পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে যায়—তারপরের ভাবনার কথা শোন। তুমি অফিস গেলে খানিকক্ষণ

চুপটি করে শুয়ে থাকব? তারপর ভাববো অফিস থেকে ফিরলে—আজ কোথায় আমরা বেড়াতে যাবো কিংবা আজকের সন্ধ্যায় কোন রং-এর শাড়িখানি পরলে তুমি খুশি হবে—

মল্লিকার কথা শেষ হওয়ার আগেই অম্লান বলে—থাক্, থাক্। আর ফিরিস্তিতে কাজ নেই। তার চেয়ে তোমার বেশ ভালো ভালো বই এনে দেব—সারা দুপুর শুয়ে শুয়ে পড়ো।

না,—বই কিনে বাজে পয়সা খরচ করো না।

বাজে পয়সা খরচ?

হ্যাঁ, তোমাদের ও আজকালকার বই আমার মোটেই ভালো লাগে না। যতসব আজগুবি কাহিনী আর কেবল দুঃখের সুর!

দুঃখের সুর তোমার ভালো লাগে না?

স্বামীর বুকে মুখ রেখে মল্লিকা বলে—না, মোটেই না জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছি। গরীব বাপ-মায়ের সংসারে অনেক গ্লানি সয়েছি।

স্বামীর বুক থেকে মল্লিকা মুখ তুলে নিলে।

অম্লান দেখলে মল্লিকার দু চোখ ভরা জল।

চল্লিশ বছর বয়সের অম্লান তখন মল্লিকাকে তোলাতে আরও কাছে টেনে নেয়।

স্বামী অফিস চলে গেলে মল্লিকার অফুরন্ত সময়।

কিন্তু ঘর-গুছোতে সে-সময় যে কোথা দিয়ে অতিবাহিত হয়ে যায় মল্লিকা তা টেরই পায় না। স্নানের জল দিয়ে প্রায় প্রতিদিন ডিসটেম্পার করা দেওয়ালের ঘরখানি মাজা-ঘষা মেজাজের ফ্রেমকে বারবার মোছা, ওয়ার্ডরোবে রক্ষিত শাড়ি, ব্লাউজ, পেটিকোট, আলাকগুলিকে সুবিন্যস্ত করে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা; ড্রাওয়ার ভাঙে নতুন ফুলের বিন্যাস, খাট দু'খানিকে স্থান পরিবর্তন করে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, কিংবা উত্তর থেকে দক্ষিণে নতুন ভাবে সন্নিবেশ করা—কত কাজ মল্লিকার। আশ্চর্য প্রতিদিন এ-কাজে মল্লিকার ক্লান্তি নেই শ্রান্তি নেই।

তারপর স্নান, আহারাদি সেরে রেকর্ড প্লেয়িং-এ রবীন্দ্রসঙ্গীত কিংবা অতুল প্রসাদী শোনা। এতেই দুপুর গড়িয়ে অপরাহ্নের বেলা ঘনিয়ে আসে।

মল্লিকা তখন রান্না ঘরে ঢুকে নতুন শেখা টুকিটাকি রান্নায় মনোনিবেশ করে। স্বামী অফিস থেকে ফিরলে জল খাবারের প্লেটে চাইনিজ ডিশ দেখে অবাক হয়ে যাবে অম্লান।

কে করেছে?

অম্লানের এ প্রশ্নের উত্তরে মল্লিকা মিষ্টি হেসে উত্তর দেবে—কে আবার করবে? চাঙওয়াতে সেদিন গেলে না বলতে খুব ভালো লেগেছে। তাই আজ দুপুরে গিয়ে চাঙওয়া থেকে কিনে নিয়ে এলাম।

মিথ্যে কথা।

কখনো নয়

একশো বার মিথ্যে কথা। কিন্তু সত্যই কী অপূর্ব স্বাদ হয়েছে চাঙওয়াও হার মেনে যায়।

চা-জল খাবার খেয়ে শোওয়ার ঘরের দিকে তাকাতে আরো খুশি হয়ে উঠবে। ড্রাওয়ার ভাঙে রজনীগন্ধার পরিবর্তে এক ডজন টকটকে লাল গোলাপ মিষ্টি গন্ধে সারা ঘর আমোদিত করে তুলবে। পাশাপাশি দুটি খাটের চাদরে আজ গোলাপী ফুলের নক্সা।

হঠাৎ আর একটা ঘরের ছবি মল্লিকার চোখের ওপর ভেসে উঠল কেন?

গরীব কেরানীর মেয়ে মল্লিকা—বামন হয়ে চাঁদ ছোঁওয়ার স্পর্ধা তার অবাঞ্ছা কোন কালেই ছিল না। শহরের অন্ধ গলিতে একতলায় একখানি ভাং সেঁতে ঘরে দরিদ্রের ছ'া পোষা সংসার। তাইনে আনতে বাঁয়ে কুলায় না। দু বেলা পেট ভরে খাওয়া আর সামান্যতম বেশ ভূষার তাগিদ যেখানে প্রধানতম সেখানে জীবন এবং কল্পনা বিলাসের স্থান কোথায়? কেরানি বাপের গলগ্রহ কন্যা মল্লিকার জীবনে কোন দিনই তাই স্বপ্ন বিলাস ছিল না। তবু কোথা থেকে তার আবির্ভাব ঘটল?

মল্লিকার পিসতুতো দাদার বাড়িতে অনিমেষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। কলিকাতার কলেজের নব নিযুক্ত সাহিত্যের অধ্যাপক অনিমেষ. প্রথম দিনের দেখায় মল্লিকার

মধ্যে কী দেখেছিল অনিমেষ। অন্তত সুরে রবীন্দ্র সঙ্গীত মল্লিকার কণ্ঠে শুনে কী আবেগে মুগ্ধ হয়েছিল অনিমেষ মল্লিকা আজ আর তার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজেই পায় না। মল্লিকার পিসতুতো দাদা সময়ের সঙ্গে অনিমেষের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। দু'জনে একই সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ত। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই সঙ্গে বাংলা সাহিত্যে এম. এ পাশ করেছে। কিন্তু ভাগ্যফলে অনিমেষ কলেজে বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপনার কাজ পেয়ে গেল। আর সময়ের কাজ একটা প্রাইভেট স্কুলে মাষ্টারি আর প্রাইভেটে ট্যুশানি করা। কিন্তু বন্ধুত্বে কাটল তা বলে দু'জনের মধ্যে ঘরে নি। সময়ের সঙ্গে অনিমেষ এরই মধ্যে দু'চার দিন মল্লিকাদের বাড়িতে এসেছে, আর অনিমেষের অত্যন্ত আগ্রহে এবং পীড়াপীড়িতেই মল্লিকা একদিন সময়ের সঙ্গে অনিমেষদের টালিগঞ্জ রিজেন্ট পার্ক-এর বাড়িতে গিয়েছিল।

অনিমেষের নিজস্ব ঘরে মল্লিকা বলেছিল :

ঘর তো নয়—তা যেন শিল্প। সে শিল্প দৈনন্দিন ব্যবহারে কোথাও এতটুকু মলিন নয়। দেয়ালের ডিস-টেম্পারের রং এ অঘ্রাণের দিকে তাকালে তা। একখানি সিঙ্গেল শীটেড তীতান—তার ওপর পাতা সাদা চাদরে ছিটানো ফুলের রং পাশে দরজ রক্ষিত ফুলদানিতে যেত শুভ্র একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। টিউব লাইটের আলোয় উদ্ভাসিত ঘরে ঢুকেই মল্লিকা কেমন যেন ফুলের গন্ধের আভাস পেয়েছিলেন।

চা জল খাবারের পালা শেষ হলে অনিমেষের বহু অনুরোধে মল্লিকাকে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতেই হয়েছিল। আর তখন এক অবাক কাণ্ড করে বসেছিল অনিমেষ ঘরের সাদা আলো নিভিয়ে দিয়ে আর একটা সুইচ টিপতেই সমস্ত ঘরখানিতে ছড়িয়ে পড়েছিল আকাশের রং। নীল, গাঢ় নীল, কাজি গোড়া তার। আর মল্লিকার গানের সঙ্গে অনিমেষের একরাত্যের অনাস্বাদিত পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল।

সে-রাতে মল্লিকার ঘুম হয় নি।

মল্লিকার গানের তারিফ করেছিল অনিমেষ।

অনিমেষ সময়কে বলেছিল—ওকে গান শেখাস নে কেন?

সময় উত্তরে বলেছিল—শেখাবে কে?

কেন, রবীন্দ্র সঙ্গীতের কোন ভালো সঙ্গীতায়নে যে না!

সময় বলেছিল তার চেয়ে তুই শেখানা কেন!

কথাটা শুনে মল্লিকার গায়ে কেমন যেন শিহরণের ঢেউ খেলে গিয়েছিল।

ধুর! আমি গানের কী জানি?

তবু অনিমেষ নিবেদন করেছিল মল্লিকাকে গান শিখবেন?

লজ্জায় জড়সড় হয়ে অনিমেষের এ প্রশ্নের উত্তরে মল্লিকা হাঁ, না, কিছুই বলতে পারে নি। শুধু মুখ নীচু ঘুম ভাঙা বুকাশা জড়ানো মুখখানি সে আরো অবনত করেছিল।

মল্লিকার একটি বাসন্তী সন্ধ্যায় স্বল্প রিজেন্ট পার্কের অনিমেষের সেই ঘরখানি মল্লিকাকে আরো দু' একবার আকর্ষণ করে নি যে এমন কথা হলফ করে বলা যায় না। কিন্তু সে অবকাশ আর মল্লিকার মেলে নি।

মল্লিকার কাছে সময়দাই একদিন কথা প্রসঙ্গে জানালে ছেলেটি ভারি এস্থেটিক। বড়লোকের ছেলে বলে একটু অহঙ্কারও ওর মনে নেই। আর মনে প্রাণে ও খাঁটি শিল্পী। কিন্তু হতভাগা সে আগে থেকেই এক জায়গায় মন দিয়ে বসে আছে। তাছাড়া ওর কিন্তু খুবই পছন্দ মল্লিকাকে।

বারান্দার আড়ালে সময়দার ও কথাগুলি কানে যেতেই মল্লিকার মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গিয়েছিল। মাটিতে পড়ে যাওয়ার হাত থেকে কোন রকমে সামলে নিয়ে কল ঘরে গিয়ে রাশি রাশি জল ছিটিয়ে ছিল সে চোখে মুখে মাথায়।

মল্লিকার মা সময়কে বলেছিলেন তবে আর কেন বাবা বামন হয়ে চাঁদ ছুঁতে চাইছ? সময় বলেছিল—তা নয় মাসীমা। অনিমেষ মল্লিকার জন্যে সত্যই ভালো ছেলের সন্ধান করছে।

কিন্তু মল্লিকা সে প্রস্তাবায় বলে না ভালোই করেছে।

শহরতলীর দক্ষিণে রিজেন্ট পার্ক থেকে উত্তরতলীর এই লেক টাউন কোনোদিক থেকে খারাপ নয়। আর অম্লানের ব্যবহারের তুলনা নেই। চল্লিশ বছরের বিপত্নীক অম্লান চাকরির ক্ষেত্রে আরো অনেক বেতন সমৃদ্ধ। ব্যবহারে অনেক অকুণ্ঠ ভালোবাসায় উদার। আর দক্ষিণ খোলা শোওয়ার ঘর খানির তো তুলনাই নেই।

সবচেয়ে বড় কথা মল্লিকার বিয়েতে দরিদ্র কেরানি বাপকে কোন বিড়ম্বনাই সইতে হয় নি। বরক ঘর খরচ দিয়ে অম্লান মল্লিকাকে বিয়ে করেছে।

টালিগঞ্জের রিজেন্ট পার্কের যে ঘরখানি উত্তরের লেক টাউন জুড়ে আর নিজঘরখানায় মল্লিকার কাছে আরো যে প্রিয়তর সে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিন্তু যে ঘরখানা জুড়ে এত সুখ এবং স্বপ্নের আবেশ মল্লিকার সেই ঘরখানির দেওয়ালে একটা ফাটলের দাগ দেখে মল্লিকা একদিক শিউরে উঠল।

কচি কলাপাতা রং এর দেয়ালের গায়ে লক কালো একটা চিড় খাওয়ার দাগ এলো কোত্থেকে? ঘরের উত্তরের দেয়ালের একপাশে যেখানে ওয়ার্ডরোবটি বসানো সেখানকার দেয়ালের দাগটি মল্লিকার চোখে স্পষ্টতর হয়ে দেখা দিল।

অম্লান খেয়ে দেয়ে অফিস চলে গেলে ওয়ার্ডরোবটি সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার করার সময় হঠাৎ পিছনের দেয়ালে একটা কালো রেখা দেখে চমকে উঠল মল্লিকা। একটা লক ফাটল নীচের থেকে প্রসারিত হয়ে দেওয়ালের উপরের দিকে ক্রমশঃ মাথা তুলছে। আপন মনেই মল্লিকা বললে—কই এতদিন তো ফাটলটা দেখি নি।

আরো আশ্চর্য ওয়ার্ডরোবটা সরাতেই মেঝের নীচে একখানি ফটোর বিবর্ণরূপ মল্লিকার চোখে পড়ল। কই, এ-ফটোর ও তো কোন দিন সন্ধান পায় নি সে।

ফটোখানির দিকে তাকাতে মল্লিকার চোখ দুটি বী বী করে জ্বলে উঠল।

মল্লিকা তো জেনে শুনেই এ ঘরে এসেছে। মল্লিকা তো জেনে শুনেই বিপত্নীক অম্লানকে বিয়ে করেছে। এর জন্যে কোন দ্বেষ বা হিংসা, অসূয়তা বা অশান্তি তো তার মনে ছিল না।

তবে?

এ-ফটো দেখে আজ মনে তার এত জ্বালা কেন? অম্লানকে তো কতবারই প্রশ্ন করেছে তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী সম্পর্কে। অম্লান তার যথাযথ উত্তরও দিয়েছে। প্রথম পক্ষের বিবাহিত জীবন তার স্বামীর সুখের হয় নি; কেননা অম্লানের প্রতি সত্যিকারের আকর্ষণ নাকি উর্মিতার ছিল না। কিন্তু কেন?

অম্লানই বার বার অনুনয় করে বলত—কেন্দ্রটি মল্লিকা সে কথা তুমি জানতে চেয়ো না। তাতে শুধু শুধু আমাকে কষ্ট দেওয়াই হবে। যে গেছে তাকে যেতে দাও। সে আমার জীবনে কটি দুঃস্বপ্নের রাত মাত্র!

মল্লিকা অম্লানের আত্মীয় স্বজনের কাছেও শুনেছে উর্মিতার কথা। দু জনের মধ্যে নাকি একেবারেই বনিবনা ছিল না। কয়েক বছরের বিবাহিত জীবনে তাদের বিচ্ছিন্ন হয়েছিল। অম্লানের সেই অসার্থক দাম্পত্য জীবনে মাধুর্য্য মল্লিকা ভরিয়ে তোলায় প্রকৃতপক্ষে স্বামী তার সুখী।

অম্লান তাই তার প্রথম পক্ষের স্ত্রীর কোন স্মৃতিই ঘরের মধ্যে রাখে নি। কিন্তু ফটোটা আজ হঠাৎ এলো কোত্থেকে?

অম্লানই হয়ত এটিকে সযত্নে কোথাও লুকিয়ে রেখেছিল এতদিন। হয়ত মল্লিকাকে গোপন করে মাঝে মাঝে সে মৃতা প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করে। অসাবধনতায় আজ তা ভুলে ফেলে গেছে। কিংবা থাক সে কথা! মল্লিকা নাই বা ভাবল আর কিছু।

শুধু যে ঘরটি তার জীবন আকাশে চাঁদ হয়ে আছে, সেখানে যদি একটু কলঙ্কের রেখা থাকে সে তো চাঁদেরই কলঙ্ক মাত্র।

ক্ষুদিরাম কলোনীর সিতিকণ্ঠ

আশাপূর্ণা দেবী

বাবা, তারপর ?

বাপের আরো কাছে সরে এসে পল্টন পুলকিত মুখে বলে, তখন তোমরা কী করতে ?

সিতিকণ্ঠ তালিমারা জুতোয় কালি মাখাতে মাখাতে উৎসাহের গলায় বলে, তখন আমরা জরির জামা জরির টুপি পরে হাত জোড় করে সারি সারি ঠাকুর মণ্ডপের সামনে দাঁড়াতাম—।

তোমাদের সকলের জরির জামা ছিল ?

পল্টনের জলজলে চোখে বিস্ময় আর কৌতূহলের দৃষ্টি।

এই দৃষ্টিটুকুর জন্যেই সিতিকণ্ঠর এতো আয়োজন।

সিতিকণ্ঠ কালিমাখা জুতোয় বুরুশ ঘসতে ঘসতে আরো উৎসাহের গলায় বলে, ছিল না ? সকলের ছিল। আমার, দাদার, মানে তোদের জ্যাঠামশাইয়ের, আর ছোটকাকুর। সববাইয়ের। তোদের পিসির জন্যে আসতো জরি বসানো সিল্কের কাপড়, নড়বড়িয়ে পরে বেড়াতো, আর সবাই হেসে হেসে বলতো, 'ধড়াইবুড়ি।'

পল্টনও হেসে ওঠে।

হেসে কুটি কুটি হয়ে উচ্চারণ করে, 'ধড়াই বুড়ি।' বাবা পিসি দাঁড়াতো না তোমাদের সঙ্গে ?

সিতিকণ্ঠ পল্টনের ছোট্ট জুতোটাও টেনে নিয়ে একটু বুরুশ ঘসে দিতে দিতে বলে, পিসি দাঁড়াবে না ? তারতো বেশি আহ্লাদ। তাকে আবার কুমারী পুজো করতে আসতো সবাই।

পল্টন এর আগেও বাবার মুখে এ গল্প কিছু কিছু শুনেছে, তাই 'কুমারী পুজো' রহস্যটা তার একেবারে অবোধ্য নয়, সে গল্পটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তাই বলে, দাঁড়ানোর পর ?

দাঁড়ানোর পর ? দাঁড়ানোর পর ঠাকুরমশাই সকলের হাতে আশীর্বাদী ফুল দিতেন, আমরা মাথায় ঠেকাতাম, তারপর বাজনা শুরু হতো। উঃ যে কী জোর বাজনা। ঢ্যাঙ্কাং ঢ্যাঙ্কাং শব্দ ভিন গাঁয়ে পর্যন্ত চলে যেতো। তারা বলতো, এইবার রায়বাড়ির ঠাকুর উঠবেন। বিসর্জনের বাজনা শুরু হলো।

অন্য গ্রামের লোকেরাও তোমাদের চিনতো ?

পল্টনের চোখে কৌতূহল, কণ্ঠে আনন্দ।

সিতিকণ্ঠ বলে, চিনবে না ? সাতটা গাঁয়ের মধ্যে আমরাই তো সব থেকে বড় জমিদার ছিলাম। আমাদের দুর্গা ঠাকুর সকলের থেকে উঁচু, আমাদের ঠাকুরেরই সব ঠাকুরের আগে ভাসান হবে। রায়েদের ঠাকুর ভাসান না হলে আর কেউ আহুক পিছি ভাসান দিতে ? সাধ্যি ছিল না।

সবাই তোমাদের কথা শুনতো ? সাতগাঁয়ের লোক ?

শুনতো রে শুনতো,—জুতো সাফের সরঞ্জামগুলি একটা কোন্ ভাঙা পুরণো জুতোর বাক্সয় গুছিয়ে তুলতে তুলতে সিতিকণ্ঠ আলো ভরা চোখে তাকিয়ে আর আলোভরা গলার সুরে বলে আমার ঠাকুর্দা নীলকণ্ঠ রায়ের নামে সবাই ভয়ে কাঁপতো। সবাই জোড় হাত।

খুব বুঝি রাগী ছিলেন বাবা তোমার ঠাকুর্দা ?

পল্টন বাবার এই স্মৃতি রোমন্থনের সহায়ক। পল্টন শ্রোতা হিসেবে আদর্শ। কারণ পল্টন জিজ্ঞাসু শ্রোতা।

সিতিকণ্ঠ এক টুকরো কাপড় কাচা সাবান নিয়ে হাতে ঘসে মগের জলে ডুবে ডুবে হা-হা করে হেসে ওঠে, মোটেই না। রাগীর নামও ছিলেন না। তবে রাশভারী ছিলেন খুব। কিন্তু তার জন্যে নয়। মানতো এইজন্যে ঠাকুর্দা সববাইকে সুখে দুঃখে দেখতেন। গরীব বড়লোক সবাই তার কাছে সমান ছিল। গরীবরাই বরং বেশী আদরের। বছরে দু'বার মানে

একবার পুজোর সময় আর একবার মাঘমেলার সময় গ্রামের যতো গরীবকে নতুন কাপড় দিতেন ঠাকুর্দা। ছেলে পুলে বুচো কাচা থেকে বুড়োবুড়ি পর্যন্ত সব।...ঘটির আগের দিন আর ওই মেলার আগের দিন লোকেরা দলে দলে আসতো কাপড় নিতে।

সিতিকণ্ঠ সেই বৃত্তটাকে ছেলের চোখের সামনে ছবির মত মেলে ধরবার আশায় ঘোরানো ভাষার আমদানী করে—উঁচু পুজোমণ্ডপের সামনের সাওয়া তার ওপর নায়েব মশাই বসে, নায়েব মশাইয়ের হাতের কাছে চৌকীতে থাতা কলম পাওয়ার সিঁড়িতে, খুব উঁচু পাওয়াতো এগারোটা সিঁড়ি—।

ইস্! তোমার বুঝি এখনো মনে আছে কটা সিঁড়ি?

মনে থাকবে না?

সিতিকণ্ঠ গভীর গলায় বলে রান্নাঘরের পিছন দেওয়ালে কটা ঘুলঘুলি ছিলো তা পর্যন্ত মনে আছে তা ঠাকুর মণ্ডপ। সিঁড়ি ছিল এগারোটা আর ন'টা খিলেন ছিলো সব খিলেনের মাথায় একটি করে ঠাকুরের মূর্তি। কোনটা মনে নেই। মাঝখানটায় মহাদেব দুপাশে নন্দী-ভৃঙ্গী তার এপাশে—

পল্টন অসহিষ্ণু গলায় বলে, তারপর কী হতো বলো না?

ওই তো—সিঁড়ি ভর্তি করে ওই গরীব প্রজারা দাঁড়িয়ে, মেয়েমানুষরা ঘোমটা দিয়ে একপাশে ব্যাটাছেলেরা আরেকপাশে। ...নায়েব মশাই নাম ডাকছেন, গোপীচরণ, কৈলাশ, ফটিক দুর্লভ ওরা এগিয়ে আসছে আর দুজন চাকরে মিলে কাপড় নিয়ে নিয়ে ঠাকুরদাদের হাতে দিচ্ছে। ঠাকুর্দা আর ছোট ঠাকুর্দা প্রজাদের হাতে দিচ্ছেন। তারা মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করে চলে যাচ্ছে।...এদিকে আমি আর দাদা ছোট্ট ছোট্ট ধুতি শাড়ির থাকের কাছে দাঁড়িয়ে ছোটদের আমরা দিচ্ছি। ...সব পারছি না কিন্তু কিছু কিছু দিচ্ছি। আমাদেরও প্রণাম করছে ওরা বড়দের দেখাদেখি—

তোমাদের দেশে বুঝি ছোট্ট-ছোট্টরাও ধুতি শাড়ি পরত বাবা?

পল্টনের প্রশ্নে সিতিকণ্ঠ গভীর হয়—পরতো! শুধু 'আমাদের দেশ' নয় বাবা, তোমাদেরও দেশ। আজ ভগবানের খেলায় এইখানে পড়ে আছিস তোরা, কিছুই দেখলি না। মুসলমান প্রজাদের কাপড় বাইরের উঠোনে দেওয়া হতো। ওরা তো পুজোমণ্ডপে উঠবে না। তা ওই উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতাম আমরা। বসির বলে একটা বন্ধু ছিলো দাদার, হালিক ঘরামির ছেলে, দাদা না তাকে দু'বার করে কাপড় দিতো—দু'হাতি ধুতি, লুকিয়ে দু'খানা দেওয়া শক্ত হতো না। ঠাকুর্দা ইচ্ছে করে—আমাদের হাত দিয়ে কাপড় দেওয়াতেন। বলতেন গরীবকে হাতে তুলে দেওয়ার আনন্দটা অনুভব করুক। এটা অভ্যেসে এসে যাবে।

কচুপোড়া—

পল্টন হি হি করে হাসে, হাতী অভ্যেস হয়েছে। কই কখন গরীবকে দিচ্ছো তুমি?

সিতিকণ্ঠ বেদনার গলায় বলে, আর বাবা! নিজেই তাই হয়ে বসে আছি এখন।

বাবা বিসর্জনের গল্পটা কই বললে?

বলবো বাবা বলবো, এখনতো আর সময় নেই।

বা: তারপর তোমরা কী রকম করে দুর্গগা ঠাকুরকে নৌকোয় উঠিয়ে বাচ্ না কী খেলা ভাসান করতে?"

সে অনেক বড় গল্প বাবা, তার থেকে এখন ভোজের গল্পটাই বলি—

সিতিকণ্ঠ চান করতে যাবে এখন, আর সময় নেই। তাই সিতিকণ্ঠ তাড়াতাড়ি বলে, পাঁচ দিন ধরে দুটিবেলা বাড়িতে শুধু ভোজ, আর ভোজ। কতো কতো লোক যে খেতে আসতো—

পল্টন যেন এতোক্ষণে এই স্মৃতি গ্রন্থের সব থেকে আকর্ষণীয় অধ্যায়ে এসে পৌঁছেছে, কী খেতে আসতো বাবা?

কী খেতে? সে এক একদিন একরকম। সপ্তমী পূজার দিনে ভাত পায়েস নানা রকম তরকারি ঠাকুর্দা বলতেন, যা যা ঠাকুর খাবেন, তাই তাই ওরা খাবে। ওদের দিতে হবে—

অষ্টমী পুজোর দিন খিচুড়ি তরকারি, এমন রকম ভাজা—

এমন রকম!

পল্টনের চোখ কপালে ওঠে।

এতো রকম খেতে কোথায়?

এই দেখো, পাবার আবার ভাবনা কী! পুরের ভাজা

তো আছেই তাছাড়া আলু বেগুন ঝুমড়ো কাঁচকলা নারকেল আচ্ছা সবগুলো মনে করে করে একটা লিষ্ট করে তোকে দেবো। শুধু কি এই না কি? ওদিকে পায়েস দই, বোঁদে রসকরা মেঠাই, সে একেবারে ছোড়া ছোড়া। ক'দিন তো আমরা ভাত টাত কিছু খেতাম না, শুধু ওই সব খেয়েই থাকতাম।

পল্টন হঠাৎ যেন একটু বিষণ্ণ হয়ে যায়। বাবার দিকে চোখ তুলে বলে, 'তোমাদের অসুখ করতো না?

পল্টন জানে যা কিছু সুখাদ্য বস্তু, খেলে অসুখ করে।

পল্টনের মা তাই বোঝায়।

সিতিকণ্ঠ কিন্তু ছেলের এই ভাবান্তর লক্ষ্য করে না। মহোল্লাসে বলে, অসুখ করবে কেন? সে কি আর দোকানের বাজে ঘীয়ের তৈরী জিনিস বাবা? একেবারে খাঁটি ঘী মরদার।...পুজোর পরে বিজয়ার দিন মিষ্টি বিলোবার জন্যে যে খাজা আর নারকেল ডক্তি বানানো হতো, সে তো আমরা এক মাস ধরে খেতাম। কিছু হতো না।

ঝুলিয়াম কলোনীর সিতিকণ্ঠ রায় নামের লোকটার আর কোনো বিলাসিতা নেই, সিতিকণ্ঠর জুতোয় সাতটা তালি, গেঞ্জির পিঠ ফাঁজরা, ধুতির লড়াদড়া সেলাই শার্টের কলারে ঘুতো ঝোলা।

সিতিকণ্ঠ একখানা ব্রেডে দেড়মাস চালায়, গায়ে বারদোপ মাখে, এবং পাছে তাড়াতাড়ি নাপিত খরচা লাগে তাই যখনি চুল ছাটে, বেশ পুঁছিয়ে কাটে।

নীলকণ্ঠর ট্রামের রাস্তার সুযোগ পেলে কখনো বাসে চাপে না এবং এটা অবধারিত যে ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসটিতেই উঠবে।

নীলকণ্ঠর বাজার করতে সময় লাগে কারণ সব দোকানে দরাদরি করে যেখানে সস্তা পায় সেখানে কেনে। সিতিকণ্ঠ বাইরে থেকে এসেই ধুতিটি সাবধানে তুলে রেখে লুঙ্গি পরে আর খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কথাটি কয় না। যা পায় লোনাজলে মুখ করে খেয়ে নেয়? সিতিকণ্ঠ একলা ওদের জন্যে জল স্থল কলোনীর যেটুকু জমি দখল করতে পেরেছিল তার থেকে এই ছ্যাচা বেড়ার ঘর দুখানা বাদে যে জমিটা উদ্বৃত্ত আছে তাতে শাক বেগুন ঢ্যাড়শ কুমড়ো লাগিয়ে গেরস্থর সাহায্য করে। এবং এর জন্যে নিজে হাতে মাটি কোপাতেও কুণ্ঠিত হয় না। সিতিকণ্ঠ বড় পরিশ্রমী। কিন্তু এই এক বিলাসিতা সিতিকণ্ঠর।

এই স্মৃতি রোমন্থনের বিলাসিতা। যেন নেশার মত।

তা শুধু যে নিজ মনেই রোমন্থন করবে বলে কলে, তা নয়, ওই ছ' বছরের ছেলেটাকে ধরে ধরে শোনানো চাই। শুনিয়ে শুনিয়ে তাকেও নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। বড়টা মেয়ে, পল্টনের থেকে প্রায় পাঁচ ছ' বছরের বড়, সে এদিক মাড়ায় না। তাকে তো আবার মায়ের কাজের সাহায্য করতে হয়।

পল্টন বাবার সঙ্গেই ইস্কুল যায়, তাই বাবার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হবার প্রশ্ন নেই। বাবা যে ইস্কুলে পড়ায়, পল্টন সেই ইস্কুলে পড়ে। কলোনীর এই ইস্কুলটার মাষ্টারী পেয়ে গিয়েছিল বলেই তবু দাঁড়িয়ে আছে সিতিকণ্ঠ।

কিন্তু সিতিকণ্ঠকে দেখলে মনে হয়, তার যেন অন্য কোথাও অন্য কোনোখানে দাঁড়াবার একটা ভাল ব্যবস্থা আছে। এটা দামরিক, এটা দৈব ক্রমের ব্যাপার।

সিতিকণ্ঠ তাই হ্যারিকেনের চিমনি ঘুছতে ঘুছতে, কি বেড়া বাঁধবার বাখারি চেরাই করতে করতেও অনায়াসেই গল্প করে চলে, পুণ্যের দিনকে আমরা সবাই ছুড়ি শাড়ি ছেপে প্রায় প্রদক্ষিণ করতে বেরোতাম। পুণ্যের দিন মানে কী জানিস? চৈত্র সংক্রান্তির দিন।

সেদিন প্রজারা আমাদের নজর দিতো—মানে ঠাকুর্দাদের দিতো, আমরা সঙ্গে যেতাম।

পল্টন ভুরু কুঁচকে বলে, 'নজর।' এ যা বুড়ো বাড়িদের আবার নজর দেবে কী? নজর তো ছোট ছেলেদের দেয়। ভাইনী বুড়িরা যদি ওদের একলা দেখে—

কথা অবশ্য শেষ করতে পারেনা পল্টন, বাবা তো ততক্ষণ হাসতে শুরু করে দিয়েছে।

আরে বাবা। এ সে নজর নয়। এ হচ্ছে রাজার নজরের সামনে প্রণামী ধরে দেওয়া। যেমন তোর মা মন্দিরে টাঁজরে ঠাকুর প্রণামী দেয়—

আহা তোমাদের ঠাকুর্দা বুঝি ঠাকুর ছিলেন?

পল্টনের কণ্ঠে সন্দেহ।

কিন্তু সিতিকণ্ঠ এ সন্দেহ রাখতে দেবে না কি?

সিতিকণ্ঠ তার শুকনো শুকনো পেশীবহুল মুখে রহস্যের লাবণ্য ভরা হাসি হেসে বলে, তা ওদের কাছে ঠাকুরই ছিলেন। দেশের জমিদারকে রাজাই বলতো ওরা, আমাদের বাড়িটাকে রাজবাড়ি।··তা সেই 'নজর' আদায় করতে দুড়ি গাড়ি করে বেরোতাম আমরা, আমি দাদা ঠাকুর্দা ছোট ঠাকুর্দা, আর গাড়ির মাথায় নায়েব মশাই। কোচুয়ানের পাশে। কোচুয়ান চুপটি তুলে স্যাট ছাট শব্দ করতে করতে গাড়ি চালাতো কদমে কদমে। ঘোড়াদের পায়ের আওয়াজ উঠতো খট খট, আর প্রজারা বেরিয়ে আসতো যে যার বাড়ি থেকে।

হাতে থালায় করে একটা আস্ত নারকেল আর কিছু টাকা। যার যা সামর্থ। কেউ একটাকা দু টাকা দিতো, কেউ পাঁচ দশ। সে টাকা তো আর এই এখনকার মত একটুকরো কাগজ নয় বাবা, তোর যার লক্ষ্মীর ঘটে যে টাকাটি আছে সেই রকম রুপোর টাকা। তার কিনারায় সিঁদুর মাখিয়ে আনতো ওরা, ওই নিয়ম। ভোরে বেরিয়ে বেলা···রোদ্দুর উঠে যেতো। ঝকঝকে কাঁসার থালার ওপর ঝকঝকে নতুন টাকা রোদ পড়ে ঝলসাতো, নায়েব মশাই গাড়ির মাথা থেকে নেমে এসে এসে সেই টাকা আর নারকেল হাতে করে নিয়ে গাড়ির ভেতর ঢেলে দিতেন।···যখন ফিরতাম আমরা গাড়ির মধ্যেটায় পায়ের কাছে তো নারকেল জমতো, সেগুলো দেবু আর কানাই পাঠক এসে তাড়াতাড়ি না নামিয়ে নিলে আমরা ছোটরা নামতেই পারতাম না।

ওরা কে বাবা ? ওই দেবু আর কানাই ?

বাঃ। ওরা হচ্ছে তো বাড়ির চাকর।

অনেক অনেক চাকর ছিলো তো তোমাদের, না বাবা ?

বেশ লেগে যাওয়া দু'বছরে ছেলেটাও যেন আগুনে বাতাস দেয়।

সিতিকণ্ঠর কণ্ঠস্বর যেন সুদূর থেকে ভেসে আসে, সিতিকণ্ঠর কোটরগত চোখ দুটোর দৃষ্টি যায় হারিয়ে কোন এক চৈত্র সংক্রান্তির ঝকঝকে সকালের পৃষ্ঠপটে। যেখানে নম্র বিনীত প্রজারা ঝকঝকে কাঁসার থালায় করে বয়ে আনে ঝকঝকে নতুন টাকা, তাদের রাজার পদপ্রান্তে নামিয়ে দিয়ে কৃতার্থ হতে।

যেখানে গাড়ি থেকে নামার সময় সেইটাকার বোঝা থলির মধ্যে বসে ঝন ঝন করে বাজে। কর্তাদের সঙ্গে যে ছোট ছেলে দুটো দুড়ি থেকে নামে, তাদের সাধ্য কী যে ওই থলিটা একটু তোলে।

এসা তোমাদের গায়ে বুঝি জোর ছিল না ?

পল্টন সেই অদৃশ্য অতীতের দুটো ভাগ্যবান ছোটছেলেকে ধিক্কার দিয়ে বসে, একেবারে দুবলা ছিলে বুঝি ?

দুবলা ? মোটেই না। আমরা না ডন্‌বৈঠক শিখতাম। তাহলে কী হবে সে যা ভারী ! কানাই পাঠকই নামিয়ে দিয়ে বলতো উঃ।

সিতিকণ্ঠ এদিক ওদিক তাকিয়ে চটকরে বলে ওঠে, আচ্ছা তোর গায়েতো খুব জোর ?

নিশ্চয়। আমি তো দিদিকে হারিয়ে দিতে পারি।

আচ্ছা, তাহলে তুমি যা সোনা ওইটা নিয়ে এসেতো এদিকে, দেখি কেমন পারো।

সিতিকণ্ঠ গতকাল সন্ধ্যের অনেকক্ষণ লাইন দিয়ে যে আধমন কয়লা সংগ্রহ করেছে, উঠোনের কোণে রাখা সেই থলিটার দিকে আঙুল দেখায়।

পল্টন লাফিয়ে নেমে গিয়ে সেটাকে তুলতে চেষ্টা করে, এবং স্বাভাবিক কারণেই এক ইঞ্চিও সরাতে না পেরে সন্ত্রাসে বলে ওঠে, বাঃ এতো কয়লা।

সিতিকণ্ঠ হাহা করে হেসে ওঠে ! কয়লাই হোক আর টাকাই হোক, ভারী বলে কথা। আমি যে বাপু তখন তোমার মতই ছোট ছিলাম।

সিতিকণ্ঠর হাসির শব্দে গৌরী রান্নাঘরের দিক থেকে বেরিয়ে আসে। ছেলেকে কয়লার বস্তার মুণ্ডু চেপে ধরা অবস্থায় দেখে বলে ওঠে, কী হল ?

পল্টন বলে, বাবা বলছে, বাবার ঠাকুর্দার নজর লাগা টাকা না কি এর থেকেও ভারী !

নজর লাগা ?

সিতিকণ্ঠ আবার হেসে ওঠে, নজর লাগা কীরে পাগলা ? নজরের টাকা। ওরা বলতেন নজরানা।

কিন্তু এখন আর সিতিকণ্ঠর হাসিতে সে জোলুস ফোটেনা।

গৌরী একবার পরিস্থিতিটার দিকে কঠোর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আরো কঠোর গলায় বলে, যাও, দিদির কাছে সাবান চেয়ে নিয়ে হাত ধুয়ে ফেলোগে।

পল্টন একবার বাবার দিকে আর একবার মার দিকে তাকিয়ে আস্তে মাথা নীচু করে চলে যায়। যেন সেও কোন অপরাধের নায়ক। অন্তত সে নায়কের সঙ্গীতো বটেই।

গৌরী সেইখানে বসে পড়ে।

গম্ভীর কঠোর গলায় বলে, আবার তুমি ছেলের কাছে তোমাদের সেই রাজাই আমলের গল্প করছো?

গৌরীর কথায় ধরা পড়ে পিতাপুত্রের এটা নিষিদ্ধ আলোচনা।

সিভিবণ্ঠ যেন গৌরীর কঠোরতা অনুভব করেনি, তাই সিভিবণ্ঠ কাটা বাখারির দু'খানাকে দাঁড় করিয়ে মাপ সমান হলো কিনা দেখার ভানে অন্যমনস্ক গলায় বলে ছেলেটা গল্প বলো গল্প বলো করছিলো, হাতে কাজ করতে করতে—

থামো!

গৌরী ধমকে উঠে বলে, ভাকামী করোনা। জগতে আর গল্প নেই? সেই তোমরা কবে কী খেয়েছো তার গল্পই না বললে নয়? কতোদিন ধারণ করেছি? কতোদিন?

সিভিবণ্ঠ যে দারুণ অপ্রতিভ হয়ে গেছে তা তার মুখটা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এখন, তবু সিভিবণ্ঠ মুখ দাপোট করে, বলে, তাতে কী হয়েছে বাবা? মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে?

ওসব কথা রাখো—

গৌরী খুব স্থির গলায় বলে, আজ তোমায় আমার কাছে স্পষ্ট করে বলতেই হবে। যেটা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনা বারবার বারণ করি, সেটাই বা তুমি আমার চোখের আড়াল হলেই করো কেন? 'কেন' সেটা না শুনে ছাড়বোনা আমি।

কী মুস্কিল!

সিভিবণ্ঠ যেন নিরুপায়ের গলায় বলে, এতো আচ্ছা ফ্যাসাদ! এর আবার কেন কী? তোমার যখন এতো গল্প টল্প জানিনা বাবা, ছেলেটা গল্প গল্প করে—

গৌরী একটুক্ষণ স্বামীর দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে বলে, আমায় তুমি ওসব বলে ভোলাতে পারবে না। তোমার এই মনোবৃত্তির রহস্য আমায় ভেদ করতেই হবে। কলোনীর এই ছ্যাঁচবেড়ার ঘরে বাস করে ওই সব রাজা-রাজড়াই গল্প করতে তোমার লজ্জা করে না?

সিভিবণ্ঠ এবার হাতের জিনিসগুলো ফেলে সোজা হয়ে বসে বলে, লজ্জা করে। তবু—বলি এই ভেবে, ছেলেটা যাতে না ভাবে বাপটা চিরকালই এমন হতভাগা ছিলো। চিরকালই ছ্যাঁচা বেড়ার ঘরে বসে তালিমারা জুতোয় কালি লাগাতো।

সেইটা না বুঝলেই তোমার খুব গৌরব?

সিভিবণ্ঠ এবার রেগে ওঠে।

সেই রাগের গলায় বলে, অগৌরবই বা কিসে? সেই রাজার সম্পত্তি কি আমি মদ ভাঙ খেয়ে আর স্বভাব চরিত্র খারাপ করে উড়িয়েছি? ভাগ্যদোষে সর্বস্বান্ত। দেশভাগ না হলে—

দোহাই তোমার! এখনো আর কবর খুঁড়ে শোক কোরোনা। নিজেও ভুলতে চেষ্টা করো, ছেলেটাকেও রেহাই দাও। ওকে জানতে দাও ও এই কুদিরাম কলোনীর ছেলে। ওকে এখান থেকেই বড়ো হতে হবে। আমি তোমায় বলে দিচ্ছি জীবনে আর কখনো যেন তোমার মুখে ঐ পচে গলে যাওয়া সৌভাগ্যের গল্প না শুনি।.....

কখনো বলবে না তুমি আমার ছেলেকে। দুম্ দুম করে চলে যায় গৌরী।

সিভিবণ্ঠ প্রতিবাদের ভাষা ভুলে যায়।

সিভিবণ্ঠ যেন বোবার মতো অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে গৌরীর ওই দৃঢ় পদক্ষেপের দিকে।

এতো রাগের কী আছে?

সিভিবণ্ঠ ভেবে পায় না এমন উল্টো দিক থেকে দেখে কেন গৌরী?

গৌরীর দৃষ্টিভঙ্গী বুঝতে পারে না সিভিবণ্ঠ।

অথচ নিজের কথাটাও বোঝাতে পেরে ওঠে না। গৌরী কান দেয় না। গৌরী রেগে আগুন হয়ে ওঠে।

কিন্তু কেন?

ভাগ্য বিপর্যয়ে আজ হতভাগা সিতিকণ্ঠ এই ফুলিয়ার কলোনীর বাসিন্দা বলে, সেই পরিচয়ই তার শেষ পরিচয়? ছেলের কাছেও নিজের সত্যকার পরিচয় দিতে পারবে না সিতিকণ্ঠ?

সিতিকণ্ঠ তো অন্যের কাছে বলতে যাচ্ছে না, নিজেরই যে রুচি নেই, কিন্তু পল্টন? তাকেও কি জানতে দিতে পারবে না, তুই কোন বংশের ছেলে: কতো বড়ো ঐতিহ্য তোর!

সে জানবে, সে শুধু মূলহীন ঘাটহীন একখণ্ড স্রোতের ফাওলা মাত্র? এই ফুলিয়ার কলোনীই তার শেষ কথা, গোড়ার কথা! নীলকণ্ঠ রায়ের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই তার।

"ধ্বংস করার কাজে কোন কৃতিত্বের প্রয়োজন নাই। বাঙালী আজ এতে পটু হয়ে উঠেছে। যুদ্ধ চালাবে অথচ শৃঙ্খলা মানবে না। পৃথিবীতে এমন অদ্ভুত সমরায়োজন আর কুত্রাপি দেখা যায়নি। বাঙালীর যুদ্ধ বাহিরের কোন শত্রুর সঙ্গে নয়, পরস্পর নিজের সঙ্গে, পরকে উপলক্ষ্য করে, ব্যক্তিগত স্বার্থ বজায় রাখার জন্য ওরা অবিরত শান দিচ্ছে ছুরিতে, সেই ছুরিও কোন ধাতুর তৈরী নয়, ধূলা ও কাদা দিয়ে তৈরী সেই অস্ত্র। বন্ধুকে বন্ধুকে বয়স্যকে মানব না। পরস্পরের কাঁধে চড়ে তার উপর কাদা ছুঁড়বো—এই মনোবৃত্তি থেকে কোনও কল্যাণ আসতে পারে না। পুরুষের চিত্তবৃত্তি ও নারীর হৃদয়বৃত্তির মিলনে যে সভ্যতা গড়ে উঠবে তাই হবে প্রকৃত সভ্যতা তার উদ্যোগ হয়েছে এতদিনে। মেয়েরা এতদিন তাদের দীনতা, মূর্খতা অজ্ঞতা অক্ষমতা মেনে নিয়েছে। সেই মেয়েরা এখন যদি বলে যে, সমাজ ও সভ্যতা সৃষ্টিতে তাদের কাজ করতে হবে তবে তাদের তা করবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে।"

—রবীন্দ্রনাথ

এপার ওপার

—নরেন্দ্রনাথ মিত্র

প্রবাসিনী বান্ধবীর চিঠিখানা পেয়ে মন খারাপ হয়ে গেল সরিৎ শেখরের।

নিউইয়র্ক থেকে অঞ্জনা লিখেছে

সরিৎ,

অনেকদিন তোমার চিঠি পাইনি। এর আগে তোমাকে চিঠি লিখেছি হিসেব করে ঠিক পয়লা বৈশাখের তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে তোমাকে কার্ড পাঠিয়েছি। তোমার কোন খবরই পেলাম না। অথচ এই তুমি আগে কত চিঠি লিখতে। আজকাল একেবারে বদলে গেছ।

তিনবছর বাদে এবার কলকাতায় গিয়েছিলাম। ছিলামও পুরো দুটি মাস। কিন্তু মনে হল আমি যেন বিদেশ থেকে আর এক বিদেশে গিয়েছি। সেই কলকাতা আর নেই। তার রাস্তাঘাট বদলেছে কোথাও দেখতে ভাল হয়েছে, কোথাও বা অবস্থা আরো খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু সব চেয়ে বদলেছে মানুষ, সবচেয়ে বদলেছে আমার আত্মীয় বন্ধুরা। সেই পরিবর্তনটাই বেশী চোখে পড়ে, গায়ে লাগে, মনে বেঁধে। নইলে অন্য পরিবর্তনের কথা আমরা সহজ-ভাবে মেনে নিই। বলতে গেলে এই পরিবর্তনশীলতার মধ্যেই আমরা বাস করি বয়সের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের নিজেদের শরীরের পরিবর্তন হয় রুচির পরিবর্তন হয়, অবস্থার পরিবর্তন হয়। আশেপাশের লোকজনও ঠিক তেমনি করেই বদলায়। সেই পরিবর্তন আমরা অনুভব করতে পারিনে। কিন্তু ভালোবাসার ক্ষেত্রে, বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন তাতে আমাদের মন অসাড় হয়ে যায়। মনে হয় একটি প্রীতির ঝরণা হঠাৎ শুকিয়ে গেছে। একটি স্নিগ্ধ শীতল স্রোতস্বতী হঠাৎ মরুভূমির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে।

বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে অনেকের ঔদাসীন্যকে আমি সহজ-ভাবেই মেনে নিয়েছি। তারা আমার কাছে যা চেয়েছিল তা দেওয়ার আমার সাধ্য ছিল না। তাই তারাও দূরে সরে গেছে আমিও দূরে সরে এসেছি। কিন্তু সরিৎ তোমার আমার মধ্যে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং এর কোন ভুল হয়নি, আমরা পরস্পরের বন্ধু : শুধু বন্ধু। অকৃত্রিম বন্ধু। আমরা দুজনেই নারী পুরুষের এই বন্ধুত্বে বিশ্বাসী। একটি ছেলের সঙ্গে আর একটি ছেলের যে বন্ধুত্ব, একটি মেয়ের সঙ্গে আর একটি ছেলের যে বন্ধুত্ব, একটি মেয়ের সঙ্গে আর একটি মেয়ের যে বন্ধুত্ব আমাদের বন্ধুত্বের স্বাদ নিশ্চয়ই তার চেয়ে আলাদা। ভাইয়ের সঙ্গে বোনের যে সম্পর্ক, এমনকি কাজিনদের মধ্যে যে সম্পর্ক আমাদের সম্পর্ক তার চেয়ে, স্বতন্ত্র। এই বৈবম্য আর বৈচিত্র্য আমরা দুজনেই উপভোগ করেছি, সম্ভোগ করেছি। কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে এই নিয়ে কত কথা আমাদের মধ্যে হয়েছে। তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই।

বিদেশে এসে সম্পর্কের এই স্বাদ-বৈচিত্র্য আমি আরো বেশী করে দেখেছি। নাচ টাচ নিয়ে, আছি জানোইতো। সেই সূত্রে বহু বিদেশীর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় বন্ধুত্বও হয়েছে। মেয়েদের সঙ্গেও হয়েছে, ছেলেদের সঙ্গেও হয়েছে। আমার পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে অনেক যুবক আছেন, প্রৌঢ় আছেন, বৃদ্ধও আছেন। তাঁরা অনেকেই নৃত্যগীত বাদ্যে গুণী জ্ঞানী মানী। বাইরে আমার বন্ধুর অভাব নেই। ঘরেও আমার স্বামী আমার বন্ধু। তুমি তো জানো বিয়ের আগে তিনি আমার বন্ধু ছিলেন। বিয়ের পরেও তাই আছেন। শুধু একটি অতিরিক্ত দপ্তরের ভার তিনি পেয়েছেন এই মাত্র। আমার আট বছরের মেয়ে শান্তা তার সঙ্গেও আমি বন্ধুত্বের সুখ অনুভব করি।

কিন্তু ঘরে বাইরে দেশে বিদেশে আমার এত বন্ধু থাকা

সত্ত্বেও কলকাতার মদন মিত্র লেনের একটি বন্ধুর কথা আমি ভুলে থাকতে পারিনে। সে ব্যবহারিক অর্থে কৃতী পুরুষ নয়। যে শিল্প মাধ্যম নিয়ে আমার কাজ তা সে উপভোগ করে মাত্র তার অংশ গ্রহণ করতে পারে না। প্রচলিত অর্থে সে আমার জীবন সঙ্গীও নয়, নৃত্যসঙ্গীও নয়। তবু সঙ্গী একজন, পরম সঙ্গী। তার সান্নিধ্যে আমি তার হৃদয়ের উত্তাপ অনুভব করি। তার সাহচর্যে আমি আর একটি বস্তুর স্বাদ পাই। হাসবে না তো সরিৎ? এতকাল বাদে তোমাকে খোসামোদ করবার আমার কোন দরকার নেই। সত্যি বলছি তোমার সঙ্গ আমাকে সাধুসঙ্গের স্বাদ দেয়।

জানোতো, সাধু সন্ন্যাসী, গবেষকদের সম্বন্ধে মেয়েদের একটা দুর্বলতা থাকে। আমিও হয়ত সেই দুর্বলতা থেকে পুরোপুরী ভিন্ন নেই। কিন্তু বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে ঠাট্টা আমার ছাড়া সত্যি সত্যি কোন জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে আমি নব জেনে এসেছি। ঘটা করে সাধু সন্ন্যাসীদেরও আমি দেখতে চাইনি। আমাদের মতই তারা গৃহী সংসারী সাধারণ মানুষ। তাদের কারো কারো মধ্যে আমি অসাধারণের সাক্ষাৎ পেয়েছি। সততা ও মহত্ত্বের স্পর্শ পেয়েছি। সরিৎ, তুমি আমার সেই সৎ আর সহৃদয় বন্ধু।

কিন্তু এবার দেশে ফিরে গিয়ে দেখলাম তুমিও যেন বিদেশী হয়ে গেছ। এবার গিয়ে তোমার, সান্নিধ্য যেন পেলাম না। কাছে গিয়েও দেখলাম তুমি সাত সমুদ্র তের নদীর ওপারেই রয়েছ। গিয়ে দেখলাম তুমি বড় এক-জামিনার হয়েছ। তোমার ঘরে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীদের ভিড়। তোমার ঘরে পর্বত প্রমাণ খাতার স্তূপ। কতদিন পরে রবীন্দ্র সদনে একটা নাচের অনুষ্ঠান করলাম। কলকাতার মেকেও তুমি তাতে আসতে পারলে না তুমি এত ব্যস্ত। আগের চেয়ে অনেক বেশী সংসারী হয়েছ। স্ত্রী পুত্র কন্যা পরিবৃত গৃহসুখে তুমি আবদ্ধ, পরিতৃপ্ত সেই গৃহের কোন জানলা নেই, দরজা নেই। কি থাকলেও তুমি সেগুলিতে খিল এঁটে দিয়েছ। মনে হয় তুমি আজ মগ্ন আত্মতুষ্ট। বাইরের কাউকে দিয়ে তোমার কোন প্রয়োজন নেই।

সংসারকে আমিও ভালবাসি। স্বামী সন্তানকে নিয়ে গড়া সংসার কি ভালো না বেসে পারি। মেয়ে তো আমি। বাইরে বাইরে ঘুরি বলে কেবলা সংসারের দিকে টান নেই। কিন্তু সেই টানই যদি আমার একমাত্র টান হত তাহলে আমার নাচ কবে বন্ধ হয়ে যেত। আমি তা বন্ধ হতে দিইনি। এখন পর্যন্ত আমি, শ্যামও রেখেছি কুশও রেখেছি। আমার এই দুই প্রেমের মধ্যে বিরোধিতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই।

সরিৎ তোমাকে আগে বলেছি, এখনও বলি তোমার একবার বাইরে আসা দরকার। ঘরের বাইরে, দেশের বাইরে, দেখো তো, বিদেশে না এলে দেশকে ভালো করে চেনা যায় না, ভালোও বাসা যায় না। স্বপন বন্ধুদের ভালোবাসার মধ্যেও মাঝে মাঝে বিচ্ছেদ বেদনার রস ঢেলে দিতে হয়।

আমার এখানে চলে এসো। কত রকমের কত ব্যবস্থা আছে, কত স্কলারশিপ টলারশিপ আছে এখন একটা কিছু জুটিয়ে নিয়ে চলে এসো। প্যাসেজ মানিটা যদি কোনরকমে যোগাড় করতে পার, আমার এখানে এলে তোমার তো কোন আর খরচের দরকার হবে না। আর যদি প্যাসেজ মানিটাও সংগ্রহ করা তোমার পক্ষে সম্ভব না হয় তুমি আমাকে লিখবে, আমি ব্যবস্থা করব।

একবার তোমাকে তোমার ওই মদন মিত্র লেনের বাইরে দেখতে চাই। তুমি তোমার ওই অনুবিশ্ব থেকে বৃহৎ বহির্বিশ্বে এসে দাঁড়িয়েছ—প্রত্যক্ষ করতে চাই।

রাগ করলে না তো! করলেই বা একটু রাগ। তোমার মত ঋষিতুল্য মানুষেরও অনুরাগরঞ্জিত মুখ কখনো কখনো চোখে পড়েছে কিন্তু কুপিত ক্রোধ বাহিত মুখ কখনো দেখেনি। এই ফাঁকে না হয় একটু দেখে নিলাম। বৌদি আর টিঙ্কি বন্ধুরা কেমন আছে? ওদের প্রীতি ও স্নেহাশীর্বাদ জানাই।

ভালবাসা নিয়ো। এবারও যদি নিরুত্তর থাকো তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব ছেদ হবে। বিবাহ বিচ্ছেদের চেয়েও তা তীব্রতর।

ইতি—
তোমার অরু

সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য চিঠির জবাব দিতে বসলনা সরিৎ। পরে দেবে।

বীথিকা চায়ের কাপ হাতে ঘরে ঢুকে বলল আর বুঝি তোমার আবার সাগর পারের চিঠি এসেছে। কী লিখেছে?

সরিৎ বলল 'পড়ে দেখ।'

বীথিকা বলল, 'ওরে বাবা অত সময় আমার নেই।'

উহুন জ্বলে যাচ্ছে খুব লম্বা চিঠি লিখেছে দেখছি। চিঠি তো নয় যেন গল্পের ম্যানুস্ক্রিপট। কত ডলার খরচ করেছে কে জানে? তুমি কিন্তু আমার ছেলে-মেয়ের জন্যে ষ্ট্যাম্প খাম রেখে দিয়ো। চিঠির ভিতরে রস-টস যা আছে সব তোমার।

আবার তাক টিকিটখানা পেলেই সন্তুষ্ট।'

বীথিকা চলে গেল রান্নাঘরে। কলেজ ফেরৎ স্বামীর জন্য বিকালের জলখাবার তৈরি করবে। ছেলেমেয়ে দুটিকে সাজিয়ে গুজিয়ে পার্কে বেড়াতে পাঠিয়েছে।

সরিৎ চা খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবতে লাগল। অন্য সাগর পার থেকে আবার তাকে হাতছানি দিয়েছে এসো চলে এসো। আগে আগে এই ডাকে সরিতের মন চঞ্চল হত। এখন আর তা হয় না। সরিৎ বুঝে নিয়েছে বিদেশে যাবার কোন সম্ভাবনাই আর নেই। যদিও ইউরোপ আমেরিকা এখন কারো কারো কাছে জলভাত এ পাড়া ও পাড়ার ব্যাপার। কিন্তু সরিৎ কোন দিন কয়েক হাজার টাকার ওই পথের কিছুতেই জমাতে পারবে না। বাইরে যাওয়ার খুব একটা ইচ্ছা কি আগ্রহও এখন আর সরিতের নেই। মানুষ শেষপর্যন্ত নিজের অবস্থা আর সামর্থ্যের সঙ্গেই নিজেকে মানিয়ে নেয়। নিজের রাজ্য নিজে গড়ে নিয়ে সেখানে রাজত্ব করে। অদ্ভুত কথা ভাবছিল সরিৎ। এই সহশায়িনী বান্ধবীর সঙ্গে তার সম্পর্কটা সত্যিই একটু অন্যরকম। ধনীর ঘরের—অন্ততঃ সরিতদের চেয়ে অঞ্জনা চক্রবর্তীরা কয়েক গুণ ধনী তো বটেই। এই মেয়েটির সঙ্গে সরিৎ যে খেলা খেলা করেছে তা দুজনের অবস্থাগত বৈষম্যের কথা মনে রেখেই করেছে। সরিৎ সব সময় মনে রেখেছে তারা এক ক্লাসে পড়লেও সমাজের এক স্তরের বাসিন্দা নয়। তাছাড়া এই দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি অল্প বয়স থেকেই উচ্চাভিলাষী। সরিৎ তাই ওর রূপে আকৃষ্ট হয়েছে, গুণে মুগ্ধ হয়েছে কিন্তু অন্য বন্ধুদের মত কখনোই আত্মহারা হয় নি। অঞ্জনা এমন ভাবে কথা বলত যেন প্রতিটি বাক্যই ওর প্রণয়ভাষণ। অঞ্জনার প্রতিটি কথাই যেন প্রেম বহন। প্রতিটি আচরণের মধ্যেই যেন অনুরাগের প্রকাশ। বন্ধুদের মধ্যে এই ব্যবহারকে স্বাভাবিক সৌজন্যপূর্ণ সদ্ব্যবহার। এও যেন তার ললিত কলার নৃত্য কলার অন্যতম অঙ্গ। ওর বন্ধুরা এই আদার আচরণের মধ্যে নিজেদের ইচ্ছা অভিলাষের রঙে রাঙিয়ে ভিন্ন অর্থ ভরে দিত। এই উচ্চাকাঙ্ক্ষিণীর যারা প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হয়েছে তারা শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়ে ফিরে এসে অঞ্জনার অখ্যাতি রটিয়েছে। নিম্নমধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে সরিৎ করগুপ্ত। সস্তা মেস হোটেলে থেকে প্রতিটি টাকা তাকে হিসাব করে খরচ করতে হয়েছে। তেমনি হৃদয়াবেগের ব্যাপারেও সে হল মিতব্যয়ী। অঞ্জনা আর তার বন্ধুর দল যে সময় উচ্ছলতা উদ্বেলতায় দিন কাটিয়েছে সরিৎ তখন একটু দূর থেকে ওদের ওই রঙ্গলীলা দেখত। তরঙ্গ ভঙ্গে প্লাবিতও হত না আহতও হত না।

'অঞ্জনা তার এই নির্লিপ্ততা দেখে জিজ্ঞাসা করত, 'সরিৎ, তুমি কোন ধাতুতে গড়া বলতো?'

সরিৎ জবাব দিত, 'তামা কাঁসা পিতল—ওই রকমই একটা নিরেট ধরণের ধাতু টাতু হবে।'

অঞ্জনা বলত, 'উঁহু, তুমি অষ্টধাতুর মূর্তি।'

স্বভাবের এই বৈপরীত্যই হয়তো অঞ্জনাকে আকর্ষণ করে থাকবে। মেয়েরা যেমন আদর-অনুরক্তকে ভালো-বাসে তেমনি উদাসী বিরাগীর দিকেও তারা এক ধরণের আকর্ষণ বোধ করে।

তারপর কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলি পার হয়ে অঞ্জনা ঢুকল নাচের আসরে। নাচের শিক্ষা তার ছোটবেলা থেকেই। বাইরে তাতে যত ছলাকলাই থাক নৃত্যকলায় নিষ্ঠা তার চিরদিনই অবিচল। সরিৎ নৃত্য

শিল্পের বড় সমঝদার নয়। কিন্তু এই নিষ্ঠাবতীকে সে অকৃত্রিম শ্রদ্ধা করেছে। দর্শকের আসন থেকে, দর্শকের দৃষ্টিতে দেখে ভালোবেসেছে যে ওই নৃত্যশিল্পীকে। সেখানেই অঞ্জনার নাচের অনুষ্ঠান হয়েছে সরিৎ নিমন্ত্রণের কার্ড পাক আর না পাক, সেখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। চড়া দামের টিকিট কেটেও ওর নাচ দেখেছে।

নৃত্যসাথীদের নিয়ে ছাত্রীদের সহকারিণীদের নিয়ে যখন দল গড়ল অঞ্জনা সরিৎ সেই দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে না থেকেও তার সব রকম সহায়তা করেছে। প্রচারের কাজে রয়েছে প্রচার সচিব, কাগজের অফিস গুলিতে ছুটোছুটি করে অনুষ্ঠানের পূর্বাভাস আর সুষ্ঠু সমালোচনা বার করেছে। স্কেচগুলি সরিতেই পরিকল্পনাতেই প্রকাশিত হয়েছে।

অঞ্জনা বারবার উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছে তুমি নির্লোভ তুমি নিস্বার্থ, সরিৎ তোমার তুলনা নেই।

সরিৎ জানে ব্যাপারটা তা নয়, আসলে লোভ করবার মতো শক্তি তার নেই। সাহসের অভাব। তবে অল্প বয়স থেকেই মনের দৌড় যে কোন মনজিদ পর্যন্ত তা সে বুঝে নিয়েছে। সে নিরাসক্ত নিশ্চয়ই নয়। তবে উচ্চ বৃত্তিকে ঘৃণা করবার মতো মর্যাদা বোধ তার আছে।

এই মর্যাদা বোধ যেমন তাকে ক্ষুদ্র ঈর্ষা, ক্ষুদ্র লোভ থেকে রক্ষা করেছে তেমনি তাকে অনেকের কাছ থেকে, দূরেও সরিয়ে দিয়েছে। কেউ বলেছে সরিৎ অস্থায়ী, ধান্ধিক। সাধারণ একজন বাংলার অধ্যাপকের অত দম্ভ মানায় না কেউ বলেছে নানা রকমের দুর্বলতা আছে বলেই সে অমন আত্ম গোপন করে থাকে। অপরাধী না হলে সে এমন করে কেয়ারী হবে কেন?

সরিৎ কোন প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে যায়নি জীবন যেখানে কর্মময় কোলাহল মুখর সেখান থেকে সে পালিয়ে এসেছে।

তার সহপাঠিনী উচ্চাভিলাসিনী বান্ধবী সম্পূর্ণ ভিন্ন-মার্গ চারিণী। দেখে শুনে নানা রকম যাচাই বাছাইয়ের পর অঞ্জনা একজন অধ্যাপককেই বিয়ে করেছে। তিনি সরিৎএর মত নন তিনি উচ্চাভিলাষী, সকল কৃতী দেশ থেকেই বিদেশকেই কর্মস্থান হিসাবে বেছে নিয়েছেন। এই নির্বাচন ভুল হয়নি। সেখানে তাঁর নাম হয়েছে, যশ হয়েছে নিজস্ব বাড়ি গাড়ি সব হয়েছে। অঞ্জনাও শুধু ঘরণী হয়ে থাকবার মেয়ে নয়। নিজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাকে সে দিনের পর দিন বাড়িয়ে নিয়ে চলেছে। দেশে দেশে ভারতীয় নৃত্যকলা দেখিয়েই বিদেশীদের মুগ্ধ করেছে, আবার বিদেশীদের কাছ থেকে আন্তরণেও সে খাস্ত হয়নি।

সরিৎ আর অঞ্জনার মধ্যে ব্যবধান ক্রমশই বাড়ছে, ক্রমেই বাড়ছে। শুধু ভৌগোলিক ব্যবধান নয়, জীবন ধারায় জীবন চর্যায় যে ব্যবধান তা দুস্তর থেকে দুস্তরতর হচ্ছে। সাত সমুদ্র তের নদী দিয়ে তার পরিমাপ চলে না।

তবু যে তারা ছাত্রবন্ধু। তার হয়তো অন্য কারণ আছে। বিদেশে থেকেও দেশের স্পর্শ মাঝে মাঝে পেতে চায় অঞ্জনা। সরিৎ তার চিঠি পত্রে সেই স্পর্শটুকু দেয়। দেশের জল মাটির স্পর্শ টুকু ছড়িয়ে দেয়। হয়তো আরো অনেক আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকেই এখন চিঠি পত্র পায় অঞ্জনা। কিন্তু সরিতের চিঠিতে হয়তো আর একটু ভিন্ন স্বাদ থাকে। তা ছাড়া পুরাণো দিনের স্মৃতিবাহী একজন মুগ্ধতম বন্ধুকে কে না সহচর হিসাবে রাখতে চায়? তাছাড়া অঞ্জনার নিজের তো বয়স হচ্ছে। তারও তো স্মৃতি রোমন্থন ভালো লাগে।

দু চার বছর অন্তর অন্তর কলকাতায় একবার করে আসে অঞ্জনা। কোনবার ওর স্বামী সঙ্গে থাকেন, কোনবার থাকেন না। তিনি এলেও অঞ্জনা যাওয়ার আগেই চলে যান। অঞ্জনা কলকাতায় আরো দু এক মাস বেশী থাকে। ওর নিজের অনুষ্ঠান হয় দিল্লিতে বা লক্ষ্ণৌতে। কলকাতায় ও হয়ত একটি দুটি অনুষ্ঠান করে ও কোন বার যায় না। সরিতের বেশী সহায়তায় ওর আর দরকার হয় না। বিদেশে থাকলেও দেশে ওর অনুরাগীর সংখ্যা কম নয়। যখন তখন তারা ওর চারদিকে ভীড় করে দাঁড়ায়। তাছাড়া নিজেরও অঞ্জনার সংগঠন করবার ক্ষমতা আছে। দিন কয়েকের মধ্যেই ও সব ব্যবস্থা করে ফেলে। নাচের উদ্যোগ আয়োজনের কাজে

সরিৎকে সে আর সেই তাকাতাকি করে না। কিন্তু অনুষ্ঠানের একটি কার্ড যথা সময়ে পাঠিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে ওর নিজের হাতের এক লাইন লেখা 'এসো বন্ধু। তুমি না এলে আমার অনুষ্ঠান মাটি হবে।' কথাটা নিশ্চয়ই অতিরঞ্জিত। তবু ভালো লাগে। সরিতের মত অখ্যাত এক অধ্যাপককে অঞ্জনার তো মনে রাখার কথা নয়। তবু সে রেখেছে এও কি কম কথা।

মাঝে মাঝে সরিতের মনে হয় অঞ্জনা কেরিয়ারিষ্ট। নিজের কেরিয়ার ছাড়া ও কিছু পাবে না। কিন্তু যখন দেখে এই বয়সে ওর নতুন নতুন নাচ শেখার বিরাম নেই, ওর উদ্ভাবনের অনুশীলন নিয়ত চলেছে, রিহার্সেলে ওর একটু ক্লান্তি নেই: অসুস্থ শরীর নিয়ে ও নাচতে পারে সরিৎকে ওর নিষ্ঠার কাছে হার স্বীকার হয়। অঞ্জনা যে মাঝে মাঝে বলে 'নাচা আর বাঁচা আমার কাছে এক' সরিতের মনে হয় ও মিথ্যা বলে না।

কলকাতায় যখন আসে অঞ্জনা খুবই কর্মব্যস্ত থাকে। নৃত্য কর্মই ওর নিত্য কর্ম। তবু কোন কোন দিন হঠাৎ অঞ্জনা সরিতের বাড়িতে চলে আসে।

আটপৌরে ওর শাড়ি অনাড়ম্বর বেশ বাস। এসে বীথিকার ঘরে গল্প করে। খেতে বললে তখনই পাত পেতে বসে যায়। নতুন নাচ কি শিখেছে দেখাতে বললে কোমরে আঁচল জড়িয়ে সরিতের ঘরের মধ্যেই অঞ্জনা নাচতে শুরু করে। যেন বালিকা কি কিশোরী মেয়ে একটি।

প্রেম নয় সহকর্মী সহধর্মীর বন্ধুত্বও নয়। বিস্তর ব্যবধান সত্ত্বেও এক ধরণের সৌহৃদ্য এখনো আছে। সরিৎ তা অনুভব করে। কী ভরে যে আছে সেইটাই আশ্চর্য্য।

একবার অঞ্জনাকে রাত্রে খাওয়ার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছিল বীথিকা। খেতে আর গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। অঞ্জনা সাধারণত একাই যায় আসে। কিন্তু সেদিন অঞ্জনাকে সরিৎ কিছুতেই একা ছেড়ে দিল না। রাজনৈতিক গোলযোগে সহরের অবস্থা সেদিন ভালো ছিল না। ট্যাকসি করে বালিগঞ্জে এলগিনরিয়া রোডের নিবাসে পৌঁছে দিতে গেল সরিৎ।

ট্যাকসিতে পাশাপাশি বসে সেদিন অনেক কথা হয়েছিল। নানা প্রসঙ্গে ঘুরে ঘুরে অঞ্জনা তার নাচের কথায় ফিরে যাচ্ছিল।

হঠাৎ অঞ্জনা কথার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে বলেছিল 'সরিৎ, আমি শুধু আমার কথাই বলে যাচ্ছি। তুমি তো তোমার কথা কিছুই বলছ না।'

সরিৎ বলেছিল, 'আমার বলবার মত কোন কথা কি আছে অনু যে বলব? আমার নাচ নেই, গান নেই, সাহিত্য নেই, চিত্রকলা নেই। নিজেকে প্রকাশ করবার কোন শিল্প মাধ্যম আমার জানা নেই। যেটুকু কোন তাগিদ ও বোধ করিনে।'

অঞ্জনা বলেছিল 'তাতে কি হয়েছে। ওসব ছাড়াও অনেক কিছু হয়েছে অনেক কিছু থাকবে। গোটা জীবনটাই তোমার মিডিয়াম। প্রতিদিনের চলাফেরাটাই তোমার নাচ। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানো? বুড়ো বয়সে যখন আমার নাচ টাচ কিছু আর থাকবেনা? তখন কি নিয়ে থাকবো? তখন তোমার মত বন্ধুই হবে সম্বল। যার বাইরের আর কিছু নেই, কিছু থাকার দরকারও নেই। তুমি আমার সেই বুড়ো বয়সের জীবন বীমা। এখন তাই, পুনরায় প্রিমিয়াম চুকিয়ে যাচ্ছি।'

নিজের জীবনে যখন কিছু না করতে পারার ক্ষোভ, কিছু না হতে পারার বেদনায় অনর্থক মনে হয়। তখন দু' একজন বন্ধুর এই স্বীকৃতির কথা মনে পড়ে সরিতের। তারই মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে পান।

এই প্রথম হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষার হেড একজামিনার হয়েছে সরিৎ। একাজ কোন সৃষ্টির কাজ নয়। কিছু পরীক্ষক পরীক্ষিকাকে নির্দেশ উপদেশ দানের কাজে। এর কাজেলা অনেক। সেই সঙ্গে কিছু অর্থ প্রাপ্তিও আছে। পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়ে সেই প্রাপ্তির যোগ টুকুকে উপেক্ষা করতে পারেনি সরিৎ। তাছাড়া নিজের সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে সে ওকে কিছু শুনাতে চায়। দায়িত্ব পালন না করলে সেই নাম টুকু থাকবে কেন।

নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল বলেই অঞ্জনার এবারকার অনুষ্ঠানে যেতে পারেনি সরিৎ। তাই অঞ্জনার রাগ হয়েছে। অভিমানও হয়েছে আর্টিস্টরা চিরকালই আত্মকেন্দ্রিক। তারা নিজের কাজকে যতখানি গুরুত্ব দেয় অন্যের কাজকে সেই পরিমান গুরুত্ব দিতে পারে না। এটা ওদের দুর্বলতা।

সরিৎ দূরবর্তিনী বান্ধবীর শিল্পী সুলভ দুর্বলতা টুকুর ওপর প্রশ্রয়ের স্নিগ্ধ হাসি বুলিয়ে দিয়ে ভাবছে এবার ওর চিঠির জবাবটা তাড়াতাড়িই দিতে হবে।

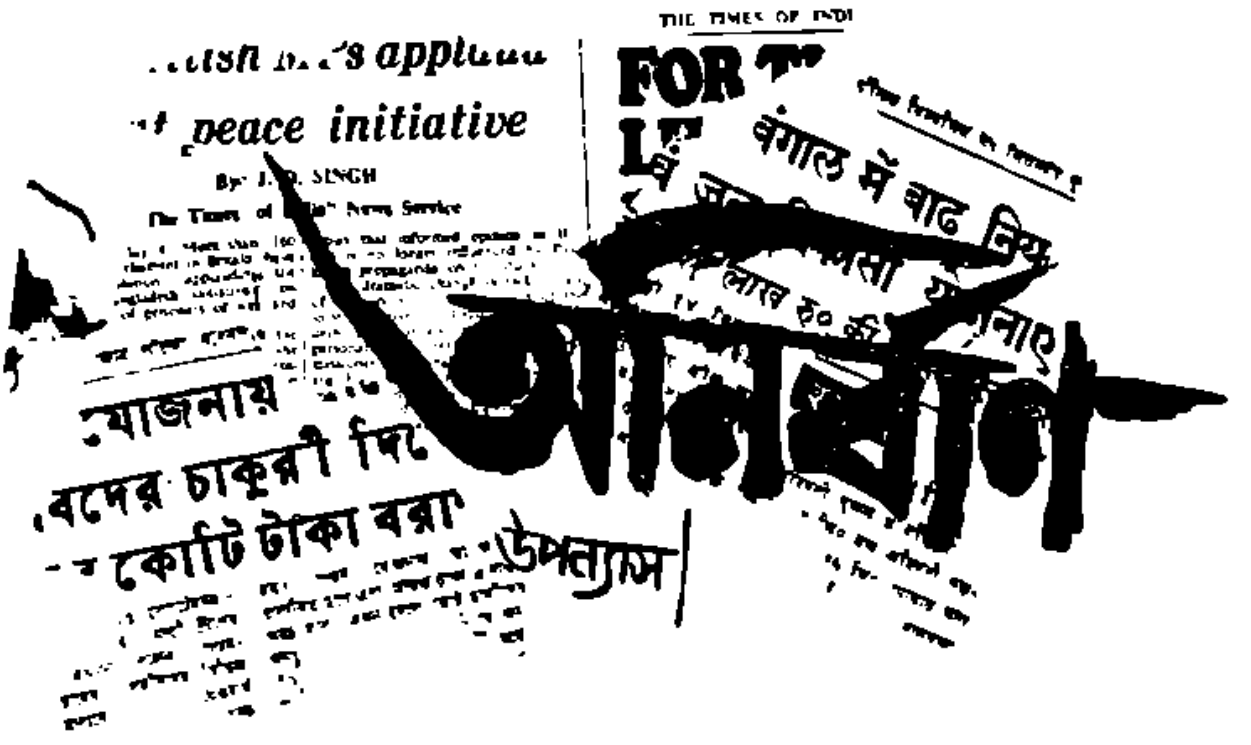
THE TIMES OF INDI
peace initiative
By
FOR
বেগাল্ত মে বাড় নিয়
আনন্দবাজার
যোজনায়
বদের চাকুরী দি
কোটি টাকা বরা
উপন্যাস

লক্ষাধিক প্রচারিত
নির্ভীক, নিরপেক্ষ,
স্বাধীন, সংবাদপত্র

যুগান্তর

সুষ্ঠু ও সবল জনমতের
স্বচ্ছ দর্পণ।

অনির্বাণ

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

খবরের কাগজের রিপোর্টারের জীবনে সন্ধ্যা সাতটায় ছুটি হয়ে যাওয়াটা এক ভীষণ বালাই। নিশাচরের মত প্রতিদিন রাত দশটায় যে বাড়ি ফেরে সে এই উদ্বৃত্ত তিন-ঘণ্টা সময় হাতে নিয়ে কী করবে? সন্ধ্যা ছ'টার আগে ছুটি চলেও না হয় সিনেমায় যাওয়া যেত। অবশ্য কোথাও টিকিট পাওয়া যেত কিনা হলপ করে বলা যায় না। চৌরঙ্গীর প্রায় প্রতিটি সিনেমা হলেই এখন পুলিসের নাকের ডগায় টিকিট ব্ল্যাক হয়ে থাকে।

আজ হঠাৎ ছুটি হয়ে গেল বিধানসভার অধিবেশন বিকেল পাঁচটার মধ্যে মুলতুবি হয়ে গেল বলে। অনির্বাণের ডিউটি ছিল বিকেলের শিফটে। মিউনিসিপ্যাল বিল নিয়ে জিসকাশান। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় স্পীকার ছুটি দিয়ে দিলেন। অনির্বাণের কিছু লেখার ছিল না। তবু তখুনি সে অফিস ফিরে গেল না। কারণ তা হলে আবার কোন একটা ঝামেলা চেপে যেতে পারে। সে লবিতে মন্ত্রীদের সঙ্গে খানিকটা আড্ডা দিয়ে সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ অফিস গেল এবং সাতটার মধ্যে অফিস থেকে বেরিয়ে পড়ল।

কোথায় সে যাবে? কলকাতায় যে প্রেস ক্লাব আছে সেখানে কদাচিৎ কেউ যায়। ওখানে গেলে বরং আরও বোরিং লাগে, নিঃসঙ্গতা বাড়ে। তার চেয়ে বাউণ্ডুলের মত কিছুক্ষণ চৌরঙ্গীর রাস্তায় ঘুরলে মন্দ হয় না। গ্র্যানডের তলায় দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বই দেখলে দেখতে দেখতে সময় কেটে যায়। হোটেল রয়্যালের নীচে এসে দাঁড়াল অনির্বাণ। সুখী সমৃদ্ধ মানুষের ভীড় চলেছে। অনাবৃত যৌবন যুবতীর সঙ্গে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে চলেছে পুরুষ। ঠিক সিগারেট কোম্পানির বিজ্ঞাপনের মত পুতুল সদৃশ মানুষ। এদেরই কমার্শিয়াল নাম, 'মেড ফর ইচ আদার।' এইভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে চলমান মানুষের স্রোত দেখছিল। তারপর সে বুকস্টলের দিকে ফিরল।

বই দেখতে দেখতে হঠাৎ একটি বইয়ের দিকে তাকিয়ে তার কী একটা জরুরি কথা মনে পড়ে গেল। সামনের র‍্যাকে জলজল করে তাকাচ্ছে একটি পেপার ব্যাক: রিচার্ড নেলসনের লেখা 'চায়না অন দি ক্রস রোড।' কালচারাল রেভোলিউশনের ওপর লেখা বই। ক্যানাডিয়ান সাংবাদিক নেলসন দুদিন হল কলকাতায় এসেছেন এবং এই হোটেলের ৩০৫ নং ঘরে উঠেছেন এ খবর সে শুনেছিল স্টেটসম্যানের রিপোর্টার মনোজিৎ মিত্রের কাছ থেকে। তার ইচ্ছে ভদ্রলোকের একটা ইন্টারভিউ নেয়। বাংলা একটি মাসিকপত্রে অনির্বাণ নিয়মিত রিপোর্টাজ গোছের লেখা লেখে। তাতে এই ধরনের ইন্টারভিউ বেশ খাবে অর্থাৎ উপযুক্ত হবে। অথচ গত ৪৮ ঘণ্টা ধরে মাথায় এই সব বিচিত্র চিন্তার প্রবাহ ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছে যে কিছুতেই রিচার্ড নেলসনের কথাটা মনে পড়েনি।

অনির্বাণ মুহূর্তের মধ্যে তার কর্তব্য ঠিক করে ফেলল। সে এক কপি 'চায়না অন দি ক্রস রোড' কিনল। বারো টাকা দাম পড়ল বইটার। তারপর সেটি হাতে করে হোটেল রয়্যালএ ঢুকল।

সন্ধ্যার সময় রয়্যাল জম-জমাট। বোধহয় বাইরের কোন ট্রেন এল। চেক ইন-এর জন্য প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন এক সাহেবের দল এসে কলরব বলব লাগিয়ে দিয়েছে। কান পেতে শুনল, ওরা যে ভাষা বলছে ইংরাজী নয়। যতদূর মনে হচ্ছে রাশিয়ান। মোটা মোটা বলিষ্ঠ চেহারা, বাদামীচুল। সোনা দিয়ে বাঁধানো দাঁত। রাশিয়ানদের মতনই চেহারা। হয়ত ভিলাই যাবে, কিংবা বোকারো। অথবা কলকাতাতেই কোন কাজ। নেই নেই করেও কলকাতাতেও দিনে কয়েক হাজার বিদেশী যাতায়াত করে। হোটেলে এলে জানা যায় এ শহরের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব কতখানি।

"এক্সকিউজ মি, মিঃ নেলসন আছেন কিনা দেখুন তো। রুম নং থ্রি হানড্রেড ফাইভ।"

অনির্বাণ জানে, রিসেপশনের মেয়েটি বাঙালী গত পাঁচ বছর ধরে ওকে দেখছে। নাম বোধহয় চন্দ্রিমা মিত্র বা অমন কিছু একটা হবে। তবে ওকে বাংলা বলতে শোনেনি কোনদিন। সেই জন্যেই অনির্বাণের দুষ্টুবুদ্ধি জাগে। ও ইচ্ছা করেই যাকে তাকে বাংলায় জিজ্ঞাসা করে এমনকি অবাঙালীদেরও। অনির্বাণের বক্তব্য অবাঙালীদের সঙ্গে আমরা ইংরাজী বা হিন্দিতে কথা বলি বলেই তারা কস্মিনকালে বাংলা শেখেনা। এইজন্যই বাংলা ভাষার প্রসার হয় না। বাংলা প্রসারে বৃদ্ধ জ্যোতিষ ঘোষ মশাই যতই চেষ্টা করুন না কেন, আমরা বেশী করে বাংলা না বললে, এ ভাষা কিছুতেই পপুলার হবে না।

মেয়েটি কোন জবাব না দিয়ে পিছনের খোপে একবার দেখে নিল। সেখানে প্রত্যেকটি ঘরের জন্য একটি করে পাশবার খোপ। প্রত্যেক খোপে নম্বর লেখা। ৩০৪ নং আছেন। না থাকলে চাবি থাকত। অবশ্য জবাবটা এল ইংরাজিতে।

ভাগ্য আজ সুপ্রসন্ন তবু বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে সাহেবের সঙ্গে দেখা করাটা ঠিক হবে না মনে করে সে লাউঞ্জের টেলিফোনে ৩০৪ নং ঘর চাইল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল, হ্যালো।

: আপনি কি মিঃ বিচারড নেলসন ?

: ইয়েস।

: গুড মর্নিং। আমি অনির্বাণ রায়চৌধুরী। ক্যালকাটা ক্রনিকলের সিনিয়র স্টাফ রিপোর্টার। এই মুহূর্তে আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি কি ?

: আসুন। কিন্তু আমি দুঃখিত যে বেশীক্ষণ কথা বলতে পারব না। তার কারণ আমার রাত দশটায় প্লেন। ন'টার সময় চেক আউট।

: আমি আপনার বেশী সময় নেব না। মাত্র মিনিট পনের।

লিফটে করে তিনতলায় গিয়ে ডানদিকের লম্বা করিডর ধরে অনেকক্ষণ ধরে হাঁটার পর ঘরটি পাওয়া গেল। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হঠাৎ মনে হল, ভেতর থেকে চেঁচামেচির আওয়াজ কানে আসছে। একজন নারী আর একজন পুরুষ বেশ উঁচু গলায় কথা কাটাকাটি করছে। দু'জনে কথা বলছে হিন্দিতে।

অনির্বাণ একটু ঘাবড়ে গেল। সে দুবার নক করল দরজায়। ভেতরের আওয়াজটা থেমে গেল। দরজার ল্যাচ কি খোলার শব্দ হল। দরজা খুলে মুখ বাড়াল একজন। শুধু মুখের অর্ধেকটা বার করে লোকটি ইংরাজীতে বলল, কাকে চাই ?

: মিঃ নেলসনকে।

যে লোকটি মুখ বাড়িয়েছিল সে ভারতীয়। বছর চল্লিশের বয়স হবে তার। গলাবন্ধ কোট ছিল তার গায়ে। একমাথা চুল। আজকাল যেমন জুলপির ফ্যাশান হয়েছে তেমনি জুলপি দু'গাল বেয়ে নেমে এসেছে।

: কত নম্বর ঘর খুঁজছেন ?

: ৩০৪।

এটা ৩০৬। মাপ করবেন। বলে লোকটি দরজা বন্ধ করে দিল।

অনির্বাণ একটু অবাক হয়ে দেখতে পেল সে ৩০৬ নং ঘরেই নক করেছে।

৩০৬কে অনেকটা ৩০৪এর মত মনে হচ্ছে।

৩০৪ তো তার পাশে। ছি, ছি, বড় ভুল হয়ে গেছে। পাশের দরজায় গিয়ে অনির্বাণ আবার নক করল।

দরজা খুলে দিলেন বিচারড নেলসন স্বয়ং। বেশ ভারিক্কি চেহারা। সারা মাথা জুড়ে টাক। চোখে সাইজের ফ্রেমের চশমা। কিন্তু সারা পৃথিবী বহুবার ঘুরেছেন। তারমধ্যে চীনে ছিলেন ছ' বছর।

১৯৬২ সালের চীন ভারত যুদ্ধের সময় তিনি ভারতে এসেছিলেন।

অনির্বাণ নিজের পরিচয় দিল।

নেলসন বললেন, ক্যালকাটার এক্সট্রীমিস্ট মুভমেন্টের ওপর একটি বই লেখার ইচ্ছে আছে। এবারে এসে সিচুয়েশন দেখে গেলাম। আগামী বছরের গোড়ার দিকে আবার আসব। সেসময় আপনাদের মত কয়েকজন সাংবাদিকের সাহায্যের দরকার হতে পারে।

: আপনার বইটি আমি সঙ্গে এনেছি। যদি বইটি দয়া করে সাইন করে দেন।

: খুব আনন্দের সঙ্গে। এই বলে নেলসন বইটির প্রথম পাতায় খসখস করে নিজের নাম লিখে দিলেন।

: চীন সম্পর্কে আপনার মোটামুটি ধারণা কি রকম?

: আমার বইতে সব লিখেছি। গ্রেট মেটিরিয়াল প্রগ্রেস হয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আনডার ডেভালাপড কানট্রির পক্ষে ডেমোক্রেশির চেয়ে চীনের পথই বৈপ্লবিক উন্নতি করার শর্টকাট পথ। ডেমোক্রেশি আর অ্যানারকি অনেকটা একই রকমের। খুব লিবিসটিকেটেড প্রসেস। একটা মেশিন বিগড়ালে সবটাই ফেল করবে। তার চেয়ে কম্যুনিজমের স্কোপ অনেক বেশী।

: আপনার কি মনে হয় চীনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক ভাল হবে?

: ঠিক বলতে পারছি না। তবে চীন আর বিপ্লব রপ্তানি করতে চায় না। তাহলে নকশাল আন্দোলনে চীনের প্রত্যক্ষ সাহায্য থাকত। চীনের বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার চেয়েও চীনের ভয় রাশিয়াকে। এজন্য ইণ্ডিয়াকে নিউট্রালাইজ করে দিতে পারলেই চীনের লাভ।

: কী রকম কাটল কলকাতায়?

: ভালই তবে গত দু' রাত ধরে ঘুমতে পারিনি। পাশের ঘরে হুটোপুটি, হৈ-চৈ। জোরে জোরে রেডিও চালানো। একেবারে ছ্যাসটি অ্যাকোয়ার।

: পাশের রুমে কে আছে?

: কে জানে মশায়? গত কাল রাত তখন এগারটা। শরীরটা খুব খারাপ লাগছিল। জ্বরজ্বর মত ভাব। রাত ন'টা নাগাদ যখন ডিনারের জন্য নীচে যাই তখন বেয়ারাকে জিজ্ঞাসা করলাম হোটেলের ডাক্তার আছে? বেয়ারা জবাব দিল, সকালের দিকে দুজন ডাক্তার আসেন। এখন তো পাবেন না। তবে হোটেলের প্যানেল অব ডক্টরস্ আছে। ফোন করে আনাতে পারেন। কে আবার ঝিল দিয়ে অত রাতে ডাক্তার আনায়। এমনি নানান কথা ভাবছি এমন সময় একটা মজার ঘটনা ঘটল। হঠাৎ দেখি দরজায় কে নক করছে। খুলে দিতে দেখি এক ভদ্রলোক হাতে ব্যাগ। আমাকে বললেন, মিঃ উপাধ্যায় আছেন?

আমি বললাম, কত নম্বর চান?

ভদ্রলোক বললেন, রুম নং ৩০৬। আমি বললাম, পাশের কামরা হবে। কী কৌতূহল হল। বললাম, কোথা থেকে আসছেন? আপনি কি ডাক্তার?

ভদ্রলোক বললেন, ঠিক ধরেছেন। তখন আমি বললাম, আমি একজন ডাক্তার খুঁজছি। আপনার কাজ শেষ হয়ে গেলে আমাকে একটু দেখবেন? ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন এবং ঘন্টাখানেক পরে, আমাকে দেখলেন। প্রেসার মাপলেন। একটা ট্যাবলেট দিলেন। সভ্যতা অথাচিতভাবে তাঁর দেখা মিলল।

অনির্বাণ ভাবছিল পাশের কামরার কথা। পাশের কামরায় কে আছে? জোরে জোরে রেডিও বা বাজে কেন?

কিছুক্ষণ আগে প্রচণ্ড কথা কাটাকাটি হচ্ছিলই বা তাদের মধ্যে। যে নারীকণ্ঠ শোনা গেল সেই বা কে?

অনির্বাণ জিজ্ঞাসা করল, কাল যে ডাক্তার এসেছিলেন তাঁর নামটা কি বলতে পারেন? আমাদের কলকাতায় অনেক ভাল ভাল ডাক্তার আছেন। কোন প্রথম সারির ডাক্তার কী না নাম দেখে বলতে পারব।

তাঁর কার্ডটা আছে। দাঁড়ান এক মিনিট। এই বলে বিচারক নেলসন কার্ডটা বার করলেন। অনির্বাণ দেখল, লেখা আছে, ডঃ এ, কে, সান্যাল, ৭৪, চৌরঙ্গী প্লেস। কলকাতা। অনির্বাণ কার্ডটা ফেরৎ দিয়ে বলল, ডাঃ সান্যাল মেডিসিনের বেশ নাম করা ডাক্তার। ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। আমার সঙ্গে আলাপ নেই। তবে চিনি। আপনি ভাল চিকিৎসকেরই পরামর্শ পেয়েছেন।

আচ্ছা আজ উঠি মিঃ নেলসন। আবার দেখা হবে। শুভরাত্রি।

অনির্বাণ হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়ল।

অন্যদিন অনির্বাণ বাড়ি ফিরে স্নান সেরে বউ মাধুরীর সঙ্গে দু চারটে কথা বলে। তারপর খাওয়া দাওয়া সেরে

পড়তে বসে। যতক্ষণ না ঘুম আসে ততক্ষণ বই পড়ে। মাধুরী ছেলেমেয়েদের নিয়ে অনেক আগেই ঘুমিয়ে পড়ে। মাধুরী ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে চাকরি করে। ফিরতে ফিরতে ছ'টা বাজে। সংসার এক বুড়ি ঝিএর হাতে। ছেলে-মেয়েদের সে স্কুল থেকে নিয়ে আসে, খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়।

মাধুরীও অফিস থেকে ফিরে ছুটি করতে বসে। গল্প-গল্পে উনুনের সামনে বসে রুটি সেঁকে। তারপর ছেলে-মেয়েদের পড়ায়। খাওয়ায়, ঘুম পাড়ায়। অনির্বাণ আসে রাত দশটায়। ততক্ষণে মাধুরীর এক ঘুম হয়ে যায়। ঘুম চোখে উঠতে হয় বলে সে কিছুটা বিরক্ত হয়। মাধুরীর মেজাজটিও সব সময় এক তালে বাঁধা থাকে না। ছুতো পেলে নামা করে। অফিসে সে হাসি খুশী। তবে কখনই প্রগলভা নয়। আবার ইনটেলেকচুয়াল টাইপেরও নয়। কিন্তু বাড়িতে অধিকাংশ সময়েই সে গম্ভীর।

অনির্বাণ মাধুরীর মেজাজকে ভয় করে। আর ভয় করে বলেই সে তাকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে।

আজ অনির্বাণ বাড়ি ফিরল রাত দশটার মধ্যে। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে ওর কখনই রাতে দেখা হয় না। ও যখন ফেরে তখন তারা ঘুমিয়ে কাদা।

বুড়ি কি পদ্মা দরজা খুলে দিল।

অভ্যাস মত অনির্বাণ প্রথমে বাইরের ঘরে ঢুকল। ব্যাগটা টেবিলে রাখল। তারপর ভেতরের ঘরে জামা কাপড় ছাড়তে গেল। খুট করে আলো জ্বালার শব্দ হল। ঘরটা এক লহমায় আলোয় ভরে গেল। মাধুরী চোখ খুলল কিন্তু উঠল না।

অনির্বাণ বলল, আমার কোন কোন এসেছিল ?

ও ফিরে কোন করেছিলেন। কোন করতে বলেছেন।

তোমাদের লাইব্রেরিয়ানের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। অনেক কথা হল। এবছরও পাঁচশো বই বিসিং।

এই নিয়ে তুমি আবার লিখতে যেওনা। তাহলে গভর্মেন্ট ভাববে আমি তোমার খবর সাপলাই করেছি।

নিউজ এডিটার বলছিলেন, নতুন বিলের ওপর একটা সাইড আর্টিকল লিখতে। লিখলে চল্লিশটা টাকা হোত। কিন্তু তোমার কথা মনে করে লিখলাম না। কতবার বলছি চাকরিটা ছেড়ে দাও।

আমার চাকরি করাটাকে তুমি একটা শখ বলে মনে কর, তাই না ?

শখ ছাড়া আর কি ? তুমি নেহাৎ জলে পড়ে নেই সংসারের সবটাইতো আমি দেখছি।

: তাতো বলবেই। টাকাগুলো তোমাকে ধরে দিচ্ছিনা তাই বুঝতে পারছ না। আমার স্যাকরিফাইসটাকে কোনদিনই চোখে দেখতে পারছনা। ক'টাকা মাইনে পাও যে বড় বড় কথা বলতে আস ? যা পাও তা থেকে মাসে মাসে আড়াইশ টাকা করে জমে পাঠালে আর কী থাকে ?

: ওই আড়াইশ টাকার ওপর তোমার রাগ জানি।

: আমি বলে শুধু রাগ করে চুপ করে আছি। অন্য মেয়ে হলে কি যে হোত। কেন তুমি একা অতগুলো টাকা টানবে কেন ? তোমার দু ভাইতো কিছু কিছু করে পাঠাতে পারে না ?

: তারা সবে চাকরিতে ঢুকেছে। আর কতই বা মাইনে পায় ?

: এইসব ন্যাকামি আমাকে দেখাতে এস না।

অনির্বাণ ক্রুদ্ধ হয়, ক্ষুব্ধ হয়, আঘাত পায় কিন্তু চিৎকার করে ঝগড়া করতে তার কালচারে বাধে।

বাড়ি ফিরে এই মুহূর্তটা তার বিশ্রী লাগল। ন্যাশতা জীবনে সে সুখী নয়। প্রতিদিন নানান খিটিমিটি লেগেই থাকে। দুই ভাগ প্রাপ্ত রাতে দুই প্রত্যন্ত প্রদেশের অধি-বাসী হিসাবে একই ছাদের নীচে বাস করে। অনির্বাণের অবশ্য মনোজগত আছে। বই আছে। ইচ্ছে করলে টুকটাক লিখতে পারে। একদা সাহিত্যিক হবার প্রবল বাসনা ছিল তার। কিন্তু সে গোষ্ঠীতে ঢুকতে পারল না। তবে বড় কারণ সময় নেই। কলেজস্ট্রীটে যখন প্রতি সন্ধ্যায় হবু সাহিত্যিকরা সম্পাদক সাহিত্যিককে ঘিরে ক্ষুরচক্র বসায় তখন সে মহাকরণে জরনাল আবেদিনের অনুপম কৃতিত্বের কাহিনী লিপিবদ্ধ করছে। অথবা বণিকসভার সভাপতির সারগর্ভ উপদেশ নোট করছে।

এ সংসারে তার বা ব্যক্তির জান দেবার অধিকার আছে, নেই শুধু রিপোর্টারের। সে শুধু বড়জোর টেপ রেকর্ডার।

তার কোন মন্তব্য করার অধিকার নেই। শুধু টোকো। ঘটনার বিবরণ নাও, নেতা অভিনেতা ব্যবসায়ী, দালবাজারি,

চোরাবাজারি সকলের মুখনিঃসৃত বিবরণ টোকো। আর সেগুলি পরদিন উগরে দাও।

অনির্বাণ বাথরুমে গিয়ে স্নান সেরে কাপড় ছেড়ে বাইরের ঘরে এল। কোম্পানি থেকে বিনিপয়সায় ফোন দিয়েছে। তাদের কোম্পানি এদিক থেকে ভাল। ফোন আর খবরের কাগজ ফ্রি। এতুটোতেই সময় কেটে যায়। অনির্বাণ বেশী ফোন টোন করে না। যখন বিয়ে থা করেনি তখন অনেক মেয়ে বন্ধুকে ফোন করত। এখন আর তাদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই।

কে কোথায় ছিটকে পড়েছে। প্রত্যেকেরই ভাল বিয়ে হয়েছে। অনির্বাণ ভাবে ওরা বোধ হয় এখন অনির্বাণের কথা ভেবে মনে মনে বলে, খুব বেঁচে গেছি বাবা! ওই রিপোর্টারটা বর হলে সারাজীবনে দু'পয়সার মুখ দেখতে পেতাম না।

অনির্বাণ বাইরের ঘরে এসে ফোন করল ডাঃ মিত্রকে। ডাঃ মিত্র পারক সার্কাস অঞ্চলে থাকেন। প্রচুর পয়সা ভদ্রলোকের। সারাদিন খেটে খুটে ক্লান্তি দূর করার জন্য রাত হলেই আড্ডা জমান বাড়িতে। নির্ভেজাল আড্ডা। ওঁর সান্ধ্য আড্ডা বোজই জমজমাট। অনেক ডাক্তার আসেন, আসেন সাংবাদিকরা।

রাত দশটায় ডাঃ মিত্রের সঙ্গে হয়। রাত একটা পর্যন্ত চলে আড্ডা। প্রত্যেকেরই গাড়ি আছে। তারা ড্রাইভ-করে বাড়ি ফেরে। এই আড্ডায় মাঝে মাঝে যায় অনির্বাণ। তাকে পৌঁছে দেয় সন্দীপ চৌধুরী। সন্দীপ চৌধুরী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একজন অবসরপ্রাপ্ত আই সি এস। এক অদ্ভুত চরিত্রের মানুষ। ছ'ফুটের মত লম্বা। মুখে ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি। সবসময় পাইপ মুখে দিয়ে থাকেন। তাঁর ইনসমনিয়া আছে। তাই রাত ঘুমোতে পারেন না। রাত তিনটে পর্যন্ত কলকাতার রাজপথে ড্রাইভ করে ঘরে ঘুরে বেড়ান। কখনও গাড়িতে তুলে নেন কোন ভিখারিকে, কখনও বেঙ্গালয় থেকে কোন মাতালকে, পথ হারিয়ে ফেলা কোন বিদেশী নাবিককে। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ভদ্রলোকের।

তুলসীদাসের রামচরিত মানস থেকে পাঞ্জাবি খিস্তি তাঁর মুখস্থ। এই পাগলাটে লোকটির মেয়েদের সম্পর্কে একটু দুর্বলতা আছে। এই বয়সেও তরুণী মেয়েদের সান্নিধ্য তিনি উপভোগ করেন। এতে তাঁর লজ্জা নেই। বরং গর্ব আছে। অথচ মদ তিনি কদাচ পান করেন না।

ডাঃ মিত্র বললেন, কে অনির্বাণ? তোমাকে ফোন করেছিলাম। একটা ভাল খবর আছে, যদি এস তাহলে পাবে। একদম নিজস্ব খবর। তুমি না এলে স্টেটসম্যানের বসন্ত সরকারকে দিয়ে দেব।

"আর! নিজস্ব খবর কি করে অনকম্ব?"

: সন্দীপদা আসবেন, ভয় নেই।

অনির্বাণ ডাঃ মিত্রের কথা অমান্য করতে পারে না। খুব পরোপকারী ভদ্রলোক। মনটাও খুব ভাল। ওঁর প্রতি যাঁরা অকৃতজ্ঞ তাঁদের তিনি নানাভাবে সাহায্য করেন। আর তাছাড়া খবরের লোভ দেখিয়ে রিপোর্টারকে বরফের টেনে আনা যায়। শিকারি যেমন শিকারের সন্ধান পেলে উদগ্রীব হয়ে ওঠে, তেমনি খবরের সন্ধান পেলে অনির্বাণ নাওয়া খাওয়া ভুলে যায়। অবশ্য বৃত্তির প্রতি তার এই নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সে কোন পুরস্কারই এখনও পায়নি। মাঝে মাঝে সে এজন্য মনমরা হয়ে পড়ে। জীবনে আর্থিক প্রতিষ্ঠার যথেষ্ট মূল্য আছে বৈকী। অর্থ দিয়ে শুধু যে স্বাচ্ছন্দ্য কেনা যায় তা নয়, অর্থ থাকলে মানুষের সঙ্গে আরও গভীরভাবে মেশা যায়। এযুগে বন্ধুত্বও পয়সা দিয়ে কেনার সামগ্রী। যার তোমার সঙ্গে কারও আলাপ হল। তুমি যদি সেই আলাপ বন্ধুত্বে পরিণত করতে চাও তাহলে তাকে মাঝে মাঝে খেতে ডাকতে হবে। তাকে লিফট দিতে হবে। তার কাজ শুধু মানুষকে নিয়ে—মানুষ আর মানুষ। অধিকাংশই ওপরতলার মানুষ। কারণ তারাই খবর তৈরি করে। তুমি যদি তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করতে পার তাহলে আচী চক্রবর্তীর ভাষায় তুমি হয়ে রইবে—টেক ডাউন রিপোর্টার। ছাও আউট আর বিবৃতি নিয়েই জীবন কেটে যাবে। তাদের বস সঞ্জয়বাবু একটা কথা বলেন, দেখ, এ লাইনে সবচেয়ে বড় দরকার হচ্ছে কনট্যাক্ট। তুমি যদি ভি আই পির কাছে নিজের নামে পরিচিত হতে পার তাহলেই তোমার ক্রেডিট। তা না হলে কালকাটা ক্রনিকলের নামে তোমার পরিচয় হলে কোন লাভ নেই।

অনির্বাণ খেয়ে নিল। রাতের খাওয়া সংক্ষিপ্ত। চারখানা রুটি। কুমড়োর চচ্চড় আর একটু দুধ। তবেলা মাছ খাবার মত টাকা তার নেই। মাধুরী কোন কথা না বলে খাবার এগিয়ে দিল। পদ্মা গ্লাস ভেলে দুধ গরম করতে লাগল।

অনির্বাণ বলল, তুমি খাবে না?

দুজনে একসঙ্গেই খায়। পদ্মা বলল, ঝিলিমিলি বসে যাও আমি তোমায় দিচ্ছি।

মাধুরী বলল, আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।

পদ্মা বলল, তাহলে দুধটা যে নষ্ট হয়ে যাবে। ডাক্তারবাবুকে সব দুধটা দেব।

অনির্বাণ বলল, না। বেশী হলে দুই পেতে রেখে দাও।

বুধ বুঝে অনির্বাণ খেয়ে নিল। মাধুরী জিজ্ঞেস করল, আর রুটি লাগবে?

: না।

মাধুরী উঠে চলে গেল শোওয়ার ঘরে। স্নানপত্রিকাটা বার করে পাতা ওল্টাতে লাগল।

অনির্বাণ তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকে বলল, আমি একটু বেরুচ্ছি।

: কোথায়?

: ডাঃ মিত্রের বাড়ি। চাবি দিয়ে যাচ্ছি। তোমার ঘুম ভাঙাব না।

: এত রাতে বাড়ি ফিরেও সুখ হয় না। এই রাতে দাড়ে দশটার সময় আবার বেরুচ্ছ?

: ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে ফিরে আসব।

: একদিন তো ভোরবেলা ফিরলে।

: সেদিন সন্ধীপদা বলগায় নিয়ে গিয়েছিলেন জিলিপি ভাজা দেখাতে। আর ভোরবেলা এলেই তো সবচেয়ে ভাল, তোমার ঘুমের ডিসটার্ব হয় না।

মাধুরী আর কোন কথা বলল না। অনির্বাণ পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে স্লিপার পরে দরজায় তালা লাগিয়ে বেরিয়ে গেল।

পার্ক সার্কাসে নিউ পার্কস্ট্রীটে চারতলা বাড়িটা ডাঃ অলক মিত্রের। মিত্রেরা আগে বাগবাজারে পৈত্রিক বাড়িতে থাকতেন। বছর পাঁচেক হল এই নতুন বাড়িতে উঠে এসেছেন। নীচে ডাঃ মিত্রের চেম্বার। দোতলায় এক যুগোস্লাভ ইঞ্জিনিয়র দম্পতি ভাড়া থাকে। তিনতলা ও চারতলায় ডাঃ মিত্রের দুই ছেলেমেয়ে আর দুজন কাজের লোক থাকেন।

গ্যারেজের ওপরে ছোটতলার ঘরটা কারপেট পাতা। কয়েকটি সোফা সেট। দেওয়ালে প্রাচীন ভারতে নানা চিকিৎসার একটি ছবি বাঁধানো। একটি ওষুধের কোম্পানির উপহার দেওয়া একটি ক্যালেনডার। টিপয়ের ওপর রাখা একটি চীনামাটির অ্যাসট্রে।

—অনির্বাণ এসে দেখল আড্ডা জমজমাট। পাশের ঘরে তাসের আড্ডা বসেছে। ডাঃ মিত্র তাঁর চেম্বারে বসে একজন মধ্যবয়সী সুপুরুষ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। ভদ্রলোককে যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছে। অথচ তাঁর সঙ্গে কখনো আলাপ হয়েছে বলে মনে পড়ে না। ভদ্রলোকের চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। ঠোঁট দুটো বেশ পুরু, নাক একটু থ্যাবড়া তবে চোখ দুটো বেশ বড় বড় এবং তাতে বুদ্ধির ছাপ। ডাঃ মিত্র বললেন, এই যে এস অনির্বাণ, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেই। ইনি ডাক্তার এ কে সান্যাল। এ হল আমাদের ভাইয়ের মত—ক্যালকাটা ক্রনিকলের রিপোরটার অনির্বাণ রায়।

অনির্বাণ নামটা শুনে চমকে উঠল। হোটেলে রিচার্ড নেলসনের পাশের ঘরে বহুমূত্র রোগিনীকে যিনি দেখতে গিয়েছিলেন তাঁর নাম ডাঃ এ কে সান্যাল। তাঁর সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবার জন্যেই তো অনির্বাণ ডাঃ মিত্রের কাছে এসেছে। সে বলল, আচ্ছা আপনার কি চৌরঙ্গীতে চেম্বার?

ডাঃ সান্যাল বললেন, হ্যাঁ।

ডাঃ মিত্র বললেন, কী তুমি চেন নাকি?

ওঁকে কে না চেনে। এতবড় মেডিসিনের ডাক্তার। ওঁর বাড়ি কোথায় তাও জানি—দেওদার স্ট্রীটে।

: তোমরাতো খবর রাখবেই। দুনিয়ার লোকের হাঁড়ির খবর রাখাই তোমাদের কাজ।

অনির্বাণ বলল, আপনার সঙ্গে দেখা করতে পারি একদিন?

ডাঃ সান্যাল : স্বচ্ছন্দে। আমার বাড়িতে চলে আসুন যে কোন রবিবার সন্ধ্যা বেলা।

: যাব। আপনার সঙ্গে আমার দরকার আছে।

ডাঃ মিত্র বললেন, অনির্বাণ, তোমায় খবর দিয়েছিলাম একটা জরুরি নিউজের জন্য। আমাদের নীলরতন সরকার হাসপাতালে টিটেনাসে গত পাঁচ দিনে পনেরজন রোগী মারা গেছে। সার্জারির কাজ বন্ধ রয়েছে। আজ ডি এম এসের কাছে ডাঃ অধীর চ্যাটার্জী আমাদের সুপারিনটেনডেন্ট গিয়েছিলেন। কিন্তু কোন ফল হয়নি। আমরা যেটা চাইছি সেটি হল হাসপাতালের জেনারেল ক্লিনলিনেসের উন্নতি না হলে কিছুতেই এ সমস্যার সমাধান হবে না। তোমাকে ডিটেলস রিপোর্টটা দিচ্ছি, তুমি একটা স্টোরি করে দাও।

ডাঃ মিত্র মোটামুটি ঘটনাটা বলে গেলেন। অনির্বাণ নোট করে নিল। এর মধ্যে ডাঃ সান্যাল বললেন, আমি চলি আজ। কয়েকটা পেশেন্টকে দেখতে যেতে হবে। আচ্ছা, আবার দেখা হবে।

একটু পরে সন্দীপ চৌধুরী হৈ হৈ করতে করতে এসে ঢুকলেন। 'অনব, বাইরে দেখলাম একটা ভক্সওয়াগন গাড়ি, গাড়িটা কার বলতো হে?'

ডাঃ মিত্র বললেন, ডাঃ যতীন মুখার্জীর গাড়ি। সবে জার্মাণি থেকে ফিরেছে। স্টুটগার্ট হসপিটালে ছিল।

: ডাঃ যতীন মুখার্জী কোন ছোকরা বলতো— আমি চিনি?

: পাশের ঘরে তাস খেলছে। আপনার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব। যতীনকে আপনি বোধ হয় দেখেননি। পনের বছর জার্মাণীতে ছিল। বীরেন মিত্রের জামাই।

মিত্রের জামাই মুখার্জী—কী ব্যাপার বলতো হে?

: লাভ ম্যারেজ। বউও ডাক্তার। ওরা আর কি করে পড়ত।

: কনট্র্যাকটর বীরেন মিত্র তো?

: হ্যাঁ, নীল ইটে বাড়ি।

: বুঝেছি, আমি যখন ট্রানসপোরট কমিশনার ছিলাম, আমার কাছে একবার এসেছিল বাসের পারমিটের জন্য। ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলাম।

অনির্বাণ বলল, কত লোককে যে আপনি ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলেন দাদা। আমাদের রিপোর্টার সনাতন দাসকেও তো একদিন ঘর থেকে বার করে দিয়েছিলেন।

সন্দীপ চৌধুরী সব সময় অ্যাগ্রেসিভ টোনে কথা বলেন। তর্ক করতে ভালবাসেন ভদ্রলোক, অবশ্য কোন তর্কেই তিনি হার মানেন না। অনর্গল রেফারেনস কোট করতে পারেন। তাতেও যখন হয় না তখন তিনি ঝাবড়ে দেন। তাঁর অগ্নি-মূর্তি দেখে তখন ভয় পাননা এমন বুকের পাটা কারও নেই।

সন্দীপ চৌধুরী অলক মিত্রের বাড়ি থেকে বার হলেন যখন, তখন রাত একটা। তাঁর গাড়িতে উঠলেন কংগ্রেস নেতা সুশীল আচার্য, জীবন বীমা কর্পোরেশনের অফিসার সন্তোষ দত্ত আর অনির্বাণ। সন্দীপ সুশীলকে নিয়ে ঠাট্টা তামাসা আরম্ভ করে দিলেন। বুঝেছেন আচার্য মশাই, আপনাদের প্রাক্তন কল অতি টক। কিন্তু যা আপনারা করেছেন কুড়ি বছর ধরে—কোন বিপ্লব হলে আপনাদের গিলোটিন করত। অমন নাদুস গুদুস ভুঁড়ি নিয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াতে পারতেন না। সন্দীপ চৌধুরীর এই ধরনের আক্রমণে সবাই অভ্যস্ত। সুশীল আচার্য তাই গায়ে মাখলেন না। বললেন, আপনারা অফিসাররাই আমাদের ডুবিয়েছেন। আপনারা ইউ এফ কেও ডুবিয়েছেন। এই গবর্ণমেন্টকেও ডোবাবেন।

সন্দীপ চৌধুরী বললেন, আমাদের হাতে ক্ষমতা থাকলে তোমাদের মত রিজেকটেড মালদের লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করতুম। রেসের রিজেকটেড ঘোড়াদের গুলি করা হয় জান না?

দক্ষিণ কলকাতায় অশ্বিনী দত্ত রোডে দুজনকে নামিয়ে দিয়ে সন্দীপ বললেন, চল অনিবাণ তোমাকে রাতের চৌরঙ্গী দেখাই।

অনির্বাণ বলল, না সন্দীপদা। আজ আর বেশী রাত করতে পারব না।

: কেনরে, বউর সঙ্গে কথন শুতে যাবি বলে মন চুলবুল করছে?

তোরা বাঙ্গালী ছোকরারা শুধু মায়ের আচলেই দুনিয়া বলে মনে করিস আরে বাবা লাইফ দেখ। তা-না, কখন মায়ের পাশে বিছানায় গড়াগড়ি যাব সেই চিন্তাতেই অধীর হয়ে গেলি।

এই বলে অনির্বাণকে কোন কথা বলতে না দিয়ে সন্দীপ চৌধুরী চৌরঙ্গীর দিকে গাড়ি ঘোরালেন। গাড়ি ছুটে চলল ফুল স্পিড ধরে।

আর গুনগুন করে গান করতে লাগলেন :

যাদু আর মিছে ভেবনা।
তোমার করে দিব ঠাঁই ঠিকানা।
আমার বাড়ী দিব বাসা, আশার আশা
ফুরাবে হবে সব বাসনা।
আমার নাম চাঁদে মাখিনী,
থাকি আমি একাকিনী
ভালবাসে রাজা-রাণী রাজ নন্দিনী
নিত্য করি আনা গণা।

সন্দীপ চৌধুরীর গানের গলাও ভাল তবে কোন কিছু নিয়েই বাড়াবাড়ি চর্চা করেননি ভদ্রলোক। সবই তাঁর কাছে এসেছে অযাচিতভাবে।

গাড়ি ছুটে চলেছে সার্কুলার রোড ধরে। রাস্তা একদম নির্জন। কচিৎ দু একটা ট্যাকসি হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে। অনেক রাতের নির্জন নিস্তব্ধ এই শহরটাকে দেখলে কেমন যেন মায়া হয়। বিরাট একান্নবর্তী পরিবারের গৃহকর্ত্রী গভীর রাত পর্যন্ত সবাইকে পরিচর্যা করে যেমন তাঁর আপন ঘরে এসে অদ্ভুত নিঃসঙ্গতা অনুভব করেন, তেমনি এই শহরটিও যেন সারা দিনের মুখরিত কলরবের শেষে নিঃসঙ্গ।

অনির্বাণের মাথায় ঘুরছে হোটেল রয়্যালে আজ সন্ধ্যার সেই রহস্যময়ী নারীর কথা। হঠাৎ আশ্চর্যভাবে দেখা হয়ে যাওয়া ডাঃ সান্যালের কথা।

সন্দীপ চৌধুরী বললেন, এই দেখ এই হচ্ছে পার্কস্ট্রীট ম্যানসন। ওই লোকদুটো ডেফিনিটলি মাগী বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে। দাঁড়া ওদের একটু ধাওয়া দি।

দুটো লোক রাস্তার পাশের একটি বড় বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে, বেশ মৌজ করে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছে সন্দীপ লোক দুটোর পিছনে গিয়ে আচমকা গাড়ির ব্রেক কষলেন। ক্যাঁচ করে শব্দ হতেই লোকদুটো চমকে উঠল। সন্দীপ চৌধুরী লোক দুটোর দিকে চেয়ে ডান হাতের দুটো আঙুল মুখে পুরে সিটি দিয়ে উঠলেন। লোকদুটো আরও ঘাবড়ে যেতেই সন্দীপ জোরে শীড দিয়ে গাড়ি ডান দিকে ঘোরালেন।

অনির্বাণ ব্যাপার দেখে হো হো করে হেসে উঠল।

রয়্যাল হোটেলের সামনে আসতেই অনির্বাণ দেখল একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে।

সন্দীপ বললেন, আরে এ যে ডাঃ সান্যালের গাড়ি। সান্যালটা এত রাতে এখানে কী করছে? অনির্বাণ, ব্যাপারটা না দেখে যাচ্ছি না।

সন্দীপ তাঁর গাড়িটা রাস্তার বাদিকে ট্রাম লাইনের ধারে দাঁড় করালেন।

অনির্বাণের ইচ্ছে হল আজ সন্ধ্যার ঘটনা সব সন্দীপ চৌধুরীকে বলে। কিন্তু ব্যাপারটা জানাজানি করা উচিত হবে না মনে করে সে কিছুই বলল না। তবে সে ভাবল আজ সন্ধ্যা থেকে বার বার এই রহস্যময় ঘটনার মধ্যে সে জড়িয়ে পড়ছে কেন?

একটু পরে সে দেখল হোটেলের দরজা দিয়ে একজন পুরুষের কাঁধে ভর দিয়ে নেমে আসছেন এক মহিলা। মহিলার মাথায় ঘোমটা। পুরুষের বয়স বছর পঞ্চাশেক। তার পরণে নিখুঁত সাহেবী পোশাক। মহিলাটি বেশ লম্বা, ছোহারা গড়ন। মুখ ঢাকা থাকায় কত বয়স হবে অনুমান করা যাচ্ছেনা। আর তাদের পিছনে পিছনে আসছেন আর কেউ নয় ডাঃ সান্যাল।

ডাঃ সান্যাল চাবি দিয়ে তাঁর গাড়ির দরজা খুলে ড্রাইভারের আসনে বসলেন। তারপর দরজা খুলে দিলেন। ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা গাড়ির ভিতর বসলেন। ডাঃ সান্যাল গাড়ি স্টার্ট দিলেন। তারপর এদিক ওদিক তাকিয়ে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে পার্ক স্ট্রীটের দিকে চলে গেলেন।

সন্দীপ চৌধুরী আপন মনে বললেন, মেয়ে ঘটিত ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে। মাগীটা কে তা বুঝতে পারলুম না?

অনির্বাণ বলল, হয়ত কোন পেশেন্ট চরে।

: হ্যাঁ, ডাক্তারের কাছে যারা আসে সবাই পেশেন্ট। কিন্তু এদিকটায় গেল কোথায়?

: চলুন দা, গিয়ে দেখি।

: না, নির্জন রাস্তা। কলো করলেই ধরে ফেলবে। দাঁড়া দেখি কোনদিকে যায়। দেখা গেল ডাঃ সান্যালের গাড়িটা একটু এগিয়ে বাঁ দিকে মোড় ঘুরল।

সন্দীপ চৌধুরী গাড়িটা ঘুরিয়ে পার্ক স্ট্রীটের দিকে চললেন। পার্ক স্ট্রীটে এসে পড়তেই দেখা গেল আগের গাড়ি অদৃশ্য হয়ে গেছে। সামনে দিয়ে দুজন পাহারাওয়ালা লাঠি ঠক ঠক করতে করতে এগিয়ে আসছিল। সন্দীপ গাড়ি থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, একটা কালো রঙের অ্যাম্বাসাডরকে যেতে দেখেছ?

পাহারাওয়ালা বলল, হ্যাঁ, কিছুক্ষণ আগে একটা অ্যাম্বাসাডর গাউডন স্ট্রীটের দিকে গেছে।

সন্দীপ গাউডন স্ট্রীটে গাড়ি নিয়ে গেলেন। দেখা গেল গাউডন স্ট্রীটের মেরিডিথ নার্সিং হোমের সামনে ডাঃ সান্যালের অ্যাম্বাসাডারটি পার্ক করা আছে। গাড়িতে কেউ নেই। বোধ হয় আরোহীরা নার্সিং হোমের ভেতরে ঢুকে গেছে।

সন্দীপ মন্তব্য করলেন, জেনুয়িন পেশেন্ট বলেই মনে হচ্ছে। কিন্তু এমন কে পেশেন্ট যে ডাঃ সান্যাল নিজে ড্রাইভ করে এনে নার্সিং হোমে তুলল।

অনির্বাণ বলল, এখানে যে একটা নার্সিং হোম আছে তাও জানতাম না। সন্দীপ বললেন, বেলভিউ ক্লিনিক এখন সবাইকে টেক্কা দিয়েছে। নয়ত মেরিডিথ নার্সিং হোমের খুব নাম ছিল। বড় লোকদের কেচ্ছার আড্ডাগাই ছিল এটা। ঢুকতেই দেখবি, অমুক ব্যারিস্টারের বউ, অমুক মিলমালিকের, অমুক সেক্রেটারিয়েটের মেয়ে সব চেক আপের জন্য ভর্তি হয়েছে। কেউ বা অ্যাপেণ্ডিসাইটিস অপারেশনের নাম করে অ্যাবর্শন নিয়েছে। সব ছেড়ে পেট খেলা কেস বুঝলিনা। একটা নার্সিং হোম কর, পাল হয়ে যাবি। ডাক্তারদের কেচ্ছার কথা আর বলিসনি।

যাক ওদের এখানে নিশ্চিন্তে থাকতে দিয়ে তোকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। নয়ত তোর বউ আবার আমাকে দুষবে।

সকাল বেলা ঘুম ভাঙল চীফ রিপোর্টারের টেলিফোনে। চোখ মুছতে মুছতে অনির্বাণ গিয়ে টেলিফোন ধরল।

: চাকরিটা আমার আর রাখবে না? চীফ রিপোর্টারের গলায় উত্তেজনার আভাস পেয়ে অনির্বাণ শঙ্কিত হয়ে উঠল।

: কী ব্যাপার বলুনতো?

: কাগজটাও এখনও পড়নি? কাল অ্যাসেম্বলি থেকে ফাঁকি মেরে চলে এলে? পার্লামেন্টারি মিনিস্টারের সঙ্গে একবার দেখাটাও করতে পারলে না? ডেপুটি স্পীকার রেজিগনেশন দিয়েছেন—এত বড় খবরটা মিস করলে? স্টেটসম্যান, আনন্দবাজার, যুগান্তর সবাই দিয়ে দিল, তুমি পেলে না?

: আমি জেনেছিলাম খবর আমাকে করতে হবে না। কল্পতরুবাবু করবেন।

তুমি দোষ চাপাচ্ছ কল্পতরুকে, কল্পতরু দোষ চাপাচ্ছে তোমার ওপর। তুমি আজকাল বড় সায়েক হয়ে গেছ। মনে রেখো দিও তোমাকে এ লাইনে আমিই এনেছিলাম। পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি করতে দেশসেবকে। সে কাগজ কোন জন্মে উঠে গেছে। রাস্তায় ক্যা ক্যা করে ঘুরে বেড়াতে এতদিন···।

: আমি তা অস্বীকার করছি না। কিন্তু সে সব কথা তুলছেন কেন?

: তুলছি, তোমার কাজে গাফিলতির জন্য আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হয় বলে। মিঃ ভাটিয়াকে আমি কী কৈফিয়ৎ দেব?

মিঃ ভাটিয়া ক্যালকাটা ক্রনিকলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর। নতুন এসেছেন ভদ্রলোক। পান থেকে চুন খসলে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধান। চীফ রিপোর্টার রাগে গর গর করতে করতে টেলিফোন রেখে দিলেন। কানটা গরম হয়ে উঠল। কাল ঘুমিয়েছে রাত তিনটের সময়। চোখটা

আলা করছে। সকালে উঠে বাজারে যাওয়ার কথা ভাবে। ন'টার মধ্যে মাধুরী খেয়ে অফিস চলে যাবে।

আজ ভোর হল দুঃসংবাদ বহন করে। খবরের কাগজের রিপোর্টারের চাকরি অনেকটা বিধবার একাদশীর মত। পালন করলে কোন পুণ্য নেই, কিন্তু না করলে দোষ। অনির্বাণ প্রতিদিন আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করে যাতে তার কাজের মধ্যে কোন ত্রুটি বিচ্যুতি না থাকে। যাতে তার কাজ নিখুঁত হয়, সুন্দর হয়, এজন্য সে প্রাণপণ চেষ্টা করে আসছে। সে যখন টাইপ রাইটারের সামনে লিখতে বসে তখন যাতে শব্দ চয়ন নিখুঁত হয়, রচনা নির্ভুল হয়, সে তার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে। বাঙ্গালীর ছেলের পক্ষে ইংরাজীর মত এক দুরূহ বিদেশী ভাষা নিখুঁত ভাবে আয়ত্ত করা কঠিন বলে সে নিজের সীমা সম্পর্কে সদা সতর্ক। কিন্তু কাল সে একদম ভাবতে পারেনি যে পরিদর্শীর মন্ত্রীর কাছে না গেলে একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর মিস হবে।

তাড়াতাড়ি অন্যান্য কাগজ বার করল অনির্বাণ। একটা দড়িতে বেঁধে কাগজগুলো হকার তার জোতদার বারান্দায় ফেলে দিয়ে যায়। দড়ি খুলে কাগজগুলো বার করল সে। প্রথমে আনন্দবাজার। প্রথম পাতার বাঁ দিকে প্রথম কলমে বোল্ড টাইপে ছাপা হয়েছে। হিন্দুস্থান স্ট্যানডার্ড প্রথম পাতায় তিনকলম বকস করেছে। স্টেটসম্যান ছেপেছে আটের কলমে প্রথম পাতায়। এক কলম হেডিং। তবে কনডেনসড টাইপ ব্যবহার করেছে বলে খুব চোখে পড়ছে খবরটা। রেজিগনেশন ঠিক দেননি। রেজিগনেশন দিতে গিয়েছিলেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধে পরে আবার প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। সাংবাদিকদের কাছেও কিছু বলতে অস্বীকার করেছেন। সেইজন্যই একটু কম গুরুত্বপূর্ণ খবর। তবে খবর হিসাবে খুবই মুখরোচক। ক্যালকাটা ক্রনিকল হালফিলের কাগজ। মাত্র দশবছর বয়স। এই দশবছরের মধ্যে কাগজের সারকুলেশন বাড়তির দিকে। কলেজের ছেলেরা, সরকারী অফিসাররা, অবাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মধ্যে এ কাগজের পাঠক সংখ্যা বাড়ছে। প্রেসটিজও অর্জন করেছে। সুতরাং কোন গুরুত্বপূর্ণ খবর মিস করা মানে কাগজের প্রেসটিজের ওপর আঘাত। মাধুরী এখনও ঘুমিয়ে। পল্লু কি উঠে তাড়াতাড়ি উনুনে আঁচ দিয়েছে। শরতের গায়ে এখনও আলিস্যি জড়ানো। পাশের ফ্ল্যাট থেকে রেডিওতে প্রাতঃকালীন অনুষ্ঠান সুরুর আগে পরিচিত মিষ্টি বাজনা বাজছে। এই বাজনাটুকুই যা মিষ্টি, তারপর যা শুরু হবে তা অশ্রাব্য। কিছু বাসি খবর, একটু বিরক্তিকর খেয়াল গান অথবা কর্তাদের কারও পেয়ারের অপরিচিত শিল্পীর গলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত। অনির্বাণ একদম রেডিও খোলেনা। কিন্তু প্রতিবেশীদের জন্য রেডিওর উৎপাত থেকে তার নিষ্কৃতি নেই। এইভাবে গিলতে গিলতে তার আধঘন্টার মত সময় কাটে। তারপর বাথরুমে গিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে বাজারে। বাজার থেকে ছুটতে ছুটতে এসে ছেলে মেয়ে টুকুন-টাকুনকে সে স্কুলে পৌঁছে দিতে যায়। ফিরে এসে দু একটি ফোন করে। কখনও কিছু লিখবার চেষ্টা করে। একসময় লিখত বাংলা কবিতা। কৃত্তিবাসে তার কবিতা বেরিয়েছিল। বুদ্ধদেব বসু তার কবিতার প্রশংসা করে দু তিনখানা চিঠি লিখেছিলেন। সে ইউনিভারসিটিতে পড়ার সময়কার কথা। কফি হাউসে সে তখন আড্ডা মারত। মোটামুটি তরুণ ইনটেলেকচুয়াল সমাজে তার পরিচিতি হয়েছিল। দু একটা কবিতা পাঠের আসরে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় নীরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে সে কবিতাও পড়েছে। সে সময় তার দু তিনজন নিয়মিত বান্ধবী ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগত ছন্দা সেনকে। অনির্বাণ জানত ছন্দা সেনের প্রেমিক আছে। আমেরিকায় থিসিস করতে গেছে ছেলেটি। যারা এ কথা জানত না তারা ছন্দাকে ভুল বুঝত। ছন্দার সহজ মেলা-মেশাকে প্রেম মনে করে তারা আঘাত সলিলে ডুবে মরত। তাদের সকলেরই ভুল ভাঙ্গল যেদিন আমেরিকা থেকে ফিরে ছেলেটি ছন্দাকে বিয়ে করে নিয়ে আবার আমেরিকা গেল।

সেসব কথা ভাবলে হাসি পায় এখন। অনির্বাণ যে কবিতা লিখত তা সে নিজেই ভুলে গেছে। সেদিন টুকুনকে নিয়ে একটা ছড়া লিখতে গিয়ে দেখে মিল খুঁজে পাচ্ছেনা। অনেক দিন পরে কোন পরিচিত জায়গাতে গিয়েও মানুষ পথ চিনতে পারে না।

মাধুরীর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল নাটকীয় ভাবে।

এখন তার সে কথা মনে হলে কী রকম লাগে। বিশ্বাস করতে মন চায়না। আসলে জীবন অনেকটা ক্রমশ প্রকাশ্য ধারাবাহিক উপন্যাসের মত। স্বয়ং ঔপন্যাসিক কিস্তিতে কিস্তিতে লিখে যান। তিনি নিজেও জানেন না পরের অধ্যায়ে কী আছে। মাধুরী তখন জিওলজিক্যাল সারভে লাইব্রেরীতে কাজ করত। ডিরেক্টর রঞ্জনাথনকে চাইতেই অপারেটর বার বার তিনবার লাইনটা লাইব্রেরীতে দিয়ে ছিল। আর তিন বারই ধরল মাধুরী। শেষের বার বেশ রেগে গিয়েছিল মাধুরী। অনির্বাণ বলেছিল, আপনি মিছি-মিছি চটছেন, দোষ আমার নয়। দোষ আমার ভাগ্যের নয়ত সাধে পড়ে বার বার মুখনাড়া খাব কেন? বেশ, মিঃ রঞ্জনাথনকে পেলে আপনার কথা বলব। আপনি বিনা দোষে আমাকে—

এবার মাধুরী বলেছিল, আমাদের ডিরেক্টরকে এ নিয়ে কেন টানাটানি করছেন?

: বাঃ, আপনি যা-তা করে বলবেন আর আমি তাঁকে বলব না?

: কিছুই এমন বলিনি। আপনি খুব বানাতে পারেন দেখছি। যাক, যা ভাল বুঝবেন করবেন। ধরুন, লাইনটা আমিই দিয়ে দিচ্ছি। ট্যাপ করে অপারেটরকে ধরল মাধুরী, সীমা, এই ভদ্রলোককে বার বার বং নামবার দিচ্ছিস কেন? ইনি ডিরেকটরের সঙ্গে কথা বলবেন।

সীমা নামে টেলিফোন অপারেটর বলেছিল, কে কথা বলবেন?

অনির্বাণ বলেছিল, বলুন অনির্বাণ চৌধুরী অফ ক্যালক্যাটা ক্রনিকল। বললেই বুঝতে পারবেন।

সঙ্গে সঙ্গে নামটাও জানা হয়ে গেল মাধুরীর। তারপর অফিসেই একদিন মাধুরীর ফোন পেয়ে অবাক অনির্বাণ।

: বাবাঃ। তিনদিন আপনাকে খুঁজেছি, আপিসে থাকেন না নাকি?

: কে বলছেন আপনি?

: আমি মাধুরী সেন।

: কোন মাধুরী সেন, আমি তো চিনি—

: জিওলজিক্যাল সারভে অব ইণ্ডিয়ার—

: ও বুঝতে পেরেছি। তা কী মনে করে?

: সেদিন আপনার সঙ্গে ঝগড়া করেছিলাম। আপনি খুব চটে রয়েছেন বুঝতে পারছি।

: না না, ও অমন হয়েই থাকে। তা আপনার খবর কী?

মাধুরীর সঙ্গে এই ভাবেই আলাপ। প্রথম তিন চার মাস শুধু টেলিফোনে। কিছুতেই দেখা করবেনা মাধুরী। শেষে বহু পীড়াপীড়ির পর রাজি হয়েছিল দেখা করতে। এবং ওই প্রথম দেখার আর তিন মাসের মধ্যেই ওরা বিয়ে করেছিল।

বিয়ের পর বছর খানেকের মধ্যে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে আলাদা বাসা করেছিল অনির্বাণ। ভেবেছিল এতে মাধুরীকে খুশী করা যাবে, কিন্তু যায় নি। কথা পড়ে কোন দিক থেকেই সুখী হতে পারল না অনির্বাণ। বিধবা মায়েরও মুখ ভার হল। মাধুরীও খুশী হল না। ভেবেছিল অফিসের কাজের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে সব কিছু ভুলে যাবে সে, কিন্তু এ এক অদ্ভুত প্রফেশান—এখানে তৃপ্তি পাওয়া বড় শক্ত। অথচ উটের খাঁচা গাছ খাওয়ার মত নিজেকে বঞ্চিত করেই তৃপ্তি।

সে শুনেছে যে পাখিকে আফিম খাওয়ানো হয় তাকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিলেও সে আফিমের নেশা ছাড়তে পারে না। তাই সে সাংবাদিকতার খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।

বাথরুম থেকে বেরুতে না বেরুতেই আবার টেলিফোন। অনির্বাণ তাড়াতাড়ি গিয়ে ফোন ধরল। ফোন করছেন একজন মন্ত্রী। অনির্বাণবাবু, আজ বিকেলে একটু আসতে পারবেন? পাঁচটা নাগাদ আমার ঘরে চলে আসুন।

: কিছু ভাল খবর টবর আছে নাকি?

: আছে। এলেই পাবেন। দেখা হলে অন্য কথা হবে। আচ্ছা ছাড়ি।

তাড়াতাড়ি বাজার সেরে টুকুন টাকুনকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে অনির্বাণ যখন ফিরল তখন ন'টার সাইরেন বাজছে।

মাধুরীর স্নান সারা হয়ে গেছে।

অনির্বাণ বলল, পঙ্কজ বোস আজ তোমার সঙ্গেই বেরুবো।

: এত সকাল সকাল ?

: আমার একটু কাজ আছে। কয়েক জায়গায় যেতে হবে।

: লাইব্রেরী থেকে ফেরার সময় আমি একটু নিউ-মার্কেট হয়ে আসব।

: বেশ তো।

: তোমার কাছে ত্রিশটা টাকা হবে ? ভয় নেই ফিরে দেব।

: হবে বোধ হয়। দেখ, ড্রয়ারের মধ্যে।

এক এক সময় অনির্বাণের মনে হয় সে ও মাধুরী যেন এক অফিসে চাকরী করে। দুজনে শুধু সহকর্মী, সহমর্মী নয়। শুধু কতগুলো দেনা পাওনা আর সামাজিক সৌজন্য শিষ্টাচারের ওপর তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক দাঁড়িয়ে আছে।

খাওয়া দাওয়া সেরে অনির্বাণ ও মাধুরী বেরিয়ে পড়ল। অনির্বাণ মোড়ের মাথায় একটা ট্যাকসি পেয়ে গেল। মাধুরীকে বলল, চল, তোমাকে সার্কুলার রোডের মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিই।

: সেখান থেকে আমি কী করে বাসে উঠব ? দরকার নেই তোমার লিফটের।

: আচ্ছা এস তোমাকে চৌরঙ্গী রোডেই নামিয়ে দিচ্ছি।

মাধুরী বলল, কিন্তু দরকার নেই তুমি চলে যাও।

এই বলে মাধুরী গট গট করে হেঁটে বাস স্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে এল।

ট্যাকসিওয়ালা তক্ষণ মিটার ডাউন করে হাঁ করে তাকিয়ে আছে। ট্যাকসিটা ছাড়াও যাবে না আবার এগিয়ে গিয়ে মাধুরীর মান ভাঙাতে গেলে যদি কোন দৃশ্যের অবতারণা হয়—সে কথা মনে করে অনির্বাণ আর এগুতে সাহস করল না। পাহাড়ী জায়গার মত কখন যে চল নামে তা আগে থেকে আঁচ পাওয়া মুস্কিল।

অনির্বাণ ট্যাকসিতে উঠে বসে বলল, চল, সাউথ পিঠ।

বেরিয়েই নার্সিং হোমের সামনে অনির্বাণ নামল। কাল থেকে তার মাথায় একটা রহস্যের জট পাকাচ্ছে। নিজেই সে জট খোলার চেষ্টা করছে অনির্বাণ। কিন্তু প্রতিবারই জট আরও জটিল হয়ে উঠছে।

ট্যাকসির ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে নার্সিং হোমের ভেতর ঢুকল অনির্বাণ। তিনতলা বাড়ি। রিসেপশনে বসে এক মহিলা। বয়স বছর চল্লিশ। সিঁথিতে ছোট্ট সিঁদুরের রেখা। তার চেয়ে আরও বক্তিম দুটি ঠোঁট। সাত সকালে ম্যাকসল্যাকটর বুলিয়ে অফিসে আসতে হয়েছে তাকে। এরকমই চাকরি।

ভদ্রমহিলা টেলিফোন অপারেটর কাম রিসেপশনিস্ট।

অনির্বাণকে খুঁজে বার করতে হবে কাল রাতে ভর্তি হওয়া রোগিনীর পরিচয়।

সে রিসেপশনে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল : ডাঃ সান্যাল আছেন ?

: না। উনি আজ বারোটা নাগাদ আসবেন।

অনির্বাণ বলল, আমার এক পেশেন্ট আছে। ডাঃ সান্যাল বলেছিলেন আজ সকালে এসে খোঁজ নিয়ে যেতে সিট খালি আছে কী না।

মহিলা বলল : উনি কাল সারারাত ছিলেন হাসপাতালে। আজ তাই আসতে একটু দেরী হবে।

: কিন্তু সিট খালি আছে ?

মহিলা বললেন, না। আজ অবধি খালি দেখছিনা।

অনির্বাণ বোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল, এইত সাত নং রুম খালি দেখছি।

: ওখানেই তো কাল রাতে ডাঃ সান্যালের পেশেন্ট ভর্তি হয়েছে।

: তাহলে লিখে রাখেন নি কেন ?

: পারমিশন রাখা আছে।

অনির্বাণ একটু অন্তরঙ্গতার ভান করে বলল, বলুন না পারমিটটা কে ?

: আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

: আমার নাম বললে আপনি চিনতে পারবেন না।

আমি অনাত্মীয় নই। আমার মা অত্যন্ত অসুস্থ। ডাঃ দাস্যাল বলেছিলেন আজই ভর্তি করতে পারবেন।

কবে বলেছিলেন ?

: কাল সকালে।

: কাল রাতেই এমারজেনসি রোগী ভর্তি করা হয়েছে। কাস্টমসের জয়েন্ট চীফ কনট্রোলার মিঃ উপাধ্যায়ের স্ত্রী। দয়া করে কাউকে বলবেন না। ব্যাপারটা গোপনীয়।

: আপনি বিশ্বাস করতে পারেন। কিন্তু এখন কী করা যায় বলুন তো ?

: বেলভিউ কিংবা হ্যাকিংটনে চেষ্টা করতে পারেন। হ্যাকিংটনের চীফ মেটরন আমার পরিচিত। ডাঃ দাস্যাল ওখানেও যান। বলেনতো আমি বলে দিতে পারি।

অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি বরং আগে আর একবার ডাঃ দাস্যালের সঙ্গে কথা বলে দেখি।

অনির্বাণ নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে পড়ল। ঐ রহস্যময়ী মহিলা তাহলে কাস্টমসের জয়েন্ট কনট্রোলার মিঃ উপাধ্যায়ের স্ত্রী ! কিন্তু স্ত্রীকে নিয়ে হোটেলে তুলবার কারণ কি ? না, সমস্ত ব্যাপারটা আরও গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

কনট্রোলার অব কাস্টমস উপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করা দরকার। পার্কষ্ট্রীট থেকে হাঁটতে হাঁটতে অনির্বাণ চৌরঙ্গী মোড়ে এল। সেখানে একটা ভিড়ে ভর্তি ট্রামে উঠে সে ডালহাউসির কাস্টমস হাউসে এল। ওখানে তার বন্ধু সুনির্মল কাজ করে। ওপরওয়ালাদের গতিবিধি সম্পর্কে সে বিশেষ ওয়াকিবহাল।

সুনির্মল অনির্বাণকে দেখে খুশী হল। অনির্বাণের জীবনে বন্ধু জুটতে দেরী হয় না কিন্তু টেঁকে না কেউ। সুনির্মল তার কলেজ জীবনের বন্ধু। একসময় একসঙ্গে থিয়েটার সিনেমায় যাওয়া সবই ছিল। কিন্তু মাঝখানে এক আকস্মিক কারণে বন্ধুত্বে ছেদ পড়েছিল। একদিন কথায় কথায় সুনির্মল তার এক নতুন আলাপ হওয়া ছেলের নাম করেছিল অনির্বাণের কাছে। ছেলেটির নাম সুন্দর। স্বভাব চরিত্র মোটেই সুবিধার নয়। সুন্দরের দাদার সঙ্গে অনির্বাণের ভাল আলাপ ছিল। অজয়ই প্রায় দুঃখ করত ভাইয়ের জন্যে। অনির্বাণ বলেছিল, ওকে তো আমি চিনি। ওর সঙ্গে একটু সাবধানে মিশো।

সুনির্মল ঐ কথাটা বলে দিয়েছিল সুন্দরের প্রেমিকা রঞ্জনাকে। রঞ্জনা আবার সুন্দরকে বলতেই সুন্দর বেগে মেগে সুনির্মলকে মারতে গেল। সুনির্মল তখন আত্মরক্ষার জন্য বলেছিল, তোমার দাদাই তো তোমার সম্পর্কে এসব কথা বলে বেড়ায়। আমাকে মারতে আসছ কেন ? সুন্দর তখন অনির্বাণের অফিসে ছুটে গিয়েছিল। বলুন, আমার দাদা কী বলেছে আপনাকে ?

সে এক বিশ্রী অবস্থা। কত রাজেশাই না এসে জোটে অনির্বাণের জীবনে। এরপর তিন চার বছর সুনির্মলের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ ছিল। মাস ছয়েক আগে বাসে দেখা সুনির্মলের সঙ্গে। নিজেই যেচে কথা বলল। বার বার বলল, আমার অফিসে এস একদিন। ও সব কথা ভুলে যাও। যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। ছ'মাস পরে আজ অনির্বাণের সুনির্মলের কথা মনে হল।

সুনির্মলকে পাওয়া গেল ক্যান্টিনে। অনির্বাণকে খাতির করে বসিয়ে চা আর কেকের অর্ডার দিল সুনির্মল।

: তারপর, তোমাদের কাগজ ক্রমশ স্বতন্ত্র পার্টির লাইন ধরছে। এত বি-অ্যাকশনারি কথাবার্তা লিখছে। এমন কি ইনক্রেমেন্ট বন্ধের লাগুয়াই হিসাবে গুরেজ ফিগ পর্যন্ত সাজেসট করেছে। আর একজন টিপ্পনি কাটল, থুকে দি আই এম লাইন।

সুনির্মল বলল, যা বলেছেন বীরদা। তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি—আমার কলীগ বীরেশ্বর চক্রবর্তী।

বীরেশ্বরবাবু নমস্কার করে বললেন, আচ্ছা আপনাদের ম্যানেজিং ডিরেকটর মিঃ দিল্লীওয়ালা কী তালমিয়াদের জামাই ?

অনির্বাণ বলল, যতদূর জানি, দিল্লীওয়ালা প্রফেশনাল ডিরেকটর। উনি কারও আত্মীয় নন। আমাদের কাগজের শতকরা ৩০ ভাগ শেয়ার বাজারে ছাড়া আছে, ৭০ ভাগের মধ্যে ৬০ ভাগ কনট্রোল করে গুজরাটিরা আর ১০ ভাগ বাঙালীরা। কিন্তু স্বতন্ত্র পার্টির সাপোর্টার অভিযোগটা

ঠিক নয়। বরং আমাদের অভিযোগ কাগজ বড্ড বেশী ব্যবসায়ী ঘেঁষা হয়ে যাচ্ছে। একটু ব্যালেন্স করা দরকার

সুনির্মল বলল, ক্যালকাটা ক্রনিকল ব্যবসায়ী ঘেঁষা একথা অতিবড় বি-অ্যাকাউনটিও বলবে না।

কথার মাঝে অনির্বাণ জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা তোমাদের জয়েন্ট চীফ কনট্রোলার মিঃ উপাধ্যায় কেমন লোক ?

সুনির্মল বলল, খুব কড়া অফিসার। সম্প্রতি ওর বউ মারা যাওয়ার পর থেকে আরও তিরিক্ষে মেজাজের হয়ে উঠেছেন।

: বউ মারা গেছে ? কতদিন হল ?

: তা এক বছর হবে, তাই না বীরেশ্বরদা ?

বীরেশ্বররাবু বললেন, তা হবে।

অনির্বাণ খুব উৎসাহ বোধ করল। তার যা খবরের দরকার ছিল হয়ে গেছে। উপাধ্যায় বলে লোকটি যাকে নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিয়ে রেখেছে সে তাহলে নিজের স্ত্রী নয়। তাহলে কে সে ?

: উপাধ্যায় কোন স্টেটের লোক ?

: বম্বের জানি ইউ, পি। লখনৌতে বাড়ি। নিজের ছেলেকে ভারত অয়েলে এবিয়া ম্যানেজার করে ঢুকিয়ে দিয়েছে। অন্তত পনের জন অফিসারকে সুপারসিড করেছিল সে সময়। রিংসে এ নিয়ে একটা খবরও বার হয়েছিল।

: ওর কয় ছেলে ?

: তা জানিনা। ওই এক ছেলের কথাই জানি। তুমি আবার এসব নিয়ে লিখবে নাকি ? তোমাদের বিশ্বাস নেই, সব কিছুই করতে পার।

: তুমি এখন কিছু গোপন খবর দাওনি যা ফাঁস হলে তুমি গোলমালে পড়ে যাবে।

: যাই হোক। তবুতো সরকারী চাকরী। তার ওপর ছোট চাকরী।

: ছোট গাছেই তো বড় ফল লাগে।

: এখানে ঠিক উলটো। ওয়াটার ফ্লোজ ডাউন-ওয়ার্ডস।

অনির্বাণ অফিসে গেল। ওদের অফিসটা মৌলালির কাছে কলেজের রোডে। চৌরঙ্গী এলাকার অফিস হলে অনেক সুবিধা হত। তাছাড়া তাকে ট্রামে বাসেই যাতায়াত করতে হয়। তাদের ডিপার্টমেন্টে একটি মাত্র গাড়ি আছে। কিন্তু অধিকাংশ দিনই বিজ্ঞাপনের কাজে চলে যায়।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বিভাগ হল কিংস অন রেজিমেন্টের মত। সবার ওপরেই তাদের হাঁক ডাক। ভাবখানা এই, আমরা আছি বলেই কাগজ চলছে। সব বিষয়েই তাদের টপ প্রায়োরিটি।

তাছাড়া ক্যালক্যাটা ক্রনিকলের ভবিষ্যৎও অনিশ্চিত। যে গুজরাতি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানটির হাতে এ কাগজের অধিকাংশ শেয়ার তাদের আরও একটি কাগজ আছে বোম্বাইয়ে। ওঁরা চাইছেন ক্যালক্যাটা ক্রনিকলকে ওঁদের বোম্বে থেকে প্রকাশিত ভারত এক্সপ্রেসের সঙ্গে অ্যামাল-গামেট করিয়ে দেবেন।

তখন কাগজ বার হবে দিল্লি আর বোম্বে থেকে। কলকাতায় নাকি ইংরাজী কাগজের ফিউচার নেই। এজন্য ওঁরা কলকাতায় আর এক্সপ্যানসান করতে চান না।

অফিসে যেতেই ওর দু'চার জন সহকর্মী মুখ চাওয়া-চায়ি করল।

অনির্বাণ কালকে একটা খবর মিস করেছে—এতে তার যে অপমান আর লজ্জা এ তার একারই। কেউ তার সমব্যথী হবে না। একজন ধমক খেলে অন্য সহকর্মীরা উল্লসিত হবে। পৃথিবীর সবচেয়ে স্বার্থপর পেশা এই সাংবাদিকতা। এ পেশা শুধু সহকর্মীদের পরস্পরের মধ্যে ঘৃণা, ঈর্ষা আর অবিশ্বাস জন্মে দেবার জন্যই যেন তৈরি হয়েছে। এ পেশা মানুষকে অহংকারি করে তোলে, আত্মম্ভরী করে তোলে। চারপাশে জমবদ্ধ পরিবেশের মধ্যে অনির্বাণ যেন মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে ওঠে। বোধ হয় এই জন্যই অনেকে তাদের মধ্যে ছিটকে যায়। কিন্তু অনির্বাণ যদি রোজ চুর হয়ে থাকতে পারত।

অনির্বাণ ভাবে, না, সে বড্ড বেশী পেসিমিস্ট হয়ে যাচ্ছে। তার চীফ রিপোর্টার বলেন, আমরা অনেক কিছু বড় আলগা ভাবে দেখি, তাই আমাদের মনে শুধু অন্ধকারই জমে। আমরা একটু বিচার। কিন্তু সব সময় রিক্ততা থেকেই তিক্ততা আসার না। তেতো গাছও সজীব হয়।

ফুল দেয় ফল দেয়, ছায়া দেয়। কিন্তু সমাজের উপকারের জন্যই তাকে তেতো হয়ে জন্মাতে হয়। যেমন ধর নিম বৃক্ষ। নিম তেতো বলেই সে ওষধি।

ভূয়োদর্শী ভদ্রলোক বড় সুন্দর করে কথা বলতে পারেন। এককালে ইনিও সাহিত্যকে ভালবেসে সাংবাদিকতাকে আশ্রয় করেছিলেন। কিন্তু যখন বুঝতে পারলেন ভুল হয়ে গেছে। সাহিত্য ও সাংবাদিকতা দুই সতীন। দুজনকে নিয়ে ঘর করা যায় না। তিনি সাহিত্যকে ছেড়ে এই সাংবাদিকতাকেই আঁকড়ে ধরলেন।

চীফ রিপোর্টার তাঁর আসনে ছিলেন না। একটু পরে এলেন। অনির্বাণকে ডাকলেন। অনির্বাণ দুরু দুরু বুকে তাঁর সামনে গিয়ে বসল।

: তোমাকে বার বার করে বলি একটু চোখ কান খোলা রাখো। নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারে কেউ এভাবে? এক তো ম্যানেজমেন্ট বার বার বলছে কলকাতার কাগজ চালু রেখে কোন লাভ নেই। সারকুলেশন এমন কিছু উল্লেখযোগ্য ভাবে বাড়ছে না। আমরা বার বার অনুরোধ করছি তার আর কিছু দিন দেখুন, আর সেই মুহূর্তে এত বড় মিস একটা!

: আমি ভেবেছিলাম কল্যাণবাবু এ খবরটা পাবেন। তিনিতো পলিটিক্যাল খবর করেন।

কল্যাণবাবু বলছেন, ওটা অ্যাসেমবলির খবর। ওটা তার এক্তিয়ারের বাইরে। দোষ তোমারই। অ্যাসেমবলি তাড়াতাড়ি অ্যাডজর্ণ হয়ে গেল আর তুমি দুহাত তুলে নাচতে নাচতে বেরিয়ে পড়লে। অমন বাড়ি যাব বাড়ি যাব মন করলে রিপোর্টার হওয়া যায় না। আমি যখন তোমার মত বয়সে স্বদেশ কাগজে কাজ করতাম তখন রাত বারোটায় গ্যালট প্রুফ দেখে দিয়ে প্রত্যেকদিন বাড়ি ফিরতাম। আজ যাও লালবাজারটা একবার ঘুরে এস। কলকাতায় এত হ্যাটে চুরি বাড়ছে এ সম্পর্কে পুলিশ কি করছে একটা স্টোরি চাই।

অনির্বাণ অফিস থেকে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে শিয়ালদা পর্যন্ত এল। তারপর বউবাজারের ট্রাম ধরে লালবাজার গিয়ে নামল।

লালবাজারে পুলিশ কমিশনার থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিভাগের নাম টেনসপেকটরদের সঙ্গে অনির্বাণের আলাপ। দিনের পর দিন সে হিপারটমেনটে গিয়ে অফিসারদের সঙ্গে আড্ডা দিয়েছে। কাজপটি খেয়েছে। সুখ দুঃখের গল্প করেছে।

বাইরে ওদের দারুণ রাশভারি চেহারা। নির্দয় নিষ্ঠুরতার কেউ কম যায় না। আসামীদের কাছ থেকে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য এরাই বেধড়ক পিটোয়। আবার এরাই অনির্বাণের কাছে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। কেউ বলে দশ-বছর ধরে প্রমোশান হল না। কেউ দুঃখ করে বলে, পাঁচবছর ধরে অফিসিয়েটিং করছি কনফারমড হতে পারলাম না। দিদিকে একবারটি আমার হয়ে বলুন না দাদা। কেউ বলে, ভাবছি পুলিশের চাকরি ছেড়ে দেব। ভদ্রলোকের চাকরি এটা নয়। বিশ্বাস করবেন গত পাঁচ বছর ধরে একটা দিনও অফ পাইনি।

অনির্বাণ লালবাজারে গিয়ে সবার আগে দেখা করল সুব্রত দত্তর সঙ্গে। সুব্রত দত্ত গোয়েন্দা বিভাগের একটি শাখার ইনসপেক্টর। বছর চল্লিশেক বয়স। বয়সের আন্দাজে চুলে পাক ধরেছে। ধুতি পাঞ্জাবি পরেই অফিসে আসে। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই যে লোকটি এমন কাজ গোয়েন্দা অফিসার।

সুব্রত দত্তর সঙ্গে অনির্বাণের সম্পর্ক খুব ভালই। এখন তা মোটামুটি বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। সুব্রত দত্ত অনির্বাণকে বিশ্বাস করে অনেক কথাই বলে। জানে, অনির্বাণ তাকে কোনদিন ডোবাবে না। খবরের সূত্র যারা তাদের আস্থা অর্জন করাই এই বৃত্তির সব চেয়ে জরুরি অঙ্গ। সুব্রত তাকে অনেক বার কয়েকটি ভাল ভাল খবর দিয়েছেও। পুলিশের চাঞ্চল্যকর খবর ডি সি বা সিপির কাছে পাওয়া যায় না। পাওয়া যায় এই সব নীচু তলার অফিসারদের কাছেই। অনির্বাণদের ডিপার্টমেন্টেই দু' একজন নাক-উঁচু রিপোর্টার আছে যারা বলে, জেলুটি সেক্রেটারির নীচে কোন অফিসারের সঙ্গে আমরা মিশি না। কিন্তু অনির্বাণ এই রিপোর্টে বিশ্বাস করে না। সে জানে অনেক সময় একজন অতি সাধারণ বেয়ারা পর্যন্ত খবরের সূত্র

হতে পারে। কখন যে কাকে দরকার লাগে তা বোঝা মুশকিল।

সুব্রত অনির্বাণকে দেখে বলল, এই যে আসুন। খবর?

: আপনার কী খবর বলুন।

: আমার খবর এই যে দেখতে পাচ্ছেন, বলে সামনের চেয়ারে বসা দুটি লোকের দিকে দেখাল। লোক দুটির বয়স চারের ঘরে। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। পরণে আধময়লা ধুতি পাজামা। কাঁচু মাচু মুখ করে বসে আছে। এই চেহারা অনির্বাণের পরিচিত। বিচারাধীন আসামী এরা। নতুন নাম দিয়েছেন অপরাধ-বিজ্ঞানীরা—হাবাইট কলার ক্রিমিন্যাল। ধোপদুরস্ত জামা কাপড় পরা ভদ্রলোক এরা।

সুব্রত বলল, এই দেখুন, ইনি হলেন ভবরঞ্জন সেনগুপ্ত এম-এ বি-টি, কাবাতীর্থ, গোলন্ড মেডালিস্ট। অবশ্য সবটাই বলল। কিন্তু ম্যাট্রিক ফেল—না ম্যাট্রিকটা পাশ করেছিল টেনেটুনে।

ভবরঞ্জন বলে, না স্যর, আমি ম্যাট্রিক পাশ। ববিলাপে জেলা স্কুলের ছাত্র ছিলাম।

: এত দিন এম-এ বি-টি বলে বেশ তো চালিয়েছিলে। আবার কাবাতীর্থ! বল নয়ঃ পক্ষের কথা বল সাধু। ভবরঞ্জন থতমত খেয়ে যায়।

সুব্রত ওর পেটে কলের খোঁচা দিয়ে বলে ওঠে, কীরে ব্যাটা চীট, কোরটুয়েন্টি, মুখ দিয়ে দেখি যা বেরুচ্ছেনা এখন?

পাশের লোকটিও মাথা নীচু করে বসেছিল। সুব্রত লোকটির পেটেও আর একটি কলের খোঁচা মেরে বলে, দেখুন অনির্বাণবাবু, আর এক ধর্মপুত্তুর। ইনি হচ্ছেন হুঁড়ির সাক্ষী বাতাল! ইনি সব জেনে শুনে এই ভবরঞ্জনের জন্য চাকরি যোগাড় করে দিতেন, জলপাইগুড়ি রাজেন্দ্র শিক্ষামন্দিরের চাকরিটা ইনিই যোগাড় করে দিয়েছিলেন। সেখানে একবছর চাকরির পর যখন উনি সার্টিফিকেট দেখাতে পারেন না, তখন এই সার্টিফিকেট কলকাতা থেকে চিঠি লিখছে, ভবানীপুর তারিনীচরণ ইনস্টিট্যুশনে তোমার জন্য চাকরি যোগাড় করেছি, চলে এস। তারপর উনি—

লোকটি বলার চেষ্টা করে, না স্যর আমি জানতাম না যে ভবরঞ্জন ম্যাট্রিক পাশ—

: আবার মিথ্যে কথা! সুব্রত ধমক দিয়ে ওঠে। লোকটা চুপ করে যায়।

অনির্বাণ বলে, কবের কেস?

: গত রবিবার অ্যারেস্ট হয়েছে। আজ কোরটে হাজির ছিল। লিখতে তো পারবেন না, সাবস্ক্রাইব।

: না। কোর্ট রিসোর্টারই ফেলে। জামিন হয়েছে?

: না। আরও সাতদিন রিমান্ডেড। ম্যাজিস্ট্রেট খুব কড়া। তা কাবাতীর্থ মশায়। আমাদের সেনট্রাল লক-আপে আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

ভবরঞ্জন বলে, বড্ড মশা স্যর। আর দারুণ পেচ্ছাপ গন্ধ।

সুব্রতর আশে পাশে যারা বসেছিল সবাই হেসে ওঠে। সুব্রত বলে, এই জমাদার কে আছে? আমাদের কাবাতীর্থ মশাইর গায়ে ভাল করে ডি ডি টি চড়িয়ে তবে লক আপে পাঠাবে। নতুন মশার কামড়ে ওঁর ঘুম হবে না।

আবার সবাই হেসে ওঠে। এমন সময় একটি ছাত কাটা ছেলে কেটলি আর কয়েকটা মলিন কাপ হাতে করে এসে ডেকে গেল, চা লাগবে নাকি স্যর?

সুব্রত অনির্বাণকে বলল, চা খাবেন?

অনির্বাণ বলল, না, এই মাত্র চা খেয়ে আসছি। তখন সুব্রতবাবু, আপনার সঙ্গে একটা প্রাইভেট কথা আছে।

অনির্বাণ সুব্রতকে নিয়ে বারান্দার এক কোণে গেল। এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। একটু খোঁজ নিয়ে যদি আমায় কিছু বলতে পারেন তাহলে একটা বিরাট খবর হবে।

সুব্রত বলল, কী ব্যাপার বলুন তো?

অনির্বাণ তখন গতকাল রাত্রির থেকে যা ঘটেছে সব বলে গেল।

সুব্রত সব শুনে বলল, অনির্বাণবাবু, আজ রাতে আপনার সঙ্গে কোথায় দেখা হতে পারে?

অনির্বাণ বলল, সন্ধ্যা সাতটায় গ্রেসলাবে একটা ককটেল পার্টি আছে। ন'টার পর আমি ফ্রি।

: তাহলে ঠিক ন'টার সময় আপনি গ্রানডের সামনে আসবেন। আমরা কোথাও বলব। এই ব্যাপারটা সম্পর্কে আমরাও কিছু কিছু খবর রাখি।

: বলেন কি ?

: হ্যাঁ, অনির্বাণবাবু। আমরা বোধহয় বেশীদূর এগুতে পারব না। অনেক কারণ আছে। তবে আপনি অনেক খানি সাহায্য করতে পারেন। সেইজন্যেই বোধহয় এই যোগাযোগটা এই ভাবে হল।

অনির্বাণ বেশ আশ্চর্য হয়ে গেল। তাহলে তার অনুমান বৃথা নয়। নিশ্চয়ই সে যা অনুমান করেছে তা ঠিক। একদিকে সে যেমন উত্তেজনা অনুভব করল অন্যদিকে সে তেমন তৃপ্তি পেল। তাহলে তার চিন্তা অভ্রান্ত পথেই এগুচ্ছে। হয়ত একটা ভীষণ কেলেংকারির খবর সে বন্ধ করতে পারে। ইংলণ্ডের কীলার স্টৌবি কিংবা বোট্যানিক্যাল গার্ডেনে মধুচক্রের মত কোন চক্র।

সে ওখানে আর দাঁড়াল না। তাকে এবার রুটিন খবর সংগ্রহ করার জন্য কমিশনারের কাছে যেতে হবে।

প্রেসক্লাবে ককটেল দিয়েছিলেন একটি প্রখ্যাত জুতো কোমপানি। কোমপানির সেলস ম্যানেজার স্বয়ং তদারক করছিলেন। বিরাট প্যাণ্ডেল বাঁধা হয়েছে। একটা ভ্যান বোঝাই মদ আর সোডার বোতল এসেছে। প্রেস ওয়ার্লডের কেউ বাকী নেই।

পি. আর. ও শম্ভু সেন চরকির মত ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর কারও গেলাস খালি দেখলে বলছেন, বেয়ারা এদিকে একটা হুইসকি।

না-না—ওয়ান হুব দি রোড। আবার কাউকে বলছেন, সেকী দাদা, এমন তো কথা ছিল না। এখন মাত্র সাড়ে আটটা, এর মধ্যে চলে যাবেন কী ? লিখতে হবে ? ওসব লেখা টেখা রেখেবেন না দাদা। একদিন না লিখলে দেশের কোন ক্ষতি হবে না। যাকে বলা হল তিনি একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট এডিটর। তিনি বললেন, আমাকে আজ আবার প্রাইবিশনের এগেনস্টে লিখতে হবে।

পি. আর. ও, শম্ভু সেন বলে, তাহলে তো আর এক পেগ হয়ে যাওয়া দরকার। দু পেগে কী এগেনস্টে লেখা বেরুবে ?

: দু পেগ কে বলল ? ফিল ইজ দি সিক্সথ গ্লাস।

একজন এগিয়ে এসে বলল, ডোণ্ট টেল মাই বিজনাথ। আমি দেখছি তুমি সেই তখন থেকে একটা গ্লাস হাতে করে দাঁড়িয়ে আছ।

পি আর ও বলল, আপনিই তাহলে বলুন দাদা। উনি আমাদের বোকা বানিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। বোর্ন, শিপ্রী সাহেবকে হুইসকি।

আসর বেশ জমে উঠেছে! কেউ আকণ্ঠ পান করে বকর বকর করছে। কেউ রবীন্দ্রনাথ আওড়াচ্ছে। কেউ বলছে, ক্লাস সিরেস আর কী ইংরাজী লেখে! ইংরাজী লিখত ফরোয়ারডের শশী মুখুজ্যে। তিন বুড়ির বয়সে মদ খেয়ে খেয়ে লিভার পচে মারা গেল। মদ না খেলে ইংরাজী লেখা যায় না!

পি আর ও'র কানে কানে সেলস ম্যানেজার তাগিদ মাঝে মাঝে কী বলছেন।

পি আর ও ঘাড় নাড়ছে।

পি আর ও ডিপারটমেন্টের আরও তিন চার জন কর্মীও তদারক করছে।

তাদের একজন অনির্বাণের কাছে এসে বলল, অনির্বাণবাবু, আজ আপনি টম্যাটো খাচ্ছেন কী ব্যাপার ?

অনির্বাণ বলল, আমি ভাই খাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। পেটে সহ্য হয় না। অম্বল হয়।

ড্রিঙ্ক করার পর একটু লেবুর রস গরমজল দিয়ে খেয়ে নেবেন। কিছু হবে না। আর সোডাটা বড় ক্ষতি করে। সোডাটা অ্যাভয়েড করবেন।

অনির্বাণ বলল, আজতো আর কিছু মুখে দিচ্ছিনা।

এমন সময় গণকণ্ঠর বিশোটার এসে বলল, অনির্বাণ, তোমাদের কাগজের অবস্থা নাকি খারাপ ?

: ভাল নয় এটুকু বলতে পারি।

: দেখ, তোমাকে বলি, তুমি কিছু মনে কোর না, এই বেলা ক্যালকাটা ক্রনিকল তুমি ছেড়ে দাও। দিল্লিওয়ালা সম্প্রতি বোম্বাই দিয়েছিলেন। জৈন অ্যাণ্ড কোহতা

কোম্পানির হাতে তো সিকসটি পারসেন্ট শেয়ার ছিল। খোলাবাজারের সব শেয়ার তারা বেনামিতে কিনে নিয়েছে। বাঙ্গালী ডিরেক্টর শঙ্কর রায়কেও তারা রাজি করিয়েছে। কলকাতার কোম্পানি তারা শিগ্রী তুলে দেবে।

: তুমি এত খবর কী করে জানলে ?

রিপোর্টারতো। সব খবরই আমার কাছে আসে।

গণকণ্ঠ এখন ছোট কাগজ। এককালে খুব নাম ছিল। হাঁক ডাকও ছিল। এখন কাগজের ভগ্ন দশা। কর্মচারীরা ঠিকমত মাইনেই পায় না। রিপোর্টারেরা অন্য জায়গায় পার্ট টাইম চাকরি বাকরিও করে। তবে তাদের মধ্যে দু'একজন চালু রিপোর্টার আছে। যেমন এই নীলাদ্রি সরকার। সব সময় একটা পোর্টফোলিও ব্যাগ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। অনেক ভেতরের খবরও রাখে ছোকরা। অনির্বাণ ঘড়িতে দেখল ন'টা বাজে! সে তাড়াতাড়ি পিছন দিক দিয়ে সরে পড়ল। অন্ধকার ময়দানের ওপাশে কলকাতা ঝলমল করছে! ঠিক অন্ধকারের আস্তরণ পেরিয়ে আকাশের তারারা যেমন ঝিকমিক করে তেমনি।

ভাবতে ভাবতে সে বলেছে নীলাদ্রি সরকার যা বলে গেল তা যদি সত্যি হয়! দু একটি ভাল ভাল কাগজে লোক নিল। সে সময় সে চেষ্টা করলে চাকরি পেয়ে যেতে পারত। হেভি ইঞ্জিনীয়ারিং-এ পি, আর, ওর চাকরিও পেয়েছিল একবার। নেয়নি। সাংবাদিকতা ছাড়তে পারেনি শেষ মুহূর্তে। ক্যালকাটা ক্রনিকলের ওপরেও তার মায়া পড়ে গিয়েছিল। এই কাগজেই তার হাতে খড়ি। জার্নালিজম পাশ করে প্রথমে একশ টাকা মাইনেতে সে ঢুকেছিল! তারপর দু বছর পরে সে চাকরি পেয়েছে। পাঁচ বছর তার চাকরি হয়ে গেল। সাতশ টাকার মত মাইনে পায় সে। মাধুরী শ চারেক টাকা পায়। কিন্তু এ টাকা সেই-ই হাতে করে খরচ করে। শাড়ি কেনে। জমায়। টুকিটাকি জিনিস কিনে আনে। অনির্বাণ কোনদিন মাধুরীর টাকায় হাত দেয়নি। মাধুরীর টাকার ওপর ভরসা করেনা সে।

কিন্তু আজ যদি তাদের কাগজ উঠে যায় তাহলে কী হবে! বোম্বাইয়ে কিছু স্টাফকে ওরা নেবে হয়ত। কিন্তু অনির্বাণকে ওরা নেবে বলে মনে হয় না। কারণ অনির্বাণই ছুনিয়র মোস্ট। তা বাদে বোম্বেতেও ওদের এসটাবলিশমেন্ট বেশ বড়। কলকাতা থেকে সবাইকে ওরা নেবে না।

: যাবেন নাকি স্যার ?

পাশ দিয়ে ফিস ফিস করে এই কথাটা বলে কে চলে গেল। অনির্বাণ তাকিয়ে দেখল কাঁধে গামছা ফেলা লুঙ্গি পরা একটা লোক। তার দিকে তাকিয়ে আছে।

এ সময়টা চৌরঙ্গীতে বেজ্জা আর বেজ্জার ঝাপাল গিজ গিজ করে। বেজ্জাদের সম্পর্কে একটা ফিচার লিখলে কেমন হয় ? অনির্বাণ মনে মনে হাসল। কাগজে লিখে এদেশে কোন সমস্যার সমাধান হয় না সে ভালমতই জানে। প্রতিদিনই তো কত ভাল ভাল কথা লেখা হচ্ছে কাগজে। তার চার ভাগের এক ভাগও যদি কর্তৃপক্ষ মেনে নিত তাহলে দেশের আজ এ অবস্থা হত না। অবশ্য এমন একটা ফিচার লিখলে তার পকেটে ত্রিশটা টাকা আসবে—এইটুকুই লাভ।

দ্রুত পায়ে চৌরঙ্গী রোড পার হয়ে অনির্বাণ গ্রান্ডের সামনে এসে দাঁড়াল! বইয়ের স্টলে দাঁড়িয়ে বই দেখছিল সুব্রত দত্ত। ঠিক সময় মতই এসেছে। অনির্বাণকে দেখে চুপি চুপি বলল, আপনি ঠিক ওপারে ডবলু বি-জে ৪৭৩২৮৭ নম্বর গাড়ির কাছে চলে যান। এক সঙ্গে যাব না।

অনির্বাণ আবার ওপরে এল। সারি সারি গাড়ি পার্ক করা আছে। তার মধ্যে ৪৭৩২৮৭ নম্বর গাড়িটাকে খুঁজে পাওয়া গেল। একটি কালো রঙের অ্যামবাসাডর। ড্রাইভার অনির্বাণকে দেখে চিনতে পারল। দরজা খুলে দিয়ে বলল, বসুন।

অনির্বাণ বসতেই সুব্রত এসে পৌছল। পাশে বসে বলল, কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েই দেখি এস, বি-র একজন অফিসার আসছে। এস বি-র লোকদের আমরাও ভয় করি। পারলে ওরা বাবাকেও

ধরিয়ে দেয়। আপনার সঙ্গে আমাকেও একসঙ্গে দেখলেই একটা রিপোর্ট হয়ে যেত।

পুলিশের নিজেদের মধ্যেও এমন গোয়েন্দাগিরি চলে নাকি?

: এই বৃত্তিটাই এমন যে কেউ কাউকে ছেড়ে কথা বলে না। সবাই সবাইর ওপর নজর রাখে। একজনের গোয়েন্দা আর একজন নষ্ট করে দিতে চেষ্টা করে। তবে আমাদের ক্রিমিন্যাল সেকসনে এই খাওয়াখাওয়িটা একটু কম! এখানে অন্তভাবে প্রেসার আসে।

: যেমন?

যেমন ধরুন, আপনি একজন চোর বা পিক পকেটকে ধরলেন আপনার কেসে। সে আবার কোন অফিসারের লোক। ওই অফিসার চেষ্টা করবে তাকে ছাড়িয়ে নিতে। আগে থেকে জানতে পারলে তাকে পালিয়ে যেতেও সাহায্য করবে। এ ছাড়া পলিটিক্যাল প্রেসার তো আছেই। ফলিং পার্টির সাপোর্ট থাকলে তাকে ধরা মুশকিল। এ সব আবার লিখবেন না যেন।

অনির্বাণ বলল, না-না। এই গাড়িটা আপনার নাকি?

সুব্রত বলল, আপনার মুখে ফুল চন্দন পড়ুক। ইনস-পেকটরের চাকরি করে যদি গাড়ি রাখতে পারতাম তাহলে আর ভাবনা থাকত না। এটা আমাদের ডি-ডি র গাড়ি। আজ রাত বারোটায় একটা রেইড আছে। আপনার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে অফিসারদের ভুলে নিয়ে রেইডে যাব।

: বড় রকমের কিছু নাকি?

: কিছুই না, মামুলি। আপনার কাছে যে বড় খবর আছে তার চেয়ে বড় খবর এই মুহূর্তে আর কিছু হতে পারে বলে আমার জানা নেই।

: কোন খবরের কথা বলছেন?

: বাই অ্যাকসিডেন্ট আপনি যে খবরের সূত্র পেয়েছেন।

: সেতো ইনকমপ্লিট। কিছুই বুঝতে পারছিনা।

: আমি বাকীটা বললেই বুঝতে পারবেন। গাড়ি ততক্ষণে পার্কস্ট্রীটে পড়েছে। সুব্রত বোধহয় আগে থেকেই বলে রেখেছিল। পার্কস্ট্রীট দিয়ে ঘুরে গাড়ি আবার ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটে ঢুকল। একটি চীনা রেস্তোরাঁর সামনে এসে গাড়ি থামল।

গাড়ি থেকে নেমে সুব্রত ড্রাইভারকে বলল, বুকুল তুমি বাড়ি থেকে খেয়ে এস। ঘন্টাখানেক পর এখানে গাড়ি নিয়ে আসবে।

বুকুল বলল, ঠিক আছে স্যর।

রেস্টুরেন্টের ভেতর আধা আলো আধা অন্ধকার। খুব একটা ভিড় নেই। সুব্রত অনির্বাণকে নিয়ে দোতলায় উঠল। এখানে গোটা চার পাঁচ টেবিল। কিন্তু একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলে আর একটি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে একটি টেবিলে মুখোমুখি বসে আইসক্রিম খেতে খেতে তন্ময় হয়ে গল্প করছে। সুব্রত একদম কোণের টেবিলে এসে বসল। ওয়েটার মেনু নিয়ে এল। সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, কী খাবেন?

অনির্বাণের খাবার খুব ইচ্ছা ছিল না। কারণ সে প্রেস ক্লাবের পার্টিতে তিন গেলাস টমাটো আর এক গেলাস পাইন অ্যাপেল জুস খেয়েছে। সেই সঙ্গে চিকেন কাবাব, চিজ পকৌড়া। পার্টিতে মাছও খেয়েছে ক্ষেপে ক্ষেপে। ডাম সালেজ ছিল প্রচুর, সে খায়নি। ডাম ও বীফ খেতে তার কী রকম গা বমি-বমি করে। তার অন্যান্য কলীগরা অবশ্য সর্বভুক। অনেকে বীফের এমন ভক্ত পারলে একটা আস্ত গরুই বুঝি খেয়ে ফেলে দেয়।

অনির্বাণ বলল, আপনি খান! আমার খুব একটা খেতে ইচ্ছে করছেনা। এইমাত্র পার্টি থেকে এলুম।

সুব্রত বলল, তবু কিছু একটা খান। টমাটো সুপ খান অবশ্য আপনার নেশাটা কেটে যাবে।

অনির্বাণ হেসে বলল, আমি ড্রিঙ্ক করিনি। নেশা কাটবার প্রশ্নই ওঠেনা।

: আই অ্যাম সরি। তাহলে তো কোন কথাই নেই। ওয়েটারের দিকে তাকিয়ে সুব্রত বলল, দুটো টমাটো সুপ, চিকেনের কী নেবে? ফ্রায়েড চিকেন দাও।

ওয়েটার সাজেস্ট করল; প্রণ দেব?

: না, আমার অ্যালার্জি আছে। অনির্বাণবাবু প্রণ নেবেন?

: না না।

: ঠিক আছে দু প্লেট ফ্রায়েড চিকেন। আর ফিস ফিঙ্গার এক প্লেট।

ওয়েটার চলে যেতে সুব্রত এদিক ওদিক একবার ভাল করে দেখে নিয়ে বলল, আপনাকে তাহলে একটা গল্প বলি শুনুন। কলকাতার ম্যাপে গুডনাইট কাফে বলে একটি বার আর রেস্টুরেন্ট আছে আপনি জানেন?

: না।

: সাধারণ লোক জানে না। কারণ এই রেস্টুরেন্টের বাইরে কোন সাইনবোর্ড নেই। একটু গলির ভেতর একতলায়। সামনে একটা সাধারণ চায়ের দোকান। যারা জানে, তারাই একমাত্র জানে। আমিও এতদিন আছি অথচ গুড নাইট কাফে চিনতাম না। চিনেছি বছর তিনেক আগে। যখন বার চেকিং এ যেতাম সেসময়। ওই সময় আমার সঙ্গে আলাপ হয় সুদর্শন সিং-এর সঙ্গে। সুদর্শনকে আমি অ্যারেস্ট করে এনেছিলাম। কেন সে কথাই বলছি।

ডি ডি তে তখন নতুন এসেছি। ডি সি ডি ডি তখন মিঃ অরুণাংশু দত্ত। মিঃ দত্ত একদিন আমায় বললেন, সুব্রত, চীফ মিনিস্টারের কাছে কে কমপ্লেন করেছে তালতলা থানার বারগুলোতে আবার আই, টি, কেস বেড়ে যাচ্ছে। দু একটা রেড করে অ্যারেস্ট করে দাও। ডিসি বললেন, গুড নাইট কাফেটার ওপর একটু নজর রেখ হে। ওটাতো শুনেছি পুরো বেআপটি হয়ে উঠেছে।

বার চেকিং-এ সেই প্রথম দিন বেরুলাম। আর প্রথম দিনই অ্যারেস্ট করলাম সুদর্শন সিংকে। নিয়ম হচ্ছে কোন বারে আন অ্যাকমপ্যানিড উওম্যান থাকতে পারবে না। গুড নাইট কাফেতে সেলরদের ভিড়। সেখানে জুক বকসে ইংরাজি গানের রেকর্ড বাজছে। আর জোড়ায় জোড়ায় মাতাল পুরুষ ও মেয়েরা হৈ হল্লা লাগিয়েছে। সেখানে গোটা ছয়েক মেয়ে পাওয়া গেল। বারের কোন কাস্টোমার জোটেনি।

মালিককে তলব করলাম। ছুটতে ছুটতে এল সুদর্শন সিং। বাড়ি হরিয়ানায়। কলকাতায় বছর পনের আছে। আমাকে কাঁচু মাচু হয়ে বলল, এই দেখুন স্যর, যখন ঢোকে তখন দিব্যি সঙ্গে পুরুষ ছিল···

আমি ধমক দিয়ে উঠলাম, আমাকে শেখাতে আসছ? পুরুষগুলো উবে গেল, তাই না? তোমার রেস্টুরেন্টে প্রতি রাতে প্রস্টিটিউশান হয় তুমি জান না?

আমি কী করে জানব স্যার। সেলাররা আমাদের বড় খদ্দের, তারা মেয়েছেলে বাইরে থেকে নিয়ে আসে। আমরা কাউকে তো আর তাড়িয়ে দিতে পারি না। উই আর লিগ্যালি রাইট যদি তারা বেআইনী কিছু না করে। এর মধ্যে থেকে কেউ যদি আনঅ্যাকমপ্যানিড ঢুকে পড়ে— তাহলে কী করব স্যার···

: চোপ রাও। ওসব কোন কথা শুনতে চাই না। চল লালবাজার।

: এতদিন ধরে রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছি, পুলিশের সঙ্গে কোন ঝামেলা হয়নি স্যর।

আপনি তালতলার বড়বাবুকে একবার ফোনে জিজ্ঞাসা করুন আমার সম্বন্ধে—।

বুঝতে পারলাম, থানার সঙ্গে বেশ সদ্ভাব রেখেই চলে সুদর্শন সিং। আমাদের রেডের খবর থানাকে আমরা ইচ্ছা করেই জানাই না। কারণ তাহলে আগে থেকেই ওরা সতর্ক হয়ে যাবে। থানাগুলোও অপরাধীদের চেয়ে বেশী চোখ রাখে আমাদের ওপর।

সুদর্শন আর মেয়ে ক'টাকে লক আপে পুরে দিলাম। পরদিনও কোর্টে জামিন পেল না সুদর্শন। পাচদিনের জন্য রিমাণ্ডেড। ফরোয়ারডিং নোটে বুদ্ধি করে লিখে দিয়েছিলাম যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এ সম্পর্কে অভিযোগ গিয়েছিল যে এই রেস্টুরেন্টে বেআইনী পাপব্যবসা বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।

কথা বলতে বলতে আমাদের খাবার এসে গেল। সুব্রত বলল, নিন, আরম্ভ করুন! সুব্রত আবার সুরু করল। পরের দিন দুপুরে অফিসে বসে আছি। সে সময় ডিপারটমেন্টে একটি মেয়ে এসে ঢুকল। অপূর্ব সুন্দরী মেয়েটি। শাম্পু করা চুল! ঠোঁটে লিপস্টিক, লম্বায় অন্তত পাচ ফুট পাচ ইঞ্চি। গায়ের রঙটা একটু চাপা। মেয়েটির

গায়ে শরীরে এমন একটা সেক্স অ্যাপিল যে যে-কোন পুরুষ তার দিকে না তাকিয়ে থাকতে পারবে না।

মেয়েটি পরিষ্কার বাংলায় বলল, আমার নাম শৈলা সিং। সুদর্শন সিং আমার হাসব্যানড। আমি তাকে বলতে বললাম। সে বলল, আমার স্বামী অসুস্থ মানুষ। ওঁর লাইনাসের ট্রাবল আছে, হার্টও উইক। ওঁকে দয়া করে জামিনের ব্যবস্থা করুন। ওতো আর পালিয়ে যাবে না।

আমি বললাম, জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করেছেন ম্যাজিস্ট্রেট, তা আমি কী করব বলুন।

শৈলা বলল, কিন্তু পুলিশ জামিনের বিরোধিতা করেছে বলেই ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দিলেন না। আপনারা তো আবার প্রেয়ার করতে পারেন, জিজ্ঞাসাবাদ যা করার তা সব শেষ হয়ে গেছে। এখন ম্যাজিস্ট্রেট জামিন দিলে আপত্তির কিছু নেই।

: আইন বেশ জানেন দেখছি। তা আপনার স্বামী এসব নোংরা ব্যাপারের মধ্যে যান কেন?

সেলারদের এনটারটেন করার জন্যই এই রেস্টুরেন্ট। পৃথিবীর অন্যান্য পোয়েটে এর চেয়ে অনেক আকর্ষণীয় ব্যবস্থা আছে।

: তাই বলে মেয়েছেলেদের বেআইনী ব্যবসা করতে হবে?

: উনি তো আর এসব করেন না। সেলররাই মেয়ে নিয়ে আসে, ড্রিঙ্ক করে। চলে যায়।

: বাজে কথা বলবেন না, গুডনাইট ক্লাবে বাজারের মেয়েদের নটোবিদ্যাস ম্যেস অব রাঁদেভু।

মেয়েটি ধমক খেয়ে ছল ছল চোখে চুপ করে থাকল। মনটা একটু ভিজে আসছিল, হাজার হোক পুরুষ মানুষ তো। আমি বললাম, আপনি এত সুন্দর বাংলা শিখলেন কোথায়?

শৈলা বলল, আমি বাঙ্গালী।

শৈলা ডি-সির কাছেও গিয়েছিল। ডি-সি আমাকে বললেন, এসব কেসে বেলতো হয়ে যায়। আমরা রুটিন অবজেকশন দিই। এটার মধ্যে চীফ মিনিস্টারের নাম আনায় কেসটায় একটু ইমপরটানস বেড়েছে। কাগজেও বেরিয়েছে। ক্যালক্যাটা ক্রনিকলে তো ফারস্ট পেজে বেরুল : প্রে হাউস অব সেক্স রেডেড'। খবরটা কী আপনি লিখেছিলেন নাকি অনির্বাণ বাবু? অনির্বাণ বলল, যতদূর মনে পড়ে—না।

সুব্রত বলল, ডি-সিরও মনটা নরম হয়েছিল। তিনি বললেন, দিন, একটা পিটিশন করে। কী আর হবে! এমনিতেই যথেষ্ট শাস্তি হয়েছে। আর এসব কেস কোর্টে কতখানি টিঁকবে বলা শক্ত।

সুদর্শন জামিন পেল। এবং কী করে জানি না কোথা থেকে ম্যানেজ করল। ডি সি একদিন ডেকে বললেন, সুব্রত, সুদর্শন সিং-এর কেসটা ফাইল করে দাও।

আমি বললাম, কেন স্যার? কী ব্যাপার বলুন তো।

ডি, সি বললেন, হোম সেক্রেটারি ফাইলটা চেয়েছিলেন ডিসকাস করতে বলেছিলেন। আমাকে ডেকে বললেন। এই কেস আর চালিয়ে কী হবে? একটু নজর রাখুন তাহলেই হবে।

যতদূর মনে হচ্ছে ওপরওয়ালারাও এই কেস চালাতে চান না। আমি সি, পির সঙ্গে কনসালট করলাম। তিনিও একথা বললেন। আমরা চুনোপুঁটি এসবের মধ্যে যাই কেন? আর কেস চাপার ব্যাপারে এটাতো আর নতুন কিছু ঘটনা নয়। মনে নেই সিমেন্টের অত বড় কেসটা এতদূর এগিয়েও চাপা দিতে হল! আর সে তুলনায় এটা তো একটা পেটি কেস।

সুদর্শন সিং ছাড়া পাবার পর আমাদের কাছে মাঝে মাঝে আসত। ওর বউ শৈলা সম্পর্কে আরও অনেক খবর পেলাম। শৈলা এক বাঙ্গালী ক্রিশ্চিয়ান পরিবারের মেয়ে। লেখাপড়া খুব বেশীদূর এগোয়নি। কলেজে পড়ার সময় এক আড়কাঠির পাল্লায় পড়ে সিনেমা লাইনে কিছুদিন ঘোরাঘুরি করে শেষ পর্যন্ত সে পারক স্ট্রীটের এক রেস্টুরেন্টে ক্লনার কাজ নেয়। সুদর্শনের সঙ্গে ওই সময়ই তার আলাপ।

শৈলা অসাধারণ বুদ্ধিমতী মেয়ে। গুড নাইট ক্লাবে সেই-ই নাকি চালায়। যদিও কোনদিন সে এখানে আসে না কিন্তু গুড নাইট ক্লাবের হিসাবপত্র তার নখদর্পণে।

এমন কি কোন মদের সঙ্গে কোন মদ মিশিয়ে বিক্রি করলে এবং তাতে কি পরিমাণ জল ঢাললে গায়ের মাত্রা চড়ে যায় এও তার জানাশুনা।

আরও জেনেছিলাম, শীলার সঙ্গে ওপর তলার অনেকেরই জানাশোনা। সমাজের ওপরের দিকে তার আনাগোনা। তবু আমার মত লোকের কাছে শীলা যে এসেছিল তার একটা বড় কারণ যে শীলা জানে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে যাওয়া উচিত নয়।

এমনি করেই কয়েকটি বছর কেটে গেল। হঠাৎ মাস খানেক আগে সুদর্শন আমার কাছে এসে কাঁচুমাচু হয়ে বলল, স্যর, আমার সর্বনাশ হয়েছে। আমি বললাম, কী হয়েছে সুদর্শন, তোমার কী সর্বনাশ হল? সুদর্শন বলল, স্যর আমার বউকে ধরে নিয়ে গিয়েছে উপাধ্যায় সাহেব।

: উপাধ্যায়? কোন উপাধ্যায়?

: জয়েন্ট কনট্রোলার অফ কাষ্টমস্।

জয়েন্ট কনট্রোলার অব কাস্টমসকে আমি চিনতাম। ডিঁয়রের অফিসার বলে তাঁর নাম আছে। আমি যখন পি, বি, আইতে ছিলাম তখন তাঁর কাছে কয়েকটি কেসের তদন্তের ব্যাপারে যেতে হয়েছিল। অমায়িক সজ্জন ভদ্রলোক। ধার্মিক লোক। কপালে ফোঁটা কেটে অফিসে আসেন। সেই উপাধ্যায় সুদর্শনের বউকে চুরি করবে—কী বলছে কী সুদর্শন?

সুদর্শন বলল, হ্যাঁ স্যর, মাস কয়েক আগে কনট্রোলার সাহেব আমার কাছে রেড করতে এসেছিলেন। আমি করেন একসচেঞ্জ আর বিদেশী জিনিস পত্রের বেনাবেচা করি। দেখুন স্যর, চৌরঙ্গীর রাস্তার প্রকাশ্যে করেন গুডস বিক্রী হচ্ছে, যে কোন দোকানে যান করেন সিগারেট পাবেন, বড় রেস্তোরাঁয় যান করেন লিকর পাবেন, কত দোকান আছে জলার আর পাউণ্ড বিক্রি করে লাল হয়ে গেল। আমি পেটি মারচেন্ট যেহেতু আমার রেস্তোরাঁয় করেনাররা আসে যেহেতু আমাকে হারাস করা হচ্ছে। এসবই কনসপিরেসি। মিথ্যে কথা বলব না স্যর, অনেক সময় করেনাররা আমাকে পাউণ্ড কিংবা ডলারে পে করে। তাদের কাছে একসচেঞ্জ থাকে না। আমি তাদের কাছ থেকে হিসাব করে ওই পাউণ্ড ডলারই নিই। এমনি করে কিছু পাউণ্ড আর ডলার জমেছিল। হাজার খানেক টাকা হবে সবশুদ্ধ। উপাধ্যায়জী সব সিজ করে নিয়ে গেলেন। আমার নামে কেস লিখে নিলেন। লোক্যাল থানায় কেস হল বলে আপনারা জানেন না।

ওই রেডের সময় শীলার উপর তাঁর চোখ পড়ে গেল সুব্রতবাবু। অনেকে বলে শীলাকে আগে দেখে তিনি আমাদের বিপদে ফেলবার জন্যই রেডটা করেছিলেন। আমি অত বুঝতে পারিনি। শীলা ব্যবসাপত্র দেখে। নানান জায়গায় যায়। সে গিয়েছিল উপাধ্যায়জীর অফিসে যেমন এসেছিল আপনার কাছে। গিয়েছিল রিকোয়েসট করতে। যাতে ওই কেস উপাধ্যায়জী তুলে নেন।

এরপর শীলাকে দেখতাম কেমন যেন গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। সে আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত সুব্রত-বাবু। আমাকে বিয়ে করবার জন্য সে নিজের মা-বাবাকে ছেড়েছিল। ওর বাবা-মা ওকে হোটেলে গান গাওয়াতো। সেই পয়সায় তারা খেত। কিন্তু পাঞ্জাবির সঙ্গে বিয়ের বেলাতেই তাদের ছিল যত আপত্তি। তার একটা কারণ মেয়েকে তারা বিয়ে দিতে চায়নি। যতক্ষণ তাকে শোষণ করা যায় ততক্ষণ তাকে তারা ধরে রেখে দিতে চেয়েছিল।

আমাদের একটি মাত্র মেয়ে! মেয়েটির বয়স তিন-বছর। মেয়েটিকে বড় ভালবাসত শীলা।

প্রায় দিন সাতেক আগে শীলা উধাও হয়ে যায় বাড়ি থেকে। অফিস টাইমে সে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বলে গেল আমি উপাধ্যায়জীর কাছে যাচ্ছি। ফিরতে একটু দেরী হবে। কিন্তু সে আর ফিরল না। আমি বিকেল বেলা ছুটে গেলাম উপাধ্যায়জীর অফিসে। আমাকে বেয়ারা ঢুকতে দিল না। রাত্তির বেলাও শীলা ফিরল না। পরদিন থানায় ডায়রি করতে গেলাম। ও. সি একটু মুচকি হেসে বললেন, ডায়রি করছেন করুন, কিন্তু কিছুই করতে পারবেন না। তারপর পাগলের মত আপনার কাছে ছুটে আসছি সুব্রতবাবু। আমার দৃঢ় বিশ্বাস উপাধ্যায়জী তাকে আটকে রেখে দিয়েছে।

আপনি তাকে উদ্ধার করে দিন। মেয়েটা আমার কেঁদে কেঁদে মরে গেল।

আমি অবাক হয়ে গেলাম সব শুনে। উপাধ্যায়জী যে শীলাকে লুকিয়ে রাখতে পারে এমন সন্দেহ করাও যায় না। অথচ কোথায় গেল শীলা? জলজ্যান্ত মেয়েটা উবে গেল নাকি এ শহর থেকে। অনেক বুঝিয়ে সুদর্শনকে ফেরৎ পাঠালাম। কিন্তু বিবেক বলেও তো একটা জিনিস আছে। ডি সির কানে তুললাম কথাটা। ডি সি বললেন, একটু এনকোয়ারি করে নেই। সন্ধ্যাবেলা বলব কী করণীয়। সন্ধ্যাবেলা ডি. সি আমায় বললেন, সুব্রতবাবু, আমায় কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না। শীলার ব্যাপারটা ইগনোর করাই ভাল বলে মনে হচ্ছে। মেয়েটি অ্যাডাল্ট। যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। তা বাদে স্বভাব চরিত্রও ধোয়া তুলসী নয়। চেপে যান।

আমি বললাম, কিন্তু স্যার, একজনের বিবাহিতা স্ত্রীকে এভাবে—

ডি. সি বললেন, উপাধ্যায়জীর কাছে শীলা না থাক তার খবর তিনি জানেন। উপাধ্যায়জী বোকা নন। সমস্ত আটঘাট বেঁধেই তিনি কাজ করেছেন। সুদর্শনের বিরুদ্ধে যে ফরেন এক্সচেঞ্জের মামলাটা হয়েছে সেটাকে সূত্র করে তিনি নাকি একটা আন্তর্জাতিক স্মাগলিং গ্যাং ট্রেস করতে পারবেন। আর এ ব্যাপারে শীলাকে অ্যাপ্রুভার হতে রাজি হতে হয়েছে।

: তার স্বামীর বিরুদ্ধে?

হ্যাঁ, এটাই সরকারের কাছে উপাধ্যায়জীর বক্তব্য। কাগজপত্র তিনি তৈরি করেই রেখেছেন। শীলাকেও তিনি নাকি নিরাপত্তার খাতিরে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে উপাধ্যায়জীকে অনেক হোমরা চোমরা লোকই মদত দিচ্ছেন। এ ব্যাপারে আমাদের নাক না গলানোই ভাল। ডিনায়স মিনিস্ট্রি ভাবতে পারে আমরা তাদের কাজে অযথা নাক গলাচ্ছি। আমাদের হাতে এখন পঁচিশটা মার্ডার কেস, তিনটে ব্যাঙ্ক ডাকাতি, দু'শ বাঘোটা স্মাচিং, প্রচুর কাজ করার আছে। তাই ওসব কথা ছাড়ুন। নিজেদের কথা ভাবুন। সুদর্শন এলে ভাগিয়ে দেবে।

সুদর্শনকে আমি ভাগিয়ে দিয়েছি। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। সেই থেকে মনটা খুঁত খুঁত করছিল। হঠাৎ আপনার কাছে সব শুনে আশার আলো দেখতে পাচ্ছি অনির্বাণবাবু। আপনি যাকে দেখেছেন সেই-ই শীলা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিসেস উপাধ্যায় নামে তাকে—ছি-ছি। সমস্ত ব্যাপারটা জলের মত পরিষ্কার হয়ে উঠছে অনির্বাণ বাবু। এখন যদি সমস্ত ব্যাপারটা ছাপাতে পারেন তাহলে একটা বিরাট কেলেঙ্কারির কথা প্রকাশ পাবে। আপনি ব্যাপারটি আরও তদন্ত করুন। তারপর লিখুন—এটা একটা চাঞ্চল্যকর খবর হবে।

টুকরো টুকরো ছবি জোড়া দিতে দিতে একটা বিরাট ল্যাণ্ডস্কেপ হয়ে উঠছে। অনির্বাণ অবাক হয়ে ভাবছে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে একটা বিরাট বিষধর সাপ ফণা তুলে এগিয়ে আসছে। খাওয়া হয়ে এসেছিল।

সুব্রত জিজ্ঞাসা করল, আইসক্রিম খাবেন?

: না।

: তাহলে চলুন ওঠা যাক। আমার আবার নৈশ অভিযানের সময় হয়ে এল। যে কথা বললাম, দেখবেন খবরদার আমার নাম যেন ঘুণাক্ষরে না প্রকাশ হয়। আপনাকে বন্ধু ভেবেই বললাম।

: আমি কথা দিচ্ছি। একথা আমি আর আপনি ছাড়া কেউ জানবে না। কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে গেল সুব্রত বাবু। শীলা নারসিং হোমে কেন?

: হৃদয় অসুস্থ। তাঃ সান্যালকে একটু চাপ করুন না।

: না। তাহলে অযথা সন্দেহ করবেন। কাজের ক্ষতি হবে। অন্যভাবে এগুতে হবে।

: আপনি সেই ভবানীপুরেই আছেন?

: হ্যাঁ।

: চলুন, আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আসি।

অনির্বাণ আপত্তি করল না। তার গাড়ি নেই। এই মাইনাতে কোনদিন সে গাড়ি করতেও পারবেনা। কলকাতার ট্রামে বাসের এই প্রচণ্ড ভিড়ে একটা গাড়ি থাকার মত আরাম নেই।

গাড়ির স্বপ্ন! অনির্বাণ নিজের মনে হেসে উঠল।

যার চাকরিরই কোন স্থিরতা নেই, সে ভাবছে গাড়ির কথা। তার চেয়ে মাঝে মাঝে এমন রিপোর্টের অফার পেলে সে আপত্তি করে না। এই উঞ্ছবৃত্তির লোভটুকু সে সামলাতে পারে না।

রাতে শুয়ে শুয়ে মাধুরী বলল, জান, আজ আবার আমাদের সবিতার পাত্তার সেই সন্দীপন বলে ছেলেটি এসেছিল। সবিতাকে নিয়ে গেল অলিম্পিয়াতে। আমাকেও বলছিল, মাধুরীদি আপনিও চলুন না। আমি বললাম, না বাবা, তোমাদের কপোত কপোতীর মাঝে গিয়ে আমি রসভঙ্গ করব না।

মাধুরীর আজ মেজাজটা ভাল। তার মেজাজটা আজ বেশ ভাল। এক এক একদিন সে স্বাভাবিক ভাবেই কথাবার্তা বলে। অনির্বাণ তখন ভাবে, আহা মাধুরী যদি চিরকাল এমন ব্যবহার করত। কিন্তু তা হয় না। অধিকাংশ দিনই তার মেজাজের সামনে দাঁড়ানো যায় না। তার চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন বেরুতে থাকে। গলার শিরা ফুলে ওঠে।

অনির্বাণ হালকা মুহূর্তটাকে দীর্ঘস্থায়ী করে রাখার জন্য আলোচনায় যোগ দেয়। সবিতা মাধুরীর সঙ্গে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে কাজ করে, খুব কম বয়স মেয়েটির। বছর উনিশ কুড়ি হবে, বেশ মিষ্টি চেহারা। সবিতা মাধুরীর সঙ্গে কয়েকবার এসেছেও। রিপোর্টারের সম্পর্কে তার দারুণ কৌতূহল। সে অনির্বাণকে দেখে বলেছিল, নিমাই ভট্টাচার্যের লেখা পড়ার পর একজন রিপোর্টারের সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে ছিল। আচ্ছা উনি (নিমাই বাবু) কোন কাগজে আছেন ?

অনির্বাণ মাধুরীকে বলে, ওদের একদিন চা খেতে বাড়িতে ডাকো না।

মাধুরী বলে, আমি বলেছিলাম, মাধুরীর নাকি লজ্জা করে। সে বলে, বিয়েটা হয়ে যাক, তারপর দেখবে তোমাদের বাড়ি গিয়ে পড়ে থাকব। তখন তাড়িয়ে দিতে পথ পাবে না। তা আমি বলেছি ওসব অনেক দেখা আছে। কত আসবি সে আমার জানা আছে !

অনির্বাণ বলল, আজকাল নেমন্তন্ন না করলে কেউ কারও বাড়ি অমনি অমনি বেড়াতে আসে না।

মাধুরী বলে, আমরাও বা কার বাড়ি যাই। কতদিন একটা সিনেমা দেখিনি বলতো !

: চলনা, এই রবিবার একটা সিনেমা দেখে আসি।

: ছেলেমেয়েদের কার কাছে রেখে যাব বল ? পদ্ম তো সারাদিন রাখে। সন্ধ্যা বেলাটা ও রান্না বান্না করে, ওকে একটু বিশ্রাম না দিলে পারবে কেন বুড়োমানুষ ?

অনির্বাণ চুপ করে থাকে। মাধুরীর সঙ্গে বেশীক্ষণ কোন ব্যাপারে তর্ক করতে সে ভয় পায়।

মাধুরী কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, অনি, আমাকে বিয়ে করার জন্য তোমার খুব আফসোস হয়, তাই না ?

অনির্বাণ বলে, হঠাৎ একথা ?

: না, তোমার তো কোন উন্নতি হবে না। কত সাধ ছিল তোমার বড় সাংবাদিক হবে। একটা পাকাপাকি চাকরিই যোগাড় করতে পারলে না। এমন চাকরি যে কবে আছে কবে নেই।

: না, মাধুরী, আফসোস হবে কেন ? আমি ভুলতো কিছু করিনি। [redacted] ভাগ্য তো আছেই। তবে চাকরির ব্যাপারটা নিয়ে একটু ভাবনার মধ্যে আছি।

: কেন ?

: শুনছি ক্যালকাটা জার্নিকল তুলে দেওয়া হচ্ছে। বোমবেতে আমাকে নেবে বলে মনে হয় না।

তাছাড়া তোমার চাকরি ছেলেমেয়েদের ইসকুল ফেলে বোমবে যাওয়াও সম্ভব নয়, বিশেষ করে এই মাইনেতে।

: তুমি যাও না। আমি এখানে ছেলেমেয়েদের নিয়ে থাকি।

: সে হয় না।

: কেন হবে না। অনেকে আছে। তুমি পারবে না তাই বল !

মাধুরী তার একখানি হাত অনির্বাণের হাতের ওপর রাখে। এমন মুহূর্তও তাদের জীবনে আসে। মরা গাঙেও বান ডাকে। তবে সে নেহাৎ আকাশে বেঘ দেখা দিলে, এলোমেলো বাতাস বইলে।

পরের দিন অফিস থেকে বেরিয়ে রাত ন'টা নাগাদ অনির্বাণ এসে ঢুকল মিডনাইট ক্যাফেতে। এখানে যে এত বড় একটা রেস্টুরেন্ট আছে তা সে কোনদিন দেখেনি। কোথাও কোন সাইনবোর্ডও নেই। গলির ভেতর দিয়ে একটু ঢুকে ডানদিকে সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে ছোট টিনের ফলকে লেখা মিডনাইট ক্যাফে—ফার্স্ট ফ্লোর। দোতলায় উঠে দুই ফ্লোর ঠেলে অনির্বাণ ভেতরে ঢুকল।

প্রতিটি আসনই ভরতি। জুক বক্সে একটি মিউজিক হচ্ছে। সিগারেটের ধোঁয়ায় আর চেঁচামেচি। অধিকাংশই সেলর। দীর্ঘদেহী, মেদহীন ছিপছিপে গড়নের তরুণেরা। মাথায় লম্বা লম্বা সোনালী চুল। গায়ে জেকি কিংবা টি-শার্ট। কর্ণা হাতে উলকি। অনেকের পাশে বসে মেয়েরা। অন্তরঙ্গ ভাবে পাশে বসে কথা বলছে। মেয়েদের মধ্যে দু' একজন অ্যাংলো ইনডিয়ান, নাক চেপ্টা চোখ ছোট ছোট অনেক মেয়ে বসে আছে। চীনা তিব্বতি বুটিয়া অনেক কিছুই হতে পারে। অনির্বাণ ঢুকতেই বেয়ারারা সবাই কেন একটু সন্ত্রস্ত হয়ে গেল। সবাই তাকে কী ভাবল—পুলিশ? অনির্বাণের চেহারা বেশ লম্বা চওড়া। তাকে পুলিশ অফিসার বলেই মনে হয়। রাইটার্সে গেলে লিফটম্যান তাকে রোজই সেলাম করে। তার চাকরি জীবনে লোকটি অন্তত একহাজার বার তাকে সেলাম করেছে। যদি কোনদিন জানতে পারে অনির্বাণ একজন বেসরকারী লোক তাহলে মুখে আসলে সমস্ত সেলামের দাম আদায় করে নেবে।

একজন বেয়ারা ওর দিকে এগিয়ে এল, বসবেন স্যার?

অনির্বাণ বলল, বসার জায়গা আছে কোথায়?

: আমি চেয়ার লাগিয়ে দিচ্ছি স্যার।

: সুদর্শনজী আছেন?

: জি স্যার।

: আমি দেখা করব।

: আপনি বসুন।

তাড়াতাড়ি একটি চেয়ার এনে অনির্বাণকে বসিয়ে লোকটি চলে গেল। কিছুক্ষণ পরে এসে বলল, চলুন স্যার।

পার্টিশনের পিছনে আবার তিনতলায় ওঠার সিঁড়ি। এ সিঁড়িটা একেবারে প্রাইভেট। ওপরে উঠে ডানদিকে একটি ছোট ঘর। সবুজ পর্দা ঝুলছে। ঘরটির মাঝে একটি বড় টেবিল কয়েকখানি চেয়ার। ঘরের দেওয়ালে একটি চীনা ড্রাগনের ছবি। আর একদিকে প্রধানমন্ত্রীর ছবি।

টেবিলে বসেছিল সুদর্শন। নামের সঙ্গে চেহারার মিল আছে। একটু খুলকায় তবে সুপুরুষ। ফাটাফাটি গৌর। টকটকে লম্বা রঙ।

লোকটি বলল, আমি সুদর্শন।

তারপর বলল, বসুন স্যার।

অনির্বাণ নিজের পরিচয় দিল না। সে বলল, আপনি ঘাবড়াবেন না। আমি সুব্রতবাবুর কাছ থেকে আসছি। আপনাকে সাহায্য করাই আমার উদ্দেশ্য। সুদর্শন বলল, বসুন স্যার। বসুন।

অনির্বাণ বসল। তারপর সুদর্শন বলল, একসকিউজ মি, আপনি কী খাবেন বলুন। এনি ড্রিঙ্কস?

: না। ধন্যবাদ।

: একটা কোকাকোলা? এই ইয়াকুব, যাও কোকাকোলা নিয়ে এস। হ্যাঁ, বলুন স্যার।

আপনার স্ত্রী লীনা কোথায় আছে কোন খবর পেয়েছেন?

: না, স্যার। আমি নিজেই বা কোথায় খোঁজ করব বলুন। রেস্টুরেন্ট ছেড়ে উঠতে পারি না। পুলিশও কিছু করল না। কী যে করব বুঝে উঠতে পারছি না।

: উপাধ্যায়জী যে আপনার স্ত্রীকে নিয়ে গেছে এ সম্পর্কে আপনি শিওর?

: মোর দ্যান শিওর। আমি উপাধ্যায়জীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেছি, কোন পারমিশান পাইনি। টেলিফোন করেছি, আমার গলা শুনে তিনি ফোন ছেড়ে দিয়েছেন। এটাই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়?

: আপনি তাহলে কোরর্টে দরখাস্ত করছেন না কেন?

: আমি যদি জানতে পারতাম কোথায় তাকে রাখা হয়েছে, আমি সার্চ ওয়ারেনটের জন্ত ব্যবস্থা করতে পারতাম। কিন্তু তা করেও কিছু হবে বলে আমার মনে হয় না। ম্যাজিস্ট্রেট তো পুলিশকেই অবজ্ঞার দেবে? কিন্তু উপাধ্যায়জীর সঙ্গে পুলিশের বড় কর্তাদের খুবই খাতির। পুলিশ তাদের আগে থেকে জানিয়ে দিতে পারে। সার্চ করতে এসেও কোন কাজ হবে না।

: আমি আপনাকে একটা ভ্যালুয়েবল ইনফরমেশন দিচ্ছি। বেরিডিথ নারসিং হোমের ৭নং ঘরে শীলা আছে। আপনি দেখুন যদি তাকে উদ্ধার করতে পারেন। অনির্বাণ লেখল এই কথাটা শুনে সুদর্শন অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। সে বলল, আপনি বলছেন কি স্যার?

: হ্যাঁ। ঠিকই বলছি। মিসেস উপাধ্যায় নামে সে ভর্তি আছে। আমি গতকালের খবর বলছি।

কিন্তু একটা জিনিস আমাকে দয়া করে বলবেন মিঃ সিং? আপনাদের কোন সন্তান নেই?

: আছে স্যর। আমাদের একমাত্র মেয়ে। তিন বছর তার বয়স। মেয়েটিকে অনেক বুঝিয়ে শুনিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে রেখেছি। কিন্তু এমনি করে ক'দিন তাকে রাখব বলুন? আমার কী হবে স্যর, শীলাকে কি—ফিরে পাব? বলুন, আপনি বলুন! বলতে বলতে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলে দিল সুদর্শন সিং।

অনির্বাণ কী করবে ভেবে পেল না। কীভাবে সে সান্ত্বনা দেবে? ঘটনাচক্রে সে এমন একটা বিশ্রী ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। নিঃসন্দেহে এটি একটি চাঞ্চল্যকর খবর। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে শেষ রক্ষা করতে পারবে তো? সুদর্শনের কাছে সে সমস্ত ঘটনার একটা ব্যাক গ্রাউনড জানতে এসেছিল। কিন্তু শীলা কোথায় আছে সে কেন বলে দিল তাকে? সে তো রিপোরটার। তার অন্য কোন কর্তব্য নেই শুধু সংবাদ সংগ্রহ ছাড়া। তবে কেন সে সুদর্শনকে জানিয়ে দিল শীলার কথা।

পরিস্থিতি লঘু করার জন্ত অনির্বাণ বলল, আচ্ছা উপাধ্যায়জী আপনার এখানে কবে প্রথম আসেন?

: মাস ছয়েক আগে। উনি নিজে কেন যেচে এলেন সেদিন বুঝতে পারিনি। উনি অনেক উপরের অফিসার। আজ বুঝতে পেরেছি উনি একটা প্ল্যান করেই এসেছিলেন।

: আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর কি আলাপ ছিল?

: একদম না। তবে দেখে থাকবেন হয়ত। আমার স্ত্রী রেস্টুরেন্টে গান গাইত।

: ফরেন একসচেঞ্জ স্মাগলিং কেস সম্পর্কে আপনার কিছু বলার আছে?

কি আর বলব স্যর। এই চৌরঙ্গী এলাকায় অনেক দোকান, রেস্টুরেন্টই ফরেনারদের কাছ থেকে ফরেন মানি নেয়। আমার বাড়ি সার্চ করে কটি টাকা আর ওঁরা পেয়েছেন। তবে হ্যাঁ, হারাস করতে গেলে একটি শিলিং পাওয়াই যথেষ্ট। কিন্তু সে কেসও তো জামিন নিয়ে বেরিয়ে আসার পর আর উঠছে না। এর মধ্যে দুদিন তারিখ ছিল। ওরা আরও তদন্তের জন্ত তারিখ চাইছেন। কিন্তু তারপর থেকে আর কাউকে তদন্ত করতে আসতে দেখিনি।

মিডনাইট কাফে থেকে অনির্বাণ যখন বেরিয়ে এল তখন রাত দশটা। গোটা করপোরেশন স্ট্রীট গমগম করছে। কলকাতার নাইট লাইফ দীর্ঘজীবী। এ শহর ভেতরে যত ক্ষয় হচ্ছে তত তার বাইরের জীবনী শক্তি বাড়ছে।

অনেকটা টিবি রোগীর মত। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই তার অন্তরটা কাঁকরা হয়ে গেছে।

বাসেও প্রচণ্ড ভিড়। ভিড়ের বাসে উঠলে গা বমি বমি করে। বিশেষ করে এই রাত্তিরের দিকের বাসে। অনেকের গা থেকে ভক ভক করে মদের গন্ধ বেরোয়। সারাদিন ধরে খেটে খাওয়া গরীব মানুষেরা সে সময় বাড়ি ফেরে: নোংরা জামা কাপড়, অপরিচ্ছন্ন দেহ, সারা দেহ জুড়ে ক্লান্তি।

যেসময় শহরের আর একটি প্রান্তে স্নান করে, চুলে ক্রিম মেখে, নতুন করে বেড়াতে যাবার পোশাক পরে, সারা বিকেল ধরে সাজা বউকে পাশে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে ক্লাব থেকে বাড়ি ফিরছে যারা অনির্বাণ কি তাদের ঈর্ষা করে? সে যদি ঈর্ষা করে সেটা তার অপরাধ! তাদের অফিসের

করুণাবাবু বলেন, আসল কথা কি জানেন মশায়, আসল হল ভাগ্যফল, স্টারস অ্যান্ড প্ল্যানেটস। যার যা ভাগ্য। আপনার ভাগ্যে রয়েছে আপনার এর বেশী কিছু হবে না। এর জন্যে আফসোস করেন কেন?

এই যে লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা প্রতিদিন এইভাবে জন্তু জানোয়ারের মত বাসে ট্রামে উঠছে, সারাদিন খেটেও অন্ন সংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারছে না, সেও কী তাদের ললাট লিপি? তাহলে তো পৃথিবীতে কোন বিদ্রোহের দরকার নেই, বিপ্লবের দরকার নেই, সংগ্রামের প্রয়োজন নেই!

আচ্ছা এই যে সুদর্শন সিং বেচারা এক বিরাট ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছে সেও কী তার ভাগ্যফল? কী প্রচণ্ড অন্যায়—ধরে নেওয়া গেল, শৈলা অ্যাপ্রুভার, ধরে নেওয়া গেল সুদর্শনের বিরুদ্ধে মামলা খুবই কঠিন, কিন্তু তাই বলে তার স্ত্রীকে আটকে রাখতে পারে কোন রাজপুরুষ?

কিন্তু শৈলা কি সত্যিই বন্দিনী? অন্তত তাও তো মনে হয় না। গ্র্যানড হোটেলে শৈলা যে ঘরে ছিল সে ঘরে সে শৈলাকে জোর গলায় তর্ক করতে শুনেছে। অন্তত বন্দিনীর আর্তনাদ বলে তা মনে করার কোন কারণ নেই।

পরের দিন সন্ধ্যায় অফিসে সবে চাইল্ড রাইটারের সামনে বসেছে এমন সময় টেলিফোন এল। অনির্বাণ টেলিফোন ধরতেই সুব্রতর গলা ভেসে এল।

: হালো, আপনি একটু এখুনি আসতে পারেন? খুব দরকার।

: কোথা থেকে বলছেন?

: বাইরে থেকে। কাকে কি মণিকোর দোতলায় আমাকে পাবেন।

: আমার হাতে যে জরুরি কপি।

: কিন্তু আমার যে অত্যন্ত দরকার।

: তাহলে এক কাজ করুন, মৌলালির মোড়ে এসে দাঁড়ান, আমি যাচ্ছি।

মিনিট দশেকের মধ্যে প্রথম কপিটা শেষ করে একটু আসছি বলে অনির্বাণ বেরিয়ে গেল। মৌলালির মোড়ে সুব্রত দাঁড়িয়ে। বলল, চলুন ওই পাঞ্জাবির রেস্টুরেন্টটায় গিয়ে বসি।

রেস্টুরেন্টের এক কোণে বসে দু গেলাস লস্যির অর্ডার দিয়ে সুব্রত বলল, আপনি কাল সুদর্শনের কাছে গিয়েছিলেন?

: হ্যাঁ।

: অত্যন্ত কাঁচা কাজ করেছেন অনির্বাণবাবু। এভাবে এনকোয়ারি করতে যাওয়া উচিত হয়নি আপনার।

: সমস্ত ঘটনাটা কনফারমড করাতো দরকার।

: কিন্তু কাঁচা কাজ করে ফেলেছেন। মিডনাইট কাফের মালিক উপাধ্যায়ের চর আছে। আপনার আসার খবর এবং যা-যা কথা হয়েছিল আপনাদের মধ্যে উপাধ্যায় সব জেনে গেছে। কাল শেষ রাতেই ওরা শৈলাকে নারসিং হোম থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

: কী করে খবর পেলেন?

: সুদর্শনই খবর দিল। সুদর্শন আজ নারসিং হোমে খোঁজ নিতে গিয়েছিল। গিয়ে শোনে আজ ভোর রাতেই মিসেস উপাধ্যায় ছাড়া পেয়েছেন। নারসিং হোমের লোকেরা আর বেশী কিছু বলতে চায় না। আমার কাছে সুদর্শন ছুটে এসেছিল। আমি তাকে তাগিয়ে দিয়েছি। সুদর্শনের প্রতি আমার বিন্দুমাত্র সহানুভূতি আছে জানতে পারলে, আমার চাকরি চলে যাবে অনির্বাণবাবু। হয়ত ওর সঙ্গে যোগাযোগ আছে এই অভিযোগে আমিই গ্রেফতার হয়ে যাব। আপনারা তখন ফলাও করে ছাপাবেন যে খবর। লোকেও তা বিশ্বাস করবে।

আমি ছাপোষা লোক। আই ক্যান নট অ্যাফর্ড রাট। আপনি সাংবাদিক। আফটার অল এ পেন ইজ মাইটিয়ার দ্যান সোরড। আপনিই পারেন সমস্ত ব্যাপারটা ডিসক্লোজ করতে। যদি কিছু পারেন তাহলে করবেন। তবে কাল আপনি মিডনাইট কাফেতে না গেলে হয়ত এ অঘটন ঘটত না।

: কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে শৈলাকে বলতে পারেন?

: জানি না। উপাধ্যায়ের বিরাট সোরস। হয়ত এ

স্টেটের মধ্যেই সে তাকে রাখেনি। তবে আপনি এখবরটা এখন ছাপতে পারেন অনির্বাণবাবু।

সাউদ্রন ষ্ট্রীট থানায় আজ ভোরে সুদর্শন গিয়ে ঘটনাটা ডায়রি করিয়েছে। সকাল বেলা ডিউটিতে যে এ. এস. আই. ছিল সে অবশ্যই জানত না।

ডায়রি লিখে নিয়েছে। নম্বরটাও লিখে এনেছে সুদর্শন। কাজেই সিল ইজ নাউ অন বেকরস্ট। ডায়রির নম্বরটা আপনাকে দিলাম। কিন্তু আপাতত আমাদের এই সেবা দেখা। প্রিজ ডু সামথিং ফর দি পুওর গার্ল···

সুব্রত পকেট থেকে একটি চিরকুট বার করে ডায়রির নম্বরটা বলে গেল। অনির্বাণ লিখে নিল। সুব্রত লাম বিটিয়ে দিতে যেতেই অনির্বাণ বাধা দিল। পকেট থেকে টাকা বার করে লাম বিটিয়ে দিয়ে সে সুব্রতকে বিদায় দিল। হন হন করে সে এগুতে লাগল কনভেন্ট রোড ধরে তার অফিসের দিকে।

বাড়ি ফিরতেই অনির্বাণ দেখল আজ শোবার ঘর অন্ধকার। অন্যদিন বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে মাধুরী ম্যাগাজিনের পাতা ওলটায়। না হয় সেলাই ফোঁড়াই করে। কিন্তু আজ ঘর অন্ধকার কেন? অনির্বাণের বুকটা ছাঁৎ করে উঠল। মাধুরী আজ ঘুমোচ্ছে।

পদ্ম বলল, দিদিমণির খুব জ্বর।

: সে কী, কখন হল?

: আপিস থেকে জ্বর নিয়ে ফিরেছেন?

: আমায় খবর দাওনি কেন?

: আপনাকে ফোন করেছিলাম। বলল, অফিসে নেই। খবর দেবে বলেছিল।

কিন্তু কেউ খবর দেয়নি। তাদের অফিসটা এক বিচিত্র জগৎ। এখানে কেউ অন্যের সুখ দুঃখ সুবিধা অসুবিধে নিয়ে মাথা ঘামায় না। অনির্বাণ মাধুরীর কপালে হাত দিয়ে দেখল, গা পুড়ে যাচ্ছে। ছেলেমেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে।

পদ্ম বলল, ওদের খাইয়ে দিয়েছি।

মাধুরীর এর আগে কখনও অসুখ করেনি? শরীর ভাল বলে তার অহঙ্কার ছিল। তার সংসারও চলছিল কষ্টিন মাফিক। সংসারের অন্যান্য কাজেরা মাধুরীই দেখত। এখন তার অসুখে খুবই নারভাস বোধ করল অনির্বাণ। মাধুরীকে দু' একবার মৃদু ডাকাডাকি দিয়ে ডাকল। কিন্তু তার ঘুম ভাঙ্গার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শুধু একটা ক্লান্তিকর দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল।

অনির্বাণ ভেবে পেল না এ পরিস্থিতিতে কী করা উচিত। তার তো মা বাবা দেশে থাকেন। কলকাতায় আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। দু' একজন ইউনিভার্সিটির বন্ধু আছে। কিন্তু কারও ফোন নেই। আর থাকলেও তারা এখন একটা যোগাযোগ রাখে না। বিয়ে থা করে ঘোর সংসারী। ভাল চাকরি করে, অনির্বাণের রিপোর্টারের চাকরিটাকে তারা চাকরি বলেই মনে করে না। সুতরাং বিপদে তারা এমন কিছু উপকারে আসবে বলে মনে হয় না। মাধুরীর বাপের বাড়ি যাদবপুর। তাদের বাড়িতেও ফোন নেই। আর থাকলেও এত রাতে কারও আসা মুশকিল।

কোন কিছু দিশা না পেয়ে অনির্বাণ ডাঃ অলক মিত্রকে ফোন করল। ডাঃ মিত্র বাড়ি নেই। কোন পার্টিতে গেছেন। হঠাৎ মনে পড়ে গেল ডাঃ এ. কে. সান্যালের কথা। অতবড় ডাক্তারকে তার বাড়িতে ডাকার সামর্থ্য নেই। শুধু জিজ্ঞাসা করে নেবে এই মুহূর্তে মাধুরীকে কী ওষুধ এনে খাওয়ান যায়! একবার ভাবল, যে ডাঃ সান্যাল উপাধ্যায় চক্রের সঙ্গে জড়িত, তার কাছে ব্যক্তিগত কেসের প্রার্থনা করাটা কি উচিত হবে? কিন্তু বিপদের সময় অত বাছ-বিচার করতে গেলে চলে না। ভাবারও একদম সময় নেই। সে টেলিফোন গাইড দেখে ফোন করল।

অনেকক্ষণ ফোন বেজে যাওয়ার পর রিসিভার তোলার আওয়াজ পাওয়া গেল। ওপাশ থেকে কে বলল, হ্যালো?

: ডাঃ সান্যাল আছেন?

: কে বলছেন?

: আমি ওঁর একজন পেশেন্ট। জরুরী দরকার ছিল ওঁর সঙ্গে।

: না, উনি আজ সকালে কোলকাতার বাইরে গিয়েছেন। এখনও ফেরেন নি।

অনির্বাণ চমকে উঠল। আজ সকালবেলা ঐলাকে মেরিডিথ নার্সিং হোম থেকে কোন অজ্ঞাতস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাহলে ডাঃ সান্যালও কি সেই সঙ্গে?

: কখন ফিরবেন কিছু বলে গেছেন?

: বলে গেছেন, অনেক রাত হবে ফিরতে। আপনার ফোন নম্বরটা দিন। কাল আপনাকে ফোন করবেন উনি।

অনির্বাণ সেকথার উত্তর না দিয়ে লাইন কেটে দিল। আশ্চর্য, একটা খবর যেন তাকে তাড়া করে ফিরছে। সে ঠিক করল, তাদের বাড়ির তিনখানা বাড়ির পরে ডাঃ সেনগুপ্ত বলে একজন ডাক্তার থাকেন। ভদ্রলোকের সঙ্গে মাঝে মাঝে বাজার করতে যাবার সময় দেখা হয়। একবার গ্যাস পাওয়া যাচ্ছিল না বলে তাদের কাগজে 'লেটারস টু দি এডিটর' লিখে অনির্বাণকে ছাপাতে দিয়েছিলেন। অনির্বাণের যতদূর মনে পড়ে সেটি ছাপা হয়।

অনির্বাণ তাড়াতাড়ি গায়ে জামাটা গলিয়ে ডাঃ সেনগুপ্তর কাছে গেল। ডাঃ সেনগুপ্ত বললেন, জ্বর এখন কত?

: থার্মোমিটার দেওয়ার সময় পাইনি।

: চলুন, দেখে আসি। তবে ভয়ের কোন কারণ নেই। আজকাল ঘরে ঘরে ইনফ্লুয়েনজা হচ্ছে।

ডাঃ সেনগুপ্ত এলেন। জ্বর দেখলেন। একশ' তিন ডিগ্রি। মাথায় বেশ উত্তাপ। কল দিয়ে বুক পিঠ পরীক্ষা করলেন। বললেন, ইনফ্লুয়েঞ্জা বলেই তো মনে হচ্ছে। তিন চার দিন না গেলে বোঝা যাবে না। এত রাতে দোকান তো খোলা পাবেন না। আমার কাছে কিছু ওষুধ আছে নিয়ে যান।

রাস্তায় যেতে যেতে ডাঃ সেনগুপ্ত বললেন, স্ত্রী একদিনের জন্য শয্যাশায়ী হলে বড় মুশকিল যখায়। একলার সংসার চলে এই অসুবিধে। আমার ছেলেটি বলে আলাদা বাসা করব, আমি রাজী নেই না টেরটি পাবে বাছাধন।

: আপনার ওয়াইফ তো চাকরি করেন?

: আজ্ঞে হ্যাঁ। সব দিকেই মুশকিল।

ভাববেন না। মায়ের কৃপায় সব ভাল হয়ে যাবে। এই আমার দিকেই দেখুন না কেন? পাঁচ বছর ধরে হাঁটাহাঁটি করছি, ই. এস. আই-এর প্যানেলে নাম রেজিষ্ট্রীর জন্য। যেহেতু আমার ধরার লোক নেই, আমার হল না। চেম্বারে প্র্যাকটিশের যা হাল হচ্ছে আজকাল—সব ছোটে স্পেশালিস্টের কাছে। ছোটখাটো অসুখ হলে কমপাউন্ডারের কাছে জিগ্যেস করে ওষুধ নেয়, যাকে বলে সেলফ ট্রিটিং। তবু ই. এস. আই এর প্যানেলে নামটা থাকলে, মাস গেলে শ পাঁচেক টাকাও ঘরে আসে। তা আপনার আলাপ আছে নাকি কর্তাদের সঙ্গে? ওখানে তো শুনেছি, চোরের রাজত্ব।

অনির্বাণ বলল, আপনার অ্যাপ্লিকেশনের ডিটেলস আমাকে দেবেন। আমি চেষ্টা করব।

এই রকম কত আবেদনই যে মাঝে মাঝে আসে। বহুলোক উপরোধ করে অনির্বাণকে। কারও চাকরি, কারও বদলি, কারও হাসপাতালে সিট, কলেজে সিট, কারও বা লেখা ছাপাবার অনুরোধ, কেউ বা চায় শুধু পাবলিসিটি।

অনির্বাণ সকলকে সন্তুষ্ট না করে পারে না। তার মনে হয় আহা যদি তার দ্বারা কারও উপকার হয় হোক না। তারপর উপকার হয়ে গেলে তারা আর কেউ ফিরেও তাকায় না। কিন্তু অনির্বাণ তাই বলে উপকার করা বন্ধ করে না।

রাতে মাধুরীকে ওষুধটা খাইয়ে দিয়ে নীচে বিছানা করে শুয়ে পড়ল অনির্বাণ। পল্টুকে বলে দিল, ঘুমিয়ে পড়তে। রাতে দরকার হলে সে তাকে ডাকবে।

ঘুম কিছুতেই আসছে না। কাল তার অফিসে ক্যাজুয়াল নিতে হবে। অ্যাসেমবলি ডিউটি রয়েছে তার।

ভোর বেলাই জানিয়ে দিতে হবে। চাঞ্চল্যকর খবরটি কালই লিখে ফেলা যেত।

এখন মোটামুটি একটা খবর সেল নিয়েছে। এ খবরের হেড পাইন কী হবে—দি মিস্ট্রি অফ এ মিসিং গার্ল অথবা হোয়ার ইজ শীলা? সে কল্পনা করল, ক্যালকাটা ক্রনিকলের কালকের কাগজে আট কলম ব্যানার হেড লাইনে বেরিয়েছে খবরটা। শিয়ালদা স্টেশনে হকার চাঁকছে: জোর খবর, জোর খবর। সুন্দরী নারী হরণ। সরকারী চোখরা চোখরা অফিসার জড়িত।

সে ভাবতে লাগল এ খবর নিয়ে সারা দেশ তোলপাড় হচ্ছে। পার্লামেন্টে প্রশ্ন উঠছে। বিরোধী দলের এম. পিরা প্রশ্ন করছেন, স্বীকার করুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি জানেন, ঐই উপাধ্যায় নামধারী অফিসার একজনের স্ত্রীকে জোর করে নিয়ে আটকে রেখেছে? আর ওই ডাক্তার সান্যাল নামধারী লোকটি মেয়েটিকে ড্রাগ করে অচৈতন্য করে রাখত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজী কেন এখনও ওই অফিসারকে গ্রেফতার করেন নি?

ঐই নিয়ে প্রচণ্ড হৈ চৈ হবে। সারা দেশজুড়ে কাগজে তার জলোআপ বেরুবে, বিদেশের কাগজেও ব্যাক গ্রাউণ্ড স্টোরি বার হবে।

ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল অনির্বাণ। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সে স্বপ্ন দেখল, সে ও মাধুরী যেন দার্জিলিংএ বেড়াচ্ছে। হঠাৎ মাধুরী বলল, দেখ দেখ ওই মেয়েটি কি বিশ্রীভাবে তোমার দিকে চেয়ে আছে! তাড়াতাড়ি সেদিকে মুখ ফিরিয়ে অনির্বাণ দেখল আরে মেয়েটি আর কেউ নয়—শীলা। শীলা এখানে কোথা থেকে এল? শীলা যেন অনির্বাণকে দেখে একটু হাসল। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে একটি লোক এসে শীলাকে কী বলল। শীলা ঘোড়ার পিঠে উঠল। তারপর দুজনে চলে গেল। ওই লোকটাই উপাধ্যায়। এমন সময় কোথা থেকে ডাঃ সান্যাল এসে বলছেন, শীলা কোথায় গেল বলতে পারেন? সেদিন আপনি ফোন করেছিলেন শুনলাম। আমি দার্জিলিং চলে এসেছিলাম শীলাকে নিয়ে। কিন্তু শীলা কোথায় যে গেল? হঠাৎ মাধুরীর দিকে নজর পড়তেই ডাঃ সান্যাল বলে উঠলেন, আরে এই যে শীলা।

মাধুরী কেঁদে উঠল। অনির্বাণ চিৎকার করে উঠল। কিন্তু ডাঃ সান্যাল বলতে লাগলেন, না-না, ওর ইনজেকশন নেওয়া হয়নি। শিগ্রী ইনজেকশন নেবে চল। এই বলে টানতে টানতে মাধুরীকে নিয়ে গেলেন।

ঘুম ভেঙে গেল অনির্বাণের। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ভোর হয়ে এসেছে। মাধুরী অঘোরে ঘুমিয়ে। কপালে হাত দিয়ে অনির্বাণ দেখল, উত্তাপ একটু কম।

সেদিন আর অফিস যাওয়া হল না অনির্বাণের। ছেলেমেয়েদেরও আজ স্কুলে পাঠিয়ে দরকার নেই। শুধু ওর বড় ছেলে বাপি বলল, না বাবা, আজ আমাদের উইকলি পরীক্ষা, যেতেই হবে। অনির্বাণ আপত্তি করল না। পন্থ ভাতে ভাত চড়িয়ে দিয়েছে। মাখন দিয়ে খেয়ে চলে যাক। কিন্তু ছোট দুটোকে পাঠানো যাবে না। অবশ্য তাদের স্কুল বাস আছে। কিন্তু আজ আর এই গোলমালের মধ্যে কারেলা পোহান মুসকিল হবে।

মাধুরী ঘুম থেকে উঠে বলতে লেগেছে, আমাকে আজ লাইব্রেরী যেতেই হবে।

: তুমি কি ক্ষেপেছ নাকি?

: না, কতগুলি জরুরি ক্যাটালগিং বাকী।

: কাল রাত্তিরে তো অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে!

: এখন ভাল আছি। ট্যাকসি করে যেতে পারব।

: আমি বেঁচে থাকতে সেটি হতে দিচ্ছিনে। শুয়ে থাক। আমি বাজারে যাচ্ছি। তোমার ওষুধ নিয়ে আসব।

: লাগবে না ওষুধ। তুমি এনে দেখ। আমি কিন্তু খাব না, ফেলে দেব।

: আচ্ছা সে দেখা যাবে।

মাধুরী অবশ্য মুখেই এসব কথা বলছিল। একদিনের জ্বরে সে ভীষণ কাবু হয়ে পড়েছে।

অনির্বাণের খুব ইচ্ছে করছিল আজ সারাদিন মাধুরীর পাশে বসে গল্প করে। আহা বেচারা, তাকে বিয়ে করে একটা দিনের জন্যও সুখী হতে পারল না। মেয়েদের তো জীবনে এই শেষ সুযোগ। বিয়ে করে ভাগ্য ফিরবে। কিন্তু

মাধুরী ইচ্ছা করেই সেভাবে ভাগ্য ফেরাতে চায়নি। তার সঙ্গে ভাগ্যকে জড়িয়ে সে নিজের উজ্জ্বল এক ভবিষ্যৎকে নষ্ট করেছে। নয়তো মাধুরী আজ বড়লোকের বউ হয়ে প্রাসাদে গাড়ি চড়তে পারত। মাসে মাসে গহনা তৈরি করতে পারত। শাড়ি কিনে কিনে ঘর বোঝাই করে ফেলতে পারত।

মাধুরীকে সাধা-সাধন করবার পর সে একটু খেল। অনির্বাণ বলল, আমি ওবেলা তোমার জন্য কমলালেবু নিয়ে আসব'খন।

মাধুরী বলল, আমি কমলালেবু চাই না।

দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়ার পর বাইরের ঘরে দরজা বন্ধ করে অনির্বাণ তার পোর্টেবল টাইপ রাইটারটা বার করে খবরটি লিখতে বসল। আগামীকাল সে চীফ রিপোর্টারকে খবরটি দেবে।

পরদিন দুপুর বেলা অফিসে রোজে ক্যালকাটা ক্রনিকলের অফিসে ঢুকল অনির্বাণ। তার ব্যাগের মধ্যে খবরের কপি। অনির্বাণের মনে হচ্ছিল গাথ টাকার এক সম্পত্তি যেন সে ব্যাগের মধ্যে পুরে নিয়ে চলেছে। দুরু দুরু বুকে এগিয়ে চলেছে অনির্বাণ। মনে মনে ভাবছে এই কথাই সে চীফকে বলবে। একটা সামান্য মিল যাওয়ার জন্য সেদিন অমন করে বললেন, আমি আপনাকে এবছরের শ্রেষ্ঠ স্কুপ খবর উপহার দিচ্ছি।

কিন্তু গেটের সামনে এসে সে উত্তেজিত ঘটনা দেখল। দেখল মেশিন ঘর থেকে কর্মীরা বেরিয়ে এসেছে। কমপোজিটররাও বেরিয়ে পড়েছে। অফিসের সামনে ছোট্ট একটা চাতাল মত আছে। তার এক পাশে একটা বুড়ো আম গাছ। তার নীচে সবাই দাঁড়িয়ে। অনির্বাণ এদের কাউকে চেনে না। এরাও অনির্বাণকে চেনেনা। অথচ ওরা একই শিল্প পরিবারের। অনির্বাণের লেখা খবর ওরা কমপোজ করে, ছাপে। অথচ পরস্পরের মধ্যে কী বিরাট যোগাযোগের ব্যবধান।

অনির্বাণ একজনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার বলুন তো?

লোকটি বলল, ক্যালকাটা ক্রনিকল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আজ নোটিশ পড়েছে।

পায়ের নীচে মাটি যেন কাঁপতে লাগল অনির্বাণের। বলছে কী লোকটি। আঘাত আসছে সে জানত, কিন্তু তাই বলে এত দ্রুত আসবে সে ভাবেনি।

হ্যাঁ, ভিতরে মধ্যে উঁকি দিয়ে অনির্বাণ দেখল, নোটিশ পড়েছে। কোম্পানির পক্ষ থেকে মিঃ ভাটিয়া জানাচ্ছেন, তাঁদের লাভ্রতিক সিদ্ধান্ত অনুসারে ক্যালকাটা ক্রনিকলকে বোম্বাইয়ের ভারত টাইমসের সঙ্গে মার্জ করিয়ে দেওয়া হচ্ছে। একমাস পরে ক্যালকাটা ক্রনিকলের প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যাবে। কোম্পানি তাই একমাসের নোটিশ দিচ্ছে। বোম্বেতে কিছু রেসিটন ষ্টাফ নেওয়া হবে। এখন কোম্পানি কাদের নেবে তা পরে ঠিক হবে। আপাতত একমাসের অগ্রিম বেতন ও বকেয়া পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্তই গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু কর্মীরা আর কাজ করতে রাজি নয়। মালিক পক্ষের এই একতরফা সিদ্ধান্ত তারা মানবেনা। তার প্রতিবাদে ক্যালকাটা ক্রনিকল তারা আজ থেকেই বন্ধ করে দিতে চায়। এখান থেকে কোম্পানির কোন অ্যাসেট বাইরে নিয়ে যাওয়া চলবে না।

দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠল অনির্বাণ। দোতলায় রিপোর্টার্স রুম। অন্যদিন এসময় ঘরটা গম গম করে। ঘন ঘন চা আসে। সৌমীনবাবু বিরাট গল্প ফেঁদে সবাইকে মাতিয়ে রাখেন। তাহলে শোন বলি, তোমরা তখন জন্মাওনি—বলে সৌমীনবাবু বলতে আরম্ভ করেন তাঁর কোন রোমহর্ষক অভিজ্ঞতার কথা। চীফ রিপোর্টার বাবু খুব আড্ডাবাজ লোক, তিনিও এসে যোগ দেন। কিন্তু আজ সব নিস্তব্ধ। সমস্ত ঘরটায় বিষাদ নেমে এসেছে। যেন এই মুহূর্তে ওদের কোন পরম আত্মীয় নেমে গেছে।

অনির্বাণকে ঢুকতে দেখে সৌমীনবাবু বললেন, তোমার একটা হিল্লে হয়ে যাবে অনির্বাণ। ইয়ং ম্যান, ভাল লেখ, তোমার কোন ভাবনা নেই কিন্তু এই বুড়ো বয়সে না খেতে পেয়ে মারা যাব আমি।

অনির্বাণ কি জবাব দেবে ?

চীফ রিপোর্টার পর্যন্ত চুপ করে বসে আছেন। টেবিলে সারি সারি টাইপরাইটারগুলি দাঁত বার করে যে ব্যঙ্গ করছে।

: তাহলে আজ আর কিছু লেখার নেই। কাল থেকে তো কাগজ বেরুচ্ছেনা ? অনির্বাণ গিয়ে চীফ রিপোর্টারকে জিজ্ঞেস করল।

: অবস্থা তো দেখেই এলে।

হাঁ, অবস্থা দেখেই এসেছে অনির্বাণ। তার সন্দেহ করার মত কোন কারণ নেই।

আর কিছুক্ষণ পরেই অনির্বাণ বেরিয়ে পড়ল। আজ ছুটি। আজ অনেক সকালে ছুটি হয়ে গেছে। কিন্তু আজ আর তার সময় কাটাবার চিন্তা হল না। ঘরে অসুস্থ স্ত্রী। তার এখন বাড়িতে অনেক কাজ।

হঠাৎ যেতে যেতে মনে হল পকেটে কাঁটার মত কী বিঁধছে। অনির্বাণ হাত দিয়ে দেখল, সেই খবরটা যাকে ঘিরে সে কিছুক্ষণ আগেও আশার জাল বুনে চলেছিল। এখন আর এটি বাজে কাগজ ছাড়া কিছুই নয়। পকেট থেকে লেখাটা বার করে ছিঁড়তে লাগল অনির্বাণ। কুটি কুটি করে ছিঁড়ে লেখাটাকে সে রাস্তায় ছড়িয়ে দিল। শেষ ফাগুনের ফুরফুরে বাতাসে কাগজের কুচিগুলো উড়তে লাগল।

—

: বিজয়া :

শ্রীরামচন্দ্রের আকুল আহ্বানে শ্রীশ্রীচণ্ডী প্রহরণধারিনী অসুরনাশিনী দুর্গামূর্তিতে জেগেছিলেন। বিজয়া এসেছিল, রাবণ নিহত হয়েছিল, সীতার উদ্ধার হয়েছিল। শ্রীরামচন্দ্র করেছিলেন বিজয়লাভ। ঋষি-কণ্ঠে বিজয়ার স্তুতি ধ্বনিত হয়েছিল। সমগ্র হিন্দুজাতির অন্তর আহ্বান সে বিজয়ার স্মৃতিকে প্রতি বছর বহন করে চলেছে—এই দিনটিতে শত্রু ও মিত্র, বন্ধু ও বিদ্রোহী, উচ্চ ও নীচ, দূর ও নিকটকে এক করে দেখবার এমন সুযোগ, এমন অবকাশ আর নেই।

বিজয়ার শান্তি ও আশীর্বাদের মধ্যে দিয়ে জাতির জীবন নবজন্ম পরিগ্রহ করে। আপনাকে ও অপরকে আমরা যেন নতুন করে ফিরে পাই—বিজয়ার মধ্যে দিয়ে নতুন জীবনের প্রারম্ভ ও নতুন জীবনের প্রকাশ। বিজয়া নবজীবনের জয়যাত্রা হোক্ এই প্রার্থনা করি।

RED CROSS
Rs 1,50,000
DUNDEE STAR
Lotteries
3,40,000
U.P
Rs 8,50,000
WEST BENGAL STATE
নাটক

নন্দী ঘি
এখন ২৫০ গ্রাম টিনেও বাজারে পাবেন

শ্রীমন্মথ রায় দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সেবায় নিযুক্ত। বস্তুত, এদেশে প্রকৃত নাটক যে ক'জন নাট্যকারের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে, মন্মথ রায়ের নাম তাদের মধ্যে স্মরণীয়। বিশেষত, একাংক নাটকের স্রষ্টা হিসেবেও তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। অবশ্য নাট্য সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ এদেশে ও বিদেশে তিনি সম্মান লাভ করেছেন। গণনাট্যের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরেই তিনি যুক্ত। তাঁর এই মঞ্চ নাটকটি পাঠকদের তৃপ্তি দেবে এই আমাদের বিশ্বাস। —সম্পাদক

মুক্ত

[একাঙ্কিকা]

নাট্যকার মন্মথ রায়

[গ্রামের নাম ধনতুলসী। কুখ্যাত কৃপণ মহাজন দয়াময় চক্রবর্তীর বহির্বাটির একাংশ। বিস্তীর্ণ বারান্দার একটি তক্তপোষ এবং আর একধারে একটি ভাঙা চেয়ার এবং একটি নড়বড়ে জলা দেখি। বারান্দার বিপরীত দিকে মা মঙ্গলচণ্ডীর ঘর। বারান্দা এবং এই পূজা ঘরের মধ্যে প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের পশ্চাৎ ভাগে বৃহৎ বকুল বৃক্ষের গুঁড়ি। বৃক্ষটির উপরাংশ দেখা যায় না। গুঁড়িটি একটি মাটির বেদী দিয়া বাঁধানো। সকাল বেলা ঠাকুর ঘরের সামনে বেদীতে বসিয়া ডবকুরে গায়েন বিবেক মঙ্গল গান গাহিতেছে। দেখা গেল ভূতপূর্ব জমিদার-নন্দন চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় চোখ বুজিয়া অন্ধের মতো বাহির হইতে আসিয়া ঠাকুর ঘরের দিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছে। বিবেকের গান শেষ হইল।]

লোকে বলে পাষাণী তুই
পাষাণ গড়া তোর মূরতি,
তাই যদি গো হবি মা তুই
কেন তবে তোর আরতি ?
গরীব ধনী, দাতা, কৃপণ
খাতক বা সুদখোর মহাজন
সকলে পায় আশীষ মা তোর
ধারাই করে তোর প্রণতি।
তুই যদি হোস কৃপণ মেয়ে
কেমন করে আমরা বাঁচি
তোর দু'খানি রাঙা চরণ,
শরণ করে টিঁকে আছি।
তুই যদি না হোস মহাজন
সুদ নে তবে যা প্রয়োজন
আসল শুধু দিসনে ফাঁকি
তোর কাছে মা এই মিনতি।

চন্দ্রনাথ। এই ব্যাটা বিবেক—

বিবেক। বলুন কর্তা! একি আপনি চোখ দুটির মাথা খেলেন কবে ?

চন্দ্রনাথ। কথা রাখ, আগে বল দেখি ঠিক মা মঙ্গলচণ্ডীর ঘরের দিকে এগিয়ে চলেছি তো ?

বিবেক। হ্যাঁ, তা যাচ্ছেন বৈকি।

চন্দ্রনাথ। আর ঠিক ক'পা এগুলে মঙ্গলচণ্ডী মায়ের দরজায় পৌঁছতে পারব বল দেখি। বল বল চটপট বল।

বিবেক। বলছি কর্তা।

[বিবেক চন্দ্রনাথের কাছে গিয়া সেখান হইতে পা মাপিতে মাপিতে দরজায় গিয়া]

এগারো পা।

চন্দ্রনাথ। ভাইনে না বাঁয়ে ?

বিবেক। নাক বরাবর সোজা।

[চন্দ্রনাথ এগারো পা মাপিয়া গিয়া মঙ্গলচণ্ডীর দরজায় দাঁড়াইল। এবং চোখ খুলিয়া নতজানু হইয়া করযোড়ে মঙ্গলচণ্ডীর উদ্দেশে প্রার্থনা করিল।]

চন্দ্রনাথ। দোহাই মা মঙ্গলচণ্ডী। অভাগার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কোরো মা। তোমার কৃপায় prize bond

এর টাকাটা যেন মারতে পারি। ঘুম থেকে চা না খেয়ে উপোস করে চোখ বুজে তোমার দুয়ারে সোজা চলে এসেছি মা—চর্মচক্ষে তোমায় বরাভয় মূর্তিই রাত পোহাতে সব-প্রথম দেখছি—সুফলটা হাতে হাতে দিও মা। হাঁ মা, আজই prize bond লটারীর ফল বাস্তবে বেরুবে। আচ্ছা এইবার তবে চলি মা। এই ব্যাটা বিবেক!

বিবেক। বলুন কর্তা।

চন্দ্রনাথ। লোকটা ওখানে আছে?

বিবেক। কোন লোকটা কর্তা?

চন্দ্রনাথ। কোন লোকটা? ডাকা চৈতন, জানো না তুমি?

বিবেক। নাম না বললে কি করে জানবো?

চন্দ্রনাথ। জেনে শুনে তুই আমার সঙ্গে চালাকি করছিস? তোর বুঝি তবে এই মতলব যে সকাল বেলায় আমি লোকটার নাম নিই আর আমার ভাতের হাঁড়ি ফেটে যাক। আজ আমার prize bond লটারীর ফল বেরুবে তার একা সন্ধ্যা হোক। (হাসিয়া দিয়া) এইটাই তবে তোর মতলব?

বিবেক। বললে তবে না বুঝলাম? দয়াময় মহাজনের কথা বলছো তো?

চন্দ্রনাথ। গেল, গেল, গেল। তোর তো হয়েই গেলো, আমার এখন কি হয় কে জানে? এই সাত সকালে নামটা তুই মুখে নিলি? জানিস, ভগবানকে আমি ইয়েময় না বলে করুণাময় বলি। তুই তো দেখছিস, এখন আমাকেও মারলি।...আছে?

বিবেক। না কর্তা, এখনো আসেন নি। যদি সটকাতে চান কর্তা, তবে এই ফাঁকে সরে পড়ুন।

চন্দ্রনাথ। বেশ, বেশ। এই চোখ বুজে আমি পিছিয়ে যাচ্ছি। তুই আমাকে ডান-দী কর।

বিবেক। কেন কর্তা, চোখ বুজে যাবেন কেন? আর পিছিয়ে পিছিয়েই বা যাবেন কেন?

চন্দ্রনাথ। ওরে ব্যাটা বিবেক। আবার তোর ঘুমতলব? চোখ মেলে সোজা চলি আর খপ্ করে ঐ অযাত্রা লোকটা এসে পড়ুক, একেবারে মুখোমুখি দেখা হোক আর আমার লটারীর টাকাটা যাক ফেঁসে?

বিবেক। (হো হো করিয়া হাসিয়া) বুঝেছি, বুঝেছি কর্তা।

চন্দ্রনাথ। যদি বুঝে থাকিস, তবে বল, লাইন ক্লিয়ার? ব্যাক করবো?

বিবেক। করুন কর্তা।

[চন্দ্রনাথ চোখ বুজিয়া পিছাইতে লাগিল। পথের দিকে না গিয়া বাহিরের বসিবার ঘরের দিকে যাইতেছে দেখিয়া ডান বাঁ বলিয়া বিবেক তাহাকে পথনির্দেশ করিতে লাগিল। বহির্বাটির পার্শ্ব দিয়া অন্দর হইতে আসিবার যে পথ আছে সেই পথে আসিয়া দাঁড়াইল দয়াময়ের একমাত্র তরুণী কন্যা মায়া। সে এই অপূর্ব দৃশ্য একস্থানে দাঁড়াইয়া সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। অনবরত ডাইন বাঁ শুনিয়া চন্দ্রনাথের লাইন গড়বড় হইল। সে মায়ার মুখোমুখি পড়িয়া গেল। বিবেক চেঁচাইয়া উঠিল।]

বিবেক। থামুন, থামুন কর্তা—থামুন।

চন্দ্রনাথ। কেন রে?

বিবেক। কলিসন হবে?

চন্দ্রনাথ। কলিসন? কার সঙ্গে?

বিবেক। (মুচকি হাসিয়া) সেটা কর্তা, মুখে বলা ভালো দেখায় না।

চন্দ্রনাথ। এই রে। তবে বুঝি ইয়েময়?

বিবেক। আর আমি কিছু বলতে পারবো না কর্তা। আমি চললাম।

[দ্রুতকণ্ঠে বিবেকের প্রস্থান]

চন্দ্রনাথ। মহামহিম ইয়েময় অনেক টাকা আমার দেনা তোমার কাছে। মালিশ করে ডিক্রী করে রেখেছো, আমি দিলেই ডিটে মাটি থেকে হবো উচ্ছন্ন। তাই বাঁচবার একটা শেষ চেষ্টা আজ আমার। একশো টাকা দিয়ে প্রাইজ বণ্ড কিনেছি। প্রথম প্রাইজ যদি কপালে

ওঠে পেয়ে যাবো ২৫০০০ টাকা। তারপরে আছে দুটো প্রাইজ, এক একটা ১০০০০ টাকা। তাও যদি কপালে না ওঠে, পাঁচটা প্রাইজ আছে এক একটা ৫০০০ টাকা। সেও যদি কেটে যায় তবু রয়েছে বাহোটা প্রাইজ এক একটা ১০০০ টাকা। কপালে যদি তাও না ঠেকে আছে। দুশিটা প্রাইজ আছে, এক একটা ৫০০ টাকা। এই লটারীর ফল বেরুবে আজ। তাই বলছিলাম ইয়েমন, তোমায় আমি বলছি, আজকের মতো পথ থেকে সরে দাঁড়াও। আমি টাকা পেলে তোমারও কিছু প্রাপ্তিযোগ আছে, এই কথাটা মনে রেখো। যাই ?

মায়া। হাঁ, মানে মানে বিদেয় হওয়াই ভালো।

চন্দ্রনাথ। ও বাবা। হিসেবে ভুল হয়ে গেছে তো। মায়া আমায় ক্ষমা করো তুমি। [মায়া নিরুত্তর রহিল]

চন্দ্রনাথ। কোলকাতা থেকে ফিরে এসেছো জানি, কিন্তু পাশের বাড়ীতে বাস করেও কথাবার্তা নেই। এ যেন একটা কাঁচের দেওয়াল গড়ে উঠেছে দু' বাড়ীর মাঝখানে।

মায়া। আমাদের বাড়ীতে এসে আমার বাবাকেই অপমান করে যাবেন এ আমি সইবো না। বেরিয়ে যান।

চন্দ্রনাথ। যাচ্ছি, যাচ্ছি মায়া, আজ ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই দেখেছি মা মঙ্গলচণ্ডীর মুখখানি। আর তারপরেই দেখছি তোমাকে। আজ আমার সুপ্রভাত। হ্যাঁ, মনে হচ্ছে লটারী আজ আমি পাবোই পাবো। ধরো, যদি ২৫০০০০ টাকা পাই—তাহলে তোমার বাবার দেনা শোধ করেও হাজার দশেক থাকবে—ঠিক সেই টাকাটা যে-টাকাটা আমার হাতে আছে কিনা উনি দেখতে চান, যখনই আমি তাঁর কাছে তোমাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব তুলি। আচ্ছা চলি।

মায়া। শুনুন।

চন্দ্রনাথ। শুনুন বললে আমি শুনিনা। ও শব্দটা আমি চিনি না। যে আগে বলতো তুমি, বলতো চন্দরদা, তার মুখে শুনুন শুনলেই মনে হয় শুনছি, সেট আউট—মানে, বেরিয়ে যাও।

মায়া। অমন করে নিজেকে কষ্ট করছো কেন বলতে পারো ?

চন্দ্রনাথ। না, না, মন ধরিনি এখনো। ধরিনি মানে, ধরবার টাকা নেই। সরকার জমিদারীটা কেড়ে নিয়েছেন সেই কবে, ক্ষতি পূরণ ছিটে ফোঁটা যা পাচ্ছি—

মায়া। তাওতো দান খ্যানে উড়িয়ে দিচ্ছো শুনি। ধার করে দান করলে লোকের কাছে বাহবা পাওয়া যায়, নাম হয়। কিন্তু ভিটে মাটি থেকে উচ্ছন্ন হবার আর বেশী বাকী থাকে না। চন্দরদা একটা বিয়ে থা করছো না কেন ?

চন্দ্রনাথ। এই দুটো নৌকার হাল ধরতে আসবে কে ? তুমি তো কলকাতায় নার্সিং পড়ে এত বড় নার্স হয়ে এসেছো। শুনি, তোমার ডাক পেলে মরা রোগীও বিছানায় উঠে বসে। তোমার ধন্বন্তরীর নাকি অন্ত নেই। কিন্তু তোমার পাশের বাড়ীতেই যে একটা রোগী দুরারোগে ভুগছে, সারারাত বিছানায় পড়ে কাতরাচ্ছে, কাল তুমি এসেছো শুনে শুধু কাতরায়নি—চেঁচিয়েছে ; কই তোমার কানে তো যায়নি সে আর্তনাদ। আদৌনি তো একবার জিজ্ঞাসা করতে—চন্দরদা, তুমি কেমন আছো ?

মায়া। (হাসিয়া) ডাক্তার দেখবে তবে তো নার্স। কলকাতার মেডিকেল কলেজ থেকে এবার সোনার মেডেল নিয়ে যে ছাত্রটি পাশ করে বেরিয়েছে, তাকে ধরে এনেছি আমি আমাদের গাঁয়ে—শুধু তোমার মতো একটি অদ্ভুত রোগীকে দেখিয়ে অবাক করে দিতে।

চন্দ্রনাথ। অদ্ভুতকর এসেছে ? সে অবাক হবে কিনা আমি জানি না, কিন্তু আমি অবাক হচ্ছি না এটা জানিয়ে যাচ্ছি। (চলিয়া যাইতে উদ্যত)

মায়া। কোথায় যাচ্ছো তুমি ?

চন্দ্রনাথ। ১০০ টাকা দিয়ে একটা Prize bond কিনেছি। ২৫০০০ টাকা পাবো আমায়। ৫ টাকার Prize bondও কিনেছি একটা। যেটায় ফার্ষ্ট প্রাইজ পাচ্ছে সাত হাজার। এই ৫ টাকার bondটা আমি কিনেছি বটে কিন্তু আমার জন্য নয়। আর একজনের

জন্ত। শুধু তার কপাল কেমন সেটা বাজিয়ে দেখতে। আজ সেই ভাগ্য পরীক্ষা। না, না, আর পিছু ডেকোনা মায়া।

[চন্দ্রনাথের প্রস্থান। মায়া কণকাল কি ভাবিল। পরে অন্দরের দিকে পা বাড়াইয়াছে এমন সময় অন্দর হইতে পুষ্পপাত্র হাতে বাহির হইয়া আসিলেন মায়ার মাতা কৃপাময়ী।]

কৃপা। কার যেন গলা শুনলাম। কে এসেছিল রে মায়া?

মায়া। তোমার সইয়ের ছেলে, আমার পুতুল খেলার বর। চন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

কৃপা। হ্যাঁ সই নাম রেখেছিল চন্দ্র, কিন্তু রাত দে এমন করে সেই চন্দ্র গ্রাস করবে সই মরে গিয়ে সেটা দেখে গেলো না। দেখতে হচ্ছে আমাকে। কলকাতায় থাকিস তাই হয়ত জানিস না। ছেলেটা দিন দিন যেন কেমন ক্ষ্যাপা হয়ে উঠছে। মাথার উপর অভিভাবক নেই কেউ। কর্তাকে কখনো বলে চাড়-গিলে কখনো বলে শকুন। তা বলুক, সেতো সবাই বলে। এতকাল আমাকে মাসীর মতোই মানতো। সে এখন আমাকেও সইতে পারে না। কি হয়েছে জানিস?

মায়া। কি মা?

কৃপা। তোর বাবা দিন দিন যতো কঞ্জুস হয়ে অখ্যাতি কুড়ুচ্ছেন ও তত দান ধয়রাত করে যেমন হচ্ছে কঞ্জুস, তেমনি কুড়ুচ্ছে নাম। এ যেন দু'জনে পাল্লা দিয়ে চলেছে। পরিণাম ভেবে আমি শিউরে উঠি। কারণ ওর ভিটে মাটি কর্তার হাতে বাঁধা। ছেলেটা কোনদিন পথে বসবে। অথচ—যাক্ সে। আমি মা মঙ্গলচণ্ডীর প্রণামটা সেরে আসি। শুভংকর তো এখনি আসবে? এলে বসতে বলিস।

[শুভংকরের প্রবেশ।]

মায়া। আমার আর বলতে হবে না। ঐ এসে গেছেন। তুমিই বলে যাও।

কৃপা। এসো, এসো বাবা এসো। ডাক্তারী পাশ দিয়ে বেরিয়েছ। সুন্দর নাম তোমার—শুভংকর। আশীর্বাদ করি নাম তোমার সার্থক হোক বাবা।

(শুভংকর কৃপাময়ীকে প্রণাম করিল)

শুভংকর। আমার নাম সার্থক হবে কি হবে না জানি না, কিন্তু আপনার কৃপাময়ী নাম সত্যি সত্যিই যে সার্থক হয়েছে তা এই ভল্লাটের লোক একবাক্যে বলছে।

কৃপা। না বাবা, সে কথা বোলো না। কর্তার জন্তে এ ভল্লাটের লোকের কাছে মুখ দেখানোই আমাদের হয়েছে ভার। শুধু আমার কর্তাটির জন্ত। লোকটির যদি এতটুকু দয়া মায়া থাকে। কিন্তু নাম হচ্ছে—যাক বাবা, সে নাম তো আর মুখে নিতে পারবো না।

শুভংকর। (হাসিয়া) আমি জানি স্বামীর নাম মুখে নিতে নেই। কিন্তু যে যাই বলুক জ্যেঠাইমা, আমার মনে হয় আমরা ওঁকে ঠিক চিনে উঠতে পারছি না। তা না হলে নিজে এমন কঞ্জুস—মানে সঞ্চয়ী, অথচ মেয়েটিকে অত টাকা খরচ করে নার্সিং পড়িয়ে সেবা শুশ্রূষার কাজে উৎসর্গ করেছেন কেন জ্যেঠাইমা?

কৃপা। কি জানি বাবা, বুঝি না। মায়া কলকাতায় মাসীর বাড়ীতে থেকে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করতেই আমি বললাম মেয়েকে এবার ঘরে-এনে বিয়ে দাও। শুনলেন না উনি। বললেন, না। মেয়েকে আমি সেবা শুশ্রূষা শেখাবো, নার্স করবো। আর বিয়েই যদি দিতে হয় বিয়ে দেবো এক ডাক্তারের সঙ্গে।

মায়া। বাবার এ মতলব কেন তা বুঝি জানেন না শুভংকরদা? কোন জ্যোতিষি নাকি বাবার আর মার কোষ্ঠী দেখে বলেছেন পঞ্চাশ পেরুলেই দু'জনেই বাকী জীবনটা—কেবলই অসুখ বিসুখে ভুগবেন। মেয়ে যদি নার্স হয় আর জামাই যদি ডাক্তার হয়, চিকিৎসা আর সেবা-শুশ্রূষাটা নিখরচায় হবে।

শুভংকর। (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল) এরই নাম দূরদৃষ্টি।

কৃপাময়ী। তবেই বোঝো বাবা, এমনি দূরদৃষ্টির লোক নিয়েই আমাদের ঘর করতে হচ্ছে। এসো বাবা,

আমি ঠাকুর প্রণাম করে আসছি। একটু প্রসাদ নিয়ে যাবে।

[কৃপাময়ী ঠাকুরঘরে চলিয়া গেলেন]

মায়া। মা মিথ্যে বলেন নি। বাবার এমনি সব দুরদৃষ্টি এক এক সময় এমন বিকট হয়ে ওঠে যে হাসিও পায়, কান্নাও আসে। একদিনের কথা তোমায় বলছি, শোনো। বসো। (উভয়ে বেঞ্চীতে বসিল) সেল বছর বামলা মোকদ্দমায় কি একটা কাজে বাবাকে একবার কলকাতায় যেতে হয়েছিল। রাস্তাঘাট তেমন চেনেন না, কাজেই আমাকেই সঙ্গে নিয়ে যোরাঘুরি করতেন। কলকাতার রাস্তার ঐ ভীড়। ট্রামে বাসে যাতায়াত তোলা হয়ে যেতে হবে তবু বাবা ট্যাক্সি নেবেন না। একটা বাস গেলো, দুটো বাস গেলো, ওঠাই গেলো না। পরের বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় তোমারই মত একটি ভালমানুষ ছেলে আমাদের পাশে এসে দাঁড়ালো।

শুভংকর। তা দাঁড়াতে হলে সুন্দরী মেয়ের পাশে দাঁড়ানোই ভালো।

মায়া। তুমি তাই দাঁড়াও দেখি। কিন্তু এ ছেলেটির উদ্দেশ্য ছিলো ক'টা বেজেছে জানা। বাবার পকেটে একটা মান্ধাতার আমলের ঘড়ির চেন শোভা পাচ্ছিল। ছেলেটি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে পাশে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো—ক'টা বেজেছে মশাই? বাবা একবার শুধু ছেলেটির আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন। উত্তর দিলেন না কিছু।

শুভংকর। না, না একথা বোলো না মায়া, সময় বলতে উনি নিশ্চয়ই টাকা পয়সা চান নি।

মায়া। (হাসিয়া) না তা চান নি। কিন্তু ঘড়ি দেখে সময়টা বললেন না। ছেলেটি ব্যস্ত হয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো। বাবাও আবার তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলেন, কোন জবাব দিলেন না। ছেলেটি চলে গেলো।

শুভংকর। একটু অবাক হয়েই চলে গেলো বোধ হয়।

মায়া। তা জানি না। কিন্তু অবাক হলাম আমি। বাস আসতে দেরী আছে দেখে আমি বললাম— ছেলেটিকে তুমি সময়টা কেন বললে না বাবা?

শুভংকর। বোধ হয় বললেন, যে-কথায় তাঁর কোন লাভ নেই এমন কথা তিনি অনর্থক খরচ করেন না।

মায়া। না, না, তা নয়। তিনি বললেন, দুরদৃষ্টি আছার আছে বলেই আমি ওর কথার জবাব দিলাম না।

শুভংকর। সে দুরদৃষ্টিটা কি?

মায়া। আচ্ছা বাবার হয়ে আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি, তুমি উত্তর দাও। বলো তাকে বলা যেতে পারতো এতোটা বেলে এতো মিনিট হয়েছে। বলা যেতো তো?

শুভংকর। যেতো বৈ কী।

মায়া। ছেলেটি তারপরেই হয়তো জিজ্ঞেস করতো কোথায় যাবেন? বলতে পারতো?

শুভংকর। তা পারতো।

মায়া। বাবা হয়ত বলতে পারতেন আমি অমুক জায়গায় যাবো। ছেলেটিও হয়তো বললো—চলুন আমিও ওখানেই যাবো। বলতে পারতো?

শুভংকর। তা পারতো।

মায়া। তারপর হয়তো ছেলেটি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে বাসে উঠতো। উঠতে পারতো?

শুভংকর। তা পারতো।

মায়া। আমাদের সঙ্গে অনেক আলাপ পরিচয় হওয়াতে হয়তো ছেলেটি বাসে আমাদের টিকিটও কেটে ফেললে ফেলতে পারতো?

শুভংকর। পারতো। বিশেষ যখন তুমি তোমার বাবার সঙ্গে ছিলে।

মায়া। তুমি বুঝলেও বাবা সেটা বুঝতেন না, তিনি দেখলেন আমাদেরও যখন টিকিট কেটেছে ছেলেটি বেশ ভালো। আর আমি হয়তো ছেলেটিকে একদিন আমাদের বাড়ীতে আসতে বলতাম। বলতে পারতাম?

শুভংকর। তা পারতে।

মায়া। আমাদের বাড়ীতে ঘনঘন যাতায়াত করে

ছেলেটি হয়তো খুব ধনিক হয়ে পড়লো। হ'তে পারতো?

শুভংকর। হ্যাঁ, হ'তে পারতো।

মায়া। তারপর একদিন হয়তো আমাকে ভালো লাগায় আমার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে বাবার কাছে উপস্থিত হ'লো। হ'তে পারতো কিনা বলো?

শুভংকর। তা পারতো।

মায়া। হ্যাঁ। কিন্তু যে ছেলে একটি ঘড়ি কিনে পরতে পারে না তাকে তিনি কিছুতেই জামাই করতে পারতেন না। বোঝো কেমন দূরদৃষ্টি।

শুভংকর। (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল) সত্যিই এর কোন জবাব নেই।

মায়া। ক'টা বাজলো।

শুভংকর। (ঘড়ি দেখিয়া হাসিতে হাসিতে) ন'টা দশ। আমার হাতে ঘড়ি আছে।

(উভয়েই হাসিয়া উঠিল)

মায়া। (হাসিয়া) কিন্তু এ কথাটার মানে কি শুভংকরদা।

শুভংকর। তাহলে বিয়ের প্রস্তাবটা করার মতো অন্তত: একটা যোগ্যতা আমার আছে।

মায়া। কিন্তু সবচেয়ে বড় যোগ্যতাটাই হচ্ছে দশহাজার টাকা। ওটা যার নেই তার হাতে বাবা আমাকে দেবেন না, এটা তাঁর বদ্ধমূল ধারণা।

শুভংকর। ও বাবা, তবে তো আমি নেই।

মায়া। আছেন, তবে আমার জীবনে নেই। আর তাতে অবশ্য আপনার ক্ষতি বৃদ্ধিও কিছু নেই। কারণ বিয়ে আপনার হয়ে গেছে।

শুভংকর। বিয়ে হয়ে গেছে আমার? কই জানিনা তো?

মায়া। জানিনা বললে মিথ্যে বলছেন। যাকে বিয়ে আপনি যেতে আছেন।

শুভংকর। যেতে আছি আমি?

মায়া। হ্যাঁ আপনি। তাকেই বিয়ে করেছেন! এতো ভালবাসা কেউ কারো কাছে পায়নি বুঝি কখনো।

শুভংকর। এ তুমি ঠিক বলছো মায়া?

মায়া। আমি আপনার স্ত্রীর কথাই বলছি। মানুষ তিনি নন, তিনি দেবী।

শুভংকর। দেবী?

মায়া। হ্যাঁ, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দেবী।

শুভংকর। (হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল) তাই বলো, আমি প্রায় ঘেবে উঠেছিলাম।

[কৃপাময়ীর প্রবেশ একটি রেকাবী হাতে। তাহাতে পূজার নির্মাল্য ও প্রসাদ রহিয়াছে]

কৃপা। তোমরা হাত পাতো, মা মঙ্গলচণ্ডীর নির্মাল্য আর প্রসাদ।

মায়া। যেন্নী করবেন না শুভংকরদা। শিগ্‌গির— শিগ্‌গির প্রসাদটা মুখে ফেলুন। বাবার আসবার সময় হয়েছে।

শুভংকর। (প্রসাদ লইয়া) যেন, জ্যাঠামশাই কি প্রসাদ খাওয়া পছন্দ করেন না?

কৃপা। তাঁর কথা বোরোনা। তিনি বলেন, দেবতার সামনে ভোগ-টোগ দেওয়া, ওটা একেবারে বাজে খরচ। দেবতাকে কি কখনো ভোগ খেতে দেখেছো?

মায়া। বাবা বলেন, প্রসাদের লোভেই নাকি আমরা ঠাকুরকে ভোগ দিই। তিনি বলেন, সত্যিকার ভক্তি হচ্ছে সেখানে, যেখানে পূজোটা হচ্ছে মনে মনে, ভোগও দিচ্ছে মনে মনে, প্রসাদও খাচ্ছে মনে মনে।

শুভংকর। জ্ঞানের কথা। উচ্চাঙ্গ জ্ঞানের কথা।

(ইতিমধ্যে ইহারা নির্মাল্য মাথায় ঠেকাইয়াছে এবং বাতাসা প্রসাদও খাইয়াছে)

কৃপা। চলো বাবা, ভিতরে গিয়ে বসবে চলো, জলটল খাবে।

মায়া। হ্যাঁ শুভংকরদা, আর যেন্নী করবেন না। বাবাকে জানেন তো? আপনি চা খাচ্ছেন দেখলেই বলবেন চা পান কেন? ওতেই নাকি বদহজম হয়। করো কুয়োর ঠাণ্ডা জল এবং সেবন করো নির্মল বায়ু। তাতেই না স্বাস্থ্য।

শুভংকর। কথাটা খুব মিথ্যে বলেননি।

কৃপা। এসো বাবা, তোমার সংগে আমার কিছু কথা আছে।

মায়া। (নেপথ্যে দয়াময়ের কণ্ঠ শুনিয়া) ঐ বাবা আসছেন—এখনো যদি চা খাবার বাসনা থাকে তবে পালিয়ে এসো আমার সংগে।

[তিনজনের অন্দরে প্রস্থান। বাহিরের পথ দিয়া আসিলেন দয়াময় এবং তৎসহ বিবেক বৈরাগী]

দয়াময়। তুই কালরাত্রে গাঁয়ে ফিরেছিস, আর দেখা করতে আসছিস সকালে? কেন, কাল রাতে আসতে কি হয়েছিলো?

বিবেক। কাল যখন গাঁয়ে ফিরেছি তখন রাত দুপুর। বর্দ্ধমান থেকে এলাম কিনা?

দয়াময়। ও, তবে বর্দ্ধমানও গিয়েছিলি!

বিবেক। কলকাতায় ছেলের মামা থাকেন। তিনি বললেন, পাত্রের খোঁজ নেবে তো যাও বর্দ্ধমান।

দয়াময়। ও, তবে কলকাতাও গিয়েছিলি? বেশ বেশ বাপ। আমি তামাক খেতে খেতে সব শুনছি।

[ঘরের দাওয়ায় গিয়া বসিলেন। তামাক সাজাই ছিল, টিকে আর হুঁকোটা বিবেকের কাছে আগাইয়া দিল।]

বিবেক। দেশলাই কর্তা?

দয়াময়। কেন তোর দেশলাই নেই? বিড়ি-টিড়ি খাস না?

বিবেক। বিড়ি খাবার পয়সা কোথায় পাবো?

দয়াময়। (বিরক্ত হইয়া) এখন হয়েছে দেশ। একটা দেশলাইয়ের কাঠি পর্য্যন্ত কেউ দিতে চায় না।

[টাঁক হইতে দেশলাই বাহির করিয়া দিলে বিবেক টিকে ধরাইতে লাগিল]

দয়াময়। কিন্তু আগে তোর হিসেবটা দেখতে হচ্ছে। তোর দেনার পরিমাণটা কতো আমার মনে পড়ছেনা। তোর হিসেবটা দেখছি।

[ঘরে হিসেবের খাতা আনিতে ঢুকিলেন। এই সুযোগে বিবেক হুঁকা ধরাইয়া পরম পরিতোষে কয়েক টান টানিয়া লইল এবং দয়াময় আসিতেই দেখিলেন দরজার গোড়ায় বিবেক হুঁকাটি তাহাকে দিবার জন্য বাড়াইয়া ধরিয়াছে। দরজায় আসিয়া খাতা খুলিয়া বসিলেন]

দয়াময়। হ্যাঁ পেয়েছি। এই যে খাতক শ্রীবিবেক বৈরাগী। ওরে বাবা তোর দেনাটা দেখছি সুদে আসলে ছ'টাকার কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিবেক। ও খাতা আপনি বন্ধ করুন কর্তা। দেনাও আছে, আমিও আছি আর আপনি তো রয়েছেনই। আমি দেনা করি কেন জানেন? দেশ ঘুরতে, আর আপনার দয়াময় নামটা সার্থক করতে।

দয়াময়। এঁ্যা, সে কি রে? ঘুরবি দেশ, আর আমার নাম হবে সার্থক!

বিবেক। আজ্ঞে তা নয়তো কি? আমি দেনা করব, শোধ করতে পারব না। আবার টাকার জন্য হাত পাতবো, আবার আপনি ধার দেবেন। তবেই না আপনার দয়াময় নাম সার্থক।

দয়াময়। জানি, জানি, সামনে দয়াময় আর চোখের আড়ালে গেলে ইয়েময়। তা থাক, তোকে যাপ করবো কি করবো না সেটা তোর কাজ দেখে বলছি। তবঘুরে লোক, দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিস। কতবার বলেছি আমার মেয়ের জন্য একটি সুপাত্রের খোঁজ এনে দিতে। তা আজ পর্যন্ত মনের মতো পাত্রের খোঁজ তো দিতে পারলি না, আবার বলছিস দয়াময় দয়া করো। বল এইবার বর্দ্ধমান থেকে পাত্রের কি খোঁজ এনেছিস?

বিবেক। কলকাতায় ছেলের মামার কাছ থেকে খবর নিয়ে তো গেলাম পাত্রের বাড়ী বর্দ্ধমানে। গিয়ে শুনি ছেলে থাকে আসানসোলে। মাঝে মাঝে বাড়ী আসে। তা ছেলের বাপটিকে তো বেশ ভালই মনে হয়। আসতে চাইলাম, ছেলে কেমন?

হরাময়। হুম্। তা কি হয়ে, খুব গুণ গান করলে নিশ্চয়ই ?

বিবেক। সে কথা আর বলতে ? তবে আমারো নাম বিবেক বৈরাগী, আসল খবর না নিয়ে কেরার পাত্র আমি নই। বলে কিনা ছেলে আমার হীরের টুকরা, পেঁয়াজ রসুন পর্যন্ত ছোঁয় না।

হরাময়। বাঃ বাঃ। বেশ।

বিবেক। আমি তো শুনে লাফিয়ে উঠলাম। আজকালকার ছেলে পেঁয়াজ রসুন ছোঁয় না কেন জিজ্ঞেস করলাম : তা পেঁয়াজ রসুন কি একেবারে ছোঁয় না ? তা বাপ বল্লে, না একেবারে যে ছোঁয় না তা নয়—ঐ মাংস-টাংস যখন খায় তখনই খায়।

হরাময়। ছেলে মাংস খায়। তাহলে অনেক খরচা।

বিবেক। আর আমিও জিজ্ঞেস করলাম, ছেলে যে মাংস খায়—তা কি রোজই খায় নাকি ?

হরাময়। কি বলে ?

বিবেক। বল্লে, না রোজ খায় না। ঐ যেদিন একটু মদ-টদ খেয়ে আসে সে দিনই খায় আর কি !

হরাময়। ছেলে মদ খায় ?

বিবেক। আজ্ঞে ওর বাপ তো বললে যে, রোজ খায় না। যে দিন কলকাতায় গিয়ে রেস্-টেস খেলে কিছু জিতে আসে সেদিনই খায়।

হরাময়। (প্রায় লাফাইয়া ওঠে) ছেলে রেস্ খেলে ?

বিবেক। আজ্ঞে না রোজ খেলে না। ওর বাপ তো স্পষ্ট বললো যে, রোজ খেলার পয়সা কোথায় ? যেদিন পকেট টকেট মেরে কিছু হাতাতে পারে সেই দিনই ঐ রেসটা খেলতে যায়।

হরাময়। (উঠিয়া দাঁড়াইল) কি ? ছেলে পকেটও মারে ?

বিবেক। আজ্ঞে কর্তা, যেদিন রাত্রে চুরি চামারী করতে পারে না সেদিন সকালেই পকেট মারতে বেরোয়। রোজ মারে। ওর বাপ তো তাই বল্লো।

হরাময়। (প্রায় চিৎকার করিয়া) ছেলে চুরি চামারীও করে ?

বিবেক। দুঃখের কথা কি বলবো কর্তা। তেমন করে আর করতে পারলো কই। বছরের ছ'মাস তো জেলেই কাটাতে হয়। তবে হ্যাঁ এই ছ'টা মাস খাওয়ার খরচা কিন্তু বেঁচে যায় কর্তা।

হরাময়। (কিঞ্চিৎ খুশী হইয়া) তা গুণের মধ্যে দেখছি শুধু এই একটি। ছ'মাস সরকারের পয়সায় খাওয়া। বেশ কিছু সঞ্চয় হয় বল ?

বিবেক। তবে কি কর্তা কথাবার্তা চালিয়ে যাবো ?

হরাময়। না।

বিবেক। কেন কর্তা ?

হরাময়। ওর না হয় ছ'মাসের খরচ বাঁচলো, কিন্তু আমার লাভটা কি হলো ?

বিবেক। ও, আপনার লাভ হবে এমন পাত্র চাই। মানে, টাকাকড়ি যার করবে চড়াসুদে এমন কোন পাত্র, কেমন ?

হরাময়। আরে ব্যাটা, ভূত, তুই বলছিস কি ? জামাইয়ের কাছ থেকে আমি সুদ নেবো ? আর কল যা হবে তা তো আমি জানি। এই যেমন ধর গিন্নীকে তার ঠেকা অঠেকায় দু'চার টাকা ধার দিয়ে সুদ নিই, কিন্তু আমি দেখেছি তাতে আমারই ক্ষতি। একটু সুদ খাই আমি। কিন্তু গিন্নী করেন কি, সুদের পুরো দাম নিয়ে সুদে মূলে মিশিয়ে সুদের টাকাটা ঐ থেকেই হাতিয়ে নিয়ে আমাকে দিয়ে যেন। না, না, ঘরের ভূতের সঙ্গে মামদোবাজী চলে না, চলবে না।

বিবেক। তবে কর্তা ?

হরাময়। আমি একটি ডাক্তার পাত্র চাই। এ তল্লাটে নাই আছে ডাক্তার, না আছে ডাক্তারখানা। কারো অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসা করতে ছুটতে হয় দশমাইল দূরে সোনারপুরে। যাতায়াতের খরচা তো আছেই, তার উপরে ডাক্তারের মোটা ফি, আর ওষুধপত্রের যে কি দাম ! আর ডাক্তারকে কল দিয়ে যদি দশমাইল দূরের এই গাঁয়ে আনতে হয় তার ধাক্কাতেই রোগীর ভবযন্ত্রণা জন্মের মত শেষ হয়ে যায়। তাই, মেয়েটাকে করেছি নার্স, তার জন্য খুঁজছি

ডাক্তার অনুপ
হবে।

বিবেক। আজ্ঞে হাঁ কর্তা, এ যা বলছেন। ওতো কেনার চেয়ে অনেক সস্তা পড়ে। তা বেশ, গোটা চারেক টাকা দিন, কলকাতা সহরে গিয়ে আবার একটু খোঁজাখুঁজি করে আসি।

দয়াময়। হ্যাঁ, তাই যাও। জ্যোতিষী বলেছে, এই বছরেই আমার একটা ফাঁড়া আছে। এগিয়ে যাও। (তাহার বৃদ্ধ অঙ্গুলিতে কালি লাগাইয়া) যে খাতায় টিপ সই দে। (টিপ সই হইয়া গেলে) এই নে, ৫টা টাকাই দিলাম। মনের মতো পাত্রের খোঁজ যদি এনে দিতে পারিস্ সুদটা না হয় ছেড়েই দেবো।

বিবেক। ঠিক তো কর্তা? সুদটা ছেড়ে দেবে তো?

দয়াময়। আরে ব্যাটা, হাতি কা রাত আর মহাজনকা ইমান—এ কখনো নড়চড় হয় না।

বিবেক। তা হলে কর্তা যেমনটি চেয়েছিলেন ঠিক তেমনটি পাত্রের খোঁজ এবার নিচ্ছে বিবেক বৈরাগী।

দয়াময়। বল, বল, ব্যাটা বল।

বিবেক। এ পাত্রটি আপনাদের ঘ-ঘর। ডাক্তার।

দয়াময়। ওঃ, বাঃ। তা তোমার মেয়ের মতো এ ছেলেটিও কি হীরের টুকরো?

বিবেক। না কর্তা।

দয়াময়। তবে?

বিবেক। এ ছেলে কর্তা পেঁয়াজ রসুন খায়, মাংসও খায়, কিন্তু মদটা খাওয়ানো যাচ্ছে না।

দয়াময়। বাঃ, বাঃ তারপর। পকেট টকেট?

বিবেক। হ্যাঁ কর্তা, কোনদিন মারেনি বরং ওর মাকে খেয়ে করেকবার। না না, ছেলেটিকে দেখলে আপনাকে বলতেই হবে, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। আর তপগুণ বলছেন—যাকে বলে একেবারে মধুর ছাড়া কাতিক।

দয়াময়। ডাক্তার? হাজার দশেক টাকার মালিক তো?

বিবেক। সোনার মেডেল পাওয়া ডাক্তার যখন, তখন দশহাজার টাকা কি থাকবে না?

দয়াময়। এ পাত্র কোথায়?

বিবেক। কর্তা, যদি আসলটাও মাপ করেন ঐ সঙ্গে তাহলে এখুনি পাত্র আপনার সামনে হাজির করে দিচ্ছি। কি কর্তা?

দয়াময়। না! সময়টা বড়ো খারাপ যাচ্ছে। লোকসান ছাড়া কথা নেই। বেশ, তাই হবে। হাজির কর।

(অন্দর হতে শুভংকর এবং মায়ার গলা শোনা গেল।)

বিবেক। তিনি হাজির হয়েই আছেন কর্তা। ঐ দেখুন।

[শুভংকর এবং মায়ার প্রবেশ]

বিবেক। এই যে কর্তা, আসছে।

দয়াময়। আরে ব্যাটা। তুমি পাশের গাঁয়ের ঐ শুভংকরকে দেখিয়ে আসল সুদটা মাপ চাইছো? ওকে তো আমি চিনি। ওর ঘরই আছে, দশ হাজার টাকা নেই। টাকার অভাবে একটা ডিস্পেনসারী দিতে পারছে না।

শুভংকর। আজ্ঞে সেই জন্যেই আজ আপনার কাছে আমার আসা। হাজার দশেক টাকা পেলে এ অঞ্চলে একটা ডাক্তারখানা খোলাই আমার ইচ্ছে।

দয়াময়। বেশতো, বেশতো। এ অঞ্চলে ব্যায়রাম পীড়া এত বেশী যে একটা ডাক্তারখানা তুমি খুললে একেবারে লালে লাল হয়ে যাবে। এখন তো তবু দশমাইল দূরে সোনারপুরে ডাক্তার রয়েছে, এমন দিন ছিলো যখন তাও ছিলো না। আমার বাপ-মার এক সঙ্গে কলেরা হয়েছিলো, ঘরে চিকিৎসার টাকাও ছিলো, কিন্তু এক ফোঁটা ওষুধ দিতে পারলাম না আমি তাদের মুখে। ঝাড়-ফুঁক আর জলসেঁকা খেয়ে তাঁরা পটল তুললেন—আমার চোখের সামনে। সম্বৎসর একটা না একটা মড়ক লেগেই আছে এ তল্লাটে। একটা ডাক্তারখানা করতে চাইছো। এ খুব ভাল কথা। শুভস্য শীঘ্রং। আর দেরী করো না বাবা।

শুভংকর। কিন্তু হাজার দশেক টাকা? সে আমি পাচ্ছি কোথায়? তোত জমি পুঁজি যা ছিলো ডাক্তারী

পাশ করতেই সব পেছে। তাই তো এসেছি আপনার কাছে। দেশের কল্যাণে বিবেচনা করে হাজার দশেক টাকা যদি আমায় ধার দেন বিনা সুদে।

দয়াময়। বিনা সুদে! ওরে বাবা! সে কি রে?

মায়া। দেশের কল্যাণে সুদটা না হয় ছেড়েই দিলে বাবা।

দয়াময়। সুদটা ছেড়ে দিলে আমার রোজগার বন্ধ। কিন্তু উনি কি রোগীর ভিজিট না দিয়ে বিনাফুলো ওষুধ দিয়ে নিজের রোজগারটা বন্ধ রাখতে রাজী আছেন?

মায়া। কিন্তু বাবা, ওঁরও তো চলা চাই।

দয়াময়। আমারও তো চলা চাই মা।

শুভংকর। আমার শেষ আশা ছিলেন উনি। সে আশাও যখন গেলো তখন সরকারী ডাক্তারের চাকরী নেওয়া ছাড়া আর আমার কোন পথ রইলো না মায়া। আচ্ছা, কথায় কথায় অনেক বেলা হলো, আজ তবে আসি।

দয়াময়। এসো বাবা এসো। আমারও চান টান করতে হবে, পুজোয় যেতে হবে। আমিও আসি। তা একটু জল খেয়ে গেলে তো বাবা আমার নতুন ইয়ারের জল। যেমন আশ, তেমনি হকমী। না হয় আর এক ঘটি খেয়ে যাও।

শুভংকর। না, না, আমি অনেক খেয়েছি।

দয়াময়। বেশ বেশ, (মায়াকে) দু'একখানা বাতাসা দিয়েছিস্ তো?

মায়া। (হাসিয়া) তোমার যখন হুকুম আছে না দিয়ে পারি বাবা? কিন্তু সে বাতাসা উনি খেয়ে ফেলেছেন বাবা।

দয়াময়। এঁ্যা খেয়ে ফেলেছো? খাবে বৈকি। (স্বর্গত পিতার উদ্দেশে নমস্কার করিয়া) কিন্তু আমার কর্তা কি করতেন জানো? রেকাবীতে বাতাসা রাখতেন এবং তাই দেখতেন আর আঙ্গুল করে জল খেতেন। দুরীভোগ আর কি। বড্ডো কৃপণ ছিলেন।

শুভংকর। আজ্ঞে তাঁর নাম কি ছিলো?

দয়াময়। ধনেশ্বর চক্রবর্তী।

শুভংকর। সুন্দর নাম। তিনি ছিলেন ধনেশ্বর, আপনি হলেন দয়াময়। সুন্দর নাম।

বিবেক। (অসতর্ক ভাবে চেঁচাইয়া উঠিল) কেটে গেছে, কেটে গেছে।

শুভংকর। কি কেটে গেছে—

বিবেক। বাড়ী গিয়ে দেখুন ভাতের হাঁড়ি, জলের কলসী যা যেখানে ছিলো সব কেটে গেছে।

[পলায়ন]

দয়াময়। তা যায়। আমার নাম নিলে ভাতের হাঁড়ি কেটে যায় এ আমি নিজে দেখেছি। লোকে আমাকে শাপ-মন্যি করে তাও জানি, আড়ালে আমার নাম করে থুথু ফেলে এও শুনেছি। তবু বাবা এ তল্লাটের অগতির গতি আমি। বাপ মরেছে শ্রাদ্ধ হচ্ছে না, ছেলের অসুখ হয়েছে চিকিৎসা হচ্ছে না, বর্ষার আগেই চাষীর ভাঁড়ারে মা ভবানী—ভাত জুটছে না। কে দিচ্ছে টাকা? আমি। এই হাড়—কেপ্পন আমি। সুদটা আমার কিছু বেশী। কিন্তু ঐটাই আমার রোজগার। আর ঐ রোজগারটা আমার আছে বলেই আমি আছি—আর অগতির গতি হয়ে আছি।

শুভংকর। না, না, আপনি থাকবেন বৈকি।

মায়া। (শুভংকরকে) কিন্তু আপনার আর দেরী করা উচিত নয়। এই অবেলায় আপনার কি হলো গিয়ে দেখুন।

শুভংকর। যাচ্ছি তো, যাচ্ছি তো। আচ্ছা আসি, নমস্কার।

[প্রস্থান]

মায়া। হিন্দু স্ত্রীরা স্বামীর নাম মুখে নেন না। তাই মা আমাদের এখনো অন্নপূর্ণা হয়ে বিরাজ করছেন।

[অন্দরে প্রস্থান]

দয়াময়। তা বাবা যে যাই বলো এ আমার পৈতৃক চামড়া। তা ছাড়া কানে দিয়েছি তুলো আর পিঠে বেঁধেছি তুলো। কারো কোন কথা আমি শুনবো না, রোজগার আমাকে করতেই হবে।

(অন্দরে প্রস্থানোদ্যত)

[সহরের উকিল বিপদভঞ্জন বসুর সাইকেল সহ প্রবেশ]

বিপদভঞ্জন। আরে ও ইন্দ্রেশ্বরবাবু, আমি এসে গেছি।

দয়াময়। আরে! আরে বিপদভঞ্জনবাবু যে, রবিবার আসবেন বলেছিলেন যে?

বিপদ। ব্যাপার হোল কি সেরেস্তায় গিয়ে বসেছি, মহুরী ভাইরী খুলে বললেন, ভাইরী আজ ফাঁকা। একটি কেসও নেই যে দু'টি পয়সা পাবো। দিনটা মাঠে মারা যাবে দেখে ভাবলাম আমার বড়ো মক্কেলের বাড়ী থেকে ঘুরে আসি। গিন্নীকে সেই কথা বলতেই তিনি বললেন, ভদ্রলোকের নামটা যখন মুখে নিয়েছো তখন সরে পড়ো। আর তার হাতের ব্যাপারটিও ঐ ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়েই সারো, নইলে এখানে হাড়ি চাঁচালো মুসকিল হবে। (হাস্য)

দয়াময়। হেঃ হেঃ, মা লক্ষ্মী যা বলেছেন, যথার্থই বলেছেন—না, না, এতটুকু মিথ্যে বলেননি। তার প্রমাণ এখানে হাতে হাতে পাবেন।

বিপদ। মানে?

দয়াময়। আমার ঐ মেয়েটা ঐ মাত্র, দেখছেন তো। নার্সিং পাশ করে বাড়ী এসেছে। খুব সাবধানী মেয়ে। পারত পক্ষে বাপের নাম মুখে নেয় না। হতচ্ছাড়ী আজ সকালে কি করেছে জানেন, আমার দয়াময় নামটি কথায় কথায় ভুলে বলে ফেলেছে। ফলে যা হবার তাই—গিন্নী জানিয়ে গেলেন হাঁড়ি ফেটেছে, আজ নির্জলা একাদশী।

বিপদ। ওরে বাবা, সেকি কথা ইন্দ্রেশ্বরবাবু?

দয়াময়। না না, তা ভাবছেন কেন? আপনার নাম বিপদ-ভঞ্জন-বসু। আমার কত বিপদ মামলা মোকদ্দমা চালিয়ে ভঞ্জন করেছেন, আর আপনার এই সামান্য বিপদ ভঞ্জন হবে না? হোটেল টোটেল অবশ্য এখানে নেই, কিন্তু—

বিপদ। কিন্তু থাকলেও লাভ হতো না কিছু। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসতে মাসিমাগটি ফেলে এসেছি ভুলে। পাঁচ ছ' মাইল যাইকে এসে সিগারেট খেতে পকেটে হাত দিয়ে দেখি মনিব্যাগটি সঙ্গে করা, নইলে পাঁয়ে হেঁটেই না খাক মুদির দোকান তো আছে। একটা ছোট খাটো মিষ্টির দোকান তো দেখেছি ডিঙে দই কলার একটা ফলারও তো হতে পারতো। কিন্তু কি করে হবে? পকেট খালি, টাকা নেই। গোটা দুই টাকা হলেই চলে যেতো।

দয়াময়। তা বেশতো, আমি ধার দিচ্ছি।

বিপদ। ধার? বেশ, তাই দিন।

দয়াময়। দিচ্ছি।

[টাকা আনিতে গেল। বিপদ ভঞ্জন দয়াময়ের পৈতৃক পাখা লইয়া হাওয়া খাইতেছে। দয়াময় ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া ঐ দৃশ্য দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল]

দয়াময়। সর্বনাশ! করছেন কি?

বিপদ। কেন হাওয়া খাচ্ছি।

দয়াময়। আমার ঐ পাখায়?

বিপদ। ও, বাবা! এর জন্যেও চার্জ দিতে হবে নাকি?

দয়াময়। কি যে বলেন মশাই। আমার পাখায় একটু হাওয়া খাবেন তার জন্যে চার্জ দেবেন আমাকে? না না মশাই, এতোটা কৃপণ ভাববেন না আমাকে।

বিপদ। তবে?

দয়াময়। হাওয়া খাচ্ছেন, খান না। কতো খাবেন খান। কিন্তু আমার ঐ পৈতৃক পাখায় ও ভাবে হাওয়া খাওয়া নিষেধ (পাখাটি বিপদভঞ্জনের হাত হইতে লইয়া) জানেন এ পাখাটির বয়স কত?

বিপদ। তা একটু পুরোনো দেখছি। বছর কয়েক হবে নিশ্চই আর আপনার যখন পাখা তখন সেইটাই স্বাভাবিক।

দয়াময়। এ আমার পাখা নয় মশাই, এ আমাদের দাদপুরুষের পাখা। পাখাটির বয়স কতো জানেন? কম করে তিন-শো-সাড়ে তিনশো বছর হবে। পুরুষানুক্রমিক ভাবে এই একটি পাখা আমরা ব্যবহার করে আসছি। কিন্তু দেখুন কি সুন্দর, এখনও টিকে আছে। কেন টিঁকে আছে বলতে পারেন?

বিপদ। সেই ভেবেই তো আরো ঘেমে উঠছি।

দয়াময়। (বাঁ হাতে নিজের পাখাটি ধরিয়া তান হাতে একটি কল্পিত পাখা আছে এই ভাবে) আপনারা মশাই পাখার হাওয়া খান এই ভাবে। তাতে পাখার আয়ু কমে যায়। পাখার পর পাখা কিনতে হয়—আপনাদের কত খরচা? কিন্তু আমাদের এই সৈতৃক পাখার নিয়ম আলাদা। পূর্ব পুরুষের নির্দেশে এ পাখা আমরা হাওয়া খাই এমনি করে। (সৈতৃক পাখাটি তান হাতে লইয়া মুখের সামনে ধরিয়া মাথাটি ডাইনে বাঁয়ে অনবরত ঘুরাইতে লাগিল। দয়াময়ের মাথানাড়ার তালে তালে বিপদভঞ্জনেরও মাথা নড়িতে লাগিল) দেখলেন তো, নিন ধরুন। (পাখাটি দিতে গেল)।

বিপদ। (দয়াময়কে নমস্কার করিয়া) ও পাখার আপনিই হাওয়া খান। আমি এমনিতেই ঠাণ্ডা হয়ে গেছি। দিন এবার দু'টো টাকা দিন। পেটটা ঠাণ্ডা করে আসি।

দয়াময়। তা এই দুটো টাকা খাতায় তবে লিখে রাখি?

বিপদ। ও, লিখেও রাখবেন? কিন্তু লিখে রাখলেই দেনাটা প্রমাণ করতে পারবেন কি? টাকাটা যে নিলো, সে যদি অস্বীকার করে?

দয়াময়। কি বিপদ! তবে এক্ষেত্রে উকিলের পরামর্শটা কি বলুন না?

বিপদ। উকিলের পরামর্শ হচ্ছে এই, টাকাটা খাতায় লিখুন আর ওরই পাশে আমার একটি সই নিন।

দয়াময়। বাঁচালেন মশাই। এ না হলে বিপদভঞ্জন উকিল। যাক নিশ্চিন্ত হোলাম। দিন একটা সই দিন।

(বিপদভঞ্জন সই করিলেন)

বিপদ। এবার আপনি একটি সই দিন, ইয়েময়বাবু।

দয়াময়। কোথায়?

বিপদ। আমার এই পকেট ডাইরিটাতে।

দয়াময়। কেন?

বিপদ। এই যে আপনাকে একটি লিগাল এ্যাডভাইস মানে উকিলের পরামর্শ দিলাম। তার দরুন আমার যে পাঁচটি টাকা আপনার কাছে পাওনা হয়ে গেল সেটা একটা সই দিয়ে আপনাকে স্বীকার করে নিতে হচ্ছে।

দয়াময়। ওরে বাবা, আপনার দেনা হচ্ছে দু'টাকা। আমার দেনা হচ্ছে পাঁচ টাকা?

(হিসাবের খাতায় উকিলের দেনাটি কাটিয়া দিয়া বিপলিত হাতে)

হেঃ হেঃ এই দেখুন আমি ঠাট্টা করছিলাম। আপনি সেটাকে এমন মারাত্মকভাবে সত্যি বলে মেনে নিলেন? আপনার খাবার ব্যবস্থা—এতো আমারই করা কর্তব্য। দেনা পাওনার কোন কথাই এতে ওঠে না।

বিপদ। তাই বলুন। তা বেশ আপনি নির্জলা একাদশী করুন। আমি বরং মুদির দোকানটায় গিয়ে দেখে আসি ভগবান আর কপালে কিছু মেপেছেন কিনা। (নোট দুটি সামনে ধরিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন)

দয়াময়। ও কি দেখছেন?

বিপদ। ধন্দ ভয় হচ্ছে কিনা ইয়েময় বাবু। তাই দেখে নিচ্ছি জালটাল নয়তো?

দয়াময়। না না, দু'টাকার উপর দিয়ে যেখানে পাঁচ পাওয়া যায় সেখানে জাল জোচ্চুরি হবে কেন? যাক্ তাহলে, খাওয়া দাওয়া সেরে ফিরে আসছেন তো? আমার কিন্তু বড্ডো দরকার। উইলটা আর না করলেই নয়। জ্যোতিষী বলেছে, আমার ভবলীলা নাকি হতে আর নাকি বেশী বাকী নেই।

বিপদ। দুঃখের বিষয় জ্যোতিষীর সব কথা সত্যি হয় না।

দয়াময়। সুখের বিষয় ঐটুকুই যা ভরসা। কিন্তু তবু এ কথাটা মিথ্যে না মশাই যে, আমার শরীরটা ভেঙে পড়েছে। এই তো সেদিন আমার পত্তর করতে বেরিয়ে ছিলাম একটু। আমার তো হলো কয়েক কাঁদি কাঁচকলা। দুপুর রোদে বাড়ী ফিরছি হঠাৎ পথে ভিরমী খেয়ে পড়ে।

বিপদ। (অপলিত শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন তো) ব্লাড প্রেসারটা হয়তো খুব বেড়েছে।

দয়াময়। মায়াও তাই বলেছে। কিন্তু সেটা কি ?

বিপদ। সেটা কি আমিও ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারবো না। তবে অনেকে বলে লোকের রক্ত শুষে খেলে এই ব্যারাম হয়। আচ্ছা, তা হলে চলি।

দয়াময়। কিন্তু এখুনি আবার আসছেন তো ? আমা উইলটা কিন্তু আজ না করলেই নয়।

বিপদ। হ্যাঁ, তা আসছি। মোটা কি পাবো। কেন আসবো না।

[প্রস্থান]

[ভজহরি নামে এক গ্রামবাসীর প্রবেশ]

দয়াময়। কে ওখানে ?

ভজহরি। আমাকে বলছেন কর্তা ?

দয়াময়। এঁ্যা ভজহরি ? তুমি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলে নাকি ? এখন এখানে আসবার মতলবটা কি ?

ভজহরি। মতলব আবার কি কর্তা ? এই যে সেদিন আপনি আমার বাড়ীর কাছে পথে হিমসি খেয়ে পড়ে গেলেন, আপনার কি কোন মতলব ছিলো ? আপনাকে কোলে পিঠে করে বাড়ী বয়ে নিয়ে যেয়ে মাথায় জল ঢেলে, হাওয়া বাতাস করে চৈতন্য ফিরিয়ে আনলাম—আমার কি কোন মতলব ছিলো ? মানুষের কাছেই মানুষ আসে কর্তা।

দয়াময়। তা বেশ বেশ, এসেছিস বেশ। সেদিন যে আমি বেঁচে গেছি তা তোর জন্যেই বেঁচে গেছি।

[অন্দর হইতে কৃপাময়ীর প্রবেশ]

এই যে কৃপাময়ী, কি গো তুমিও তো সেদিন তাই বলে যে, এই ভজহরির জন্যেই এ যাত্রা আমি বেঁচে গেছি।

কৃপাময়ী। শুধু আমি কেন, সবাই বলেছেন।

দয়াময়। তাইতো গেয়ে উঠে তোকে একটা টাকাও দিতে গিয়েছিলাম। টাকাটা তুই হাত পেতে নিলি না। আমি অবাকই হলাম তাতে। আজ বুঝি সেই টাকাটা নিতে এসেছিস ?

ভজহরি। না কর্তা, আজ অনেক বেশি ঠেকে পড়েছি। আজ বেশী কিছু টাকা আমার চাই—আমার তিন ছেলে মারা গিয়ে বিধবা বউ বেঁচে আছে ওই রাখহরি। কিন্তু হরি বুঝি তাকেও আর রাখবে না। ঘরে বেড়াল ঘরে পড়ে আছে আজ পুরো তিনদিন। বাড়ন্ত কলপড়া সব শেষ। এখন শেষ ভরসা সহরের কোন ডাক্তার। কম করে দশটা টাকা এখনি আমার দরকার কর্তা।

দয়াময়। ও, তাই এসেছিস ?

ভজহরি। না না, সে মতলবে আমি তোমার কাছে আসিনি কর্তা। আমি জানি, দশটাকা কেন দশপয়সাও তুমি আমাকে দেবে না, তোমার পায়ে মাথা খুঁড়লেও দেবে না। কারণ, তোমার কাছে যে টাকা আমি ধারি তার আসল তো দূরের কথা সুদই দিতে পারিনি এ বছর।

কৃপাময়ী। (স্বামীকে) তোমাকে চিনতে তো আর কারো বাকী নেই। যাকগে সে কথা, বেলা কত হলো খেয়াল আছে ? চানটান করবে না ?

দয়াময়। (ভজহরিকে) আমাকে চিনতে বাকী নেই। টাকাই যদি না চাইতে এসেছিস তবে এসেছিস কেন ?

ভজহরি। তোমার কাছে আসিনি কর্তা ; এসেছিলাম আমাদের চন্দ্রবাবুর কাছে। বিপদ আপদে পড়লে এ তল্লাটের লোক দয়ার সাগর ঐ লোকটার কাছেই যায়। দান ধ্যান করে কতুর হয়ে গেছে লোকটা, তোমার কাছে ওর ভিটে-মাটি বাঁধা তাও আমরা শুনেছি। তবুও আমাদের মতো লোকের শেষ ভরসা ওই চন্দ্রবাবু।

কৃপাময়ী। তা বেলা করেও লোকের বিপদে টাকা দেয় চন্দর। টাকা দিয়েছে তোমাকে বাবা ?

ভজহরি। পোড়া কপাল আমার। গিয়ে দেখি আমাদের ঠাঠাকুর নিজেই মরমর হয়ে শুয়েছে বিছানায়।

কৃপা। সে কি ? কি হয়েছে তার ?

ভজহরি। পোষ্টাফিস থেকে ফিরে বাড়ী এসে কিট হয়ে পড়লেন দোরগোড়ায়। সেই সেদিন তুমি কর্তা যেমন হয়েছিলে।

কৃপা। এঁ্যা ! বলিস কি ?

ভজহরি। না, না, জ্ঞান হয়েছে দেখে এলাম। কিন্তু বড় দুর্বল। এখুনি ডাক্তার আনা দরকার। তাদের রাখাল

আমাদের মতো লোকের কাছে দশ-বিশ টাকার জন্য হাত পাতলো, সহর থেকে ডাক্তার আনতে চায়। অত লোক তো ওখানে জড়ো হয়েছে ঠাঠাকুরের অসুখের কথা শুনে। কিন্তু একটি লোকও তো পাওয়া গেল না যে দুটি টাকা এ বিপদে রাখালের হাতে তুলে দেয়।

ধরাধর। (উত্তেজিত কণ্ঠে) দেবে না, দেবে না, কেউ কোনদিন দেবেনা। আপদে বিপদে আরো কাছে কিছু পাবে না, এই হলো গিয়ে সংসারের নিয়ম। তাই না বলি —এই চন্দ্রনাথকে কতবার বলেছি—বাপু হে! খরচ করছো করো, কিন্তু বিপদ আপদের কথা মনে রেখে কিছু কিছু সঞ্চয়ও করো। টাকা জমানোর অভ্যাস করো। অন্ততঃ পোষ্টাফিসে একটা সেভিংস ব্যাঙ্ক খুলো। হঠাৎ আপদ বিপদে যদি রক্ষা পেতে চাও। তা শুনছে কে? চলি, আমি চলি। চেঁচামেচি করলেই আমার রক্তের চাপটা আবার বেড়ে যায়। হ্যাঁ বেড়ে গেছে, এখন একটি ঘটি জল ঢালতে হবে মাথায়।

[অন্তরে প্রস্থান]

কৃপাময়ী। শোনো বাবা ভজহরি, চন্দ্রনাথের অসুখের সব খবরই আমি পেয়েছি। খিড়কির দোর দিয়ে রাখালে এসে মায়াকে ডেকে নিয়ে গেছে। মায়া শুভংকর ডাক্তারকে এখুনি চলে আসবার জন্যে অনুরোধ করে সাইকেলে লোক পাঠিয়ে দিয়েছে শ্রীপুর গাঁয়ে। জোরে চালিয়ে গেলে মনে হয় পথেই ধরতে পারবে তাকে। শুভংকর এতক্ষণ হয়তো এসেও যেতে পারে। তুমি চন্দ্রনাথের বাড়ীতে গিয়ে বসে থাক। শুভংকরের দয়া মায়া আছে, তোমার ছেলেকে ও দেখতে যাবে নিশ্চয়। চলি বাবা, ঐ বুড়োর জন্য আমারও ভয় হচ্ছে আজ।

[অন্তরে প্রস্থান। ভজহরি মঙ্গল-চণ্ডীর ঘরের সামনে গিয়া প্রার্থনা করিল]

ভজহরি। মা মঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গল করো মা। আমার ছেলের মঙ্গল কোরো আর যার জন্য আমাদের এই গাঁয়ের সবার মঙ্গল আমাদের সেই ঠাঠাকুরের মঙ্গল কোরো মা।

[বাহির হইতে শুভংকরকে লইয়া মায়ার প্রবেশ]

মায়া। (ভজহরিকে দেখিয়া) এই যে ভজহরি কাকা, একটা কাজ করতে পারো?

ভজহরি। কি মা?

মায়া। (শুভংকরকে দেখাইয়া) এঁকে চেনো তো?

ভজহরি। ও গাঁয়ের নতুন ডাক্তারবাবু তো?

মায়া। হ্যাঁ। ওঁর জন্য এখুনি দু'একটা ডাব এনে দিতে পার ভজহরি কাকা? খাবার সময় খেলেন না। ও বাড়ীতে ঘরের সাথে যুঝতে গিয়ে গলাও গেছে শুকিয়ে।

শুভংকর। না না থাক। তোমাদের ইঁদারার মিষ্টি জল এক গ্লাস হলেই হবে।

মায়া। তবে বোসো, আমি নিয়ে আসছি।

শুভংকর। না না তুমি বসো। (ভজহরিকে) তুমি বরং তবে একটা ডাবই নেবো।

ভজহরি। ডাব তো আমার বাড়ীতেই রয়েছে। আনছি [প্রস্থান]

শুভংকর। লটারীর টাকা পাননি শুনে কোন মানুষ যে মনে এমন আঘাত পেতে পারে—যাতে তার প্রাণ নিয়ে টানাটানি, এ কিন্তু আমি এই প্রথম দেখলাম মায়া।

মায়া। হার্টটা ওর বড় দুর্বল। বোধ হয় তাই দয়ামায়াও এত বেশী। শুভংকরদা ও বাঁচবে তো? তুমি কোনো চেষ্টার বাকী রেখোনা শুভংকরদা। শুধু এই কথাটা বলতেই আমি ধরে এনেছি তোমাকে এখানে। (মায়া শুভংকরের হাত দুখানি চাপিয়া ধরিল)।

শুভংকর। এ কথা এমন করে বলছো কেন? তুমি এখনো জানো না যে তোমাকে সুখী করাই আমার জীবনের একটা সাধনা।

মায়া। এ সব তুমি কি বলছো শুভংকরদা?

শুভংকর। (চমকিয়া উঠিয়া) তাই তো, কি সব বললাম। কেনই বা বললাম। কী নির্লজ্জ আমি। (হঠাৎ কঠিন হইয়া) তোমার কি মনে হয়েছিলো ওকে বাঁচাতে যে চেষ্টা করা আমার দরকার তা আমি করছি না।

মায়া। না, না সেকি? তা কেন?

শুভংকর। হ্যাঁ, হ্যাঁ। আর এখন হয়তো তোমার মনে হচ্ছে আমি আমার পথের কাঁটা সরিয়ে দেবো।

মায়া। (আর্তনাদ করিয়া) এ্যাঁ! এমন কথা তুমি বলতে পারলে?

শুভংকর। (হাসিয়া) হ্যাঁ নির্ভয়ে বলতে পারলাম, কারণ আমি জানি চন্দ্রকান্তবাবু এতক্ষণ বিছানায় উঠে বসেছেন। চলাফেরাও হয়তো করছেন। তোমার খোঁজে যদি এখনি এখানে এসে পড়েন তাতেও আমি বিস্মিত হবো না মায়া।

[রাখালের প্রবেশ]

রাখাল। এই যে মায়া মাসি, মামা এখন বেশ ভালো বোধ করছেন। তোমাদের ডাকছেন। শীগগির চলো। এখুনি একটা বিরাট খাসি কাটা হবে। বিরাট ভোজ হবে। কেন জানো? মামা লটারীতে অনেক টাকা পেয়েছেন।

মায়া। বলছো কি রাখাল! তবে যে শুনলাম লটারীতে টাকা পাননি বলে উনি মূর্ছা গিয়েছিলেন।

রাখাল। না, না, মায়া মাসি। উনি এখন বলছেন মূর্ছা গিয়েছিলেন আনন্দে।

মায়া। সে কি?

রাখাল। দু'টো টিকিট উনি কিনেছিলেন, একটা ১০০ টাকার আর একটা ৫ টাকার। ১০০ টাকার যেতে কোন প্রাইজ উনি পান নি, কিন্তু পাঁচ টাকার যেটাতে ১৫০০ টাকা প্রাইজ পেয়েছেন। হ্যাঁ, আজকের খবরের কাগজেই তা উঠেছে। তাই তোমাদের ডাকছেন।

মায়া। বেশতো গিয়ে বলো ডাক্তার বাবু একটু জল খেয়েই যাচ্ছেন।

শুভংকর। ডাক্তারের কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন হয়তার দার্দের।

রাখাল। সে আমি জানি না। তিনি ডাকছেন আপনাদের দুজনকেই। দু'জনেই আসুন। খবরটা বুড়ো কর্তা আর বুড়ো কর্ত্রীকে জানিয়ে দিয়ে একটা খাসি নিয়ে আমিও যাচ্ছি বলবেন।

[প্রস্থান]

মায়া। কি ভাবছো?

শুভংকর। এ মাসের বিয়ের তারিখ আছে কিনা ভাবছি।

মায়া। চন্দ্রবাবু, ১৫০০ টাকা পেয়েছেন বলেই বিবাহ বন্ধনে আমাকে বেঁধে ফেলছেন একথা ভাববার কোন যুক্তি আছে কি শুভংকরদা?

শুভংকর। ১৫০০ টাকা একটা হাতঘড়ির চেয়ে অনেক বেশী নয়?

মায়া। তা নিশ্চয়ই বেশী। অন্ততঃ আমার দাবার কাছে। কিন্তু আমার কাছে না-ও হতে পারে।

শুভংকর। কেন?

মায়া। মেয়েদের মন সে যে কি চায় কেউ জানে না।

শুভংকর। শাস্ত্রে আছে বটে স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্ দেবাঃ ন জানন্তি, কুতঃ মানবাঃ। কিন্তু—কিন্তু মায়া, মেয়েটি হয়ত নিজের মন নিজে জানে।

মায়া। (হাসিয়া) না শুভংকরদা, এ মেয়েটি তাও জানে না। আমার কি মনে হয় জানো শুভংকরদা? আমি বোধ হয় সবাইকে ভালবাসি। সবাইকে আমার আপনার মনে হয়। আর তাই বিয়ে আমি কাউকেই করবো না শুভংকরদা।

শুভংকর। প্রোফেসর নাইটিংগেল বোধ হয় এই জন্যেই ছিলেন চিরকুমারী। আজ বুঝেছি তোমার ঐ জকেটে বেঁধে কেন তাঁর ছবিটি বুকে করে রেখেছো।

মায়া। (শুভংকরের হাত দুখানি ধরিয়া) আজ তোমাকে আমার মনের গোপন কথাটি বলেছি।

শুভংকর। বলে, ভালোই করেছো মায়া।

মায়া। তুমি কি দুঃখ পেলে শুভংকরদা?

শুভংকর। দুঃখ হয়ত কিছুটা পেলাম, কিন্তু সেটা সামলে উঠতে পারবো তোমার প্রতি আজ আমার যে শ্রদ্ধা জন্মালো তার আনন্দে।

মায়া। তোমার দুশ্চিটা সহজ করো শুভংকরদা?

শুভংকর। করছি।

মায়া। পারছো না। চোখ ছুটো ভিজে আসছে। ডাক্তারের চোখে জল! লোকে বলবে কি?

শুভংকর। জলের দাগ বেশীক্ষণ থাকেনা মায়া। (চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া) কই আর যে নেই। এইবার আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও মায়া।

মায়া। বিদায়! কেন, কোথায় যাচ্ছো?

শুভংকর। যাঃ যাবো না। এখানে যখন ডিসপেনসারী খোলা হোল না তখন দেখি অন্যত্র কিছু করা যায় কিনা। একটা সরকারী চাকরী হয়তো নিতে হবে এখন।

মায়া। ঐ সংগে আমার জন্যেও একটা চাকরী দেখো শুভংকরদা। খুব সাধ হয়, যে হাসপাতালে তুমি হবে ডাক্তার সেই হাসপাতালেরই আমি হবো নার্স।

[ভজহরির প্রবেশ]

ভজহরি। ডাক্তারবাবু, ভাবটা ধরুন।

শুভংকর। (ডাব লইয়া) না ঠিক সময়েই এটা এনেছো। গলাটা সত্যিই শুকিয়ে গিয়েছিলো। (জল পান)

ভজহরি। ভাবটা আপনি দয়া করে খেলেন, আমার পুণ্যি হোল, আর এই পুণ্যের জোরে যদি আমার বেঁহুস ছেলেটা বেঁচে ওঠে।

শুভংকর। ওসব কি বলছো। চলো এখুনি তোমার ছেলেকে দেখে আসছি।

[ভজহরির সহিত প্রস্থান। মায়া অন্দরে যাইতেছিল এমন সময় অন্দর হইতে রাখাল আসিল]

রাখাল। একি মায়া মাসি! তুমি এখনো যাওনি? চলো শিগগির চলো। আমার সংগেই চলো।

মায়া। খাসি কিনতে গেলি না?

রাখাল। না না, খাসি কিনতে যেতে পারছি কই? যেতে হচ্ছে বাড়ীতে। ৫ টাকার সেই Prize bondটা আনতে।

মায়া। কেন?

রাখাল। হ্যাঁ, এনে দেখাতে হবে, আর সেই সংগে খবরের কাগজ। নইলে বুড়ো কর্তার বিশ্বাস হচ্ছে না।

মায়া। নাই বা হোল, তাতে তোমাদের কি?

রাখাল। সবাই বিশ্বাস করবে, আর উনি বিশ্বাস করছেন না? ওঁকে আমি বিশ্বাস করিয়ে ছাড়বো।

মায়া। কিন্তু আমি তো বিশ্বাস করেছি।

রাখাল। বেশ তো তাহলেই হোল। বাড়ীর একজনের বিশ্বাস হলেই হোলো। তা তোমার যখন বিশ্বাস হয়েছে তখন তোমার কাছে আমার একটা আর্জি আছে মায়া মাসি।

মায়া। আর্জি? আমার কাছে?

রাখাল। হ্যাঁ, তোমার কাছে। আমি জানি যে ··

মায়া। কি জানি যে?

রাখাল। হেঁ হেঁ—কেউ যা জানে না, আমি তা জানি। বলবো?

মায়া। বলো।

রাখাল। মামাবাবু তোমাকে বেশ—ইয়ে করে।

মায়া। মানে?

রাখাল। ইয়ে করে বলেই এবার বিয়ে করবে। আর বিয়ে করবে বলেই ঐ ৭৫০০ হবে তোমার। আর তা হবে বলেই আর্জিটা আমি এখনই করছি।

মায়া। (হাসিয়া) হুম। কি আর্জি শুনি?

রাখাল। এ গাঁয়ে আমার বয়সী যারা সবারই বিয়ে হয়ে গেছে, এক আমিই শুধু বাদ আছি।

মায়া। এই কথা, তা এর জন্য ভাবছো কেন? বিয়ে হবে।

রাখাল। কার সংগে?

মায়া। সে দেখা যাবে এখন।

রাখাল। আমার আর্জিটা ঐখানেই। আমি বিয়ে করতে চাই।

মায়া। হ্যাঁ বলো—কাকে বিয়ে করতে চাও?

রাখাল। যে মেয়েগুলো সিনেমা করে পর্দায় দেখি, ওদের কাউকে।

মায়া। (হাসিয়া উঠিল)

রাখাল। তুমি হাসছো? লাভটা ভেবে দেখছো-মা?

মায়া। লাভ?

রাখাল। হ্যাঁ লাভ, বিনি-পয়সায় বায়স্কোপ দেখবো। তোমাকেও দেখাবো।

(চন্দ্রনাথের প্রবেশ)

চন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, তা তো দেখবে, তার আগে একটা খাদি দেখো।

রাখাল। এই যে! [দ্রুত প্রস্থান]

চন্দ্রনাথ। রাখাল কি বলছিল?

মায়া। ৫ টাকার লটারি কিনে তুমি ৭৫০০ টাকা পেয়েছো, তারই আনন্দে নাকি মূর্ছা গিয়াছিলে?—তুমি মূর্ছা···থাক বেশ সেরে উঠেছো দেখছি।

চন্দ্রনাথ। তা উঠেছি বটে, কিন্তু ৭৫০০ টাকা আমার নয়। যার টাকা তারই হাতে তুলে দিতে এসেছি।

মায়া। কিন্তু ওটা তো তুমিই কিনেছিলে—তোমারই টাকায়।

চন্দ্রনাথ। হ্যাঁ, তা কিনেছিলাম বটে। ১০০ টাকার লটারি কিনেছিলাম একটা আর ৫ টাকার লটারি কিনেছিলাম একটা। ১০০ টাকারটা কিনেছিলাম আমার জন্য। সেটাতে কোন Prize পাইনি। ৫ টাকারটা যার কথা মনে করে কিনেছিলাম সেই বউই প্রাইজ উঠেছে ৭৫০০ টাকা। কাজেই বউটা এখন তাকেই দিতে হবে।

মায়া। বউ শুনেছি কারো নাম লেখা থাকে না। থাকে শুধু মন্ত্র। তবে কেন এ টাকা তুমি অন্যকে দেবে? দিতেতো তুমি বাধ্য নও চন্দ্রনাথ।

চন্দ্রনাথ। না। দিতে আমাকে হবেই। ঐ মা মঙ্গলচণ্ডীর সামনে মনে মনে এই প্রতিজ্ঞাটাই আমি করেছিলাম সেদিন—যেদিন বউ কিনি।

মায়া। আমি ও বউ নেবো না।

চন্দ্রনাথ। তোমার নামে তো এ বউ আমি কিনিনি।

মায়া। ঠকে করেছো। তবে কার নামে কিনেছো?

চন্দ্রনাথ। কিনেছি এ বাড়ীতেই কারো নামে।

মায়া। বুঝেছি।

চন্দ্রনাথ। কি বুঝেছি।

মায়া। এত লোক থাকতে যখন এ বাড়ীর কোন লোকের নামেই কিনেছো—

চন্দ্রনাথ। (হাসিয়া) না না তোমাকে কিনতে নয়। আমি আমি টাকা দিয়ে তোমাকে কেনা যায় না।

মায়া। তাই নাকি?

চন্দ্রনাথ। হ্যাঁ। রাতে শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে আকাশের চাঁদ দেখি। মনে হয় ঐ চাঁদ যেন তার জ্যোৎস্না দিয়ে আমাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। যদি মনে করি শুধু আমাকেই দিচ্ছে তবে আমার চেয়ে বড়ো বোকা দুনিয়ার আর কেউ নেই? তাই নয় কি?

মায়া। কি যে তুমি বলো!

চন্দ্রনাথ। না না আমি ঠিকই বলছি। পথে পথে কাতরাচ্ছে যে কুষ্ঠরোগী, কিম্বা বনে জঙ্গলে লুকিয়ে রয়েছে যে পশু অথবা নরপশু সবাই বঞ্চিত হচ্ছে—ঐ জ্যোৎস্নার করুণা ধারায়।

মায়া। তুমি কবি? জানতাম না চন্দ্রদা।

চন্দ্রনাথ। কবি কিনা জানি না। তবে এটা জানি আমার আকাশের সে চাঁদ তুমি।

[বিবেকের প্রবেশ]

বিবেক। এইযে দিদিমণি, এই যে দা' ঠাকুর বড়ো একটা কুলক্ষণ দেখে এলাম।

মায়া। সে কি কুলক্ষণ?

বিবেক। নতুন দেখলেই জানবে কেউ মরছে। এ গাঁয়ে আজ কি কেউ মরেছে দিদিমণি?

মায়া। কই না তো?

চন্দ্রনাথ। মরবার কথা ছিল আমার। কিন্তু আমি তো বেঁচে উঠেছি। [ভজহরি সহ ডাক্তারের প্রবেশ]

মায়া। (ব্যস্ত ভাবে শুভংকরকে) ওর ছেলেটি কেমন আছে?

শুভংকর। গিয়ে দেখি জ্বর ছেড়ে গেছে।

ভজহরি। হ্যাঁ দিদিমণি, ওর পায়ের ধুলোরই এমন গুণ।

চন্দ্রনাথ। ধন্বন্তরী বটে। আমাকেও তো টেনে তুলেছেন। আমি শুধু ভাবছি এমন একটা ধন্বন্তরীকে চিরদিনের জন্য এ গাঁয়ে বেঁধে রাখলে কেমন হয়। আমরা বেঁচে যাই, কি বলো মায়া?

বিবেক। আমি কিন্তু লক্ষণ দেখে এসেছি। মড়ার গন্ধে আগে পড়ুন আর মারামারির গন্ধে আগে উকিল। এই যে এসে গেছেন। আসুন, আসুন উকিলবাবু।

[বিপদভঞ্জনের প্রবেশ]

বিপদ। এই যে মায়া। তোমার বাপের নির্জলা একাদশী হয়েছে? গিয়ে বলো আমি হরিমটর খেয়ে এসে সেছি। কিন্তু আর দেরী করতে পারবো না। পেটে এখন ছুঁচো ডন মারছে।

মায়া। তার মানে?

বিপদ। তার মানে, ইয়েমর, মানে তোমার বাবা জানেন।

[দয়াময় ও কৃপাময়ীর প্রবেশ]

দয়াময়। কই কোথায় রাখাল? এখনো তো এলো না। পাঁচ টাকায় ১৪০০ টাকা, কোথায় আমি দেখবো। (কৃপাময়ীকে) না, না আমাকে ছাড়ো, আমি স্বচক্ষে তা দেখতে চাই। যদি এ সত্যি হয় তবে আর আমি বাঁচবো না। কেন কিনিনি ঐ বস্তু। হায়! হায়! কেন কিনিনি!

চন্দ্রনাথ। আপনি শান্ত হন মেসোমশাই। এইযে আমার হাতে সেই বস্তু। আর এই দেখুন খবরের কাগজ। এই মজবুটা কাগজে আমি দাগ দিয়ে রেখেছি।

দয়াময়। (প্রায় জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া উহা যে সত্যিক তাহা ধীর ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া) তাইতো। (বস্তুটি ফেলিয়া দিয়া) কী ভুল করেছি আমি। এ টাকায় মিলতো সাড়ে সাত হাজার টাকা? যত চড়া সুদই আমি চুষে খেয়ে থাকি, এত সুদ কখনও খাইনি আমি। (বুক চাপড়াইয়া) কেন কিনিনি আমি ঐ বস্তু।

চন্দ্রনাথ। আপনি থামুন, আপনি থামুন মেসোমশাই। ঐ বস্তু আমি কিনলেও টাকাটা আপনার।

দয়াময়। (চমকাইয়া) সে কি! আমার!

চন্দ্রনাথ। হ্যাঁ আপনার। বস্তু কিনবার আগে ঐ মা মঙ্গলচণ্ডীর সামনে এসে বলেছিলাম মাগো, তার কেমন ভাগ্য সেটা পরখ করে দেখবো। ১০০ টাকার বস্তু একটা কিনেছি আমি। আর পাঁচ টাকার একটা কিনেছি মনে মনে তার নামে যার নামে নিলে ভাতের হাড়ি ফাটে। দেখবো মা, এবার তোকে বাগিয়ে দেখবো, তেলা মাথায় সবাই তেল ঢালে, কিন্তু তুইও কি ঢালবি? তা দেখলাম ঠিক তাই। কিন্তু বুঝলাম না, কি গুণে তোমার অমন কপাল।

দয়াময়। এ্যাঁ এ বস্তু আমার? তবে দাও আমাকে দাও।

বিবেক ও ভজহরি। না না দিও না। দিও না দা-ঠাকুর। ঐ হাড় কেলেঙ্কারি—

দয়াময়। দেবে না? মা মঙ্গলচণ্ডীর বরে ও টাকা আমি পেয়েছি। দেবে না মানে? [ছুটিয়া যাইতে গিয়া ঘুরিয়া পড়িয়া গেল]

চন্দ্রনাথ। আমি তো দিতেই এসেছি। এই যে— এই যে (বস্তুটি দয়াময়ের কম্পিত হস্তে গুঁজিয়া দিল। কিন্তু রক্ত চাপাধিক্যে দয়াময়ের অন্তিম অবস্থা উপস্থিত হইল)

মায়া। বাবা! বাবা। অমন কাঁপছ কেন বাবা?

কৃপা। এ কি সর্বনাশ!

শুভংকর। (রাখালকে) আমার ওষুধের ব্যাগটা শিগ্‌গীর আনো। (রাখাল ও বিবেক ছুটিয়া গেল। শুভংকর নাড়ী দেখিতেছিল। তাহার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল)

শুভংকর। ওঁকে এখানে শুইয়ে দিন। (মায়াকে) মায়া, মনে হচ্ছে একটা মাইল্ড স্ট্রোক। [মায়া ছুটিয়া ভিতরে চলিয়া গেল।]

ভজহরি। ভয় নেই, আমার বাড়ীর সামনে সেদিনও এমনি হয়েছিল। এক বালতি জল দরকার।

[বিপদভঞ্জন এবং শুভংকর দুইজনে দয়াময়কে ভালো করিয়া শোয়াইলেন। মাথা রহিল কৃপাময়ীর কোলে। ইতিমধ্যে মায়া পাখা বালিশ ও এক বালতি জল লইয়া ছুটিয়া আসিল। ভজহরি তাহার

হাত হইতে বাগতিটি লইল। ওষুধের ব্যাগ হাতে রামলাল আসিয়াছে। পশ্চাতে বৈরাগী। প্রাথমিক প্রতিবিধানের পর—]

হরাময়। (ভক্তিত কণ্ঠে) উইল না করে আমি মরতে পারবো না। আমাকে আর একটু বাঁচিয়ে রাখো ডাক্তার! আর একটু বাঁচিয়ে রাখো।

শুভংকর। কথা বলবেন না, আপনি কথা বলবেন না, তবেই আপনি সেরে উঠবেন।

হরাময়। না না, আর হয়তো সময় পাবো না, আমার শেষ কথা আমাকে বলতে দাও। উকিল, আমার উইলটা তুমি লিখে নাও।

[উকিল তাহার কাইল হইতে একখানি ষ্টেমি কাগজ লইয়া লিখিতে লাগিলেন) আমার যাবতীয় অস্থাবর সম্পত্তি আর ৮৬০০০ টাকার সরকারী কাগজ আমি সরকারকে দিয়ে গেলাম আমার গাঁয়ে একটা দাতব্য হাসপাতাল করতে। লিখেছো?

বিপদ। লিখেছি।

হরাময়। আর শুধু দু'টি কথা—এই হাসপাতালের নার্স হবে আমার একমাত্র কন্যা মায়া। আর ডাক্তার হবে শুভংকর।

হরাময়। দাও আমি সই করবো।

(উকিল কাগজটি তাহার সামনে ধরিলেন, হরাময় অতি কষ্টে সই করিলেন)

হরাময়। তোমরা সকলে সাক্ষী থাকো।

[উকিল নিজে সই করিলেন এবং অন্যদের দিয়াও সই করাইয়া লইলেন এবং কাগজখানি হরাময়ের হাতে দিলেন। কম্পিত হস্তে কাগজখানি গ্রহণ করিয়া টেবিলে মায়াকে এবং শুভংকরকে কাছে ডাকিয়া তাহাদের যুক্ত করে অর্পণ করিলেন। তাহারা উহা সশ্রদ্ধচিত্তে মাথায় ঠেকাইল)

হরাময়। (আকাশের দিকে যুক্ত করে) বাবা! মা! একফোঁটা ওষুধ দিতে পারিনি তোমাদের মুখে। শ্রাদ্ধেও করিনি এতকাল। আজ তোমাদের তর্পণ করলাম।

(প্রবল উত্তেজনায় কথাগুলি বলিয়াই চিরতরে নীরব নিথর হইলেন)

রূপামণী। (প্রকাশ্য কণ্ঠে) এই লোকের নাম মুখে নিলে হাড়ি কাটতো...

চন্দ্রনাথ। আজ বুঝলুম কীভাবে ওর নামে লটারীতেও টাকা ওঠে।

মায়া। বিবেক কাকা নাম কীর্তন করো। ওঁর আত্মার সদ্গতি হোক।

[অশ্রুস্নাত চক্ষে সকলে বিবেকের নাম কীর্তন শুনিতে লাগিল। অতি ধীরে যবনিকা নামিল]

"নাটক লেখা কঠিন, সংসার ও লোক চরিত্রের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টির আবশ্যক। পুত্রশোকে মা যেরূপ ভাবায় কাঁদে, পিতা সেরূপ ভাষায় কাঁদে না। শোক উভয়েরই, কিন্তু প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গী স্বতন্ত্র। নাটক সংসারেরই অনুকরণ, ইহা নাট্যকারের সতত স্মরণ রাখা উচিত।"

"সৎকার্য্য করিয়া জীবনে কখন কেহ ফল পায়। কেহ বা ইহজীবনে পায়-ই না। কিন্তু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান—সৎকার্য্যের জন্য—সুফল প্রাপ্তির জন্য—উচ্চপ্রকৃতি গ্রন্থকার এই আদর্শ মানব চক্ষে ধরিবার প্রয়াস পাইবেন। সংসারে এরূপ লোক আছে, যাহারা সৎকার্য্য করিয়া পুরস্কারের প্রত্যাশা করে এবং না পাইলে সৎকার্য্যে আস্থাহীন হয়। তাহাদের লিখিত পুস্তক লোকের ভ্রান্ত-বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করে, কিন্তু তাহারা যখন কার্য্যক্ষেত্রে বিপরীত দেখে, তখন তাহাদের ধর্ম্মের প্রতিও বিশ্বাস হারাইয়া যায়।"

—গিরিশচন্দ্র

মনোরম নতুন আধারে
এখন আরো উন্নতমানের .
অভিজাত চন্দন-সুবাস

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের
নবরূপায়ণে
এখন আপনাদের

মলয়

চন্দন ট্যাল্ক

চন্দন সৌরভের অভিজাত। সুবিদিত। মলয় চন্দন ট্যাল্কের নরম রেশমী পরশ আপনাকে চন্দনের সেই সৌরভে সারাদিন ভরপুর রাখবে। সতেজ ও স্নিগ্ধ থাকবেন আপনি।

আপনার চিরচেনা মলয় চন্দন ট্যাল্ক এখন ঐতিহ্যের নবরূপায়ণে আরো অভিজাত।

কালকাটা কেমিক্যাল-এর অভিজাত প্রসাধন।

দেশ
বিদেশের
উৎসব

কী সুন্দর মধুর হাসি

প্রতিদিন নিয়মিত সাধনা দশন ব্যবহার করার ফলেই তাঁর দাঁতগুলি হয়েছে অত সুন্দর। আর তাই তাঁর হাসিও আজ অত মধুর। সাধনা দশন অতি উৎকৃষ্ট দাঁতের মাজন। এর অতুলনীয় গুণাবলীর জন্য বহুদিন ধরে দেশের সর্বত্র সমাদৃত।

সাধনা দশন

সাধনা টুথপেষ্ট

সাধনা টুথ পেষ্টও বহুগুণ-বিশিষ্ট বিশেষ ফলপ্রদ ও উপকারী। যাঁরা পেষ্ট পছন্দ করেন তাঁদের জন্যই এটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা

কলিকাতা-৪৮

অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশচন্দ্র ঘোষ এম.এ, আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রী, এফ.সি.এস, (লণ্ডন) কেমিক্যাল ল্যাবরেটরী ডাক্তারপুর কলেজের প্রধান শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।

কলিকাতা কেন্দ্র
ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ, এম.বি.বি.এস. (ডিগ্রী) আয়ুর্বেদাচার্য

আমেরিকায় কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন দিবস উৎসব

—প্রভাত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ঈশ্বরের অপরিসীম অনুগ্রহ ও করুণায় ধরণী সুফলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা হয়েছে, দেবতার করুণা মানুষকে যুগিয়েছে আহার, মানবজাতিকে জীবনদান করেছে। পরম পিতার এই অপার অনুগ্রহকে সর্বকালের সর্বদেশের মানুষ কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করেছে ও করছে।

নতুন ফসল ওঠবার সময় মানুষ অতীতের দুঃখ-দুর্দশা ভুলে গিয়ে পূজা-অর্চনা কিংবা উপাসনার মাধ্যমে ঈশ্বরের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে, তারপর মেতে ওঠে উৎসবে, নৃত্যগীতে।

নতুন ফসলকে বন্দনা করে এমনি লৌকিক উৎসব আমাদের দেশেরও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত আছে।

১৯২১ সালের দুঃসহ শীতে কৃতজ্ঞভরে ঈশ্বরকে স্মরণ করে এমনই উৎসবে মেতে উঠেছিলেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নবাগত ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীরা—নিউ ইংল্যাণ্ড অঞ্চলের অধিবাসীরা। নতুন দুনিয়ায় এজাতীয় উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই প্রথম। ঐ বছরই গভর্ণর উইলিয়ম ব্র্যাড-ফোর্ডের নির্দেশে প্রথম এই উৎসব পালন করা হয়েছিল। কেন এই উৎসবে তাঁরা মেতে উঠেছিলেন, সেও এক ইতিহাস।

প্রচণ্ড দুর্দশার মধ্যে তাঁদের সে বছরটা কেটেছিল। ইউরোপ থেকে তাঁরা যাত্রা করেছিলেন মেফ্লাওয়ার জাহাজে—গন্তব্যস্থল ছিল আমেরিকার পূর্ব উপকূলবর্তী ভার্জিনিয়া। কিন্তু বিধি বাম। প্রচণ্ড ঝড়ের তাড়নায় জাহাজ গিয়ে ভিড়ল ম্যাসাচুসেট্স রাজ্যের অধুনা প্লীমাথ বন্দরে। ধু-ধু করছে সেখানকার বরফ ঢাকা প্রান্তর, খাদ্যবস্তু প্রায় অমিল। সঙ্গে তাঁদের আহার্যেরও সঞ্চয় খুব বেশি ছিল না। যেটুকু ছিল অল্পদিনের মধ্যেই তা নিঃশেষ হয়ে গেল। এই নবাগতরা দলে ছিলেন ১০২ জন। তার মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি নানা রোগের প্রকোপে প্রাণ হারালেন।

যাইহোক, মরণোন্মুখ নবাগতরা আশার আলো দেখতে পেলেন বসন্ত সমাগমে। বরফ সরে যাবার পর চারিদিকে লতাগুল্মের অঙ্কুরোদ্গম লক্ষ্য করা গেল। কিছুদিনের মধ্যেই গাছে শুধু পাতাই গজালো না, নানারকম সুস্বাদু ফলও দেখা দিল। খাল-বিল জলাশয়ে মাছ ভরে উঠল। বন্য পশু-পক্ষী শিকারও সম্ভব হল।

ইতিমধ্যে আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড ইণ্ডিয়ান-দের সঙ্গে তাদের মিতালি হয়েছে, একটা চুক্তিও হয়েছে চলাফেরায় নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি নিয়ে। এদের সহায়তায় তাদের চাষ থেকে ঘরের ফসল হল প্রচুর। আগামী শীতের কথা স্মরণ করে নিজেদের জন্য তাঁরা কুটির তৈরিও করলেন।

অক্টোবর নাগাদ এই নবাগতের দল তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও বেশ নিশ্চিন্ত হলেন। ইউরোপে ধর্মান্ধতার বলি হয়ে আমেরিকার পথে পাড়ি জমিয়েছিলেন তাঁরা। ভবিষ্যতের এই নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবনের আশ্বাস ঈশ্বরের প্রতি তাঁদের কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করল। একারণেই তাঁদের নির্বাচিত গভর্ণর উইলিয়াম ব্র্যাডফোর্ড ১৯২১ সালের ১৩ই ডিসেম্বর তারিখটিতে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন উৎসব পালন করলেন। নতুন দুনিয়ায় সেই হল প্রথম ছুটির দিন।

এরপর এই নতুন বসতিস্থাপনকারীরা মাঝে মাঝে, এমন কি বছরে দুদিন পর্যন্ত এই ধরনের উৎসব পালন করতেন। অতঃপর প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন সর্বপ্রথম এই মাসের শেষ বৃহস্পতিবারটি নির্দিষ্ট করে দিলেন। এর-পর প্রেসিডেন্ট লিঙ্কন ১৮৬৩ সালে এক ঘোষণায় প্রতি বছর নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবার কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন দিবস উৎসব পালনের নির্দেশ দেন। কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন দিবস অপার করুণা ও আশীষের জন্য ঈশ্বরের জয়গান ও তাঁকে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনের দিন। ঐ দিনে সকলেই শান্তিতে ও সদ্ভাবে পারস্পরিক মেলামেশার মধ্যে দিন যাপন করবে।

তখন থেকেই যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন দিবস ছুটির দিন হিসাবে পালিত হচ্ছে। ১৯৪১ সালের ২৬শে ডিসেম্বর মার্কিণ কংগ্রেসের এক প্রস্তাব অনুসারে বর্তমানে নভেম্বরের শেষ বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে চতুর্থ বৃহস্পতিবার দিনটি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন দিবসরূপে পালিত হচ্ছে।

বিগত সাড়ে তিনশ বছরে আমেরিকার অনেক পরিবর্তন হয়েছে—ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সর্বদিক থেকেই। কিন্তু জনমানসে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন দিবসের তাৎপর্যের একটুও হেরফের হয় নি। সমস্ত ধর্মমতের গির্জাতেই সেদিন উপাসনা হয়। গীর্জার বেদী সাজানো হয় শস্যের মঞ্জরি ও নতুন ফল-ফুলে।

ধন্যবাদজ্ঞাপন দিবস আমেরিকার পারিবারিক উৎসব, পারিবারিক পুনর্মিলনের দিন—যেমন, আমাদের শারদীয়া বিজয়া উৎসব। বাড়িতে বাড়িতে সেদিন স্বজন পরিজনেরা সবাই এসে মিলিত হয়, বড়দিনের সময়ও বোধহয় এমনটা হয় না। গৃহকর্তার আহ্বানে পুত্র-কন্যারা, পৌত্র-পৌত্রীরা এসে হাজির হয়, জমায়েত হয় কাকা-পিসী-মামা-মাসীর দল। প্রচুর রান্নাবান্না হয়। তারপর হাসি-ঠাট্টা, গল্প-গুজবের মধ্যে সবাই গরম পরিতোষের সঙ্গে নৈশ আহার সারে।

প্রথম কৃতজ্ঞতা দিবসের মত এখনও এই দিনে মেলা-মেশা আদান-প্রদানের সমারোহ দেখা যায়। মাঠে-ময়দানে খেলোয়াড়রা বিবাদ-বিসম্বাদ ভুলে যায়। মরশুমের শেষ ফুটবল খেলা হয় এই দিন। তাতে হারজিতের প্রশ্নটা বড় নয়, প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে খেলার আনন্দটুকুই আসল।

বাজারে এইদিন থেকেই বড়দিনের কেনাবেচা শুরু হয়ে যায়।

প্রেসিডেন্ট ক্যালভিন কুলিজ্ বলেছিলেন: "ঈশ্বরের আশীষ অঝোরে ঝরে পড়েছে আমাদের ওপর। আমরা এজন্য খুবই কৃতজ্ঞ।" তাই এত আনন্দের সমারোহ, এত উৎসবের আয়োজন।

১৬২১ সালে ম্যাসাচুসেটস্ উপনিবেশ স্থাপনকারীরা প্রথম কৃতজ্ঞতা দিবস পালন করছেন

দুর্গোৎসব : আদিরূপ এবং বর্তমান ব্যাপ্তি

—লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্য

দৈনন্দিন জীবনের নগ্ন বাস্তবতা হতে মানুষ চিরকালই মুক্তি চেয়েছে। প্রাত্যহিক যান্ত্রিকতাচ্ছিন্ন জীবনযাত্রা, লাভ-ক্ষতির যোগ-বিয়োগের অবশ্য-আবশ্যক খাতা থেকে তার অন্তরাত্মা আনন্দময় অসীমের দিকে মুখ না তুলে পারেনি। সভ্যতার অগ্রগমন হয়েছে সত্যি, সঙ্গে সঙ্গে দিনযাপন আর প্রাণধারণের গ্লানিও মানুষকে কবায়ত্ত করেছে। এই সব অবকল্পিত শোচনীয় মুহূর্তে, এক প্রচণ্ড আকর্ষণে বাধাহীন আনন্দে পক্ষ-বিস্তারের সুযোগ করে দিয়েছে উৎসব।

যখন ক্ষুদ্রতা, এবং সংকীর্ণতায় আমাদের দৈনন্দিন জীবন আকীর্ণ হতে থাকে, যখন গৃহবদ্ধ জীবনই আমাদের পরিসমাপ্তির ইংগিতবাহী হয়ে ওঠে, তখনই আসে উৎসবের দিন—এই দিন আমাদের বৃহৎ সমাজ কিংবা বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে একীভূত করে দেয়। আমরাও নিজেদের ব্যাপ্ত করে দিই। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "প্রতিদিন মানুষ ক্ষুদ্র দীন একাকী—কিন্তু উৎসবের দিনে মানুষ বৃহৎ; সেদিন সে সমস্ত মানুষের সঙ্গে একত্র হইয়া বৃহৎ, সেদিন সে সমস্ত মনুষ্যত্বের শক্তি অনুভব করিয়া মহৎ।" এই কারণেই উৎসবের দিন মানুষের বিকাশের দিন, মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের প্রহর।

বাংলাদেশের প্রতিটি মাসই একটি না একটি উৎসবের আধার। প্রাচীন যুগ হতে বাংলার মণ্ডপে মণ্ডপে কতই না দেবদেবীর আসনের প্রতিষ্ঠা! কিন্তু বাংলার মানুষ উৎসবের চরম আদর্শ খুঁজে পেয়েছে দুর্গোৎসবের মধ্যে। কারণ দেশের সকল শ্রেণীর সমস্ত স্তরের মানুষকে নিয়েই গড়ে উঠেছে এই মহান আনন্দ-উৎসব। বাংলার অধিবাসী তাই হৃদয় দিয়ে এই উৎসবকে গ্রহণ করেছে।

বস্তুতঃপক্ষে যে উৎসব আমাদের উন্নত জীবনের আস্বাদ দেয়, সেই উৎসবের প্রধানতম বৈশিষ্ট্যই হল পারস্পরিক শুভ কামনা। প্রাচীনকালে দুর্গোৎসবকে পবিত্র উপলক্ষ্য করে আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী-বন্ধুবান্ধব, দীন-দরিদ্র প্রত্যেককেই গৃহকর্তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আহ্বান জানাতেন, আর প্রত্যেক শ্রেণীর মানুষ একত্রিত হয়ে উৎসবকে সার্থক মণ্ডিত করতেন। ঐ উৎসবে ছিল ভাবেরই প্রাধান্য। "আমার আনন্দে সকলের আনন্দ হউক, আমার শুভে সকলের শুভ হউক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি"—এই কল্যাণী ইচ্ছাই বাঙালীর উৎসবের প্রাণ ছিল। বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা, এই কল্যাণী ইচ্ছা এবং পবিত্র শুভ কামনার ভাব প্রতিষ্ঠার আদর্শেই নিয়োজিত ছিল।

এই উৎসবের আরাধ্য দেবী দুর্গার আবির্ভাব-তিথি শরৎকাল। শারদ-প্রকৃতির স্পর্শসুখের মন্ত্রকালের মন্ত্রেই কবি গেয়ে ওঠেন, "আজি শরৎ-তপনে প্রভাত স্বপনে কী জানি পরাণ কী যে চায়! কী যে চাই তা আজ করে কে বলতে পারে—প্রকৃতির বহস্যময় অসীমতার কথা বলা সম্ভবও নয়। তবে এটুকু বুঝি, শরতে সুন্দরের আমন্ত্রণ! জলে-স্থলে-আকাশে-মাটিতে সর্বত্রই ঐ সুন্দরের উজ্জ্বল উপস্থিতি। আর ঐ সুন্দরের কেন্দ্রভূমিতে রয়েছেন শারদা। বাংলা দেশের মানুষের চির-আকাঙ্ক্ষার বস্তু এই শারদ-দেবীর আগমন-মুহূর্তও নগর-গ্রামের ঘূর্ণিঝড়া বনানীর পত্রপল্লব—প্রত্যেকেই দেবীর আবাহন মন্ত্রে এই সময় নূতন উল্লাসে জীবন্ত হয়ে ওঠে এই আকাঙ্ক্ষার এই আতির, এই আনন্দ ও কল্যাণের-মূর্তিময়ী প্রতীক রূপেই বাংলাদেশে দেবীর প্রত্যাগমন।

দেবী দুর্গার দুটি রূপ। একটি তাঁর শাস্ত্রীয় রূপ, অন্যটি লৌকিক। শাস্ত্রীয় মতে দেবী দশপ্রহরণধারিণী, বিপুলবারিণী, বহ্নিবলধারিণী; তিনিই সকল শক্তির আধার, তাঁর নাম দুর্গতিনাশিনী—তিনিই বিপদে-বিঘ্নে স্মরণকারী দেবী, সর্বলোকহিতার্থে সিংহবাহিনী দেবীর আবির্ভাব অশুভ-বিনাশিনীরূপে।

লৌকিক দুর্গার রূপ স্বতন্ত্র। এইরূপে তিনি জগজ্জননী, আনন্দময়ী মা; আবার কখনও তিনি কন্যা। লৌকিক দেবী দুর্গার রূপকল্পনায় সিংহবাহিনীর ত্রিশূলে আক্রান্ত অসুরের উপস্থিতি যথাযথ। কিন্তু একই সঙ্গে এসেছেন তাঁর পুত্রকন্যারা—কার্তিক-গণেশ, লক্ষ্মী-সরস্বতী ও বঙ্গ-মৃত্তিকার সরল কোমলতা, সামাজিক কল্পনা এবং মানসিকতার প্রভাবে শক্তিময়ী দেবী আপনজনে পরিণত হয়ে সংসারেরই অন্যতম হয়ে গেছেন। কন্যা উমারূপে, বৎসরান্তে, মাত্র তিন দিনের জন্য পিত্রালয়ে গিরিরাজ এবং মাতা মেনকার কাছে তাঁর আগমন। এই 'আগমন' নিয়েই 'আগমনী' গানের রচনা। এই তিনদিনই তো উমাকে নিয়ে উৎসব দুর্গোৎসব। চলে যাওয়ার দিন বিজয়া। বিষাদ-ব্যথা ভরা বিজয়ার দিন মা মেনকা কন্যাকে বিদায় দিতে গিয়ে আকুল কান্নায় ভেঙে পড়েন। এই উমা তো বাঙালীর ঘরেরই কন্যার প্রতীক। বাঙালীর দুর্গোৎসব তাই আনুষ্ঠানিক পূজার ধর্মীয় গণ্ডী ছাড়িয়ে, হয়ে উঠেছে তার হৃদয়ের প্রেমভক্তির এক চারু প্রকাশ।

পুরাণোক্ত দেবী দুর্গার মূর্তি পরিকল্পনা, ভাবরূপ এবং প্রত্যায়ন পদ্ধতির সঙ্গে লৌকিক দুর্গার পার্থক্য স্পষ্টরেখ। কিন্তু বাঙালীর জীবনে দেবী উভয় রূপেই আবির্ভূতা। বাঙালীর দুর্গোৎসব তাই মিশ্রিত পূজা। ধর্মচেতনা, লোকাচার, সামাজিক আচার-ব্যবহার লৌকিক প্রভাব—সমস্ত কিছুর মিশ্রণে গড়ে উঠেছে বলেই এই দুর্গোৎসবের মধ্যে 'সকল তত্ত্বের সমবায়' হয়েছে।

কোন বিস্মৃত অতীত থেকে দুর্গাপূজার প্রচলন হয়েছে তা নিয়ে ঐতিহাসিকেরা গবেষণা করতে পারেন। অনেকে দুর্গাপূজাকে আধুনিক বলেন, কারণ বেদে 'দুর্গা' নামের উল্লেখ নেই। তাঁরা ভুলে যান দুর্গার সহস্র নাম, তার সমস্ত নাম সর্বত্র দেখতে পাওয়া যাবে এমন আশা করা যায় না। বস্তুতঃ শুক্লযজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা নাম দেখা যায়। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে, উমা ও হৈমবতী নামোল্লেখ আছে, নারায়ণ উপনিষদে দুর্গা-গায়ত্রীতে দুর্গানাম স্পষ্টভাবে লেখা আছে। দুর্গারূপে দেবীর পূজার প্রসঙ্গ, মার্কণ্ডেয় পুরাণে, দেবী ভাগবতে, দেবী পুরাণে, কালিকাপুরাণে, কাশীখণ্ডে বর্ণিত আছে।

দুর্গানামের নানা অর্থ। দুর্গা (দুর্গ বা দুর্গম) নামক অসুরকে বধ করে দেবীর দুর্গা নাম হয়েছিল; দেবগণের শত্রুসংকট দূর করেছিলেন বলে তাঁর নাম দুর্গা; দুর্গা নাম জপের ফলে জীবের দুর্গতি দূর হয়, এইজন্য দুর্গা নাম হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। স্মার্ত রঘুনন্দন তিথি-তত্ত্বে নির্দেশ করে গেছেন,—দুর্গাপূজা হিন্দুমাত্রেরই কর্তব্য।

কিন্তু এই দুর্গাপূজা প্রথম প্রচলন করেছিলেন কে? মার্কণ্ডেয় পুরাণানুযায়ী মেধস ঋষির কাছে দুর্গার মাহাত্ম্য কথা শুনে রাজা সুরথ এবং বিধ্যাধিপতি সমাধি প্রথম দেবীর আরাধনা করেছিলেন। এই পূজা হয়েছিল কোন ঋতুতে এবং কোন মূর্তিতে [illegible] দেবীর পূজা করেছিলেন, ঐ পুরাণে তার উল্লেখ [illegible] তবে কিয়দংশ, তিনি বসন্তকালে দেবীর প্রত্যায়ন করেছিলেন। একাধিক পুরাণ এবং কৃত্তিবাসী রামায়ণ অনুযায়ী শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-বধের জন্য শরৎকালে মহাশক্তিরূপিনী-দেবী দুর্গার বোধন করেছিলেন; এই বোধন অকালে হয়েছিল বলে, এই পূজার নাম অকাল-বোধন। আর্ষ রামায়ণে অবশ্য শ্রীরামচন্দ্রের অকাল-বোধনের উল্লেখ নেই। ব্যাসদেবের মহাভারত পাঠে আমরা জানতে পারি, অর্জুন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে জয়লাভের জন্য দুর্গাদেবীকে উদ্দেশ্য করে স্তব পাঠ করেছিলেন এবং দেবী প্রসন্নও হয়েছিলেন। দেবী দুর্গা বস্তুতঃ মানুষের ভোগমোক্ষদায়িনী রূপেই চিত্রিত; তিনি মানুষকে অভীষ্ট বস্তু দান করেন।

কিন্তু এ তো প্রাচীন কালের কথা—এক এক জনের পূজা। দুর্গাপূজা জাতীয় পূজা—সার্বজনীন পূজা হলো কবে থেকে? মনে হয় অষ্টাদশ শতক থেকে দুর্গাপূজা জাতীয় পূজা রূপে উঠলো বাঙালীর কাছে। এই সময়ই শাক্ত-বৈষ্ণবের মধ্যে সমন্বয় সূচিত হয়। অবশ্য মুসলমান আগমনের পূর্বেই দুর্গাপূজার ব্যাপক প্রচার শুরু হয়েছিল। তখন শাস্ত্রোক্ত দুর্গা এবং লৌকিক দুর্গা মিলেমিশে এক হয়ে গিয়েছে। কালী, তারা বা চামুণ্ডার মূর্তি অপেক্ষা দুর্গার রাজরাজেশ্বরী মূর্তিই বাঙালীকে বেশী আকর্ষণ করলো। তবে জাতির জীবনের একতম দেবতারূপে প্রতিষ্ঠা পাবার

জন্যে দুর্গাকে আঠারশ শতক পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিলো।

এই সময়ই রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রমুখ কবিরা আগমনী-বিজয়া গান রচনা করলেন। দুর্গা বা উমার পিতৃগৃহে আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ জুড়ে উৎসব সুরু হয়—কিন্তু তিনদিনের মধ্যেই বিদায় মুহূর্ত ঘনিয়ে আসে, সকলের হৃদয় অশ্রুভারে আনত হয়ে ওঠে। কবিরা এই হৃদয়াতি লক্ষ্য করেই কবিতা লিখেছেন। এইভাবেই বাংলাদেশের হৃদয়ের সঙ্গে, পারিবারিক সম্পর্কের সূত্রে দেবী এক হয়ে গেছেন। এইসব গানের মধ্য থেকে অল্পকালস্থায়ী মিলনের আনন্দ ও দীর্ঘকালস্থায়ী বিচ্ছেদ-বেদনা আমাদের আপ্লুত করে। যদিও পৌরাণিক সমাজব্যবস্থার বিন্দুমাত্রও আজ আর অবশিষ্ট নেই, তবুও তৎকালীন সমগ্র বাংলা-দেশের দুঃখের বাণী ঐসব কবিতাপাঠে এখনও আমাদের আক্রান্ত করে। বাঙালী মানসিকতায় চণ্ডীর বীর্যবত্তা যেন স্তিমিত হয়ে গেছে, কোমল সাংসারিক রসেরই জয় জয়কার হয়েছে।

অবশ্য বাঙালী মনন দেবীকে ঐ গৃহস্থ-ধর্মের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে দেয় নি। দেবীকে দেশস্থ আত্মার প্রতীক-রূপেও দেখা হলো। বঙ্কিমচন্দ্র দেবীকে স্বর্গের দুরত্ব, পরিবারের স্নেহবন্ধন থেকে মুক্ত করে দেশজননীরূপে জাতির হৃদয়ের অন্তঃস্থলে স্থাপন করলেন।

কমলাকান্তের মুখ দিয়ে বঙ্কিম বলেছিলেন, ঐ দুর্গাকে উদ্ধার করতে গেলে আলস্য ত্যাগ করে, সংহত ও একতাবদ্ধ হতে হবে। আনন্দমঠের সত্যানন্দও দেখেছিলেন, অনাগত কালের দেশমাতৃকাই সন্তানদের ধ্যানের দেশমাতা—'বন্দে মাতরম' মন্ত্রে দীক্ষিত সন্তানদের ব্রতই হচ্ছে—এই ধ্যানমূর্তির প্রতিষ্ঠা। বাঙালী, দুর্গোৎসবের মধ্য দিয়ে এই বঙ্গজননীর বন্দনা করে।

কমলাকান্ত 'অনন্ত কালসমুদ্রে' দেবীকে নিমজ্জমান দেখেছিলেন। সেই দশা হতে তাঁর উদ্ধার হয়েছে কি না বলতে পারি না। তবে দুর্গাকে কেন্দ্র করে যে প্রাচীন উৎসব আন্তরিকতায় নিবিড় ছিল, বর্তমান এবং আধুনিক উৎসবে তা ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে এবং বাহ্যিক সমারোহে পরিণত হয়েছে। বস্তুতঃ সার্বজনীন পূজা মাত্রই হুল্লোড় আর হৈ-হুল্লোড়ের সমবেত প্রকাশ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূজা তার আধ্যাত্মিক সত্তা হারিয়েছে বলে বিজ্ঞ জনেরা সমালোচনায় মুখর হয়েছেন। এ কথা সত্যিই, যে আজকের দুর্গাপূজা দেখলে বোঝা যায়, উপলক্ষ্য কেমন করে আসল বস্তুকে বহুগুণে অতিক্রম করে যায়। কিন্তু শত সমালোচনাও সার্বজনীন পূজার ব্যাপক বিস্তার এবং উচ্ছৃঙ্খল আচরণকে রুদ্ধ করতে পারে নি।

বলাবাহুল্য, এর কারণানুসন্ধান প্রয়োজন। যে পূজাকে কেন্দ্র করে বাঙালী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার হৃদয় মুক্তির উল্লাসে, আত্মার তৃপ্তিতে, হৃদয়ের বিস্তারে এবং মনন-কল্পনার প্রকাশে উৎফুল্ল হত, তার এ যেন অবলুপ্তি সত্যিই সহ্য করার নয়। অবশ্য পূজা সার্বজনীন হচ্ছে বলে ক্ষোভ করে লাভ নেই। এর পেছনে অর্থনৈতিক কারণ আছে, অন্য কারণও আছে। এত বড় পূজাযোজনে প্রচুর অর্থ, প্রচুর লোকবল প্রয়োজন। কিন্তু জমিদার-বংশ অবলুপ্ত, নতুন-ধনীরা ধর্মকেন্দ্রিক উৎসবে অর্থব্যয় অপব্যয় বলে গণ্য করেন। অতএব সাধারণ গৃহস্থের পুঁজি যোগ করেই গৃহস্থকে পূজার ইচ্ছা পূরণ করতে হচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে এই গণতান্ত্রিক সঙ্ঘশক্তির প্রকাশ আর গণতান্ত্রিক অধিকারবোধ—ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের স্বীকৃতি—সার্বজনীন পূজার পশ্চাতে এই দুটি কারণ বর্তমান।

কিন্তু পূজা, সার্বজনীন বলে, ভক্তিরও অবলুপ্তি ঘটবে, ধর্মের নামে অধার্মিকোচিত ছেলেখেলা চলবে—এ মেনে নেওয়া শক্ত। আজ মনে হয় বাঙালী হিন্দুর ধর্মাচরণের ভবিষ্যৎ বোধ হয় সর্বজনীনতা। সার্বজনীন না হলেই পূজার বিলুপ্তি। অতএব সার্বজনীন পূজার আয়োজন মানতেই হবে। সুতরাং চিন্তাশীল বাঙালীরই উচিত এর সমাধানের পথ খুঁজে বের করা। সার্বজনীন পূজার নামে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং বিকৃত রুচি দমন করতে না পারলে জাতীয় সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়বে। দুর্গাপূজার মত সার্বজনীন পূজাকে শুধুমাত্র ধর্মমুখী করে তুলে আড়ম্বর বর্জন করলে চলবে না। ধর্মের পাশাপাশি আড়ম্বর-ঔজ্জ্বল্য থাক, কিন্তু উৎসবটিকে রুচির বিকৃতি যেন কিছুতেই গ্রাস না করে।

বুদ্ধজয়ন্তী

—রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

'যাঁরা মহাপুরুষ তাঁরা জন্মমুহূর্তেই স্থান গ্রহণ করেন মহাযুগে, চলমান কালের অতীত কালেই তাঁরা বর্তমান, দূরবিস্তীর্ণ ভাবী কালে তাঁরা বিরাজিত।'

আজ থেকে আড়াই হাজার বছরেরও আগে খৃষ্টপূর্ব ৬০২ শতাব্দীতে বৈশাখী পূর্ণিমায় পুণ্যভূমি ভারতের বুকে আবির্ভূত হয়েছিলেন এমনি এক মহাপুরুষ। তিনি ভগবান বুদ্ধ।

বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধদেবের জন্মদিনটি তাই সারা বিশ্বের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে এক অতি-পবিত্র দিন—মহোৎসবের দিন। শুধু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে কেন, বিশ্বের সকল মানুষের কাছে বুদ্ধজয়ন্তী এক মহামানবকে অভ্যর্থনার পুণ্যদিন। কারণ 'তিনি এসেছিলেন সকল মানুষের জন্যে সকল কালের জন্যে।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব' বলে উপলব্ধি করেছিলেন। হৃদয় উজাড় করে এত ভক্তি শ্রদ্ধা আর কোনো মহামানবকে তিনি জানিয়েছেন কিনা সন্দেহ! অনুপম ভাষায় তিনি বুদ্ধদেব প্রসঙ্গে বলেছেন : 'মানব-ইতিহাসে তাঁর চিরন্তন আবির্ভাব ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে ব্যাপ্ত হল দেশে দেশান্তরে। ভারতবর্ষ তীর্থ হয়ে উঠল, অর্থাৎ স্বীকৃত হল সকল দেশের দ্বারা, কেননা বুদ্ধের বাণীতে ভারতবর্ষ সেদিন স্বীকার করেছে সকল মানুষকে। সে কাউকে অবজ্ঞা করে নি, এইজন্যে সে আর গোপন রইল না। সত্যের বন্যায় বর্ণের বেড়া দিলে ভাসিয়ে; ভারতের আমন্ত্রণ পৌঁছল দেশ বিদেশের সকল জাতির কাছে। ...দুস্তর গিরিসমুদ্র পথ ছেড়ে দিলে অবোধ সত্যবার্তার কাছে। দূর হতে দূরে মানুষ বলে উঠল, মানুষের প্রকাশ হয়েছে, দেখেছি—মহান্তং পুরুষং তমসঃ পরস্তাৎ। এই ঘোষণা বাক্য অক্ষয় রূপ নিল মরু-প্রান্তরে প্রস্তরমূর্তিতে। অদ্ভুত অধ্যবসায়ে মানুষ রচনা করলে বুদ্ধ বন্দনা মূর্তিতে, চিত্রে, স্তূপে। মানুষ বলেছে, যিনি অলোকসামান্য দুঃসাধ্য সাধন করেই তাঁকে জানাতে হবে ভক্তি। অপূর্ব শক্তির প্রেরণা এল তাদের মনে; নিবিড় অন্ধকারে গৃহভিত্তিতে তারা আঁকল ছবি, দুর্বহ প্রস্তর খণ্ডগুলোকে পাহাড়ের মাথায় তুলে তারা নির্মাণ করলে মন্দির, শিল্প-প্রতিভা পায় হয়ে গেল সমুদ্র, অপরূপ শিল্প সম্পদ রচনা করলে। শিল্পী আপনার নাম করে দিলে বিলুপ্ত, কেবল শাশ্বত কালকে এই দান করে গেল : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।'

বুদ্ধদেবের শরণ নিতে একদিন তাই চীন, জাপান, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, তিব্বত, মঙ্গোলিয়া, শ্যামদেশ, কম্বোজ, চাম্পা, ইন্দোনেশিয়া এগিয়ে এসেছিল। বুদ্ধদেবের শরণ নিয়ে তারা পেয়েছিল মনের শান্তি, হৃদয়ের শক্তি এবং আত্মমুক্তির পথ। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'তিনি ছিলেন এশিয়ার আলোক। তিনি এমন একজন ব্যক্তি, যাঁর সম্বন্ধে কি মিত্র কি শত্রু কেউ কখনও বলতে পারে না যে, তিনি সকলের হিতের জন্য ছাড়া একটি বারও নিঃশ্বাস নিয়েছেন। ...তিনি কারো নিন্দা করেন নি, নিজের জন্যে কিছু দাবি করেন নি। নিজেদের চেষ্টাতেই আমাদের মুক্তি-লাভ করতে হবে, এই ছিল তাঁর বিশ্বাস।'

একসময় সারা বিশ্বে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। কালক্রমে আবার তার প্রসার কমে যায়। কিন্তু আজও বুদ্ধজয়ন্তীতে পৃথিবীর সকল দেশের সকল ধর্মের মানুষ বুদ্ধদেবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে কুণ্ঠিত হয় না। বরং যখনই মানুষে মানুষে হানাহানি, বৈরীতা, দানবিক নিষ্ঠুরতা মনুষ্যত্বকে অপমান করতে উদ্যত হয়, তখন সকল দেশের শান্তিকামী মানুষ তাঁরই শরণ নেয়, 'যিনি আপনার মধ্যে মানুষকে প্রকাশ করেছেন। যিনি সেই মুক্তির কথা বলেছেন, যে মুক্তি কর্মবিমুখ নয়, সদর্থক; যে মুক্তি কর্মত্যাগ

নয়, সাধুসঙ্গের মধ্যে আত্মত্যাগ, যে মুক্তি হানয়ের বন্ধনে নয়, সর্বজীবের প্রতি অপরিমেয় মৈত্রী সাধনায়। আজ স্বার্থন্ধতার বৈতরণির নিরন্ন নিঃসীম নিষ্ঠুরতার দিনে সেই বুদ্ধের শরণ কামনা করি যিনি আপনার মধ্যে বিশ্বমানবের সত্যরূপ প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হয়েছিলেন

আবির্ভাবের দিন তাঁই শুধু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে নয়, মানবতাবাদী সকল মানুষের কাছেই পরম পুণ্যদিন

এই পুণ্যদিনে পীত বসনাবৃত বৌদ্ধ শ্রমণের দল বিহারে সমবেত হয়ে ভগবান বুদ্ধের পূজার্চনা করেন, তাঁরা অমৃতময় বাণী পাঠ করেন আর তাঁর শরণ নিয়ে প্রার্থনা জানান—

'হিংস উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কত যুগ মহাপ্রাণ, আনো অমৃত বাণী,
কর প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ
হে হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধর্মতড়িত কর করুণশঙ্খ।'

ভামদেশের প্রস্তর নির্মিত বুদ্ধমূর্তি

মংগল দিনকর শ্যাম

অনিপদ্ম

সমগ্র এশিয়ার সংস্কৃতির মধ্যে, আমরা এক মহাসমন্বয়ের সুরকে খুঁজে পাই। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ, জীবন এবং প্রকৃতিকে ঘিরে এক একটি বহতা নদীর ধারা যেন সাগর সঙ্গমে মিলিত হয়েছে।

উৎসব সংস্কৃতির একটি বিশেষ অঙ্গ। প্রথম এবং প্রধানতঃ, ধর্মকে কেন্দ্র করেই উৎসবের পত্তন। ধর্মীয় সংস্কার থেকে সংস্কৃতির বিস্তৃতিতে উৎসবকে দেখি আমরা জীবন ভিত্তিক রূপে। উৎসবের নানারকমের বিকাশ। ধর্মীয় উৎসব, প্রাকৃতিক উৎসব, সামাজিক উৎসব। উৎসব শুধু নিছক নিজের ধর্ম সংস্কার, বা আনন্দ চেতনার অভিব্যক্তিই নয়—উৎসব সর্বজনীন। সকলকে নিয়েই উৎসবের উৎসার।

এশিয়াকে লক্ষ্য করে একদিন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'এশিয়াকে আজ ভার নিতে হবে মানুষের মধ্যে দেবত্বকে সম্পূর্ণ করে তুলতে, কর্মশক্তিকে ও ধর্মশক্তিকে এক করে দিয়ে।'

কবিগুরুর এ কথার তাৎপর্য সবিশেষ অনুভব করা যায় যখন সমগ্র এশিয়ার সাংস্কৃতিক জীবনের দিকে আমরা তাকিয়ে দেখি। শুধু উৎসবকে ঘিরেই কী অপূর্ব সমন্বয়।

শ্যাম ইন্দোচীনে অবস্থিত। এশিয়ার দুটি বৃহৎ দেশের সম্মেলন হয়েছে শ্যামে ভারত যান এবং চীনযানের : কিন্তু ভারত সংস্কৃতির প্রভাব পরিলক্ষিত এখানে! গ্রাম প্রধান শ্যামদেশ—গ্রামীন পরিবেশেই তার সভ্যতা গড়ে উঠেছে। কৃষি এবং ধর্ম এদেশের জীবনকে গড়ে তুলেছে। ঠিক ভারতবর্ষের গ্রামীন জীবনের মতনই এ-দেশের উৎসব-ব্যঞ্জনা। প্রকৃতির অবদানকে এরা উৎসবের সমারোহে অর্চনা করে। বর্ষায় ধান্য রোপিত হয়েছে—হেমন্তের পাকা ধানে কৃষক-জীবনের স্বপ্নের সাধ বাস্তবে রূপায়িত। শীতে সেই ধান কাটা হবে। নবান্ন-উৎসব যেমন এ-দেশের কৃষি-উৎসব,—শ্যামদেশেও তেমনি ক্রথং উৎসব। কৃষকেরা পাতার নৌকায় দীপ ও ধূপ জেলে নদীর জলে ভাসিয়ে দেয়—জলতরঙ্গে তা ভেসে যায় কোন দূর সুদূরান্তরে—চন্দ্রমাস্নাত রাত্রে এই উৎসবের কী শুচি-শুভ্র অপূর্ব সুন্দর রূপ!

বাংলাদেশের মেয়েদের ভাদুলীব্রতের রূপটিও ঠিক এমনিই।—'এ নদী, সে নদী—একখানি দুধ ভরানী ঠাকরুণ ঘুচাবেন দুখ।' ভাদ্রের ভরা নদীতে নৌকা ভাসিয়ে এ ছড়া বলা হয়—কৃষিসম্পদকে বরণ করে।

কৃষিপ্রধান দেশের ধান্য-উৎসবের এই সাদৃশ্য এশিয়ার বহু দেশেই অনুরূপ। কৃষিকেন্দ্রিক দেশে. সাম্যাবর্তনকে অবলম্বন করে ভারতবর্ষের ন্যায় শ্যাম, বার্মা, জাতীয় যে-সব নৃত্যোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তার রূপ এবং আঙ্গিকে একই ভাব এবং অভিব্যক্তির দ্যোতনা।

শ্যামে মহা বিষুব সংক্রমণ একটি বিশেষ উৎসব। এই উৎসবের দিন নতুন বেশ-ভূষায় সুসজ্জিত নর-নারী মঠে গিয়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের অন্ন এবং নানা খাদ্য দান করে। উৎসবের আগে বাড়ি, ঘরদোর সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখা হয়। উৎসবের দিন বৌদ্ধমূর্তিগুলিকে এবং মঠগুলিকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করার রীতি প্রচলিত। এদিন পরলোক-গতদের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ করা হয় আর পুণ্যলাভের আশায় মাছ এবং নানারকমের পাখি কিনে ছেড়ে দেওয়া হয়। জীবন বন্ধন থেকে মহামুক্তির পথ প্রদর্শনই এই উৎসবের সংস্কৃতি। পরস্পর পরস্পরের প্রতি বারি সিঞ্চনও এই উৎসবের একটি বিশিষ্ট রীতি। নাচ, গান, নানারকমের খেলাধূলায় এবং কৌতুক-অভিনয়ের নানা আনন্দ-পরিবেশন এই উৎসবের প্রীতিময় অনুষ্ঠান।

বিষুব সংক্রমণ-উৎসব সম্পর্কে লোকমুখে কথিত কাহিনীতে শোনা যায় শ্যামদেশীয় লোকধর্ম সংস্কারের রূপকথা।

প্রাচীনকালে এদেশে এক যুবক বুদ্ধিতে ছিল অদ্বিতীয়। তার বুদ্ধির পরিচয় পেয়ে শ্যামদেশীয় দেবতা কবিল মহাপ্রোমে যুবকটিকে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যে তিনটি ধাঁধাঁর প্রশ্নের উত্তর চাইলেন। যুবকটি খুবই বিপন্ন হয়ে পড়ল। ধাঁধাঁ তিনটি এতই কঠিন যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষেও তার উত্তর দেওয়া কঠিন। প্রকৃতপক্ষে যুবকটির নিকট তা সাধ্যাতীত বলে অনুমিত হল। যুবকটি তখন এক বনের মধ্যে গিয়ে এক গাছের ডালে গলায় দড়ি বেঁধে আত্মহত্যা করার সঙ্কল্প নিলে। সেই গাছের মগডালে এক বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর বাস। বিহঙ্গমীর কাছ থেকে শোনা গেল তিনটি ধাঁধাঁর উত্তর। যুবকটিকে আর আত্মহত্যা করতে হল না। শ্যামদেবতা কবিল মহাপ্রোমের সঙ্গে যুবকটির সর্ত হয়েছিল এই যে যুবকটি যদি যথাযথ উত্তর দিতে পারে তাহলে দেবতা তাঁর মাথা কেটে ফেলবেন, আর তা না হলে যুবকটির শিরশ্ছেদ করা হবে।

যুবকটির যথাযথ উত্তরে দেবতা কবিল মহাপ্রোম পরাজয় স্বীকার করে নিজ হাতে তাঁর মাথা কেটে ফেললেন। তখন আর এক মহা সমস্যার সৃষ্টি হল। দেবতার মাথা এত বড় যে তা যদি মাটিতে পড়ে তাহলে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, যদি সমুদ্রে পড়ে তবে সমুদ্রের সমস্ত জল শুকিয়ে যাবে। তা হলে তো আর সৃষ্টি বাঁচে না। অতএব? অতএব এ-মহা সমস্যার সমাধানে স্বর্গের দেবতারা কবিল মহাপ্রোমের কাটা মাথাটি নিয়ে আকাশের এক মস্ত গুহায় লুকিয়ে রাখলেন।

দেবতা কবিল মহাপ্রোমের সাতটি কন্যা। বছরে একদিন করে তারা এসে তাদের পিতার খণ্ডিত মাথা নিয়ে বিজয়োৎসব করে। শ্যামদেশীয় পুরাণে কবিল মহাপ্রোম হচ্ছেন সূর্য আর তাঁর সাত মেয়ে সপ্তাহের সাতটি দিন। মহাবিষুব সংক্রমণ হচ্ছে এককথায় সূর্য পূজা। আর এই পূজা শ্যামদেশের জাতীয় উৎসব।

বৌদ্ধমঠ আর বৌদ্ধমূর্তি শ্যামদেশের চারিদিকে। বৌদ্ধধর্ম-সংস্কৃতি এখানকার উৎসবের সঙ্গে আজও অম্লান আছে। পিরামিড আকারে নির্মিত সব স্তূপ—স্তূপের সমান বেদি। মঠ আর স্তূপে বুদ্ধের লীলাসুন্দর প্রতিমূর্তি।

শ্যামদেশের বিবিধ নৃত্য-ভঙ্গী

উৎসবে যেসব সঙ্গীত গীত হয়, নৃত্যের ভঙ্গীতে যে ভাবের প্রকাশ—তাতে ভারতীয় প্রভাব বিদ্যমান বাদ্যযন্ত্রও ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রের অনুকরণে উদ্ভাবিত শ্যামদেশীয় উৎসবে সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য—ভারতীয় উৎসবের রূপান্তর বলা চলে

শ্যামদেশের বর্তমান নাম থাইল্যাণ্ড শ্যামের সবুজ বন প্রকৃতিতে ভারতের শ্যামলতার স্পর্শ থাইজাতি সেই সবুজতার স্পর্শ লাভ করে ভারতের প্রেম এবং মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ। থাই সংস্কৃতি আর ভারতীয় সংস্কৃতি একাত্ম। শ্যাম-উৎসবের মধ্যে ভারতীয় উৎসবের অনেক সুর শোনা যায়

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ভারত সংস্কৃতির যে সমন্বয় বাণী শ্যামদর্শনে শোনা যায় তাই হচ্ছে প্রকৃত উৎসব-মাঙ্গলিকীর শুভ-শঙ্খধ্বনি

ভারতের যে-মহিমা
ত্যাগ করি আসিয়াছে আপন অজান্তে দীপা,
অর্ঘ্য দিব তারে
ভারত-বাহিরে তব দ্বারে।

শ্যাম এবং ভারতের উৎসবগুলি প্রকৃত পক্ষে প্রেম এবং মঙ্গলের মিলনের উচ্চ মহিমা।

বাংলাদেশে দুর্গাপূজা উৎসবের সেরা

মাংগল্যময় সিংহল

মীনা সেন

ভারত আর সিংহল। দক্ষিণ ভারতের পাশাপাশি সিংহল রাজ্য। ভারতের হিন্দু-উৎসবের এবং বৌদ্ধ-উৎসবের অনেক সৌসাদৃশ্য সিংহলের মাঙ্গল্যে।

সিংহলবাসীদের উৎসবের নাম মাঙ্গল্য। ভারত আর সিংহল ধর্ম এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একই বৃন্তে দুটি ফুল। মাঙ্গল্য অর্থ মঙ্গলজনক অনুষ্ঠান। ধর্ম উৎসবের মাধ্যমে মাঙ্গল্যকে বরণ করা হয়। সিংহলের মাঙ্গল্য অনুষ্ঠানের মধ্যে দেখা যায় ধর্ম সংস্কারের সঙ্গে প্রকৃতি বন্দনা। যে প্রকৃতি সুন্দর, যার করুণায় আমাদের জীবনধারণ, যে আমাদের আহার, আশ্রয় এবং জীবনদান করে, যে আমাদের সৌন্দর্য বুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলে, আমাদের ধর্ম-বোধে প্রেরণা দান করে—সেই প্রকৃতিই হচ্ছে আমাদের জপ-তপ আমাদের আরাধ্য দেবতা।

সিংহলের মাঙ্গল্যে সেই প্রকৃতি পূজার আয়োজন। আতক্কর মাঙ্গল্য নববর্ষ-উৎসব। বর্ষশেষের পর আসে নববর্ষ। বিগতের ক্লান্তি এবং জরার অবসান ঘটিয়ে নববর্ষ আনে নূতন প্রাণের, নূতন কর্মের, নূতন জীবনের, নূতন গানের উদ্দীপনা! নব বেশবাসে, নব নবতায় অনুরঞ্জিত প্রাণে সিংহলবাসী আতক্কর মাঙ্গল্যে নববর্ষকে আহ্বান জানায়।

আষাঢ়ের মাঙ্গল্য পেরহেরা। এই উৎসব সিংহলের সব চেয়ে বড় উৎসব। অতি প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি সিংহলে পেরহেরা-উৎসব চলে আসছে। পেরহেরার অধিদেবতা চারজন। নাথ, বিষ্ণু, কাতরগাম এবং পট্টিনিবেদী। আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিতে চারখণ্ড কাঁঠাল-গাছকে চার দেবতার প্রতিভূ সাজিয়ে মহা সমারোহে মন্দির-অঙ্গনে রাখা হয়। ফুলে-ফুলে, লতায়-পাতায় সুসজ্জিত করে তোলা হয় সেই চারখণ্ড কাঁঠালগাছকে। তারপর চার দেবতার মন্দির থেকে বিরাট শোভাযাত্রা বের হয়। গীত এবং বাদ্যে রাজপথ পরিক্রমায় এই উৎসবের বর্ণাঢ্য শোভা সত্যিই দর্শনীয়। পেরহেরা উৎসবের আর এক নৈশশোভা জলন্ত মশাল যাত্রা। মশালের আলো জ্বালিয়ে শোভা-যাত্রীদের পথযাত্রায় বীর্যবত্তার পরিচয় নেওয়া। এই উৎসবের প্রধান কেন্দ্রকান্দি। মশাল শোভাযাত্রায় যে নৃত্যের ভঙ্গিমা দৃষ্ট হয়ে ওঠে বাংলাদেশের অমাবস্যা রাত্রের কাঠ নৃত্যকে তা স্মরণ করিয়ে দেয় যেন। সিংহলের পেরহেরা মাঙ্গল্যের উৎপত্তির মূলে যুদ্ধজয়ের গৌরব গাথা। সিংহলসম্রাট গজবাহু দক্ষিণ ভারত জয় করে গৌরবের মাঙ্গল্য এই উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন।

হেমন্তে কার্তি মাঙ্গল্য দীপাবলী উৎসবের নামান্তর। হৈমন্তিক প্রকৃতিতে দীপমালা জ্বালিয়ে কুয়াশা, অবসন্ন এবং অন্ধকারকে বিদূরিত করার বাসনায় এই মাঙ্গল্যের প্রবর্তনা।

পৌষে ধান্য-উৎসব। মাঠের কৃষক সোনালী ধান কেটে গোলায় ধান ভরে। এই সময়ে ধান্য-বন্দনার সুর কৃষি-প্রধান আমাদের দেশেও প্রতি ঘরে ঘরে পালিত হয়। বাংলাদেশের পৌষ-পার্বণের মতন পৌষালী উৎসব হচ্ছে সিংহলের আলুটখন মাঙ্গল্য।

বাংলাদেশের মেয়েলি ব্রতে তারাব্রত প্রসিদ্ধ। সন্ধ্যায় আকাশে তারার দীপ যখন একটি একটি করে জ্বলতে থাকে বাংলাদেশের মেয়েরা তখন তাদের সমর্ধনা জানিয়ে তারা ব্রতের ছড়া কাটে। সিংহলের বলি-উৎসবও এই তারকা-বন্দনার নামান্তর। জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে গ্রহনক্ষত্রের প্রভাব মানুষের জীবনে খুব বেশি। মানুষের অদৃষ্ট গ্রহ-নক্ষত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিতও বটে। তাই গ্রহ-শান্তি রক্ষায় নক্ষত্র পূজা সিংহলীদের ধর্মীয় সংস্কৃতি।

মাঙ্গল্যের দিন প্রতি দেশেই দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার মালিন্যকে ঘুচে ফেলা হয়। নববাস পরিধান করে, ঘরদোর পরিষ্কার করে গৃহসজ্জায় মাঙ্গল্যকে বরণ করতে সিংহলবাসীর উৎসব প্রাচীন কাল থেকেই। রাজপথে তোরণ, পুষ্প-সজ্জা—মাঙ্গল্যের মঙ্গলময় রূপালোক।

উৎসব মেলার ব্রহ্ম

পুতুল রায়

ভারতের প্রতিবেশী ব্রহ্মদেশ।

ব্রহ্মদেশের উত্তরে আসাম ও মণিপুর রাজ্য, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর ও মার্তাবান উপসাগর। পূর্বে চীন, ইন্দোচীন ও শ্যামদেশ বা থাইল্যাণ্ড এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও বাংলাদেশের অংশ বিশেষ। উর্বরা ব্রহ্মদেশের প্রধান শস্য ধান্য। দুই নদী ইরাবতী ও সলবতী।

বর্ষার জলধারায় ভরা নদী। মাঠে মাঠে ধান। শস্য সম্ভারে পরিপূর্ণ ব্রহ্ম বর্ষাপ্রকৃতিকে বন্দনা জানায় উৎসবের উপচারে। কথিত আছে, ভগবান বুদ্ধ আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে দেবলোকে গিয়েছিলেন এবং কার্তিক পূর্ণিমায় মর্ত্যধামে আবার ফিরে এসেছিলেন। তাই আষাঢ় থেকে কার্তিক ব্রহ্মে বর্ষা উৎসব পালিত হয়। কার্তিক পূর্ণিমায় এই বর্ষ-উৎসবের পরিসমাপ্তির দিন। এই দিনটি আলোকোজ্জ্বল দিন। এই দিনে ব্রহ্মদেশের সমস্ত ঘরবাড়ি আলোয় সাজানো হয়। আমাদের দেশের দীপালি-উৎসবের মতন ব্রহ্মের সর্বত্র আলোর শোভা এই দিনের 'Festival of Lights' বা ব্রহ্ম ভাষায় 'টাঙান মৌন' আলোর পূর্ণিমা-উৎসব।

ব্রহ্মদেশের পোয়ে নৃত্য

প্যাগোডার দেশ ব্রহ্ম। বৌদ্ধমন্দির বা মঠকে বলা হয় প্যাগোডা। প্যাগানের আনন্দ-মন্দিরের আনন্দ-পরিবেশ যেন দ্যোতনা ব্রহ্মদেশের উৎসব-আনন্দের প্রতীক। রাজহংস, ময়ূর, শ্বেতহস্তী বর্মীদের কাছে পবিত্র। ব্রহ্মদেশের উৎসবেও প্রকৃতির পবিত্র পরিবেশে মাধুর্য এবং সৌন্দর্য।

বর্মীদের উৎসবকে বর্মী জাতীয় ভাষায় বলা হয় পোয়ে। ধর্ম থেকে সমাজ এবং প্রকৃতি থেকে প্রাণ বিকশিত হয় উৎসবের মাধ্যমে।

ব্রহ্মদেশের জনসংখ্যার শতকরা প্রায় পঁচাশি ভাগ লোক বৌদ্ধধর্মাবলম্বী। তাই ভগবান বুদ্ধের পূজা বর্মীদের ধর্ম-সংস্কৃতিমূলক পুণ্য-উৎসব। বর্ষা-উৎসব বা টাঙান মৌন্ পূর্ণিমার কথা আগেই বলেছি। এইবার কাছৌং-লা-বি-নে উৎসবের কথা বলি।

কাছৌং—অর্থাৎ বৈশাখ মাস। লা-বি-নে পূর্ণিমা তিথি। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে ভগবান গৌতম বুদ্ধ জন্মলাভ করেছিলেন। বাংলাদেশের মতন কাছৌং—বৈশাখ বর্মীদের বছরের প্রথম মাস। বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বুদ্ধদেবের বৌদ্ধত্বলাভ এবং এই তিথিতেই তিনি পরা-নির্বাণলাভ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ব্রহ্মে তাই এই পবিত্র উৎসবের বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই উৎসব সারা ব্রহ্মদেশে পরম ঘটা করে প্রতিপালন করা হয়। এই উৎসবের দিনে বর্মী বৌদ্ধধর্মীরা উপবাস করে ধর্ম-গ্রন্থ পাঠ করেন। বৌদ্ধমঠে বা প্যাগোডায় যান, বৌদ্ধমন্ত্র ধ্যান করেন, ভিক্ষুদের বস্ত্রাদি দেন, অতিথি-অভ্যাগতদের খাদ্য এবং পানীয় দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। বর্মীদের এই ধর্ম-উৎসবে পোয়ে নাচ-গানের এবং নানারকম আমোদ-প্রমোদের আয়োজন করা হয়।

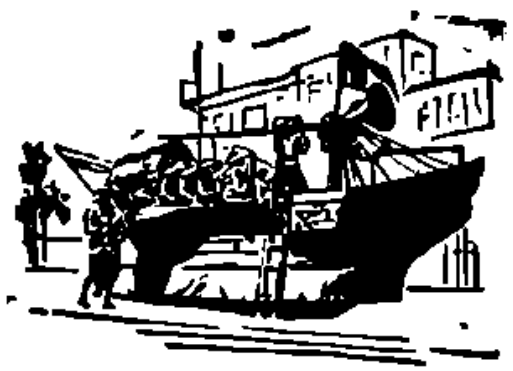

বঙ্গোপসাগরে জাহাজ

সামাজিক উৎসবে
বাংলাদেশের মতন মেয়েলি বিয়ের গান শোনা যায়।

জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জীবনের নানাবিধ পর্যায়কে ঘিরে সামাজিক-উৎসবের প্রথা বর্মীদের উৎসবের মাধ্যমে পালিত হয়ে থাকে এবং প্রায় প্রতি ক্ষেত্রেই পোয়ে-গীত এবং নৃত্যের প্রচলন দেখা যায়। পোয়ের বিষয়-বস্তুতে বৌদ্ধ জাতকের গল্প কিংবা রামায়ণের কাহিনী বর্ণিত এবং কীর্তিত হয়।

শিশুর জন্মের কয়েক মাসের মধ্যেই তার নামকরণ করা হয়, তারপর প্রত্যেক জাতক বালক-বালিকার কান বেঁধান হয়। একে বলে কর্ণবেধ। বর্মীদের কর্ণবেধ একটি সামাজিক উৎসব। এই উৎসবে আমোদ-প্রমোদ এবং পোয়ে নাচের আয়োজন করা হয়।

ধর্ম এবং সমাজ—এই দুইয়ের পাশ-পার্বণ বর্মীদের জীবনকে উৎসব-মুখর করে রাখে এবং বাংলাদেশের বারো মাসে তের পার্বণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

প্রকৃতি-উৎসবের মধ্যে মহা-তিনযান বা বিষুব-সংক্রান্ত জল খেলার মহোৎসব। অপর পক্ষে আমাদের দেশের মতন ঋতু-উৎসব।

গ্রীষ্মের দাবদাহে প্রকৃতি যখন তৃষ্ণায় কাতর, ফাটিক-কণ্ঠে যখন জল-কামনার আর্তি, মাটি রুক্ষ,—তখন বর্ষা-বন্দনায় মেঘের আহ্বান জল-কামনায় প্রকৃতি বন্দনার রীতি আমাদের দেশের মতন ব্রহ্মদেশেও প্রচলিত। উৎসবের সমারোহে বর্মীরা মহা-তিনযানে মেতে ওঠে। বছরের শেষদিন বা সংক্রান্তির দিন থেকে আরম্ভ করে তিনদিন ধরে এই উৎসবে প্রকৃতি-বন্দনার সুর শোনা যায়। মেয়ে-পুরুষ আবাল বৃদ্ধ-বনিতা সবাই এই জল-উৎসবে মেতে ওঠে।

পল্লীতে পল্লীতে তোরণদ্বার প্যাণ্ডালের সমারোহ। ঘরে ঘরে শুধু জল আর জল। স্কুল, কলেজ, অফিস, আদালত, ঘর বন্ধ এই সময়। সরকারী ছুটি ঘোষণা এই উৎসব প্রতিপালনের জন্যে।

ব্রহ্মদেশের সবচেয়ে এই জল-খেলা উৎসব চলে পরস্পর পরস্পরকে জলে ভিজিয়ে দেয়—নারী-পুরুষে বয়স-বিচার নেই। এই জল-খেলা উৎসবে আমাদের দেশের হোলি-উৎসবের ন্যায় পিচকারী পাইপ ব্যবহৃত হতে পারে। একে অন্যকে জলধারা আক্রমণ করে যে পর্যন্ত না আক্রান্ত ব্যক্তি পরাজয় স্বীকার করে ততক্ষণ পর্যন্ত আক্রমণ চলতে থাকে। শুধু জলেরি খেলা—এই জলে কোন রং বা কাদা-মাটি মেশানো হয় না। অনেক ক্ষেত্রে জলকে সুগন্ধী করা আর সুবাসিত করা হয়। এই জল-উৎসবে রাস্তায় রাস্তায় গান-বাজনা এবং নাচের আসরও দেখা যায়। পাড়ে পাড়ে পল্লীতে পল্লীতে পোয়ে নৃত্য-গীত।

ব্রহ্মদেশে মহা-তিনযানের একটি দৃশ্য

প্রতিযোগিতামূলক ছড়া কাটা, গানের লড়াই ঠিক কবির লড়াই-এর অনুরূপে অনুষ্ঠিত হয়।

মহা-তিন্-যান্ বা জল-খেলা উৎসবে বর্মীদের সংস্কার এই যে 'তাকামিন্' বা দেবরাজ ইন্দ্র নাকি তাঁর সঙ্গী সাথীদের নিয়ে মর্ত্যে আসেন উৎসবে যোগদান করবার জন্যে। তারপর খুশি হয়ে বৃষ্টি বা জলদান করেন ধরাবাসীদের।

প্রকৃতপক্ষে এই জল-খেলা উৎসব নববর্ষের প্রারম্ভে অনুষ্ঠিত হয় এই কারণে যে বর্ষায় ভালো বৃষ্টি হবে এবং দেশ শস্য-সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। গ্রীষ্মের দাবদাহে শুষ্ক মাটি সজল হয়ে সরস হবে! প্রকৃতির সঙ্গে এই আত্মীয়তা স্থাপন উৎসবের অন্তর্নিহিত ভাব।

উৎসব শেষে বুদ্ধ-মন্দিরে ফুল এবং বাতি নিয়ে বর্মীরা সমুপস্থিত হয়ে ঈশ্বর আরাধনা করে বর প্রার্থনা করে—নববর্ষ তাদের সুখের হোক—সমৃদ্ধির হোক! বর্ষার মেঘ নিয়ে আসুক সুশীতল ধারা। আতপ-দগ্ধ শরীর সুশীতল হোক! ধান্য-লক্ষ্মীতে গৃহস্থের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকুক!!

ধর্ম, প্রকৃতি এবং সমাজ নিয়ে উৎসবের এই মেলার ব্রহ্মের সঙ্গে ভারতের এক পরম সাংস্কৃতিক ঐক্য।

ব্রহ্মদেশের পোষাক-পরিচ্ছদ :

বর্মীগণ স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে লুঙ্গি পরিধান করেন—উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ কোঁচা দিয়া লুঙ্গি পরেন—গায়ের জামাকে বলে "এঙ্গি"—পায়ে সাধারণতঃ ব্যবহৃত slipper—বর্মী ভাষায় বলা হয় "ফানা"। মেয়েরা বেণী পাকাইয়া বড় করিয়া খোঁপা বাঁধেন। অনেক সময় খোঁপাকে বড় করিবার জন্য পরচুলা ব্যবহৃত হয়। পুরুষের মাথায় থাকে সিল্কের রুমাল, বর্মী ভাষায় বলা হয় "গাউং বাউং"। বর্মীগণ সিল্ক প্রভৃতি মূল্যবান পোষাক পরিতে ভালবাসেন। হীরা ও মণি-মাণিক্যসহ সোনার অলঙ্কার মেয়েদের খুব প্রিয়—পায়ে অনেক সময়ে মেয়েরা সোনার অলঙ্কার পরিধান করেন। সকলেই খুব সৌখিন এবং সুন্দর পোষাক ও অলঙ্কার উহাদের খুব প্রিয়। উহারা জাতীয় পোষাক বিশেষ পছন্দ করেন—প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান বিচারক হইতে আরম্ভ করিয়া অধস্তন কর্মচারী সকলেই একই রকম পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন—অবশ্য অনুসারে অবশ্য পোষাকের তারতম্য হইয়া থাকে। সাহেবী পোষাক বর্মীগণ খুব কম ব্যবহার করিয়া থাকেন। বৌদ্ধ সন্ন্যাসীগণ কাষায় বস্ত্র (yellow robe) ও চাদর ব্যবহার করিয়া থাকেন।

উৎসবে ধ্যানী জাপান

হাসি ভট্টাচার্য

চির সুন্দরের দেশ জাপান। ঘরে বাইরে সৌন্দর্যের উপাসনা। আর এই সৌন্দর্যের উপলব্ধিকে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করা যায় জাপানি উৎসবে, শিল্পে, কবিতায়, চিত্রে ভাস্কর্যে—জাপানি সংস্কৃতিতে।

জাপান পরিদর্শন করে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়ে বলে গেছেন —ধ্যানী জাপান। জাপানের যন্ত্রশিল্প আজ বাণিজ্যিক জগতের প্রসারতায় যদিও উন্নতিশীল, কিন্তু সুকুমার বৃত্তিতে মনের চাহিদায়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে এবং উৎসবনিষ্ঠায় জাপান প্রকৃত পক্ষে ধ্যানী জাপান।

ভারতবর্ষের মতন জাপানও কৃষিপ্রধান,—বিশেষ করে জীবন-যাত্রায় গ্রাম্য সরলতাই জাপানিদের বৈশিষ্ট্য। বর্তমানের জাপান যদিও ইণ্ডাস্ট্রিয়াল; কিন্তু তার গ্রামীন মন গ্রামীন সংস্কৃতির ধারাতেই স্নাত। রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন রাতারাতি ইউরোপের গন্ধমাদন জাপান তার দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত করেছিল; কিন্তু তা সত্ত্বেও সে তার প্রাচীন সংস্কৃতিকে মেরে ফেলে নি। বরঞ্চ কৃষি-সংস্কৃতি জাপানি শিল্প রূপায়নে নবজীবনের সন্ধান দিয়েছে, তাই জাপানী আনন্দ-উৎসবের ধারায় মুক্তিকার সরলতা, কোমলতা, প্রকৃতিপ্রাণতা আজও প্রাণস্পন্দে বেঁচে আছে।

জাপানি গৃহসজ্জায় একটি ক্যামেলিয়া ফুলের ডাল সবুজ পাতায় সবুজ প্রাণের ছোঁয়া লাগায়। কিয়োটো শহরের রোয়ানজী মন্দিরে অতি সাধারণ মাটির দেওয়াল; মন্দির অঙ্গন জুড়ে বিস্তৃত হয়ে আছে সাদা বালির মাঠ। এক-শ্রেণীতে সেই বালির মাঠে বালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে পাথরের খণ্ড। এই অনাবিলতার মধ্যে কল্পনায় শুধু প্রসার। উদারতা এবং অনন্তের ইঙ্গিত।

উৎসব সুখর জাপান।

প্রতিবছরের ভূমিকম্প, ঝরঝরা নদীস্রোতের ভাঙন আর বৃষ্টি-ঝঞ্ঝার কঠিন বরফঢাকা শৈলচূড়া, কলকারখানার যান্ত্রিক কর্কশতা—কোন কিছুই জাপানের কোমল প্রকৃতির প্রাণ-সম্পদ হরণ করতে পারে নি। গত যুদ্ধের আনবিক লুণ্ঠনতা, পশ্চিমের কৃত্রিমতা জাপান-প্রকৃতিকে ধ্বংস করতে সমর্থ হয় নি। তাই আজও উৎসবে, আনন্দে, জাপান প্রাণবন্ত।

নববর্ষ উৎসব, নবান্নের উৎসব, হরিয়ার উৎসব, বুদ্ধোৎসব, চেরীবসন্ত উৎসব—জাপানের প্রকৃতি-প্রাণতার পরিচয়। এইসব উৎসবের সঙ্গে ভারতীয়-উৎসবের অদ্ভুত সৌসাদৃশ্য। ভারতের মতন জাপানের কৃষি-জীবন মরে নি, তার গ্রামীন সংস্কৃতি এখনও প্রাণবন্ত।

বর্ষায় আশানুরূপ জল পাওয়ার কামনায় বাংলার কৃষক যেমন নৈলাগানে মেঘরাজার দরবারে ধর্না দেয়,—মেঘরাণীর পূজার নৈবেদ্য সাজায় কৃষক বধূ এবং কৃষক-কন্যা, জাপানের গ্রামে গ্রামে, মন্দিরে মন্দিরে তেমন পূজা-উপাসনা চলে, চলে নাচ-গান বরুণ দেবতার সন্তুষ্টি বিধানে।

নববর্ষ-উৎসব প্রতিপালিত হয় ঘরে ঘরে। প্রতি ঘর পরিষ্কার করে সাজানো হয়। দেওয়ালে দেওয়ালে পুষ্প স্তবক ঘরকে গন্ধ-আমোদিত করে রাখে। উৎসবকে ঘিরে নানা ভোজ্য। সবাই মিলে আত্মীয় পরিজন এক হয়ে আহারে বসেন।

নবান্নের উৎসবে নতুন ধানের সঙ্গে কৃষিদেবতার অর্চনা। হরিয়ার উৎসবে নৌকা-বাইচ। বন-উৎসবে স্মরণ করা হয় যারা মৃত তাঁদের।

চেরীফুলের দেশ জাপান।

বসন্ত সমাগমে সারা জাপান চেরীফুলময়। ফুলের বনে যৌবনের বন্দনা। আর সে বন্দনায় শুধু যুবক-যুবতীই নয়,

প্রৌঢ়, বৃদ্ধ সকলেরই সানন্দ সমাবেশ। নবীন ফুলের স্পর্শ সকলের দেহ-মনে, 'সাকে' পান আর বসন্তের দক্ষিণ বাতাসের পরশন—জীবনকে ফুলের মতন উপভোগ করার বাসনা চেরী-উৎসবের বৈশিষ্ট্য।

জাপানের ধর্মীয় উৎসবে শিণ্টো-মন্দির থেকে শিণ্টো-যাজকদের শোভাযাত্রা বের হয়। সে এক অপূর্ব দৃশ্য—যেন কুম্ভমেলা। সমারোহের অন্ত নেই সন্ন্যাসীদের মিছিলে। পরিক্রমা শেষ হলে ভূরী ভোজ সুরু হয়।

প্রকৃতি-উৎসব আর ধর্ম-উৎসবই শুধু নয় জাপানে গার্হস্থ্য উৎসবও লেগেই থাকে। অতিথিপরায়ণ জাপানি চা-উৎসবে আতিথেয়তা এবং সুকুমার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। জাপানে চা-পান সবিশেষ জনপ্রিয়। জাপানিরা তাই চা-পানকে উপলক্ষ্য করে উৎসবের আয়োজন করে। এই উৎসবের আনুসঙ্গিক অনেক খুঁটিনাটি নিয়ম কানুন প্রচলিত আছে। যেমন তেমন করে চা তৈরী করে পরিবেশন করলে এ উৎসবের অঙ্গহানি ঘটে; তাই চা-উৎসবের দিন সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে সুন্দর বাসন পত্রে, কাপ ডিসে, হাসি-খুসি মনে, সুন্দর পোশাক আসাকে সজ্জিত হয়ে চা-পরিবেশনকারিণীকে অতিথি অভ্যাগতজনকে চা পরিবেশন করতে হয়।

উৎসবের দিন ঘর সাজানো, পুষ্প-সজ্জা, উদ্যান রচনায় পারদর্শিতা এবং পরিবেশ সৃষ্টিতে শিল্পী মনের পরিচয় দিতে পারাই হচ্ছে চা-উৎসবের প্রধান অঙ্গ। জাপানি কুমারী মেয়েরা লেখাপড়া, শিল্পচর্চা প্রভৃতি জ্ঞানার্জনের সঙ্গে গার্হস্থ্য-জীবনের নানা শিক্ষা যেমন গ্রহণ করে তেমনি চা-উৎসবের রীতিনীতিকেও তাদের শিখতে হয় অত্যন্ত আন্তরিকতা এবং যত্নের সঙ্গে। খেলার পুতুল শুধু পুতুল নয়। পুতুল-জীবনের সৌন্দর্য-অনুভূতির এক পরম শিল্প প্রকাশ। জাপানিরা তাই শুধু খেলার ছলেই পুতুলকে যে ভালোবাসে তা নয়; পরন্তু পুতুল নিয়ে তারা উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে। পুতুল উৎসবে পুতুলগুলির মধ্যে সজীবতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাদের নাচ-গানে কথায় অভিনয় ভঙ্গীতে যে জীবনের ছোঁওয়া তা নিছক বাস্তবধর্মী নয়। সে যেন এক রূপকথার কল্পরাজ্য। সে রাজ্য ঘিরে অফুরন্ত উৎসবের ব্যঞ্জনা। কাব্কী কথাতেও জাপানের উৎসব-রীতিরই পরিচয় মেলে।

নো-অভিনয় মুখোসপরা অভিনয়। আরণ্যক পরিবেশে এই জাপানি অভিনয় অরণ্য-উৎসবের প্রতীক। এই অভিনয়ে মরু-মজ্জায় জীবন্ত পাইনের চারার পত্র আমাদের উৎসবে ব্যবহৃত নবপত্রিকার মতনই উৎসব মাঙ্গলিকী।

চির সুন্দর জাপান তার জীবনকে ঘিরে রেখেছে এমনি সব উৎসবের সমারোহে। জাপানি উৎসবে ভারতবর্ষের উৎসব কল্পনা এবং মন্ত্র-সূত্রের আশ্চর্য মিল।

পশ্চিমবাংলার গ্রামীন উৎসব

অলকা ভট্টাচার্য

বাঙালী উৎসবপ্রিয় জাতি। সারা বছর ধরেই বাঙালী হিন্দু একের পর এক আনন্দোৎসবে মেতে ওঠে। 'বারো মাসে তের পার্বণ' প্রবাদে তো বাঙালীর পূজা-পার্বণকে সংকুচিত করে দেখানো হয়েছে। খুঁজতে গেলে 'তের'র—'তেরশ' হয়ে যাওয়া বিচিত্র নয়।

উৎসবের এই বিরাট ব্যাপকতার আস্বাদ উপলব্ধি করেছিল বাংলার গ্রামীন মানুষ। বলা চলে প্রাচীন বাঙালীর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে উৎসব যেন একীভূত হয়ে গিয়েছিল। একদিকে "পারে না বহিতে নদী জলধার, মাঠে মাঠে ধান—ঘরে নাক আর", অন্যদিকে "পারে না বহিতে লোকে জলভার, পেটে পেটে সিলে ঘরে নাক আর"—বস্তুতঃ প্রাচীন বাংলার গ্রামজীবনে এই অসময় বিয়োগিতার পটভূমিকাতেই গ্রামের মানুষ উৎসব-আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে।

গ্রামের মানুষ যে সমস্ত উৎসব, পূজাপার্বণ ব্রত ইত্যাদির আয়োজন করতো তার শুরু কবে থেকে বলা কঠিন। অনেকে বলেন, বৈদিক যাগযজ্ঞই পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে লৌকিক ক্রিয়ার পরিপুষ্টি লাভ করে বাংলার পার্বণে পরিণত হয়েছে। অন্য শ্রেণীর মত, কৃষি-নির্ভর আদিম লোকায়ত সংস্কৃতি এবং তৎকালীন গ্রামীন জীবন পরিবেশেই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এই সব বিচিত্র পূজাপার্বণ।

যে প্রকৃতি মানুষের আদি জননী, লক্ষণীয় যে, এই প্রকৃতির চক্রাকার আবর্তনের সঙ্গে একই তালে বাংলার গ্রামীন উৎসব তথা পার্বণগুলির সৃষ্টি হয়েছে। বস্তুতঃ প্রকৃতিগত পরিবেশের মূল সুরের সঙ্গে একই ভাবনায় অনুরণিত হয়ে গ্রামবাংলার রঙ্গশালায় এদের ক্রমিক আবির্ভাব।

ঋতুরঙ্গশালায় প্রথম প্রবেশ যার—সে হচ্ছে গ্রীষ্ম। বৈশাখের প্রথম দিন গণেশপূজা আর ব্যবসায়ীর 'হাল-খাতার' দিন জমিদারের জন্য 'পুণ্যাহ' দিবস। অনুষ্ঠানটিতে স্পষ্টতঃ ব্যবসায়ের গন্ধ থাকলেও, উৎসবের ছোঁয়ায় তার অনেকখানিই চাপা পড়েছে।

এই মাসটি অবশ্য ব্রতানুষ্ঠানেই পূর্ণ। সমগ্র বৈশাখ মাস ধরে জলদান, ফলদান, গোক্ষুর, হরির চরণব্রত, মঙ্গলচণ্ডীব্রত প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান। জৈষ্ঠে বিশেষ করে গঙ্গার নিকটবর্তী স্থানে গঙ্গা দশহরা পূজা হয়। এইভাবেই গ্রামবাংলার নারী-পুরুষ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ কাটিয়ে দেয়।

বর্ষাঋতুতে পৃথিবী স্নানসিক্তা। এই সময় গ্রামের জমিতে হলকর্ষণের সূচনা হয়। বাঙালী গ্রাম-বধূ আষাঢ়ের পূর্ণিমা তিথিতে গৃহমধ্যে লক্ষ্মীপূজার আয়োজন করে। এই সময়ই জগন্নাথদেবের রথযাত্রা-উৎসব বাংলার সর্বত্রই অনুষ্ঠিত হয়। রথযাত্রা উৎসবের অনুষঙ্গ রথের মেলা। এই রথের মেলায় প্রয়োজনীয় বহু দ্রব্য বিক্রয় হয়। শ্রাবণ-মাসের প্রায় প্রতি দিনই ঘট প্রতিষ্ঠা করে মনসা দেবীর পূজা করা হয়। শ্রাবণ-সংক্রান্তিতে মনসার প্রতিমা নির্মাণ করা হয় এবং মনসামঙ্গল সুরসহযোগে গ্রামের মানুষ পাঠ করে। নিম্নবঙ্গে অরণ্যপ্রধান অঞ্চলে সর্প ভয়ে ভীত মানুষ নাগপঞ্চমী তিথিতে মনসাপূজা করে। আয়োজন, এই সব উৎসবে হয়তো কম থাকে, কিন্তু আন্তরিকতা ও প্রাণের স্পর্শে তা সজীব হয়ে ওঠে।

তাতে জন্মাষ্টমী পালিত হয়—বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব তিথিরূপে প্রসিদ্ধ। সমাজ জীবনে এই উৎসবের

প্রতিফলন তেমন ব্যাপক না হলেও, শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতের ধর্মপ্রাণ নরনারী এই উৎসব পালন করে। ভাদ্র-মাসের সংক্রান্তিতে শিল্প-কর্মীর কাজ বন্ধ থাকে—সেদিন অস্ত্র ও যন্ত্রের দেবতা বিশ্বকর্মার শুভ আবির্ভাব। পশ্চিম-বঙ্গের বহুস্থানে আবাল-বৃদ্ধ এই দিন ঘুড়ি ওড়ানোর খেলায় মেতে ওঠে। গ্রামে এই দিনেই তাল-পিঠে ও ক্ষীর ঘরে ঘরে তৈরী হয়।

এই ভাদ্র মাসেই পশ্চিমবাংলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে কুমারী-মেয়েরা এক অপূর্ব-সুন্দর উৎসবে যোগদান করে; অনুষ্ঠানটির নাম ভাদুপূজা। এই পূজার প্রধান অঙ্গ নাচ এবং গান। মাসের প্রথম দিনেই মাটির প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে কুমারী-মেয়েরা ভাদুর আগমনী গান গায়—'আদরিনী ভাদুরাণী এল আজি ঘরকে।' একমাস ধরে ভাদুগান চলে—এই সমস্ত গানের মধ্য দিয়ে কুমারী মনের ব্যক্তিগত কামনা-প্রত্যাশার প্রতিফলন ঘটে। ভাদ্রের শেষ দিনে ভাদুর বিদায়—কুমারীরাই ভাদু প্রতিমা মাথায় করে গান গাইতে গাইতে বিসর্জন দিতে যায়, বিজয়ার মতোই এই দৃশ্যের করুণা আমাদের অভিভূত করে।

ইতিমধ্যে শরৎকাল এসে গেছে। আশ্বিন মাস। বর্ষা বিদায় নিয়েছে। শরতের নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলায় রোদ্দুর আর ছায়ার লুকোচুরি খেলার মধ্য দিয়ে বাঙালীর বড় বড় পূজার উদ্যোগপর্ব সূচিত হতে থাকে। তারপর চলতে থাকে একের পর এক উৎসব—দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা। বাঙালীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব এই দুর্গাপূজা। কি গ্রামের মানুষ কি শহরে মানুষ—প্রত্যেক পূজার তিনদিন স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। গ্রামের পূজায় হয়তো শহরের মতো বহুবিধ আড়ম্বর থাকে না, কিন্তু হার্দিক যোগাযোগ উৎসবের প্রকৃত মূল্যকে চিনিয়ে দেয়। এর পরেই লক্ষ্মীপূজা। কোজাগরী লক্ষ্মীর কাছে বাঙালী শ্রী আর সম্পদ কামনা করে। পূর্ণিমার রাত্রে গৃহস্থের ঘরে ঘরে পূজার আয়োজন, প্রসাদ গ্রহণ, সারারাত্রি আনন্দ-উৎসব। মাত্র পনেরো দিনের ব্যবধানে এবার এসে পড়ে মহাশক্তির পূজা—শ্যামা মা অমাবস্যার মধ্যরাত্রে ভক্তকে বরাভয় দান করতে আবির্ভূত হন। কালীপূজার রাত্রে আবার বাঙালীর দীপাবলী উৎসব। অন্ধকার রাত্রি সেদিন প্রদীপের মালায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বস্তুতঃ প্রাকৃতিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে বাঙালীর সৌন্দর্যচেতনা ও ধ্যানদৃষ্টি একই স্বাভাবিকতায় সৌন্দর্যময়ী লক্ষ্মী এবং মুণ্ডমালিনী কালিকাকে আহ্বান জানায়।

মুখ্যত পারিবারিক অনুষ্ঠান হলেও কার্তিকমাসে বাঙালীর গৃহে ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়া বা ভাইফোঁটা এক ছোট্ট খাটো উৎসবের আমেজ নিয়ে আসে। ভাই-বোনের প্রীতিমিলনের এ এক অপূর্ব অনুষ্ঠান—পৃথিবীর কোথাও এমন অনুষ্ঠান হয় কি না জানি না। বোনেরা নানা ছড়ার মধ্য দিয়ে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দিয়ে তার দীর্ঘজীবন কামনা করে।

কার্তিকের শেষে বা অগ্রহায়ণে গ্রামবাংলার একটি প্রধান উৎসব—নবান্ন। এই সময় নতুন ধান ঘরে আসে। 'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন, তোমার ভবনে ভবনে।' কারও মতে বৈদিক শারদোৎসবই হচ্ছে নবান্ন উৎসব। এই সময়ে প্রাপ্ত নবীন অন্ন পিতৃপুরুষকে, দেবতাকে, আত্মীয়-বন্ধুকে এমন কি পশুপক্ষীকেও নিবেদন করে নতুন ধানে গৃহলক্ষ্মীর পূজা করা হয়। মেয়েরা গেয়ে ওঠে,

ধান এলো ছালা ছালা
তাই তুলতে এত বেলা···
গোয়ালে গরু মরাইএ ধান
তাতেই লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান।

পৌষ-পার্বণ বা পৌষ সংক্রান্তি গ্রামীন মানুষের কাছে ভোজন-উৎসবের রূপ ধরে আসে। এক কথায় এ উৎসব পিঠে খাবার উৎসব। সমস্ত শীতকাল ধরে নলেন গুড় বা খেজুর রসের সঙ্গে পিঠে-পায়েস খাবার রীতি গ্রামবাংলার অতি প্রাচীন প্রথা।

এই প্রসঙ্গে একটি মেয়েলী ব্রতের উল্লেখ করতে হয়।

ব্রতটির নাম দুব-দুবলী। অঘ্রান মাসের সংক্রান্তি হতে পৌষ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত এর বিস্তার। কুমারী-সধবা-বিধবা প্রত্যেকেই এই ব্রত করতে পারে। বাঁকুড়া জেলায় কিছু মেয়েলী ছড়াসহযোগে আবার মানভূম জেলায় মেয়েলী সঙ্গীত দ্বারা এই পূজা করা হয়। বিভিন্ন অঞ্চলে দুব বা টুসুর বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। মানভূমে টুসুপূজা প্রায় জাতীয় উৎসবের আকার পেয়েছে।

মাঘ মাসে গ্রামের মানুষও শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বাক্‌দেবী সরস্বতীর অর্চনা করে। বাসন্তী বসন পরে শীতের মিঠে হাওয়ায় বিশেষতঃ ছাত্রছাত্রীরা এই পূজায় মেতে ওঠে। ব্যাপ্তি এবং আড়ম্বরে বাঙালীর সমাজে এই উৎসবের স্থান অনেক উঁচুতে।

ফাল্গুনে গ্রামীন মানুষের প্রধান উৎসব শিবরাত্রি। প্রধানতঃ নারীদেরই এ অনুষ্ঠান। উপবাস, শিবপূজা, গঙ্গাস্নান এই উৎসবের অঙ্গ। এই সময় দোলপূর্ণিমা। বাঙালীর কাছে এই দিনটি শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা নয়, 'বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া' শ্রীগৌরাঙ্গ আবির্ভূত হয়েছিলেন এই পুণ্যতিথিতে।

চৈত্রমাসের প্রধান উৎসব চড়কপূজা, চৈত্র সংক্রান্তি তিথিতে উদ্‌যাপিত হয়। অবশ্য সারা মাস ধরেই এর প্রস্তুতি চলে। সমাজের তথাকথিত ছোট বড় সকলে একত্রে মিলিত হয় শিবের গাজনে। এই গাজন বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে পরিচিত—যেমন নীলপূজা, আদ্যের গম্ভীরা, ধর্মের গাজন ইত্যাদি। নাম ভিন্ন হলেও অনুষ্ঠান-সূচী প্রায় এক। শিব লৌকিক সূর্যদেবতা—বস্তুতঃ গাজন একটি লৌকিক মেলা বা সূর্যোৎসব।

বছরের প্রতিটি মাসেই এইভাবে বাঙালী হিন্দু উৎসবানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাটিয়ে দেয়। উৎসব হোলো জনসাধারণের হৃদয়ের সহজ অভিব্যক্তি। কিন্তু আমাদের জীবনে উৎসবের আধিক্য অস্বীকার করবার নয়। আমরা লক্ষ্য করেছি, এই আধিক্য জাতীয় জীবনের উচ্ছৃঙ্খল কর্মবিমুখতা নিয়ে আসছে। গ্রামজীবনেও এর প্রভাব পড়ছে। শহরে পূজার বিকৃতি, আড়ম্বর-সর্বস্বতা আজ গ্রামে গিয়েও পৌঁছচ্ছে—গ্রামের তরুণেরা সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ভুলে অনুকরণের নেশায় মেতে উঠছে। কিন্তু রুচি ও সংযমহীন যে কোন উৎসবই মনে ভিন্ন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। তাই সর্বজনীন উৎসবে ভাবের আধিক্য থাকলেও, তাকে শালীন হতে হবে।

তাছাড়া জাতির জীবনেও উৎসবের সংখ্যা সীমিত থাকা উচিত বলে মনে হয়। শুধুমাত্র মধ্যযুগীয় স্মৃতিরক্ষার জন্য ঘাবতীয় পার্বণকে বাঁচিয়ে রাখা কি খুবই প্রয়োজনীয়? গ্রামীন জীবনেও আজ কর্মের ঢেউ পৌঁছেছে, সেখানেও ব্যস্ততা—সুতরাং সেই জীবনেও এতগুলো উৎসবের আয়োজন সময়ের অপচয় কি না তাও ভেবে দেখবার সময় এসেছে। একথা বোধহয় ভুল নয় যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যময় গণতান্ত্রিক জীবনে, সর্বজনীন না হয়ে উঠলে যে কোন পূজারই অবলুপ্তি ঘটবে—আর তা ঘটছেও।

মহারাষ্ট্রের গণেশচতুর্থী উৎসব

শ্যামলেন্দু যাত্রা

মহারাষ্ট্রের উৎসব এই গণেশ চতুর্থী। ভাদ্রপদের (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) চতুর্থ দিনে মহাধুমধাম সহকারে মহারাষ্ট্রের গ্রামে ও শহরে গণেশ ঠাকুরের পূজা হয়ে থাকে।

হিন্দুদের কাছে গণেশ হলেন সর্বত্রে সফলতার প্রতীক, তিনি সিদ্ধিদাতা, তাঁকে পূজা করলে সব কাজে সফল হওয়া যায়। তিনিই আবার বিঘ্নহর্তা মানুষের যাবতীয় বাধাবিঘ্ন তিনি দূর করেন। সেইজন্য সকল কর্মানুষ্ঠানের গোড়াতেই গণেশের পূজা করা হয়।

প্রথমে গণপতি অর্থাৎ গণেশের মূর্তি সোভাযাত্রাসহ বাড়ীতে আনা হয়। বাংলার দুর্গাপূজার মতোই মহারাষ্ট্রে বাড়ীতে এবং সর্বজনীন উৎসবের মধ্য দিয়ে গণেশপূজা হয়। কাজেই রাস্তার মোড়ে, ফাঁকা জায়গায়, পার্কে অথবা কারুর খোলা জমিতে বড় বড় প্যাণ্ডেল তৈরী হয়। উৎসবের সময়টি বর্ষার শেষ ভাগ, কাজেই মেঘ-বৃষ্টি-ঝড়ের উৎপাত ঘটতে পারে, সেজন্য চাঁদার একটা মোটা অংশ খরচ হয়ে যায় ত্রিপল ছাওয়া প্যাণ্ডেল বাঁধতে। আমাদের এখানে ঠাকুর আনার সোভাযাত্রা হয় না। ওখানে হয় ব্যাণ্ড-ট্রান্সেট বাজিয়ে, নাচতে নাচতে, গান গাইতে গাইতে ওরা ঠাকুর নিয়ে আসে। বাড়ীতে গণেশপূজা হয় দুদিন এবং সর্বজনীন গণেশপূজা দশদিন। ভাদ্রপদের চতুর্দশ দিনটিকে ওরা বলে অনন্তচতুর্দশী, ঐ দিনে সর্বজনীন উৎসব শেষ হয়, ঠাকুর বিসর্জন হয়।

গণেশ ঠাকুরের মূর্তিটি স্মরণ করুন, তিনি বসে আছেন, ভুঁড়িটি বেশ পুষ্ট, মুখটি হাতীর, চোখদুটি অতি শান্ত, কোন উগ্রতা নেই তাঁর আচরণে, বীর স্থির সৌম্য মূর্তি, পায়ের কাছে যেটি বাহন সেটি আবার নেংটি ইঁদুর, তার কাছে বীরত্ব কেউ আশা করে না।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এ হেন শান্তশিষ্ট দেবতাকে কেন্দ্র করেই লোকমান্য তিলক এক অভিনব আন্দোলন সুরু করেন। তাঁরই চেষ্টায় এবং প্রেরণায় দেশের সর্বত্র বিপুল উৎসাহে গণেশ পূজা হতে থাকে। যে মারাঠী জনগণ মোগল এবং ইংরেজদের বিরুদ্ধে তীব্র স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে তারা এই উৎসবে মেতে ওঠার তদানীন্তন ইংরেজ শাসক আপত্তির কিছুই দেখতে পায়নি। কিন্তু ওই সর্বজনীন পূজার ভেতরেই তলে তলে সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন লোকমান্য তিলক, তাঁরই অদম্য কর্মদক্ষতার ফলে সেদিন পূজা প্যাণ্ডেল হয়ে উঠেছিল জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান। সর্বজনীন পূজাস্থানে তখন বক্তাগণ ভাষণ দিতেন, লোকে শুনত, দেশমাতৃকার প্রতি ভক্তিতে তাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হোত। সেখানে দেশপ্রেমমূলক যাত্রা, থিয়েটার, সঙ্গীতানুষ্ঠান চলত, ফলে ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জেগে উঠত।

শুধু তাই নয়, এই গণপতি উৎসবের ভেতর দিয়ে মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক এবং সামাজিক জীবনেও এসেছে পরিবর্তন। সর্বজনীন পূজার জন্যে শক্তিশালী সংগঠনের প্রয়োজন হয়েছে, প্রয়োজন হয়েছে নিঃস্বার্থ কর্মীর। মহারাষ্ট্রে দেখা যায় অনেক প্রখ্যাত সমাজসেবী তাঁদের জীবন সুরু করেছিলেন গণপতি উৎসব কমিটির সেক্রেটারী হিসেবে। অন্যদিকে পূজার আসরে গান গেয়ে অভিনয় করে অনেক গায়ক এবং অভিনেতা নাম করেছেন, পরবর্তী জীবনে শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, দেশের শিল্প-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছেন।

পূজা উপলক্ষে বিভিন্ন স্থানে মেলা বসে যায়।

নাচ, গান, ম্যাজিক, সমবেত যন্ত্রসংগীত, খেলাধূলা ইত্যাদির আসর বসে।

ঠাকুর বিসর্জন উপলক্ষে বড় বড় শোভাযাত্রা বেরোয়। তার বৈচিত্র্যের আর অন্ত নেই। পুণা শহরে যে শোভাযাত্রা বেরোয় তাতে আখড়ার যন্ত্রবীর-গণ অংশ নেন, সামনে ব্যাণ্ড বাজে, পেছনে চলে নাচ এবং অভিনয়। নিকটবর্তী নদী, হ্রদ কিংবা সমুদ্রে ঠাকুর বিসর্জন হয়।

গণপতি উৎসবের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মহারাষ্ট্রের কৃষক অঞ্চলে গৌরী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। গৌরী বা পার্বতী হলেন গণেশ জননী। একটি গাছকে শাড়ী গয়না পরিয়ে গৌরী সাজানো হয়। তার মাথাটি হয় মাটির।

গণপতি এবং গৌরী উৎসবটি মহারাষ্ট্রের কৃষি-জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। বর্ষাকাল প্রায় শেষ হয়ে আসে উৎসবের কালে। ফসল অঞ্চলে তখন ধান ফলতে সুরু করে, ঘাট বা পার্বত্য অঞ্চলে জোয়ার ও বাজরা পেকে ওঠে। কৃষকের ঘরে ঘরে আশা ও আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তাদের ঘরে মাটির হাতীতে চেপে আসেন গৌরী। হাতী হোল হস্তা মঙ্গলের প্রতীক। কৃষকের বিশ্বাস সৃষ্টির কলে এবার প্রচুর ফলন হবে, ফসলে তার ঘর ভরে যাবে। এই আশা নিয়েই মেয়েরা গৌরী দেবমূর্তির সম্মুখে নাচ গান করে।

গণপতি এবং গৌরী পূজা ও উৎসব মহারাষ্ট্রের অত্যন্ত জনপ্রিয়। মহারাষ্ট্রে আজ বিরাট পরিবর্তনের ঢেউ এসেছে। আগের মতো স্বাদেশিকতার চর্চা হয়তো হয় না। তথাপি মহারাষ্ট্রের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে অনেকখানি স্থান অধিকার করে আছে এই উৎসব।

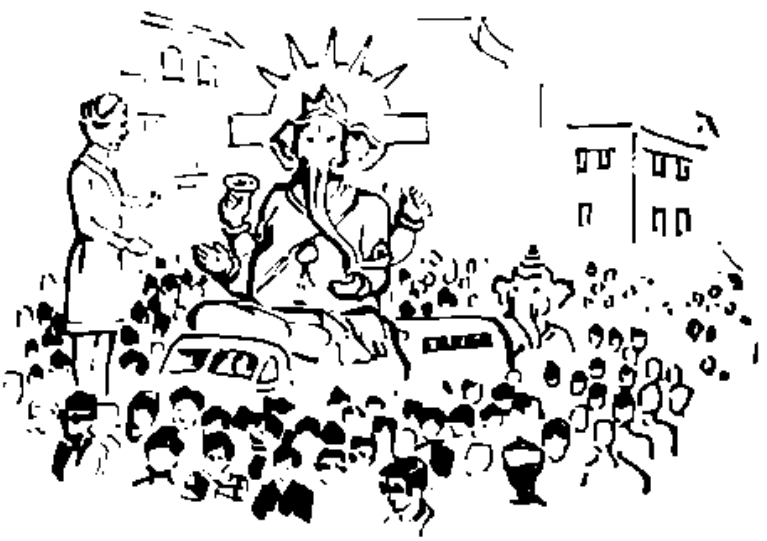

মহারাষ্ট্রে-গণেশ পূজার শোভাযাত্রা

কেরালার ওনাম নৌকা প্রতিযোগিতা

তন্ময়ী মাল্লা

ভারতের দক্ষিণ প্রান্তের রাজ্য হোল কেরালা। এর পূর্ব আর দক্ষিণ দিকে তামিলনাড়ু, ও উত্তর-পূর্বে মহীশূর ; পশ্চিমে আরব সাগর। প্রায় ৩৬০ মাইল দীর্ঘ এই সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল নদী, হ্রদ, খাল-বিলে ভরা। ত্রিবান্দ্রম এবং আলেপ্পির অঞ্চলে হ্রদ বা ব্যাকওয়াটার কেরালাকে এক অনুপম বৈশিষ্ট্য দান করেছে। হ্রদগুলি খালের দ্বারা যুক্ত। সারাবছরই এতে নৌকা চলে।

কেরালার মানুষ প্রকৃতিকে অত্যন্ত ভালবাসে, যে মাটি তাদের অন্ন যোগাচ্ছে তার প্রতি ভালবাসা তারা জানায় উৎসবের ভেতর দিয়ে। তারা ধর্মপ্রবণ এবং শিল্পী প্রকৃতির মানুষ। সে-কারণে ধর্মকে কেন্দ্র করে তাদের উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এবং সেখানে তাদের শিল্পীসত্তা প্রকাশ লাভ করে।

কেরালার সবচেয়ে বড় উৎসব হোল ওনাম। এটি অনুষ্ঠিত হয় মলয়ালাম বৎসরের প্রথম মাস চিঙ্গমে অর্থাৎ শ্রাবণে (ইংরাজী আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাস)। অসুর সম্রাট মহাবলীকে নিয়েই এই উৎসব। সে এক অতি সুন্দর পৌরাণিক কাহিনী। অতীতে সম্রাট মহাবলী এখানে সুখে রাজত্ব করতেন। তাঁর রাজত্বে সবাই সমান ছিল, চুরি ডাকাতি, খুন, রাহাজানি—কোনো পাপকার্য হোত না, তাঁর রাজ্যে সবাই শান্তিতে বাস করত। কিন্তু দেবতারা সহ্য করতে পারলেন না সম্রাট মহাবলীকে, তাঁরা বিষ্ণুর শরণাপন্ন হলেন সম্রাটকে অপসারণের জন্য। বামনবেশে বিষ্ণু সম্রাট মহাবলীর কাছে গেলেন এবং ভিক্ষা প্রার্থনা করলেন। মহাবলী ছিলেন অত্যন্ত দানশীল। তারই সুযোগ নিলেন বিষ্ণু, ত্রিপাদ ভূমি দান করতে গিয়ে

উৎসবে আলোক মালা

তিনি সর্বস্ব হারালেন, বিষ্ণু তাকে পাতালে পাঠালেন। কিন্তু তিনি এইটুকু বর দিলেন যে সম্রাট মহাবলী প্রতি বছর একবার কেরালায় ফিরে আসতে পারবেন। প্রজাবর্গ কেমন আছে। তাই দেখতে মহাবলী বছরে একবার তাঁর রাজত্বে আসেন, এই উপলক্ষে দশদিন ধরে কেরালায় যে উৎসব চলে তাই হোল ওনাম। এই উৎসবে মানুষ বহুরকম আনন্দ করে, তারা নাচে, গান গায়, আর—নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা করে। এই প্রতিযোগিতা কোন স্বতন্ত্র উৎসব নয়, ওনামেরই অঙ্গবিশেষ।

উৎসবের সময়টি অত্যন্ত সুন্দর। তখন বর্ষাবাদল কেটে যায়, ঘরে ফসল তোলার সময় হয়ে আসে। সকলের মনে জাগে আশা আর আনন্দ—এবার অভাব-অনটন আর দুঃখকষ্টের দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে, সামনে আসছে নবান্নের দিন, মালয়ালীরা তাই মেতে ওঠে উৎসবে।

তারা নতুন জামাকাপড় পরে। শাদা ধবধবে ধুতি, তাতে সোনালী রঙের পাড়। শাদাই তাদের প্রিয় রঙ। ঘর থেকে পথে বেরিয়ে পড়ে সবাই, নারকেলের শক্ত বল নিয়ে খেলা করে, নদীতে চলে সাঁতার প্রতিযোগিতা। কিন্তু সকলের লক্ষ্য থাকে নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতার দিকে। আকাশ তখন নীল, নারকেল গাছের পাতার পাতায় রোদ পড়িয়ে পড়ে। নানা রঙীন ফুলে ফুলে মাটি ছেয়ে যায়, নদী-খাল-হ্রদগুলি জলে পরিপূর্ণ। এই পরিবেশ তাদের এনে দেয় নৌপ্রতিযোগিতার সুযোগ।

শুধু তাই নয়, এককালে মালয়ালীদের পূর্বপুরুষগণ ছিলেন দাহসী বীর, অকুতোভয় নাবিক। তাঁরা পাল তোলা জাহাজে বহু দূর সমুদ্রে অজানা দেশে পাড়ি জমিয়েছেন। তাঁদেরই উত্তরাধিকার বহন করছেন আজকের কেরলবাসীগণ। নৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা হোল তাঁদের সেই শৌর্য এবং সমুদ্রযাত্রার স্মরণে আনন্দলীলা।

যথা সময়ে নদী এবং হ্রদের ধারে দর্শনার্থী জনতার বিপুল সমাবেশ হয়। জলে নৌকা নামে। নৌকাগুলির গঠন বিভিন্ন রকমের। মধ্যকেরালার মন্দিরকেন্দ্রিক উৎসবে যে নৌকা ভাসানো হয় তাকে বলে সর্পনৌকা, মালয়ালী ভাষায় 'চুন্দন ভাল্লম'। এর একদিক প্রায় মুড়ি ফুট উঁচু। বড় নৌকাগুলি লম্বায় প্রায় একশো ফুট। তার দুধারে সমসংখ্যক দাঁড়ী। আনন্দ ও উৎসাহ দেবার জন্য গায়কের দলও থাকে সেখানে।

এই প্রসঙ্গে ওনামের ষষ্ঠদিনে চেঙ্গান্নুরের নিকটবর্তী আরানমুলায় যে নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় তা স্মরণযোগ্য। স্থানীয় মন্দিরের দেবতা হলেন অর্জুন, তিনি নৌকায় আগমন করেছিলেন এই স্থানে। সেই উপলক্ষ্যে প্রাচীন কাল থেকেই এ উৎসব চলে আসছে।

কোট্টায়ম নামক স্থানের বাইচ খেলাও উল্লেখযোগ্য।

প্রতিটি নৌকার ওপরে খোলা থাকে উজ্জ্বল লাল রঙের বড় বড় ছাতা। ছাতাগুলি মালিকের সমৃদ্ধি ঘোষণা করে। ছাতার চারপাশে স্বর্ণসূত্র এবং রেশমী ফিতে ঝুলতে থাকায় অতি সুন্দর দেখায় দূর থেকে।

সুরু হয় প্রতিযোগিতা। গায়ক গান ধরে, তারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত-পায়ের সাহায্যে তাল রাখে, দাঁড়ী দাঁড় বেয়ে চলে ক্ষিপ্র গতিতে, জলে ছপাৎ ছপাৎ শব্দ হয়, গোল হয়ে দাঁড় জল থেকে উঠতে আর পড়তে থাকে। তীর গতিতে নৌকাগুলি ছোটে, দর্শকরা আনন্দ কলরোলে তাদের উৎসাহ দেয়। যতদূর অবধি প্রতিযোগিতা চলে ততদূর অবধি নদী বা হ্রদের দুধারে লোক, নৌকার গান, হাততালি, দাঁড়ীদের ঝকঝকে শাদা

পাগড়ী, দাঁড়ের আঘাতে জলে নানা রঙের ছাপি—সে এক অপরূপ দৃশ্য।

কেরালায় বহু উৎসবের সমারোহ কমে এসেছে কিংবা পালটে গেছে কিন্তু ওনাম এবং বৌকাবাইচ প্রতিযোগিতা আজও সমান ভাবে চলেছে। আজকের এত সমস্যা, এত দুঃখ দুর্দশার ভেতরও মানুষ তখন প্রাণ খুলে আনন্দ করে। ওনাম দিনে মহাবলী কেরালায় এসে তাঁর প্রিয় প্রজাদের দেখে যান সুখী সমৃদ্ধরূপে, আর বোধকরি পাতালে ফিরে সকলকে বলেন যে তাঁর প্রজাকুল দুহাজার বছর আগের মতোই সুখে শান্তিতে বাস করছে।

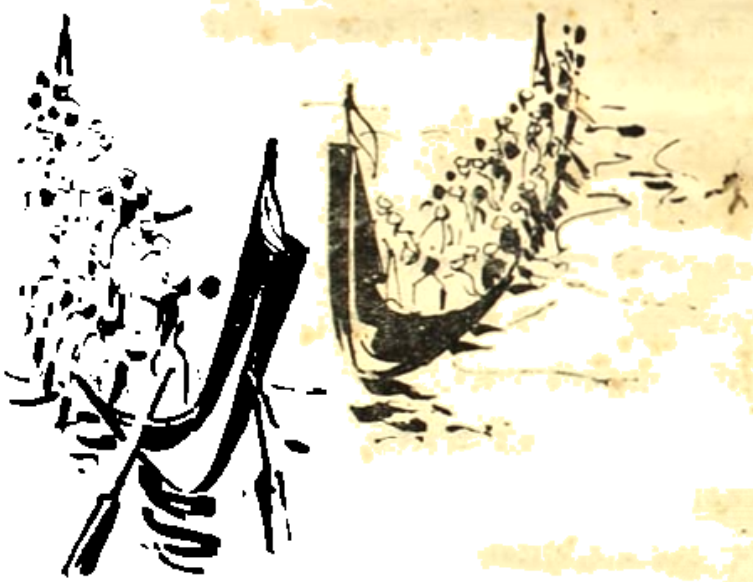

কেরলের মহোৎসব—নৌকা বাইচ

দশেরা

দীপঙ্কর

দশেরা একটি সর্বভারতীয় উৎসব। গোপথ ব্রাহ্মণে এই উৎসবের উল্লেখ আছে। দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীই এই উৎসবে পূজিত হয়ে থাকেন। তবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায় এই উৎসবকে রামচন্দ্রের উৎসব বলেই পালন করে থাকেন। ১০ দিন ধরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেজন্য একে 'দশরাত্র' বলা হয়। সংস্কৃত বর্ষপাঠে এই উৎসব 'নবরাত্র' বলে উল্লিখিত হয়েছে। শুক্লা চতুর্দশীতে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরে আশ্বিনে (শারদ) এবং চৈত্র মাসে (বসন্ত) এই অনুষ্ঠানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতে এই দুইমাস 'কালদংষ্ট্রা' অর্থাৎ রোগ-মৃত্যুমারীর কারণ। এথেকে মুক্তি পাবার জন্যেই দেবী দুর্গার আরাধনা করা হয়। আর লক্ষ্মী ও সরস্বতীর পূজা করা হয় সুখ ও সমৃদ্ধির জন্যে।

ভাদ্রমাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমীতে দেবী দুর্গা বিশ্রাম করতে যান এবং আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমীতে জেগে ওঠেন। রাম-রাবণের যুদ্ধের সময় দেবীর অকাল বোধন করা হয়। শ্রীশ্রীচণ্ডী অনুসারে ব্রহ্মা মধু ও কৈটভ নামে অসুরের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে দেবীকে অসময়ে জাগিয়েছিলেন।

আশ্বিন মাসের প্রতিপদে দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যে পূজা আরম্ভ হয়, তা দশদিন ধরে অনুষ্ঠিত হবার পর দশমীর দিন সন্ধ্যায় সমাপ্ত হয়। প্রথমা থেকে তৃতীয়া এই তিন দিন সংসার শক্তিরূপিণী দুর্গার পূজা হয়; লক্ষ্মীর পূজা হয় চতুর্থী থেকে ষষ্ঠী এবং সরস্বতীর পূজা হয় সপ্তমী থেকে নবমী। এই তিন জন দেবী তিনটি শক্তির প্রতীক। প্রচলিত ধারণা—এঁদের আরাধনায় সমস্ত অকল্যাণ দূর হয়ে যায়। বাংলাদেশে

মহীশূরে দশেরা উৎসব

যেমন দুর্গা, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর একত্র আবার পৃথক-ভাবে পূজার্চনার রীতি প্রচলিত আছে, দক্ষিণ ভারতে সেরকম পূজায়োজন করা হয় না। সেখানে তিনজন দেবীই একসঙ্গে পূজিত হন। বিজয়া দশমী বিদ্যারম্ভ বা হাতেখড়ির পবিত্র দিন বলে বিবেচিত হয়। শুধু বিদ্যারম্ভ কেন, সবরকম ক্রিয়াকর্মই এই শুভ দিনে আরম্ভ করার রীতি প্রচলিত আছে। যন্ত্রপাতি, কল-কব্জার পূজা ও কারিগরী কাজের উদ্বোধন এই দিনে করা হয়।

দেশীয় রাজাদের শাসনকালে ত্রিবাঙ্কুর কোচিন মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে খুব জাঁকজমকের সঙ্গে দশেরা উৎসব প্রতিপালিত হত। বিশেষ করে মহীশূর রাজ্যে আড়ম্বরপূর্ণ দশেরা উৎসবের প্রসিদ্ধি সর্বজনবিদিত। টিপু সুলতান ও হায়দার আলির সময়েও এই উৎসব প্রচলিত ছিল। তাঁরা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও দশেরা উৎসবে অংশ গ্রহণ করতেন।

দশেরার দিন সমস্ত মহীশূর শহর আলোয় আলোময় হয়ে উঠত। রাজা এই শুভদিনে পার্শ্বে চামুণ্ডেশ্বরী দেবীর মন্দিরে গিয়ে তাঁর পূজার্চনা করতেন। তারপর আলোকমালায় সমুজ্জ্বল রাজ প্রাসাদ থেকে রাজকীয় যাত্রা (স্টেট ড্রাইভ) শুরু হত। রাজা তাঁর মণিমাণিক্য খচিত রাজবেশ পরে সুসজ্জিত হাতির পিঠে সুশোভন সিংহাসনে বসে শোভাযাত্রার পুরো ভাগে যেতেন। সঙ্গে থাকতেন তাঁর অমাত্যগণ দেহরক্ষী, রাজপরিবারের আত্মীয়গণ এবং রাজ্যের শত শত প্রজা। সেই শোভাযাত্রার বর্ণাঢ্যতা ও জাঁকজমক সকলের বিস্ময়ের সৃষ্টি করত। আজ মহীশূরে রাজা নেই, মহীশূর এখন ভারতরাষ্ট্রের একটি অঙ্গরাজ্য। কাজেই আগেকার দশেরা শোভাযাত্রার আড়ম্বর আজ অনেকখানি ম্লান হয়ে গেছে। তবু মহীশূর শহরে দশেরা উপলক্ষে আজও যে শোভাযাত্রা হয় তার আকর্ষণও বড় কম নয়। এই উপলক্ষে প্রতি বছর এখানে একটি সর্বভারতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

———

দশেরা উৎসবের শোভাযাত্রা